চিত্রের সূচী।

The woman's cause is man's; they rise or sink
Together, dwarfed or God-like, bond or free;
If she be small, slight-natured, miserable,
How shall men grow?

Tennyson.

৩য় ভাগ। } বৈশাখ, ১৩১৪। { ১ম সংখ্যা।

নারীজাতির শিক্ষা।

অর্দ্ধ শতাব্দীর পূর্ব্বে নারীজাতির শিক্ষার আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য গবেষণাপূর্ণ দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিবার প্রয়োজন হইত। আমাদিগের পরম সৌভাগ্য বশতঃ সে দিন আর নাই। আমাকে যুক্তি তর্কের সহায়তায় নারীশিক্ষার আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করিতে হইবে না। "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"—এখন ইহা এক প্রকার সর্ব্ববাদিসম্মত মন্ত্র। নারীগণকে শিক্ষিতা করিতেই হইবে। সেই শিক্ষা কিরূপ প্রণালীতে সম্পন্ন হইলে সমধিক কল্যাণ লাভ হইতে পারে, বর্ত্তমান প্রবন্ধের তাহাই আলোচ্য।

বর্ত্তমান জাপানের সমৃদ্ধির বিষয় বলিতে গিয়া জনৈক ইংরাজ লেখক লিখিয়াছেন, "The family life of a country and the position occupied by women are probably the best tests of its civilisation. In comparing nation with nation we have no doubt in asserting that one of the most important forces in the progress of society is the education which the mothers convey to their children, and no nation can ever be great unless women rise to a high plane of thought and life, and kindle and foster similar ideas in the minds of the young"—Dai Nippon P. 375.

গার্হস্থ্য জীবন এবং নারীজাতির সামাজিক অবস্থা সকল দেশেরই সভ্যতার প্রকৃত পরিচায়ক। জাতি সমূহকে পরস্পরের সহিত তুলনা করিতে হইলে, শিশুগণ গৃহে জননীর নিকট যে শিক্ষা লাভ করে তাহাকেই জাতীয় উন্নতির প্রধান উপকরণ বলিয়া গণনা করিতে হয়। নারীগণের চিন্তা এবং জীবন উন্নত না হইলে কোন জাতিই প্রকৃত মহত্ব লাভ করিতে সক্ষম হইতে পারে না। জননীই সন্তানগণের হৃদয়ে যথাসময়ে মহদ্ভাবের বীজ রোপণ করিতে সক্ষম হন।

এই বিশেষ লক্ষণ অনুসারে যদি বিচার করিতে হয়, তাহা হইলে আমরা কত নিম্ন স্তরে পতিত হই। এ সম্বন্ধে ভারতের অবস্থা যে এক সময় বিশেষ উন্নত ছিল, প্রাচীন সাহিত্য পুরাণাদি তাহার সাক্ষী। বেদের ঋষিরমণীগণ, গার্গী, মৈত্রেয়ী, লীলাবতী প্রভৃতি মনস্বিনী রমণীগণের নাম সকলেই শ্রবণ করিয়াছেন। পরে যখন শাক্যসিংহ বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিয়া ভারতে নব-যুগের অবতারণা করিলেন, তখন ভারত-রমণীর অবস্থা

কিরূপ ছিল? বৌদ্ধশাস্ত্র তাহার সাক্ষী। স্থবিরা বা থেরী সম্প্রদায়ের নাম অনেকে শুনিয়া থাকিবেন। এই থেরীগণ কি মাহাত্ম্য রমণী ছিলেন? কি জ্ঞান-গরিমা, কি কঠোর বৈরাগ্য, কি অপূর্ব্ব স্বার্থত্যাগ, কি মধুর সহানুভূতি এই দেবীপ্রকৃতি নারী-সম্প্রদায়ের হৃদয় অধিকার করিয়া ভারতে স্বর্গের শোভা বিস্তার করিয়াছিল! আমরা বিদেশিনী সন্ন্যাসিনীগণের আত্মোৎসর্গ দেখিয়া মুগ্ধ হই। এই সন্ন্যাসিনী দলের আদি জননী কে? আমাদের ভারতের হরিৎবসনা শান্তা থেরীগণ! ভারতের সে দিন আর নাই, গভীর জ্ঞানসম্পন্না পরোপকারিণী সন্ন্যাসিনী দল আর নাই। সহস্র সহস্র ভারত-নারী এক দিন একই আশ্রমে বাস করিয়া জ্ঞান ও ধর্ম্মের সেবায় জীবন যাপন করিতেন। তখন ভারতের গৌরবের দিন ছিল। হোয়েন সাং যখন ভারত ভ্রমণে আগমন করেন, তখন প্রকাশ্য রাজসভায় সম্রাট হর্ষবর্দ্ধনের দক্ষিণে তাঁহার বিধবা ভগ্নী রাজ্যেশ্বরী উপবেশন করিয়া জ্ঞান ধর্ম্মের আলোচনা উৎফুল্ল নেত্রে একাগ্র মনে শ্রবণ করিতেন।

অন্য সকল প্রকার অধিকারের বিষয় ছাড়িয়া দিলে গৃহ রমণীর এক মাত্র রাজ্য, এক মাত্র শিক্ষা ও শক্তি বিকাশের স্থল, সেখানে ভারত-রমণী কিভাবে দিন যাপন করেন? এ বিষয়ে সকলেরই অভিজ্ঞতা আছে, আমাকে বিশদ ভাবে আর এ বিষয়ের বর্ণনা করিতে হইবে না। বিধাতার বিশেষ কৃপায় ভারত-রমণীর অজ্ঞতার দীর্ঘ নিশার অবসানের সূচনা হইয়াছে। জাতির উন্নতির মূল মন্ত্র নারীগণের সুশিক্ষা। রমণীগণের দুর্ব্বলতা, অজ্ঞতা, পরমুখাপেক্ষিতা কেবল যে তাঁহা-দিগেরই অগৌরবের কারণ তাহা নয়, ইহাতে সমগ্র জাতির হীনতা প্রকাশ করে। নারীগণকে শিক্ষিতা করিলে কেবল যে তাঁহাদিগেরই কল্যাণ তাহা নয়, ইহাতে পুরুষের নীতি উন্নত এবং সুখ সমৃদ্ধি নিশ্চয়ই বর্দ্ধিত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। শিক্ষার আলোক বড় উজ্জ্বল আলোক। এই দিব্যালোক চক্ষে পড়িলে সকল সত্য প্রকাশিত হয়। নারীর উন্নতির পথে যাঁহারা কণ্টক রোপণ করিতে প্রয়াসী, তাঁহাদিগের ভীতিও বোধ হয় এই জন্য। পুরুষের জন্ম দেবতার জন্য, দেশের জন্য, নারীর জন্ম পুরুষেরই জন্য—সকল দেশের নীতি-শাস্ত্র আবহমান কাল এই উপদেশ দিয়া আসিতেছে। কোন দেশের শাস্ত্র বলিয়াছে, "নারীর আত্মা নাই," আমাদের দেশের শাস্ত্রে বলিয়াছে, "পতিই নারীর দেবতা। পতির সেবা ভিন্ন নারীর অন্য পূজা অর্চ্চনা নাই।" এই প্রকার শাসন এবং শিক্ষা দ্বারা নারীজাতি সম্পূর্ণ রূপে আত্মবিনাশ করিতে শিক্ষা করিয়াছেন। ধর্ম্মশাস্ত্রে সেবা এবং আত্মবিনাশ অতি মহৎ ভাব বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। এই দুই মহৎ ভাব সাধন করিয়া নারীপ্রকৃতি প্রগাঢ় ধর্ম্মভাব লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছে, কিন্তু অপর পক্ষে পুরুষগণ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। নারীর পক্ষে নৈতিক নিয়ম সকল কঠোর, পুরুষের জন্য শিথিল। কিন্তু যে সমাজে পুরুষের নৈতিক চরিত্র শিথিল, সেখানে নারীকেও পতিত হইতে হইবে। একের উত্থানে উভয়ের উত্থান, একের পতনে উভয়ের পতন অনিবার্য্য।

হীয়তে হি মতিস্তাত হীনৈঃ সহ সমাগমাৎ
সমৈশ্চ সমতামেতি বিশিষ্টৈশ্চ বিশিষ্টতাম্।

এই সুন্দর নীতি-বাক্যের ব্যতিক্রম কি কেবল নরনারী সম্বন্ধেই হইবে? পুরুষগণ ক্রমাগত শিক্ষা-জ্ঞান-বর্জ্জিতা ক্ষুদ্রচেতা রমণীগণের সহিত বাস করিলে অবনতি ভিন্ন উন্নতি কি করিয়া লাভ করিতে পারেন? এই প্রকারে নারীকে হীনাবস্থায় রাখিয়া পুরুষগণ আপনারা হীনতা প্রাপ্ত হইতেছেন। কারণ নারী শিক্ষিতা আর অশিক্ষিতাই হউন পুরুষদিগের প্রতি তাঁহাদের অপ্রতিহত প্রভাব। এরূপ ভূরি ভূরি নিদর্শন উল্লেখ করিতে পারা যায়, যেখানে নারীগণের অজ্ঞতা এবং কুসংস্কারের প্রতিবিধান করিতে অসমর্থ হইয়া পুরুষদিগকে জ্ঞাতসারে কত অন্যায় কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হইতেছে। অপর পক্ষে উন্নতচরিত্রা নারীগণের প্রভাবে পুরুষদিগের চরিত্র উন্নত হয়।

অনেকে হয়ত বলিবেন, বিদ্যাশিক্ষা না করিলেও নারীগণ উন্নত হইতে পারেন। আমরা বলি, অজ্ঞতার ভিত্তির উপর যাহা কিছু প্রতিষ্ঠিত, তাহার স্থায়িত্ব

কিছুই নাই, তাহার মূল্য অতি সামান্য। শিশুগণ যখন ক্রন্দন করে, অনেকে ভূত প্রেতের কথা বলিয়া তাহাকে শান্ত করে, কিন্তু এরূপ উপায়ে অধিক দিন সে শান্ত হয় না, দুদিনের মধ্যেই শিশু বুঝিতে পারে, যে কাঁদিলেও ভূত আসে না। ভ্রান্তি ভঙ্গ হইলেই সকল ধর্ম্মশাস্ত্র ধূলিসাৎ হইবে। যে দেখিয়া শুনিয়া বুঝিয়া গন্তব্য পথে পদবিক্ষেপ করে, সে ভাল চলিতে পারে, —না যে অন্ধের মত অপরের হস্ত ধরিয়া চলে, সে দ্রুত যায়? পরন্তু অন্ধের বিপদ পদে পদে। কবি বলেন, অজ্ঞতা শিশুর সৌন্দর্য্য, কিন্তু অজ্ঞতা নারীগণেরও সৌন্দর্য্য, কোন কবি এরূপ কথা বলিয়াছেন কি? বর্ত্তমান সময়ে শিশুকেই বা কয়দিন অজ্ঞ থাকিতে দেওয়া হয়? শিশুর ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে জ্ঞানের বোঝা চাপাইবার জন্য আমরা কত ব্যস্ত! ফলে কি দেখি না, অষ্টম বর্ষীয় বালক জননীর অধিক পাণ্ডিত্য লাভ করিতেছে! অধিকতর বিস্ময়ের কথা, এই প্রকার বিসদৃশ অবস্থা দেখিয়া কাহারও মনে লজ্জা বা ক্ষোভের উদয় হয় না। কন্যাকে বিদ্যা ও জ্ঞানবর্জ্জিতা রাখিতে পিতার লজ্জা নাই, অশিক্ষিতা অজ্ঞ স্ত্রীকে জ্ঞান শিক্ষা দিবার স্পৃহা পতির নাই, এরূপ সুপণ্ডিত পিতা বা পতিকে বিদ্যানুরাগী বলিয়া কে পাণ্ডিত্যের অবমাননা করিবে? পুরুষের পক্ষে যাহা কল্যাণকর, গৌরবের কারণ, নারী-প্রকৃতিতে এমন কি বিষয় আছে, যদ্দ্বারা বিদ্যা ও জ্ঞান সে পাত্রে পড়িয়া বিকৃত হইবে? নারীর বুদ্ধিশক্তি একেবারে নির্ব্বাণ-প্রায়, এ কথা নিশ্চয় কেহ বলিতে সাহসী হইবেন না। নারীর উন্নতি ও শিক্ষার পথে কণ্টক রোপণ করিবার অধিকার কাহারও নাই। নারীগণকে যাঁহারা অজ্ঞ রাখিতে প্রয়াসী তাঁহারা নরসমাজের ঘোর শত্রু। এদেশের নারী-সাধারণ অদ্যাপি বিদ্যা-জ্ঞান বিবর্জ্জিতা আছেন। ১৮৯৬-৯৭ খৃষ্টাব্দে শিক্ষা বিভাগের যে তালিকা সংগৃহীত হয়, তদনুসারে সমুদয় ভারতবর্ষে ৪০২১৫৪ জন বালিকা নাম মাত্র শিক্ষা লাভ করে। অর্থাৎ শিক্ষার্থী দিগের মধ্যে শতকরা ২·৩৪ জন মাত্র বালিকা পাঠশালায় গিয়া থাকে। বালিকাগণের সাধারণ শিক্ষায় মান্দ্রাজ সর্ব্বাপেক্ষা অগ্রসর, তৎপরে বাঙ্গালা, তৎপরে বম্বে। ভারতবর্ষের অন্যান্য বিভাগে বালিকাগণকে যে কোন প্রকার শিক্ষা দেওয়া হয় তা বলা যাইতে পারে না। এ সম্বন্ধে মুসলমান সমাজ আরও পশ্চাৎপদ। খৃষ্টান এবং ব্রাহ্মদিগের মধ্যে ভিন্ন অন্যান্য সম্প্রদায়ের ভিতর নারীগণের উচ্চশিক্ষা একেবারেই বিরল। ভারতীয় নারীগণের শিক্ষার বর্ত্তমান অবস্থা এইরূপ, কিন্তু সর্ব্বত্রই স্ত্রীশিক্ষা প্রচলনের চেষ্টা হইতেছে। এমন কি, মুসলমান বালিকাদিগের জন্যও বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

শিক্ষার উদ্দেশ্য কি? শিক্ষার উদ্দেশ্য দ্বিবিধ ১। জ্ঞান লাভ। ২। অর্থ উপার্জ্জন।

প্রথমতঃ দৈহিক শিক্ষা। দেহমনের প্রকৃতি-নিহিত শক্তি সকলের সম্যক বিকাশই প্রকৃত শিক্ষার উদ্দেশ্য। যে শিক্ষা দ্বারা এ উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হয়, তাহা প্রকৃত শিক্ষা নয়, এদেশে বালিকাদিগের দৈহিক বলবৃদ্ধির কোন ব্যবস্থাই নাই। অনেকে বলিয়া থাকেন, যে গৃহকর্ম্ম সম্পন্ন করিতে নারীদিগের যথেষ্ট ব্যায়াম হইয়া থাকে, সুতরাং অন্য ব্যায়ামের আবশ্যকতা নাই। কিন্তু কয়জন ধনীর গৃহিণী স্বহস্তে গৃহকর্ম্ম করিয়া থাকেন? তাঁহাদিগের শারীরিক চালনা আবশ্যক। বর্ত্তমান সময়ে অনেকে স্বাস্থ্যকর ব্যায়াম প্রণালী অবলম্বন করিয়া শারীরিক বল সঞ্চয় করিতেছেন, রমণীগণও তাহা পারেন বটে, কিন্তু শ্রমসাধ্য ক্রীড়াদ্বারা শরীর বলযুক্ত এবং চিত্ত প্রফুল্লহয়।

এদেশে নারীর স্বাস্থ্যোন্নতির অন্তরায় নানাবিধ। অবরোধ প্রথা আমাদিগের স্বাস্থ্যরক্ষার প্রধান অন্তরায়। চিকিৎসকগণ স্বাস্থ্য লাভের জন্য সকলকে প্রমুক্ত বায়ু সেবন এবং পদব্রজে ভ্রমণের ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। অন্তঃপুরবাসিনীগণের এই স্বাভাবিক নির্দ্দোষ স্ফূর্ত্তি অনুভব করিবার অধিকার নাই। এজন্য তাঁহাদের অনেকেই যে ভগ্নস্বাস্থ্য ও স্ফূর্ত্তিহীন হইবেন তাহাতে আর বিচিত্র কি?

দ্বিতীয়তঃ বাল্যবিবাহ।—এই সামাজিক রীতি নারী-দিগের স্বাস্থ্যরক্ষার একান্ত প্রতিকূল। চিকিৎসকগণ একবাক্যে বলিয়া থাকেন, দৈহিক যন্ত্র সকল পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে বালিকাদিগের জননী হওয়া বিষম

নহে। কিন্তু বঙ্গের গৃহে গৃহে এই বিধির অন্যথা হইতেছে। চতুর্দ্দশ বৎসরের পূর্ব্বে সাধারণতঃ বালিকা সকল জননী হইয়া থাকে। ষোড়শ বৎসরের পূর্ব্বে সন্তানবতী না হইলে বালিকাদিগকে বন্ধ্যা আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে। যে দেশে সামাজিক রীতি এরূপ দূষিত, সেখানে নারীর স্বাস্থ্যরক্ষা অসম্ভব। বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গনারী আকৃতিতে এরূপ ক্ষুদ্রতা প্রাপ্ত হইতেছে, যে দেখিলে আশ্চর্য্য বোধ হয়। সুস্থ সবল নারী বঙ্গদেশীয় অন্তঃপুরে নিতান্ত বিরল। হয় অতি স্থূল মাংসপিণ্ড, নচেৎ অতি ক্ষীণ কৃশ লতিকার ন্যায়। সুস্থ, সবল, দৃঢ়, কর্ম্মঠ বঙ্গনারী কয়জন দেখিয়াছি তাহা চিন্তা করিয়া অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া গণনা করিতে হয়। নারীদিগের স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে সকলেই উদাসীন। সম্পন্ন গৃহস্থগণ পরিবারস্থ নারীগণের পীড়া হইলে বহু ব্যয় করিয়া থাকেন সত্য, কিন্তু তাঁহাদিগের স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থা করেন কই? দুগ্ধ-ফেননিভ শয্যায় নিরন্তর শয়ন করিয়া কখন স্বাস্থ্য লাভ হয় না। যেমন জননীর স্বাস্থ্য, সন্তানেরও স্বাস্থ্য তদ্রূপ। এরূপ উদাসীনতার ফলে জাতীয় জীবনীশক্তি ক্রমে ক্রমে একেবারে লুপ্ত হয়।

নারীগণের স্বাস্থ্যরক্ষার তৃতীয় অন্তরায় অলঙ্কার পরিচ্ছদাদির অযথা ব্যবহার। সকলেই বলিয়া থাকেন, ভূষণপ্রিয়তা নারীগণের স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা। সুসভ্য নারীগণকেও যখন অতিমাত্রায় বেশবিন্যাশের অনুরাগিনী দেখিতে পাই, তখন ইহাকে নারীজাতির দুর্ব্বলতা বলিয়াই বিশ্বাস জন্মে। সুরুচি-সঙ্গত বেশ-বিন্যাস করা রমণী মাত্রেরই কর্ত্তব্য, কিন্তু যদ্দ্বারা স্বাস্থ্যহানি হয়, বা ব্যয়বাহুল্য ঘটে, সেইরূপ পরিচ্ছদ অলঙ্কার কখনই ব্যবহার করা উচিত নহে। আমাদের দেশের রমণীগণ আপাদমস্তক অলঙ্কার দ্বারা এরূপ মণ্ডিত করেন যদ্দ্বারা শরীরের রক্তসঞ্চালন ক্রিয়ায় ব্যাঘাত উপস্থিত হয়। এরূপ ভূষণপ্রিয়তা নিতান্তই নির্ব্বুদ্ধিতা। ইহাতে সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হওয়া দূরে থাকুক বরং কদর্য্য দেখায়। বসন ভূষণে সম্পদ ঐশ্বর্য্য প্রদর্শনের ইচ্ছা নিতান্তই কুরুচির পরিচায়ক।

মানসিক ও নৈতিক শিক্ষা।—মানসিক শিক্ষার পূর্ব্বে শারীরিক শিক্ষার আলোচনা করা হইল। কারণ দেহই মনের যন্ত্র, অসুস্থ রুগ্ন দেহ সকল প্রকার শিক্ষার অন্তরায়, সুতরাং শারীরিক স্বাস্থ্য সর্ব্বাগ্রে দেখিতে হইবে।

বালিকাদিগের শিক্ষা সম্বন্ধে প্রথমেই গুরুতর মতভেদ লক্ষিত হয়। (১) এক শ্রেণী বলেন, বালক এবং বালিকাদিগের শিক্ষাগত কোন পার্থক্য থাকা বিধেয় নহে। (২) অন্য পক্ষ বলেন, বালিকাদিগকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। প্রথমোক্ত শ্রেণীর মত, স্ত্রীপুরুষের প্রকৃতিগত এবং অধিকারগত কোন বিভিন্নতা নাই, এখন যে বিভিন্নতা দৃষ্ট হয় তাহা কেবল যুগযুগান্তরের অজ্ঞতা এবং একদেশদর্শী শিক্ষার ফল। বালকদিগের ন্যায় বালিকাদিগকে শিক্ষা দিলে তাহারাও বালকদিগের ন্যায় হইবে। এই উভয় শ্রেণীরই উক্তি আংশিক পরিমাণে সত্য—নরনারীর প্রকৃতিগত বিভিন্নতা একেবারে উপহাসযোগ্য কথা নহে। কিন্তু স্বাভাবিক পার্থক্য শিক্ষার দোষে এবং অজ্ঞতা হেতু অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। শিক্ষার ফলে অনেক পার্থক্য সময়ে বিদূরিত হইবে। এই বাক্যের সত্যতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য আমাদিগকে বহুদূরে যাইতে হইবে না। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে মহাত্মা বীটন (বেথুন) যখন প্রথম বালিকাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন, তখন কি হুলস্থূলই না উপস্থিত হইয়াছিল। তখন এদেশের নারীগণ কোন প্রকারে মাতৃভাষা লিখিতে এবং পড়িতে পারিলেই শিক্ষার পরাকাষ্ঠা হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইত। এখন কেবল বঙ্গদেশে নয় ভারতের অন্যান্য দেশের রমণীগণও বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ উপাধি গ্রহণ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। রমণী চিকিৎসক, রমণী আইন ব্যবসায়ীর পর্য্যন্ত নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। রমণীর শিক্ষার দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইবার এত অল্প দিনের মধ্যে নারীগণ যখন শিক্ষার উচ্চ শিখরে আরোহণ করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তখন ভবিষ্যতে আরও উন্নতির [illegible] আছে।

যাঁহারা নরনারীর প্রকৃতির বিভিন্নতা অস্বীকার

তাঁহাদিগকে কেবল একটী কথা জিজ্ঞাস্য আছে—যাহা সর্ব্বদেশে ঘটিয়াছে তাহা কখন কেবল পুরুষদিগের চেষ্টার ফলে হয় নাই। জ্ঞানে পুরুষের প্রাধান্য প্রত্যক্ষ, কিন্তু নারী-প্রকৃতি ধর্ম্মপ্রবণ হইলেও কোন নারী বুদ্ধ ঈশা বা মহম্মদের স্থান অধিকার করিতে সক্ষম হন নাই। কেবল তাহাই নহে, পৌরহিত্য কর্ম্মও সর্ব্বদেশেই নারীর প্রতি অর্পিত না হইয়া পুরুষেরই হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে। সর্ব্ববিভাগে সর্ব্বোচ্চ স্থান কেবল মাত্র পুরুষগণই লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। নারীর বুদ্ধি তীক্ষ্ণ, চিন্তাশক্তি দ্রুত, কল্পনা প্রাণময়ী, তথাপি নারীর গভীর অভিনিবেশের শক্তি পুরুষদিগের তুলনায় ন্যূন। তবে তাঁহার গভীর অভিনিবেশের পথে বহুল অন্তরায় আছে, একথা সত্য। যাহাদিগকে নিয়তই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য সংসারিক কর্ম্মে এবং শিশুপালনে সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকিতে হয়, তাহাদিগের গভীর অভিনিবেশের অভ্যাস হওয়া কঠিন ব্যাপার। পুরুষের সুযোগ সুবিধা অনেক এবং এই হেতু একের প্রাধান্যও অপরের অক্ষমতা স্বাভাবিক হইয়াছে। নারী-প্রকৃতির আর এক বিশেষত্ব বাৎসল্যভাব। ইহা নারীর অস্থিমজ্জাগত। দয়া, স্নেহ, বাৎসল্য, নিঃস্বার্থতা, পরহিতৈষণা, আতিথেয়তা এ সমুদায়ই নারীর প্রকৃতিসিদ্ধ গুণ। শিক্ষার দ্বারা স্বাভাবিক ভাব সকলের বিকাশের সহায়তা হইতে পারে, কিম্বা শিক্ষার দোষে তাহার বিকৃতি হওয়া সম্ভব। নারীজাতির অনেক দুর্ব্বলতা ও ত্রুটি যে কুশিক্ষার ফল তাহাতে আর সংশয় নাই। ভীরুতা, দুর্ব্বলতা, ক্ষুদ্রতা, প্রশংসাপ্রিয়তা ভূষণপ্রিয়তা, এ সকল নারীর কুশিক্ষার ফল। নারীজাতির শিক্ষার বিষয় আলোচনা করিতে হইলে নারী-প্রকৃতির আলোচনা প্রথম কর্ত্তব্য। কিন্তু নরনারীর প্রকৃতিগত পার্থক্য যাহাই কেন থাকুক না, উচ্চ অঙ্গের জ্ঞান এবং ধর্ম্মশিক্ষায় নরনারী ভেদ থাকে না। নারীর প্রকৃতির পার্থক্য উল্লেখ করিয়া যাঁহারা তাঁহার উন্নত শিক্ষার আবশ্যকতা অস্বীকার করেন, তাঁহারা গুরুতর ভ্রমে পতিত হন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্যের ক্ষুদ্র বিষয়ে যাঁহাদিগকে সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকিতে হয় তাঁহাদিগের চিত্তকে উন্নত অবস্থায় রক্ষা করিতে হইলে উচ্চশিক্ষা ব্যতীত তাহা হওয়া সম্ভব নহে। কেহ কেহ দ্বাদশ বৎসরের মধ্যে বালিকাবিদ্যালয়ের শিক্ষালাভ সমাধা হইতে পারে বলিয়া মনে করেন। আমাদিগের নিকট ইহা একেবারে অসম্ভব ব্যাপার বলিয়া মনে হয়। শিক্ষার আদর্শকে এইরূপ ক্ষুদ্র করিতে আমরা প্রস্তুত নই। নরনারীর প্রকৃতিগত বৈষম্য দৃষ্ট হইলেও যে নারীর শিক্ষার কেহ সীমা নির্দ্দেশ করিয়া দিতে পারেন তাহা আমরা বিশ্বাস করি না। প্রকৃতির প্রতিকূলে মানবীয় ইচ্ছা এবং চেষ্টা কখনই জয়যুক্ত হইতে পারে না। যাহা নারীর জন্য নহে, নারী তাহা করিতে স্বতঃই বিরত হইবেন। জীবন সংগ্রামে দুর্ব্বল বলিয়া নারী কাহারো কৃপা লাভ করিতে সক্ষম হইবে না। দৃষ্টান্ত দ্বারা বিশদ করিয়া বলিতেছি। অনেকে বলিয়া থাকেন ব্যবহারজীবীর ব্যবসায় নারীর পক্ষে সমীচীন নহে। যদি সমীচীন না হয়, আইন করিয়া প্রতিবন্ধকতা করিয়া নারীর পথ অবরোধ করিবার প্রয়োজন কি? জীবন-সংগ্রামে যদি নারী এই ক্ষেত্রে পুরুষদিগের সহিত প্রতিযোগিতায় বিফলকাম হন, সরিয়া পড়িবেন। যে যে কর্ম্মের উপযুক্ত নয়, কেহ তাহাকে সে কর্ম্মে নিযুক্ত করে না। জন ষ্টুয়ার্ট মিল বলিয়াছেনঃ—"One thing we may be certain of that what is contrary to woman's nature to do they never will be made to do simply giving their nature free play." Subjection of women.

"আমরা নিঃসন্দেহে একটী কথা বলিতে পারি, নারী-প্রকৃতিকে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করিলে কিছুতেই তাঁহাকে তাঁহার প্রকৃতির প্রতিকূল-গামিনী করিতে সক্ষম হইবে না।"

নারীর জ্ঞানোন্নতির পথ এতদিন অর্গলিত ছিল, এখন অর্গলমুক্ত হইতেছে বটে কিন্তু তথাপি সকল বিভাগের দ্বার উন্মুক্ত করিতে সকলে ইতস্ততঃ করিতেছেন। কিন্তু এরূপ অন্তরায় উপস্থিত করা কোন প্রকারেই বিজ্ঞের কার্য্য নহে। নারীগণ পুরুষদিগের ন্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দিতে পারিবেন না, একথা যাঁহারা বলিয়াছিলেন, এখন তাঁহারা কি বলিবেন?

নারীগণ, এখন এমন সকল কার্য্য যোগ্যতার সহিত সম্পন্ন করিতেছেন, যাহা এক সময়ে কেবলমাত্র পুরুষেরই সম্ভব ছিল। কিছু দিন পূর্ব্বে যাহা অসম্ভব ছিল বর্ত্তমানে তাহা প্রত্যক্ষ ঘটনা, ভবিষ্যতে কি হইবে তাহা কি কেহ বলিতে পারেন? নারীর শিক্ষার সীমা নির্দ্দেশ করিবার ক্ষমতা কাহার আছে? সমাজ জঘন্যতম পুরুষের হস্তে নারীর সমগ্র জীবনের ভারার্পণ করিতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করে না। কিন্তু নারীকে তাহার নিজের ভার বহন করিতে দিতে সমাজ প্রস্তুত নহে।

বাল্যে পিতৃবশে তিষ্ঠেৎ পাতিগ্রাহস্য যৌবনে,
রক্ষন্তি স্থবিরে পুত্রাঃ ন স্ত্রীস্বাতন্ত্র্যমর্হতি।

নারী বাল্যকালে পিতার বশে থাকিবেন, যৌবনে পতির বশে থাকিবেন, বার্দ্ধক্যে পুত্রগণ তাঁহাকে রক্ষা করিবেন, নারী স্বাধীন থাকিতে পারেন না।

শারীরিক বলই কি কেবল আত্মরক্ষার উপায়? সীতাদেবী কি বলে প্রচণ্ড বলশালী রাক্ষস-পতি রাবণের বল হইতে আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন?

অরক্ষিতা গৃহে রুদ্ধা পুরুষৈরাপ্তকারিভিঃ।
আত্মানমাত্মনা যাস্তু রক্ষেয়ুস্তাঃ সুরক্ষিতাঃ॥

বিশ্বস্ত ও আজ্ঞাবহ ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক গৃহমধ্যে রুদ্ধা থাকিলেও স্ত্রীগণ অরক্ষিতা, যাঁহারা আপনাকে আপনি রক্ষা করেন তাঁহারাই সুরক্ষিতা।

চরিত্রের বলই নারীর বল। আপনাকে জানাই জ্ঞানলাভের শ্রেষ্ঠ ফল।* (ক্রমশঃ)

শ্রীহেমলতা সরকার।

শাপাবসান।

১

সেই শাপ-অবসান—
অদৃষ্টের মহাপাপে
ক্রুদ্ধ দুর্ব্বাসার শাপে,
ইন্দিরা স্বরগ ছাড়ি করিলা প্রস্থান;
ইন্দ্র চড়ি ঐরাবতে,
খুঁজিলা ত্রিদিব পথে,
খুঁজিলা বরুণ অগ্নি গণেশ গীর্ব্বাণ;
স্বর্গ মর্ত্ত্য কোন ঠাঁই,
উজলা কমলা নাই,
সহসা জ্যোতিষ্ক কুল হইল নির্ব্বাণ;
নিভিল চাঁদের হাসি,
স্বর্গ সৌর কর রাশি,
আঁধারে তারকা কুল ঢাকিল বয়ান;
নিখিল হইল শূন্য,
চলি গেল ধর্ম্ম পুণ্য,
অন্ন বস্ত্র ধন ধান্য হ'ল অন্তর্দ্ধান;
দশ দিক অন্ধকার,
প্রাণে প্রাণে হাহাকার,
অমঙ্গল দাঁড়াইল হয়ে মূর্ত্তিমান!

২

সেই শাপ-অবসান—
ইন্দ্র ছাড়ি পুষ্প রথ,
করে নিলা ভাগবত,
তপোরত অগ্নি যম কুবের ধীমান;
ব্রহ্মলোকে পদ্মাসন,
মহা তপে নিমগন,
কৈলাস কৈবল্য ধামে তাপস ঈশান;
বৈকুণ্ঠেতে নারায়ণ,
পাতিলেন যোগাসন,
সপ্ত ঋষি কণ্ঠে সদা সামবেদ গান;
দানবের পুরী ময়,
মহতী তপস্যা হয়,
হিংসা দ্বেষ মলিনতা করিল প্রস্থান;
সবে ডাকে উভরায়
"আয় মা কমলা আয়!
কাঁদে তোর দীন হীন অকৃতি সন্তান;
শিশুরে অকৃতি বলি,
কভু কি মা যায় চলি,
মায়ের হৃদয় কবে এমন পাষাণ?"

---

* মহিলা-সমিতিতে পঠিত।

৩

আজি শাপ অবসান,
সেই তাপসের দল,
তপে সিদ্ধ মহাবল,
মন্থনার্থে অদ্রি নিলা দিয়ে এক টান,
মিশা মিশি সুরাসুর,
বৈর ভাব শত দূর,
মথিল অতল সিন্ধু—মহাশক্তিমান!
সাধনা মঙ্গলময়ী,
সাধক সর্ব্বত্র জয়ী,
তাই ধাতা সিদ্ধিদাতা দিলা বরদান;
স্বর্ণ পদ্ম—শতদলে,
রাখি রাঙা পদতলে,
উঠিলা মা মহালক্ষ্মী জগতের প্রাণ!
আনন্দ উচ্ছ্বাস ছোটে,
অমৃত ফেণায়ে ওঠে,
পুনঃ পেলে অমরতা আকুল সন্তান,
সঘনে উল্লাস রোল,
শঙ্খধ্বনি, হরিবোল,
বিশ্বময় সার্থকতা দিলা ভগবান!

৪

আজি শাপ অবসান—
গেছে সে অশিব কালো,
জ্বলিল মঙ্গল-আলো,
হাসিল শশাঙ্ক, তারা, তপন মহান;
ধন ধান্যে, পুণ্য ধর্ম্মে,
ভক্তি প্রেমে, শুভ কর্ম্মে,
উঠিল নিখিল, লভি সে রাজ সম্মান;
দেব দৈত্য দুই ভাই,
বিবাদ বিষাদ নাই,
দোঁহে যেন এক মা'র যমজ সন্তান,
মায়েরে পূজিলা সবে,
"বন্দে মাতরম্‌" স্তবে,
বৃহস্পতি ভার্গবের শিষ্য মতিমান;
ঘুচিল সকল পাপ,
দূরে গেল মনস্তাপ,
অগ্নিময় ব্রহ্ম শাপ আজি অবসান,
কমলা অচলা পুনঃ বিধাতার দান।

শ্রীবীরকুমার-বধ-রচয়িত্রী।

দয়াময়ী বৌদ্ধ মহিলা।

বৌদ্ধ গ্রন্থাদিতে উচ্চশিক্ষিতা, ধর্ম্ম ও সেবাপরায়ণা বহু মহিলার ইতিবৃত্ত দেখিতে পাওয়া যায়। তৎসঙ্গে তাঁহাদের নানা অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ডেরও উল্লেখ রহিয়াছে। অনাথপিণ্ডদের কন্যা সুপ্রিয়া সম্বন্ধে এরূপ কথিত আছে, যে কন্যাটী ভূমিষ্ঠ হইবার অব্যবহিত পরেই জননীর মুখের দিকে চাহিয়া একটী বৌদ্ধ গাথা উচ্চারণ করিতে লাগিল। গাথাটীর অর্থ এই:—"বৌদ্ধদিগকে প্রচুর ধন ও খাদ্যাদি দানে আপ্যায়িত কর, যেখানে যেখানে পবিত্র বৌদ্ধ স্থান আছে তথায় চম্পক পুষ্প সমূহ ছড়াইয়া দেও।" এই সদ্যোজাতা কন্যাটীর কথা অনুসারে তাহার পিতা তাহাই করিলেন। কয়েক বৎসর পরে কোন এক বৌদ্ধ পরিব্রাজক তাঁহার বাটীতে ভিক্ষা করিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহার ধর্ম্মোপদেশ-বীজ বালিকা সুপ্রিয়ার উর্ব্বরা চিত্তভূমিতে উপ্ত হইবা মাত্র অঙ্কুরিত হইয়া মহা জ্ঞানবৃক্ষে পরিণত হইয়াছিল। অদ্ভুদ শক্তি প্রভাবে সে পূর্ব্বজন্ম-বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া বলিতে পারিত। সপ্তমবর্ষ বয়সে সুপ্রিয়া বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনী হইবার জন্য পিতামাতার অনুমতি প্রার্থনা করেন। গৌতমী সুপ্রিয়াকে বৌদ্ধ ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। দীক্ষিত হইবামাত্র তিনি তত্ত্বজ্ঞানবতী বলিয়া যেরূপ প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন, মহামারী-রোগাক্রান্ত, দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট, আতুরদিগের সেবা ও শুশ্রূষা করিবার জন্যও সকলের তেমনি সবিশেষ ধন্যবাদভাজন হইয়াছিলেন। একদা দেশ মধ্যে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে সুপ্রিয়া দুর্ভিক্ষক্লিষ্টদিগের সাহায্যের জন্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়াছিলেন। ইহার তিন মাস পরে বুদ্ধদেব একদা শ্রাবস্তী নগরী হইতে রাজগৃহে আসিতেছিলেন। পথিমধ্যে তিনি অতি

নিবিড় অরণ্যানীর মধ্যস্থলে আসিয়া পড়েন। সেখানে কোনরূপ খাদ্যদ্রব্য পাওয়া অসম্ভব ছিল। সুপ্রিয়া কোনরূপে জানিতে পারিলেন, যে ভগবান বুদ্ধদেবের শিষ্যবর্গ বন মধ্যে খাদ্যাভাবে পতিত হইয়াছেন। তখন সুপ্রিয়া স্বীয় ভিক্ষাপাত্র বাহির করিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন ঃ—"যদি আমার পূর্ব্ব জন্মের কোন সুকৃতি থাকে তাহা হইলে মুহূর্ত্ত মধ্যে যেন আমার ভিক্ষাপাত্র পীযুষরসে পরিপূর্ণ হয়।" বনদেবতা তাঁহার এই প্রার্থনা শুনিবামাত্র তাঁহার ভিক্ষাপাত্র অমৃতরসে পূর্ণ করিয়া দিয়াছিলেন। সুপ্রিয়া বুদ্ধদেব ও তাঁহার শিষ্যবর্গকে অমৃত পান করাইয়া তাঁহাদিগের মহাতৃপ্তি সাধন করিলেন। জ্ঞান বৈরাগ্য বলে ইনি অর্হতত্ত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

বৌদ্ধ যুগে উৎপলাবতী নগরীতে রুক্মাবতী নাম্নী একজন সম্পত্তিশালিনী দয়াবতী ও জ্ঞানবতী বৌদ্ধ মহিলা বাস করিতেন। তিনি যে পল্লীতে বাস করিতেন সেই পল্লীর প্রতিবেশী ও প্রতিবেশিনীদিগের মধ্যে কেহ যদি কখন অন্নবস্ত্রাভাবজনিত ক্লেশ ভোগ করিত, আর যদি সেই ক্লেশভোগবার্ত্তা দয়াবতী রুক্মাবতীর কর্ণগোচর হইত তাহা হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতীকার করিতেন। পল্লীতে কেহ কষ্টে পতিত হইয়াছে কি না তিনি সর্ব্বদাই গোপনে সে বিষয়ে অনুসন্ধান লইয়া ক্লিষ্ট ব্যক্তির ক্লেশবিমোচনে যত্নবতী হইতেন। একদা এই মূর্ত্তিমতী দয়া রুক্মাবতী রাজপথে বিচরণ করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন, একটী দুর্ভিক্ষক্লিষ্টা, কঙ্কাল-সারা, ক্ষুধার্ত্তা নারী খাদ্যাভাবে অনন্যোপায় হইয়া তাহার সদ্যোজাত শিশুর জীবদ্দেহ ভক্ষণ করিবার উদ্যোগ করিতেছে। সে সময়ে সে দেশে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। ক্ষুধানল-প্রজ্বলিতোদর নরনারীর আর্ত্তনাদে নগরী যেন শ্মশানভূমিতে পরিণত হইয়াছিল। চতুর্দ্দিক ক্ষুন্নিবৃত্তি সম্পাদনার্থে যেন লোলজিহ্বা বিস্তার করিতেছিল। নগর ও উপনগরস্থ তরুলতা, পত্রপুষ্প ও ক্ষেত্রস্থিত তৃণাঙ্কুর পর্য্যন্ত দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত নরনারীর জঠরানলের তৃপ্তিসাধনে সমূলে ধ্বংশ হইয়াছিল। অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত নরনারীগণ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হওয়াতে সমগ্র দেশটী যেন একটা বিরাট শ্মশানের আকার ধারণ করিয়াছিল। দয়াবতী রুক্মাবতী যখন দেখিতে পাইলেন, যে সদ্যপ্রসবা নারী ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হইয়া নবজাত শিশুর দেহ ভক্ষণ করিবার উদ্যোগ করিতেছে তখন তিনি কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, মানবীয় চিত্তবৃত্তির কলুষতা কি প্রকারে এরূপ ভয়ঙ্কর পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছে! জগতের স্বাভাবিক রীতিনীতি কি ভয়ানক রূপে সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়াছে! মাতা নিজ দেহ পোষণার্থ জীবিত পুত্রের দেহমাংস উদরসাৎ করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি সম্পাদন করিতে দ্বিধা বোধ করিতেছে না!—এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে রুক্মাবতী সেই ক্ষুধাতুরা নারীর সম্মুখে অগ্রসর হইয়া বলিতে লাগিলেন ;—"ক্ষুধার্ত্তে ক্ষান্ত হও।" তখন সেই ক্ষুৎপ্রপীড়িতা নারী বলিল, "তবে কি খাব? দেশে সচ্ছন্দ বনজাত শাকপাতাঘাসাদি পর্য্যন্ত লোকের উদরসাৎ হইয়া গিয়াছে, এখন কি খাই?" রুক্মাবতী বলিলেন, "ক্ষান্ত হও, আমি গৃহ হইতে খাদ্যসামগ্রী আনয়ন করিয়া তোমায় দিতেছি, তুমি তোমার এই সদ্যোজাত শিশুর দেহ ভক্ষণ করিও না, ক্ষান্ত হও।" এইরূপ আশ্বাস প্রদান করিয়া বুদ্ধিমতী রুক্মাবতী কিয়ৎক্ষণের জন্য ঐ নরপিশাচীকে নিবৃত্ত করিলেন, সেও কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইল। কিন্তু পরক্ষণেই রুক্মা ভাবিলেন, যদি আমি খাদ্য আনয়ন করিতে গৃহে যাই তাহা হইলে সেই অবকাশে ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হইয়া যদি এই নারী শিশুটীকে গ্রাস করিয়া ফেলে তাহা হইলে তো শিশুর প্রাণরক্ষা করা হইল না। আর শিশুটীর প্রাণ রক্ষার্থ যদি আমি মাতৃক্রোড় হইতে বলপূর্ব্বক শিশুটীকে লইয়া যাই তাহা হইলে শোকে তাপে ও জঠরানল-জ্বালায় অস্থির হইয়া প্রসূতিও ইহলীলা সম্বরণ করিবে। সুতরাং এ স্থান পরিত্যাগ করিয়া যাই কিরূপে? এই প্রকার ন যযৌ ন তস্থৌ এ অবস্থায় রুক্মাবতী মহা সঙ্কটেই পড়িলেন। কিন্তু অবিলম্বে তিনি কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া ফেলিলেন। অটল স্থৈর্য্য ও ধৈর্য্য সহকারে একখানি শাণিত সুতীক্ষ্ণ ছুরিকা দ্বারা

কাশী।
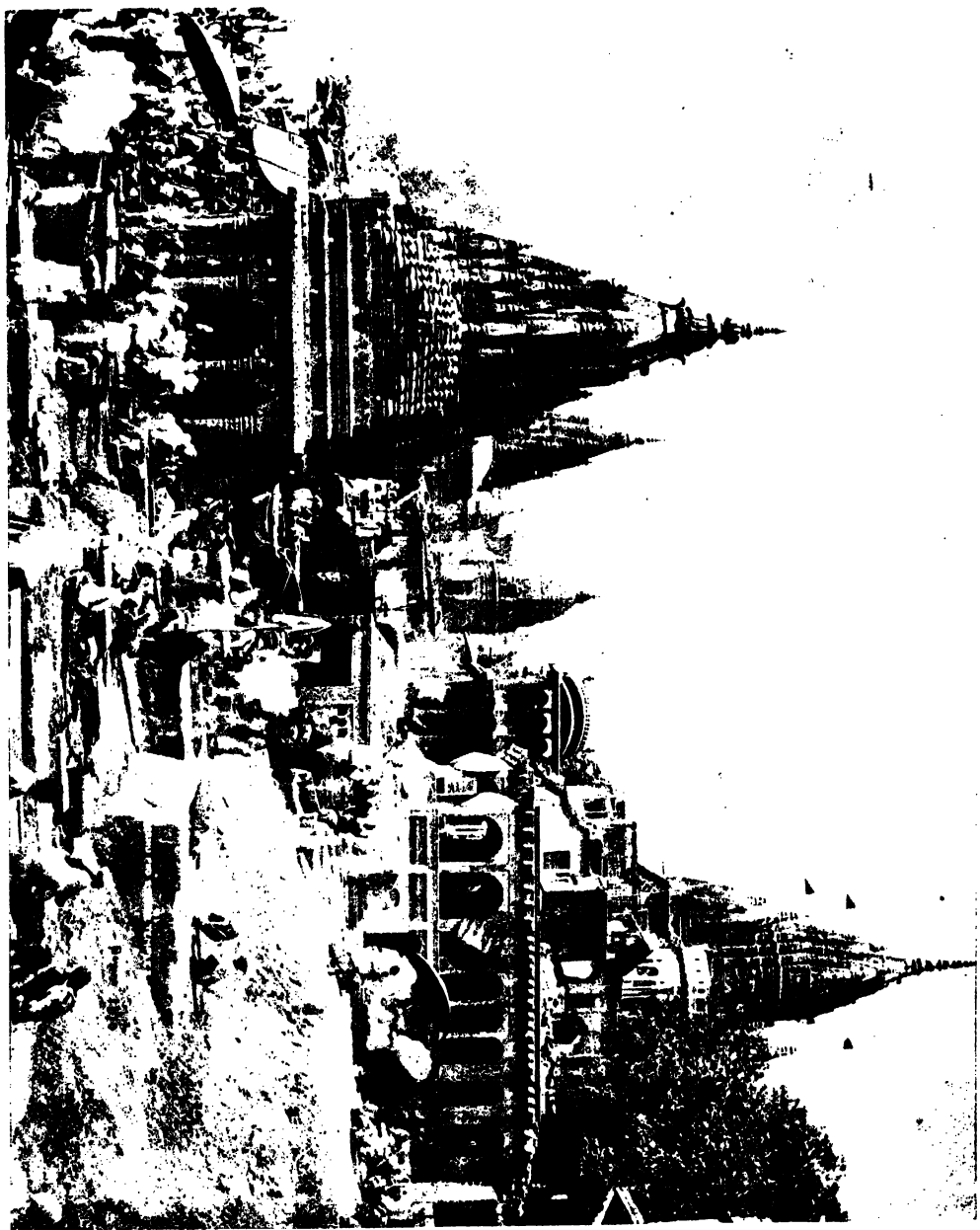
স্বীয় মাংসল স্তনদ্বয় কর্ত্তন করিয়া সন্তান-রুধির-লোলুপা দুর্ভিক্ষক্লিষ্টা ক্ষুৎপীড়িতা নারীকে প্রদান করিলেন। বিকট ভৈরব ভাবে ক্ষুধার্ত্তা হস্ত প্রসারণ করিয়া ঐ স্তন্য মাংসপিণ্ড গ্রহণ করিয়া ভক্ষণ করিতে লাগিল। এই সুযোগে মহীয়সী রুক্মাবতী শিশুটীকে লইয়া পলায়ন করিলেন। তাঁহার বক্ষঃস্থল হইতে প্রবাহিত রুধিরধারা উৎপলাবতী নগরীর রাজমার্গ রঞ্জিত করিয়া ফেলিল।

ভগবান বুদ্ধদেব পরোপকার ও আত্মোৎসর্গের মহা-মন্ত্রে তাঁহার শিষ্যমণ্ডলীকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন। তাঁহার নারী শিষ্যগণও তাঁহার শিক্ষা ও দৃষ্টান্তের প্রভাবে অতি উন্নত অবস্থা লাভ করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ যুগে ভারতের নারীজাতি আত্মশক্তি বিকাশের মহা সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ভগবান বুদ্ধ নারীজাতির পরমো-পকারী বন্ধু ছিলেন। দুঃখের বিষয় বৌদ্ধ যুগের ইতিহাস এ দেশে এখনও আশানুরূপ আলোচিত হইতেছে না।

শ্রীহরিদেব শাস্ত্রী।

বারাণসী দর্শনে।

বিরাজে পবিত্রতীর্থ বারাণসী ধাম
বিশ্বনাথ অন্নপূর্ণা অধিষ্ঠিত যেথা
পূর্ণব্রহ্ম অদ্যাশক্তি মূর্ত্তিগ্রহ করি।
অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি গঙ্গা শোভে নিরবধি
হরমৌলি ইন্দু সম, পুণ্যতোয়া ভবে।
পুরী প্রবেশিতে অনিমিষে দেখে নর
অগণিত দেবালয়চূড়া অভ্রভেদী,
পাষাণে নির্ম্মিত হর্ম্ম্য দ্বিতল ত্রিতল,
ভিত্তি-গাত্রে চিত্ররাজি উজ্জ্বল বরণ।
পাষাণ-সোপানশ্রেণী ভাগীরথী তটে,
শিলাপট্ট আবরিত আঁকা বাঁকা গলি,
সকলই বিচিত্র হেথা। জাহ্নবীর বারি
সুস্নিগ্ধ নির্ম্মল; স্নানেতে জুড়ায় দেহ,
আত্মার কলুষ কাটে, ভরে মনঃ প্রাণ
শান্তির বিমল রসে। প্রভাতে সন্ধ্যায়
তীরে বসি পূজে ভক্ত নিজ ইষ্টদেবে;
বসি সাধু দণ্ডী কাছে শুনে ধর্ম্মকথা
কেহ শুদ্ধ চিতে। বিরাজিত শান্তিসদা
এ পবিত্র ধামে, ভুলে নর শোক তাপ;
আত্মার পিপাসা মিটে শান্তি-সুধা পানে।

যুগে যুগে যোগী ঋষি সাধু ভক্তগণ
পবিত্র করেছে পুরী-চরণ পরশে;
পুণ্য রজঃ স্পর্শে প্রতি ধূলিকণা
পূরিত অধ্যাত্ম বলে; তাই বুঝি প্রাণ
শান্তিরসে অভিষিক্ত, বৈরাগ্যমণ্ডিত
হয় প্রতিক্ষণে; ছেড়ে যেতে আঁখি ভরে
অশ্রুনীরে, শূন্য ঠেকে হৃদয়পঞ্জর—
বুঝি না অজ্ঞান মোরা কেন হেন ভাব?

কত যুগ কত কল্প ধরি আছে পুরী।
ধর্ম্মবিধি কত প্রকাশিল একে একে;
সৌর গাণপত্য শৈব শাক্ত বিষ্ণুসেবী;
পঞ্চ উপাসক দল মিলিত হেথায়;
শিবের মহিমা প্রকটিত কত স্থলে,
জ্ঞানবাপী আদি করি পুণ্যবারি কোথা
সর্ব্বতীর্থময় কাশী—ধর্ম্ম রাজধানী!

ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন বুদ্ধদেব কৃত
—বিরাট্ ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম নিষ্প্রভ যেথায়—
সারনাথ অদূরে বিরাজে; স্তূপমাত্র
অবশেষ; পাষাণ-বিগ্রহ মহাদেব
সারনাথেশ্বর প্রতিষ্ঠিত তার পাশে;
ধর্ম্মসমন্বয় কিবা ভারত ভিতরে!
ইস্‌লাম মজিদ হোথা উচ্চ চূড়া তুলি,
বিরাজে তাহার পাশে শ্রীবিন্দুমাধব;
আদি বিশ্বেশ্বর স্থান হয়েছে মজিদ;
খৃষ্টান ভজনালয়, শিবের মন্দির
রহে পাশাপাশি, কি উদার ধর্ম্মভাব।
বহু ধর্ম্ম বহু যুগে উদিত ভারতে
সংঘর্ষণ সমন্বয় বারাণসী ধামে!!

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্যারীসুন্দরী।

বাংলা দেশের ইতিহাসে নীলকরের অত্যাচারের ন্যায় লোমহর্ষণ কাহিনী বোধ হয় আর নাই। স্বর্গীয় দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়ের "নীলদর্পণে" সেই অত্যাচারের কতক আভাস পাওয়া যায়। পাবনা, নদীয়া প্রভৃতি অঞ্চলে যখন নীলকরের পূর্ণ প্রতাপ সেই সময়ে নদীয়া জেলার বর্ত্তমান কুষ্টিয়া মহকুমার অন্তর্গত আমলা-সদরপুরের বিখ্যাত জমিদারী প্যারীসুন্দরী নাম্নী এক জন তেজস্বিনী মহিলার শাসনাধীন ছিল। কুষ্টিয়ায় তখন মহকুমা হয় নাই। পূর্ব্ববঙ্গ রেলওয়ে তখনও নির্ম্মিত হয় নাই। বর্ত্তমান কুষ্টিয়া ষ্টেসনের অনতিদূরে কেনী নামক একজন দুর্দ্দান্ত ইংরাজ নীলকুঠী নির্ম্মাণ পূর্ব্বক দরিদ্র প্রজার উপর নিদারুণ দৌরাত্ম্য করিয়া নীল আবাদ করাইত। কুষ্টিয়া অঞ্চলে কেনী সাহেবের সহিত তেজস্বিনী প্যারীসুন্দরীর সংঘর্ষণ-কাহিনী সুবিদিত। পৌরাণিক কাহিনীর ন্যায় এই কাহিনী ঐ অঞ্চলের অধিবাসীগণের মধ্যে বংশপরম্পরাক্রমে কীর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে। আমরা "বিষাদ-সিন্ধু"-প্রণেতা সুবিখ্যাত মুশলমান লেখক শ্রীযুক্ত মীর মশাররফ হোসেন সাহেবের "মনের কথা" হইতে এই তেজস্বিনী বঙ্গমহিলার অপূর্ব্ব কাহিনী সংকলিত করিয়া প্রকাশ করিলাম। বলা বাহুল্য, নিম্নোক্ত কাহিনী কল্পিত গল্প নহে। সদরপুর-নিবাসী আমাদের জনৈক শ্রদ্ধেয় বন্ধুর নিকট হইতেও আমরা এই ঘটনার ... বিবরণই পাইয়াছি। শ্রীযুক্ত মীর সাহেব অনুগ্রহ করিয়া তাহার "মনের কথা" আমাদিগকে পাঠাইয়া দিয়া এবং তাহা হইতে প্যারীসুন্দরীর কাহিনী ভারত-মহিলায় প্রকাশ করিতে অনুমতি দিয়া আমাদিগকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। ভাঃ মঃ সঃ।

১

সদরপুরের জমিদার প্যারীসুন্দরী। প্রধান কার্য্যকারক রামলোচন। সে সময়ের চলতি বাঙ্গালা ভাষায় রামলোচন খুব পাকা; জমিদারী ফন্দিফেরেবেও দেশ-বিখ্যাত। সকলেই জানে, রামলোচন একজন বিখ্যাত মামলাবাজ।

কেনীর অত্যাচারে ছোট ছোট তালুকদার; মহাজন প্রভৃতি নাজেহাল হইয়া পৈত্রিক গ্রাম, বাড়ী ঘর ছাড়িয়া, নানা স্থানে, নানা লোকের আশ্রয় লইতেছে, জাতি, ধন, মান, প্রাণ কোন প্রকারে বাঁচাইতেছে। কেনী এ পর্য্যন্ত সদরপুরের কোন প্রজার গায়ে হাত দেয় নাই, কোনরূপ অত্যাচার করে নাই, ইহাতেই রামলোচন নির্ভাবনায় জমিদারী চালাইতেছেন। প্যারীসুন্দরীও ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া নির্ভাবনায় আছেন।

একদিন প্রায় একশত প্রজা কাঁদিতে কাঁদিতে সদরপুর উপস্থিত হইয়া তাহাদের একমাত্র বল ভরসা, আশ্রয়দাত্রী ও রক্ষাকর্ত্রী যাহাকে জানিত তাঁহার নিকট বলিতে লাগিল:—"মা রক্ষা কর। এত দিন বাঁচাইয়াছ, এখন বাঁচাও। দুরন্ত বাঘের মুখ হইতে তোমার গরীব প্রজার প্রাণ বাঁচাও। আগামী কল্য আমাদের বুনানী ধান ভাঙ্গিয়া সাহেব নীল বুনানী করিবে, বহুতর লাঠিয়াল সংগ্রহ করিয়াছে। মা! আমাদিগকে রক্ষা কর। দুরন্ত জালেমের হস্ত হইতে তোমার গরীব প্রজাদিগকে রক্ষা কর। এতদিন ছিলাম ভাল, এখন মারা পড়িলাম। আর বাঁচিবার পথ নাই। সম্বৎসর আশা করিয়া চাষ করিয়াছি, পেটে না খাইয়া ঘরের ধান মাঠে ফেলিয়াছি, স্ত্রী, পুত্র লইয়া খাইয়া প্রাণ বাঁচাইব, আপনার রাজস্ব আদায় করিব, আশাতেই সাধ্যের অতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়া ঐ ধান খেতের দিকে চাহিয়া একটু স্থির রহিয়াছি। মা! আমাদের সেই বোনা ধান ভাঙ্গিয়া সাহেব যদি নীল বুনানী করে, তবে আমরা একেবারে মারা পড়িব, ছেলে মেয়ে সহিত মারা পড়িব। মা! তুমি মুখ তুলিয়া না চাহিলে, আমাদের মুখের প্রতি একবার নজর করে এমন লোক জগতে আর কেহই নাই। মা! তুমিই আমাদের রক্ষাকর্ত্তা। মা! তোমার এই অধম সন্তানদিগকে রক্ষা কর। দুরন্ত জালেমের হাত হইতে বাঁচাও।"

প্রজাদিগের কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া সকলেই ব্যথিত হইলেন। প্যারী সুন্দরী রামলোচনকে ডাকিয়া বলিলেন:—"আমার প্রজার প্রতি অত্যাচার? যাহা শুনিতে বাকী ছিল, আমি বাঁচিয়া থাকিতে ভাগ্যক্রমে তাহাই শুনিতে হইল? আমি থাকিতে আমার প্রজার প্রতি নীলকর ইংরেজ দৌরাত্ম্য করিবে? আমি বাঁচিয়া থাকিতে আমার প্রজার বুনানী ধান ভাঙ্গিয়া, কেনী নীল বুনিবে, ইহা আমার প্রাণে কখনই সহ্য হইবে না। প্রজাদিগের দুরবস্থা আমি এই নারী-চক্ষে কখনই দেখিতে পারিব না। যে উপায়ে হউক, প্রজা রক্ষা করিতেই হইবে। লোক, জন, টাকা, সর্দ্দার, লাঠিয়াল

যাহাতে হয়, তাহার দ্বারা প্রজার ধন, মান, প্রাণ, জালেমের হস্ত হইতে বাঁচাইতে হইবে। ধান ভাঙ্গিয়া যাহাতে নীল বুনানী করিতে না পারে, তাহার বিশেষ উপায় করিতে হইবে। আপন প্রজাকেই যদি দুরন্ত নর-ব্যাঘ্র হইতে রক্ষা করিতে না পারিলাম—তবে এ বিষয় বিভব, টাকা এবং জমিদারীতে প্রয়োজন কি? এখনই এসকল প্রজার সাহায্যার্থ লোক পাঠাও। যদি যথার্থই সাহেবের পক্ষীয় লোকেরা এই সকল প্রজার ধান ভাঙ্গিয়া নীল বুনানী করিতে আইসে, দ্বিতীয় আদেশের অপেক্ষা নাই—যে প্রকারে হয়, তাহাদিগকে তাড়াইয়া—শাস্তি দিয়া তাড়াইয়া, প্রজা রক্ষা করিবে। ধান ভাঙ্গিয়া নীল বুনানী করিলে কি আর প্রজা বাঁচিবে? কি লজ্জার কথা! কি ঘৃণার কথা? কোথায় বিলাত, আর কোথায় এ দেশ! একটী মাত্র ইংরেজ (কেনী) আসিয়া এ দেশ উচ্ছিন্ন করিল! একেবারে ছার খার করিয়া ফেলিল! কৃষি-প্রজার জমা জমি কাড়িয়া লইয়া নীল বুনানী করিল। কত তালুকদারের তালুক, কত জোতদারের জোত জবরাণে লিখিয়া লইল। কাহারও যথাসর্ব্বস্ব লুটিয়া একেবারে পথের কাঙ্গাল করিয়া ছাড়িয়া দিল! হায় হায়!! কি দুঃখ! যাঁহারা চিরকাল দুধে ভাতে, সুখে সচ্ছন্দে, আপন আপন পরিবার লইয়া সংসার-ধর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়াছে, কত অতিথি সেবায়, দেবতা পূজায়, দীন দুঃখীর সাহায্য করিয়া কত লোকের উপকার করিয়াছে, কত অনাহারীর আহার দিয়া জীবন রক্ষা করিয়াছে, এক্ষণে তাহারাই একটী পয়সার জন্য লালায়িত। তাহাদেরই পেটে অন্ন নাই, গায়ে বস্ত্র নাই, থাকিবার স্থান নাই! হায়! হায়! তাহাদের মা, ভগ্নী, স্ত্রী, মাসী পিসীর উদরের দিকে চাহিলে কাহার না চক্ষু জলে পূরিয়া যায়? সে জীর্ণ শীর্ণ শরীরে শত গ্রন্থিযুক্ত পরিধেয়ের প্রতি দৃষ্টি পড়িলে কাহার না অন্তরে ব্যথা লাগে? সে দুঃখ কি আর মানুষে চক্ষে দেখিতে পারে? ঐ কেনীর দৌরাত্ম্য সহ্য করিতে না পারিয়া কত ভদ্র-সন্তান, কত নিরীহ লোক, পৈত্রিক বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া, কোথায় কোন্ দেশে চলিয়া গিয়া জাতি, কুল, মান রক্ষা করিতেছে। যাহারা পৈত্রিক ভিটার মায়া মমতা একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারে নাই, তাহারা যথাসর্ব্বস্ব দিয়াও রক্ষা পায় নাই। নীল কাটা, হউজ মাই, নৌকার গুণ টানান, এই সকল কার্য্যে তাহাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়া যাইতেছে। ইহার পর আবার সময় সময় হাত পা বান্ধিয়া গাছে লটকাইয়া চাবুকে পীঠের খাল তুলিতেছে! উহু! কি ভয়ানক নর-ব্যাঘ্র! কি করিব, এদেশে আর কাহারও কিছু রাখিবে না। ও বিলাতী কুকুর, এ দেশের সকল-কেই দংশন করিবে। সে বিষে সকলকেই জর্জ্জরীভূত হইতে হইবে। প্রথমেই ঐ ম্লেচ্ছের বিষ দাঁত ভাঙ্গিয়া না দিলে, শেষে আমার জমিদারী পর্য্যন্ত গ্রাস করিয়া ভস্মীভূত করিবে। আমাকে যে কিরূপ বিপদগ্রস্ত হইতে হইবে, তাহা ঈশ্বরই জানেন। শেষে কি সদরপুরের ঘরের নাম ডুবিবে? হায়! হায়! শেষে কি কেনীর হস্তে সদরপুরের ঘর মাটি হইবে?"

রামলোচন বলিলেন,—"কেনীর সাধ্য কি যে আমাদের প্রজার উপর অত্যাচার করে। যে উপায়ে হয় আমি তাহাকে দুরন্ত করিব। কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তালুকদারের বিষয়সম্পত্তি বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইয়া তাঁহার মেজাজে গরমী চড়িয়াছে। আপনার আশীর্ব্বাদ থাকিলে যে উপায়ে হয়, তাহাকে এমন শিক্ষা দিয়া দিব যে, আর কখনও সদরপুরের নাম স্বপ্নেও মুখে না আনে, ভুলেও মনে না করে। আর বাঙ্গালী হইলেই যে শেয়াল কুকুর হয় তাহাও না ভাবে।" এই বলিয়া রামলোচন বিদায় হইয়া আপন কর্ত্তব্য কার্য্যে চলিয়া গেলেন।

রাত্রি এক প্রহর পর্য্যন্ত রামলোচন লাঠিয়াল যোগাড় করিয়া প্রজাগণের সাহায্যে নিযুক্ত করিলেন। এবং একজন সাহসী কর্ম্মচারীকে তাহাদের অধিনায়ক করিয়া প্রজাগণকে সঙ্গে দিয়া তখনই সদরপুর হইতে ঘটনা-স্থানে পাঠাইয়া দিলেন। বলিয়া দিলেন, রাত্রি প্রভাত না হইতে হইতে ভারলের কাছারী পঁহুছিবে, এবং তথা হইতে যত লোক পাও সঙ্গে লইয়া সেই ধানের জমিতে যাইয়া থাকিবে। প্রাণ থাকিতে সাহেবের লাঠিয়ালদিগকে আমার এলাকায় পা দিতে দিবে না।

যেখানে যাহাকে পাও মারিবে, ধরিয়া আনিতে পারিলে ত কথাই নাই। একে একে সকলেই রামলোচনের আশীর্ব্বাদ লইয়া সদরপুর হইতে বিদায় লইল।

২

বাঙ্গালী যুদ্ধে ডাক-ভাঙ্গা (সকলে উচ্চৈঃস্বরে ভীষণ রব করা) এক প্রকার উৎসাহ-সূচক বাজনা এবং দূতের কার্য্য করে। ডাকের উত্তর প্রত্যুত্তরেই ক্ষমতা, বল, লোকসংখ্যা সকলই বোঝা যায়। অনেক সময় এরূপ ঘটিয়া থাকে যে, কেবল ডাক-ভাঙ্গার উত্তর প্রত্যুত্তরেই নিস্তেজ পক্ষ হটিয়া যায়। আর অগ্রসর হয় না। রাত্রি প্রভাত হওয়ার পূর্ব্বেই, প্যারীসুন্দরীর সর্দ্দারগণ মার্ মার্ শব্দে নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া পড়িল। আসিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে একেবারে ভগ্নহৃদয় ও নিরুৎসাহ হইয়া পড়িল। কারণ সাহেবের লাঠিয়ালগণ বিরোধীয় ভূমিতে পূর্ব্বেই আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। কেবল প্রভাতের প্রতীক্ষায় ছিল মাত্র। উভয় পক্ষের মশালের আলো দেখিয়া, উভয় পক্ষ ডাক ভাঙ্গিয়া, উত্তর প্রত্যুত্তরেই বুঝ সমুজ হইয়া গেল। উভয় পক্ষই জানিল, যে কোন পক্ষই কম নহে। প্যারীসুন্দরীর লাঠিয়ালেরা স্থির করিল যে, রাত্রে লাঠালাঠি, মারামারী করা বুদ্ধির কার্য্য নহে। কে কোথা হইতে কাহাকে মারিবে, কে মরিবে, কে বাঁচিবে, কে রক্ষা করিবে, কে দেখিবে, একটু অপেক্ষা করিয়া পূর্ব্বদিক ফর্সার সহিত আমরাও ওদিকে ফরসা করিয়া দিব।

মায়াময়ী নিশা পরস্পর বিবাদ বাধাইয়া দিবার জন্যই বোধ হয় শীঘ্র শীঘ্র প্রস্থান করিলেন। দুই দলে স্পষ্ট দেখা শুনা হইল। ছেড় ছাড় মিষ্টি মিষ্টি গালি গালাজ চলিল। প্যারীসুন্দরীর লাঠিয়ালেরা সজোরে ডাক ভাঙ্গিয়া ক্রমশঃই অগ্রসর হইতে লাগিল। ইহারা মনে করিয়াছিল যে, যে জমির ধান ভাঙ্গিয়া সাহেব নীল বুনানী করিবে, সে জমি পশ্চাতে ফেলিয়া নির্দ্দিষ্ট সীমায় দাঁড়াইয়া বুনানী ধান রক্ষা করিবে। সাহেবের লাঠিয়ালদিগকে আর সে জমির দিকে আসিতেই দিবে না। সে আশা বিফল হইল। কারণ সাহেবের লাঠিয়ালেরা পূর্ব্বেই ধান ক্ষেত পেছনে করিয়া আপন আপন আয়ত্ত ও সুবিধা মত আনি বান্ধিয়া দাঁড়াইয়াছিল। দেখিতে দেখিতে প্রভাত বায়ু বহিয়া পূর্ব্বদিক্ পরিষ্কার করিয়া দিল। মশালের আলো মলিন হইয়া, মুখে ছাই মাখিয়া নিবিয়া গেল। পুনরায় উভয় দলের কথা চলিল। ক্রমে গালাগালি, শেষে লাঠালাঠির উপক্রম। ওদিকে কেনীর পক্ষ হইতে শতাধিক লোক লাঙ্গল গরু জুড়িয়া ধান ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিল।

প্যারীসুন্দরীর কার্য্যকারক, যিনি হুকুম-দেহেন্দা হইয়া আসিয়াছিলেন, ঘোড়া টপকাইয়া এদিক ওদিক দেখিতে দেখিতে দৈবাৎ সাহেবের সর্দ্দারদিগের পিছনে বহুতর গরু ও লাঙ্গল দেখিয়া বলিতে লাগিলেন ঃ—"ভাই সকল! আর দাঁড়াইয়া কি কর? ওদিকে দফা রফা! ঐ দেখ ধান ভাঙ্গিয়া নীল বুনিতেছে। আমরা যাহা ভাবিয়াছিলাম তাহা হইল না। সর্ব্বনাশ হইল!! সদরপুর গিয়া কি জবাব দিব?"

প্যারীসুন্দরীর লাঠিয়ালেরা বিকট চীৎকার করিয়া কেনীর লাঠিয়ালের প্রতি আক্রমণ করিল। বিপক্ষ দলও বিশেষ শিক্ষিত, কিছুতেই হেলিল না। আনি ভাঙ্গিল না, এক পা-ও নড়িল না। লাঠি, উড়-শড়কী অবিরত চলিতে লাগিল। কেনীর লাঠিয়ালেরা কেবল আত্মরক্ষা করিতেছে, এক পদও অগ্রসর হইতেছে না। কার্য্যসিদ্ধি (ধান ভাঙ্গিয়া নীলবুনানী) না হওয়া পর্য্যন্ত আক্রমণের নামও মুখে আনিবে না, ইহাই তাহাদের স্থির সংকল্প।

এদিকে সূর্য্যদেবের আগমনের সহিত, টি, আই, কেনী বৃহদাকার শ্বেতবর্ণ অশ্বে আরোহণ করিয়া ত্বরিত বেগে আপন লাঠিয়ালদিগের পৃষ্ঠপোষক হইলেন। দেখিতে দেখিতে ধান ভাঙ্গিয়া নীল বুনানী শেষ হইয়া গেল। সাহেব গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "আর দেখ কি? লাগাও।"

স্বয়ং মনিবের হুকুম। পাঁচ শত লাঠিয়াল একত্রে সেই বিকট চীৎকারের মাঝে ঋ ঋ শব্দ করিয়া মনিবের সাহস ও উৎসাহ বাক্যে ক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিল। কেনী লাঠিয়ালদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। প্যারীসুন্দরীর লাঠিয়ালেরা সাহেবকে স্পষ্টভাবে

দেখিতেছে। অশ্ব উচ্চ, কেনীর শরীর উচ্চ, সকলের মাথার উপর মাথা—সে মাথার উপরে আরো উচ্চ টুপী। সকলেই দেখিতেছে যে, আজ কেনী স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে রহিয়াছে। প্যারীসুন্দরীর লাঠিয়ালগণের মধ্যে সড়কী-ওয়ালা সর্দ্দার অনেক ছিল। একজন সড়কী-ওয়ালা সর্দ্দার, টি, আই, কেনীর মস্তক লক্ষ্য করিয়া উড়-সড়কী এমন কৌশলে নিক্ষেপ করিল যে, সাহেবের টুপী সড়কির আঘাতে মাটীতে পড়িয়া গেল। মাথায় আঘাত লাগিল না। সাহেব অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া দুই তিন জন প্রধান প্রধান লাঠিয়ালের পৃষ্ঠে চাবুক সই করিয়া বলিতে লাগিলেন:—"ড্যাম. শূয়ার, কেবল ডাক ভাঙ্গিতে জান? পায়তারা করিতে জান; লাঠী ভাঁজিতে জান, মারিতে জান না? লাগাও—তাড়াও—মার শূয়ার লোক্‌কো"—

লাঠিয়ালেরা হুকুমের জোরে, চাবুকের জ্বালায়, বিপক্ষ দলের প্রতি সজোরে লাঠি সড়কী মারিতে আরম্ভ করিল, এবং ক্রমশঃই অগ্রসর হইতে লাগিল। প্যারী-সুন্দরীর লাঠিয়ালেরা আহত হইতেছে, কিন্তু পৃষ্ঠ দেখাইতেছে না, দৌড়িয়া পলায়ন করিতেছে না। ক্রমে পিছে হটিয়া আত্মরক্ষা করিতে করিতে যাইতেছে। দুই তিনটী লোক পিছে হটিয়া যাইতে যাইতে দৈবাৎ উচু নীচু স্থানে যেই পড়িয়াছে, অমনি সাহেবের লাঠিয়াল সড়কী দ্বারা আঘাত করিয়া তাহাদিগকে বিন্ধিয়া ফেলিল, আর উঠিতে দিল না। মানুষের রক্তের ধারা ছুটিল! কেহ উঠিয়া বসিতেই পড়িয়া গেল। কেহ মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া রহিল। রক্তমাখা সড়কীর দিকে দৃষ্টি করিয়া, প্যারীসুন্দরীর লাঠিয়ালগণ ঢাল, সড়কী, লাঠি ফেলিয়া উর্দ্ধশ্বাসে পলাইতে আরম্ভ করিল। যে, যে দিক সুবিধা সে সেই দিকেই যথা সাধ্য দৌড়িল। হুকুম-দেহেন্দা মহাশয় কোন্ সময় চম্পট দিয়াছিলেন, তাহা কেহই দেখিতে পায় নাই। টি, আই, কেনীর উৎসাহে তাহার লাঠিয়ালগণ অর্দ্ধ ক্রোশ পর্য্যন্ত বিপক্ষগণকে তাড়াইয়া লইয়া চলিল। শেষে তাহারা একেবারে দল ভাঙ্গা হইয়া ঝাড়ে জঙ্গলে এবং নিকটস্থ গ্রামের মধ্যে গিয়া প্রাণ বাঁচাইল। টি, আই, কেনী সদর্পে বলিতে লাগিল:—"আর আগে বাড়িও না। এক্ষণে প্যারী-সুন্দরীর প্রজাগণের বাড়ী ঘর যাহা সম্মুখে পাও ভাঙ্গিয়া ফেল। জিনিস পত্র লুটিয়া লও।"

আদেশ মাত্র লুট আরম্ভ হইল। থালা ঘটী এবং কৃষক-স্ত্রীদের গায়ের রূপার অলঙ্কার সর্দ্দারগণ টানিয়া, ছিঁড়িয়া খসাইতে আরম্ভ করিল। পাষণ্ডেরা স্ত্রীলোক-দিগের পরণের কাপড় পর্য্যন্ত কাড়িয়া লইয়া কেহ মাথায় বান্ধিয়া বাহাদুরী দেখাইতে লাগিল। গরু সকল তাড়াইয়া কুঠীর দিকে লইয়া চলিল। ঘরের অন্যান্য জিনিস পত্র যাহা সুবিধা পাইল, লইল। অবশিষ্ট ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া শেষে ভাঙ্গা ঘরে, ভাঙ্গ ঘরে আগুন লাগাইয়া টি, আই, কেনী লাঠিয়ালগণ সহ কুঠীর দিকে ফিরিল।

প্যারীসুন্দরীর প্রজার সর্ব্বনাশ, বিনাশ, একেবারে রসাতল। মাথা ভাঙ্গিয়া কান্না। স্ত্রীলোকেরা ঝাড়ে, জঙ্গলে প্রাণের ভয়ে, জাতির ভয়ে লুকাইয়া বাড়ী-পোড়া আগুন জল-পোরা চক্ষে দেখিয়া মৃত্যু-যাতনা ভোগ করিতে লাগিল। সাহেব সদলে কুঠীতে আসিয়াই লাঠিয়ালগণকে বকসিস দিয়া খুসী করিল! লুটের মাল, কাঁসা, পিতল, বস্ত্রাদি, লাঠিয়ালগণের বাড়ী গেল। সোণা রূপা সাহেবের আলমারীতে উঠিল। গরুগুলির গায়ে তখনি T. I. K. মার্কা (কেনীর নাম) বসাইয়া কুঠীর গরুর সামিল করা হইল। সময়ে এ সংবাদ সকলেই শুনিল হায়, হায়, ভিন্ন আর উপায় কি? * * *

প্যারীসুন্দরীর প্রজাদিগের দুরবস্থার কথা শুনিতে কাহারও বাকী থাকিল না। অন্যান্য জমিদার, তালুকদার, মধ্য শ্রেণীর জোতদার, প্রজা সকলেই, ভয়ে ভীত, ব্যস্ত, অস্থির। কখন কাহার ভাগ্যে কি হয়, এই ভাবনাতেই সকলে অস্থির।

কেনী ক্রমে ক্রমে নিকটবর্ত্তী জোতদার, তালুক-দারদিগকে পত্র দ্বারা, কাহাকে লাঠিয়াল দ্বারা আনাইয়া তাহাদের পৈত্রিক ভূসম্পত্তি আপনার সুবিধামত কবলা, পত্তনী এবং মিরাস স্বত্বে দলিল লিখাইয়া লইতে লাগিল। চির পৈত্রিক স্থাবর সম্পত্তি লিখিয়া দিতে যিনি একটু

ওজর আপত্তি করিলেন তিনিই অন্ধকূপ সম গুদামজাত হইলেন। কষ্টের এক শেষ। বাধ্য হইয়া সে কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহারাও কেনীর মনোমত দলীল লিখিয়া দিয়া শেষে প্রাণ বাঁচাইলেন। অমানুষিক কয়েদ হইতে খালাস পাইলেন।

সে সময় কুষ্টিয়া অঞ্চলে কেনীই রাজা, কেনীই হর্ত্তাকর্ত্তা। যা করে কেনী। নীলের উন্নতি, রেসমের উন্নতি, চতুর্দ্দিকে কেনীর নাম। কেনীর নামে পুরুষের পীলে কাঁপে, গর্ভিনীর গর্ভপাত হয়। ছোট ছোট ছেলেরা কেনীর নামে ভয় পায়। কেনীর দৌরাত্ম্যে দেশের লোক জলিয়া পুড়িয়া খাক্ হইতে লাগিল। কুঠীর নাম শুনিলেই হৃদয় কাঁপে। কুঠীর সীমা মধ্যে পা ধরিতেই প্রাণ কাঁপিয়া, অঙ্গ শিহরিয়া উঠে—মুখ শুকাইয়া যায়।

কুষ্টিয়ায় তখন মহকুমা হয় নাই। জেলা পদ্মার পার। জমিদার কেনী, বিচারকর্ত্তা কেনী, মহারাজাও কেনী। রাখে কেনী, মারে কেনী। যারা আগে থেকেই কেনীর পায়ে মুজা চড়াইয়া ছিলেন তাঁহারা একটু আছেন ভাল! বিশ্বাস ছিল, যে বিচার না করিয়া আর গুদামে পুরিবে না। এগুদাম বড় ভয়ানক বন্দী-খানা। সরকারী গুদামে পেট পুরিয়া না হউক, কয়েদী দুবেলা দুমোঠো ভাতের মুখ দেখিতে পায়। এ গুদামে তা নয়, কেনীর বন্দীখানার সে কথা নয়, ইহার ভিন্ন ভাব, অন্য কারবার, বড় ভয়নক স্থান! সেখানে শুইবার বিছানা, বালিস, কাঁথা কম্বলের নাম নাই। ভাতের মুখ দেখিবার ভাগ্যই নাই। আহারের ব্যবস্থা ধান। প্রাতে প্রতি বন্দী এক সের ধান পায়। সেই ধান হাতে খুঁটিয়া খুঁটিয়া চাল বাহির করে। সেই চাল, আর সন্ধ্যার সময় এক ঘটী জল, ইহাই কেনীর বন্দীখানায় কয়েদীর আহারের ব্যবস্থা। কত সম্ভ্রান্ত লোক—তালুকদার, মিরাসদার এই বন্দীখানায় কতকাল আবদ্ধ হইয়া শেষে কেনীর মনোমত দলীল লিখিয়া দিয়া কেনীকে আপন বিষয় সম্পত্তির অধিকারী করিয়া ভিখারী হইয়া খালাস পাইয়াছে। সেই অত্যাচারের কথা ভাবিতেও শরীর কণ্টকিত হয়। ঘরাও বিবাদ, প্রজায় প্রজায় মারা-মারী, স্বত্বাসত্বের বিচার, খত পত্র তমশুক ইত্যাদি যাবতীয় নালিশ সে সময় কেনী গ্রহণ করিত। কেনীর অনারারী মাজিষ্ট্রের ক্ষমতা ছিল। লোকে জানিত কেনীই সে অঞ্চলের আইন-সঙ্গত রাজা। (ক্রমশঃ)

পাই না তোমার ধরা।

তুমি শ্রাবণের রাতে গুরু গরজন,
শরতে পূর্ণিমা রাকা;
তুমি হিমানীর মাঝে, ধবল তুষার,
তরুণ তপনে আঁকা।
তুমি গিরি সানুদেশে, স্নিগ্ধ স্রোতস্বিনী,
তৃষিত প্রাণের আশা;
তুমি কবির হৃদয়ে, মধুর কল্পনা,
বাণীর বীণার ভাষা।
তুমি দূর নন্দনের, ফুল্ল পারিজাত,
সৌরভ অমিয়া ভরা;
তুমি বৃন্দাবন ধামে, বাঁশরীর তান,
গোপীজন মন-চোরা।
তুমি নিখিল ভুবনে, নব উষারাগ,
সন্ধ্যার ধ্রুব তারা;
তুমি সকল ভুবন, ভরিয়া রয়েছ,
তবু পাই না তোমার ধরা!

শ্রীমৃণ্ময়ী দেবী।

মনের বল।

পিতা কিংবা মাতার মনে যে বিষয়ে দৃঢ় ভাবনা থাকে সন্তানে সেই ভাব বিশেষ ভাবে অভিব্যক্ত হয়। সন্তানের মনের ভাব উন্নত করিতে হইলে পিতামাতার মনে উচ্চ ভাবের আদর্শ থাকা প্রয়োজন। সন্তানের মনের গঠন যেরূপ হওয়া প্রার্থনীয় গর্ভে সন্তানের জন্ম হইবার অন্ততঃ এক মাস কাল পূর্ব্ব হইতে জনক জননীর মনে তদ্রূপ চিন্তার দৃঢ় ভাবনা রাখা উচিত। পিতামাতার চিত্ত কোন কারণে ব্যাকুল থাকিলে সন্তান

অন্ধ, খঞ্জ, এমন কি বামন পর্য্যন্ত হইতে পারে। পিতা মাতার মনের মিল না থাকিলে সন্তান মূর্খ বা দুর্ম্মতিগ্রস্ত হইতে পারে। অনেক ভাল লোকের ঘরেও যে কুলাঙ্গারের জন্ম হয় ইহাই তাহার কারণ। পিতা-মাতার মনে যত মিল থাকিবে সন্তান ততই বুদ্ধিমান এবং সচ্চরিত্র হইবে।

আজ কাল ভারতবাসীর মহৎ অভাব কি, এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিলে মনে হয়, যে চিত্তের দৌর্ব্বল্যই ভারতবাসীর সমস্ত অভাবের মূল কারণ। যাহাদের মনে বল নাই তাহাদের দ্বারা কোন মহৎ কার্য্যই সাধিত হইতে পারে না। মনকে আয়ত্তাধীন করিতে না পারিলে সে মনের দ্বারা আপনার বা দেশের কোন উন্নতি করা যায় না। এই জন্যই সাধুরা দৃঢ় অভ্যাসের দ্বারা মনকে আপনার আয়ত্তাধীন করিতে উপদেশ দিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, "মনকো বাঁধ, মনকো ছান্দো, মনকো না দেও নাই।" কুকুর যেমন "নাই" পাইলে মাথায় উঠে মনও তদ্রূপ আত্মার কাছে "নাই" পাইলে আপনি মুনিব সাজিয়া বসে।

মনের কয়েকটী ধর্ম্ম আছে, সে গুলি না জানিলে মনকে বশে আনা কঠিন। মনকে বশীভূত করিতে হইলে প্রথমে মনের একাগ্রতা অভ্যাস করিতে হয়। মন স্বভাবতঃ অতি চঞ্চল। সকলেই লক্ষ্য করিয়া দেখিয়া থাকিবেন, যে চঞ্চলমতি বালক বালিকাগণ পড়িতে পড়িতে গাড়ী ঘোড়া প্রভৃতি নানা বিষয়ে মনকে ধাবিত হইতে দেয়। এইরূপ শিশুগণের পাঠাভ্যাস শীঘ্র হয় না। এই অল্প বয়সে শিশুর মনের একাগ্রতা অভ্যাস করান গর্ভধারিণীর কার্য্য। ইহাদের পাঠাভ্যাস করাইবার জন্য প্রহার করা ভুল। মনের একাগ্রতা বাড়াইবার জন্য শিশুগণকে অভিলষিত বিষয়ে মনোনিবেশ করিতে দিতে হয়। কোন বিষয়ে একাগ্রতা অভ্যাস হইলে সেই একাগ্র চিত্তের দ্বারা পাঠাদি অতি শীঘ্র হৃদয়ঙ্গম হয়। মন যতই একাগ্র হইতে অভ্যস্ত হয় মনের শক্তি ততই বাড়িতে থাকে। এডিসন প্রভৃতি পাশ্চাত্য মহাত্মাগণ মনের একাগ্রতা বলেই বৈজ্ঞানিক জগতে নানা অদ্ভুত আবিষ্ক্রিয়া করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তাঁহাদের মনের এত একাগ্রতা, যে কখন কখন তাঁহারা গভীর চিন্তায় মগ্ন হইয়া এক অহোরাত্র বা ততোধিক সময় আহার নিদ্রা ভুলিয়া থাকেন। ব্যায়ামের দ্বারা দেহের পেশীগুলি যেমন সুগঠিত হয়, একগ্রতা অভ্যাস দ্বারা মনও তদ্রূপ বলিষ্ঠ হইয়া এক মহোপকারী যন্ত্রে পরিণত হয়।

মনের আর একটী ধর্ম্ম এই, যে উহা যতক্ষণ যে বিষয়ে মনন করে ততক্ষণ তদাকার হইয়া থাকে। মন এক সময় একটীর অধিক বিষয় গ্রহণ করিতে পারে না। মনের গতি অতিশয় চঞ্চল বলিয়া সাধারণ লোকে এই সত্যটী সহজে অনুভব করিতে পারে না। একাগ্র মন নির্ম্মল দর্পণ স্বরূপ। মনোরূপ দর্পণের মলিনতা দুর করাই সাধনের উদ্দেশ্য। মন যতই একাগ্র ও নির্ম্মল হয় ততই তাহাতে ভগবানের শক্তি বিকাশ হয়। মেঘাচ্ছন্ন আকাশ হইতে বায়ু দ্বারা মেঘ দূরীভূত হইলে আকাশে সূর্য্য যেরূপ উজ্জ্বল রূপে প্রকাশিত হয়, কঠোর সাধনা দ্বারা একাগ্রতা লাভ করিলে সেই নির্ম্মল মনে ভগবান তেমনি উজ্জ্বল ভাবে প্রকাশিত হন। এরূপ একাগ্র নির্ম্মল মনের অসাধ্য কিছুই নাই।

মানবের মন যে পরিমাণ নিজের আয়ত্তাধীন হয় সেই পরিমাণে বিশ্বের অন্যান্য মনের উপর তাহার স্বীয় প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা লাভ করে। যাহার মনের একাগ্রতা যত অধিক সে সেই পরিমাণে তদপেক্ষা দুর্ব্বল ব্যক্তিদিগের চিত্তে আপনার প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। এইরূপে মনের ভাব চালনাকে ইংরেজীতে টেলিপ্যাথি (telepathy) কহে। সংসারে জ্ঞান ধর্ম্মে যাঁহারা শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছেন সহস্র সহস্র ব্যক্তি যে তাঁহাদের আনুগত্য স্বীকার করিয়াছে এই টেলিপ্যাথিই তাহার কারণ। মনের একাগ্রতা লাভ করিতে না পারিলে, মনকে আপন আয়ত্তাধীন করিতে না পারিলে নরনারীর প্রকৃত মনুষ্যত্ব এবং জীবনে কোন বিষয়ে সফলতা লাভ হয় না।

সন্তানের মানসিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য গর্ভধারিণীর দায়িত্ব অতি গুরুতর। সন্তান গর্ভে থাকিবার সময় জননী

যেরূপ চিন্তা করেন এবং যেরূপ আহারাদি করেন সন্তানে সেইরূপ চিন্তা এবং আহারাদির ফল পরিলক্ষিত হয়। মহাবীর নেপোলিয়নের জন্ম গ্রহণের পূর্ব্বে তাঁহার পিতামাতা যুদ্ধে অনেক বীরত্ব দেখিয়াছিলেন। তাঁহাদের মনে বীরত্বের দৃঢ় ভাবনা অঙ্কিত ছিল বলিয়া সন্তানেও এই ভাব প্রবিষ্ট হইয়া জগতে নেপোলিয়নকে মহাবীর করিয়া তুলিয়াছিল। গর্ভাবস্থায় একটী শ্বেতাঙ্গিনী রমণী আপনার গৃহস্থিত কাফ্রির প্রতিমূর্ত্তি সর্ব্বদা দেখাতে তাহার চিত্তে সেই প্রতিমূর্ত্তি দৃঢ় রূপে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল। এই কারণে তাহার সন্তানের বর্ণ ও আকৃতি অনেকটা কাফ্রির ন্যায় হইয়াছিল। সকল গর্ভধারিণীরই মনে রাখা উচিত, যে সাধুগণের ও বীরপুরুষগণের চরিত্রের বিষয় গভীর ভাবে চিন্তা করিলে সন্তানে সেই সকল গুণ অভিব্যক্ত হয়।

সন্তানের মনের একাগ্রতা বৃদ্ধির জন্য জননীকে অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে হইবে, কিসে সন্তানটীর সহজে অধিক মনোনিবেশ হয়। কোন কোন সন্তানের চিত্রের দিকে সহজে অধিক মনোনিবেশ হয়। কোন কোন সন্তানের বিচিত্র পত্র পুষ্পাদির প্রতি অধিক মনোনিবেশ হয়। কেহ বা জীব জন্তর প্রতি অত্যধিক আসক্ত হয়। যাহার যেরূপ ভাবে শীঘ্র মনোনিবেশ হয় সেই সন্তানকে সেই পথ দিয়া মনের একাগ্রতা শিখাইতে হইবে। যাহার যে বিষয় প্রিয় নহে, জোর করিয়া তাহাকে সে বিষয়ে একাগ্র করিবার চেষ্টা করিলে বিপরীত ফল হয়। মন অনেকক্ষণ এক বিষয়ে চিন্তা করিতে শিখিলেই সেই মন অদ্ভুত যন্ত্র হইয়া উঠে। তখন কামধেনুর ন্যায় সেই মনের কাছে যাহা চাওয়া যায় তাহাই প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব।

কতকগুলি আহারীয় দ্রব্য আছে যাহাতে চিত্তের একাগ্রতা জন্মিতে বাধা দেয়। মাদক দ্রব্য, গরম মসলা, অধিক গুরুপাক আহার, অধিক মাছ মাংস ভক্ষণ, এই গুলিতে মনের চাঞ্চল্য বৃদ্ধি হয়। ঘৃত, দুগ্ধ, মিষ্ট সুপক্ক সুরস ফল চিত্তের একাগ্রতা সাধনে সাহায্য করে।

সাধু সঙ্গ ও সাধুচরিত পাঠ দ্বারা চিত্ত শীঘ্র নির্ম্মল ও একাগ্র হয়। দুশ্চরিত্র লোকের সঙ্গ করিলে বা কুৎসিৎ পুস্তকাদি পাঠ করিলে মনের একাগ্রতা জন্মিবার বাধা জন্মে।

সংসারের কার্য্যক্ষেত্রে মনই মানুষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যন্ত্র। সেই মহাযন্ত্রকে কার্য্যক্ষম ও শক্তিশালী করিবার ভার মানুষের জন্মের পূর্ব্বাবধি বহু পরিমাণে গর্ভধারিণীর হস্তে ন্যস্ত। জন্মের পরেও বহুকাল সেই ভার প্রধানতঃ জননীর হাতেই থাকে। প্রত্যেক নরনারীর এবং নরনারীর সমষ্টীভূত জাতিসমূহের অদৃষ্ট গঠনে জননী-জাতির দায়িত্ব কি গুরুতর!

শ্রীহেমচন্দ্র সেন।

দান।

প্রভু—ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র আমি, তোমার চরণ কাছে,
তোমারে দিবার মত কি দেব আমার আছে?
অসীম অনন্ত তুমি, পরিব্যাপ্ত চরাচর,
বিশাল জগতে আমি অণু হতে ক্ষুদ্রতর।
তোমার সৃজিত নাথ! রবি শশী গ্রহগণ,
ক্ষিত্যপ্তেজ মরুদ্ব্যোম-সমন্বিত ত্রিভুবন।
সপ্ত সিন্ধু, গিরি, বন, সবি তো সৃজন তব,
আমিও তোমার সৃষ্ট, ওহে দেব ভবধব!
তোমারে কি দিব নাথ! তুমি ষড়ৈশ্বর্য্যশালী,
সকলি তোমারি দেব! মোর বলি ভুলে খালি!
কিছু মোর নাহি দেব! সপিতে তোমার পায়,
অথচ পরাণ কিছু, তোমারে হে দিতে চায়।
হৃদয় কাননে মোর, দিয়াছ যে প্রেম ফুল,
তোমার দানের সার, সে দান হে বিশ্বমূল!
তাই তব পদমূলে, বিশ্বম্ভর! বিশ্বপ্রাণ!
প্রেম-পুষ্পাঞ্জলি আমি শ্রদ্ধায় করিনু দান।

শ্রীসুশীলাসুন্দরী মিত্র,
শোভাবাজার রাজবাটী

মৃত যীশুখ্রীষ্ট।

গার্হস্থ্য বিজ্ঞান।

খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা।

এক অশিক্ষিত কৃষক তাহার দূরস্থিত পত্নীর নিকট একখানা চিঠি লেখাইবার জন্য এক দিন এক গ্রাম্য পণ্ডিতের নিকট উপস্থিত। পণ্ডিত মহাশয়ের কবিতা লিখিবার বাতিক ছিল; তিনি মনে করিলেন, এ ব্যক্তির প্রিয়তমার নিকট পত্র লিখিতে হইবে, কবিতাতে লেখাই কর্ত্তব্য। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পত্রখানা কি পদ্যে লিখিতে হইবে?"

কৃষক। না মহাশয়, পদ্যে লিখিবার প্রয়োজন নাই।

পণ্ডিত। আচ্ছা, তবে গদ্যেই লিখিতেছি।

কৃষক। না মহাশয়, গদ্যেও লিখিতে হইবে না।

পণ্ডিত। পদ্যেও নয়, গদ্যেও নয় তবে কিসে লিখিব?

কৃষক। কেন মহাশয়, সে পাড়া-গাঁ, সেখানে ত আর আপনার মত পণ্ডিত নাই, অত পদ্য গদ্য ত তারা বুঝিবে না।

পণ্ডিত। তুমি বল কি হে? গদ্যও বুঝিবে না? তবে আমি কি করিয়া চিঠি লিখিব?

কৃষক। কেন মহাশয়, সকলে সাধারণতঃ যাতে চিঠি পত্র লেখে তাতেই লিখুন না। আমরা যেমন কথাবার্ত্তা বলি তেমনই লিখুন না!

পণ্ডিত। আরে তাহাই ত গদ্য! আমরা যাতে কথা বলি তার নামই ত গদ্য!

কৃষক। আপনি বলেন কি! আমরা গদ্যে কথা বলি? এই যে আমি কথা কহিতেছি ইহা গদ্য?

কৃষক বেচারা যদিও সারাজীবন গদ্যেই কথা কহিয়াছে, কিন্তু সে নিজে জানিত না, যে সে গদ্যে কথা কহিতেছে।

আমাদের পাঠিকা ভগিনীগণের জন্য গার্হস্থ্য বিজ্ঞান সম্বন্ধে কিছু লিখিতে বসিয়া এই গল্পটী মনে পড়িল। "বিজ্ঞান, দর্শন"—কত বড় বড় কথা! বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা পর্য্যন্ত এই নাম শুনিয়া ভয় পায়, অন্তঃপুরচারিণী মহিলাদিগের নিকট তবে আবার এই বিজ্ঞানের কচ্ কচির প্রয়োজন কি? প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে; আর আমাদের পাঠিকা ভগিনীগণও যে বিজ্ঞান আলোচনা করেন না, বিজ্ঞানের কিছুই জানেন না, তাহা নয়। উপরোক্ত গল্পোল্লিখিত কৃষক সারা জীবন গদ্যে কথা কহিয়াও যেমন জানিত না, যে সে গদ্যে কথা কহিতেছে, তেমনি পাঠিকা ভগিনীগণও অনেকে হয়তঃ জানেন না, যে দিবানিশি তাঁহারা নানা প্রকারে বিজ্ঞানের নিয়ম অনুসরণ করিতেছেন। আমাদের রন্ধন, ভোজন, শয়ন, প্রভৃতি সকল কার্য্যেই আমরা বিজ্ঞানের অনুসরণ করিতেছি। ময়লা তোষক খানা লাঠি দিয়া ঝাড়িয়া তাহা হইতে, ধূলা বাহির করিতেছি—ইহাতেও বিজ্ঞানের নিয়ম কার্য্যে পরিণত করিতেছি। আমরা অজ্ঞাতসারে বিজ্ঞানের অনুসরণ করিতেছি, প্রকৃত কার্য্য-কারণ জানি না। প্রকৃত কার্য্য-কারণ জানিলে বৈজ্ঞানিক নিয়মের প্রয়োগদ্বারা আমরা অনেক উপকার লাভ করিতে পারি। সে দিন এক খানা কাগজে একটী ভদ্রলোক লিখিয়াছেন, তাঁহার পটল ক্ষেতে গত বৎসর পটলের গাছ গুলি খুব সতেজ হইয়াছিল, কিন্তু যখন ফল ধরিবার বয়স হইল, তখন দেখা গেল, প্রতি দিন পটল গাছে খুব ফুল ফুটিতেছে কিন্তু ফুলগুলি ক্রমে মজিয়া ঝড়িয়া পড়িতে লাগিল, তাহা হইতে পটল আর হয় না। ভদ্রলোকটীর কৃষি-বিজ্ঞানে কিছু অভিজ্ঞতা ছিল, তিনি অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন, তাঁহার ক্ষেত্রের গাছগুলি সকলি স্ত্রী-গাছ। পুং-গাছ তাঁহার ক্ষেতে নাই। স্ত্রী-গাছের ফুলের পরাগের সহিত পুং গাছের ফুলের পরাগ না মিশিলে ফুল হইতে ফল জন্মে না। তিনি অনুসন্ধান করিয়া একজন কৃষকের ক্ষেত হইতে পুং-গাছের পরাগ আনিয়া তাঁহার ক্ষেতের স্ত্রী-গাছের ফুলের পরাগের সহিত একটু একটু মিশাইয়া দিতে লাগিলেন, পটল ফলিতে আরম্ভ করিল।

আজ কাল বিজ্ঞানের সাহায্যে কৃত্রিম উপায়ে বিভিন্ন প্রকারের ফুল হইতে অতি সুন্দর সুন্দর নূতন রকমের ফুল সৃষ্টি করা হইতেছে। বিচিত্র বর্ণের ক্রোটনের গাছ প্রায় সকলেই দেখিয়াছেন। কি সুন্দর, দেখিলে

তনু জুড়াইয়া যায়! কিন্তু এত সুন্দর সুন্দর ক্রোটনের গাছ ভগবান সৃষ্টি করেন নাই। মানুষ সামান্য সামান্য ক্রোটনের মিশ্রণে, বৈজ্ঞানিক উপায়ে এই সকল মনোহর ক্রোটন সৃষ্টি করিয়াছে। বিজ্ঞানের সাহায্যে অসম্ভব সম্ভব হয়, তাহা ত নিত্যই দেখিতেছি। কিন্তু আমাদের কি বিজ্ঞানের সাহায্যে কিছুই করিবার নাই?—নিশ্চয়ই আছে। বিজ্ঞানের নিয়ম প্রণালী আমাদের শক্তি সাধ্য অনুসারে আমরা কিছু কিছু আলোচনা করিতে পারি। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে গৃহের কাজ, অন্ন বস্ত্র প্রস্তুত, ইত্যাদি করিলে আমাদের গৃহ পরিবার কত সুন্দর হয়, গৃহে স্বাস্থ্য রাজত্ব করে—পুত্রকন্যার মুখে প্রফুল্লতা বিরাজ করে, জীবনের অনেক দুঃখ যন্ত্রণা কমিয়া যায়। আমরা ভারত-মহিলায় অতঃপর সহজ বৈজ্ঞানিক বিষয়ে কিছু কিছু আলোচনা করিব। "বিজ্ঞান" বলিয়া ভয় না পাইয়া বিষয়গুলির আলোচনা করিলে পাঠিকা ভগিনীগণ উপকার পাইতে পারেন।

গৃহ-রাজ্যের সম্রাজ্ঞী নারী। গৃহের সুখ ও আনন্দ বর্দ্ধনে বিজ্ঞান আমাদিগকে কি শিক্ষা দিতে পারে আমরা প্রথমে তাহারই আলোচনা করিব।

মানব জীবনের প্রথম কথা শরীর। "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্ম-সাধনম্।"—কিন্তু শরীর কেবল ধর্ম্ম সাধনেরই উপায় মাত্র নহে, স্বাস্থ্য না থাকিলে জীবনে কোন সুখ স্বস্তিই থাকে না। সকলের শরীর একরূপ নহে। কেহ সুস্থদেহ, কেহ বা পিতামাতার নিকট হইতেই অসুস্থ দেহ লাভ করিয়াছেন। অনেকে সুস্থ দেহ লাভ করিয়াও বিজ্ঞানের নিয়ম ভঙ্গ করতঃ ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু সুস্থই হউন, আর অসুস্থই হউন, বিজ্ঞানের নিয়ম পালন করিলে সকলেই লাভবান হইবেন।

এই শরীর রক্ষার জন্য চারিটী বস্তুর বিশেষ প্রয়োজন,—(১) পুষ্টিকর খাদ্য, (২) পরিষ্কার বায়ু ও অঙ্গচালনা (৩) যথোপযুক্ত বস্ত্র (৪) পরিচ্ছন্নতা।

খাদ্য অর্জ্জনে ও খাদ্য প্রস্তুতেই সাধারণ মানুষের জীবনের অধিকাংশ শক্তি ব্যয়িত হয়। পরিবারের কর্ত্তার অর্থোপার্জ্জন প্রধান ভাবে খাদ্যের জন্য। গৃহিণীর প্রভাত অবধি রাত্রি পর্য্যন্ত প্রধান কার্য্য খাদ্য প্রস্তুত করা অথবা করান এবং খাদ্য পরিবেশন। আহার গ্রহণ যে প্রয়োজন ইহা গবেষণা দ্বারা নির্ণয় করিতে হয় না। ক্ষুধার মাহাত্ম্য কে না জানে? কিন্তু ক্ষুধাতত্ত্ব আলোচনাতে লাভ আছে।

কেহ কেহ রেলওয়ের ইঞ্জিনের সহিত শরীরের তুলনা দিয়া থাকেন। উপমাটী বড় সুন্দর। ইঞ্জিনটী কত কৌশলে নির্ম্মিত! নির্ম্মাতার কত বুদ্ধির পরিচায়ক! কিন্তু ইঞ্জিন চালাইবার নিমিত্ত ইঞ্জিনের খাদ্য ও পানীয় চাই। খাদ্য—কয়লা, ও পানীয়—জল। বিনা খাদ্যে, বিনা পানীয়ে ইঞ্জিন কাজ করে না। কয়লা আগুণে পুড়িয়া হজম হইবে, তাহা হইতে শক্তি (বাষ্প) উৎপন্ন হইবে, তবে কল চলিব। কয়লা পুড়িবার জন্য আগুণ চাই, আগুণ জ্বলিবার জন্য বাতাস চাই। মানুষের দেহ-যন্ত্র সম্বন্ধেও ঠিক একই ব্যবস্থা। কাজ করিতে করিতে কল ক্রমে ক্ষয় হয়, শেষে মিস্ত্রী আসিয়া তাহা মেরামত করে। আমাদের শরীরও কাজ করিতে করিতে ক্ষয় হয়, কিন্তু আমাদের দেহের মিস্ত্রী কে? আমাদের দেহের মিস্ত্রী খাদ্য হইতে উৎপন্ন রক্ত। আমরা যত বেশী পরিশ্রম করি তত বেশী খাদ্যের প্রয়োজন। কেহ কেহ বলেন, দুই মাসের মধ্যে আমাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নবনির্ম্মিত হয়, পুরাতন ক্ষয় হইয়া যায়, নূতন তাহার স্থান অধিকার করে; সুতরাং খাদ্যের প্রথম প্রয়োজনীয়তা—দেহের ক্ষয়িত অংশের পুনর্গঠন।

কলের আগুন যেমন বায়ুর সাহায্যে জ্বলন্ত রহে এবং উৎপন্ন উত্তাপ যেমন কলের বয়লায়ের মধ্যস্থিত জলকে বাষ্পে পরিণত করে, আর সেই বাষ্পই যেমন ক[ে] প্রকৃত শক্তি, আমাদের খাদ্যও তেমনি ফুসফুস দ্বা[রা] গৃহীত বায়ুর সংস্পর্শে আসিয়া শরীরে উত্তাপ সৃষ্টি ক[রে]। এই উত্তাপ হইতে শক্তি উৎপন্ন হয়। সুতরাং খাদ্যে[র] দ্বিতীয় প্রয়োজনীয়তা—উত্তাপ ও শক্তি সৃষ্টি করা।

ঐতিহাসিক বীরবালা।

সোনা বিবি।

(বাঙ্গলার প্রসিদ্ধ বারভূঁয়াদের মধ্যে ইশা খাঁ ও চাঁদরায়ের নাম ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেরই জানা আছে। সোনাবিবি বা সোনামণি চাঁদরায়ের কন্যা। ইশা খাঁ কৌশলে তাঁহাকে হরণ করিয়া বিবাহ করেন। ইশা খাঁয়ের সহিত মোগলগণের যুদ্ধের সময় তিনি সমর-ক্ষেত্রে স্বামীর পার্শ্বে সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকিয়া সহায়তা করিতেন ও ইশা খাঁয়ের মৃত্যুর পর নিজ পতির পরিত্যক্ত রাজ্য রক্ষার্থে ফিরিঙ্গি ও মগগণের সহিত বহু বার যুদ্ধ করেন। পরিশেষে মগেদের হস্তে পরাস্ত হইয়া অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করেন। বিস্তারিত বিবরণ জানিতে হইলে সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত নিখিল নাথ রায়ের লিখিত "বার-ভূঁয়া—ইশা খাঁ" নামক প্রবন্ধ ১৩১১ সালের সাহিত্যে ২০৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।)

"নব উৎসাহে পরাজিত মগ আবার এসেছে ফিরে,
বাড়ায়ে ত্রিগুণ তা'দের সংখ্যা লয়েছে নগর ঘিরে।
কি করি উপায় হীন সংখ্যায় এখাদের সৈন্যগণ,
সমুখ সমর বৃথা, গড়ে পশি কর্ত্তে হইবে রণ।"
"একি সেনাপতি, একি ভীরু বাণী, বীরের যোগ্য নয়!
দস্যু-দলনে মরে মোর প্রজা মোরি জীবনের ভয়!
ওই হাহাকার উঠে চারিধার দহিছে দীনের বাড়ী,
পতি পাশ হ'তে ঘৃণিত দানব লইছে সতীরে কাড়ি।
এ হেরি নয়নে র'ব গৃহ কোণে নয় নয় কভু নয়,
বীরের রমণী বীরের কীর্ত্তি আমি কি ডুবাব তায়!
বার বার যথা করি কশাঘাত খেদিয়াছি দূরে সবে,
এই মত এবে বিজয় মোদেরি অন্যথা নাহি হ'বে।
কি সে ত্রিগুণ নয় নব গুণ জানি সবে ফেরুপাল,
সিংহ সমুখে বিক্রম বৃথা তিষ্ঠিবে কত কাল।
ত্যজ মিছে ত্রাস সাজাও সৈন্যে শিঙ্গায় দেও ফুঁক,
বাজিয়া উঠুক সমর বাদ্য কঠিন করহ বুক।"
এত বলি বালা বীরের গৃহিনী বিদাইল সোনাবাই,
সৈন্যাধ্যক্ষে সাজিলা আপনি ক্ষণ বিলম্ব নাই।

কটিতটে আঁটি শাণিত কৃপাণ, ভীষণ ভল্ল করে,
ত্বরিতে চড়িয়া বেগবান বাজী বাহিরিল রণ তরে।

সঙ্গে সঙ্গে সজ্জিত সেনা খুলিয়া দুর্গদ্বার,
দাঁড়াল আসিয়া ঘিরিয়া তাঁহারে বশীভূত আজ্ঞার।
পাষাণ-প্রমাণ পাঠান বক্ষ নাহি জানে কি যে ভয়,
শত্রু নিধনে সক্ষিপ্র কর দুর্দ্দম দুর্জ্জয়।
"কি দেখিছ আর' শত্রু সবার হুঙ্কারে ফাটে ধরা,
সহায় বিহীন নিরীহ নরের বহিছে রক্ত-ধারা।

আস্ফালি অসি আক্রম বেগে বিক্রমে অরাতিরে;
মগের মুণ্ড বিছায়ে কৃষ্ণ কর শ্যাম পৃথিবীরে।
নদের দর্প ডুবে যায় যথা সাগর ঊর্ম্মি মাঝে,
তেমতি শত্রুর শূন্য দম্ভ ডুবাও তোদের তেজে।"
এত বলি বিবি তুলিয়া কৃপাণ শূন্যে নিশান সম,
ছুটাল ত্বরিতে তড়িৎ সমান তেজস্বান তুরঙ্গম।
অচিরে অভ্র ভেদিয়া উঠিল মার মার মহারোল,
উভয় শত্রু-সৈন্য মিশিয়া জাগাল গণ্ডগোল।

অসি পরে অসি পড়ে ঝন ঝনি ঝলিল বহ্নি তায়,
নরের শোণিত পান উল্লাসে পিশাচের হাসি প্রায়।
যুঝিছে পাঠান করি প্রাণপণ পাড়িয়া মগের মাথা,
একা শত মাঝে পড়িছে লাফায়ে মৃগ-যূথে হরি যথা।
শত শত শির চুমিছে ধরণী ঘেরে পুনঃ শত এসে,
শত ক্ষত দেহে কত যুঝে আর পড়িছে পাঠান শেষে।
তবু উৎসাহে মাতায়ে সকলে সবার অগ্রে ছুটি,
খেলায় খড়্গ চমকে চপলা বীরবালা, শির কাটি'।
দোলে কেশ-বেণী কৃষ্ণ নাগিনী উড়িছে রক্ত বাস,
গর্জ্জিয়া পড়ে অরাতির 'পরে, "ছাড়রে জীবন আশ।"
"ওরেরে দস্যু ওরেরে দানব ঘৃণিত আচারী চোর,
নিরীহ-রক্ত-পাত-প্রতিফল পা'রে আজি করে মোর।"
এই মত রণ চলে বহুক্ষণ পেতেছে পাঠান ক্ষয়,
শত গুণ সাথে কে আঁটিতে পারে ব্যর্থ সকলি হয়।
চারি ধার হ'তে আসি নব স্রোতে. ঘিরিল মগের দল,
জন কত সাথে রুদ্ধ রমণী হ'য়ে উঠে বিহ্বল।
"কি করি উপায় সম্ভ্রম যায় বুঝি বর্ব্বর হাতে,
সবাই শুয়েছে সমরাঙ্গনে কে আছে উদ্ধারিতে!

বৃথা আর রণ ফের সাথীগণ ভেদিয়া শত্রু-ব্যূহ.
পশি গিয়া চল দুর্গ মাঝারে ছুইতে দিব না দেহ।"
ফিরিল সবাই আগে সোণাবাই শত্রু-সেনা-প্রাচীর
ভেদিয়া পলকে রোধিতে কে পারে ছুটে জলন্ত তীর।
নিমেষে গিয়া সে পশিল দুর্গে ধায় পিছে মগ-সেনা.
প্রাকার বাহিয়া লাগিল উঠিতে নাহি মানি বাধা মানা।
রুদ্ধ কপাট বাজে ঝন ঝন শত মুদ্গর ঘায়,
পড়ে পড়ে খসি' উপায় কি আছে সম্ভ্রম বুঝি যায়।
"বৃথা বৃথা হায় এতেক প্রয়াস হ'য়ে গেল সব শেষ;
বীর পতি মোর বীরের কীর্ত্তি রাখিতে নারিনু লেশ!
ছিছি কলঙ্ক, ছিছি এ জীবন, মরিব অনলে জ্বলি,
আনহ কুণ্ড এখনি ত্বরিতে সব জ্বালা যাই ভুলি।"
জ্বলিল বহ্নি ধক্ ধকে শিখা পশে বীরবালা তা'তে,
"ধর ধর ধর" ছুটে আসে মগ, পেয়েছে দুর্গ হাতে।
"আয় বর্ব্বর" বলে সোনা শেষ, বহ্নির বুকে রহি,
বিস্ময় মানি মগপতি কহে—"ধন্য রমণী তুঁহি।"

শ্রীতারাপ্রসন্ন ঘোষ।

গীতোক্ত কর্ম্মযোগ।

সকলেই অবগত আছেন, যে উপনিষদ মতে মুক্তিলাভ কেবল ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারাই হইতে পারে। হিন্দুমতে সংসার অর্থাৎ পুনর্জন্ম হইতে মুক্ত না হইলে ত্রাণলাভ অসম্ভব। কিন্তু উপনিষদের লেখকগণ বলেন, যে কর্ম্মের ফলভোগ অবশ্যম্ভাবী। পাপ করিলে তজ্জন্য শাস্তি আছে, আবার সৎকর্ম্ম দ্বারা পুণ্য সঞ্চয় করিলে তাহার পুরস্কার আছে। উভয় অবস্থাতেই জন্মলাভ হয়; কারণ দেহ ধারণ না করিলে পাপ পুণ্যের ফলভোগ করা যায় না। অথচ বেদান্তমতে দৈহিক জীবন সর্ব্ব দুঃখের মূল। যতদিন আমাদের তত্ত্বজ্ঞান না হয়, অর্থাৎ 'তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো' এই মহা বাক্যের তাৎপর্য্য উপলব্ধি না হয়, ততদিন আমাদের মুক্তির কোন সম্ভাবনা নাই। অতএব বেদান্ত মতে বেদের জ্ঞানকাণ্ড অধ্যয়ন এবং সমস্ত কর্ম্ম হইতে বিরতি প্রত্যেক মুমুক্ষু ব্যক্তির কর্ত্তব্য

অথচ কর্ম্ম না করিলে আমাদের সাংসারিক জীবন নির্ব্বাহ হইতে পারে না। উপনিষদুক্ত উপদেশ দুই এক জন লোক অনুসরণ করিতে পারেন বটে, কিন্তু সাধারণের পক্ষে তাহা হইতে পারে না। সুতরাং কালক্রমে কর্ম্ম করা যে শাস্ত্রসঙ্গত তাহা প্রদর্শন করা উচিত বোধ হইতে লাগিল; কারণ সকলেই দেখিতে পাইলেন, যে সাধারণ লোক যদি কর্ম্ম হইতে বিরত হয়, তবে সমাজবন্ধন একবারে শিথিল হইয়া যাইবে এবং জীবন ধারণই অসম্ভব হইবে। অতএব কৃষ্ণ বলেন:—

উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহম্।
সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ॥ ৩।২৪

আমি যদি কর্ম্মানুষ্ঠান না করি, তাহা হইলে এই অখিল লোক উৎসন্ন হইয়া যাইবে এবং আমি বর্ণসঙ্করের কর্ত্তা ও এই সমস্ত প্রজাগণের মলিনতার কারণ হইব।

কিন্তু জ্ঞানকাণ্ডবাদী বলিতে পারেন, যে কর্ম্ম নিষ্প্রয়োজনীয়। কর্ম্মের উপকারিতা সম্বন্ধে কি যুক্তি দেওয়া যাইতে পারে? গীতাতে এই প্রশ্নের নানারূপ উত্তর আছে।

কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।
লোক সংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্ত্তুমর্হসি॥ ৩।২০

জনকাদি মহাত্মাগণ কর্ম্মদ্বারাই সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন, অতএব স্বধর্ম্ম প্রবর্ত্তনের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কর্ম্ম করা লোকের কর্ত্তব্য।

গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ।
যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে॥ ৪।২৩

যিনি নিষ্কাম ও রাগাদি পরিমুক্ত এবং যাঁহার চিত্ত জ্ঞানে অধিষ্ঠিত, তিনি প্রকৃতপক্ষে কর্ম্মানুষ্ঠান করিলেও তৎকৃত কর্ম্মসমূহ বিলোপ প্রাপ্ত হয়।

কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি।
যোগিনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে॥ ৫।১১

কর্ম্মযোগিগণ আত্মবিশুদ্ধির জন্য আসক্তি বিসর্জ্জন পূর্ব্বক দেহ মন বুদ্ধি ও কর্ম্মাভিনিবেশ রহিত ইন্দ্রিয় দ্বারা কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকেন।

শ্রেয়ো হি জ্ঞানমভ্যাসাজ্জ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে।
ধ্যানাৎ কর্ম্মফলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্॥ ১২।১২

বিবেক-বিরহিত অভ্যাস অপেক্ষা জ্ঞানশ্রেষ্ঠ, জ্ঞান অপেক্ষা ধ্যান শ্রেষ্ঠ এবং ধ্যান অপেক্ষা কর্ম্মফল বিসর্জ্জন শ্রেষ্ঠ। কর্ম্মফল বিসর্জ্জন করিলেই শান্তি লাভ হইয়া থাকে।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, কোন্ প্রকার কর্ম্ম আমাদের কর্ত্তব্য। গীতা বলেন ঃ—

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ॥ ৩।১৯

পুরুষ আসক্তি বিসর্জ্জন পূর্ব্বক কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে মোক্ষ লাভ করিয়া থাকেন; অতএব তুমি অনাসক্ত হইয়া সতত কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর।

কার্য্য-কর্ম্ম আমাদের ধর্ম্ম অর্থাৎ নিত্যকর্ম্ম। নিত্য-কর্ম্ম কি তাহা জানিতে হইলে শাস্ত্র পাঠ করিতে হইবে। (১৬।২৩) সকলেই জানেন, যে শাস্ত্র বলিতে মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি গ্রন্থকারদের ধর্ম্মশাস্ত্র বুঝায়; কোন রকম বৈদিক গ্রন্থ শাস্ত্র নামে অভিহিত হয় না।

গীতাকার কর্ম্মযোগ দ্বারা প্রমাণ করিতে চান, যে জাতিধর্ম্ম (duties of caste) বন্ধুত্ব এবং স্নেহ-বন্ধন অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। অর্জ্জুন যুদ্ধক্ষেত্রে অনেক আত্মীয়কে শত্রুপক্ষে দেখিয়া আর যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করেন না। কৃষ্ণ বলেন যে অর্জ্জুন ক্ষত্রিয় অতএব অন্য সব উপেক্ষা করিয়া নিজের ক্ষত্রিয়োচিত যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য। কর্ত্তব্য-জ্ঞানের অধীন হইয়া সুহৃদবর্গকে বধ করিলেও কোন পাপ নাই।

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ॥ ৩।৩৫

কালিদাসের শকুন্তলাতেও এইরূপ মত আছে ঃ—

সহজে কিল জে বিণিন্দিএ ণ হু দে কম্ম বিবজ্জণী অএ।

যাহার যে কর্ম্মেতে জন্ম, তাহা যদি নিন্দিত হয়, তথাপি তাহা পরিত্যাগ করিবে না।

সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ।
সর্ব্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ॥ ১৮।৪৮

হে কৌন্তেয়! যেরূপ ধূমপুঞ্জ দ্বারা বহ্নি সমাবৃত থাকে, সেইরূপ নিখিলকার্য্যই দোষদ্বারা সংস্পৃষ্ট রহিয়াছে; অতএব স্বাভাবিক কর্ম্ম দোষসমন্বিত হইলেও কখন পরিত্যাগ করিবে না।　　(ক্রমশঃ)

শ্রীরাজকুমারী দাস।

অজপা ব্রহ্মচারিণী ও হকহকী মাতা।

প্রস্তাবের শীর্ষদেশে যে দুই অসামান্য পূতচরিত্রা রমণীর নাম উল্লিখিত হইয়াছে তাঁহারা অত্যাশ্চর্য্য আধ্যাত্মিক শক্তিশালিনী এবং দেবদুর্লভ গুণরাশিতে বিভূষিতা ছিলেন। ইঁহাদের কাহিনী গল্প বা উপন্যাসের ন্যায় চিত্তহারী, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহাতে কল্পনার লেশ মাত্র নাই। এই ঘটনার সম-সাময়িক অনেক ইংরেজ ও ভারতবাসী অদ্যাপি জীবিত আছেন।

উপরি উক্তা রমণীদ্বয়ের জীবনের প্রথম অংশের বিবরণ উহ্য করিয়া দিলে কাহিনীর অঙ্গহীনতা ও সৌন্দর্য্যহীনতা এবং উদ্দেশ্য বিভ্রাটের আশঙ্কায় আমি সংক্ষেপে প্রথমে তৎবিষয়ে কথঞ্চিৎ বর্ণনা করিতে আকাঙ্ক্ষা করি।

অনেক বৎসর পূর্ব্বে (হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠিত হইবার অগ্রে) এদেশে যে সকল বাঙ্গালী ভদ্রলোকের হস্তে ফৌজদারী ও দেওয়ানী বিচারের ভার ন্যস্ত হইত, তাঁহারা "জজ-পণ্ডিত" আখ্যায় অভিহিত হইতেন। ইঁহারা প্রায়ই দেওয়ানী মোকদ্দমার বিচার করিতেন এবং ইংরাজি না জানিলে বাঙ্গালা ভাষায় আদালতের কার্য্য নিষ্পন্ন করিতেন। উর্দ্দু ভাষা অবগত থাকিলে তাহাতে কর্ম্মাদি নির্ব্বাহ হইত। অজপা ব্রহ্মচারিণী এইরূপ এক বাঙ্গালী জজ-পণ্ডিতের একমাত্র কন্যা; পিতা জাতিতে ব্রাহ্মণ এবং অবস্থায় ধনবান ছিলেন। অজপার পিতৃদত্ত নাম "বিলাসিনী।" বড় লোকের ঘরে জন্ম বলিয়া এবং শৈশবকাল হইতে বিলাসের ক্রোড়ে প্রতিপালিতা বলিয়া কন্যাটি নামেও যেমন বিলাসিনী ব্যবহারেও তেমনি বিলাসিনী হইয়া উঠিলেন। ধনবান যুবার সহিত বিলাসিনীর বিবাহ হইল; কিন্তু স্বামী নিতান্ত মূর্খ ও নিতান্ত দুরন্ত এবং দুশ্চরিত্র। অতীব মূর্খ, কুচরিত্র এবং বিলাসপরায়ণ স্বামীর সহিত বিবাহিতা হইয়া বিলাসিনী আরও বিলাসিনী হইয়া উঠিলেন, ক্রমে পতি ও পত্নীর মধ্যে ঘোরতর মনোমালিন্য জন্মিল; অভাগিনী বিলাসিনী নারীর দুর্লভ ধর্ম্মধনে জলাঞ্জলি

দিয়া এক "বাবুর" সহিত কাশীধামে পলাইয়া আসিলেন। কয়েক মাস পরে দুরাচার বাবুর মৃত্যু হওয়ায় এবং পূর্ব্বকার টাকা ও অলঙ্কারাদি নানা কারণে হস্তান্তর হওয়ায় বিলাসিনী প্রকাশ্যরূপে বারাঙ্গনাবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে বাধ্য হইলেন। বিলাসিনী অত্যন্ত রূপবতী ছিলেন, তাঁহার রূপে চতুর্দ্দিক আলোকিত হইয়া যাইত। ক্রমে এক মহা ধনবান জমিদারের আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া স্ত্রীলোকটি তাহারই "রক্ষিতা" রূপে দিন যাপন করিতে লাগিল। টাকা, অলঙ্কার, মূল্যবান দ্রব্য প্রভৃতিতে গৃহ আবার পরিপূর্ণ হইয়া গেল। এইরূপে কিছু দিবস অতিবাহিত হইলে তিনি এক স্ত্রীলোকের মুখে শ্রবণ করিলেন, কাশীধামের 'মিশির্ পোখ্‌রা' পাড়ায় এক বাঙ্গালী কথক আসিয়া রামায়ণ ব্যাখ্যা ও গান করিতেছেন, সেই কথকতায় ও গানে সমস্ত নগর মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া গিয়াছে। বিলাসিনী এক দিবস কথকতা শুনিতে গেলেন। ধর্ম্মপ্রাণ, সুকণ্ঠ, ব্রহ্মজ্ঞানী এবং ভক্ত ব্রাহ্মণ কথকের ব্যাখ্যা ও গান শুনিয়া বিলাসিনী একেবারে চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় স্থির হইয়া বসিয়া রহিলেন। চক্ষে বারিধারা এবং হৃদয়ে বৈরাগ্যের প্রবল তরঙ্গ বহিতে লাগিল। এক সপ্তাহ কাল উপর্য্যুপরি সীতার পতিভক্তি, বাল্মিকীর উদ্ধার, লক্ষ্মণের ভ্রাতৃভক্তি, শ্রীরামচন্দ্রের দেব-চরিত্র, সংসারের অনিত্যতা, পাপের পরাজয়, ধর্ম্মের জয়, ধন জন যৌবনের ক্ষণভঙ্গুরতা প্রভৃতি শ্রবণ করিয়া বিলাসিনী একেবারে পাগলিনীর ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন। সূচিকা বিদ্ধ করিলে দেহ যেমন ব্যথিত হয়, পাপের সূচিকা (Consciousness of sin) তাঁহার হৃদয়কে তেমনি বিদ্ধ করিতে লাগিল। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, "আমি সম্পূর্ণ রূপে পাপ হইতে স্বতন্ত্রা হইয়া নবজীবন লাভ করিব। যখন দস্যু রত্নাকর পাপমুক্ত হইয়া বাল্মিকী মুনি হইতে পারিয়াছে, যখন পাষাণী অহল্যা রামপদে মোক্ষ প্রাপ্ত হইতে সমর্থা হইয়াছে, তখন আমার চেষ্টা কি বৃথা হইতে পারে?" গভীর মনোবেদনায়, অটল অচল প্রতিজ্ঞায় এবং তীব্র বৈরাগ্যে, অর্দ্ধ রজনীতে কিঞ্চিৎ মাত্র টাকা সঙ্গে লইয়া, জমিদারের অনুপস্থিতি কালে, কাশীধাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিলাসিনী দেবী বৃন্দাবনধামাভিমুখে একাকিনী প্রয়াণে প্রবৃত্ত হইলেন। কয়েক ক্রোশ মাত্র পথ অতিক্রম করিয়া শুভ্র বস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক গৈরিক বসন ধারণ করিলেন। গলে হরিনামের মালা, মাথায় গৈরিক বস্ত্রের ছোট পাগড়ী, হস্তে কাষ্ঠের কমণ্ডলু এবং বগলে মৃগ-চর্ম্ম লইয়া হরিনাম গাহিতে গাহিতে শ্রীবৃন্দাবন ধামের পথ অতিক্রম করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার মনে তীব্র বৈরাগ্য এবং হৃদয়ে শুদ্ধি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। তখন তিনি ভগবৎ প্রেমে বহির্জ্জগৎ ভুলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সেই পূর্ণ যৌবনে, অতুল দৈহিক সৌন্দর্য্যে, সন্ন্যাসিনী বেশে এবং সুকণ্ঠ-নিঃসৃত সুমধুর হরিনামে পথিকেরা এবং বিশেষতঃ গ্রামের ও নগরের লোকেরা তাঁহাকে "মা" "মা" বলিয়া সম্বোধন পূর্ব্বক তাঁহার পদধূলি গ্রহণ ও সেবা করিতে লাগিল। অনেকে বলিতে পারেন, এরূপ যুবতী ও রূপবতী স্ত্রীলোকের পক্ষে একাকিনী ঐ পথ দিয়া যাওয়া যুক্তিসঙ্গত হয় নাই, কিন্তু জলন্ত হুতাশনের সম্মুখে তৃণ মুহূর্ত্ত মধ্যে ভস্মীভূত হইয়া যায়। বিলাসিনীর মনে তখন যেরূপ ভগবৎ ভক্তি, যেরূপ তীব্র বৈরাগ্য জন্মিয়াছিল, দুষ্ট লোক তাঁহার সম্মুখে আসিলেই দুষ্টতা বর্জ্জিত হইয়া মাতৃভাবে তাঁহাকে পূজা করিতে স্বতঃই প্রবৃত্ত হইত। ধর্ম্মের এমনই তেজ! ভগবৎ ভক্তির এমনই শক্তি!

যাহা হউক, বৃন্দাবনে কয়েক মাস যাপন করিয়া বিলাসিনী দেবী আরও ধ্যানপরায়ণা এবং আরও ভক্তিময়ী হইয়া উঠিলেন। এখন তাঁহাতে বিলাসের চিহ্নমাত্র রহিল না। তিনি যমুনাতটে এক পদে দণ্ডায়মান হইয়া কখন সূর্য্যের দিকে নয়ন নিপাত পূর্ব্বক এক ঘণ্টাধিক কাল জপ করিতেন, কখন প্রদীপ্ত বৈশ্বানর সম্মুখে বীরাসনে উপবেশন পূর্ব্বক ধ্যান করিতেন, কখন নিকুঞ্জ বনে নিভৃতে উপাসনায় নিযুক্তা হইতেন, কখন বা যমুনাকূলে একাকিনী শুইয়া থাকিয়া প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিতে করিতে "মা" "মা" রবে ভগবানকে ডাকিতেন। এই সময়ে তিনি বহির্জ্জগত একেবারে ভুলিয়া যাইতেন। আহার বা ভোজনের দিকে কিছুই

দৃষ্টি ছিল না, অথচ দিন দিন যেন তাঁহার দৈহিক কান্তি ও মুখশ্রী অনির্ব্বচনীয় ভাবে বৃদ্ধি পাইত। সমস্ত নরনারী তাঁহাকে প্রগাঢ় ভক্তি সহকারে সেবা করিত এবং পাছে কোন অপরাধ হয় এ জন্য সদা সর্ব্বদা ভীত থাকিত।

বৃন্দাবনধাম পরিত্যাগ করিয়া বিলাসিনী দেবী পঞ্জাবের অন্তর্গত জ্বালামুখী তীর্থে উপনীত হইলেন। তথায় সাধুদিগকে দর্শন করিয়া জলন্ধর নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে করিতে পথিমধ্যে "চিন্তাপর্ণী" নামক স্থানে ভবানী দেবীর মন্দিরে প্রবেশ পূর্ব্বক বিশ্রাম লাভ করিবার আশায় উপবেশন করিলেন। দেবীর মন্দিরাভ্যন্তরে গিয়া সর্ব্ব প্রথমে যাহা তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল তিনি তাহাতে বিস্মিতা ও কম্পিতা হইয়া গেলেন। দেখিলেন, অতি প্রাচীন কাল হইতে অগণ্য সাধু মহাপুরুষদিগের চরণরেণুতে মন্দিরের যে স্থান পবিত্র হইতে পবিত্রতর বলিয়া পরিগণিত, সেই স্থানে, যেন চতুর্দ্দিক আলোকিত, সুশোভিত ও সুরভি-সম্ভার-মোহিত করিয়া বীণা হস্তে একটি অতীব মনোমোহন দেবোপম মূর্ত্তি বসিয়া আছেন; অনুধাবন করিয়া দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন ইহা পুত্তলিকা নহে, এক জীবিত মনুষ্যমূর্ত্তি; কিন্তু সে মূর্ত্তির রূপের তুলনা হয় না। বিলাসিনীর হৃদয়ে অঙ্গুলি রাখিয়া সেই মুহূর্ত্তে কোন অদৃশ্য দেবতা যেন বিদ্যুৎজ্যোতির ন্যায় কহিয়া দিলেন, 'দেখ! দেখ! ঐ দেবমূর্ত্তি তোমার সহায়, তুমি উহার চরণাশ্রিত হও।' বিলাসিনী তৎক্ষণাৎ সেই সাধুর শ্রীপাদপদ্মে মস্তক অবনত করিলেন; মহাপুরুষ মৃদু মধুর হাস্যে বিলাসিনীর মস্তকে সুকোমল হস্ত রাখিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। পরশমণির স্পর্শে লৌহ যেমন মণিরূপে পরিবর্ত্তিত হয়, সেই দেবশরীরের স্পর্শে বিলাসিনীর সর্ব্ব শরীরও যেন পবিত্রতায় পরিপূর্ণ হইয়া নব জীবনে জীবিত হইয়া উঠিল। মহাপ্রভু গৌরাঙ্গের দেবদেহ স্পর্শে মহাপাপী জগাই ও মাধাইএর যেমন অসাধারণ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছিল এই সাধুর দেহস্পর্শে বিলাসিনীরও তেমনি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হইল। তিনি বুঝিলেন, পিঞ্জর হইতে পক্ষী যেমন উড়িয়া পলায় তাঁহার মনপিঞ্জর হইতে কুপ্রবৃত্তি ও কলুষ প্রভাব এত দিনে সম্পূর্ণরূপে পলাইয়া গিয়া তাঁহাকে নিষ্কলঙ্ক করিয়া দিল। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, "এই অযাচিত কৃপায় আমি ধন্যা হইলাম, এত দিনে অভাগিনীর প্রতি ভগবানের কৃপা হইল, এত দিনে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইল।" সাধু কহিলেন, "বাছা! কাঁদিও না, আমার সঙ্গে হরিনাম কর।" সাধু হস্তের বীণায় ঝঙ্কার দিয়া হিন্দুস্থানী গান আরম্ভ করিলেন, বিলাসিনী তাহাতে যোগ দিলেন; উভয়ের সুকণ্ঠ-নিঃসৃত মধুময় হরিনামগানে দিকদিগন্ত মাতিয়া উঠিল, চতুর্দ্দিক যেন মোহিত হইয়া গেল। গ্রামের নরনারীগণ বলিলেন, আমাদের সৌভাগ্যক্রমে এখানে দেবতারা আসিয়াছেন, তাঁহাদের আগমনে চিন্তাপর্ণী স্বর্গধাম হইয়া উঠিয়াছে। (ক্রমশঃ)

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

চিত্রের কথা।

বুদ্ধদেব—বর্ত্তমান সংখ্যায় যে চারিখানি চিত্র প্রদত্ত হইল, তন্মধ্যে বুদ্ধদেবের চিত্রখানি বুদ্ধগয়ার মন্দিরস্থিত চন্দনকাষ্ঠ-নির্ম্মিত বুদ্ধমূর্ত্তির প্রতিলিপি। এই সুন্দর বুদ্ধমূর্ত্তিটী শ্যাম দেশের অধিপতি সম্প্রতি জাপান হইতে আনাইয়া বুদ্ধগয়ার মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

মৃত যীশুখ্রীষ্ট—বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, মহম্মদ প্রভৃতি জগতের ধর্ম্মগুরুগণের মধ্যে খ্রীষ্টের মৃত্যুকাহিনী অতি করুণ। সকল সাংসারিক বাসনা কামনায় জলাঞ্জলি দিয়া ধর্ম্মপ্রাণ যীশু ধর্ম্মপ্রচারে নিযুক্ত হইলেম, তাঁহার জীবন্ত উপদেশে দলে দলে নরনারী তাঁহার শিষ্যদলভুক্ত হইতে লাগিল। গোঁড়া য়িহুদী পুরোহিতগণ ইহাতে প্রমাদ গণিল। তাহাদের জীবিকানির্ব্বাহের পথ বন্ধ হইবার আশঙ্কা হইল। রাজশক্তির সাহায্যে বিচার-বিড়ম্বনায় যীশুর প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল। তাঁহার জীবন্ত দেহ তীক্ষ্ণ লৌহশলাকা দ্বারা ক্রুশকাষ্ঠে বিঁধিয়া শত্রুগণ উপহাস করিতে লাগিল। মাথায় কাঁটার মুকুট, যন্ত্রণায় প্রতিমুহূর্ত্তে প্রাণবায়ু কম্পিত হইতেছে, তৃষ্ণায় বুকের ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে, শত্রুগণ

কেহ তাঁহার মুখে ধূলি, কেহ থুথু নিক্ষেপ করিতেছে। প্রাণভয়ে প্রিয় শিষ্যগণ তাঁহার সহিত সকল সম্বন্ধ অস্বীকার করিয়া দূরে পলায়ন করিয়াছে। কেবল একটী নারী—যিনি যীশুর প্রভাবে পাপ-জীবন হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন—কিছুতেই যীশুকে পরিত্যাগ করেন নাই। ইনি মেরী ম্যাগডালিন। গত চৈত্রের ভারত-মহিলায় ইঁহার প্রতিকৃতি প্রকাশিত হইয়াছে। যীশুর মৃতদেহ ক্রুশ কাষ্ঠ হইতে নামাইবার পরবর্ত্তী অবস্থা বর্ত্তমান চিত্রে কল্পিত হইয়াছে। মৃতদেহের পার্শ্বে মেরী ও স্বর্গের দেবীগণ উপবিষ্ট। এই চিত্রখানি বিখ্যাত শিল্পী র‍্যাফেলের গুরু ফ্রান্সেস্ ফ্রান্সিয়া কর্ত্তৃক পঞ্চদশ শতাব্দীতে অঙ্কিত চিত্রের প্রতিলিপি।

শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী—আমাদের পাঠক-পাঠিকার মধ্যে অনেকেই বোধ হয় জানেন না, যে আমাদের অন্যতম লেখিকা বঙ্গের মহিলা-কবিকুল-গৌরব "অশ্রুকণা"র কবি শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী একজন সুনিপুণ চিত্রশিল্পী। ইংরাজীতে কথা আছে Genius works out its own Salvation অর্থাৎ প্রতিভা কখনও ছাপা থাকে না। গিরীন্দ্রমোহিনীর প্রতিভা তাই কবিতা ছাড়াইয়া শিল্পকলা বিভাগেও স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। বাস্তবিক শিক্ষালাভ না করিয়াও কেবল সহজাত সংস্কার দ্বারা চিত্র-শিল্পের মত একটি দুরূহ বিষয়কে কিরূপ সহজে আয়ত্ত করা যায় ও তাহাতে কিরূপ উৎকর্ষ লাভ সম্ভবপর আমাদের কবির অঙ্কিত চিত্রাবলী তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। বিগত শিল্প-প্রদর্শনীতে মহিলা-বিভাগে ইঁহার দ্বারা চিত্রিত অনেকগুলি তৈল-চিত্র এবং জলের রঙ্গে আঁকা ছবি প্রদর্শিত হইয়াছিল। তাহার অনেক গুলি পাকা চিত্রকরের হাতের বলিয়া ভ্রম হয়। ইঁহার অঙ্কিত মূর্ত্তি-চিত্রগুলি তত সম্পূর্ণ নয় বটে, কিন্তু দৃশ্যচিত্রে (Landscape painting) এ গিরীন্দ্রমোহিনী সিদ্ধহস্ত। এই উপলক্ষে শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের পত্নী আমাদের কবিকে একটি রৌপ্য-পদক উপহার দিয়া নারীসমাজের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন, এবং ইঁহার প্রণীত "শকুন্তলার প্রতি কণ্বের আশীর্ব্বাদ" নামক চিত্রখানি অষ্ট্রেলিয়ার প্রদর্শনীতে পাঠাইয়া বড়লাটপত্নী লেডি মিণ্টো প্রতিভার যথেষ্ট সম্মান করিয়াছেন।

কিন্তু অতৃপ্তিই প্রতিভার মূল মন্ত্র। শ্রীমতী গিরীন্দ্র-মোহিনীর অশিক্ষিত হস্তের চিত্রাবলী দেখিয়া সাধারণে মুগ্ধ হইলেও কবি স্বয়ং তাহাতে তৃপ্তি পাইতেছেন না। তাঁহার নিজের রচিত "চিত্রে" কবিতায় তিনি বলিতেছেন :—

ছন্দে বর্ণে যে মাধুরী পারি না ফুটাতে,
চিরপ্রিয় পল্লী-দৃশ্য ; জলাভূমিপরে,
তুলিকায় সে সুষমা, বর্ণসমাবেশে,
ফুটায়ে তুলিতে চাহি দিনসের শেষে !
দূরে মিশে শ্যামক্ষেত্র আকাশের কোলে,
মৎস্যে ভরি ক্ষুদ্র তরী বেয়ে যায় জেলে ;
গুটায়ে বসন তুলি, পাছে ভেজে নীরে,
শ্রান্ত মুখে গ্রাম্য বধূ গৃহে যায় ফিরে,
সারা দিবসের লজ্জা যত্নে বহি শিরে।
সহস্র-চুম্বন-রাঙ্গা আকাশের শিরে,
রাখি অস্তগামী রবি ধীরে ডুবে নীরে।

তাঁহার "চিত্রাঙ্কণে"ও কবি এক স্থলে লিখিতেছেন :—

অয়ি তন্বী শুচিস্মিতা, হে সুন্দরী অনিন্দিতা,
অয়ি মম আলেখ্য-লিখিতা !
অঙ্গে অঙ্গে স্নেহ-আঁখি, বর্ণ সাথে গেছে মাখি,
অয়ি মম স্বহস্ত-গঠিতা !
বসি মাজি সারাদিন, সদা শ্রান্তি ক্লান্তি হীন,
ঘুরে ফিরে দেখি বার বার !
কেমনে বুঝাব কায়, কি মমতা তারে হায়,
মানসী দুহিতা সে আমার !

আমরা ভারত-মহিলায় এই কবিশিল্পীর চিত্রের প্রতিলিপি প্রকাশিত করিবার অনুমতি পাইয়াছি ও সেগুলি ক্রমশঃ প্রকাশ করিবার আয়োজন করিতেছি। বর্ত্তমান সংখ্যায় কেবল চিত্রানুরতা কবির প্রতিমূর্ত্তি প্রদত্ত হইল।

২১১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্ম মিশন প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত দ্বারা মুদ্রিত।

লালা লাজপত রায়।

> The woman's cause is man's ; they rise or sink
> Together, dwarfed or God-like, bond or free ;
> If she be small, slight-natured, miserable,
> How shall men grow ?
>
> *Tennyson.*

৩য় ভাগ। | জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৪। | ২য় সংখ্যা।

অবরোধ-প্রথা।

আমাদের দেশে প্রায় সর্ব্বত্রই নারীর অবরোধ-প্রথা প্রচলিত আছে। মুসলমানদিগের শাসনের সঙ্গে সঙ্গেই যে এই প্রথার সূত্রপাত হয়, ভারতবর্ষের ইতিহাসে তাহার অনেক প্রমাণ আছে। সুতরাং যেখানে মুসলমানের প্রাদুর্ভাব হয় নাই, সেখানে অদ্যাপি স্ত্রীলোকেরা উন্মুক্ত ভাবে বিচরণ করিয়া থাকেন। মহারাষ্ট্রীয় ও পার্শী রমণীগণ ইহার দৃষ্টান্ত।

অবরোধ-প্রথাকে ভারতবাসীর অভিশাপ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কারণ এই প্রথার দ্বারাই এদেশে স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা এবং তাঁহাদের বিদ্যাচর্চ্চা ক্রমে ক্রমে হ্রাস পাইয়া অবশেষে বিলুপ্তপ্রায় হয়। বিদ্যার অভাবে তাঁহারা সহধর্ম্মিণী হইলেও প্রকৃত পক্ষে জীবনের সঙ্গিনী হইতে পারিলেন না। তাঁহারা পদভ্রষ্ট হইয়া গুরুতর বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিতে অক্ষম হইলেন। গার্হস্থ্য জীবনের নিম্নতম স্তর ভিন্ন আর কিছুই তাঁহাদের অধিকারে রহিল না। তাঁহারা সন্তানের শিক্ষা ও শাসনের ভার গ্রহণ করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম হইলেন। কারণ, যে মাতা নিজেই শিক্ষা লাভ করেন নাই, তিনি কি প্রকারে সন্তানকে সুশাসন করিবেন? তিনি তাহার শুশ্রূষার ভার লইতে সক্ষম, কিন্তু মাতার গুরু-কর্ত্তব্য সন্তান-শাসনে সম্পূর্ণরূপে অক্ষম। পরের ইচ্ছা দমন করিয়া তাহা নিজের ইচ্ছায় পরিণত করার নাম শাসন। শাসন করিতে গেলে সম্পূর্ণরূপে নিজের ইচ্ছা বজায় থাকে না, তাহাও কিঞ্চিৎ পরিমাণে দমন করিতে হয়, নতুবা শাসন অত্যাচারে পরিণত হয়। কি পরিমাণে শাসিতের ইচ্ছা দমন করিতে হইবে ও কি পরিমাণে তাহার স্ফূর্ত্তি অনুমোদন করিতে হইবে, তাহা অশিক্ষিতের বিচার করিবার ক্ষমতা নাই। সুতরাং আমাদের দেশের মাতারা সাধারণতঃ সন্তান শাসন করিতে একেবারে অক্ষম। এমন স্থলও দেখা যায়, যেখানে পিতা বা অন্য কোন অভিভাবক শাসন করিলে, মা, ঠাকুরমা বা পিসীমা রাগ করেন ও সন্তানকে আদর দিয়া নষ্ট করেন। তাঁহাদের মত এই, যে সন্তানেরা অবোধ, তাহাদের ভাল মন্দ জ্ঞান নাই, তাই মিথ্যা কথা কহে বা অবাধ্য হয়, কিন্তু বয়স হইলে যখন জ্ঞান হইবে, তখন এই সকল থাকিবে না। আমাদের দেশে অনেক সন্তান আদরেই নষ্ট হয়। এই দোষটী আমাদের দেশ হইতে দূর হইত, যদি স্ত্রী-শিক্ষার উন্নতি হইত। কিন্তু যে পর্য্যন্ত এই অবরোধ-প্রথা না

উঠিয়া যাইবে, সে পর্য্যন্ত স্ত্রী-শিক্ষারও আশানুরূপ উন্নতি হইবে না। বালিকাদিগের বিবাহ হইলেই তাহারা অবরুদ্ধ হয়। বিবাহের আগে তাহারা যে পর্য্যন্ত নীতি উপদেশ লাভ করে, বিবাহের পরে তাহা স্থগিত অবস্থাতেই থাকে। আপত্তি হইতে পারে যে, নীতি উপদেশ কি শাশুড়ী দিতে পারেন না? সাধারণতঃ পারেন না, কারণ তাঁহার নিজেরই শিক্ষালাভ সম্পূর্ণ হয় নাই, তিনি অন্যকে কি প্রকারে উপদেশ দিবেন? নীতি উপদেশ গ্রহণ করিবার ও বুঝিবার শক্তি বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ে। বিদ্যাশিক্ষা যখন দশ বার বৎসরের মধ্যে শেষ হয়, তখন নৈতিক শিক্ষার উন্নতি কি প্রকারে হইবে? বিবাহের পরও স্ত্রীলোকের বিদ্যাশিক্ষার পক্ষপাতী লোক আমাদের দেশে খুব কমই আছেন।

অবরোধ-প্রথার জন্য আমাদের দেশে স্ত্রীলোকের উচ্চ শিক্ষা অসম্ভব। উচ্চ শিক্ষা উপাধি পরীক্ষা অর্থে এস্থলে ব্যবহৃত হয় নাই। যে শিক্ষা স্ত্রীলোককে কেবল সহধর্ম্মিণী নহে, কিন্তু জীবনের সঙ্গিনী করে, সেই শিক্ষাই এই স্থলে উচ্চ শিক্ষা নামে অভিহিত হইয়াছে। সমকক্ষ না হইলে বন্ধুত্ব হয় না। আমাদের নারীগণ অবরুদ্ধ থাকেন বলিয়া পুরুষের সকল আমোদে যোগ দিতে বা বিষম সমস্যার সময়ে সাহায্য বা সহানুভূতি প্রকাশ করিতে অসমর্থ। যে আমোদে স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়ে যোগ দান না করে, সে আমোদ কখন বিশুদ্ধ ও আনন্দদায়ক হইতে পারে না। তাহার পরিণাম নিশ্চয়ই শোচনীয়। নারীর অজ্ঞানতা ও অনুপযুক্ততা হেতু স্বামীর কোন গুরুতর কার্য্যে নারী মতামত প্রকাশ বা সাহায্য করিতে অক্ষম। জ্ঞান বহুদর্শিতার উপর নির্ভর করে। আবদ্ধ থাকিলে বহুদর্শিতা কিরূপে সম্ভবে? পাশ্চাত্য নারীর বহুদর্শিতা প্রাচ্য নারীর বহুদর্শিতা অপেক্ষা অধিক। আমাদের জ্ঞান প্রায় পুঁথিগত, কিন্তু তাঁহাদের জ্ঞান ব্যবহারিক (practical life) জীবনলব্ধ, আমরা পুস্তক পাঠে যে জ্ঞান লাভ করি, আমাদের অবরোধ-প্রথার জন্য তাহার পূর্ণ মাত্রায় বিকাশ হয় না। ইহার ফল এই যে, কোন বিষয়ে স্বাধীন ভাবে মত প্রকাশ করিতেও আমাদের সাহস হয় না। আমরা নিজের চক্ষেও ঘৃণার্হ এবং পুরুষের চক্ষেও ঘৃণার্হ।

এইখানে আপত্তি হইতে পারে—প্রাচ্য নারীর সংসারে কি শৃঙ্খলা নাই, তিনি কি পাশ্চাত্য মহিলার ন্যায় তাঁহার সাংসারিক বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিতে অক্ষম? শৃঙ্খলা নাই একথা বলিতে পারি না, কিন্তু যে শৃঙ্খলা ও পারিপাট্য পাশ্চাত্য মহিলার সংসারে ও প্রত্যেক কার্য্যে দেখা যায়, তাহা আমাদের গার্হস্থ্য-জীবনে দৃষ্ট হয় না। পাশ্চাত্য নারীর বাড়ী, অন্দর-মহল ও বৈঠকখানা এই দুই ভাগে বিভক্ত নহে। তিনি সর্ব্বত্রই যাইতে পারেন এবং সমস্ত বাড়ীখানাই সুন্দর ও পরিপাটী রাখেন। তাঁহার বাড়ী এই দুই ভাগে বিভক্ত না হইলেও তাঁহার অন্তঃপুরের ও বৈঠকখানার অভাব নাই। বৈঠকখানা তাঁহার বাড়ীর মধ্যেই থাকে এবং তিনি নিজেই তাহার সৌন্দর্য্য ও পারিপাট্যের দিকে দৃষ্টি রাখেন। তাঁহার শয়ন-কক্ষই তাঁহার অন্তঃপুর, সেখানে কাহারও যাইবার অধিকার নাই। আমাদের বৈঠকখানা অশিক্ষিত দাস দাসীর হাতেই থাকে; তাহাদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার জ্ঞান সামান্য। আর নিতান্ত অশিক্ষিত বলিয়া তাহাদের কর্ত্তব্যজ্ঞানও নাই। মনিবের বাড়ী পরিষ্কার রাখা যে তাহাদের কর্ত্তব্য একথা তাহাদের অনেকেরই কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে আসে না। অন্তঃপুরে সকলের যাইবার অধিকার নাই, সুতরাং সেখানে যে রকম অবস্থায় ইচ্ছা সে রকমে থাকা হয়। ভিতর বাটীর উঠান, প্রশংসনীয় অপ্রশংসনীয় সকল রকম ব্যবহারেই আসে। বস্তুতঃ আমাদের অন্দর-মহল থাকা সত্ত্বেও প্রকৃত privacy'র আবরুর) অভাব।

কেহ কেহ আপত্তি করিতে পারেন—পাশ্চাত্য নারী আমাদের আদর্শ নহেন। আমাদের প্রাচীন ভারত-রমণীদের দৃষ্টান্তই অনুকরণীয়; প্রথমে সাবিত্রী, দময়ন্তী এবং সীতা প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয়া রমণীগণ আমাদের আদর্শ। একথা স্বীকার্য্য বটে। কিন্তু বঙ্গ-রমণীগণ কি বাস্তবিক এই প্রাচীন ললনাদের সদৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া থাকেন? আমি একে একে দেখাইতে চাই যে, আমাদের বঙ্গদেশের নারীজীবনের বর্ত্তমান আদর্শ

প্রাচীন ভারতের আদর্শ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ভারতের প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্বেদে এ সম্বন্ধে কিছু আছে কি না দেখা যাউক। ঋগ্বেদে অবরোধ-প্রথার উল্লেখ নাই। তৎকালে নারী স্বাধীন ছিলেন ও বিদ্যাচর্চ্চা করিতেন। সমস্ত সংসারের ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত ছিল, এমন কি, তাঁহার অবিবাহিত দেবর ও ননন্দৃগণ তাঁহার অধীনে ছিল। তিনি সকলকে শাসন করিতেন। তৎকালে বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় স্ত্রী-শিক্ষাকে এত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিতে হইত না। বিশ্ববারা নাম্নী এক নারী বৈদিক গীত রচনা করিতেন। ঋগ্বেদে অবিবাহিতা নারীরও উল্লেখ আছে। অনেক অবিবাহিতা নারী পিতৃগৃহে থাকিয়া বার্দ্ধক্য অবস্থায় উপনীত হইতেন। বিবাহ দিতেই হইবে, এমন কোন নিয়ম ছিল না। তৎকালীন স্ত্রীলোকেরা যজ্ঞে যোগদান করিতেন এবং সর্ব্বতোভাবে সমাজে নিজের প্রভাব বিস্তার করিতেন। তাঁহারা শিক্ষিতা ছিলেন বলিয়াই তাঁহাদের প্রভাব ছিল। আমাদের অবরোধ-প্রথার জন্য ও জ্ঞান-পিপাসার অভাবে আমাদের এই দুর্দ্দশা। বৈদিক নারী আমাদের আদর্শ হইলে অবরোধ-প্রথাকে জলাঞ্জলি দেওয়া উচিত, এবং স্ত্রী-শিক্ষা অবলম্বন করা উচিত।

যে সময়ে মহাভারত এবং রামায়ণ মহাকাব্য রচিত হয় (Epic period), তখন নারীরা প্রকাশ্যে সভায় যোগদান করিতেন, এবং স্বাধীন ছিলেন। পাশ্চাত্য মহিলার ন্যায় সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন না হইলেও তাঁহাদিগের মধ্যে অবরোধপ্রথা ছিল না। বৃহদারণ্যক উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য ও মৈত্রেয়ীর কথোপকথনই তাহার দৃষ্টান্ত। এই সময়ে বালিকা-বিবাহ প্রচলিত ছিল না। স্বয়ম্বরে সীতা ও দময়ন্তীর ন্যায় যুবতীরা বর বরণ করিতেন।

দময়ন্তী প্রাচীন ভারতের এক জন আদর্শ রমণী; আমরা সকলেই তাঁহার প্রশংসা করিয়া থাকি, কিন্তু বঙ্গললনাগণ কি সকল বিষয়ে তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুসরণ করেন? তিনি যদিও রাজকন্যা ছিলেন, তথাপি সখিগণ সমাবৃত হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেন। নল যখন হঠাৎ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, তখন তিনি এবং তাঁহার সখিগণ দৌড়িয়া পলায়ন করেন নাই; পরন্তু নৈষধরাজের রূপে মুগ্ধ হইয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেনঃ—

> কস্ত্বং সর্ব্বানবদ্যাঙ্গ মম হৃচ্ছয় বর্দ্ধনঃ।
> প্রাপ্তোহস্যমরবদ্বীর জ্ঞাতুমিচ্ছামি তেহনঘ॥

আমার হৃদয়ানন্দ-বর্দ্ধক মনোহর দেহধারী অমরবৎবীর আপনি কে, আমি জানিতে ইচ্ছা করি।

তাহার পরে দেখিতে পাওয়া যায়, তিনি পতির সঙ্গে বনে বনে গমন করিয়াছিলেন। পতিকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইলে পর অনেক অপরিচিত পুরুষের দলে মিশিয়াছিলেন এবং তৎপরে চেদীরাজের গৃহে উপস্থিত হইয়াছিলেন। দময়ন্তীর দৃষ্টান্ত হইতে হইতে আমরা কি এই শিক্ষা পাইতে পারি না, যে রমণী যদি ধর্ম্মরূপ বর্ম্মদ্বারা সজ্জিত হন, তাহা হইলে কেহই তাঁহার অনিষ্ট করিতে পারে না। ধর্ম্মই রমণীর প্রধান সহায়।

যে সময়ে আমাদের দেশে বৌদ্ধ মত অত্যন্ত প্রবল হইয়াছিল, সেই সময়েও আমাদের দেশে অবরোধ-প্রথা ছিল না। স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে অনেকেই সন্ন্যাসিনী হইয়াছিলেন। ইঁহারা বর্ত্তমান কালের বৈষ্ণবীদিগের ন্যায় ছিলেন না। ইঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই সম্ভ্রান্তবংশীয়া ছিলেন। বুদ্ধদেবের বিমাতাও সন্ন্যাস-ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন।

মনুর শাস্ত্রে অবরোধ প্রথার উল্লেখ নাই। স্ত্রীলোককে সম্মান করিবার উপদেশই আছে। পৌরাণিক সময়ে অন্তঃপুর স্বতন্ত্র থাকিলেও বর্ত্তমানকালের অবরোধ-প্রথা সে সময়ে ছিল না। শকুন্তলা দুষ্মন্তকে দেখিয়া পলায়ন করেন নাই। তাঁহার সহিত আলাপ করিয়াছিলেন। মলয়াবতী যদি বর্ত্তমান কালের মহিলা হইতেন, তাহা হইলে তিনি জীমূতবাহনকে দেখিবামাত্র পলায়ন করিতেন। মালতী জনতার মধ্যে হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া মন্দিরে গিয়াছিলেন, এবং সেখানে তাঁহার বরের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। বর্ত্তমান কালে কোন মহিলা হস্তী আরোহণ করিতে সাহস করিবেন কি? গাড়ী খুলিয়া যদি জনতার ভিতর দিয়া যান, তাহা হইলে যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে মনে করিতে হইবে।

কথা-সরিৎসাগর পাঠে দেখিতে পাওয়া যায় যে, কাত্যায়ণের মাতা তাঁহার বিদেশীয় অতিথির সঙ্গে আলাপ করিয়াছিলেন। আমাদের অতিথি আসিলে কি আমরা নিজে তাঁহার সহিত আলাপ করি ও তাঁহার সেবা করি? আমরা চাকরের হাতে খাবার পাঠাইয়া দেওয়াই যথেষ্ট মনে করি।

বর্ষের স্ত্রীও অপরিচিত অতিথিদিগের অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। মৃচ্ছকটিক নাটকে দেখিতে পাওয়া যায় যে চারুদত্তের স্ত্রী তাঁহার স্বামীর বন্ধু মৈত্রেয়ের সহিত আলাপ করিয়াছিলেন। এই নাটকে তৎকালীন হিন্দু-সমাজের সুন্দর চিত্র পাওয়া যায়। তৎকালে এখনকার বঙ্গদেশের ন্যায় অবরোধ-প্রথা ছিল না। নাগানন্দ এবং রত্নাবলী নাটকেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, নায়িকাগণ তাঁহাদের স্বামীর বন্ধুদের সহিত অসংকোচে কথাবার্ত্তা কহিতেন। অতএব ইহা নিশ্চয় বলা যায় যে, প্রাচীন হিন্দু-সমাজে বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় অবরোধ-প্রথা ছিল না। আধুনিক হিন্দু-মহিলারা মুখে সীতা ও দময়ন্তীর শত প্রশংসা করিয়া থাকেন, কিন্তু কার্য্যে তাঁহাদের অনুকরণ করিতে চাহেন না।

মুসলমানেরা যখন ভারত অধিকার করিলেন, তখনি অবরোধ প্রথার আবির্ভাব হইল। তাঁহারা সুন্দরী মহিলা দেখিলেই তাঁহাকে নিজের অন্তঃপুরে লইয়া যাইতেন; সুতরাং সকলেই নিজের পরিবারস্থ স্ত্রীলোকদিগকে অবরুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। অবরোধ-প্রথার সঙ্গে সঙ্গে অবনতির অবতারণা হইল। ভারত-নারীদিগের বিদ্যাচর্চ্চা ও উন্নত ধর্ম্ম-জ্ঞান লুপ্ত হইল, এবং তাহার পরিবর্ত্তে কুসংস্কার তাঁহাদিগের মন অধিকার করিল। যে যে স্থলে মুসলমান আধিপত্য স্থাপিত হয় নাই সেই সেই স্থলের স্ত্রীলোকেরা স্বাধীন থাকিয়া আপনাদিগের উন্নতি সাধনে নিযুক্ত থাকিলেন। উত্তর ভারত মুসলমানের অধিকারে ছিল বলিয়া এই অঞ্চলে অবরোধ-প্রথা এত প্রবল। বোম্বাই বা মান্দ্রাজে মুসলমানের আধিপত্য কখন স্থায়ীরূপে স্থাপিত হয় নাই বলিয়া অদ্যাপি তথাকার স্ত্রীলোকেরা স্বাধীন। তাঁহারা অতিথি আসিলে স্বয়ং তাঁহার সেবা করেন এবং সমাজে সকলের সহিত আলাপ করিয়া সমাজকে বিশুদ্ধ ও উন্নত করেন।

আমাদের দেশের প্রাচীন শাস্ত্র হইতে দেখাইয়াছি যে, পুরাকালে বর্ত্তমান কালের ন্যায় অবরোধ-প্রথা প্রচলিত ছিল না। অনেকে যুক্তিতর্কে কর্ণপাত করেন না, কিন্তু শাস্ত্রের কথা বলিলে মানেন; তজ্জন্য শাস্ত্র ও প্রাচীন সাহিত্যের কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলাম। এখন আমি দেখাইতে চাই যে, কোন রকম ভাল যুক্তি দ্বারা অবরোধ-প্রথা সমর্থন করা যায় না।

এই প্রথার সমর্থনকারীরা বলিয়া থাকেন যে, স্ত্রীলোককে যদি স্বাধীনতা দেওয়া যায়, তাহা হইলে তাহারা সহজেই কুপথে যাইবে, অতএব তাহাদিগকে কোন রকম অসৎকার্য্যের সুযোগ দেওয়া উচিত নহে। সর্ব্বদা তাঁহাদিগকে অন্দর মহলে আবদ্ধ রাখা উচিত। কিন্তু এই মত নিতান্তই ভ্রান্তিপূর্ণ। যখনই স্ত্রীলোকদিগকে সৎশিক্ষা দেওয়া হয়, তখনি দেখা যায় যে, তাহারা সকল বিষয়ে আদর্শস্বরূপ হন। পরন্তু নারীজাতিকে অজ্ঞানান্ধকারে রাখিলে, তাঁহারা পঠনাদি ভাল কার্য্যে সময় কাটাইতে পারেন না বলিয়া অনেক অশ্লীল কথোপকথন করিয়া থাকেন। বাক্যগত অশ্লীলতা ক্রমশঃ কুকার্য্যে পরিণত হওয়া নিতান্ত স্বাভাবিক। সুশিক্ষিত স্বাধীন রমণী কুপথে যায়, এই মত দৃষ্টান্ত দ্বারা সমর্থন করা অসম্ভব। পরন্তু নারীগণ স্বাধীনভাবে সকলের সঙ্গে মিশিলে পুরুষদের আলাপ এবং চরিত্র বিশুদ্ধ হয়, তাহা অনেকেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া থাকেন। যাঁহারা ইংলণ্ডের সমাজ দেখিয়াছেন, এমন অনেক ভারতবাসী একথার সাক্ষ্য দিয়া থাকেন। *

---

* মাননীয়া লেখিকার উক্তির সমর্থন জন্য সর্ব্বজনসম্মানিত মহাত্মা বিবেকানন্দ আমেরিকার মহিলাদিগের সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, এস্থলে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। ভাঃ মঃ সঃ।

"এদেশের স্ত্রীদের মত স্ত্রী কোথাও দেখি নাই। সৎপুরুষ আমাদের দেশেও অনেক, কিন্তু এদেশের মেয়েদের মত মেয়ে বড়ই কম। * * এ দেশের তুষার যেমন ধবল, তেমনি হাজার হাজার মেয়ে দেখেছি। আর এরা কেমন স্বাধীন। সকল কার্য্য এরাই করে।

আবার হিন্দুশাস্ত্র হইতে কিছু বলি; কেননা শাস্ত্রের দোহাই এদেশে খুবই দেওয়া হয়। পূর্ব্বকালে স্ত্রীলোক ও পুরুষ একসঙ্গে গুরুগৃহে শাস্ত্রাধ্যয়ন করিতেন। পদ্মাবতী নগরীর রাজমন্ত্রী ভূরিবসু এবং বিদর্ভরাজমন্ত্রী দেবরাত ব্রাহ্মণ ছিলেন, কিন্তু কামন্দকী, সৌদামিনী প্রভৃতি বৌদ্ধ-মহিলাগণের সঙ্গে একত্র এক অধ্যাপকের নিকট অধ্যয়ন করিতেন। কামন্দকী লবঙ্গিকা নাম্নী সখীকে বলিতেছেন ঃ—

অয়ি! কিং ন বেৎসি, যদেকত্র নো বিদ্যাপরিগ্রহায় নানাদিগন্তবাসিনাং সাহচর্য্যমাসীৎ? তদৈব চ অস্মৎ-সৌদামিনীসমক্ষং অনযোর্ভূরিবসুদেবরাতয়োঃ বৃত্তেয়ং প্রতিজ্ঞা অবশ্যমাবাভ্যামপত্যসম্বন্ধঃ কর্ত্তব্য ইতি।”

ভবভূতিপ্রণীত উত্তর-রাম-চরিত নাটকেও এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়। মহাভারতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সুলভা নাম্নী এক ব্রহ্মচারিণী মহারাজ জনকের পণ্ডিতমণ্ডলী-সমলঙ্কৃত সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি জনকের প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন ঃ—

সাহং তস্মিন্ কুলে জাতা ভর্ত্তর্য্যসতি মদ্বিধে
বিনীতা মোক্ষধর্ম্মেষু চরাম্যেকা মুনিব্রতম্॥

“আমি সেই উচ্চ রাজন্যকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত পরিসমাপ্তির পর আমি পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলাম, কিন্তু আমার উপযুক্ত বিদ্যা বুদ্ধি ও মেধাদিসদ্গুণসম্পন্ন পাত্র না পাওয়াতে আমি সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণপূর্ব্বক কৈবল্য-ব্রত অবলম্বন এবং মুনিধর্ম্ম প্রতিপালন করিতেছি।” (“ভারত-মহিলায়” “প্রাচীন ভারতে স্ত্রীশিক্ষা” সম্বন্ধে পণ্ডিত হরিদেব শাস্ত্রী-লিখিত প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত।)

কিন্তু কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, পারিবারিক জীবনই স্ত্রীলোকের প্রধান কর্ত্তব্য। অতএব সমাজে স্বাধীনভাবে মিশিতে পারিলে স্ত্রীলোক গৃহকার্য্যে অবহেলা করিবে। এ কথার উত্তরে এই বলিতে চাই যে, সুশিক্ষা পাইলে স্ত্রীলোক কখন আপন কর্ত্তব্য কার্য্যে অনাবিষ্ট হয় না। মহারাষ্ট্রীয়, মান্দ্রাজী এবং পার্শী রমণীগণের মধ্যে অবরোধ-প্রথা নাই, অথচ তাঁহারা গৃহকার্য্যে অনাবিষ্ট, এরূপ কথা কেহ বলিতে পারিবেন না।

কেহ কেহ বলেন, স্ত্রীলোক শিক্ষিত ও স্বাধীন হইলে সৌখীন হয়, তখন আর গৃহ-কর্ম্ম করিতে চাহে না। তাহারা স্বামীর বশীভূত হইয়া থাকিতে চাহে না; তাহাদের অভিপ্রায় যে, স্বামী তাহাদের বশে থাকিবে। সুতরাং উভয়ের মধ্যে বিবাদ হয় এবং অবশেষে স্ত্রী, স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়।

ইহার উত্তরে এই বলি, যে অশিক্ষিত ও অবরুদ্ধ স্ত্রী কি কখন সৌখীন হয় না? তাহারা কি পাউডার ইত্যাদি ব্যবহার করে না, বা গালে রং দেয় না? গালে রং অবরুদ্ধ স্ত্রীলোকেরাই বেশী দিয়া থাকে। তাহাদেরই কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞান থাকে না, সুতরাং তাহাদের অনেকে শরীর-সেবায় পতি ও গুরুজন-সেবা ভুলিয়া যায়। তাহাদের মনই গৃহকর্ম্ম হইতে উঠিয়া যায়। সুশিক্ষিতা

স্কুল কলেজ মেয়েতে ভরা। আমাদের পোড়া দেশে মেয়ে ছেলের পথ চল্‌বার যো নাই। আর এদের কত দয়া! যতদিন এখানে এসেছি, এদের মেয়েরা বাড়ীতে স্থান দিতেছে, খেতে দিচ্ছে, লেকচার দিবার সব বন্দোবস্ত করে, সঙ্গে করে সব বাজারে নিয়ে যায়, কি না করে বলিতে পারি না। শত শত জন্ম এদের সেবা করিলেও এদের ঋণ মুক্ত হব না। বাবাজি, শাক্ত শব্দের অর্থ জান? শাক্ত মানে মদ ভাঙ্গ নয়, শাক্ত মানে যিনি ঈশ্বরকে সমস্ত জগতে বিরাজিত মহাশক্তি বলে জানেন, এবং সমগ্র স্ত্রীজাতিতে সেই মহাশক্তির বিকাশ দেখেন। এরা তাই দেখে। এবং মনু মহারাজ বলিয়াছেন যে, “যত্র নার্য্যস্তু নন্দ্যন্তে নন্দন্তে তত্র দেবতাঃ” যেখানে স্ত্রীলোকেরা সুখী, সেই পরিবারের উপর ঈশ্বরের মহা কৃপা। এরা তাই করে। আর এরা তাই সুখী, বিদ্বান স্বাধীন ও উদ্যোগী। আর আমরা স্ত্রীলোককে নীচ, অধম, মহা-হেয়, অপবিত্র বলি। তার ফল আমরা পশু, দাস, উদ্যমহীন, দরিদ্র। * * *

আর এদের মেয়েরা কি পবিত্র! ২৫ বৎসর ৩০ বৎসরের কমে কারুর বিবাহ হয় না। আর আকাশের পক্ষীর ন্যায় স্বাধীন, বাজার হাট, রোজকার, দোকান কলেজ, প্রোফেসর সব কাজ করে, অথচ কি পবিত্র! যাদের পয়সা আছে, তারা দিন রাত্র গরীবদের উপকারে ব্যস্ত। আর আমরা কি করি? আমার মেয়ের ১১ বৎসরে বে না হলে খারাপ হয়ে যাবে! আমরা কি মানুষ, বাবাজী? মনু বলেছেন,— কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ—ছেলেদের যেমন ৩০ বৎসর পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য করে বিদ্যাশিক্ষা হবে, তেমনি মেয়েদেরও করিতে হইবে। কিন্তু আমরা কি করছি? তোমাদের মেয়েদের উন্নত করিতে পার? তবে আশা আছে। নতুবা পশুজন্ম ঘুচিবে না।”

স্বামী বিবেকানন্দের পত্রাবলী।

স্ত্রী তাঁহার কর্ত্তব্য ভালরূপে বুঝিতে পারেন ও মিথ্যা সাজ সজ্জায় সময় নষ্ট করেন না। তাঁহারা কখন স্বামীকে অবজ্ঞা করেন না, কিন্তু তাঁহার কথানুসারে চলেন।

মাতা শিক্ষিত হইলে সন্তানেরা সুশাসিত হয়, তাহারা শৈশবকালেই অশ্লীল কথা শুনিতে পায় না। মাতা অশিক্ষিত হইলে সন্তানের সম্মুখে সকল রকম আলাপ করিয়া থাকেন। পার্শিদিগের মধ্যে অবরোধ-প্রথা নাই এবং বাল্য-বিবাহও নাই। তাঁহারা কি স্বামীর বশীভূত নহেন বা তাঁহাদের সমস্ত সময় কি সাজ সজ্জায় কাটান? তাঁহারা স্বাধীনভাবে পুরুষদিগের সঙ্গে মিশিয়া থাকেন, অথচ তাঁহাদের লজ্জাশীলতা পূর্ণমাত্রায় বিকাশ পায়। যে পুরুষ স্ত্রীকে সন্দেহের চক্ষে দেখেন, তিনি প্রকৃতপক্ষে আপনাকেই সন্দেহ করেন। তিনি নিশ্চয় অপরিচিত স্ত্রীলোকের সম্মান রক্ষার জন্য যত্নবান্ হন না। পরস্ত্রীকে মাতৃতুল্য মনে করিলে কোন দিকেই ভয় থাকে না। উভয়ে অসংকোচে সমাজে মিশিতে পারেন, এবং সম্মিলিত ভাবে সমাজের শ্রীবৃদ্ধি করিতে পারেন।

আমাদের স্ত্রীলোকেরা এত অশিক্ষিত যে, অনেক সময়ে তাঁহারা তাঁহাদের অজ্ঞানতাবশতঃ সন্তানের সর্ব্বনাশ করিয়া থাকেন। অথচ অবরোধ-প্রথা যতদিন থাকিবে, ততদিন নারীজাতির সুশিক্ষার আশা নাই। নারীজাতির সুশিক্ষা না হইলে পুরুষের উন্নতি এবং জাতীয় উন্নতি অসম্ভব। কবিবর Tennyson বলিয়াছেন :—

"The woman's cause is man's: they rise or sink

Together, dwarfed or Godlike; bond or free;

If she be small, slight-natured, miserable, How shall men grow?

নরনারীর কল্যাণ এক, তাহারা একসঙ্গে উন্নতি-সোপানে আরোহণ করে, একসঙ্গে অধোগতির পথে ধাবমান হয়। একসঙ্গে তাহারা বামন সদৃশ ক্ষুদ্র, দেবতা সদৃশ উন্নত, পরাধীন বা স্বাধীন হয়। অতএব যদি নারী অনুন্নত, ক্ষুদ্র-হৃদয় এবং কুসংস্কারপাশে বদ্ধ হয়, তবে পুরুষের উন্নতি কি প্রকারে হইতে পারে?*

শ্রীরাজকুমারী দাস।

মোহিনী।

(রবিবর্ম্মার অঙ্কিত মোহিনীর চিত্র দর্শনে)

কাহার?—কাহার হৃদয় সরে তুমি নলিনী?
ফুটেছ গরব ভরে, কার হৃদি আলো ক'রে,
মধুর সুগন্ধ ভরা মনোহারিণী?

কাহার জীবন-কূলে তুমি তটিনী?
তুলি কুলু কুলু তান, গাহ প্রণয়ের গান,
সুখের তরঙ্গে খেলি' দিবা রজনী?

কাহার হৃদয়-নদে তুমি তরণী?
ঢেউ লাগি ধীরে ধীরে, নাচিছ লহর 'পরে,
কাহার জীবন পারে তুমি পারনী?

কাহার হৃদয়-বনে তুমি শিখিনী?
নিয়াছ আসিয়া বাসা, লভি কার ভালবাসা,
নাচিছ ছড়ায়ে পাখা, ওগো নাচনি?

কাহার হৃদয় জালে তুমি হরিণী?
আসিয়া দিয়াছ ধরা, মুনি জন-মনোহরা,
লইয়া নয়ন দু'টী তুমি আপনি?

কার হৃদি-উপবনে তুমি কামিনী?
ছড়ায়ে সুরভি সার হাসিতেছ অনিবার,
মোহিয়া সুবাসে হৃদি, ওগো মোহিনি?

কাহার আঁধার হৃদে তুমি দামিনী?
প্রকাশি বিমল জ্যোতিঃ, অন্ধকার নাশি সতি,
খেল হৃদি-নীলিমায়, তমো-নাশিনী?

কোন হৃদি-শশধরে তুমি রোহিনী?
পরিয়া তারকা মালা, কার বক্ষে শোভ বালা,
কোন্ পূর্ণিমার রাতে তুমি চাঁদিনী?

শ্রীমৃণ্ময়ী দেবী।

---

* মহিলা-সমিতিতে পঠিত।

অজপা ব্রহ্মচারিণী ও হকহকী মাতা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

উভয়ে মন্দিরের বাহিরে আগমন করিবার পরে বিলাসিনী জানিতে পারিলেন, এই সাধু পুরুষ নহেন, ইনি স্ত্রীলোক। পুরুষের বেশে ইনি পরিব্রজন করিয়া থাকেন। তদনন্তর আরও যাহা শ্রবণ করিলেন ও জানিতে পারিলেন তাহাতে আরও বিস্মিতা হইলেন। জানিলেন, মুসলমান পিতার ঔরসে ও মুসলমানী মাতার গর্ভে এই সাধ্বীর জন্ম; আদি নাম বা জন্মস্থান কেহই অবগত নহে। ইনি মুসলমান শাস্ত্রে যেমন পণ্ডিতা, হিন্দুশাস্ত্রেও সেইরূপ পারদর্শিনী। যে কোন ধর্ম্মশাস্ত্র তাঁহার নিকটে লইয়া যাও তিনি জলের ন্যায় তাহা ব্যাখা করিয়া ও বুঝাইয়া দিতে পারেন। তাঁহার জাতিভেদ নাই, তিনি হিন্দু ও মুসলমানের অন্ন গ্রহণ করেন, এবং উভয়কে তুল্যভাবে ভালবাসিয়া উভয়ের সংসর্গকে সুখকর জ্ঞান করেন। তিনি কখনও মন্দিরে, কখনও বা মসজিদে বসেন; ভেদাভেদ জ্ঞান নাই। তাঁহার প্রকৃত ধর্ম্মমত কেহ জানে না। সদাই তিনি আনন্দে মগ্ন এবং সদাই ভগবৎ ধ্যানে অনুরক্তা। দেহের সৌন্দর্য্য যেমন, চরিত্রও ঠিক তেমন। স্বভাবে, ব্যবহারে ও কথোপকথনে তিনি দেবী-তুল্যা। অতীব গোঁড়া হিন্দুরাও তাঁহার পদ-ধুলিকে পবিত্র জ্ঞান করেন এবং সেবা করিয়া কৃতার্থ হয়েন। তিনি অধিক কথা কহেন না, যাহা কিছু কহেন তাহা ধর্ম্মতত্ত্ব ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই সাধ্বীর বয়স কেহ জানে না, কিন্তু যতই বৎসর বিগত হইতেছে ততই যেন চ্যবন মুনির ন্যায় যৌবন ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার দেবশরীরকে তপ্তকাঞ্চনবৎ জ্যোতির্ম্ময় করিয়া তুলিতেছে। মধ্যে মধ্যে হক্‌হক্ বলিয়া চীৎকার করেন, এই জন্য লোকে তাঁহাকে হক্‌হকী মাতা বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকে। পারস্য ভাষায় হক্ শব্দে ভগবানকে বুঝায়। সংস্কৃত সচ্চিদানন্দ শব্দের অন্তর্গত সৎশব্দের ইহাই অর্থ। অর্থাৎ নিত্য স্থায়ী, অমর, অনবদ্য, অক্ষয় সত্য—Truth.

লোকে হক্‌হকী মাতাকে বাক্‌সিদ্ধা বলিয়া জানে, তাঁহার শ্রীমুখ হইতে যাহা কিছু বাণী নিঃসৃতা হয় তাহা মিথ্যা হয় না, জলন্ত সত্য বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে। তিনি মহা তপস্বিনী এবং অসাধারণ আধ্যাত্মিক সামর্থ্যে অলৌকিক ক্রিয়া সম্পাদন করেন। যাহা হউক, বিলাসিনী দেবী ইঁহার শিষ্যা হইলেন। এখন হইতে বিলাসিনীর নাম "অজপা ব্রহ্মচারিণী" হইল। গুর্ব্বী তাঁহাকে এই নাম দীক্ষার সময়ে দান করিলেন। হক্-হকী মাতা কহিয়া দিলেন, "বাছা! আমি তোমার উপদেশিকা মাত্র; তোমার প্রকৃত গুরু শ্রীভগবান।"

উভয়ে ব্রহ্মগুণ গান করিতে করিতে পরমানন্দে পঞ্জাব প্রান্তে নওসারা (Nowshera) নামক স্থানে উপনীত হইলেন। অনেক স্থান পরিব্রজন করিয়া এক নদীতটে তাঁহারা এক সমাধিক্ষেত্রে উপবেশন করিলেন। ঐ স্থানে বহুসংখ্যক মুসলমান ফকির (সাধু) মহাত্মার সমাধি হইয়াছিল। অদূরে অনেক হিন্দু মহাপুরুষের মৃতদেহের শ্মশান ছিল। এই উভয় স্থানের মধ্যে, এই তীব্র বৈরাগ্য-ময় স্থানের সন্ধিস্থানে, কতকগুলি মনোহর বটবৃক্ষ ছিল, তাঁহারা তরুতলে উপবেশন করিয়া কিছু দিবস তথায় অধিবাসপূর্ব্বক ভগবৎ ধ্যানে মগ্না থাকিবেন এইরূপ সঙ্কল্প স্থির করিলেন। ঐ সময়ে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট একটি সেনানিবাস (cantonment) স্থাপনের জন্য চেষ্টা করিতে-ছিলেন, তাঁহারা ঐ সমাধি ও শ্মশানক্ষেত্রের উপরে গোরা সেনার গৃহ নির্ম্মাণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। দুই সাধ্বী অনেক নিষেধ করিলেন, কেহ তাহাতে কর্ণপাত করিল না। অবশেষে হক্‌হকী মাতা কহিলেন, "এখানে গৃহ নির্ম্মিত হইলে সেই গৃহ ভূমিসাৎ হইয়া যাইবে। যে কেহ গৃহ নির্ম্মাণ করিতে আসিবে, যে কেহ এই কার্য্যে সহায় হইবে, তাহাদের কেহই জীবিত থাকিবে না," ইত্যাদি। পাঠক পাঠিকারা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন, ঐ গৃহ এবং সেনানিবাস ও ঐ গৃহ নির্ম্মাণের সাহায্যদাতা সৈনিকপুরুষগণ একে একে ভূমিসাৎ হইয়া গিয়াছিলেন। অতি সামান্য সময় মধ্যে এই অদ্ভুত ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল। আমি অনেক বর্ষ পূর্ব্বে প্রথমে এই কথা পঞ্জাবের অন্তর্গত লুধিয়ানা নগরীর

সুবিখ্যাত উকিল এবং ফরিদকোট রাজ্যের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী আমার বন্ধু শ্রীল শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুর বরদাপ্রসাদ লাহিড়ী মহাশয়ের মুখে শ্রবণ করিয়াছিলাম। তদনন্তর ইহা আলাহাবাদের ভুবনবিখ্যাত পাইয়নিয়র পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ইংলিশম্যান সমাচার-পত্র কার্য্যালয় হইতে প্রতি রবিবারে "জর্ণাল" নামে যে পত্র বাহির হয়, কয়েক মাস পূর্ব্বে এই ঘটনার বিবরণ তাহাতে পুনরায় প্রকাশিত হইয়াছিল। যাঁহাদের "জর্ণাল" (Journal) পত্র দেখিবার অসুবিধা হয় তাঁহারা ইণ্ডিয়ান মিরর পত্রের ১৯০৭ অব্দের ১৫ই মার্চ্চ তারিখের ক্রোড়পত্রে The curse of the Fakir প্রবন্ধ পাঠ করিতে পারেন। পঞ্জাব প্রদেশের বহুস্থানে এই কাহিনী এখনও শুনা যায়। জর্ণাল পত্রে জনৈক ইউরোপীয় সৈনিক-কর্ম্মচারী যাহা লিখিয়াছেন তাহার অনুবাদ এ স্থলে উদ্ধৃত করিলাম। তিনি লিখিয়াছেনঃ—

"আমি ঐ ঘটনার সমসাময়িক সৈনিক-কর্ম্মচারী। এখন বয়সে বৃদ্ধ ও পেন্সনপ্রাপ্ত। ঐ ফকির স্ত্রীলোক ছিলেন, পুরুষ-বেশ ধারণ করিয়া ভ্রমণ করিতেন বলিয়া অনেকে ইঁহাকে পুরুষ বলিয়া ভ্রম করিত। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে তৃতীয় সংখ্যক বেঙ্গল কাভালরী সেনা যখন নওসারা ময়দানে পৌঁছে, আমি তখন পেশোয়ারে কাপ্তেন ছিলাম। পঞ্চম সংখ্যক সেনার অধ্যক্ষ কাপ্তেন এন্‌ডার্শন সর্ব্বপ্রথমে নওসারায় সেনা-নিবাস নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করেন এবং সাধুদের বাক্য উপেক্ষা করেন। ইনি "পোলো" খেলিতে খেলিতে আহত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কাপ্তেন উইলিয়ম সাহেব হরিণ শিকার করিতে গিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন। ডাক্তার পামার সাহেব নদীবক্ষে তরণী ডুবিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। ইঞ্জিনীয়ার বোট্‌লিংটন সাহেব ব্যাঘ্র-মুখে পতিত হইয়া ভবলীলা সম্বরণ করেন এবং ঝড় ও বন্যায় ঐ সেনানিবাস ও গৃহাদি ভূমিসাৎ হয়। এই সকল ঘটনা সাধুদিগের অভিশাপের অল্প দিন মধ্যে সংঘটিত হইয়াছিল।" ইত্যাদি।

অতঃপর নওসারা পরিত্যাগ পূর্ব্বক নানা দেশ পরিভ্রমণ করিয়া তাঁহারা রাজপুতানার আরাবল্লী পর্ব্বত-মালাভিমুখে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। একটা সুবৃহৎ প্রাচীন গুহামধ্যে প্রবেশ করা তাঁহাদের অভীষ্ট ছিল। অন্ধকার রাত্রি—অমাবস্যা রজনী—গুহার দ্বারে একটা ভয়ঙ্কর অজাগর সর্প ও তাহার শিশুকে ক্রীড়া করিতে দেখিয়া তাঁহারা অনতিদূরস্থ একটা তরুতলে উপবেশন করিলেন। অন্যমনস্কা হইয়া সর্পদের ক্রীড়া দেখিতেছেন এমন সময়ে এক ব্যক্তির হস্ত হকৃহকী মাতার পৃষ্ঠ এবং আর এক ব্যক্তির হস্ত অজপা ব্রহ্মচারিণীর পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করিল। মুখ ফিরাইয়া দেখিতে না দেখিতে এক ব্যক্তি হকৃহকী মাতাকে এবং আর এক ব্যক্তি ব্রহ্মচারিণীকে বগলে তুলিয়া চলিতে লাগিল। তাহারা কে এবং কেন লইয়া যাইতেছে অথবা কোথায় লইয়া যাইতেছে, ইঁহারা তাহার কিছুই জানিলেন না। যাহারা ইহাদিগকে বহন করিয়া গোপনে পলাইতেছিল, তাহারা পথিমধ্যে মধ্যে মধ্যে কহিতেছিল "তোমরা যদি চীৎকার বা উৎপাত কর তাহা হইলে তোমাদের গলা কাটিয়া ফেলিব।" (ক্রমশঃ)

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

সাহিত্যে প্রেম ও ধর্ম্ম।

অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায় যে কোনও প্রবল ধর্ম্ম বা সমাজ সম্বন্ধীয় আন্দোলনের মধ্যে এক একটা সাহিত্যের জন্ম হইয়া থাকে। স্থূল দৃষ্টিতে কথাটা একটু অসম্ভব বা অপ্রাকৃত মনে হইতে পারে কিন্তু ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে আমরা সহজেই ইহার সাক্ষ্য পাই। আমাদের মধ্যে অনেকেই বাংলা এবং ইংরাজী ভাষাভিজ্ঞ। সুতরাং অন্য ভাষার ইতিহাস আলোচনা করিবার পূর্ব্বে আমরা এই দুইটী ভাষার প্রাথমিক ইতিহাস পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারি।

যাঁহারা ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাস পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা অবশ্যই জানেন, যে ইংলণ্ডের আদিম অবস্থায় অর্থাৎ যখন ইংলণ্ডবাসীগণ প্রকৃতি এবং প্রতিমার উপাসক ছিল এবং ড্রুইড্‌দিগের শাসনাধীনে থাকিয়া

নানাপ্রকার অদ্ভুত ক্রিয়া কলাপের মধ্যে নির্জ্জীব ভাবে জীবন যাপন করিতেছিল সে সময় ইংরাজী ভাষার জন্ম হয় নাই বলিলেও হয়। শুধু কতকগুলি অনুপ্রাসবহুল ও ছন্দোহীন কবিতা বা ছড়া প্রচলিত ছিল। কিন্তু যেই নির্জ্জীব ও পৌত্তলিক বৃটনদিগের মধ্যে খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রভাব ও তজ্জাত আন্দোলনের স্রোত প্রবাহিত হইল অমনি এক নূতন ভাষার সৃষ্টি হইল। সেই আন্দোলনে নিদ্রিত মানব জাগিয়া উঠিল এবং চিন্তাবিহীন, সংগ্রাম-বিহীন মানবের মনে নূতন চিন্তার তরঙ্গ ও ধর্ম্মের সংগ্রাম আনিয়া দিল। ঐ যে চিন্তা আসিল, ঐ চিন্তার একটা বহির্মুখীন গতি আছে, সেই গতির অব্যবহিত ফল সাহিত্যের জন্ম। ইংলণ্ডের এই সময়ের ইতিহাসে আমরা প্রধানতঃ বিড্ (Bede) ও সিড্মনের (Caedmon) নাম দেখিতে পাই।

ইংরাজী ভাষার জন্মের বহু শত বৎসর পরে বাংলা ভাষার জন্ম হইয়াছে। অধিক কি, বাংলা সাহিত্যের বয়ঃক্রম শতাব্দী মাত্র বলিলে অন্যায় হইবে না। যে কোন অশীতিপর বৃদ্ধ মোটামুটি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বলিতে পারেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।* যাহা হউক এই শিশু সাহিত্যের জন্মবৃত্তান্ত আলোচনা করিলে আমরা বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাই, যে ইংরাজী শিক্ষার ও পাশ্চাত্য জাতিত্রয়ের (ইংরাজ, ফরাসী ও পোর্ত্তুগীজ) সম্মিলিত প্রভাব যখন আমাদের জাতীয় জীবনে একটা মহা বিপ্লবের সূচনা করিতেছিল ঠিক সেই সময়েই রাজা রামমোহন রায় আধুনিক ভাবাপন্ন পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। উহাই প্রকৃত প্রস্তাবে বাংলা সাহিত্যের জন্মকাল বলিতে পারা যায়।† তাঁহার গ্রন্থ সকল ভাবী জাতীয় জীবনের বার্ত্তা প্রচার করিয়াছিল। প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য সভ্যতা ও শিক্ষার সংঘর্ষণে বিচলিত মানবমণ্ডলী কোথায় দাঁড়াইবে এবং কোন্ উচ্চ ভূমির উপর দণ্ডায়মান হইয়া আপনাকে নিরাপদ মনে করিবে তাহা রাজা রামমোহন রায়ের নিকট মহা চিন্তার বিষয় হইয়াছিল এবং তাহার ফলে এক নূতন এবং জীবন্ত ভাষার সৃষ্টি হইয়াছিল। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পর জীবন্ত বাংলা ভাষা খুঁজিতে হইলে আমাদিগের দৃষ্টি স্বর্গীয় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের উপদেশাবলী ও ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যানের প্রতি আকৃষ্ট হয়। বঙ্গদেশে সেই সময়ে যে সমাজ ও ধর্ম্মবিপ্লবের স্রোত প্রবাহিত হইতেছিল মহর্ষিদেবের অগ্নিময় ব্যাখ্যান ও উপদেশগুলি তাহার অমৃতময় ফলস্বরূপ।

এইরূপে আমরা দেখিতে পাই যে সমাজ ও ধর্ম্মগত আন্দোলনই সাহিত্যের জন্মদাতা ও পরিপোষক। যাহা মানুষকে কিছু শিক্ষা দেয় এবং সজীব করে এরূপ সাহিত্যকেই সাহিত্য বলা উচিত। প্রাচীন কালের অনুপ্রাস, যমক ও অন্যান্য বহুবিধ অলঙ্কার-পরিশোভিত ভাষার মধ্যে চিন্তা ও ভাবের গভীরতা অপেক্ষা পদ-লালিত্যই অধিক পরিমাণে লক্ষিত হইত। ভাষা সমূহের আর একটা অপূর্ব্ব সৌসাদৃশ্য দেখা যায়; তাহা এই যে প্রথম অবস্থায় যেমন একটী সাহিত্য ধর্ম্মভাব বা কোনও উচ্চ অঙ্গের আন্দোলনের ফলস্বরূপে প্রসূত হয় তেমনি উহার শৈশবকাল উত্তীর্ণ হইয়া গেলে গভীর ধর্ম্মভাবের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ একটা লঘু ভাব আসিয়া পড়ে। সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে এ কথা সম্পূর্ণরূপে প্রযুজ্য। বেদ ও উপনিষদের প্রাগাঢ় ভাব ও গভীরতার সহিত পরবর্ত্তী রচনা সকলের তুলনা হইতে পারে না। সেগুলি অপেক্ষাকৃত লঘু বিষয়েরই অবতারণা করিয়াছে। শেষে কালিদাসের কাব্য-কলায় আমরা আর বেদের ছায়াও দেখিতে পাই না। কালিদাসের কাব্যে আমরা অনেক শিক্ষালাভ করি, অনেক সৌন্দর্য্য উপভোগ করি, কিন্তু প্রাচীন ঋষিদিগের সাধনাময় জীবনের জীবন্ত ছায়া অনুভব করিতে পাই না। এ স্থলে অনেকে হয়ত অভিজ্ঞান শকুন্তলের তাত কণ্বকে ঋষি-চরিত্র বলিবেন। কিন্তু

* যাঁহারা শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের লিখিত "বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্য" পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা এ কথায় আপত্তি করিতে পারেন। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে জাতীয় সাহিত্য বলিতে আমরা প্রাণপ্রদ সুগঠিত সাহিত্য এবং সে হিসাবে আধুনিক বাংলা সাহিত্যকেই লক্ষ্য করিয়া এ সকল কথা বলিতেছি।

† অবশ্য ইতিপূর্ব্বে বৈষ্ণব সাহিত্য আমাদের জাতীয় জ্ঞান-ভাণ্ডারে স্থান পাইয়াছিল। কিন্তু বৈষ্ণব সাহিত্য শুধু পদাবলী-মাত্র বলিলেও চলে। খাঁটী গদ্য সাহিত্য আমরা রাজা রামমোহন রায়ের নিকটই প্রথম পাই।

একটু চিন্তা করিলেই ইহা উপলব্ধি হইবে যে, কালিদাস কণ্বের যে ছবি অঙ্কিত করিয়াছেন তাহাতে ঋষিভাব অপেক্ষা সাংসারিকতার ভাবই অধিকতর পরিস্ফুট। দুষ্যন্ত ও শকুন্তলার হৃদয়ের উদ্বেলিত প্রেমে যদি তাত কণ্বের ধর্ম্ম ভাব ও গম্ভীরতায় একটু স্নিগ্ধতা এবং সংযমের ভাব আনিয়া দিত তাহা হইলে যেন আরও সুন্দর হইত। আর কণ্বকে সংসারের সাধারণ মানুষ অপেক্ষা অনেক স্থানে বড় করিয়া আঁকিতে কালিদাস একটু কৃপণতা করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়। শকুন্তলার যাত্রাকালে তিনি বলিতেছেন ;—

> "যাস্যত্যদ্য শকুন্তলেতি হৃদয় সংস্পৃষ্ঠমুৎকণ্ঠয়া
> কণ্ঠঃ স্তম্ভিতবাস্পবৃত্তিকলুষশ্চিন্তাজড়ং দর্শনম্।
> বৈক্লব্যং মম তা[illegible]দৃশমহোস্নেহাদরণ্যৌকসঃ
> পীড্যন্তে গৃহিণঃ কথংনু তনয়াবিশ্লেষ দুঃখৈর্নবৈঃ ॥

(শকুন্তলা আজ পতিগৃহে যাইতেছে—এই চিন্তাতে আমার হৃদয় দুঃখে অভিভূত হইতেছে ; অশ্রুপ্রবাহ দমন-চেষ্টায় কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া যাইতেছে ; চিন্তায় দৃষ্টি অস্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। আমি অরণ্যবাসী, বাৎসল্য হেতু আমারই এতদূর চিত্তবৈকল্য উপস্থিত, না জানি গৃহিগণ নূতন কন্যা বিরহ ক্লেশে কি যাতনাই অনুভব করে।)

তদনন্তর তিনি শকুন্তলাকে যে উপদেশ দিতেছেন তাহাও সাংসারিক ভাব-প্রণোদিত ; যথা :—

> "শুশ্রূষস্ব গুরূণ্ কুরু প্রিয়সখীবৃত্তিং সপত্নীজনে
> ভর্ত্তুর্বিপ্রকৃতাপি রোষণতয়া মাস্ম প্রতীপং গমঃ ॥
> ভূয়িষ্ঠং ভব দক্ষিণা পরিজনে ভাগোষ্বনুৎসেকিনী
> যান্ত্যেবং গৃহিনীপদং যুবতয়ো বামা কুলস্যাধয়ঃ ॥"

(গুরুজনের শুশ্রূষা করিও ; সপত্নীদিগকে প্রিয় সখীর ন্যায় জ্ঞান করিও ; পতি বিরুদ্ধাচারী হইলেও রোষ বশতঃ তাঁহার বিরুদ্ধাচারিণী হইও না ; পরিবার পরিজনের প্রিয়কারিণী হইও ; সৌভাগ্যগর্ব্বে স্ফীত হইও না ; যুবতীগণ এই সকল গুণেই গৃহিণীপদে আরোহণ করেন ; যাঁহারা বিরুদ্ধগুণ সম্পন্ন, তাঁহারা বংশের ক্লেশদায়ক হন।)

ইহাতে কণ্বের চরিত্র যে অধিকতর মনোরম হইয়াছে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই ; কিন্তু যে গভীর সাধনা ও ধর্ম্মভাব মানব মনকে যুগযুগান্তর ধরিয়া উদ্বুদ্ধ করে আমরা কণ্বচরিত্রের সেই উন্নত দিক দেখিতে পাই না। জয়দেবের গীতগোবিন্দে লঘুভাবের পরিণতি হইয়াছে বলা যাইতে পারে।

ইংরাজী সাহিত্যের প্রথমাবস্থা অতীত হইলে এই অবস্থাই দাঁড়াইয়াছিল। তাহার উদাহরণ স্থলে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে স্পেন্সার, শেক্সপিয়ার ও লর্ড বায়রণের মত কবির কাব্যও স্থানে স্থানে অশ্লীলতা দোষে এত দুষ্ট যে অধ্যাপকগণ কলেজে অধ্যাপনাকালে সেই সকল অংশে দৃষ্টিপাত করিয়া লজ্জায় মস্তক অবনত করিয়া থাকেন। ফরাসী ভাষার ইতিহাসের মধ্যাবস্থা ঐরূপ ছিল বলিয়া শুনা যায়। শিশু বাংলা সাহিত্যের জীবনেও অশ্লীলতার বিপ্লব বহিয়া গিয়াছে। যাহা হউক বর্ত্তমান সময়ে উল্লিখিত সাহিত্যগুলির প্রত্যেকটী একটী উন্নত অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু ইহার মূল কোথায়? কোন্ অজ্ঞাত শক্তি বর্ত্তমান সময়ের সাহিত্য সকলকে এই উন্নত অবস্থায় আনিবার পক্ষে সহায়তা করিতেছে ?

এই প্রশ্নের উত্তর করিতে হইলে প্রথমতঃ আমরা দেখিব, কিসে প্রকৃত সাহিত্যের উৎপত্তি বা জন্ম হইয়াছে। সাধারণতঃ ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বা সামাজিক আন্দোলনই ইহার মূল কারণ বলিয়া দেখা গিয়া থাকে। তাহার পর আমরা দেখিতে পাইতেছি যে লঘুভাব এবং আবিলতা বা অশ্লীলতার প্রাবল্যে সাহিত্যের অবনতি হইয়া থাকে। একদিকে যেমন ইহা স্বীকার্য্য যে অত্যন্ত গভীর তত্ত্বজ্ঞানপূর্ণ সাহিত্য সকল শ্রেণীর লোককে তৃপ্তি দিতে পারে না, অন্য দিকে তেমনি ইহাও অতি সত্য কথা, যে নিরবচ্ছিন্ন লঘু বা তরল ভাব মানবের চিত্তবৃত্তির স্ফূর্ত্তি সাধনে কখনও সমর্থ হয় না। বস্তুতঃ তীব্র সাধনা ও হৃদয়ের কোমল বৃত্তি নিচয়ের সম্যক বিকাশেই যেমন মানব জীবনের সৌন্দর্য্য, সাহিত্যের সৌন্দর্য্যও তাহাই। ধর্ম্ম ও প্রেমের একত্র সমাবেশই আদর্শ সাহিত্যের লক্ষণ। ধর্ম্মবিহীন প্রেম যেমন অসম্ভব, প্রেমবিহীন ধর্ম্ম তদপেক্ষাও অসম্ভব। সেই হিসাবে 'অভিজ্ঞান শকুন্তল'কে মধ্যকালের সংস্কৃত সাহিত্যের উজ্জ্বলতম রত্ন বলা

যাইতে পারে। আবিলতা সত্ত্বেও উহাতে সংস্কৃত সাহিত্যের পূর্ণতম বিকাশ হইয়াছে। উহার অপূর্ণতা এই যে উহার মধ্যে প্রেম ও ধর্ম্মের (এ স্থলে মার্জ্জিত রুচি এবং আধ্যাত্মিক ভাবের) সামঞ্জস্য সুরক্ষিত হয় নাই। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ইংরাজ কবি ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ ও শেষ কবি টেনিসনে আমরা এই উভয় ভাবের সুন্দর সমাবেশ দেখিতে পাই। সেই জন্য তাঁহাদের কাব্য জগতের নিকট এত আদরের বস্তু। শেলি ও কিট্সের রচনার মধ্যেও কিয়ৎ পরিমাণে এই উভয় ভাবের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশে নবীনচন্দ্র এবং প্রধানতঃ রবীন্দ্রনাথের রচনায় প্রেম ও ধর্ম্মের অপূর্ব্ব সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। শেষোক্ত কবি যেন প্রেম ও ধর্ম্ম মিলাইবার জন্যই লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। প্রেম ও ধর্ম্মের সাম্যাবস্থা সাহিত্যের মধ্যে যত পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে, সাহিত্যের আদর্শও ততই আমাদের নিকট অধিকতর উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত হইবে। ইংরাজী সাহিত্যে যে পরিমাণে এই দুয়ের পরিমিত সমাবেশ হইয়াছে সেই পরিমাণেই উহা সাহিত্য হিসাবে মূল্যবান্ ও আদরণীয়। বাংলা সাহিত্য ইংরাজীর অনুকরণে কখনই উক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারে না। উহার গঠন প্রণালী স্বতন্ত্র প্রকার; কারণ আমাদের প্রেম ও ধর্ম্মের আদর্শ সম্পূর্ণরূপে পাশ্চাত্য আদর্শের অনুরূপ নহে। এই বৈষম্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া আমাদের জাতীয় সাহিত্য গঠিত হইলে তাহা অচিরেই পরিপুষ্ট হইয়া উঠিবে এবং উহার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির একটা স্পষ্ট লক্ষণ দেখা যাইবে।

শ্রীইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্যারীসুন্দরী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতেরপর)

৩

রামলোচন একখানি পত্র প্যারীসুন্দরীর নিকট দিয়া বলিলেন, পত্র পড়ে দেখুন।

প্যারীসুন্দরী পত্র পাঠ করিয়া ক্ষণকাল নীরবে চিন্তা করিলেন। ভাবে বোধ হইল, যেন বিশেষ গুপ্ত কথা পত্রে লিখা। ক্ষণকাল পরে বলিলেন, "এবারেও যদি গতবারের মত হয়, তবে আর কাজ নাই, অপমান অপেক্ষা মৃত্যু ভাল।"

রামলোচন বলিলেন, "চেষ্টার ত্রুটী নাই। জয় পরাজয় ভগবানের হাত। দেখি! এবারেও দেখি!"

প্যারীসুন্দরী বলিলেন:—"দেখিতে আমার আপত্তি নাই। কিন্তু খুব সাবধান, খুব সতর্কে, এবারে খুব সতর্ক ভাবে কার্য্য করিবে। ঐ ম্লেচ্ছ ইংরেজ বেটা (কেনা) কোন্ দেশ হইতে এ দেশে আসিয়া, দেশের লোকের সাহায্যে আমাদিগকে এত কষ্ট দিতেছে। প্রজার দুর্দশার কথা শুনিয়া আমার হৃদয় ফাটিয়া যাইতেছে। হায়! হায়! একটা শ্বেত রাক্ষসে আমার জমিদারী পর্য্যন্ত গ্রাস করিতে বসিয়াছে। ম্লেচ্ছ বেটা দর্প করিয়া বলিয়াছে যে, 'প্যারীসুন্দরীকে যে আমার নিকট ধরিয়া আনিবে সে হাজার টাকা পুরস্কার পাইবে। আমি ভাল করিয়া বিলাতী সাবানে তাহার গায়ের মলা দুর করিয়া যাতে বাঙ্গালার গন্ধ শরীর হইতে একেবারে স'রে যায় তার উপায় করিব। গাউন পরাইয়া দিব্বি মেম সাজাইয়া কুঠীতে রাখিব।' কি ঘৃণা!! কর্ণ তুমি বধির হও।"

রামলোচন বলিলেন, "হুজুর! যত শুনা যায় তত নয়। আবার পরমুখে পরের কথা কিছু বেশী পরিমাণেই কাণে আসে, ওসকল কথায় কাণ দিবেন না। শত্রুর মুখ আর পাগলের জিহ্বা এ দুই-ই সমান। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। বাজে কথা বলার জন্য বাজে মুখ আছে। শুনিবার জন্যও বিস্তর কাণ রহিয়াছে। আমরা কাজের কথা শুনিব, এবং যাহা মনে আছে

তাহা করিব। ওসকল হাওয়াই কথায় কখনই কাণ দিব না।

প্যারীসুন্দরী বলিলেন, "বাজে কথায় কাণ না দেওয়াই ভাল, কিন্তু কেনীর মেমকে যে হাতে আনিয়া দিবে, এই হাজার টাকার তোড়া তাহার জন্য ধরা রহিল, ইহার পর—মনের মত তাহাকে সন্তুষ্ট করিব। আজীবন তাহার চাকুরী বজায় থাকিবে। মৃত্যুর পরেও তার বংশাবলী সদরপুরের ঘর হইতে বিশেষ বৃত্তি পাইবে।"

রামলোচন বলিলেন,—"এ উতলার কার্য্য নহে। সকল দিক রক্ষা করিয়া, মান সম্ভ্রম এবং প্রাণ বাঁচাইয়া এই সকল কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হয়। রোষবশে সাংঘাতিক কোন কার্য্য করিতে অগ্রসর হওয়া মানুষের কার্য্য নহে। আগে আত্মরক্ষা, শেষে যাহা ইচ্ছা। ইহার অন্যথায় নিত্য নূতন বিপদ ঘটিবারই বেশী সম্ভাবনা। এই ত সে দিন তাড়াতাড়ি করিয়া অপ্রস্তত হইতে হইল। পূর্ব্ব হইতে আয়োজন করিয়া আগা-গোড়া আঁটিয়া কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিলে, কিছুতেই ঠকিতাম না। সাহেবের লোকেরা কি সুন্দর কৌশলে কার্য্য সিদ্ধি করিয়া চলিয়া গেল। বিবেচনার ত্রুটিতেই সরকারী চাকর ১০।১২ জন অনর্থক জখমী হইল। যদিও তাহারা প্রাণে মরিবে না কিন্তু আশঙ্কা অনেক।"

প্যারীসুন্দরী বলিলেন :—"আমি যে কিছু না বুঝি তাহা নহে। কিন্তু এত অপমান, এত লাঞ্ছনা, প্রজার প্রতি দৌরাত্ম্য, ইহা আমার প্রাণে সহিবে না। যাহা হইবার হইয়াছে। গত কথায় আর ফল কি? এবারে কত লাঠিয়াল সংগ্রহ করিয়াছ?"

"তাতে ত্রুটি নাই।"

"এবারে তোমাকে স্বয়ং যাইতে হইবে। কুঠী পর্য্যন্ত নিজে না যাও, আমার কাছারী-বাড়ীতে থাকিবে। ইংরেজ দেখিলেই যে তোমরা কেন এত ভয় কর, তাহা আমি বুঝিতে পারি না। সেও মানুষ, তোমরাও মানুষ। তোমাদেরও দুই হাত দুই পা, তাহাদেরও তাহাই। কোন হাড় কি কোন শিরা তোমাদের শরীর অপেক্ষা বেশী নাই, অঙ্গ প্রত্যঙ্গেরও কোন প্রভেদ নাই, আছে কেবল রঙ্গের প্রভেদ। আর একটু প্রভেদ আছে। তোমরা নীলকর কুঠীয়ালদের ন্যায় পরিশ্রমী নও, বুদ্ধিমানও নও। কেনীর ন্যায় মিথ্যাবাদীও নও, নির্দ্দয়, নিষ্ঠুর, প্রবঞ্চকও নও। অত স্বার্থপরও নও।

আমি শুনিয়াছি,যে টি, আই, কেনী বিলাতের ভদ্রবংশীয়। কিন্তু এখন দেখিতেছি যে, সে সকলই কথার কথা। এখন দেখিতেছি, কেনী চামার অপেক্ষাও অধম, মেথর অপেক্ষাও নীচ।

এ কুঠীরই একজন সাহেবকে সাঁওতার বড় মীর সাহেব কি করিয়াছিলেন মনে আছে? আজ যে মীর সাহেব কেনীর আজ্ঞাবহ, সেই মীরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যে কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, চিরকাল এদেশে সাধারণের মনে সে কথা আঁকা থাকিবে। তাঁহার ক্ষমতাকে সহস্র ধন্যবাদ। যে নীলকরকে দেখিলে তোমরা দশ হাত সরিয়া পড়, দুই হাতে সেলাম বাজাইতে বাজাইতে পিছে হটিয়া হাঁপ ছাড়, দেবতার ন্যায় পূজা কর, যম হইতেও ভয় কর—সত্য কথা বলিব তাহাতে আর দোষ কি, নিন্দারই বা কথা কি,—সাহেব দেখিলে যেন সকলেরই গা কাঁপিয়া ওঠে—সে গিড়িমিড়ি কথা কাণে গেলে মহামহিম মহাশয়েরও প্রাণ উড়িয়া যায়,—সেই নীলকরকে ধরিয়া তিনি যেরূপ শাস্তি করিয়াছিলেন,তাহা এদেশের সকলেই জানে। বড় মীর ঐ শালঘর মধুয়ার কুঠীয়াল সাহেবকে ধরিয়া দিনে দুপুরে তাহার একটী কাণ কাটিয়া লইয়াছিলেন। প্রজার প্রতি অত্যাচার করাতেই না তাহার রাগ—সাহেবেরও শাস্তি। আমি কি বলিব, আর কি করিব? সমুদায় কার্য্য পরের হস্তে, শুধু মুখের কথায় কি হয়? যা হউক, আমি আবার বলিতেছি, কেনীর মেমকে তোমার নিকট চাই।"

রামলোচন বলিলেন, "হুজুর আমার নিজের কার্য্য নহে। যাহা করিব সকলই পরের হস্তে, আমি যোগাড়ের ত্রুটি করি নাই, কখনও করিব না। টাকা খরচ করিতেও আপনার হুকুমের অপেক্ষায় থাকি নাই, থাকিবও না। দেখি, এবারে ঈশ্বর কি করেন। এই বলিয়া রামলোচন প্যারীসুন্দরীর নিকট হইতে বিদায় হইলেন।

৪

যে সময়ের কথা, সে সময় কুষ্টিয়ায় মহকুমা বসে নাই। কেনীর জমিদারীর কতক অংশ পাবনার সামিল, কতক মাগুরা যশোহরের অধীন। বিশেষ কোন আবশ্যকীয় কার্য্যোপলক্ষে কেনীকে স্বয়ং যশোহরে যাইতে হইয়াছিল। যখন সংবাদ পাইয়াছেন, তখনই বেহারার ডাক বসাইয়া চলিয়া গিয়াছেন। রাত্রে সংবাদ, রাত্রেই যাওয়া, অনেকেই তাহার যশোহর গমনের খবর পায় নাই।

প্যারীসুন্দরীর গুপ্তচর সন্ধান করিয়া সদরপুরে যে সংবাদ দিয়াছে, তাহা ঠিক হয় নাই। কারণ কুঠীর লোকেই কেনীর সংবাদ ঠিক জানে না। অনেকেই জানে, সাহেব কুঠীতেই আছেন। কেনী কুঠী হইতে বাহির হইলেন, মেম সাহেব পিয়ানোয় হাত দিয়া অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত পিয়ানোর সুরে সুর মিশাইয়া গান করিলেন। ক্লান্তি বোধেই হউক, কি নিশির নিস্তব্ধতায় বিশেষ কোন কথা মনে উঠিয়াই হউক, হৃদয় বিচলিত হইয়া মিহি সুর বন্ধ হইল। পিয়ানোর বাজনাও থামিয়া গেল। হৃদয়ে যে চিন্তার লহরীই খেলিতে থাকুক তাহা মুখে ফুটিল না। মনের কোন কথা মুখে আনিলেন না, কিন্তু ভাবে বোধ হইল, যেন তিনি কি ভাবিতেছেন। তাঁহার পূর্ব্ব অবস্থার কথা! ইংলণ্ডের কথা? তাঁহার ভাগ্যের কথা ভাবিতে ছিলেন? কেনীকে বিবাহ করিয়া তিনি ভালই করিয়াছেন। ইংলণ্ডে থাকিলে এত সুখ ভাগ্যে কখনই ঘটিত না। নৃত্য, গীত, আহার, বিহার, আমোদ, প্রমোদ, রাজপ্রাসাদে রাজভোগ, ইহা কখনই তাঁহার সুন্দর ললাটে জুটিত না। হয় জুতা-সেলায়ের সুতার যোগাড়, না হয় কাপড় সরঞ্জাম দুরস্ত, না হয় দোকান ঘরে বিকি কিনি, কি অন্য কোনরূপ ব্যবসা অবলম্বন করিয়া শরীর খাটাইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইত। ভারতে আসিয়াছেন, ভালই হইয়াছে। সুখের সীমা উপভোগ করিতেছেন। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া যেন তিনি চেয়ার হইতে উঠিলেন। শয়ন-কুঠরীতে গিয়া রাত্রিবাস মোলায়েম (রেশমী) কাপড় পরিয়া পালঙ্কে শয়ন করিলেন। পাখা চলিতে লাগিল। বোধ হয় ভাগ্য-কথা আলোচনা করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িলেন।

পাখীদের প্রভাতী গানেই প্রতিদিন তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইত। নিশি-শেষে আজ নূতন প্রকারের শব্দ তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। হো! হো! মার! মার! লাঠির ঠকাঠক্, লোকের গর্‌রা এই নূতন প্রকার শব্দে তাঁহার নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। শয্যা হইতে চক্ষু মেলিয়া দেখিলেন, প্রভাত হইয়াছে। প্রভাত-বায়ু জানালার খড়্‌খড়ে দিয়া ধীরে ধীরে আসিয়া তাঁহার রেসমী বসনের সহিত ক্রীড়া করিতেছে। দোলিত পাখার ঝালর মৃদু মৃদু নড়িতেছে। মিসেস্ কেনী আধ-নিমীলিত আঁখিতে আধ আধ ভাবে এই সকল দেখিয়া প্রাভাতিক সমীরের স্বভাবিক মোহমন্ত্রে আবার নিদ্রায় অভিভূতা হইলেন। কিন্তু নিদ্রার আবেশ বেশীক্ষণ রহিল না। ভীষণ রবে লাঠিয়ালগণের হুহুঙ্কার এবং মার মার শব্দে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। প্রাণ দুর দুর করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

একি কাণ্ড? কি ব্যাপার? মহা গোলযোগ! পালঙ্ক হইতে ত্রস্তে উঠিয়া তাড়াতাড়ি গবাক্ষ-দ্বারে মুখ দিয়া দেখিলেন, যে তাহার শয়ন ঘরের চতুষ্পার্শ্বে কুঠীর চারিদিকে বহুতর লাঠিয়াল। কুঠীর হাতায় এবং প্রবেশদ্বারে ঢাল, শড়কী এবং বল্লমধারী সারি সারি লাঠি-য়ালগণ যমদূতের ন্যায় দণ্ডায়মান, সকলেই অপরিচিত। কুঠীর কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। দেখিবার মধ্যে দেখিলেন, লাঠিয়ালেরা প্রবেশদ্বার হইতে কুঠীর লোকদিগকে মারিয়া তাড়াইতেছে। তাহারা আঙ্গিনায় আসিতে যতই চেষ্টা করিতেছে ততই লাঠির আঘাতে আহত হইতেছে। বহু চেষ্টাতেও আঙ্গিনায় প্রবেশ করিতে পারিতেছে না। মহা বিপদ। একি! এরা কারা? কি জন্য আসিয়াছে, কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তাড়াতাড়ি বিছানা হইতে উঠিয়া সিঁড়ির দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন। গবাক্ষে মুখ দিয়া বলিতে লাগিলেন, 'সাহেব কুঠীতে নাই।' লাঠিয়ালদিগের মধ্য হইতে একজন বলিল, 'আমরা সাহেবকে চাই না, তোমাকে চাই। প্যারীসুন্দরীর হুকুম, তোমাকে সদরপুর যাইতে হইবে। কথায় না যাও ধরিয়া লইয়া যাইব।'•

মিসেস্ কেনী বলিলেন, "বাপু সকল! তোমরা

আমাকে লইয়া কি করিবে? আমি তোমাদের কিছুই করি নাই, আমাকে বাঁচাও!"

সাদা মুখের কথা শুনিতে কাহার ভাগ্য? আজ মিসেস্ কেনী বিপদে পড়িয়া লাঠিয়ালদিগের সহিত কথা কহিতেছেন, কিন্তু কার ভাগ্য সে মুখের কথা শুনিতে পায়? যাহা হউক, মিসেস্ কেনী তিন চারিটী কথা কহিয়াই কার্য্য উদ্ধার করিলেন। একে স্ত্রীলোক, তাহাতে আবার বিলাতী মুখ। লাঠিয়ালগণের এত তেজ, এত উৎসাহ এত জোরের কথা, মিসেস্ কেনীর ঐ কথায় কোথায় যে ভাসিয়া গেল, তাহার সন্ধান হইল না। যে মুখ তুলিয়া তাকাইল সে তাকাইয়াই রহিল। মিসেস্ কেনী সাহসে নির্ভর করিয়া এক তোড়া টাকা উপর হইতে নীচে ছড়াইয়া ফেলিয়া দিলেন। অর্থের কাঙ্গাল বাঙ্গালী টাকার মুখ দেখিয়াই গলিয়া পড়িল। যে কার্য্যে আসিয়াছিল তাহা মন হইতে একেবারে সরিয়া গেল। সড়কী ঢাল তরবারি মাটিতে ফেলিয়া তাড়াতাড়ি টাকা কুড়াইতে লাগিল। যে যত পারিল লইল, কেহ কোমরে গুঁজিল, কেহ কাপড়ে বান্ধিল, টাকার লোভে শেষে আপনা-আপনি সংগ্রাম বাধিল। মিসেস্ কেনীর নিক্ষিপ্ত টাকা সমুদয় কুড়াইয়া লইয়া শেষে বলবানেরা দুর্ব্বল এবং ক্ষীণকায় ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে কাড়িয়া লইতে আরম্ভ করিল। কেহ সাহায্য করিল, কেহ বা সে সাহায্যে বাধা দিতে অগ্রসর হইল।

মিসেস্ কেনী এই সুযোগ দেখিয়া আর এক তোড়া টাকা ঐ কুকুর-কাণ্ডের মধ্যে ছড়াইয়া ফেলিয়া দিলেন। সে সময়ে আপনা-আপনি প্রকাশ্য ভাবে মারামারি বাধিয়া গেল। কোথায় শড়কী কোথায় ঢাল, কোথায় লাঠি কোথায় কি পড়িয়া রহিল, সেদিকে কাহারও লক্ষ্য থাকিল না। টাকা লইয়া কাড়াকাড়িতেই মাতিয়া গেল। আপনা-আপনি মারামারী টানাটানি, হেঁচড়া হেচড়ী আরম্ভ করিয়া কেনীর লাঠিয়ালগণের অনেক সুবিধা করিয়া দিল। বিপক্ষদলের লাঠি সড়কী হাতে লইয়া অর্থলোভী নিমকহারামদিগকে ধরিবার আশায় কুঠীর লাঠিয়ালেরা মার মার শব্দে আসিয়া পড়িল। টাকার এমনি লোভ, টাকা এমনি জিনিষ, যে তখনও সে দিকে কাহারও দৃষ্টি নাই। রূপার চাকিতে চক্ষে ধাঁধা লাগিয়াছে। আত্মহারা জ্ঞানহারা হইয়া সকলেই ভ্রমে—মহা ভ্রমে পড়িয়াছে। কুঠীর লাঠিয়ালগণের লাঠি পিঠে পড়িতেছে। মাজা দমিয়া যাইতেছে, কেহ মাটিতে গড়াইয়া পড়িতেছে, চক্ষু তুলিয়া ফিরিয়া দেখিয়াই চম্পট। দৌড়িয়া পথে অপথে পলায়ন। যাহারা প্যারীসুন্দরীর নির্দ্দিষ্ট বেতনভোগী তাহারাই কেবল রামলোচনের নিকটে ভারলের কাছারীতে ফিরিয়া গেল। বিদেশী সর্দ্দারেরা আপন আপন সুবিধা মত আপন আপন পথ খুঁজিয়া লইল। হুকুম-দেহেন্দা দলপতি মহোদয়ের সহিত কাহারও সাক্ষাৎ হইল না। মিসেস্ কেনী তখন নীচে নামিয়া বাক্স, আলমারী যাহা পূর্ব্ব হইতে জরাজীর্ণ ছিল, নিজের চাকর দ্বারা ভাঙ্গিতে লাগিলেন। ফুলের টব, পা-পোস, চেয়ার ইত্যাদি ছিন্ন ভিন্ন করিয়া কতক সিঁড়ির নীচে, কতক ভগ্ন, কতক স্থানভ্রষ্ট করিলেন। এবং তখনই জেলার মাজিষ্ট্রেটের নিকট পত্র লিখিয়া রামরূপ সিংহকে অশ্বারোহনে জেলায় পাঠাইয়া দিলেন। (ক্রমশঃ)

কয়েকটী অদ্ভুত প্রথা।

শৈশবে যেদিন প্রথম আমার এক বধূঠাকুরাণীকে রন্ধনশালায় অঙ্গুলি-সঙ্কেত দ্বারা শাশুড়ীর নিকট তণ্ডুল চাহিতে দেখিয়াছিলাম, তখন বড় বিস্ময় বোধ হইয়াছিল। আমার বেশ স্মরণ আছে, যদিও তিনি মূক বা বধির ছিলেন না, তথাপি বর্ত্তমান কালের বিজ্ঞান-সম্মত উন্নত প্রণালী-পরিচালিত মূক-বধির বিদ্যালয়ের প্রায় সকল প্রকার সঙ্কেতই তাঁহার অধিগত ছিল এবং তিনি একটীও শব্দোচ্চারণ না করিয়া অতি ক্ষিপ্রতার সহিত আপনার অভাব জানাইতে সমর্থা ছিলেন। আমার এই বালিকা বধূঠাকুরাণীকে কেন গৃহে থাকিয়াই মুনিবৃত্তি অবলম্বন করিতে হইয়াছিল, তখন তাহা বুঝিতে পারি নাই—এখনও যে

বড় বুঝিতে পারিয়াছি এমত স্পর্দ্ধা করিতে পারি না, তবে দেখিতেছি, প্রথাটা কিঞ্চিৎ অদ্ভুত বটে, এবং এইরূপ বা ইহা অপেক্ষাও অদ্ভুত প্রথা নানা দেশে বর্ত্তমান আছে।

নববধূ শাশুড়ীর সহিত কথা বলিবে না—এই নিয়মটী দুর্ব্বোধ্য বই কি। বালিকা পুত্রবধূ যখন চির স্নেহময় জনক-জননীকে ত্যাগ করিয়া শ্বশুরালয়ে আগমন করে তখন শাশুড়ী তাহার মাতার স্থান গ্রহণ করিবেন, তাহাকে অবাধে সকল মনোদুঃখ জানাইবার অধিকার দিয়া তাহার পিতৃমাতৃভ্রাতৃভগিনী-বিচ্ছেদ-জনিত হৃদয়ভার লঘু করিবেন এবং কোমল স্নেহপ্রবণ ব্যবহার-জনিত সুশিক্ষা দ্বারা তাহাকে গড়িয়া তুলিবেন, ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম বলিয়া বোধ হয়। অথচ দেখিতে পাই, যে সময়ে বালিকার শ্বশুর-গৃহকে সর্ব্বপ্রযত্নে তাহার পিতৃগৃহে পরিণত করা কর্ত্তব্য, ঠিক সেই সময়েই সে নিকটতম আত্মীয়গণের সহিত বাক্যবিনিময়েও বঞ্চিত। এই প্রথার সমীচীনতা কতখানি তাহা নববধূরাই বলিতে পারেন। আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বোধ হয়, ইহাতে ঐহিক পারত্রিক কোন কল্যাণই সাধিত হয় না। শান্তি রক্ষার উদ্দেশ্যে এই নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকলে সে উদ্দেশ্য যে সর্ব্বদা সম্যক্ সিদ্ধ হয় না, তাহার প্রমাণ গ্রামে গ্রামেই বর্ত্তমান। কে না জানে, অনেক বধূ বাল্যে মূক হইলেও প্রৌঢ়াবস্থায় বিলক্ষণ মুখরা হইয়া থাকেন এবং অনেক সময়ে বধূ-শাশুড়ীতে যে বাক্‌যুদ্ধ আরম্ভ হয়, বাহুযুদ্ধে তাহার পরিণতি ঘটে। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের 'যুগান্তর' হইতে তাহার একটু নমুনা দিতেছি।

"শাশুড়ী। কেন রে আবাগীর সন্তান! কি রাক্ষসের কাজটী করেছি! তোর বাপ ভেয়ের মাথা খেয়েছি নয়? তোর সেই সাদা শসা বাপ্‌টার ও দুটো পাঁটা ভেয়ের মাথা কড়মড় করে চিব্‌য়ে খেয়েছি, নয়?

বড় বৌ। কথায় কথায় বাপ ভাই তুলোনা বলছি, বাপ ভাই সকলের সমান; নিজের বাপ ভেয়ের মাথা খেয়ে বুঝি সন্তুষ্ট নও, তাই অন্যের বাপ ভেয়ের মাথা খেতে চাও?

শাশুড়ী। কি এত বড় আস্পর্দ্ধা, ঐ উনোনকাঁধাতে মুখটা ঘষে দিব জান না?

বড় বৌ। ছেঃ! আর ঘষে দিতে হয় না, আর খুকীটী নই যে উঠ্‌তে ঠোনা, বস্‌তে ঠোনা দেবে; এ সেজ বৌ পাওনি যে খোসামোদ করে বেড়াবে; গালি দেও গালি খাবে।"

অবশ্য বর্ত্তমান স্থলে বাহুযুদ্ধটা হয় নাই, কারণ শাশুড়ী দেখিলেন, "গতিক ভাল নয়, আক্রমণ করিলে হাতা-হাতির সম্ভাবনা;" সুতরাং the better part of valour is discretion, এই নীতির অনুসরণ করিয়া সরিয়া পড়িলেন।

শাশুড়ীর সহিত নববধূ কথা বলিবে না, এই নিয়ম আর কোনও দেশে আছে কি না জানি না, কিন্তু শ্বশুর সম্বন্ধে এই বিধি বহু দেশে বহু জাতির মধ্যে প্রচলিত আছে। সকলেই জানেন, বাংলাদেশে ভদ্র-সমাজমাত্রেই দেখিতে পাওয়া যায়, বিবাহের পর অন্ততঃ কয়েক বৎসর বধূ শ্বশুরের সহিত বাক্যালাপ করে না। সুসভ্য ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-বৈদ্যগণের এই প্রথা কি আদিম বর্ব্বরতার প্রস্তরীভূত নিদর্শন? মোগল ও ক্যালমক্‌দিগের মধ্যে প্রথা এই, বধূ শ্বশুরের সহিত কথা বলিবে না বা তাঁহার সম্মুখে উপবেশন করিবে না। সাইবেরিয়ার অষ্টিয়াক জাতির নিয়ম, সন্তান না হওয়া পর্য্যন্ত বধূ শ্বশুরের সম্মুখে যাইবে না। চীনদেশে শ্বশুর কখনও পুত্রবধূর মুখ দর্শন করেন না, হঠাৎ সাক্ষাৎ হইলে অমনি লুক্কায়িত হন। বোর্ণিও এবং ফিজিদ্বীপপুঞ্জেও এবম্প্রকার প্রথা আছে। কাফির জাতির প্রথা আর একটু প্রসারিত। সেখানে কেবল শ্বশুর নয়—স্বামীর সম্পর্কিত ঊর্দ্ধতন পুরুষ মাত্রেরই সহিত সর্ব্বপ্রকার সংশ্রব পরিত্যাগ করিতে হয়।

এ দেশে স্বামী বা স্বামীসম্পর্কিত ও গুরুজনের নামোচ্চারণ নিষিদ্ধ। এ জন্য কথাচ্ছলে অনেক আবশ্যকীয় শব্দ হাস্যজনকরূপে বিকৃতি প্রাপ্ত হয়। আমার এক আত্মীয়া গ্রিমের নিয়ম (Grimm's Law) সম্বন্ধে অনভিজ্ঞা হইয়াও 'ভৈরব'কে 'টৈরব' ও 'উমানাথ'কে 'ধুমানাথ' উচ্চারণ করিতেন।

শুনিয়াছি, এই নিয়মের তাড়নায় একজন স্ত্রীলোককে প্রার্থনার সময় বলিতে হইত :—

ফাম ফঙ্গা ফোপীনাথ ফঙ্গাজলে ফরি,
পাপীরে তরাও ওহে ফরি ফরি ফরি।
(অর্থাৎ—রাম গঙ্গা গোপীনাথ গঙ্গাজলে হরি,
পাপীরে তরাও ওহে হরি হরি হরি।)

আশ্চর্য্যের বিষয় এই, কাফির জাতির মধ্যে ঠিক এই প্রথা দৃষ্ট হয়। কাফির-রমণী মনে মনেও গুরুজনের নাম উচ্চারণ করিতে পারে না। অষ্ট্রিয়াক্ রমণীর পক্ষে স্বামীর নাম লওয়া নিষিদ্ধ। স্বামী বুঝাইতে হইলে তাহারা বলে "তাহী" অর্থাৎ "পুরুষ।" ইহা এ দেশীয় নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোকদিগের "মিন্সে" কথার অনুরূপ।

বঙ্গদেশের অনেক স্থানে শাশুড়ী জামাতার সহিত কথা বলেন না। এই প্রথাটী পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও দেখা যায়। আমেরিকায় আদিম নিবাসীদিগের এক শাখার মধ্যে এই নিয়মের কঠোরতা খুব বেশী। এই জাতির মধ্যে শাশুড়ী জামাতার সহিত শুধু কথা বলেন না, তাহা নয়। জামাতার মুখদর্শনও তাঁহার পক্ষে নিষিদ্ধ। যদি জামাতাকে কিছু বলিতে হয়, তবে শাশুড়ী তাহার দিকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া তৃতীয় ব্যক্তির সাহায্যে মনোভাব প্রকাশ করিয়া থাকেন। আর একটী আদিম জাতির মধ্যে এই নিয়মটী আরও উন্নতি লাভ করিয়াছে। তাহাদিগের মধ্যে কেবল শাশুড়ী নয়, শ্বশুরের সহিত বাক্যবিনিময় করাও জামাতার পক্ষে অকর্ত্তব্য। কালিফর্ণিয়ার আদিম নিবাসীদিগের মধ্যে কোনও পুরুষ তাহার স্ত্রী মাতা ভগিনী প্রভৃতি কোনও আত্মীয়ার সহিতই কথা বলিতে পারে না, হঠাৎ ইহাদিগের সম্মুখে পড়িলে তাহাকে লুকাইতে হয়। আরও বহু বর্ব্বর জাতির মধ্যে এই প্রথা প্রচলিত আছে। অষ্ট্রেলিয়াতে কোন পুরুষ আপন শ্বশুর শাশুড়ী বা জামাতার নামোচ্চারণ করিতে পারে না। মধ্য আফ্রিকায় আরও চমৎকার। সেখানে বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইলেই ভাবী শ্বশুর শাশুড়ীর সহিত দেখা সাক্ষাৎ বাক্যালাপ বন্ধ করিতে হয়।

শ্বশুর শাশুড়ীর সহিত জামাতা কথা বলেন না কেন, লবক (Sir John Lubbock) তাহার একটী কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলেন. পূর্ব্বে কন্যা-হরণের প্রথা প্রচলিত ছিল। কোনও কন্যা অপহৃত হইলে স্বভাবতঃই তাহার পিতামাতা ক্রুদ্ধ হইয়া জামাতার সহিত বাক্য-বিনিময় করিতেন না। কালক্রমে বিবাহার্থ রমণীহরণ প্রথা তিরোহিত হইয়াছে, কিন্তু শ্বশুর শাশুড়ী পূর্ব্ব নিয়মের অর্থশূন্য অনুসরণ করিয়া আসিতেছেন, কাজেকাজেই জামাতার সহিত বাক্যালাপ বন্ধ রাখিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এই ব্যাখা খুব যুক্তিযুক্ত কি না পাঠকপাঠিকাগণ তাহা বিবেচনা করিবেন।

বঙ্গদেশের অনেক ভদ্রসমাজে ভ্রাতৃবধূ দেবরের সহিত কয়েক বৎসর কথা বলেন না। এরূপও দেখিয়াছি, ভ্রাতৃবধূ ও দেবরের মধ্যে আজীবন কথা বন্ধ রহিয়াছে। বিভিন্ন অঞ্চলে এই নিয়মের ব্যতিক্রম থাকিতে পারে। কিন্তু ভাসুর ও মামাশ্বশুর সম্বন্ধে নিয়মটি এমন কঠোর যে কোথায়ও ইহার চুলমাত্র ব্যভিচার আছে. আমি এমত অবগত নহি। মামাশ্বশুর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিতে চাই না, কারণ পৃথিবীর বহু দেশেই মাতুল-ভাগিনেয় সম্বন্ধটী কিছু জটিল। বর্ত্তমান প্রবন্ধে এ বিষয়ে আলোচনা করা সম্ভবপর নয়। কিন্তু স্বামীর ভ্রাতাদিগের সম্বন্ধে যে প্রথা প্রবল রহিয়াছে তাহার শাস্ত্রীয় ভিত্তি কোথায়? শাস্ত্র বলেন, "ভ্রাতা জ্যেষ্ঠঃ সম পিতা" জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতৃতুল্য যদি তাহাই হয়, তবে দেবর ভাসুর সম্বন্ধে এই অস্বাভাবিক প্রতিষেধ কেন? কনিষ্ঠ ভ্রাতৃবধূ কন্যাতুল্য ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃবধূ মাতৃ সদৃশ হইলে তাহাদিগের সহিত কথা বলিতে পারিবে না, এই নিয়মের যুক্তিযুক্ততা কোথায়?

শুনিয়াছি, বিহার প্রদেশে নিয়ম আছে. বিবাহের পর কন্যা পিতার সম্মুখে যায় না। সত্য হইলে প্রথাটী আচারবৈচিত্র্যের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি। উপরে বঙ্গদেশের সামাজিক ব্যবহার সম্বন্ধে যাহা বলা হইল তাহা প্রাচীন-সংস্কারনিষ্ঠ পরিবার সম্বন্ধে বুঝিতে হইবে। নব্যতন্ত্রীদিগের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র। এক্ষণে আর একটী অদ্ভুত প্রথার উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি।

শ্রীমতী গ্যায়োঁ।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার 'যুগান্তরে' লিখিয়াছেন, "তাওক" তাহার খুকীর জ্বর হইয়াছিল বলিয়া এক নিমন্ত্রণে মাছ খাইতে সম্মত হয় নাই, ইহাতে "ভোজের স্থল অট্টহাস্যের ধ্বনিতে ফাটিয়া যাইতে লাগিল।" "তাওক" নিতান্তই নির্ব্বোধ, সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহার অপেক্ষাও নির্ব্বোধ অনেক জাতি আছে, পরিহাস-রসিকগণের ইহা জানা থাকিলে বেচারাকে অমনতর নাকাল হইতে হইত না। বস্তুতঃ পৃথিবীর নানা ভূভাগে La Convade নামে যে অদ্ভুত প্রথাটী বিদ্যমান আছে, তাহার বিবরণ পড়িলে হাস্য সম্বরণ করা কঠিন হয়। উহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই ঃ—

দক্ষিণ আমেরিকায় এক জাতি আছে, উহাদিগের নিয়ম এই, কোনও স্ত্রীলোক সন্তান প্রসব করিলেই তাহার স্বামীকে সূতিকাগারে আবদ্ধ থাকিতে হয়। সে বেচারী মাদুরের উপর চামড়া জড়াইয়া পড়িয়া থাকে; তাহাকে নির্জ্জনে অনশন ক্লেশে কালযাপন করিতে হয়, কিছুদিন তাহার পক্ষে কতকগুলি খাদ্যদ্রব্য নিষিদ্ধ। দেখিলে মনে হয়, সে-ই বুঝি প্রসূতি। ব্রাজিলে এক জাতির মধ্যে, সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বে পিতা মাতা উভয়কেই আহার সম্বন্ধে খুব সতর্ক হইয়া চলিতে হয়, তখন কোন কোন পশুর মাংস বর্জ্জন করা অবশ্য-কর্ত্তব্য। গায়েনা দেশেও পিতা সম্বন্ধে এরূপ নিয়ম প্রচলিত আছে। উত্তর আমেরিকার কোন কোনও আদিম জাতির মধ্যে দেখা যায়, স্ত্রীর প্রসবকাল উপস্থিত হইলে স্বামীকেও নির্জ্জনবাস করিতে হয়, তখন তাহার পক্ষে কাহারও মুখদর্শন নিষিদ্ধ। গ্রীনল্যাণ্ডে, সন্তান জন্মগ্রহণ করিলে পিতার পক্ষে কয়েক সপ্তাহ কাজকর্ম্ম করা নিষিদ্ধ। কামস্কটকা দেশে, সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বে পিতার ঐ নিয়ম পালনীয়। এতদনুরূপ প্রথা পৃথিবীর আরও বহুদেশে দৃষ্ট হয়। এমন কি T. W. Jennings (quoted by Tylor in his 'Early History of Man') বলেন, মান্দ্রাজ প্রদেশে উচ্চশ্রেণীর মধ্যে নিয়ম এই, প্রথম সন্তান (পুত্র বা কন্যা যাহাই হউক না কেন) ভূমিষ্ঠ হইলে পিতাকে এক মাস গৃহে আবদ্ধ থাকিতে হয়, এবং এই সময়ে মাংস, তামাক প্রভৃতি-উত্তেজক দ্রব্য বর্জ্জন করিতে হয়। ইহার পরেও পুত্র সন্তান হইলেই এই নিয়ম পিতার পক্ষে শিরোধার্য্য।

এই দুর্ব্বোধ্য প্রথাটী বিলক্ষণ প্রাচীন। Strabo, Apollonius Rhodius প্রভৃতির গ্রন্থ পাঠে জানা যায়, প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে পণ্টাস, কর্সিকা, স্পেন প্রভৃতি দেশে উহা বিদ্যমান ছিল। কেহ কেহ বলেন, পিরিনিস পর্ব্বতবাসী বাস্ক জাতির মধ্যে এ প্রথা এখনও বর্ত্তমান আছে, এবং কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে ফ্রান্সেও উহা প্রচলিত ছিল। এরূপ একটী বহুযুগ-প্রচলিত ব্যাপক প্রথার উৎপত্তি কোথায়? উহার মূলে কোনও সঙ্গত হেতু আছে, না উহা নিতান্তই নিরর্থক? অনেকে এই প্রশ্নগুলির অনেক প্রকার উত্তর দিয়াছেন। এস্থলে তাহার দুই একটী উল্লেখ করা যাইতেছে। একজন ফরাসী লেখক বলেন, এই প্রথার মূল কারণ, খৃষ্টীয় শাস্ত্রের আদিপাপের অস্ফুট স্মৃতি। আদমের পতন হইতেই মানব পতিত। এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ সন্তানের পিতাকে কৃচ্ছ্রসাধন করিতে হয়। এই ব্যাখ্যা নিতান্ত মনঃকল্পিত, তাহা বলাই বাহুল্য। লবক বলেন, বর্ব্বর মানব বিশ্বাস করে, পিতার খাদ্যাখাদ্যের উপর সন্তানের মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করে, পিতা যে বস্তু আহার করে, সন্তান তাহার দোষ প্রাপ্ত হয়, সুতরাং সন্তানের কল্যাণার্থ পিতাকে সাবধান হইয়া চলিতে হয়। এই ব্যাখ্যা যে অযৌক্তিক নহে, অনেক অসভ্য জাতির আচার ব্যবহার দ্বারা তাহা প্রমাণিত হয়। মোক্ষমুলর এই প্রথার তৃতীয় এক কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলেন, ইংলণ্ডের ন্যায় সুসভ্য দেশেও দেখা যায়, কোনও রমণীর প্রসব বেদনা উপস্থিত হইলে তাহার মাতা ভগিনী প্রভৃতি আত্মীয়গণ তাহার স্বামীকে বাক্যবাণে দগ্ধ করে, কারণ স্ত্রী যমযাতনা ভোগ করিতেছে, আর স্বামী দিব্য আরামে রহিয়াছেন এদৃশ্য তাহাদিগের পক্ষে অসহ্য। সুতরাং বর্ব্বর জাতি সমূহের মধ্যে, সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার প্রাক্কালে পুরুষ বেচারীকে যে নিগ্রহ ভোগ করিতে হইবে, তাহা তো স্বতঃসিদ্ধ কথা। বিশেষতঃ বর্ব্বর রমণীগণ মনে করে, পিতা আহারাদি ব্যাপারে সতর্ক না হইলে, সন্তান রুগ্ন, বা অকালে কালগ্রাসে

পতিত হইবে। এজন্য তাহারা সন্তানের পিতাকে গৃহে আবদ্ধ থাকিতে বাধ্য করে। ক্রমে পুরুষগণ সত্য সত্যই বিশ্বাস করিতে আরম্ভ করে, সন্তানের কল্যাণার্থ এইরূপ আচরণ অত্যাবশ্যক। হয় তো বা শাশুড়ীর ভয়ে তাহারা পীড়ার ভাণ করে কিংবা যথার্থই পীড়িত হইয়া পড়ে। এইরূপে, ভয় ও কুসংস্কার হইতে কালক্রমে এই প্রথা বদ্ধমূল হইয়াছে।

পণ্ডিতপ্রবর আচার্য্য মোক্ষমূলরের এই মত সমীচীন কি না, তাহা বিচার করিবার ভার পাঠকপাঠিকাদিগের উপর অর্পণ করিয়া আমি বিদায় গ্রহণ করিলাম।

শ্রীরজনীকান্ত গুহ।

বনিতা-বিনোদ।

[হিন্দী হইতে অনূদিত]

(অনুবাদকের বক্তব্য)

কাশী নাগরী-প্রচারিণী সভার নাম সর্ব্বত্র পরিজ্ঞাত। দেশে শিক্ষার প্রচারের জন্য এই সুপ্রতিষ্ঠিত সভা বহু সৎকার্য্য করিতেছেন। সম্প্রতি ঐ সভা হইতে "বনিতা-বিনোদ" নামে একখানি উৎকৃষ্ট স্ত্রীপাঠ্য পুস্তক বাহির হইয়াছে। ভিন্‌গার শ্রীমান্ রাজা সাহেব ঐ পুস্তকের বিষয়সূচী প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন এবং তিনিই ইহার মুদ্রণব্যয়ভার বহন করিয়াছেন।

"বনিতা-বিনোদ" পুস্তকখানি বিবাহিতা এবং কিঞ্চিৎ বয়ঃস্থা গৃহিণীদিগের অবশ্য পাঠ্য। ইহাতে (১) আত্মবিস্মৃতি এবং পতিভক্তি, (২) ক্রোধশান্তি, (৩) ধৈর্য্য এবং সাহস, (৪) বিদ্যাশিক্ষার লাভ, (৫) অন্যের মতের সমুচিত সম্মান করা, (৬) বাল্যবিবাহ, (৭) বহুবিবাহ, (৮) ব্যয়, (৯) চিত্ত প্রসন্ন করিবার উপায়, (১০) সঙ্গীত ও সূচী বিদ্যা, (১১) স্বাস্থ্যরক্ষা, (১২) ব্যায়াম, (১৩) গর্ভরক্ষা এবং শিশু-পালন, (১৪) ভূত-প্রেতের ভয়ের মন্দফল, (১৫) গৃহচর্য্যা, (১৬) ধূর্ত্ত, চপল এবং তোষামোদীদিগের নিকট হইতে আত্মরক্ষা করিবার উপায়—এই ষোলটী বিষয় লিখিত আছে। এই পুস্তকের বিশেষত্ব এই যে, বার জন হিন্দীপ্রেমী বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি উল্লিখিত ষোলটী অধ্যায় লিখিয়াছেন এবং নাগরী-প্রচারিণী সভার বিশেষ উদ্যোগী প্রতিনিধি-সভাপতি শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর দাস বি, এ, মহাশয় এই পুস্তক সম্পাদন করিয়াছেন। এই পুস্তকের প্রবন্ধাবলীর লেখকগণের নাম পাঠিকা-দিগের অবগতির জন্য নিম্নে লিখিত হইল :—

(১) ঠাকুর গদাধর সিংহ।
(২) পণ্ডিত শ্যামবিহারী মিশ্র, এম, এ।
(৩) বাবু বেণী প্রসাদ।
(৪) বাবু মাধব প্রসাদ।
(৫) পণ্ডিত শুকদেব বিহারী মিশ্র বি, এ।
(৬) একজন বঙ্গমহিলা।
(৭) পণ্ডিত কালীশঙ্কর ব্যাস।
(৮) লালা দেবরাজ।
(৯) বাবু মহেন্দ্রলাল গর্গ।
(১০) বাবু গোপাল দাস।
(১১) বাবু কালিদাস।
(১২) বাবু শ্যামসুন্দর দাস বি, এ।

পুস্তকখানি অতি উপাদেয় বোধ হওয়াতে উহার বঙ্গানুবাদ "ভারত-মহিলার" প্রিয় পাঠিকা ভগিনীদিগকে উপহার দিবার অভিপ্রায়ে আমি সভার অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিলাম এবং সভা কৃপা করিয়া উক্ত অনুমতি প্রদান করায় উক্ত পুস্তকের মর্ম্মানুবাদ প্রকাশিত হইতে চলিল। আশা করি পাঠিকাগণ ইহা পাঠ করিয়া আনন্দ উপভোগ ও শিক্ষালাভ করিতে পারিবেন।

নাগরী-প্রচারিণী সভার কর্ত্তৃপক্ষগণ এই অনুবাদ প্রচারের অনুমতি প্রদান করায় আমি এই স্থলে তাঁহা-দিগকে আমার ধন্যবাদ এবং আন্তরিক কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিতেছি। "ভারত মহিলার" মাননীয়া শ্রীমতী সম্পাদিকা মহাশয়া "ভারত-মহিলায়" এই অনুবাদ প্রকাশ করিতে স্বীকৃত হওয়ায় আমার বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। পরিশেষে আমার বক্তব্য এই, অনুবাদ একেবারে আক্ষরিক নহে। আবশ্যক বোধে আমি স্থানে স্থানে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন ও পরির্জ্জন করিয়াছি।

অনুবাদক।

প্রথম বিনোদ।

আত্মবিস্মৃতি এবং পতিভক্তি।

একজন সুবিখ্যাত চিন্তাশীল নীতিবান ইংরেজ বলিয়াছেন, "পুরুষ কেবলমাত্র সামাজিক নিয়মাবলী প্রণয়ন করিবার কর্ত্তা, কিন্তু ঐ নিয়ম প্রচলন অর্থাৎ—জাতির আচার ব্যবহার নিয়মিত করিবার দায়িত্ব রমণীর। বস্তুতঃ রমণীই জাতির আচার ব্যবহারের সভ্যতার শিক্ষাদাত্রী। এই বাক্যের অন্তরালে কত গূঢ় তথ্য নিহিত রহিয়াছে তাহা সকলে বিচার করিয়া দেখিবেন। এক স্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করিতে হইলে যেমন পথ নির্ম্মাণ করিতে হয়, তদ্রূপ কোন কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিতে হইলে উহার নিয়মাবলী প্রস্তুত করিতে হয়। পরিষ্কার পথ না থাকিলে স্থানান্তরে গমন করা যেমন অতিশয় কষ্টকর হয়, পদে পদে ভ্রম হয়, পদস্খলন হয়, বিপদে পড়িতে হয়, সেইরূপ কোন কার্য্যের সুনিয়ম বিধিবদ্ধ না থাকিলে বা না জানিলে ঐ কার্য্য করিতে গেলে সহস্র সহস্র বাধা বিঘ্ন আসিয়া পড়ে, নানাবিধ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়, এমন কি ঐ কার্য্য সমাধা করাই অসম্ভব হইয়া উঠে।

পথ প্রস্তুত করা পুরুষের কার্য্য, কিন্তু ঐ পথে চালিত করিবার—ঐ পথে লইয়া যাইবার অধিকার নারীর।

পথ যতই কেন বিস্তৃত, পরিষ্কৃত, সরল, সুগম হউক না কেন, যদি উহাতে যাতায়াতের কোন বন্দোবস্ত না করা যায়, যদি কেহ ঐ পথ দিয়া গমন করিবার উদ্যোগ না করে, তাহা হইলে যেমন স্থানান্তরে যাওয়া যায় না, তদ্রূপ কোন জাতির সামাজিক নিয়মাবলী বা আদব কায়দা যত কেন উৎকৃষ্ট হউক না, যদি কেহ ঐ জাতিকে নিয়ম মত চালাইতে না পারেন, তাহা হইলে সেই জাতির আচার ব্যবহার কখনই সুন্দর হইতে পারে না।

এই সকল কথা বিবেচনা করিয়াই পূর্ব্বোক্ত কবি বলিয়াছেন, যে পুরুষ নিয়ম প্রবর্ত্তন করেন মাত্র কিন্তু ঐ নিয়মানুসারে জাতিকে চালিত করা রমণীরই অধিকার।

এই নীতিবাক্য সর্ব্বথা সত্য। হিন্দুজাতিরও সিদ্ধান্ত তাহাই। কি সামাজিক রীতি নীতি, কি পারিবারিক ব্যবহার, কি অতিথি-সৎকার, কি ধর্ম্মকর্ম্ম যাগ যজ্ঞ, সমস্ত কার্য্যেই রমণীর অধিকার চিরকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে এবং সেই জন্য আমাদিগের পুরাণাদি শাস্ত্রে স্ত্রীজাতির পক্ষে "আত্মত্যাগ ও পতিভক্তি" অতি উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম বা ব্রত বলিয়া পুনঃপুনঃ ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

সংসারে দেখা যায়, যে কার্য্যে দায়িত্ব যত অধিক সে কার্য্য সাধন করাও তত কঠিন। সাধারণ লোকে হয়ত মনে করে, যে রাজচক্রবর্ত্তী সম্রাটের মত সুখী আর কেহই নাই। তাঁহার দুঃখ ক্লেশ নাই, সংসার-চিন্তা নাই, বাধা বিঘ্ন নাই, অভাব মাত্র নাই, তাঁহার জীবনে কেবলই সুখ সুখ সুখ। কিন্তু যাঁহার কিঞ্চিৎমাত্রও অভিজ্ঞতা আছে তিনিই জানেন যে সম্রাটের জীবন কি দুঃখময়, কি বিষাদময়, কি চিন্তাময়। এক দণ্ড, এক পলের নিমিত্তও তাঁহার চিন্তার বিরাম নাই। কবি সেক্‌সপীয়র বলিয়াছেন :—

"শিরেতে যাঁহার রতন মুকুট চিন্তায় বিকল তিনি।"

আমাদের নীতিশাস্ত্র বলেন :—

"রাজার শিরেতে দেখ অভিষেক কালে
কলসে কলসে করে সলিল সেচন,
মঙ্গল বারির সহ অভিষেক ঘট
রাশি রাশি অমঙ্গল করে উদ্গীরণ।"

রামচন্দ্র যদি সম্রাট না হইতেন তাহা হইলে কি তাঁহাকে সীতা বর্জ্জন করিতে হইত? কেন এমন হয়?—যেহেতু সমস্ত দেশের, সমস্ত প্রজার, সুখ সমৃদ্ধি রক্ষার গুরু দায়িত্ব রাজার। আর একটি সমগ্র জাতির সদাচার বা কদাচার সম্বন্ধে গুরু দায়িত্ব স্ত্রীজাতির। এই দায়িত্ব যে অতিশয় কঠিন, তৎসম্বন্ধে কি বিন্দুমাত্রও সন্দেহ আছে?

সমগ্র একটী জাতির সদাচার শিক্ষা দিবার দায়িত্ব-ভার যাহার স্কন্ধে তাহাকে নিজের আচার ব্যবহার সম্বন্ধে কিরূপ যত্ন লইতে হয়, কথোপকথন করিবার সময়ে কত সতর্ক হইতে হয়, আপনাকে আদর্শ স্থানীয় করিয়া তুলিবার জন্য কিরূপ চেষ্টা, যত্ন ও উদ্যোগ করিতে হয়, তাহা না বলিলেও সকলে বুঝিতে পারেন।

এই জন্য রমণীদিগের নিত্যনৈমিত্তিক ব্যবহারাবলীর এবং তাঁহাদের জীবন-চর্য্যার নিয়ম প্রণালী যে বিশেষ সাবধানতা সহকারে প্রণীত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় নাই।

"আত্ম-বিস্মৃতি" ও "পতিভক্তি" এই দুইটী বাক্য শুনিতে যতই কেন কঠিন হউক না, ইহাই মনুষ্য জাতি গঠনের মূলমন্ত্র।

নিজের স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া স্বামীকে ভালবাসা এবং নিজ পরিবার ও মনুষ্য মাত্রের উপকারের জন্য নিজ স্বার্থ ভুলিয়া যাওয়া ঐ মন্ত্র দুইটীর অর্থ। বাস্তবিক বিচার করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, যে জগতে যত কিছু আপদ বিপদ বিবাদ বিসম্বাদ প্রভৃতি "কু"—দেখা যায় তাহা সমস্তই স্বার্থপরতার ফলমাত্র।

কেন না জানে, যে অহঙ্কার মহাপাপের জনক? "আত্ম-বিস্মৃতি" "আত্মত্যাগ", "আত্মনির্ভর", এবং "আত্ম-গৌরব" এই সকল কথা আত্ম অথবা আপনার সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

"আত্ম-বিস্মৃতি" অর্থ আপনাকে আপনি ভুলিয়া যাওয়া। নিজের প্রয়োজন অপেক্ষা অপরের প্রয়োজনের প্রতি অধিকতর লক্ষ্য রাখা, নিজের আবশ্যকতা পরের আবশ্যকতায় বিসর্জ্জন দেওয়া, নিজে উপকার পাইবার আশা বা ইচ্ছা না করিয়া পরোপকারের জন্য পরিশ্রম ও যত্ন করা এবং পরের মঙ্গলের নিমিত্ত নিজে অম্লান বদনে প্রসন্ন মনে নানারূপ কষ্ট সহ্য করা—এই সকল "আত্ম-বিস্মৃতি" হইতেই ঘটিয়া থাকে। "আত্মত্যাগ" শব্দ "আত্মবিস্মৃতির" ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। তবে "আত্মবিস্মৃতি" অপেক্ষা "আত্মত্যাগ" শব্দের গৌরব কিছু অধিক বলিয়া মনে হয়।

স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া পরার্থ পালন করিলে, নিজের উপকার বলি দিয়া পরোপকার সাধন করিলে, একরূপ নিজের উপকারই করা হয়। অর্থাৎ আমি যাহার উপকারের নিমিত্ত আমার নিজের সমুদয় সুখ ও স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া কায়মনোবাক্যে পরিশ্রম করি সেই ব্যক্তি মুখ্যভাবেই হউক অথবা গৌণভাবেই হউক আমার উপকারের জন্য চেষ্টা করিবে না, তাহা কদাপি সম্ভবপর নহে।

এইরূপ যদি সকল লোক জগতের বহু প্রাণীর উপকার করিবার জন্য সর্ব্বদা চেষ্টা করে তাহা হইলে আমাদের সংসারের বোঝা কতই না হাল্‌কা হইয়া যায়।

এক জনে কষ্টে সৃষ্টে যে বোঝা উঠাইতে পারে, যদি দশ জনে মিলিয়া সেই বোঝা তুলিয়া দেয়, তাহা হইলে ঐ বোঝা কাহাকেও ভারী ঠেকে না। কিন্তু যতদিন মনুষ্য নিজের অহঙ্কার অভিমান ও স্বার্থপরতা সম্পূর্ণরূপে বিসর্জ্জন করিতে শিক্ষা না করিবে ততদিন পরার্থপরতার এরূপ সার্ব্বজনিক সাধন সম্ভবপর হইবে না।

ভগবান এই সংসারে যে সকল পদার্থের সৃষ্টি করিয়াছেন, সকলেরই প্রয়োজন আছে,—উহাদের প্রত্যেকেই কোন না কোন রূপে, কোন না কোন প্রাণীর ব্যবহারে আইসে। সৃষ্ট বস্তু পরস্পর পরস্পরের সহায়তা করে। প্রত্যেক বস্তুর স্বরূপ বা তত্ত্ব অবগত হইতে পারিলে উহা হইতে যেরূপ উপকার পাওয়া যায় উহাদের তত্ত্ব অজ্ঞাত থাকিলে অথবা উহাদিগের নিকট হইতে দূরে থাকিলে তদ্রূপ উপকার পাইবার সম্ভাবনা নাই। এইরূপ, মনুষ্যেরও সমুদয় তত্ত্ব বুঝা উচিত।

সমগ্র জাতিকে "আত্ম বিস্মৃতি" শিক্ষা দেওয়া অথবা সমগ্র জাতির মধ্যে এই গুণের বিকাশ সাধন করা রমণীর সাধ্য। কে না জানেন যে আজ যে মাতৃকোল-শায়ী শিশু, কাল সে যুবা হইবে এবং সংসাররূপী শকটের ধুরস্বরূপে সংসার-ভার বহন করিবে? ঐ শিশুর স্নেহ-ময়ী জননী আজ তাহাকে যেরূপে, যে ভাবে গঠিত করিবেন কাল সংসারক্ষেত্রে সে সেইরূপেই নিজ কর্ত্তব্য পালন করিবে। যে স্ত্রী স্বার্থপর নহেন, যাঁহার হৃদয় প্রকৃত পক্ষে পরার্থপরতার অমৃত রসে অভিষিঞ্চিত, তাঁহার সন্তানেরা পরোপকার গুণের অধিকারী এবং নিঃস্বার্থপরায়ণতার আদর্শ স্বরূপ কেনই বা না হইবে?

আমরা যদি আমাদিগের গৃহ সুদৃঢ় ও সুন্দররূপে নির্ম্মাণ করিতে অভিলাষী হই, তাহা হইলে উহার ভিত্তি যাহাতে দৃঢ়ভাবে প্রস্তুত হয় তৎপ্রতি সর্ব্বাগ্রে লক্ষ্য রাখিতে হয়। ভিত্তি মজবুত না হইলে উহা গৃহের সমস্ত ভার বহন করিতে পারিবে কেন? আমাদের শরীররূপী গৃহের সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা খাটে।

যদি বালিকা বয়সে চরিত্ররূপ ভিত্তিকে মজবুত করিয়া তৈয়ার না করা যায়, তাহা হইলে যৌবনে শরীর পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হইলে সংসারের প্রতিকূল পবনে সর্ব্বদা টলমল করিতে থাকিবে, কখনও স্থির ধীর হইতে পারিবে না। আমাদের বুঝা উচিত, যে যদি আমরা বার্দ্ধক্য শান্তিতে কাটাইতে চাহি, তাহা হইলে যৌবনেই আমাদিগকে সাবধান হইতে হইবে, যথোচিত সংযম অবলম্বন করিতে হইবে,—এবং যৌবন নিরাপদে ও নির্ব্বিঘ্নে ক্ষেপণ করিতে চাহিলে শৈশবকালে তৎসম্বন্ধে যত্ন লইতে হইবে —আর শৈশবের যত্ন, সতর্কতা, ভালমন্দ সমস্তই জননীর উপর নির্ভর করে। (ক্রমশঃ)

শ্রীসত্যবন্ধু দাস।

শ্রীমতী গ্যায়োঁ।

শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর, হৃদয়ের এই পাঁচ প্রকার ভাব দ্বারা ঈশ্বর-সাধনার প্রণালী বৈষ্ণব শাস্ত্রে কীর্ত্তিত হইয়াছে। জগতের বিখ্যাত সাধকগণের মধ্যে যাঁহাদের হৃদয়ে যে ভাব প্রবল ছিল তিনি সেই ভাবে পরমাত্মাকে হৃদয়ে ধারণ ও তাঁহাকে প্রীতি করিয়া গিয়াছেন। মহম্মদ ঈশ্বরকে প্রধানতঃ সখারূপে সাধন করিতেন, যীশু তাঁহাকে পিতারূপে সাধন করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু মধুর ভাবের সাধন—ঈশ্বর পতি ও মানবাত্মা পত্নী—এই ভাবপ্রণোদিত সাধন ভারতবর্ষেই বিশেষ ভাবে বিকাশ লাভ করিয়াছে। সাধনের ইহাই সর্ব্বোচ্চ অবস্থা। ঈশ্বরে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণেই সাধকের সাধনার পরিসমাপ্তি; প্রেমিকা পত্নী হৃদয়ের সমস্ত প্রেম স্বামীর হৃদয়ে ঢালিয়া দিয়া গভীর আকুলতার সহিত পতিতে যেমন আত্মসমর্পণ করিতে পারেন তেমন আত্মসমর্পণের দৃষ্টান্ত জগতের আর কোন সম্বন্ধের মধ্যেই পাওয়া যায় না। চৈতন্যদেব ও মুসলমান সাধক হাফেজ এই মধুর ভাবের সাধন করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব শাস্ত্রোক্ত শ্রীরাধা ভগবৎ প্রেমাভিলাষী মানবাত্মারই নারী ভাবের রূপক কল্পনা। পশ্চাদ্বর্ত্তী লেখকগণের নানারূপ অশ্লীলতায় এই রূপক কলঙ্কিত হইয়াছে। ফরাসীদেশীয়া ভক্তিপ্রাণা নারী শ্রীমতী গ্যায়োঁ (Mdame De La Mothe Guyon) এই মধুর ভাবে ভগবানকে সাধন করিয়াছিলেন। ইঁহার সমগ্র জীবন ভগবানের লীলার এক অপূর্ব্ব ইতিহাস। শ্বশ্রূ ও স্বামী ইঁহার ভগবৎভক্তি-পরায়ণতা দেখিয়া বিরক্ত হইতেন, ইঁহার সাধন-প্রণালীর নূতনত্ব দেখিয়া ফ্রান্সের ধর্ম্মযাজকগণও ইঁহার প্রতি বিরূপ হন। ধর্ম্মদ্রোহী বলিয়া রাজবিচারে ইনি দীর্ঘকাল কঠোর কারাযন্ত্রণা ভোগ করেন। ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া ধর্ম্মাভিমানী শত্রুগণ ইঁহার নির্ম্মল চরিত্রের বিরুদ্ধে নানা কুৎসা রটনা করে। কিন্তু অগ্নির সম্মুখে তৃণ যেমন ভস্মসাৎ হইয়া যায় তাঁহার ভক্তিদীপ্ত জীবনের সম্মুখে শত্রুগণের সকল কুৎসাও তেমনি ভিত্তিহীন বিদ্বেষ-কল্পনা বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। অবশেষে বিলাসিতাপূর্ণ ফরাসীদেশে বিমল ভক্তিধর্ম্মের মধুময় শান্তিবার্ত্তা প্রচার করিয়া, অনেক প্রতিভাশালী সাধকের চিত্তে তাঁহার সাধনপ্রণালীর উৎকর্ষতা বদ্ধমূল করিয়া, অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইনি পরলোকগমন করেন। ফরাসী ভাষায় ইঁহার রচিত অনেক ধর্ম্মগ্রন্থ ও সঙ্গীত এবং কবিতা আছে। তাহার কতকগুলি ইংরাজীতে অনুবাদিত হইয়াছে। সেগুলি অতি মধুর ও শিক্ষাপ্রদ। অবসর হইলে ভবিষ্যতে "ভারত মহিলায়" শ্রীমতী গ্যায়োঁর মধুর জীবন সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

বাংলা দেশের দশা।

পৃথিবীর কোন জাতি চির দিন ঘৃণিত পরাধানতার তিমিরগর্ভে বাস করে নাই, ভারতবাসীও চির পরাধীন থাকিবে না। বিধাতার রাজ্যে এমন বিধান কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না। কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাসে ভারতবাসীর শোচনীয় অবস্থার সহিত তুলনা মিলে এমন আর কোন জাতি বা দেশের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। এত ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম, ভিন্ন ভিন্ন জাতি, নারীজাতির এমন হীনাবস্থা, বোধ হয়, স্বাধীন বা পরাধীন আর কোন দেশেই নাই, কখনও ছিল কি না জানি না। দরিদ্রের প্রতি ধনীর অত্যাচার,

ছোটর প্রতি বড়র উৎপীড়ন, সকল দেশেই আছে, কিন্তু 'বিধাতা চির দিনের জন্য তোমাকে ছোট করিয়া দিয়াছেন; জ্ঞান ধর্ম্মে তুমি যতই উন্নত হও না কেন তুমি আমার অস্পৃশ্য' এ কথা ভারতবর্ষ ছাড়া আর কোন দেশে অতি বড় উচ্চশ্রেণীস্থ উচ্চ পদস্থ লোকও অতি ছোট নিম্নশ্রেণীস্থ লোককে বলিতে সাহসী হয় না। বিধাতার প্রদত্ত অধিকারে ভারতবাসী ভারতসন্তানকে, ভারতের পুরুষ ভারতের নারীকে যেমন বঞ্চিত করিয়াছে, তাহার তুলনা আর কোথাও আছে কি না জানি না। ভারতবাসীর পরাধীনতা ও বর্ত্তমান লাঞ্ছনা এই সকল ঘোর পাপের প্রায়শ্চিত্ত। প্রায়শ্চিত্ত বিধাতার নিয়ম। আমরা ত পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত ভোগ করিতেছিলাম, কিন্তু হঠাৎ নুতন করিয়া দেশে আবার তীব্র অশান্তির আগুণ জ্বলিয়া উঠিল কেন? পূর্ব্ববঙ্গে ও পঞ্চনদে হাহাকার উত্থিত হইল কেন?

অসার তেজোবীর্য্যহীন ভারতবাসীর মোহ নিদ্রা কিছুতেই ভঙ্গ হইতেছে না দেখিয়া ভগবান ইংরেজের অবিচাররূপ তাঁহার রুদ্র আশীর্ব্বাদে এবার ভারতবাসীকে জাগ্রত করিতেছেন। হিন্দু! তুমি না বড় আধ্যাত্মিকতার বড়াই কর, জগতে মহা ধার্ম্মিক বলিয়া আত্মগৌরব ঘোষণা কর? 'সংসার-বিষয়-বাসনায় উদাসীন, বর্ত্তমান জ্ঞান বিজ্ঞানে অশিক্ষিত হইলেও মহাধন ধর্ম্মধনে আমরা অধিকারী' এই ভ্রান্ত আত্মপ্রবঞ্চনায় তোমরা না বড় উল্লাসিত? তোমার চক্ষুর সম্মুখে, তুমি যাহাকে অস্পৃশ্য মনে কর সেই মুসলমান তোমার দেবমূর্ত্তিকে লগুড়াঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ করিল, তোমার দেবমন্দির মূত্র পুরীষে অপবিত্র করিল, তোমার ধর্ম্মের বড়াই কোথায় গেল? তুমি কি করিলে? কত অসার হইয়াছ, অধঃপাতের কত নিম্নতম সোপানে অবতরণ করিয়াছ, জান না? ভগবান তাই বুঝাইয়া দিলেন বাঙ্গালী কত অধম, বাঙ্গালীর ধর্ম্ম কর্ম্ম, বাঙ্গালীর আত্মসম্মান কেবল বাগাড়ম্বর মাত্র। এখন একবার চিন্তা কর, নিজের অসারতা উপলব্ধি কর। জাগিবার আয়োজন কর। জেলখানার কয়েদীর মত নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া লাভ কি! জানিয়া শুনিয়া আত্ম পাপ উপলব্ধি করিয়া প্রায়শ্চিত্ত কর। বৃথা ধর্ম্মাভিমানে অন্ধ হইয়া উচ্চ জাতি সকল নীচ জাতির প্রতি যে অত্যাচার করিয়াছ এবং এখনও করিতেছ সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর। জাত্যভিমানের বশবর্ত্তী হইয়া আপনার ভাইকে হেয় জ্ঞান করিয়া দেশমাতার অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে যে অবশ করিয়া রাখিয়াছ তাহার প্রায়শ্চিত্ত কর।

তোমরা ত ভারত নারীর সতীত্বের কতই গৌরব কর! তোমাদের শাস্ত্র, তোমাদের কাব্য পুরাণের দোহাই দিয়া তোমরা জগতের সম্মুখে তোমাদের নারীর সতীত্বের গৌরব কর। কিন্তু হে কাপুরুষগণ, তোমাদের মাতা-ভগিনী ও স্ত্রী-কন্যাকে তোমাদের সাধের "অবরোধ" হইতে কাড়িয়া লইয়া বর্ব্বরগণ তাঁহাদের প্রতি যে ভীষণ অত্যাচার করিল, তোমরা তাহার কি করিলে? ভীরু ফেরু পালের ন্যায় আপনার পৈতৃক প্রাণটা লইয়া পলায়ন করিতে লজ্জা হইল না? এই অধম প্রাণটার কি এতই মায়া! হতভাগ্যগণ! নারীজাতিকে অন্তঃপুরে রাখিয়া তাঁহাদের শরীরের বল হরণ করিয়াছ, বহিঃপ্রকৃতির সাহায্যে হইতে বঞ্চিত করিয়া তাঁহাদের অভিজ্ঞতা লাভ ও ভূয়োদর্শনের পথ অবরুদ্ধ করিয়াছ, জ্ঞান লাভের পথে অর্গল দিয়া তাঁহাদিগকে কৃপাপাত্র করিয়া রাখিয়াছ—আর আজ বর্ব্বর যখন তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিতেছে—তরঙ্গাহত বেতস-লতার ন্যায় কম্পিত দেহে, ব্যাধভীতা কুরঙ্গিনীর ন্যায় আকুল নয়নে, রক্ষাকর্ত্তা তোমাদের দিকে তাহারা চাহিতেছে, আর তোমাদের ঐ ঘৃণিত প্রাণের মায়ায় তোমরা তাহাদের দিকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিয়া উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিতেছ! একবার আপনার মূল্য হৃদয়ঙ্গম কর। সবলে নারীর আত্মশক্তি বিকাশের পথ রুদ্ধ করিয়া, বিধিদত্ত অধিকারে তাঁহাদিগকে বঞ্চিত করিয়া আপনাকে কত হীন করিয়াছ, তোমার দেশমাতাকে কত হীন করিয়াছ, একবার চিন্তা কর! তোমাদের অপেক্ষাও অধিকতর নিষ্ঠাবান হিন্দু মহারাষ্ট্র প্রভৃতি অন্যান্য জাতি ত এরূপ করে নাই, কোন বর্ব্বর যদি তাহাদের নারীগণের প্রতি এরূপ

অত্যাচার করিতে যায় তাহারা বোধ হয় তোমাদের মত পলায়ন করিবে না। আর যদি তাহারা পলায়ন করে তবে আহাদের নারীগণেরও আত্মরক্ষার ক্ষমতা আছে। তোমাদের ন্যায় ভারতের অন্যান্য প্রদেশের পুরুষগণ তাহাদের নারীগণকে এত অধঃপাতিত করে নাই। বাঙ্গালী! একবার আত্মাবস্থা উপলব্ধি কর। বৃথা বড়াই পরিত্যাগ কর। নারীজাতির প্রতি যে অত্যাচার করিতেছ তাহা হইতে বিরত হও এবং কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর। নতুবা তোমাদের উদ্ধার নাই। এত দেখিয়া শুনিয়াও, এত সহিয়াও যদি না জাগ তবে অধঃপাতে যাও। শুধু রসনাকণ্ডূয়ন করিয়া—বক্তৃতার ফোয়ারা খুলিয়া দিয়া, অথবা লেখনীকে নাচাইয়া—ভাষার লহরী তুলিয়া তাহাতেই কর্ত্তব্যের পরিসমাপ্তি করিও না। তোমাদের লেখা বা তোমাদের বলার মূল্য কি? ইংরেজ এখনও তোমাদিগকে ভাল করিয়া বুঝিতে পারে নাই, তাই তোমাদের গলার ফাঁকা আওয়াজকে একটু ভয় করে। নতুবা ইংরেজরাজ তোমাদের বক্তৃতা বন্ধ করিয়া দিত না। কিন্তু তাহারা ইহা জানে, যে বাঙ্গালীর ফাঁকা গলার খইফুটানো আওয়াজের মূল্য কাণা কড়ি। বীরভূমি পঞ্চনদে লালা লাজপত রায় কি তোমাদের বাক্যবাগীশ বক্তাদের মত ভাষার ফুৎকারে ইংরেজরাজকে সাত সমুদ্র তের নদীর পরপারে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন? তোমাদের বক্তারা যত লম্ফ ঝম্প করে, যত বড় বড় কথা বলে, তিনি বা শিখবীর অজিত সিংহ কি তাহার শতাংশের একাংশও করিয়াছিলেন? তথাপি ইংরাজ—স্বীকার করি ভ্রান্ত ইংরাজ—তোমাদের নেতাদিগকে ত ভয় করিল না? তাহারা জানে তোমাদের বক্তৃতার দাম কত!

ভাই বাঙ্গালী, এখনও জাগ, শুধু ইংরাজকে গালি দিয়া লাভ কি? ইংরাজ স্বার্থের জন্যই এদেশে আসিয়াছে। তাহাদের স্বার্থ বজায় রাখিয়া যদি তোমাদের কিছু উপকার করা চলে, তাহারা ততটুকু করিতে রাজি আছে। তাহাদের স্বার্থ, তাহাদের ব্যবসা বাণিজ্য রক্ষার জন্য তাহারা তোমাদের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করা প্রয়োজন মনে করে, সকলই করিবে। সাম, দান, ভেদ, দণ্ড সকল নীতিই অবলম্বন করিবে। ফুলার দণ্ড দিয়া ব্যর্থ প্রযত্ন হইলেন, হেয়ার ভেদ নীতির আশ্রয় লইয়াছেন। হিন্দু মুসলমানে এখন মারামারি কাটাকাটি করিয়া মরিতেছে। দোষ কি শুধু ইংরাজের! ইটালীর উদ্ধারকর্ত্তা মহাপুরুষ ম্যাটসিনি তাঁহার পরাধীন দেশবাসীকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, "দাবী দাওয়ার দিকে তত মনোযোগ দিও না, আপনার কর্ত্তব্যের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, আপনার কর্ত্তব্য সাধন কর।" আপনার যাহা করিবার আছে তাহা করিবে না, বিদেশী পণ্যবর্জ্জনের প্রতিজ্ঞা করিয়া পদে পদে সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিবে; ধর্ম্মের বড়াই করিয়া, দেব প্রতিমাকে আরাধ্য দেবতার প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া অর্চ্চনা করিয়া চক্ষের সম্মুখে মুশলমান কর্ত্তৃক তাহা নির্য্যাতিত হইতে দেখিবে, মাতা-ভগিনী, স্ত্রীকন্যাকে বর্ব্বর কর্ত্তৃক আক্রান্ত দেখিয়া উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিবে, আবার "স্বরাজ" স্থাপন করিবে, স্বাধীনতা কি এতই সুলভ!

শ্রী—

সাময়িক প্রসঙ্গ।

পূর্ব্ববঙ্গ ও পঞ্জাবের অবস্থা।—পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দু মুশলমানের বিরোধ, মুশলমান কর্ত্তৃক হিন্দুর দেবপ্রতিমাধ্বংস ও হিন্দুনারীর উপর অত্যাচারের বিবরণ সংবাদপত্রে পাঠ করিয়া ভারতবাসী মাত্রেই দুঃখে ম্রিয়মাণ হইয়াছেন। হিন্দু ও মুশলমান বহু দিন শান্ত প্রতিবেশীর ন্যায় এক সঙ্গে বাস করিতেছে, হঠাৎ কেন এমন হইল? ইংরাজ বলিতেছেন, পূর্ব্ববঙ্গের মুশলমানগণ বিলাতী জিনিষ ব্যবহার করিতে চায়, হিন্দুগণ তাহাতে বাধা দেয়, এই জন্য অশিক্ষিত মুশলমানগণ হিন্দুদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত হইয়াছে। এই কথার মূলে কোন সত্য আছে কি না জানি না, যদি থাকে তাহা অতি সামান্য। গবর্ণমেণ্ট স্বজাতির বাণিজ্য নাশের আশঙ্কায় ভীত হইয়াছেন। জনরব এই যে গবর্ণমেণ্টের তোষামোদী

দেশ-শত্রু কয়েক জন স্বার্থপর লোক গবর্ণমেণ্টকে সন্তুষ্ট করিবার আশায় অশিক্ষিত মুশলমানদিগকে, বিলাতী দ্রব্য ব্যবহারের প্রধান বিরোধী হিন্দুদিগের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতেছে। অনেকে মনে করেন, এই আত্ম-বিরোধে বিদেশী শাসক সম্প্রদায়ের আনন্দিত হইবারই কথা। তাহাদের অতিরিক্ত মুসলমান-প্রীতি এবং হিন্দু-বিরাগ দেখিলে সেই রূপ সন্দেহই হয় বটে। কিন্তু ইংরাজ কি এতই নির্ব্বোধ! রাজশক্তির শান্তি রক্ষার ক্ষমতায় প্রজাসাধারণের অবিশ্বাস জন্মিলে সেই রাজশক্তির অবস্থা নিরাপদ থাকে না। গবর্ণমেণ্টের স্থানীয় কর্ম্মচারীগণ যে নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিতেছে তাহা কখনই শাসক-সম্প্রদায়ের নেতৃবর্গের অনুমোদিত নহে। অল্পবুদ্ধি শাসনকর্ত্তাগণ ভ্রমে পতিত হইয়া উর্দ্ধতন শাসনকর্ত্তাকে এবং বিলাতের মন্ত্রীসভাকেও ভ্রান্তিতে নিক্ষেপ করিতেছে। তাঁহারা মনে করিতেছেন, ভারতে দ্বিতীয় সিপাহী-বিদ্রোহের সূচনা দেখা যাইতেছে। ইংলণ্ডের সমর-মন্ত্রী সে দিন বলিয়াছেন, 'ভারতে যদি পুনরায় বিদ্রোহ উপস্থিত হয় রাজসৈন্য পূর্ব্ব বারের ন্যায় এবারও সে বিদ্রোহ দমন করিতে সমর্থ হইবে।' ইংরাজগণ ভারতবর্ষের অবস্থা বুঝিতে কি শোচনীয় ভ্রম করিতেছেন এই উক্তি হইতেই তাহা উপলব্ধি হয়।

এই ভ্রান্তির বশবর্ত্তী হইয়াই ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট শ্রীযুক্ত লালা লাজপত রায়কে দেশান্তরিত করিয়াছেন। লালা লাজপত ধীর, চিন্তাশীল ও ধার্ম্মিক স্বদেশসেবক। ওকালতী ব্যবসায় দ্বারা তিনি প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন এবং তাহার অধিকাংশ তিনি আর্য্যসমাজে দান করিয়াছেন। পঞ্জাবের আর্য্যসমাজ কতকটা ব্রাহ্মসমাজের অনুরূপ। লাজপত রায় এই আর্য্যসমাজের অন্যতম নেতা। তাঁহার নির্ব্বাসনে সমগ্র আর্য্যসমাজ দুঃখে অভিভূত হইয়াছে। অকারণে নিতান্ত অন্যায় রূপে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন। মহামতি গোখলে এসম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন আমাদের নিকট তাহাই সত্য বলিয়া অনুমিত হয়। তিনি লিখিয়াছেন :—গবর্ণমেণ্টের কতকগুলি নূতন টেক্সে পঞ্জাবের প্রজাবর্গ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে উত্তেজিত হইয়াছিল, "পঞ্জাবী" পত্রের সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারীর শাস্তিতে ও রাওলপিণ্ডির গোলযোগেও অনেক পঞ্জাবী উত্তেজিত হইয়াছিল, পঞ্জাবের সৈন্য-বিভাগেও পদোন্নতি বিষয়ে অবিচার হওয়াতে দেশীয় সৈন্যগণ অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিল—তাহাতে আবার গত ১০ই মে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহের ৫০ বৎসর পূর্ণ হইবার দিন ছিল, এজন্য গবর্ণমেণ্ট বিদ্রোহের আশঙ্কা করিয়া উক্ত তারিখে অথবা তৎপূর্ব্বে লোকের মনে ভীতি সঞ্চারের জন্য পঞ্জাবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক নেতা লাজপত রায়কে হঠাৎ নির্ব্বাসিত করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত গোখলে আরো বলেন, লাজপত রায় কখন কখন গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সামান্য তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন বটে কিন্তু তাহা কর্ত্তব্যের মধ্যেই নহে। তিনি শান্ত, ধীর, চিন্তাশীল লোক, তিনি বৃথা-কল্পনার পশ্চাতে ধাবমান হন না। বর্ত্তমান সময়ে রাজবিদ্রোহের কল্পনারূপ আকাশ কুসুম তাঁহার মনে কিছুতেই স্থান পাইতে পারে না, তিনি এত নির্ব্বোধ নহেন। লাজপত রায় গোখলের বন্ধু, তাঁহাকে তিনি ভালরূপেই জানেন। গবর্ণমেণ্ট এই নিরপরাধ শক্তিশালী ধার্ম্মিক পুরুষকে তাঁহার স্ত্রীপুত্র পরিবার হইতে বিচ্ছিন্ন করতঃ বিদেশে নির্ব্বাসিত করিয়া যে মহা ভ্রম করিয়াছেন তাহার বিচার ভগবান করিবেন। লাজপত রায় নির্ব্বাসনে যাইবার সময় এক জন বন্ধুকে লিখিয়া গিয়াছেন, "আমার জন্য ভাবিও না, ঈশ্বর যাহা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন।" ঈশ্বর অবশ্যই মঙ্গল করিবেন, ভারতবাসী ইংরেজের এই সকল ব্যবহার দেখিয়া জাগ্রত হউক।

সর্দার অজিত সিংহ নামক আর এক ব্যক্তির নির্ব্বাসনের আদেশ প্রচারিত হইয়াছে। ইনি জাতিতে শিখ, অতি শক্তিশালী পুরুষ এবং প্রজা-সাধারণের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র। গবর্ণমেণ্ট এখনও ইঁহাকে ধরিতে পারেন নাই।

মাতাজী তপস্বিনী—সুপ্রসিদ্ধ মাতাজী তপস্বিনীর মৃত্যু হইয়াছে। ইঁহার ন্যায় শক্তিশালী নারী বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষে আর বড় বেশী নাই। ইঁহার মৃত্যুতে মহাকালী পাঠশালা অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। ১৩১৩ সালের ভাদ্র মাসের "ভারত-মহিলায়" ইঁহার বৃহৎ প্রতিকৃতি ও জীবনী প্রকাশিত হইয়াছিল।

২১১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্ম মিশন প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত দ্বারা মুদ্রিত।

মাতা ও পুত্র।

(সেণ্ট মণিকা ও সেণ্ট অগষ্টিন)

ভারত-মহিলা

The woman's cause is man's ; they rise or sink
Together, dwarfed or God-like, bond or free ;
If she be small, slight-natured, miserable,
How shall men grow ?

Tennyson.

৩য় ভাগ। } আষাঢ়, ১৩১৪। { ৩য় সংখ্যা।

নারীজাতির শিক্ষা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

বর্ত্তমান সময়ে রমণীগণ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিযোগী পরীক্ষা দিতেছেন বটে, কিন্তু সে শিক্ষা-প্রণালীর অনেক অভাব ক্রটি আছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহা আলোচ্য নহে। ইহাতে যে পরিমাণ সময় ও শক্তি বিদ্যাশিক্ষার জন্য ব্যয়িত হয়, সেরূপ সুফল লাভ হয় না। বালিকাদিগের জন্য পৃথক শিক্ষা-প্রণালী অবলম্বন করিলে অধিকতর সুফল লাভের আশা আছে। যে শিক্ষায় নারী-জীবনের সাফল্য লাভের সহায়তা হইতে পারে, তাহাই উপযুক্ত শিক্ষা। বালিকাদিগের শিক্ষা দ্বিবিধ হওয়া উচিত, (১) সাধারণ, (২) উচ্চ। যতটুকু শিক্ষা না করিলে জীবনের সাধারণ কর্ত্তব্য সুসম্পন্ন করা যায় না, তাহাই সাধারণ শিক্ষার উদ্দেশ্য হইতে পারে। দ্বিতীয়টী উচ্চ শিক্ষা। সুযোগ এবং যোগ্যতা অনুসারে নারীগণ উচ্চশিক্ষা লাভ করিবেন। এদেশে বাল্য-বিবাহের প্রচলন হেতু প্রায় সকল বালিকাই উচ্চশিক্ষা লাভে বঞ্চিতা থাকিবেন, তাঁহাদিগের সেই অল্প সময়ের মধ্যে যতদূর সম্ভব প্রয়োজনীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করিলে সঙ্গত হয়। সাধারণ শিক্ষা-প্রণালীতে উত্তমরূপে মাতৃভাষা শিক্ষা, অঙ্ক, ভূগোল, স্বদেশের ইতিহাস, স্বাস্থ্যতত্ত্ব, সহজ বিজ্ঞান, শিল্প এবং সঙ্গীত শিক্ষার ব্যবস্থা থাকা উচিত।

উচ্চশিক্ষা—ইংরাজী ভাষা, উচ্চ গণিত, ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন, সংস্কৃত ইত্যাদিতে ব্যুৎপত্তি লাভ।

গার্হস্থ্য শিক্ষা—গার্হস্থ্য ধর্ম্ম এবং শিশুপালন নারীজাতির প্রধান দুই কর্ত্তব্য। এতদুভয় কর্ত্তব্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে হইলে রমণীদিগকে বহু বিষয় শিক্ষা করিতে হইবে। সকল বিষয়ে সাধারণ জ্ঞান না থাকিলে গৃহিণীপনা উত্তমরূপে সম্পন্ন হয় না। তদ্ভিন্ন রমণী মাত্রেরই সকল বিষয়ে পতির সহকারিতা করা কর্ত্তব্য। হিসাব পত্র, চিঠি পত্র লেখা, গৃহস্থালীর সকল কর্ত্তব্য রমণীরই করা উচিত। পুরুষজাতি বাহিরে নিরন্তর কঠোর জীবন-সংগ্রামে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হইবেন, আবার গৃহকর্ম্মও যদি তাঁহার স্কন্ধে পতিত হয়, নিশ্চয়ই তাহা অনুচিত হইবে। গৃহ তাঁহাদিগের নিকট আরামের ও শান্তি সম্ভোগের স্থল হওয়া উচিত। অপর পক্ষে গৃহিণীর উপর অর্থোপার্জ্জনের ভার কোন ক্রমেই ন্যস্ত হওয়া উচিত নয়। ইহাও এক প্রকার অত্যাচার। এ সম্বন্ধে জন ষ্টুয়ার্ট মিল লিখিয়াছেন :—

If in addition to the physical suffering of bearing children, and the whole responsibility of their care and education in early years

the wife undertakes the careful and economical application of the husband's earnings to the general comfort of the family, she takes not only her fair share, but usually the larger share. of the bodily and mental exertion required by their joint existence. If she undertakes any additional portion it seldom relievs her from this but only prevents her from performing of it properly.

Subjection of Women.

"নারীগণ সন্তান গর্ভে ধারণের শারীরিক ক্লেশ এবং তাহাদিগের পালন এবং শৈশব-শিক্ষার সমুদায় ভার বহন করিয়া থাকেন। অধিকন্তু পতির উপার্জ্জিত অর্থ সাবধানতা এবং বিচক্ষণতার সহিত ব্যয় করিয়া সাংসারিক অভাব মোচন এবং গৃহের সুখ স্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি করেন। এতদ্দ্বারা দাম্পত্য জীবনে গৃহধর্ম্ম পালনের শারীরিক এবং মানসিক শ্রমের ভার তাঁহারা যোগ্যরূপেই বণ্টন করিয়া লন। যোগ্য বলিলেও ঠিক হয় না, বরং তাঁহারাই গুরুতর ভার বহন করেন। ইহার উপরে যদি আর কোন ভার তাঁহাদিগের উপরে অর্পিত হয়, তাহা হইলে এ সকল কর্ত্তব্য পালনের দায়িত্ব হইতে তাঁহারা কদাচ নিষ্কৃতি লাভ করিবেন না, ফলতঃ তদ্দ্বারা এ সকল কর্ত্তব্য উপযুক্তভাবে পালন করিতে তাঁহারা অক্ষম হইবেন।"

নারীগণ সন্তান পালন এবং জীবিকা উপার্জ্জন এই উভয় কর্ম্ম একত্র সম্পাদন করিতে পারেন না। প্রকৃতি নারীকে এরূপ আশ্চর্য্য শক্তিসম্পন্ন করেন নাই। ইহাতে জননী এবং সন্তান উভয়ের ক্লেশের একশেষ হয় এবং সংসারে নানাবিধ বিশৃঙ্খলা ঘটে, দুর্নীতি প্রশ্রয় পায়। রমণীগণ গৃহে থাকিয়া অবসর সময়ে নানাপ্রকারে যদি কিছু কিছু উপার্জ্জন করিতে সক্ষম হন, তাহা ভালই, ইহাতে আর্থিক স্বচ্ছলতা হইতে পারে। কিন্তু নারীকে যে কোন কারণেই হউক, গৃহ ছাড়িয়া বাহিরে অধিকক্ষণ সময়ক্ষেপ করা উচিত নহে।

চিন্তার কার্য্যে পতির সহায়তা করিতে হইলে অশিক্ষিতা পত্নীর দ্বারা শিক্ষিত পতির কোন সহায়তা হইতে পারে না।

সহজ বিজ্ঞান—নারী মাত্রকেই সহজ বিজ্ঞান অর্থাৎ প্রাকৃতিক জগতের স্থূল নিয়ম সকল শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। এই সঙ্গে স্বাস্থ্য বিজ্ঞানও প্রত্যেকের শিক্ষা করা উচিত।

শিল্প—সূচিশিল্প, চিত্রবিদ্যা প্রভৃতি বালিকাদিগের অবশ্য শিক্ষণীয় বিষয়। ইহাতে গৃহের ব্যয় সঙ্কোচ এবং শ্রীবৃদ্ধি সাধনের সহায়তা হয়। তদ্ভিন্ন শিশুদিগকে শিক্ষা দিবার সময় চিত্রবিদ্যার সাধারণ জ্ঞানের প্রয়োজন হয়। তাহাদিগকে স্বহস্তে বিবিধ প্রাণী ও বিবিধ পদার্থের চিত্র অঙ্কিত করিয়া দেখাইতে হয়।

গীতবাদ্য—বালিকাদিগের গীতবাদ্য শিক্ষার আবশ্যকতা সম্বন্ধে বলিয়া শেষ করা যায় না। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশে জীবন-সংগ্রাম যেরূপ কঠোর হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহাতে গৃহে নারীগণ সঙ্গীত ও বাদ্যের সাহায্যে পরিজন-দিগের চিত্ত বিনোদন না করিলে জীবনভার বড়ই গুরু হইবে।

সেকালে জীবন-সংগ্রাম এরূপ কঠোর ছিল না, সকলে স্বচ্ছন্দে শান্তভাবে জীবন যাত্রা অতিবাহিত করিত। তখন দেহ মনের পরিতৃপ্তির জন্য এরূপ চিত্তবিনোদনের আবশ্যকতা ছিল না। বর্ত্তমান সময়ে নারীগণ এ সম্বন্ধে উদাসীন থাকিলে গৃহের সুখ হ্রাস হইবে। কবিতা এবং গীতবাদ্যের সাহায্যে শৈশব-শিক্ষা সম্পন্ন হওয়া উচিত। সঙ্গীতে সকলের চিত্ত আকৃষ্ট হয়, বিশেষতঃ শিশুদিগের কিণ্ডার গার্টেন শিক্ষা-প্রণালীতে সঙ্গীতের সহায়তা বিশেষ ভাবে গ্রহণ করা হয়। নারীগণকে এই শিক্ষা-প্রণালী বিশেষভাবে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। Kinder garten শিক্ষা-প্রণালী শিশুশিক্ষায় এক নব যুগ আনয়ন করিয়াছে। এই শিক্ষা-প্রণালীর মূলে অতি গভীর সত্য সকল নিহিত আছে, সেই সকল ভাব প্রত্যেক জননীর প্রাণে মুদ্রিত করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। সন্তান পালন নারীজাতির সকল কর্ত্তব্যের শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য। সামান্য শিক্ষায় নারীগণ কদাপি এই গুরুতর কর্ত্তব্য পালনে সক্ষম হইবেন না। আমরা যে দিকেই দৃষ্টিপাত করি, নারীর সুশিক্ষার আবশ্যকতা বিশেষ ভাবে অনুভব করি। জননী হওয়া যেরূপ সহজ, সন্তান পালন করা সেই পরিমাণে কঠিন। সন্তান পালন করিবার উপযুক্ত শিক্ষা লাভ না করিয়া কাহারও জননী হওয়া কর্ত্তব্য নহে।

রন্ধন, গৃহকর্ম্ম এবং শুশ্রূষা—এসকল বিষয়ে নারী মাত্রেরই দক্ষতা লাভ করা কর্ত্তব্য। এই সকল বিদ্যা শিক্ষা করিবার প্রকৃত স্থল গৃহ। অভ্যাস দ্বারাই এসকল বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করা যায়। বিলাতে শুশ্রূষা-বিদ্যা রীতিমত শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা আছে। রন্ধন সম্বন্ধেও শিক্ষালয় আছে। কিন্তু এ সকল মুখে মুখে শিখিবার নয়, কার্য্যে সম্পন্ন করিবার বিষয়।

অনেকে বলিয়া থাকেন, বাল্যাবধি পুস্তকের কীট হইয়া থাকিলে রমণীগণ গৃহধর্ম্ম পালনে একান্ত অযোগ্যা হইবেন। স্বাস্থ্য এবং গার্হস্থ্য শিক্ষাকে অবহেলা করিয়া কোন শিক্ষাই বাঞ্ছনীয় হইতে পারে না। কর্ম্মগত জীবনে অধিকতর যোগ্যতা লাভ করিবার জন্যই জ্ঞান শিক্ষা। রমণী কবিই লিখিয়াছেন ঃ—

অধ্যয়ন অধ্যাপন নহেরে দুষ্কর,
দুষ্কর চরিত্রে শাস্ত্র করা প্রতিভাত।
আলো ও ছায়া।

পুস্তকের কীট হইয়া থাকা কি পুরুষ, কি নারী কাহার জীবনের উদ্দেশ্য হইতে পারে না। বিদুষী রমণী গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পালনে অপটু হইবেন, তাহা কখনই হইতে পারে না। বরং এবিষয়েও তাঁহার অধিকতর উপযুক্ততা এবং বিজ্ঞতা প্রদর্শন করিবারই কথা। তবে সাংসারিক কর্ম্ম সকলকে অবহেলা করিলে ক্রমে তাহাতে অপটুতা জন্মে। পাশ্চাত্য দেশসমূহে পঠদ্দশায় বালিকাগণ অনেকেই বোর্ডিংএ বাস করে, তাহাতে তাহাদিগের সাংসারিক কর্ম্মে অনেক সময় অপটুতা জন্মে। জাপান সকলেরই ভ্রম সংশোধন করিয়া লইয়াছে। সেখানে বালিকাদিগের জন্য বোর্ডিং আছে, তাহার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকার। সেখানে গৃহেরই অনুকরণে ৫।৭ টী বালিকা লইয়া ভিন্ন ভিন্ন ক্ষুদ্র সংসার রচিত হয়। বালিকাগণ স্বহস্তে আপনাদিগের আবশ্যকীয় সমুদায় কর্ম্ম সম্পন্ন করে, অথচ সকলে একত্র বিদ্যাশিক্ষাও করিয়া থাকে।

জ্ঞানলাভ করা যে অবশ্য কর্ত্তব্য সে সম্বন্ধে আর মতদ্বৈধ হইতে পারে না, কিন্তু অর্থকরী শিক্ষার দ্বার নারীর নিকট উদ্ঘাটিত হওয়া উচিত কিনা সে সম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয়। সুতরাং ইহার সম্যক্ আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। যে সকল নারী অবিবাহিতা থাকিবেন তাঁহাদিগকে আপনাপন জীবিকা উপার্জ্জন করিবার উপযুক্ত শিক্ষালাভ করিতে হইবে। বর্ত্তমান সময়ে অনেক শিক্ষিতা রমণী অধ্যাপনা কিম্বা ভৈষজবৃত্তি দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিতেছেন। কিন্তু সংখ্যার অল্পতাবশতঃ এক্ষেত্রে তাহারা অভাব পূর্ণ করিতে পারিতেছেন না। রমণীর জীবন-সংগ্রাম এখনও কঠোর হয় নাই। বর্ত্তমান সময়ে অন্তঃপুরবাসিনী রমণীগণেরও কিছু কিছু উপার্জ্জনের উপায় হইয়াছে। সময় থাকিলে গৃহে থাকিয়া অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা করা নারীর পক্ষে শ্রেয়ঃ। নানা প্রকার শিল্প, মোজার কলে মোজা প্রস্তুত, সূতাকাটা প্রভৃতি কর্ম্মে নারীর অবকাশ সময় নিয়োগ করা উচিত।

বিধবাদিগের অর্থোপার্জ্জন—এদেশের পুরাতন একান্নভুক্ত পরিবারের প্রথা ভগ্ন হওয়াতে অনেক বিধবার জীবন ধারণ অতি কঠিন হইয়াছে। অনেক ভদ্র স্ত্রীলোক জীবন ধারণের জন্য পাচিকার ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু শিক্ষা দিলে এবং অর্থোপার্জ্জনের দ্বার উন্মুক্ত করিলে তাঁহারা ইহা অপেক্ষা অধিক সম্মান এবং লাভকর ব্যবসায় অবলম্বন করিতে পারিতেন। কিন্তু সমাজ তাহার ব্যবস্থা করিতেছেন কই? যতদিন নারী এক মুষ্টি অন্নের প্রত্যাশায় অপরের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে বাধ্য হইবেন ততদিন তাঁহাদিগের লাঞ্ছনার শেষ থাকিবে না। অসহায় বিধবাগণ সমাজের অগৌরবের কারণ। হিন্দু বিধবাগণ কি ভাবে জীবন যাপন করেন, তাহা সকলেই দেখিয়াছেন। যাঁহারা অন্নহীনা তাঁহাদের বিষয় ছাড়িয়া দিলেও যাঁহারা শ্বশুরগৃহে কিম্বা পিতৃগৃহে বৈধব্য-জীবন যাপন করেন তাঁহাদিগের ব্যবস্থা কিরূপ? বিধবাগণ দাসীর অধিক শ্রম করেন, অথচ তাঁহারা অনাদৃতা। গৃহে শুভ কার্য্যের সময় তাঁহারা সভয়ে দূরে থাকেন, কষ্টসাধ্য কার্য্য মাত্রেই তাঁহারা নিযুক্তা। অবশ্য একথা স্বীকার্য্য, যে বিধবাদিগের এইরূপ জীবন তাঁহাদিগের অকল্যাণ না করিয়া কল্যাণই করে। আলস্য অপেক্ষা শ্রম শ্রেয়ঃ, বিলাস অপেক্ষা বৈরাগ্য শ্রেয়ঃ, প্রভুত্ব অপেক্ষা সেবা শ্রেয়ঃ। বিধবাগণ পার্থিব ভোগ বিলাসে, সুখ সৌভাগ্যে বঞ্চিতা হউন, কিন্তু সম্মান আদরে কেন তাঁহারা বঞ্চিত হন? প্রত্যেক গৃহস্থের গৃহে বিধবাদিগের আসন এবং

সম্মান সর্ব্বোপরি প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত; তবেই না তাঁহাদের ব্যথিত হৃদয় অনেক পরিমাণে সান্ত্বনা লাভ করিতে সক্ষম হইবে। তাঁহারা দুরন্ত শ্রম করুন ক্ষতি নাই, বৈরাগ্যাচরণ করুন ক্ষতি নাই, কিন্তু আদর সম্ভ্রমে কেন বঞ্চিত হইবেন?

দুর্ভাগ্য বশতঃ যাহাদিগের এক মুষ্টি অন্নের সংস্থান নাই তাহাদিগের পাচিকাবৃত্তি কিম্বা দাসীপনা ভিন্ন উপায় কি? যাহার উপার্জ্জনের শক্তি আছে, তাহাকে সকলেই সম্মান করে, নচেৎ লোষ্ট্র কাষ্ঠের ন্যায় অপরের গলদেশে ঝুলিলে, লোষ্ট্র কাষ্ঠের ন্যায় পদদলিত হইতেই হইবে।

শিক্ষিত রমণীগণ বিধবা হইলে তাঁহাদিগকে জীবিকা-সংস্থান ও সন্তান পালনের জন্য পরমুখাপেক্ষী হইতে হইবে না। শিক্ষার ইহা সামান্য সুফল নহে। কত সম্ভ্রান্ত পরিবার গৃহস্বামীর মৃত্যুতে অনাথ হইয়া দুর্গতির চরম সীমায় উপস্থিত হইতেছে। গৃহিণীগণ যদি শিক্ষিতা হইতেন, তাহা হইলে এইরূপ শোচনীয় অবস্থা কখনই হইত না। অনেক সময় রমণীগণের অজ্ঞতা হেতু ধনসম্পত্তি পরহস্তগত হয়, সন্তানগণ শিক্ষালাভে বঞ্চিত হয়, সমুদায় পরিবার পরের মুখাপেক্ষী হইয়া বাস করে। শিক্ষিতা নারী—কি সধবা, কি বিধবা, কি কুমারী—সকলেই আত্মরক্ষায় সমর্থ হন।

বর্ত্তমান সময়ে আমেরিক এবং ইউরোপীয় নারীগণ যেরূপ অদম্য জ্ঞানস্পৃহা, আশ্চর্য্য কার্য্যকুশলতা, প্রবল পরহিতৈষণা বৃত্তির পরিচয় দিতেছেন, তাহাতে সমগ্র নারী-জাতির গৌরব বৃদ্ধি পাইয়াছে। শিক্ষার ফলে তাঁহাদের চরিত্র দিন দিন উন্নত হইতেছে। সে সকল দেশেও অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে নারীগণ কেবলমাত্র লিখিতে এবং পড়িতে শিক্ষা করিতেন। অনেক বাক্‌বিতণ্ডার পর নারীগণের উচ্চশিক্ষার দ্বার উদ্ঘাটিত হয়। বিলাতে বিগত ৩৭ বৎসর মাত্র নারীগণের প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে। প্রথম ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে Hitchin (হিচিন) সহরে Girton College (গার্টন কলেজ) প্রতিষ্ঠিত হয়। তৎপরে অল্পদিনের মধ্যে চতুর্দ্দিকে বিস্তর স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। নিম্নে তাহার একটা তালিকা দিতেছি :—

অক্সফোর্ডে ১৮৭৯ সালে প্রতিষ্ঠিত Somervelle College.
অক্সফোর্ডে „ „ Lady Margaret Hall.
অক্সফোর্ডে ১৮৮৬ সালে প্রতিষ্ঠিত St Hugh's Hall.
„ ১৮৯৩ „ St Hilda's Hall.
কেম্‌ব্রিজে ১৮৭৩ „ Girton College.
„ ১৮৮০ „ Nownham College.
লণ্ডনে ১৮৪৮ „ Queen's College.
„ ১৮৪৯ „ Bedford College.
„ ১৮৮২ „ Westfield College.

ইহা ভিন্ন স্কটল্যাণ্ডে নারীগণের জন্য উচ্চশ্রেণীর কলেজ সমুদায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই তালিকা হইতে উপলব্ধি হইবে যে কত অল্পদিন হইল ইংলণ্ডে রমণীদের উচ্চশিক্ষার দ্বার অর্গলমুক্ত করা হইয়াছে। কিন্তু এই অল্পদিনের মধ্যে ইংরাজ-রমণী যে আশ্চর্য্য ফল দেখাইতে সক্ষম হইয়াছেন তাহাতে বিস্ময়ে বিমুগ্ধ না হইয়া থাকা যায় না। এই সকল মন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটিত হইতে না হইতে দলে দলে রমণীগণ প্রবেশা-ধিকার লাভ করিয়াছেন। প্রতিযোগী পরীক্ষায় অনেকে শীর্ষ স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ইতিমধ্যে একজন সিনিয়ার ক্লাসিক এবং একজন সিনিয়ার র‍্যাংলার হইয়াছেন। এই সকল উচ্চশিক্ষিতা নারীগণের জীবন এবং তাঁহাদিগের উন্নত ভাব সমুদায় ইংরাজ-সমাজের শ্রদ্ধা ও বিস্ময় উদ্রেক করিতে সক্ষম হইয়াছে। এই সকল নারীগণের প্রভাবে সমাজ দিন দিন উন্নত হইতেছে। ইঁহাদিগের দ্বারা যে সকল সৎকার্য্য অনুষ্ঠিত হইতেছে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দিতেছি। তাঁহারা ইতিমধ্যে স্কুলবোর্ডের সভ্যপদ, কল-কারখানার পর্য্যবেক্ষণ, স্বাস্থ্যের ইন্‌স্পেক্টর, ডাকবিভাগের উচ্চকর্ম্মচারী, শিল্প, সাহিত্য, সংবাদ-পত্র পরিচালনা, বিজ্ঞান-চর্চ্চা, প্রভৃতি সর্ব্ব বিভাগে, সকল কার্য্যে মনস্বিতার পরিচয় দিতেছেন।

কিন্তু আমাদিগকে নিরাশ বা ভীত হইলে চলিবে না। যে কোন মহৎ কার্য্যে যাঁহাদিগকে অগ্রণী হইতে হয়, তাঁহাদিগকে অনন্যসাধারণ সাহসিকতা ও বিচক্ষণতা প্রদর্শন করিতে হয়। শিক্ষিতা নারীগণ যেন উচ্চ শিক্ষার প্রতি জনসাধারণের শ্রদ্ধা এবং সম্ভ্রম উদ্রেক করিতে সক্ষম হন। দেবী বীণাপাণি হিন্দুর পরমারাধ্যা দেবী। তাঁহার বরপুত্রী মনস্বিনী রমণীগণ জননীর পূজা করিতে আসিয়া যেন সকলেই পণ্ড না করেন। কমলাসনা দেবী বীণা-পুস্তক হস্তে লইয়া ভক্তের সেবা গ্রহণ

করেন। কবে আমাদিগের এই পুণ্য ভূমিতে গৃহে গৃহে গৃহ-দেবীগণ সন্তানক্রোড়ে বীণা-পুস্তক হস্তে বিরাজ করিবেন! সেই দিন বিজয়-ভেরী হিমাচল-কন্দর প্রতিধ্বনিত করিয়া বাজিয়া উঠিবে, নচেৎ এ দেশের আর উদ্ধার নাই।

শ্রীহেমলতা সরকার।

আরতির লগ্ন।

চুপ্ চুপ্—রাখ কোলাহল ;
জোড় কর দুটী হস্ত, মোদ দুটি আঁখিতারা,
ক্ষান্ত কর ভাষণ চপল।
আজ হেথা মহারতি, জ্বলে হের লক্ষ বাতি—
ঝলসিছে কম্প্রশীর্ষ দীপ্ত উর্জ্জস্বল।
দুর্দ্দিনের কৃষ্ণ ধূমে আজ এ অভাগা ভূমে
শোন কোথা হ'তে ডাকে পাপিয়া পাগল—
উল্লাস বিভল!

থামা—ওরে থামা জয়ধ্বনি ;
উদয় অচল-শিরে সবে মাত্র পড়েছেরে
উষার চরণচিহ্নখানি,
নিবিড় তিমির টুটে গগনে উঠেছে ফুটে
কিরীট-ভূষিত-ভাল ধূর্জ্জটিরে জিনি' ;
প্রভাত বায়ুর স্বরে কঙ্কণ বাজিছে করে,
নূপুর বাজিছে পায়ে রিনি ঝিনি রিনি,
থামা জয়ধ্বনি!

আজ যে রে এসেছে লগন!
সপ্তসিন্ধু হ'তে বারি কে আনিবি কুম্ভ ভরি'
অভিষেক করিতে রচন!
উত্তপ্ত রুধির দিয়া ভালে দিবি কে আঁকিয়া
জননীরে রাজটীকা—অরুণ বরণ!
আজ এ করাল সাঁঝে শ্মশান ভিতর মাঝে
এ কি রে করালী কালী করিবি বোধন!
এ নহে লগন!

জয়ধ্বনি দিস্‌রে তখন—
গর্ব্বে পাল ফুলাইয়া নদীবক্ষ বিদারিয়া
ভাসাইবি তরণী যখন!
আজ যে কিরণ-রেখা পূর্ব্বাসারে দেছে দেখা
দীপিয়া উঠিবে যবে ভরিয়া ভুবন!
ভাস্বর মধ্যাহ্ন করে কাঞ্চন বেদীর 'পরে
রাজরাজেশ্বরী মারে করিবি স্থাপন!
শঙ্খ ঘণ্টা বাদ্যরোলে ত্রিশ কোটি কণ্ঠ মিলে
বজ্রনাদে জয়ধ্বনি দিস্‌রে তখন,
আরতির এ নহে লগন!

শ্রীমতী আমোদিনী ঘোষ।

অজপা ব্রহ্মচারিণী ও হকুহকী মাতা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

ব্রহ্মচারিণী ও মাতাজীকে পূর্ব্বোক্ত লোকেরা স্কন্ধে বহন করিয়া, কতকগুলি পর্ব্বত, প্রান্তর, ক্ষুদ্র বন এবং জলাশয় অতিক্রমপূর্ব্বক, অনেক দূরবর্ত্তী স্থানে গিয়া উপস্থিত হইল। তথায় কিছুকাল বিশ্রাম লাভ করিয়া পুনরায় ঐরূপে স্কন্ধে বহন করিতে করিতে একস্থানে এক ইংরাজ সেনা-নিবাসে পৌঁছিয়া ব্রহ্মচারিণী ও মাতাজীকে এক ক্ষুদ্র কারাগারে আবদ্ধা করিয়া রাখিল। রজনী প্রভাত হইলে ইহাঁরা দেখিলেন, ঐ স্থান কতকগুলি ইউরোপীয় সৈনিক কর্ম্মচারী এবং ইংরাজ-সেনায় পরিপূর্ণ। দিবা অষ্টম ঘটিকার সময় কারাগারের দ্বার খুলিয়া একজন কর্ম্মচারী ইহাঁদিগকে সেনাপতি (কর্ণেল) সাহেবের সম্মুখে দাঁড় করাইয়া দিল। সাহেব কহিলেন, "অনেক দিন হইতে আমরা তোমাদের অনুসন্ধান করিতেছিলাম। তোমরা গ্রেপ্তার হওয়ায় আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইয়াছে। তোমরা নিশ্চয়ই আমাদের অনুসন্ধেয় মনুষ্য।" ব্রহ্মচারিণী বলিলেন, "সাহেব! তুমি কি কহিতেছ তাহা বুঝিতে পারিতেছি না।" সেনাপতি সাহেব বলিলেন, "তোমরা অবশ্যই অবগত আছ, সম্প্রতি এদেশের

হিন্দু ও মুসলমান সিপাহীরা ষড়যন্ত্র করিয়া এদেশে ইংরাজের রাজত্ব নষ্ট করিবার জন্য বিদ্রোহী হইয়াছে। * এই অকৃতজ্ঞ ও দুশ্চরিত্র সিপাহীদিগের সহায় স্বরূপে কতকগুলি পুরুষ ও স্ত্রীলোক নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া সিপাহীদের জন্য অর্থ, বস্ত্র, ভোজ্য দ্রব্য, অস্ত্র শস্ত্র ইত্যাদি আহরণ করিয়া দিতেছে, তদ্ব্যতীত আমাদের (ইংরাজ-রাজের) গোপনীয় গতি বিধি প্রভৃতির সমাচার সিপাহীদিগকে জানাইয়া দিতেছে। তোমরা এই গুরুতর অপরাধে ধৃতা হইয়াছ। এই অভিযোগ সম্বন্ধে তোমাদের যদি কিছু বলিবার থাকে, বলিতে পার।" সাহেবের কথা শুনিয়া সাধ্বীগণ "হাঁ" কিম্বা "না" কিছুই কহিলেন না। কর্ণেল বলিলেন, "বর্ত্তমান সময়ের মার্শাল ল (সমর-নৈতিক আইন) অনুসারে আমি তোমাদের উভয়ের প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলাম। কোন্ দিবস কোন্ সময়ে তোমাদের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা কার্য্যে পরিণত করা হইবে, বড় সাহেবের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া যথা সময়ে তাহা তোমাদিগকে জানান যাইবে।" অপরাহ্ণ সার্দ্ধ দুই ঘটিকার সময় কর্ণেল সাহেব প্রধান সেনাপতি (জেনেরল) সাহেবের সহিত পরামর্শ করিয়া কিংকর্ত্তব্য স্থির করিবার প্রার্থনা করিলেন; অনেক তর্ক বিতর্কের পরে বড় সাহেব অজপা ব্রহ্মচারিণী এবং হক্‌হকী মাতার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা মঞ্জুর করিলেন। সায়াহ্ণ কালে একজন কর্ম্মচারী আসিয়া কারাগারের দ্বারে দণ্ডায়মাণ হইয়া অনাহারে কাতরা কয়েদিনীদ্বয়কে সম্বোধন করিয়া কহিয়া গেল, "আগামী কল্য প্রাতে নয় ঘটিকার সময়ে বন্দুকের গুলির আঘাতে তোমরা নিহত হইবে।" কর্ম্মচারী চলিয়া গেলে, মাতাজী ব্রহ্মচারিণীকে বলিলেন, "চিন্তা বা ভয়ের কোন কারণ নাই। দেশের ধর্ম্ম ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য হিন্দু ও মুসলমান সিপাহীরা বিদ্রোহী হইয়াছে, আমরা তাহাদের উপকার করিয়া ধন্যা হইয়াছি। যদি কল্য প্রাণ পরিত্যাগ করিতে হয় তাহা হইলে আরও ধন্যা হইব।" অনাহারে সেই ক্ষুদ্র কারাগারে উপবেশন পূর্ব্বক সেই সাধ্বী দুইজন গলা খুলিয়া দিয়া অতীব মধুর স্বরে ভগবানের স্তোত্র আবৃত্তি এবং গুণগান করিতে লাগিলেন। এইরূপে অর্দ্ধরাত্রি অতিবাহিত হইয়া গেল। দুই একজন প্রহরী ব্যতীত সাহেবেরা একে একে নিদ্রাসুখ উপভোগ করিতে লাগিল। রাত্রি প্রায় ১ টার সময়, কোথা হইতে কে জানে, প্রায় চারি পাঁচ শত অস্ত্রধারী হিন্দু ও মুসলমান সিপাহী "হর হর বম্ ববম্" এবং "আল্লা হো আকবর" উচ্চারণ করিতে করিতে তথায় অতি দ্রুতপদে আগমন করিয়া সাহেবদের তাম্বুতে আগুণ লাগাইয়া দিল, এবং যে কয়েকজন ইংরাজ-পক্ষীয় সেনা ছিল তাহাদিগকে অস্ত্রাঘাতে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া তাহাদের অস্ত্রশস্ত্রাদি লুণ্ঠনপূর্ব্বক অজপা ব্রহ্মচারিণী ও হক্‌হকী মাতাকে কারামুক্তা করিয়া পলায়ন করিল। সে স্থানে ইংরাজের যে সাময়িক বা অস্থায়ী আড্ডা ছিল তাহার চিহ্ন পর্য্যন্ত রাখিয়া গেল না।

আগ্রা নগরীতে এই সমাচার পৌঁছিলে, সাহেবেরা মাতাজীকে ও ব্রহ্মচারিণীকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য আর একবার চেষ্টা করিল, কিন্তু সে চেষ্টা বৃথা হইয়া গেল। তখন সুপ্রসিদ্ধ নানা সাহেব নেপাল অভিমুখে পলাইতে ছিলেন এবং লালা কুমার সিংহ বিদ্রোহীদলের সহিত মিলিয়া প্রবৃদ্ধ বয়সে বিক্রমী ইংরাজ সেনার সহিত ঘোরতর সংগ্রামে প্রমত্ত ছিলেন। লালা কুমার সিংহ বিহারের অন্তর্গত সাহাবাদ (বর্ত্তমান নাম আরা) জিলার অধীন বিহিয়া রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকট জগদীশপুর নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ধনবান, সাহসী, বলবান, ও প্রভূত প্রভাবসম্পন্ন জমিদার ছিলেন। বৃদ্ধ বয়সে তিনি অসাধারণ শৌর্য্য ও বীর্য্য দেখাইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে, কানপুর জিলার অন্তর্গত বিঠুর নামক গ্রামের নিকটবর্ত্তী গঙ্গা নদীর তটে মহামুনি বাল্মিকীর আশ্রম সম্মুখে প্রাণত্যাগ করেন। ইহাঁর মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্ব্বে অজপা ব্রহ্মচারিণী ও হক্‌হকী মাতা তাঁহার নিকট গোপনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। কুমার সিংহ ইহাঁদিকে গুপ্তভাবে জগদীশপুর পাঠাইয়া দেন। তখনও জগদীশপুর গ্রাম ইংরাজের হস্তগত হয় নাই। বিদ্রোহের অবসান হইলে, বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট কুমার সিংহের বাড়ী ও সমুদয় সম্পত্তি খাস মহল মধ্যে গণ্য করিয়া লয়েন। এখন ঐ সম্পত্তি ইংরাজের খাস সম্পত্তি বলিয়া গণ্য।

ব্রহ্মচারিণী ও হক্‌হকী মাতা প্রায় সপ্তমাস কাল জগ-

* পাঠক পাঠিকাগণ ইতিহাসে ১৮৫৭ অব্দের যে ভয়ানক সিপাহী-বিদ্রোহের কথা পাঠ করিয়াছেন, তাহা এই বিদ্রোহ।

দীশপুরে অবস্থান করিয়াছিলেন। সেখানে তাঁহারা সেনা ও অস্ত্র শস্ত্র প্রভৃতি সংগ্রহ করিতে করিতে দেশের অবস্থা দেখিয়া স্পষ্টতঃ বুঝিতে পারিলেন, ইংরাজ-রাজত্ব ধ্বংস হইবার এখনও উপযুক্ত সময় আইসে নাই। বর্ত্তমান সময়ে বৃটীশ শাসন লুপ্ত হইয়া গেলে, ভারতে অরাজকতা ও মহা বিপদ আসিয়া উপস্থিত হইবে। সুতরাং সমর সম্বন্ধীয় কার্য্যে আর তাঁহারা হস্তক্ষেপ না করিয়া কোথায় চলিয়া গেলেন তাহা কেহই জানিতে পারিল না। সেই সময় হইতে এ পর্য্যন্ত আর তাঁহাদের সমাচার কেহ জানে না।

বিহিয়া অঞ্চলের অনেক বৃদ্ধ পুরুষ ও বৃদ্ধা রমণীর মুখে শুনিয়াছি, অজপা ব্রহ্মচারিণী ও হকৃহকী মাতা যখন ঐ দেশে থাকিতেন তখন সেখানকার সমুদয় হিন্দু ও মুসলমানগণ তাঁহাদের বশীভূত ছিল। তাঁহারা যাহা উপদেশ করিতেন বা আজ্ঞা করিতেন, সকলে তাহা মান্য করিয়া চলিত। তাঁহাদের উভয়ের চরিত্র, স্বভাব, ব্যবহার, ক্রিয়াকলাপ প্রভৃতি দেখিয়া সকলেই মুগ্ধ হইয়া থাকিত। দেবীর ন্যায় এতদুভয়কে সমস্ত বিহারের লোক ভক্তি করিত। তাঁহাদের এমন অলৌকিক সামর্থ্য ছিল যে, তাঁহারা যাহা কিছু মনে করিয়া কাহারও নিকটে উপনীত হইতেন, সে ব্যক্তি তাহা যথাশক্তি পূরণ না করিয়া থাকিতে পারিত না। বড় বড় কৃপণ জমিদার, বণিক বা রাজারা যে কার্য্যে একটি পয়সাও ব্যয় করিব না বলিয়া স্থির করিয়া রাখিত, এই সাধ্বীদ্বয় তথায় উপস্থিত হইলে ঐসকল কৃপণই অকাতরে ঐকার্য্যে জলের ন্যায় অর্থ ব্যয় করিত। শুনা যায় এক প্রকার সর্প আছে, যাহাদের চক্ষু মধ্যে এমন অসাধারণ বৈদ্যুতিক শক্তি থাকে যে, তাহারা পক্ষীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই বৃক্ষশাখা হইতে পক্ষী ভূমিতে পতিত হইয়া মরিয়া যায়। এই সাধ্বীদ্বয়ের নয়নে এমন এক আশ্চর্য্য ঐশিক ক্ষমতা ছিল যে, তাঁহারা কাহারও প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে অমনি তাহার মন পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইত। সাধ্বীগণ নরনারীর মনের ভাব দৈববলে বুঝিয়া লইতে পারিতেন। যাহা হউক, পরোপকার, দেশের ও লোকসাধারণের কল্যাণ এবং আত্মার উৎকর্ষ সাধন করিয়া অজপা ব্রহ্মচারিণী ও হকৃহকী মাতা বিমল চরিত্রের উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন। তাঁহারা উন্নত চরিত্র এবং কঠোর সাধনার অতি শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত। এরূপ রমণী পৃথিবীর যে কোন দেশে বা সমাজে জন্মগ্রহণ করুন, ইহাঁরা জগতের অলঙ্কার বলিয়া সর্ব্বত্র গণনীয়া ও মাননীয়া হইয়া থাকেন। (সমাপ্ত)

ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

কাব্যে লোক-শিক্ষা।

(১)

মানব জীবনের উপর কবির ও কাব্যের প্রভাব নিতান্ত সামান্য নহে। কবি যদি প্রতিভাশালী হন এবং তাঁহার কাব্য যদি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়, তবে তিনি মানুষের অন্তরে বীরত্ব ও মহত্ত্বের মহাভাব জাগ্রত করিয়া দিতে পারেন; মানব সমাজে ধর্ম্মভাব উদ্দীপিত করিয়া, সমাজকেও উন্নত করিয়া তুলিতে পারেন। সুতরাং উচ্চ অঙ্গের কাব্যের দ্বারা লোকের যথেষ্ট শিক্ষালাভ হইতে পারে; উন্নত-হৃদয় প্রতিভাশালী কবি সমাজের শিক্ষক রূপে গণ্য হইতে পারেন।

ইহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের জন্য এ দেশে বড় আয়াস স্বীকার করিতে হয় না। রামায়ণ ও মহাভারত—এই দুই মহাকাব্য কতকাল হইল রচিত হইয়াছে; তাহার পর কত যুগ চলিয়া গেল; উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর উন্নত বিজ্ঞান জগতে কত প্রভাব বিস্তার করিল;— তথাপি রামায়ণ ও মহাভারতের মহাশিক্ষা ভারতবর্ষ বিস্মৃত হইল না। অদ্যাপি হিন্দু নর নারীর হৃদয়ে মহাকবি বাল্মীকি ও মহর্ষি বেদব্যাসের স্বর্ণ-সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত! শিক্ষিত ভারতবাসীর শিক্ষার ত কতই গর্ব্ব; কিন্তু কত শিক্ষিত ব্যক্তি জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে রাম লক্ষ্মণ ও ভরতের, ভীষ্মার্জ্জুন ও যুধিষ্ঠিরের চরিত্রের মহৎ আদর্শ নয়নের সম্মুখে রাখিয়া জীবনকে উন্নত করিতেছেন; কত নারী সীতা সাবিত্রীর পুণ্যচরিত্র ধ্যান করিয়া সতীত্বের গৌরবময় পথে অগ্রসর হইতেছেন।

অতএব উৎকৃষ্ট কাব্য দ্বারা যে লোকের শিক্ষালাভ হয়, সমাজ উন্নত হয়, তাহা বুঝাইবার জন্য আর অধিক চেষ্টা করিবার আবশ্যক নাই। সূক্ষ্মদর্শী ও প্রতিভাশালী

লেখক বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার "বিবিধ প্রবন্ধ" গ্রন্থের এক স্থানে লিখিয়াছেন :—

"উদ্দেশ্য এবং সফলতা উভয় বিবেচনা করিলে, রাজা, রাজনীতিবেত্তা, ব্যবস্থাপক, সমাজতত্ত্ববেত্তা, ধর্ম্মোপদেষ্টা, নীতিবেত্তা, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, সর্ব্বাপেক্ষাই কবির শ্রেষ্ঠত্ব। কবিত্ব পক্ষে যেরূপ মানসিক ক্ষমতা আবশ্যক, তাহা বিবেচনা করিলেও কবির সেইরূপ প্রাধান্য। কবিরা জগতের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাদাতা এবং উপকারকর্ত্তা এবং সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মানসিক শক্তিসম্পন্ন।"

বঙ্কিমচন্দ্রের এই উক্তির দ্বারা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, কবি সমাজের শিক্ষাদাতা ; এবং কাব্য দ্বারা লোকের শিক্ষালাভ হয়।

কিন্তু কাব্যের দ্বারা যেমন লোকের শিক্ষালাভ হয়, তেমনি লোকেব অনিষ্টও হইতে পারে ; কবিগণ লোকের শিক্ষক না হইয়া শত্রুও হইতে পারেন ; কাব্যের প্রভাবে সমাজ অধঃপাতেও যাইতে পারে। কারণ, কাব্যের উদ্দেশ্যই হইতেছে, মানব হৃদয়ে নানা রসের সঞ্চার করা ও নানা ভাব উদ্দীপিত করা। কবিগণ যে প্রতিভা বলে মানব হৃদয়ে বীরত্ব, মহত্ত্ব ও ভক্তিভাব উদ্দীপিত করেন, সেই প্রতিভাবলে কপটতা, নীচতা, অধর্ম্ম এবং অনেক নারকীয় ভাবও উদ্দীপিত করিয়া তুলিতে পারেন ; তাহাতে সমাজ পাপে কলুষিত হইয়াও যাইতে পারে। ইতিহাসের পৃষ্ঠা অনুসন্ধান করিলে ইহার প্রমাণও পাওয়া যাইতে পারে। কে বলিবে ভারতচন্দ্র ও অন্যান্য কুরুচিপ্রিয় কবিগণ তাঁহাদের অশ্লীল রচনা দ্বারা সমাজের অধঃপতনের পথ কতটা পরিষ্কার করিয়াছেন ?

সুতরাং এ কথা আমাদের অতি পরিষ্কার রূপেই জানিয়া রাখা আবশ্যক যে, কবিগণ যদি ধার্ম্মিক হন, তাঁহাদের নির্ম্মল অন্তর যদি মহদ্ভাবে পূর্ণ হয়, তাঁহারা যদি ধর্ম্মভাবে অনুপ্রাণিত ও মহদ্ভাবে উদ্দীপিত হইয়া কাব্য রচনা করেন,— তবেই সমাজের কল্যাণ ও লোকের শিক্ষা লাভ হইতে পারে। তাহা হইলে আমরা তাঁহাদের সৌন্দর্য্য-বর্ণনার মধ্য দিয়া এই শোভাময়ী ধরণীর অপূর্ব্ব রূপমাধুরী উপভোগ করিতে পারি এবং অসীম সুন্দরের বিশ্বব্যাপী সৌন্দর্য্যে নিমগ্ন হইয়া জীবনকে সুন্দর করিতে পারি ;— তাঁহাদের অঙ্কিত চিত্রের মধ্যে মানব জীবনের বীরত্ব, মহত্ত্ব, আত্মত্যাগ ও আধ্যাত্মিক ভাব সকল সুস্পষ্ট উপলব্ধি করিতে পারি এবং তাঁহাদের কাব্যের উচ্ছলিত ভাবরস পান করিয়া মহদ্ভাবে উন্নত ও ভক্তিতে আর্দ্র হইতে পারি।

বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে বোধ হয়, শুধুই লোকরঞ্জন অথবা লোকের চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির উৎকর্ষ সাধনের জন্য কাব্য রচনা কর্ত্তব্য নহে ; মহদ্ভাব ও ধর্ম্মভাবপূর্ণ কাব্য রচনা করাই আবশ্যক। কারণ, আমরা এখন উন্নতির এক মহান্ আদর্শ হৃদয়ে ধারণ করিয়া মাতৃভূমির মহৎ কার্য্যে ব্রতী হইতে ও আত্ম-সমর্পণ করিতে চাহিতেছি। সুতরাং কবিগণ যদি জগতের "শ্রেষ্ঠ শিক্ষাদাতা" ও "উপকার-কর্ত্তা" হন, তবে তাঁহাদের উচ্চ অঙ্গের কাব্যের দ্বারা আমাদের অন্তরে বীরত্ব, পৌরুষ, আত্মত্যাগ ও আধ্যাত্মিকতার মহাভাব সকল জাগাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

যা' হো'ক, আমাদের বাঙ্গলা সাহিত্যে যে সকল কাব্য প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে কয়েকজন প্রসিদ্ধ কবির কাব্যের লোকশিক্ষার উপযোগিতা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। কেবল মাত্র কয়েক জন প্রসিদ্ধ কবির কাব্যের আলোচনা করিবার কারণ এই যে, বাঙ্গলা সাহিত্যে কাব্য-গ্রন্থের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক ;— সত্যের অনুরোধে বলিতে হইতেছে, সেই সকল কাব্য পাঠ করিবার সৌভাগ্য আমাদের হয় নাই। কাজেই আমরা যে সকল প্রসিদ্ধ কবির কাব্য পাঠ করিয়াছি, তৎসম্বন্ধেই মতামত প্রকাশ করিব।

(২)

বাঙ্গলা ভাষায় প্রকাশিত সমস্ত কাব্যকে বোধ হয় চারি ভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রথম—নিম্ন শ্রেণীর কাব্য, দ্বিতীয়—সাধারণ কাব্য, তৃতীয়—স্বদেশানুরাগ ও মহৎ ভাবোদ্দীপক কাব্য, চতুর্থ—ভক্তিরসাত্মক কাব্য।

প্রথমতঃ নিম্ন শ্রেণীর কাব্য সম্বন্ধেই সংক্ষেপে আলোচনা করা যা'ক। বাঙ্গলা ভাষায় এমন অনেক কাব্য আছে, যাহা পড়িয়া লেখকদিগের জন্য দুঃখ হয়। দুঃখ হয় এই জন্য যে, তাঁহারা ঘরে পরে প্রতারিত হইয়াছেন। তাঁহাদের

মনে হয়ত ভাব আছে, কিন্তু সেই ভাব প্রকাশ করিবার মত কবিত্ব নাই; তাঁহারা কবিতার বই পড়িয়া ভাষা শিখিয়াছেন; কিন্তু সে ভাষায় নিজের কথা কহিতে হইলে তাহাকে যতটা আয়ত্তের মধ্যে আনা আবশ্যক, তাহা আনিতে পারেন নাই। অথচ কবিতা রচনা করেন। তাহা পড়িয়া ঘরের সৌন্দর্য্য-জ্ঞানবিহীন লোকেরা বলে, "বেশ হইয়াছে, বই ছাপাও।" আবার বই ছাপাইলে, আমাদের কয়েকজন ইংরাজী ভাষায় সুপণ্ডিত সহৃদয় ভক্তিভাজন ব্যক্তি বলেন—"বেশ ত, বই খানি ত খুব ভাল হইয়াছে!" দুঃখের বিষয় তাঁহারা মনোযোগের সহিত বাঙ্গলা কাব্য পাঠ করিয়া ভাল মন্দ বিচার করিবার অবসর পান না; কেবল উপরে উপরে একটু ভাষার চটক দেখিয়া, দুইটা নীতিকথা পাঠ করিয়াই ভাবেন—বইখানি বেশ! এই "বেশ" কথায় উৎসাহিত হইয়া লেখকেরা ক্রমাগত কবিতার বই রচনা করেন। ইহাতে ঘরের পয়সা খরচ করিয়া শুধু সৌন্দর্য্য-জ্ঞানবিহীন লোকের প্রশংসাই লাভ হয়। কিন্তু এই সকল গ্রন্থের দ্বারা পাঠকদিগের কিংবা আমাদের সমাজের কোনরূপ উপকার হয় না।

এতদ্ভিন্ন আর এক শ্রেণীর নিকৃষ্ট কাব্য আছে। এই কাব্য-গ্রন্থগুলি কাব্যাংশে যে নিকৃষ্ট, তাহা নয়। ইহার ভাষা ভাল; শুধু ভাল কেন, খুবই ভাল। কারণ, এই শ্রেণীর গ্রন্থের ভাষা সুললিত ও বর্ণনার ভঙ্গীটি সুমধুর না হইলে বিষয়টি এত জমে না। তা ছাড়া এই সকল গ্রন্থে কাব্যরসও সুপ্রচুর; নহিলে লেখকদিগের বক্তব্য বিষয়টি পরিস্ফুট হইয়া উঠে না। তবে এ সকল সত্ত্বেও ইহাকে নিকৃষ্ট কাব্য বলিতেছি কেন? বলিতেছি লেখকদিগের জঘন্য রুচির জন্য। এই সকল লেখকদিগের মধ্যে কেহ বা সম্প্রদায় বিশেষের নিন্দার জন্য, কেহ বা কুক্রিয়াসক্ত বিকৃতরুচি পাঠকদিগের মন মজাইয়া দুপয়সা রোজগার করিবার জন্য, কেহ বা আপনার কুৎসিত কল্পনা-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য, জঘন্য উপন্যাস, নাটক এবং প্রহসন ও কবিতা গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। উহা পাঠ করিয়া কত যুবকের রুচি যে বিকৃত হইয়া গিয়াছে, কত সরল-হৃদয়া রমণীর সম্মুখে সংসারের গুপ্ত পাপের চিত্র উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে, কে তাহার হিসাব রাখে? হিসাব রাখা ত দূরের কথা, এই যে আমরা উহার নিন্দা করিতেছি, এজন্য হয় ত কত লোকে আমাদিগকে রুচিবাগীশ বলিয়া বিদ্রূপ করিবেন।

অতঃপর দ্বিতীয় শ্রেণীর সাধারণ কাব্যের উল্লেখ করিব। আমরা এই শ্রেণীর কাব্যের একটি উৎকৃষ্ট নাম নির্ব্বাচন করিতে না পারিয়া ইহাকে "সাধারণ কাব্য" বলিতেছি বটে, কিন্তু বাঙ্গালা সাহিত্যের অধিকাংশ উৎকৃষ্ট কাব্যকেই এই শ্রেণীর অন্তর্গত করিতেছি। এই সকল কাব্যের দ্বারা পরোক্ষ ভাবে লোকের যথেষ্ট শিক্ষালাভ হইতেছে; কিন্তু সাক্ষাৎভাবে কোনরূপ শিক্ষালাভের জন্য ইহা কেহই পাঠ করেন না। লেখকদিগের উদ্দেশ্যও তাহা নয়। সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির জন্য,—পাঠকদিগের হৃদয় মন সাহিত্যের রস-ধারায় অভিষিক্ত করিবার জন্য,—কেবল মাত্র তাঁহাদের চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য এই সকল গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। মাইকেল মধুসূদন দত্তের সমস্ত কাব্য, নবীনচন্দ্রের রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস ভিন্ন আর সমস্ত কাব্য, এবং হেমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি কাব্য-গ্রন্থকেই এই শ্রেণীর অন্তর্গত বলিয়া মনে করি।

যদিচ এই শ্রেণীর কাব্যের আলোচনা করা আমাদের প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়, তথাপি আমরা এই শ্রেণীর কয়েকখানি কাব্য সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত।

প্যারীসুন্দরী।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

৫

রামলোচনের মুখে কথা নাই। লজ্জা রাখিবারও স্থান নাই। নিজে দলপতি হইয়া অপ্রস্তুত। সুধু অপ্রস্তুত? অপ্রস্তুতের একশেষ। সঙ্গে সঙ্গে অর্থের বিনাশ। অযথা অর্থের শ্রাদ্ধ এবং শত মুখে নিন্দা। প্যারীসুন্দরীর নিকটে রামলোচন সকল কথা খুলিয়া বলেন নাই। সত্য মিথ্যা একত্রে, ভেল আসলে "আমেজ" করিয়া যুদ্ধের কথা শেষ করিয়াছেন। সন্ধানী লোকে মিথ্যা সংবাদ দিয়াছিল।

মেম সাহেব কি সাহেব কেহই কুঠীতে ছিলেন না। অনর্থক যাইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু সাহেব মোকদ্দমা সাজাইতে ত্রুটি করেন নাই। কুঠির উপর পর্য্যন্ত যখন চড়াও করা হইয়াছে তখন সাহেব অল্পে ছাড়িবেন না। কোনরূপ একটা মিথ্যা ফাঁদে ভাল করিয়া আট্‌কাইবার চেষ্টা করিবেন। কথা ক্রমেই বাড়িয়া গিয়াছে, সকলেই শুনিয়াছে, প্যারীসুন্দরীর লাঠিয়ালেরা সাহেবের কুঠী লুঠ করিয়া লইয়া গিয়াছে। ১০।১২টী লোক জখমী, তিনটী খুন।

প্যারীসুন্দরী এই ঘটনা শুনিয়া একটুকুও ভীতা হইলেন না। ক্ষণকালের জন্যও ভাবিলেন না। রামলোচনকে স্পষ্ট ভাবে বলিলেন :—

"বেশ হইয়াছে। আমার লাঠিয়াল কুঠী লুঠ করিয়াছে, দশজনের মুখে একথা শুনিয়াও আমার সুখ বোধ হইতেছে। আমি বাঙ্গালীর মেয়ে, সাহেবের কুঠী লুটিয়া আনিয়াছি, ইহা অপেক্ষা সুখের বিষয় আর কি আছে? সাহেবের পক্ষে ১০।১২টা জখম, ৩টা খুন! চিন্তা কি? মোকদ্দমার পথে চলিলে প্যারীসুন্দরী কখনও একটুও হটিবে না। সদর নেজামত পর্য্যন্ত মোকদ্দমা চালাইবে। এত দিনে জানিলাম, কেনীর ক্ষমতা বল সকলই বুঝিতে পারিলাম। আমি যাহা ভাবিয়াছিলাম তাহা নহে। তোমরা ক্ষণকালের জন্যও অন্তরে ভয়কে কিছুমাত্র স্থান দিও না। একবার দুবার না হয় তিনবার চেষ্টার অসাধ্য কি আছে? আবার চেষ্টা এখন তোমাদের কার্য্য মোকদ্দমার যোগাড়। অন্য দিকে আবার লাঠিয়াল সংগ্রহ। দেখি কয় বার ফাঁক যায়! এক দিন হাতে পাইবই পাইব। আরও একটী কথা আমি তোমাকে বলি, যে ব্যক্তি যে কোন কৌশলে কেনীর মাথা আমার নিকটে আনিয়া দিবে এই হাজার টাকার তোড়া আমি তাহার জন্য বাঁধিয়া রাখিলাম। এই আমার প্রতিজ্ঞা। আরও প্রতিজ্ঞা, আমার জমিদারী, বাড়ী, ঘর, নগদ টাকা, আসবাব যাহা আছে, সমুদায় কেনীর কল্যাণে রাখিলাম। ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া বলিতেছি, সদরপুরের সমুদয় সম্পত্তি কেনীর জন্য রহিল। কিছু না থাকে, আমি ঘটী হাতে করিয়া বঙ্গের ঘরে ঘরে কেনীর অত্যাচারের কথা কহিয়া মুষ্টিভিক্ষায় জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিব। দ্বারে দ্বারে কেনীর অত্যাচারের কথা কহিয়া বেড়াইব। যে ঈশ্বর জগতের মুখ দেখাইবার পূর্ব্বেই আহারের সংস্থান করিয়া মায়ের বুকে রাখিয়া দিয়াছেন, সেই ঈশ্বরের নাম করিয়া প্যারীসুন্দরী যাহার দ্বারে দাঁড়াইবে সেই খানেই সমাদরে স্থান পাইবে। দুরন্ত নীলকরের হস্ত হইতে প্রজাকে রক্ষা করিতে জীবন যায় সেও আমার পণ। আমি জীবনের জন্য একটুকুও ভাবি না। দেশের দুর্দ্দশা, নিরীহ প্রজার দুরবস্থার কথা শুনিয়া আমার প্রাণ ফাটিয়া যাইতেছে। মোকদ্দমার জন্য তোমরা ভাবিও না। যত প্রকারের তদ্বির হইতে পারে তাহা কর।"

রামলোচন বলিলেন, "আমার বোধ হইতেছে শীঘ্রই থানাদার দারগা, জমাদার, আসামী ধরিবার জন্য মফঃস্বলে গ্রামে গ্রামে আসিবে।"

প্যারীসুন্দরী বলিলেন, "তাহাতে ভয় কি? যত টাকা লাগে দারগাকে দাও, আর এই বলিয়া কৈফিয়ত দেওয়াইয়া দেও, যে আসামীর নামের কোন লোক আমার বাটীতে নাই, আমার সরকারে নাই। সদরপুর গ্রামে নাই। আমার এলাকার মধ্যে নাই। আমরা কখন সে নামের কথা শুনি নাই। সাহসে কম হইবে না। রামানন্দ বাবুর উপার্জ্জিত ঐশ্বর্য্য, জমিদারী সকলই আজ কেনীর জন্য তাঁহারই কন্যা প্যারীসুন্দরী রাখিয়া দিল। আর তাঁহারও পৈতৃক জমিদারী নহে। ইহাও ইংরেজের অনুগ্রহেই হইয়াছিল। তাঁহারাও ইংরেজ, কেনীও ইংরেজ—এক প্রাণী বটে, তবে মানুষ আর শুয়র।

এক ঝাড়ের বাঁশ, কেহ হাড়ীর ঝাঁটা, কেহ পূজার ফুলের সাজি। কত ইংরেজ কত কার্য্যে এদেশে আসিতেছেন, কই? কেনীর মত নররাক্ষস ত একটীও দেখি না। অনেককে দেবতা বলিয়া পূজা করিতে ইচ্ছা করে। কুমারখালির ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রেসমের কুঠীর কল্যাণেই পিতার এত ঐশ্বর্য্য, এত জমিদারী। ইংরেজ বাহাদুরের শুভদৃষ্টিতেই সদরপুরের ঘরের সৃষ্টি। এবার বোধ হয় কেনীর কল্যাণে সকলই মাটি হইবে। একেবারে সারা হইবে। তোমরা আমার আদেশ মত কেহই কার্য্য করিতে পার না, ইহাই আমার মনের দুঃখ। এক জন দৌরাত্ম্যকারী ইংরেজকে জব্দ করিতে পারিলে না, ভালরূপ শিক্ষা দিতে পারিলে না! ছি! ছি! বড় লজ্জার কথা, বড় ঘৃণার

কথা! দেখ ত, এদেশে আমরাই সকল, আমাদেরই দেশ, আমাদেরই লোকজন লইয়া একা কেনী আমাদের উপর এত অত্যাচার, এত দৌরাত্ম্য জুলুম করিতেছে। তোমরা শত সহস্র লোক একত্র হইয়াও দুইবারে কিছুই করিতে পারিলে না। নিশ্চয় জানিলাম, তোমাদের মাথায় কিছু নাই—কিছুই নাই, খালি হাড় আর পচা মজ্জা। কি করি, আমার মনের দুঃখ মনেই রহিয়া গেল। আমি স্ত্রীলোক। কেনীর দৌরাত্ম্যে না টিকিতে পারিয়া এদেশের অনেকেই তাহার সহিত যোগ দিয়াছে। সত্যই কি তাহারা যোগ দিয়াছে? তা' মনে করো না, সে কথা কখনই মনে করো না। সে যোগ দায়ে পড়িয়া, সে প্রণয় না পারিয়া, সে ভালবাসা, সে আনুগত্য, অপমানের ভয়, প্রাণের ভয়, স্ত্রী-পরিবারের প্রতি অত্যাচারের ভয় ভাবিয়া। যাহা আমাদের মনে জাগে, তাহা তাদের মনেও জাগে। তাহারা কি কেনীর কুটুম্ব না আত্মীয়? না এক দেশের লোক? তাহাদের নিকটে তোমাদের যাওয়া আসা করা চাই। যথাসাধ্য গোপনে গোপনে তাহাদের সাহায্য করা, তাহাদের দুঃখে দুঃখিত হওয়া চাই। যাহাতে সকলের মন এক হয় তাহার উপায় করা চাই। প্রকাশ্যে যাহাই করুক, হিন্দু মুসলমানকে এক ভাবা চাই। শত্রুতা বিনাশ করিতে শত্রুতা শিক্ষা করা চাই। একতাই সকল অস্ত্রের প্রধান অস্ত্র। জাতিভেদে হিংসা, জাতিভেদে ঘৃণা, দেশের মঙ্গলের জন্য একেবারে অন্তর হইতে চিরকালের জন্য অন্তর করা চাই। সকলের এক প্রাণ, এক দেহ হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করা চাই। এক ভাবে এক মতে বুদ্ধি চাসনা করা চাই। আমি যত দুর জানিতে পারিয়াছি, যাহারা কেনীর পক্ষে আছে তাহারা মনের সহিত আমার বিপক্ষে দাঁড়াইবে না। কেনীর মন যোগাইতে হাঁ হুঁ করিবে মাত্র। চেষ্টা করিলে বিপদ কালে সকলেই সকলের উপকার করিতে পারে। শুধু অর্থবল আর বাহুবলই যে বল তাহা নহে। শত্রু দমন করিতে হইলে অন্য বলেরও আবশ্যক। চেষ্টা করিলে সকলেই সকলের কিছু না কিছু উপকার করিতে পারে। আমি অর্থের বল চাই না। বাহুবলেরও তত দরকার করিতেছে না। ঈশ্বর আমাকে এই দুই বল যা দিয়াছেন কেনীর জন্য উহাই যথেষ্ট। যে বলের অভাব সেই বলের অন্বেষণ কর, যদি পাও, সাহায্য চাও, সাহায্য লও। আর কেনী যে বলে বলীয়ান, তার অনুকরণ কর। দেখি কেনী যায় কোথা? একা কেনী আসিবার দিন মাত্র একখানি বেত আর একটা টুপী লইয়া আসিয়াছিল, তা লোকের কাছে গল্পও করে, "আমার বেত টুপী সার। যদি নাই থাকৃতে পারি, যাহা লইয়া আসিয়াছিলাম তাহাই লইয়া যাইব।" দেখ ত কেমন সাহস! আর কেমন বড় হওয়ার চেষ্টা!

তোমাদের কি ওরূপ সাহস আছে,—না উৎসাহ আছে? তোমাদের সকলই মুখে, কাজে কিছুই নাই। কেবলই হৈ হৈ। কার্য্য বুঝিয়া, কার্য্যের গুরুত্ব বুঝিয়া চলিবে না, বুঝিয়া করিবে না। আচ্ছা, যাহা বল তাহা করিতে পারিলেও মুখের গৌরব থাকে। কথার মূল্য বাড়ে। ফাঁকা আওয়াজ আর ফাঁকা কথা দুই সমান। কেবল বারুদ ক্ষয় আর মাথা ক্ষয়। তোমরা বোঝ আর না বোঝ, পার আর না পার, মুখের জোর কিছুতেই কমে না। মাথা ত একেবারে নাই বলিলেও হয়, কারণ প্রায়ই ঠিক থাকে না। যাহা হউক, আর বেশী বল্‌তে ইচ্ছা করি না। মনে ভেবে রেখ, খুব দৃঢ় বিশ্বাসে স্থির করে রেখ, যে সকলেরই শেষ আছে। আমি যদি এত করিয়াও এই জালেমের হাত হইতে আমার প্রজা রক্ষা করিতে না পারি, তাতে দুঃখ নাই। কারণ, কালে কেনীর ধ্বংস আছেই আছে। আমার দুঃখ এই, যে আমি সে সকল ঘটনা চক্ষে দেখিতে পারিব না,—দয়ার হাত বিস্তার—নির্দ্দয়ের হাত সঙ্কোচ। যে দিন কেনীর সময় পূর্ণ হইবে, সে দিন সামান্য বলে, সামান্য কারণে, কেনী মহা অস্থির হইয়া উঠিবে।"

কথা শেষ হয় নাই, এমন সময় খবর আসিল যে দারগা, জমাদার, বরকন্দাজ, চৌকীদারে প্রায় ৪ শত লোক আসিতেছে।

প্যারীসুন্দরী বলিলেন, "তাহারা কোম্পানীর লোক, তাহাদিগকে খুব আদর কর। কি জন্য আসিয়াছে শোন। যদি সেই কারণেই আসিয়া থাকে, তবে এইক্ষণে সে সব আলাপ কিছু না ক'রে আগে আহারের যোগাড়, জল-খাবার যোগাড়, বাসার যোগাড়, বিশ্রামের উপযোগী স্থানের যোগাড় করিয়া দেও। পরে অন্য কথা, অন্য

যোগাড়। কিছুতেই যেন তাহাদের সমাদর ও যত্নের ত্রুটি না হয়।

সেলাম বাজাইয়া রামলোচন ত্রস্তে চলিয়া গেলেন।

(৬)

উভয় পক্ষেরই গুপ্ত সন্ধানী চর অনুচর খবুরে, সকলই আছে। সদরপুরের খবর কুঠীতে আসিতেছে, কুঠীর খবর সদরপুরে যাইতেছে। সাধারণের মনে বিশ্বাস, যে প্যারী-সুন্দরী কেনীকে কিছুতেই ছাড়িবেন না। হাজার টাকা—কথার কথা! কেনীর মাথার মূল্য এখন হাজার টাকা। যে ঐ মাথা সদরপুরে লইয়া দিতে পারিবে, সে-ই ঐ টাকা পাইবে। আর মেম সাহেবকে চাহেন চাকরাণীর জন্য! সাড়ী পরাইয়া, হাতে বালা দিয়া, মনের মত জব্দ করিবেন। দেশের লোককে দেখাইবেন। কিন্তু কেনীও কম পাত্র নয়, সেও প্যারীসুন্দরীকে আপনার কুঠীতে পাইবার যোগাড়ে আছে। কি কাণ্ড! ভয়ানক ব্যাপার। কার ভাগ্যে যে কি আছে কে বলিতে পারে?—আপন কথাই আপন মুখে প্রায় লোকের ঠিক্ থাকে না। তাহাতে আবার বাঙ্গালী। পরের কথায় কত কথাই যে বাতাসের আগে আগে দৌড়িয়া যাইতে থাকে তাহার সীমা করা কঠিন।

বেলা অপরাহ্ণ ৪টা। মিসেস্ কেনী এবং মিঃ কেনী উভয়ে দ্বিতল গৃহের উপরের ঘরে। আজ বড়ই মিশামিশি ঘেঁসাঘেসী। সম্মুখে শ্বেত প্রস্তরের একটী গোলাকার ক্ষুদ্র টেবিল, টেবিলের উপরে টম্‌লট পূর্ণ এক্কা ব্রাণ্ডি। সোডা-ওয়াটারে মিশ্রিত। এখনও গ্লাসের নিম্নভাগ হইতে বুদ্‌বুদ্ উঠিতেছে, এক্কার রং ক্রমশঃই ফিকা হইতেছে।

কেনী পা-চারি করিয়া বেড়াইতেছেন। দুই তিন পাক ফিরিয়া একটু ব্রাণ্ডি মুখে দিতেছেন। কিন্তু মস্তক চিন্তার কার্য্য ভুলে নাই। কেনীর মস্তক এইক্ষণ বিশেষ একটী চিন্তায় চিন্তিত রহিয়াছে। চারি দিকে শত্রু, চারিদিকে গোলযোগ। যশোহরে, মাগুরায়, পাবনায়, এই তিন জেলা মাখিয়া মোকদ্দমা। আদালত ফৌজদারী। নড়া-লের রামরতন রায়, নলডাঙ্গার রাজা, পাংশার ভৈরব বাবু, আরও কত জমিদার তালুকদারের সহিত কত গোলযোগ। সকলের উপর সদরপুর। মেম সাহেবকে লইয়া সাড়ী পরাইবে। বড় শক্ত কথা। আবার নিজের মাথার কথা-টাও কম নহে। কোন্ দিক রক্ষা করিবেন!

বিশ্বস্ত খানসামা সোনাউল্লা ত্রস্তে আসিয়া হাত জোড় করিয়া বলিল, "হুজুর, পাবনার লোক ফিরিয়া আসিয়াছে। এই পত্র আনিয়াছে।"

কেনী টম্‌লট্ খালি করিয়া পুনরায় ব্রাণ্ডি ঢালিতে-ছিলেন। পাবনার পত্রের কথা শুনিয়া ব্যস্ততা প্রযুক্ত ব্রাণ্ডিতে সোডাওয়াটার না মিশাইয়া যত পারিলেন পান করিয়া, মিসেস্ কেনীর বাম স্কন্ধে আপন বাম হস্ত রাখিয়া পত্র খানির আগাগোড়া ২।৩ বার মনে মনে পড়িলেন। মুখে কথঞ্চিৎ হর্ষের লক্ষণ দেখা দিল। বোধ হয় কোন সুখবর। সোনাউল্লা খানসামা বিশ্বাসী ও চতুর। সময়ে রাগী ও ধীর। স্বামী স্ত্রী উভয়েরই বিশ্বাসী, কেনী সোনাউল্লাকে ইঙ্গিতে ডাকিয়া চুপে চুপে কি কি বলিয়া দিলেন।

ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকার দেখা দিল। সোনাউল্লা সাহেবের কয়েক জোড়া কাপড়, তোয়ালিয়া, চিরুণী, ব্রুস, একটা গ্লাস এবং অল্প পরিমাণ কিছু খাদ্য দ্রব্যাদি পুরিয়া একটী পোর্টম্যাণ্ট সাহেবের সম্মুখে রাখিয়া দিল। আহারের জন্য টেবিল সাজান হইয়াছে। কেনী তাড়াতাড়ি করিয়া আহারে বসিলেন, মিসেস কেনীও টেবিলে বসিলেন, কিন্তু আহার করিলেন না। কেনী তাড়াতাড়ি যৎসামান্য কিছু মুখে ফেলিয়া টেবিল হইতে উঠিলেন। সোনাউল্লার মুখের দিকে তাকাইতেই সোনাউল্লা জোড় হাতে বলিল :—"খোদা-বন্দ! পাল্কী বেহারা হাজির।" কেনী দেশলাই জ্বালাইয়া পাইপ মুখে ধরিলেন, এবং জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সব ঠিক?"

সোনাউল্লা পূর্ব্ববৎ বলিল, "খোদাবন্দ, সব ঠিক্।" কেনী মৃদুস্বরে মেম সাহেবকে দুই একটী কথা বলিয়া সোনা-উল্লাকে বলিলেন, "দেখ বাবুরচিকে গিয়া বল, ভাল ভাল খানা তৈয়ার করিতে। আর যা যা করিতে হবে মেম সাহে-বের কাছে শুনবে।" এই বলিয়াই মেম সাহেবের হাত ধরিয়া নীচে নামিলেন, এবং তখনই তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইয়া পাল্কীতে উঠিলেন। মুহূর্ত্তকাল অতীত হইলেই মিসেস কেনী দেখিতে পাইলেন, যে এক খানা পাল্কী আর নানা রকম পোশাক পরা জন পঞ্চাশ লোক ক্রমে আফিস দালান বাম দিকে রাখিয়া একেবারে তাঁহার দ্বিতল বাস

গৃহের সিঁড়ির নিকট আসিয়া দাঁড়াইল, এবং পাল্কীর দ্বার খুলিয়া গেল।

মিসেস্ কেনী আগ্রহের সহিত, "ও মিষ্টার—" বলিয়া মহানন্দে ত্রস্তপদে সিঁড়ির নীচে আসিয়া আগন্তুক ইংরেজের হাত ধরিলেন। যথারীতি অভিবাদন করিয়া উভয়ে উপরে আসিলেন। পর্দ্দা সরিয়া দ্বার অবারিত করিল। দস্তুর মত পাখা চলিত লাগিল। মিসেস্ কেনী তাড়াতাড়ি নীচে যাইয়া সাহেবের লোকজনকে বিশেষ আদর করিয়া নীচের তলায় স্থান দিলেন। আহারাদির জন্য সোনাউল্লাকে বিশেষ করিয়া বলিয়া বুঝাইয়া উপরে আসিলেন। পাঠক পাঠিকা জানেন, এই আগন্তুক কে? ইনি জেলার মাজিষ্ট্রেট। সঙ্গের যত লোকজন কেহই নিরর্থক আসে নাই। উহাদের মধ্যে দারোগা, নায়েব-দারগা, জমাদার বরকন্দাজ সকলেই আছেন। কিন্তু সকলেই ছদ্মবেশী।

মেম সাহেব, সাহেবকে বসাইয়া ঐ কক্ষের নিম্ন কুঠুরীতে দারগা, জমাদার এবং বরকন্দাজদিগকে যথোপযুক্ত স্থান নির্ণয় করিয়া দিলেন। তৎপর তাহাদের আহারের ব্যবস্থা করিলেন। কুঠীর অন্যান্য চাকর আমলা প্রভৃতি কেহই এ নিগূঢ় তত্ত্ব জানিতে পারে নাই।

উভয় পক্ষের গোয়েন্দাই চতুর। কে কোন্ সময়ে সন্ধান লইতেছে, কি কৌশলে, কি বেশে আসিয়া খবর জানিয়া যাইতেছে, সাবধান সতর্কে থাকিয়াও কোন পক্ষই তাহা জানিতে পারিতেছে না। কুঠীর খবর দিন দিন সদরপুর যাইতেছে। সদরপুরের গুপ্তচর সংবাদ দিয়াছে যে, কেনী আজ কুঠীতেই আছেন—আমোদে মাতিয়া আছেন। ব্রাণ্ডি পানেতে মাতওয়ারা,—বিভোর। মেম সাহেব পিয়ানো বাজাইতেছেন, হাসি তামাসা খুব চলিতেছে, ইত্যাদি।

মিসেস্ কেনী আজ যে অভিনয়ের ভার গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে কৃতকার্য্য হওয়া বড়ই কঠিন। তবে ভরসা এই যে, সুচতুর সোনাউল্লা সাহায্যকারী,—আগন্তুক পাবনার দল প্রকাশ্যে সাহায্যকারী না হইলেও শান্তিরক্ষক, বিচারক, এবং প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্বরূপ পরিদর্শক।

সোনাউল্লা মেম সাহেবের নিকট আসিয়া বলিল, "হুজুর! মীর সাহেব তাঁহার নিতান্ত বিশ্বাসী লোক দ্বারা এই পত্র পাঠাইয়াছেন। সে আপনার সহিত দেখা করিতে চাহে। পত্রের কথা ছাড়া আরও কি কথা আছে। মিসেস্ কেনী ত্রস্তে নীচে আসিয়া গোপালকে দেখিয়াই চিনিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "গোপাল, খবর কি?"

গোপাল সেলাম বাজাইয়া বলিল,—"হুজুর একশত আসিয়াছে। আর সমুদয় ঠিক। আপিস ঘরে ইহাদের স্থান দিলে ভাল হয়।" মিসেস কেনী আফিস ঘরের দরওয়ানকে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন, "গোপাল এবং তাহার সঙ্গীরা আফিস ঘরে স্থান পাইল।"

মিসেস্ কেনী মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের নিকটে বসিয়া খোস গল্প করিতেছেন, এমন সময়ে আবার সোনাউল্লা আসিয়া করজোড়ে বলিল, "হুজুর সান্যাল মহাশয় সাহেবের নিকট বিশেষ কি কথা বলিতে চান। মিসেস্ কেনী বলিলেন, তুমি গিয়ে দেওয়ানজীকে বল, আজ সাহেবের শরীর অসুস্থ। সোনাউল্লা চলিয়া গেল, মুহূর্ত্ত পরেই ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "হুজুর বড় জরুরি খবর, তিনি বলিলেন,—যদি সাহেবের শরীর অসুখ হইয়া থাকে তবে মেম সাহেবের নিকটেই বলিতে হইবে। বড়ই জরুরি কথা।" মিসেস্ কেনী উঠিলেন এবং সিঁড়ির নিকটে আসিয়া শম্ভু সান্যালকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি কথা?" সান্যাল মহাশয় বলিতে লাগিলেন, "হুজুর, এখনই খবর পাইলাম, যে প্যারীসুন্দরীর বহুতর লাঠিয়াল সদরপুর হইতে রওয়ানা হইয়াছে। ঢাল, সড়কী, লাঠি ইত্যাদি গাড়ী বোঝাই করিয়া আনিতেছে। বহুতর লাঠিয়াল একত্রে আসিতেছে। সাহেবের সঙ্গে দেখা হইল না, কোন পরামর্শও করিতে পারিলাম না। দিন বুঝিয়াই সাহেবের শরীর অসুখ হইয়াছে, এখন উপায় কি?" মিসেস্ কেনী বলিলেন, কুঠীতে ত আমারও অনেক লোক আছে, ভয় কি?" শম্ভু সান্যাল বলিলেন, "হুজুর, কুঠীতে যে লোক আছে তাহাদের দ্বারা কুঠী রক্ষা হইতে পারে না। প্যারীসুন্দরী এবারে বিশেষ জোগাড় করিয়াছে। আর একটী কথা, তাহারা শুধু কুঠী লুটপাট করিয়া যাইবে না। তাহাদের মনের ভাব ভাল নহে।" মিসেস কেনী বলিলেন, "আর কি করিবে? আমাকে সদরপুরে লইয়া যাইবে? যে লোক আছে তাহাতে যদি তোমাদের সাহস না হয়, আরও লোক সংগ্রহ

কর। টাকার কি না হয়! দুই টাকার জায়গায় চারি টাকা খরচ কর, এই রাত্রেই কত লোক জুটিয়া যাইবে। যত পার সংগ্রহ কর, আমার হুকুম।" শম্ভু বলিলেন, "এত রাত্রে লোক পাওয়াই ত কঠিন কথা।" মিসেস কেনী বলিলেন, "তবে সাহেবকে কি বলিতে আসিয়াছ? কোথায় পাইবে! সে কি কথা? কুঠীর চারিদিকে আমারই প্রজা। তাহাদিগকে বেশী করিয়া টাকা দেও, অবশ্যই আসিবে। যত লোক পার আনিয়া কুঠীর চারিদিকে খাড়া করিয়া দেও। রাত্রি প্রভাত না হওয়া পর্য্যন্ত খাড়া পাহারা দিবে।"

শম্ভু সান্যাল সেলাম বাজাইয়া বিদায় হইলেন। মিসেস কেনী নিজ কক্ষে প্রবেশ করিলেন। (ক্রমশঃ)

বনিতা-বিনোদ।

প্রথম বিনোদ।

আত্মবিস্মৃতি এবং পতিভক্তি।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

গর্ভধারণের সময় হইতেই মাতা সন্তানের ভালমন্দের জন্য দায়ী থাকেন। জননীর ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র শারীরিক ব্যাধি বা মানসিক বিকার এবং তাঁহার নিত্যনৈমিত্তিক ছোট বড় কাজকর্ম্মের উপর বালক বালিকার জীবন এবং চরিত্রের শুভাশুভ বিশেষরূপে নির্ভর করে। জননীর সামান্য ও নগণ্য কার্য্যের ফলে শিশু হয় ধার্ম্মিক, পণ্ডিত, শূরবীর—অথবা মূর্খ, ক্রূর ও কুচরিত্র হয়। তাঁহার দায়িত্ব কতদূর গুরু তাহা ভাবিলে স্তম্ভিত হইতে হয়।

যে মাতার হস্তে এই মনুষ্যজীবনরূপী প্রাসাদের মূল ভিত্তি স্থাপিত, আর্য্যশাস্ত্রে যে সেই মাতাকে পদে পদে আত্মবিস্মৃতির উপদেশ দিয়াছেন, ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই।

"আত্মবিস্মৃতি" সম্বন্ধে গীতাশাস্ত্রে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কহিয়াছেন :—

'হে অর্জ্জুন, সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ এই তিন গুণ অবলম্বন করিয়া বেদশাস্ত্র অবস্থান করিতেছেন। যাঁহার বুদ্ধি এই তিন গুণে আবদ্ধ তাঁহার পক্ষে সত্যজ্ঞান ও সত্যসুখের অধিকারী হওয়া সম্ভব নহে। আর যাহার মন "যোগ-ক্ষেম" তত্ত্ব সম্যক বুঝিতে পারে না সে ব্যক্তি সুখাভিলাষ-পাশে বদ্ধ হইয়া পড়ে। অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তির চেষ্টা বা উপায়কে "যোগ" বলে, আর প্রাপ্ত বিষয়ের রক্ষা, ভোগ এবং বৃদ্ধি করিবার উপায়কে "ক্ষেম" বলে। এই জন্য এই ত্রিবিধ গুণের বিষয় অর্থাৎ স্বার্থপরতা পরিত্যাগ করিয়া মানুষকে সত্যনিষ্ঠ হইতে হইবে। ইহাতে আত্মাতে বল আসিয়া উপস্থিত হইবে। যাহার আত্মা সবল সে-ই সংসারের প্রলোভন-পাশ হইতে মুক্ত হইয়া সুখী হইতে পারে।'

মনুষ্যজীবনে সত্ত্বগুণের বিকাশ করা এবং সমস্ত জীবনে ঐ সাত্ত্বিক প্রভাব স্থির রাখা রমণীরই কার্য্য। রমণী মাতৃরূপে শিশুর হৃদয়ে সত্ত্বগুণের বিকাশসাধন করেন, সহধর্ম্মিনীরূপে যৌবনে নিজ স্বামীর হৃদয়ে যথোচিত অনুশীলন দ্বারা ঐ গুণকে বদ্ধমূল করিতে পারেন, এবং বার্দ্ধক্যে নিজ পুণ্যময় চরিত্র-প্রভাবে ঐ গুণের স্বর্গীয় গৌরবের আদর্শ নিজ স্বামীর হৃদয়ে চিরস্থায়ী করিতে পারেন।

আপনাকে একেবারে ভুলিয়া গিয়া নিজের আত্মীয় পরিবার এবং অপরের মঙ্গলার্থ জীবনের সর্ব্বস্ব সমর্পণ করা বস্তুতঃই সুকঠিন। "সংসারে একবারে লীন হইয়া উহার প্রত্যেক কার্য্য মনোযোগ সহকারে সম্পাদন করা অথচ সংসার হইতে একেবারে পৃথক থাকাই সংসার জয় করিবার একমাত্র সহজ উপায়,"—রাজর্ষি জনকের এই সদুপদেশ রমণীর পক্ষে নিতান্ত উপযোগী। এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমস্ত জগতে পুরুষ তাহার সমগ্র জীবনে যাহা কিছু উপার্জ্জন বা সঞ্চয় করে, তাহার পরিশ্রমের সমস্ত ফল—ভূমি, পশু, বিত্তাদি সমস্ত সম্পত্তি—এক কথায় পুরুষের পুরুষার্থ—সকলই রমণীর জন্য—তাহা কে না জানে? গৃহিণীরই জন্য গৃহ, তাঁহারই সুখের জন্য ধনসম্পত্তি;—আর পশু, ভূমি এ-সকল ধনেরই নামান্তর মাত্র।

ধন, ধরণী এবং পুরুষার্থ—পুরুষের সমস্তই যখন রমণীর জন্য, তখন উহাদের উত্তমরূপে রক্ষণাবেক্ষণের ভার বা দায়িত্ব রমণীর ভিন্ন আর কাহার হইবে?

পুরুষকে সচ্চরিত্র করাও রমণীর হাত। জগৎ-সৃষ্টি ব্যাপারে সর্ব্বশক্তিশালিনী প্রকৃতির সহিত পরমপুরুষের যে সম্বন্ধ, গার্হস্থ্যরূপ জগতে পুরুষের সহিত স্ত্রীরও সেই সম্বন্ধ।

জগতের সৃষ্টি ব্যাপারে প্রকৃতিই যেমন সর্ব্বময়ী কর্ত্রী, গৃহস্থের গৃহে স্ত্রীও সেইরূপ সর্ব্বময়ী কর্ত্রী। প্রকৃতির রচনা সর্ব্বত্র সৌন্দর্য্যময়ী এবং মনোমোহিনী হইলেও তিনি নিজের জন্য ব্যাকুল না হইয়া অপরের উপকারের জন্যই যাবতীয় পদার্থ সৃষ্টি করিয়া থাকেন; স্ত্রীও সেইরূপ নিজে সুন্দরী, সুশীলা ও সদাচারপরায়ণা হইয়াও নিজের রূপ, গুণ, সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, সমস্ত বিস্মৃত হইয়া সংসারকে সৎপথে চালিত করিয়া থাকেন।

প্রকৃতি যেমন সর্ব্বত্র অতুলনীয় শোভার আকর হইয়াও নিরহঙ্কার এবং নিরভিমান, স্ত্রীর পক্ষে ঐরূপ সর্ব্ববিধ সৌন্দর্য্যের অধিশ্বরী হইয়াও নিরহঙ্কার নিরভিমান ও নিঃস্বার্থ হইয়া পরোপকারের নিমিত্তই জীবন উৎসর্গ করা উচিত। কারণ, গৃহস্থের সমস্ত সুখ ও স্বচ্ছন্দতা যখন একমাত্র স্ত্রীর উপর নির্ভর করিতেছে তখন সেই স্ত্রী যদি অহঙ্কৃতা ও স্বার্থবশীভূতা হন, তাহা হইলে পুরুষ জীবন্মৃত হইয়া থাকেন এবং সমগ্র সংসার ছারখার হইয়া যায়।

এক ইংরেজ কবি লিখিয়াছেন, "জীবন একখানি সাদা কাগজের মত। যদি কাহারও কিছু লিখিবার থাকে এই বেলা লিখিয়া লও;—কারণ অন্ধকারময়ী রাত্রি আসিতেছে, তখন চক্ষে কিছুই দেখিতে পাইবে না।"

যদি আমরা আমাদের জীবনরূপী সাদা কাগজে কোন পাপের কালি পড়িতে না দিই এবং উহাতে এমন সকল অমৃতময় বাক্যাবলী লিখিয়া রাখি, যে তাহাতে কাগজেরই কেবল মূল্য বৃদ্ধি করিবে এমন নয়,—যে কেহ ঐ কাগজ পড়িবে বা উহার মর্ম্ম বুঝিতে পারিবে সেও অমৃতের অধিকারী হইবে—তাহা হইলেই আমাদের রীতি নীতি আচার ব্যবহার ভাল হইতে পারিবে। কিন্তু যে সকল বাক্য আমাদিগের হৃদয়ে নিজ পবিত্রতার প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না, অথবা আমাদের মনে প্রেম ও পবিত্রতার সঞ্চার করিতে পারে না, কিংবা বিচারশক্তি বর্দ্ধিত করিতে সক্ষম হয় না—সেরূপ বাক্য লেখা নিরর্থক।

আমরা সকলেই দয়াময় ভগবানের সন্তান। যাঁহাতে আমরা এই সংসারের মধ্যে নিরুদ্বেগে ও নির্ব্বিঘ্নে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারি এমন একটী মহারত্ন আমরা পিতার নিকট হইতে পাইয়াছি। সেই রত্নটী বুদ্ধি। আমাদিগের শরীর রক্ষার জন্য যেমন অন্ন জলাদি খাদ্য ও পানীয়ের আবশ্যক, বুদ্ধির জন্যও তেমনি বিদ্যা ও জ্ঞানের আবশ্যক। উত্তমোত্তম পুস্তকাবলী রত্নাকর স্বরূপ; সেই রত্নাকরের ভিতর যে ব্যক্তি প্রবেশ করিবার কৌশল অবগত থাকে সে অমূল্য ও অতুলনীয় রত্নলাভে অধিকারী হইতে পারে এবং ঐরূপ অতুল রত্নাবলীর চারু চাকচিক্যময় উজ্জ্বলতায় আপন আপন জীবনের শোভা শতগুণ বর্দ্ধিত করিতে পারে।

অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, শৌচ, স্বাধ্যায়, ধৈর্য্য, ধ্যান, সম, দমাদি ধর্ম্ম নিয়ম যাঁহারা নিত্য পালন করিয়া থাকেন, স্বার্থপরতা বা আত্মম্ভরিতা সে সকল রমণী বা পুরুষের ত্রিসীমায়ও পদক্ষেপ করিতে পারে না।

যে সকল রমণী এই সকল উচ্চভাব স্বয়ং সম্যক ধারণা করিয়া নিত্য নিয়মিত ভাবে এই সকল সদাচারের অনুশীলন করিতে পারেন এবং আপন পুণ্য-চরিত্রের আদর্শ স্বীয় আত্মীয়বর্গ, সন্তান সন্ততি এবং প্রতিবেশীগণের অন্তঃকরণে প্রতিফলিত করিয়া এই দুঃখতাপসঙ্কুল সংসারকে বস্তুতঃই স্বর্গে পরিণত করিতে পারেন, তাঁহারাই রমণীরত্ন, ধরায় তাঁহারাই ধন্যা।

"আত্মার" সহিত সম্বন্ধ আছে এইরূপ চারিটী বাক্যের নাম আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, যথা:—"আত্মবিস্মৃতি", "আত্মত্যাগ," "আত্মনির্ভর" ও "আত্মগৌরব।" ইহার মধ্যে প্রথম দুইটী অর্থাৎ "আত্মবিস্মৃতি" ও "আত্মত্যাগ" মহিলাদিগের পক্ষে অত্যন্ত আবশ্যকীয় ও উপযোগী, এবং অপর দুইটী অর্থাৎ "আত্মনির্ভর" ও "আত্মগৌরব" পুরুষের পক্ষে বিশেষ হিতকর ও উপাদেয়। সর্ব্ব বিষয়ে নিজের ক্ষমতা বা পারদর্শিতার উপর বিশ্বাস, নির্ভর ও সাহস রাখাই পুরুষের পুরুষত্ব।

এই বিশ্বসংসার সর্ব্বশক্তিমান বিশ্বকর্ম্মা পরমেশ্বরের রচনা। তিনি আপন সন্তানের আবশ্যকীয় যাবতীয় পদার্থের সৃষ্টি করিয়াছেন—কিছুরই ত্রুটি রাখেন নাই! অধিকন্তু তিনি মনুষ্যকে জ্ঞান ও বুদ্ধি এই দুই অসাধারণ শক্তি প্রদান করিয়াছেন, যাহার প্রভাবে মানুষ ঐ সকল সৃষ্ট পদার্থকে লইয়া নানা প্রকারে নিজ ব্যবহারোপযোগী করিয়া লইতে পারে। জগতে অদ্যাবধি মানুষ যাহা কিছু করিতে

সমর্থ হইয়াছে, আজও মানুষ তাহা করিতে পারে। একজন মানুষে যে কাজ করিয়াছে প্রত্যেক মানুষেও তাহা করিতে পারে।

সংসারে স্বাধীনতাই সুখের হেতু, পরাধীনতাই দুঃখের মূল। আপনার আবশ্যকীয় সর্ব্ববিষয়ে নিজের উপর বিশ্বাস ও নির্ভর রাখাই মনুষ্যত্ব—পরের মুখ চাওয়া বাস্তবিকই ঘৃণিত পশুত্ব।

যিনি আত্মনির্ভরশীল তিনিই আত্মগৌরবের মহিমা অনুভব করিতে পারেন। যে ব্যক্তি আত্মগৌরবের মহিমা অনুভব করিয়াছেন তিনি কদাপি পরাধীনতার শৃঙ্খল পায়ে পরিতে স্বীকৃত হইতে পারেন না। তিনি অল্পেই তুষ্ট, তিনি সংযমী। আত্মাকে সম্পূর্ণ স্বাধীন রাখিয়া যে সকল বস্তু তিনি আয়ত্ত করিতে পারিয়াছেন, নিজের আকাঙ্ক্ষা বা আবশ্যকতাকে সেই সকল বস্তুযোগেই তিনি তৃপ্ত করিতে পারেন। যে সকল বস্তু পরাধীন বা পরায়ত্ত—এমন বস্তু ভোগের ইচ্ছাই তাঁহার জন্মে না। তিনি জিতেন্দ্রিয়, তিনি সংসারবিজয়ী মহাপুরুষ।

কোন পূজ্য ব্যক্তির প্রিয় কার্য্য সাধন অর্থাৎ তাঁহার মনের মত কার্য্য করার নাম ভক্তি। ভগবানের সৃষ্ট প্রাণীদিগকে ভালবাসিলে যেমন ভগবানের প্রতি ভক্তি করা হয়, সেইরূপ যে কার্য্য করিলে প্রিয়তম স্বামীর মন প্রসন্ন ও চিত্ত প্রফুল্ল হয় সেই কার্য্য নিত্য আচরণ করিলে স্বামীর প্রতি ভক্তি করা হয়। স্বামীর মনের ভাব জানিয়া—তিনি প্রকাশ করিয়া বলিবার পূর্ব্বেই তাহার মনোঽনুকূল কার্য্য করিতে সর্ব্বদা যত্ন করা, স্বামীর কার্য্যে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করিয়া তাঁহার ভার লঘু করা এবং বিপদের সময়ে উৎসাহ ও সাহস দিয়া তাঁহার ধৈর্য্য বৃদ্ধি করা, পতিভক্তির মুখ্য অঙ্গ। কাম ও ক্রোধ সম্বরণ করিয়া সর্ব্বদা মিষ্টভাষিণী ও হিতকারিণী হওয়া উচিত। ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য, যে ক্রোধ কখনই আপনা আপনি উৎপন্ন হয় না। সময়ে সময়ে অতি তুচ্ছ কথায় ক্রোধ জ্বলিয়া উঠে বটে তথাপি ইহা নিশ্চয় কথা, যে অপরের বিনা সাহায্যে ক্রোধাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয় না। কথায় বলে, "এক হাতে তালি বাজে না।" এই ক্রোধ সমস্ত বিবাদ বিসম্বাদ ও সর্ব্বনাশের মূল। এই ক্রোধের সম্বন্ধে নিতান্ত সতর্ক থাকা উচিত। কখনও কোন কারণে পতিকে ক্রোধান্বিত দেখিতে পাইলে অত্যন্ত সাবধানে তাঁহার ক্রোধশান্তির উপায় করা কর্ত্তব্য। কোন উপায় বুঝিতে না পারিলে নিজের অত্যন্ত স্থির ধীরভাবে থাকা উচিত। সে সময়ে ক্রোধের লেশ মাত্রও মনে স্থান দেওয়া উচিত নহে। এইভাবে থাকিলে অল্পকাল মধ্যেই সর্ব্বত্র শান্তি উপস্থিত হইবে। পতি পত্নী দুই জনে সমান ভাবে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলে তাহার পরিণাম বড়ই ভয়ঙ্কর হইয়া উঠে। কত কত সোণার সংসার এই আগুনে ছাই হইয়া গিয়াছে।

ইহা স্মরণ রাখা উচিত, যে মানুষ আপনার আত্মীয় পরিজনকে যত ভালবাসে, প্রতিবেশী, দূর অথবা নিঃসম্পর্কিত ব্যক্তিদিগকে তত ভালবাসিতে পারে না। কিন্তু যে ব্যক্তির গৃহে সর্ব্বদা শান্তি ও আনন্দ বিরাজমান, তাহার সহবাসে বাহিরের লোকেও শান্তি ও আনন্দের আস্বাদ পাইয়া থাকে। আর যে ব্যক্তি নিজ গৃহে ক্রুদ্ধ ও খিট্‌খিটে, বাহিরের লোকের সঙ্গে তাহার ব্যবহার কদাপি সুখকর হয় না।

সু-জননীর নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত সন্তান, সুগৃহিণীর সহবাসে তাঁহার প্রভাবে পালিত পতি এবং উন্নত চরিত্রসম্পন্ন বয়ঃস্থ স্ত্রীপুরুষের দ্বারাই সংসারে পারিবারিক ও সামাজিক সুখের বৃদ্ধি হয়। এইরূপ ব্যক্তিসমূহ দ্বারা গঠিত জাতি জগতে সভ্য জাতি বলিয়া প্রশংসিত হয় এবং ধন ধান্য রাজ্য সমৃদ্ধি প্রভৃতি নানা প্রকার সুখের অধিকারী হইয়া থাকে।

ভগবানের সংসাররূপী সুন্দর পুষ্পোদ্যানে এইরূপ জাতি সমূহ মনোহর সুগন্ধি পুষ্পাবলীর ন্যায় শোভা বিস্তার করিয়া থাকে। এই পুষ্পের সৌরভ উৎপন্ন করা এবং সর্ব্বদা ঐ সুগন্ধে ভরপুর রাখা রমণীর হাত। কবি বলিয়াছেন :—

"যথায় সুমতি তথা সম্পত্তি নানা,
যথায় কুমতি তথা দুঃখ নিদানা।"

মহিলাগণ নিজ নিজ অতুল পতিভক্তি এবং মহিমাময় আত্মগৌরব হইতে এই সুমতি বিকশিত করিয়া নিজ নিজ জীবন সার্থক করিতে পারেন। পুরাকালে এইরূপ মহিমাময়ী মহিলাকুল ভারতে অবতীর্ণ হইয়া ভারতের গৌরব বর্দ্ধন ও মুখ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন এবং এখনও আমাদের মাতৃভূমির—আমাদের সমস্ত জাতির মান মর্য্যাদা মহিলাদিগের

চীনের বর্ত্তমান সম্রাট।

হতে ন্যস্ত রহিয়াছে। ভগবানের নিকট আমরা সকলে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, তিনি যেন ভারতীয় মহিলাদিগকে—আমাদিগের স্নেহময়ী জননী, ভগিনী ও কন্যাদিগকে—এরূপ পথে চালিত করেন, যে তাঁহারা জগতে আদর্শস্থানীয়া হইয়া ভারতের পূর্ব্বগৌরব শতগুণ বর্দ্ধিত করিতে পারেন। ভগবানের আশীর্ব্বাদে তাঁহারা যদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থ বিস্মৃত হইয়া নিজ নিজ স্বামী, পুত্র, ভ্রাতা ও পিতাকে দেশের জন্য, সমাজের জন্য, জাতির জন্য আত্মবিসর্জ্জন দিতে শিক্ষা দেন, তাহা হইলে আমাদিগের উদ্ধার অনিবার্য্য। বিশ্ববিধাতা ভগবান আমাদের এই প্রার্থনা পূর্ণ করুন।

শ্রীসত্যবন্ধু দাস।
অনুবাদক।

সতি-উন্-নিসা।

এই মুসলমান রমণীর জীবন-চরিতে দিল্লীর বাদশাহদিগের অন্তঃপুরের একটি চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা ছাড়া সে সময়ের একজন শিক্ষিত পারসীক মহিলার বিবরণ আমরা জানিতে পারি; তৎপর মাতার হৃদয়ের স্নেহ ও শোকের একটি করুণ দৃশ্য আমাদের চোখের সামনে আসে।

মুসলমান জগতে পারস্যবাসীদের মত বুদ্ধিমান ও সুসভ্য জাতি আর হয় নাই। ইউরোপে যেমন ফরাসীরা শিল্প ও সভ্যতায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, এসিয়া মহাদেশে পারস্য দেশের লোকেরাও তেমনি। ভারতবর্ষের মুসলমান রাজাদিগের অনেক বিখ্যাত ও কার্য্যদক্ষ মন্ত্রী, সেনাপতি ও শাসনকর্ত্তা পারসীক ছিলেন। তঁাহাদের মধ্যে মহম্মদ গাওয়ান (বাহমানী সুলতানদিগের মন্ত্রী), মির জুমলা (আওরংজীবের প্রধান সহায়), আলি মর্দ্দান্ খাঁ (দিল্লীর যমুনা নহরের এঞ্জিনিয়ার) প্রভৃতির নাম অনেকে শুনিয়াছেন।

সতি-উন্-নিসা (অর্থাৎ বর্ষার তীক্ষ্ণ ফলার মত রমণীদের শিরস্থানীয়, রমণীশ্রেষ্ঠ,) পারস্যের মাজন্দ্রান প্রদেশের একজন সম্ভ্রান্ত লোকের কন্যা। তাঁহার পিতৃ ও শ্বশুরকুল বিদ্যা ও সভ্যতার জন্য বিখ্যাত। তাঁহার ভ্রাতা তালবাই আমলি সে সময়ে পদ্য রচনায় এবং বাক্যবিন্যাসে অদ্বিতীয় ছিলেন, এবং সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজ-সভায় "কবি-রাজা" এই উপাধি পাইয়াছিলেন। তাঁহার দেবরেরা বিখ্যাত চিকিৎসক ছিলেন। এই পারসীক পরিবারের অনেকেই ভারতে আসিয়া কাজ করিতেন, কেহ কেহ পারস্যেও থাকিতেন। বিধবা হইবার পর সতি-উন্-নিসা দিল্লীর মহারাণী মমতাজ মহলের চাকরী করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং কার্য্যদক্ষতা, বাগ্মীতা, চিকিৎসা-বিদ্যা, ও সদ্ আচরণ গুণে শীঘ্রই আর সব চাকরাণীকে ছাড়াইয়া উঠিয়া রাণীর প্রধান কর্ম্মচারীর পদ পাইলেন। তাঁহার উচ্চ পদ ও বিশ্বাসের চিহ্ন স্বরূপ রাণীর শীল মোহরটি তাঁহার হাতে রাখা হইয়াছিল।

সতি-উন্-নিসার উচ্চারণ বিশুদ্ধ ছিল, তিনি আরবী কোরাণ এবং ফারসী পদ্য ও গদ্য বহি ভাল করিয়া পড়িতে পারিতেন। এ জন্য তিনি জ্যেষ্ঠ রাজকুমারী জেহানারার শিক্ষয়িত্রী হইলেন এবং অল্পদিনেই তাঁহাকে কোরাণ পড়িতে এবং ফারসী লিখিতে শিখাইলেন। যে সকল সচ্চরিত্র স্ত্রীলোকেরা খাওয়া পরার কষ্টে থাকিত অথবা যে সব গরিব কুমারীদের বিবাহের টাকার অভাব হইত, তাহাদের কথা সতি-উন্-নিসা প্রত্যহ রাণীকে বলিতেন। বৈকালে বাদসাহ যখন অন্তঃপুরে আসিতেন, রাণী তাঁহাকে এই সব কথা জানাইতেন; এবং বাদসাহ তাহাদের জন্য দানের হুকুম দিতেন। এরূপে প্রত্যহ অনেক টাকা বিতরণ হইত। কাহাকে জমি দেওয়া হইত, কাহাকে দৈনিক বৃত্তি, কাহাকে এককালীন দান, এবং কুমারীদিগকে নগদ টাকা ও অলঙ্কার। এই শুভ কার্য্যে সতি-উন্-নিসা মধ্যস্থ ছিলেন, এবং সকলের আশীর্ব্বাদ পাইতেন।

রাণী মরিলে পর, যখন তাঁহার দেহ আগ্রার তাজমহলে গোর দিতে আনা হয়, সতি-উন্-নিসা সঙ্গে সঙ্গে আসিলেন। বাদশাহ শাহজাহান বড়ই ভাল স্বামী ছিলেন; ধনী এবং মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও আর বিবাহ করিলেন না; তার পর যে ৩৫ বৎসর বাঁচিয়া ছিলেন একেলা প্রেয়সীর স্মৃতি হৃদয়ে রক্ষা করিলেন। কাজেই রাজবাড়ীতে কর্ত্রীর কাজ করিতে রহিলেন শুধু তাঁহার কন্যা জেহানারা; তাঁহাকেই রাজ-পরিবারের বিবাহ প্রভৃতি উৎসবের বন্দোবস্ত করিতে হইত, স্ত্রীলোকদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতে হইত, এবং অন্যান্য সামাজিকতা রক্ষা করিতে হইত। এই সব

কাজে তিনি সতি-উন্-নিসার উপর নির্ভর করিতেন। সতি-উন্-নিসা রাজকুমারীরও প্রধান কর্ম্মচারিণী হইলেন এবং তাঁহার মোহরের ভার পাইলেন। ফলতঃ এই বৃদ্ধ দাসী রাজ-পরিবারের ছেলেমেয়েদের ঠিক মার মত হইলেন।

রাজকুমারদের বিবাহে সতি-উন্-নিসা, চাকরাণীদের সর্দ্দার হইয়া, বরপক্ষের দানগুলি রাজবাড়ী হইতে লইয়া গিয়া কন্যার মার নিকট পৌঁছাইয়া দিতেন এবং মহামূল্য বকশিস পাইতেন। রাণী মম্‌তাজ মহল বাঁচিয়া থাকিতে ভবিষ্যতে ছেলেদের বিবাহের জন্য অনেক লক্ষ টাকার অলঙ্কার, মণি মুক্তা, কাপড় ও আসবাব সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন; তার পর জেহানারা নিজেও এজন্য অনেক দেন। বিবাহে এই সব হইতে বাদশাহকে উপঢৌকন, বর-কন্যাকে দান, রাজ-পরিবারের সকলকে ও সভাসদ এবং ওমরাহদিগকে উপহার বিতরণ হইত।

জ্যেষ্ঠ কুমার দারাশিকোর বিবাহে দান-সামগ্রী ষোল লক্ষ টাকার ছিল—৭ লক্ষ মণি মুক্তায়, এক লক্ষ নগদ টাকা, ৪ লক্ষ সোনা রূপার অলঙ্কারে এবং অন্যান্য বহুমূল্য দুষ্প্রাপ্য সামগ্রীতে, বাকি হাতী ঘোড়া ইত্যাদিতে। জাহানারার হুকুমে সতি-উন্-নিসা এ সমস্ত দ্রব্য আগ্রা দুর্গের রাজবাড়ীর প্রশস্ত আঙ্গিনায় সাজাইয়া রাখিলেন। রাত্রে চারিদিকে আলো জ্বালান হইল; বোধ হইল যেন মহামূল্য দ্রব্যের এক প্রদর্শনী (exhibition) খোলা হইয়াছে। লোকেরা দেখিয়া চক্ষু সার্থক করিল; স্বয়ং বাদশাহও দেখিতে আসিলেন। এই মত দ্বিতীয় কুমার শূজার বিবাহে দশ লক্ষ টাকার দান সামগ্রী সাজাইয়া দেখান হইল। এই কাজে সতি-উন্-নিসার কার্য্যকুশলতা, কর্ত্তৃত্ব-শক্তি, এবং কলানৈপুণ্য বেশ দেখা গেল এবং সেই জন্যই কাজও সুচারুরূপে সম্পন্ন হইল।

সতি-উন্-নিসা যে কেবল জাহানারার মন্ত্রী ছিলেন তাহা নহে। বাদশাহের অন্তঃপুরের তদারকের ভার তাঁহার উপর, এবং বাদশাহের আহারের সময় পরিবেশন করা ও উপস্থিত থাকাও তাঁহার কার্য্য ছিল। ইহা খুব বিশ্বাস এবং স্নেহের চিহ্ন।

তাঁহার নিজের সন্তান ছিল না; তাই তাঁহার মৃত ভাই তালিবার দুই কন্যাকে তিনি পোষ্য লইয়াছিলেন। তাহাদের উপরই নিঃসন্তান বিধবা-হৃদয়ের যত সঞ্চিত স্নেহ ও ভালবাসা ঢালিয়া দিতেন। বিশেষতঃ ছোট মেয়েটি তাঁহার যেন চোখের মণি ছিল। পারস্য হইতে হকিম (ডাক্তার) জিয়াউদ্দীন নামক তাঁহার একজন দেবর-পুত্রকে আনিয়া, তাহার সহিত এই মেয়েটির বিবাহ দেন, এবং বাদশাহের অনুগ্রহে তাহাকে মোঘল রাজসরকারে একটী চাকরী দিয়া একরকম ঘর-জামাই করিয়া রাখেন। ১৬৩৭ খৃষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারী এত ভালবাসার সামগ্রী এই মেয়েটি দীর্ঘ সুতিকা রোগে মারা গেল। মাতার শোক কি দর্শনের উপদেশ শুনে? সতি-উন্-নিসা যদিও জ্ঞানী ও পণ্ডিতা ছিলেন, কিন্তু এখন একেবারে ধৈর্য্য হারাইলেন; এগার দিন পর্য্যন্ত নিজের বাড়ীতে (লাহোর দুর্গের বাহিরে) শোকে উন্মাদ হইয়া পড়িয়া রহিলেন।

শাহ জাহান বড়ই দয়ালু ছিলেন, স্ত্রী পুত্র চাকরবাকর সকলের প্রতি তাঁহার আদর যত্নের সীমা ছিল না। বারো দিনের দিন তিনি শোকের কিছু উপশম হইয়াছে ভাবিয়া সতি-উন্-নিসাকে রাজ-প্রাসাদে ডাকাইয়া আনাইলেন। কন্যা জেহানারাকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার নিকট গিয়া দুজনে কত সান্ত্বনা দিলেন, এবং ওখানে থাকিতে বলিলেন।

পরদিন বাদশাহ শিকার করিতে গেলে, সতি-উন্-নিসা কি কাজের জন্য নিজ বাড়ীতে ফিরিলেন। আহারের পর সন্ধ্যার দুই নমাজ্ (প্রার্থনা) করিয়া কোরাণ পড়িতে লাগিলেন। রাত্রি আটটার সময় হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "আমার যেন দম বন্ধ হইয়া আসিতেছে।" অসুখ তাড়াতাড়ি বাড়িতে লাগিল। তাঁহার আত্মীয় মসি-উজ্‌জমান নামক পারসীক ডাক্তারকে তৎক্ষণাৎ ডাকা হইল। তিনি ঘরে ঢুকিতে সতি-উন্-নিসা তাঁহাকে সালাম্ করিয়া অমনি এক পাশে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেলেন। তখনও নাড়ী ছিল। কিছুক্ষণ মূর্চ্ছাভঙ্গের জন্য ঔষধ দেওয়া হইল, কিন্তু কোনই ফল হইল না। পরে নাড়ী থামিল এবং বুঝা গেল যে সব ফুরাইয়াছে। একপক্ষ সময়ের মধ্যেই স্নেহময়ী মাতা কন্যার সঙ্গ লইলেন।

পরদিন বাদশাহ এ দুঃসংবাদ পাইয়া কয়েক জন সম্ভ্রান্ত কর্ম্মচারীকে হুকুম দিলেন, যে খুব সম্মানের সঙ্গে মৃত দেহ

সৎকার করিতে হইবে; রাজকোষ হইতে দশ হাজার টাকা শ্রাদ্ধের জন্য দেওয়া হইল। এক বৎসর পরে মৃত দেহ লাহোর হইতে উঠাইয়া আগ্রায় আনিয়া তাজমহলের বাহিরের আঙ্গিনায় পশ্চিম দিকে গোর দেওয়া হইল। ত্রিশ হাজার টাকা দিয়া বাদশাহ এক সমাধি-মন্দির করিয়া দিলেন। তাহা এখনও আছে।

এইরূপে এই প্রভুভক্ত পুরাতন ভৃত্য মৃত্যুতেও প্রভু ও প্রভুপত্নী হইতে দূরে রহেন নাই। *

যদুনাথ সরকার।

পাটনা কলেজের অধ্যাপক।

গীতোক্ত কর্ম্মযোগ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে প্রত্যেক জাতির নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম আছে। সেই কর্ম্মকেই গীতায় 'সহজং কর্ম্ম' বলা হইয়াছে। শূদ্র যদি অসাধারণ প্রতিভাশালী হয় তথাপি 'পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম'ই তাহার কর্ত্তব্য। শঙ্কর তাঁহার গীতাভাষ্যে বলেন :—

"সহজং সহজন্মনৈবোৎপন্নং সহজং কিং তৎ কর্ম্ম কৌন্তেয় ? সদোষমপি ত্রিগুণত্বান্ন ত্যজেৎ সর্ব্বারম্ভা আরভ্যন্ত ইত্যারম্ভাঃ সর্ব্বকর্ম্মাণীত্যেতৎ প্রকরণাৎ যঃ কশ্চিদারম্ভঃ স্বধর্ম্মঃ পরধর্ম্মশ্চ তে সর্ব্বে সদোষাঃ হি যস্মাত্ত্রিগুণাত্মকত্ব মত্র হেতুঃ।"

কর্ত্তব্যসাধন রূপ মহাব্রত হইতে পরাঙমুখ হওয়া অন্যায়। কিন্তু কর্ত্তব্য বলিতে জাতিধর্ম্ম বুঝিব অথবা বুদ্ধি এবং চরিত্রবলে জাতি নির্ব্বিশেষে যে ব্যক্তি যে কার্য্যের উপযুক্ত তাহা বুঝিব, এ সম্বন্ধে আজকাল অনেক মতভেদ দৃষ্ট হয়। গীতাকার অনেক গভীর দার্শনিক এবং নৈতিক মত অতি পরিষ্কার ভাবে বুঝাইয়াছেন। সে সমস্ত মত এবং উপদেশ আমরা সাদরে গ্রহণ করি। কিন্তু তিনি যখন মনুর অনুসরণ করিয়া পৌরাণিক জাতিভেদ প্রথা দৃঢ়ীভূত করিতে চান, তখন অনেকেই তাঁহার মত গ্রহণ করিতে অসম্মত হইবেন। মনুর ন্যায় তিনিও প্রমাণ করিতে চান, যে জাতিভেদ ঈশ্বরাদেশরূপ ভিত্তির উপর স্থাপিত। কৃষ্ণ বলেন :—

চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।

তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্ত্তারমব্যয়ং॥ ৪।১৩

আমি গুণ ও কর্ম্মের বিভাগ অনুসারে চারি জাতির সৃষ্টি করিয়াছি; পরন্তু এই জাতি-বিভাগের কর্ত্তা হইলেও আমাকে অকর্ত্তা ও অব্যয় বলিয়া অবগত হইও।

অষ্টাদশ অধ্যায়ে আছে :—

পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজং। ১৮।৪১।

শঙ্কর তাঁহার ভাষ্যে বলেন, "সত্ত্বপ্রধানস্য ব্রাহ্মণস্য শমো দমস্তপ ইত্যাদীনি কর্ম্মাণি সত্ত্বোপসর্জনরজঃপ্রধানস্য ক্ষত্রিয়স্য শৌর্য্যতেজপ্রভৃতীনি কর্ম্মানি তমউপসর্জন রজঃ প্রধানস্য বৈশ্যস্য কৃষ্যাদীনি কর্ম্মানি রজউপসর্জনতমঃ প্রধানস্য শূদ্রস্য শুশ্রূষৈব কর্ম্ম।

গীতা যদিও শ্রুতি নয়, স্মৃতি, তথাপি প্রাচীনকাল হইতে ইহা প্রামাণিক ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। হিন্দু সমাজে ইহার বিস্তর প্রভাব। কিন্তু আজকাল দেখিতেছি অনেকেই স্বদেশের উন্নতি কামনা করিয়া থাকেন এবং ভারতে জাতীয় একত্ব স্থাপন করিতে চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু গীতোক্ত জাতিভেদ রূপ ভিত্তির উপর যদি আমরা কর্ম্মযোগ স্থাপন করি তবে জাতীয় উন্নতি আকাশ-কুসুমের ন্যায় অসম্ভব হইবে। অনেকেই আজকাল গীতা পাঠ করিয়া থাকেন এবং গীতার ভূরি ভূরি প্রশংসা করেন। গীতাতে যে প্রশংসনীয় জিনিস অনেক আছে তাহা সকলেই স্বীকার করেন, কিন্তু এমন অনেক কথাও আছে যাহা আমাদের জাতীয় উন্নতির পরিপন্থি। কর্ম্মযোগের সঙ্গে জাতি বিভাগের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে বলিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধে কেবল তাহারই উল্লেখ করিলাম।

প্রসিদ্ধ ইংরাজ পণ্ডিত Monier Williams বলেন:— Remembering the Sacred character attributed to this poem and the veneration in which it has always been held throughout India, we may well understand that such words as these (III. 35, XVIII. 47 48) must have exer-

---

* আবদুল হামিদ্‌ লাহোরীর পারসীক ইতিহাস "পাদিশাহনামা" হইতে প্রবন্ধের ঘটনাগুলি পাওয়া গিয়াছে।

ted a powerful influence for the last 1800 years, tending, as they must have done, to rivet the fetters of caste institutions which for several centuries preceding the Christian era, notwithstanding the efforts of the great liberator Buddha, increased year by year their hold upon the various classes of Hindu Society, impeding mutual intercourse, preventing healthy interchange of ideas, and making national union almost impossible.

অর্থাৎ ভগবদ্গীতা পবিত্র ধর্মশাস্ত্র বলিয়া ভারতের সর্ব্বত্র অতিশয় আদৃত, একথা মনে রাখিলেই আমরা বুঝিতে পারিব, যে গত ১৮০০ বৎসর যাবৎ এই সকল উপদেশ সমাজে প্রবল প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। বুদ্ধদেবের প্রতিকূল চেষ্টা সত্ত্বেও খ্রীষ্টের পূর্ব্বে কয়েক শতাব্দী পর্য্যন্ত গীতার প্রভাবে জাতিভেদ প্রতি বৎসর পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল হইয়াছিল। এই জাতিভেদের দরুণ হিন্দু সমাজের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর লোকদের পরস্পরের মধ্যে ঘনিষ্ঠত ও ভাব বিনিময় এবং জাতীয় একতা প্রায় অসম্ভব হইয়াছিল।

স্বধর্ম্ম অর্থাৎ duties of caste কর্ম্মযোগের প্রধান অঙ্গ। গীতাতে জাতিভেদ বজায় রাখিবার জন্য স্বধর্ম্মের গুণকীর্ত্তন করা হইয়াছে বলিয়া আমরা এতৎ সম্বন্ধে এত কথা বলিলাম। প্রত্যেক স্বদেশপ্রেমিক দেখিতে পাইবেন, যে এই মত অনুসারে চলিলে জাতীয় সম্মিলন অসম্ভব। যখন গীতা লিখিত হয়, তখন ভারতে হিন্দুই একমাত্র জাতি ছিল। হিন্দুদের মধ্যেই জাতিভেদের দরুণ অনেক দুর্ব্বলতা দেখা দিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে মুসলমানগণও ভারত-সন্তান। হিন্দুগণ যদি জাতিভেদ বহাল রাখিতে চাহেন তবে ভারত মাতার সকল সন্তানের মধ্যে একতা কখনও স্থাপিত হইবে না।

যজ্ঞ, দান এবং তপশ্চরণও কর্ম্মযোগের অঙ্গ। ফলাকাঙ্ক্ষা-বিরহিত ব্যক্তিরা একাগ্র চিত্তে কেবল কর্ত্তব্য জ্ঞানে যে অবশ্য কর্ত্তব্য যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, তাহাই সাত্ত্বিক (১৭।১১)। যজ্ঞ, দান ও তপ কখনই পরিত্যজ্য নহে; এই সকলের অনুষ্ঠান অবশ্য কর্ত্তব্য। এই কয়েকটী কর্ম্ম বিবেকিগণের চিত্তশুদ্ধির হেতুভূত (১৮।৫)।

শ্রীরাজকুমারী দাস।

ঐতিহাসিক-বীরবালা।

জওহর বাই।

(মিবারের প্রসিদ্ধ রাণা সঙ্গের পুত্র বিক্রমজিতের রাজত্ব কালে গুর্জ্জর-রাজ বাহাদুর শাহ চিতোর আক্রমণ করেন। তিনি বারুদের সাহায্যে চিতোর গড়ের প্রাচীরের কিয়দংশ ভাঙ্গিয়া ফেলেন। সেই সময়ে রাজমহিষী জওহর বাই চিতোর রক্ষার্থ যেরূপ বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহাই নিম্নে বর্ণিত হইল। বিস্তারিত জানিতে হইলে টডের রাজস্থানে মিবারের ইতিবৃত্ত দ্রষ্টব্য।)

"দে' দাসী দে' দাসী দে' দাসী সাজায়ে
এ দৃশ্য কভু দেখা কি যায়?
চিতোরের গড়ে পশে মোশ লেম্
ক্ষাত্র গর্ব্ব দলিয়া পায়!
দূরে যাক এই কণ্ঠের হার
কুন্তল-শোভা হীরার ফুল,
কণক কেয়ূর কর-কঙ্কণ
কাণের গর্ব্ব মাণিক দুল।
দে' পরায়ে মোর সর্ব্ব অঙ্গে
লৌহ-বর্ম্ম বীরের বাস,
দে' আনি' ধরিব শাণিত কৃপাণ
শত্রু বক্ষে জাগায়ে ত্রাস।
রাণী বটে আমি সারাটা জীবন
কেটেছে কেবল বিলাস ভরে,
অঙ্গ করেছি কুসুম কোমল,
পাতিয়া শয়ন কুসুম 'পরে।
তা' ব'লে কি তুই ভেবেছিস মোর
বাহুতে নাহিক কিছুই বল,
শত্রুর শির পাড়ার শক্তি
ধরে না কি মোর হৃদয়-তল!
ভুলিলি ভুলিলি ভুলিলি কি তোরা
মোরা রাজপুত ললনা সবে,
বীরের রক্ত আছে কিছু হৃদে
বীরের বংশে জনম যবে

নগ-নন্দিনী শীত স্রোতস্বিনী
তরল কোমল অঙ্গ তার,
মৃদু কলতানে হয়ে লয় প্রাণে
ঘুচায় বুকের ব্যথার ভার।

সেও যদি তার স্বাধীনতা পথে
বাধা পায় কভু একটুখানি,
শত ফণা তুলি পড়ে অরি-শিরে
গর্জ্জিয়া যেন দলিত ফণী।

সে যে বীর-সুতা, জানে না কি গিরি
ছুইতে স্বর্গ দর্প ভরে,
অক্লেশে সহে ইন্দ্র-বজ্র
কত অগণন শিরের 'পরে!

লুকান বীর্য্য আছিল বক্ষে
ফুটিয়াছে তাহা আঘাত পেয়ে,
রাখিব রাখিব চিতোরের মান
নারীর তুচ্ছ জীবন দিয়ে।

দেরী ত সহে না দে' আঁটি, ত্বরিতে
বর্ম্ম চর্ম্ম অঙ্গে মোর,
দর্পে উঠিছে শত্রু গর্জ্জি
বাড়িছে যেন রে তা'দের জোর।

প্রোথিত চূর্ণ প্রাচীরের তলে
হারায় হাজার যোদ্ধাগণ,
দুর্জ্জয় বীর দুর্গাও ওই
রাখিতে রন্ধ্র দিল জীবন।

দেখুক সবাই অবলার বাহু
কি কাজ এবার সাধিতে পারে।"

বলিতে বলিতে পরিয়া বর্ম্ম
শাণিত খড়্গ লইয়া করে,
রাজার মহিষী জওহর বাই
ছুটিল উঠিয়া অশ্ব পিঠে,
যেথায় ভগ্ন প্রাচীরের পথে
অযুত অরাতি আসিছে ছুটে।

"দাঁড়া দাঁড়া তোরা বাড়িসনে আর
শমন তোদের এসেছে কাছে,
কুক্ষণে তোরা পশিলি আসিয়া
আজিকে চিতোর গড়ের মাঝে।

শির লয়ে কেউ ফিরিবি না আজি
ফাঁকি দিয়ে এই খড়্গে ওরে ;
সিংহিনী বুকে শাবক লইয়া
নিদ্রিত ছিল নিজের ঘরে,

শাণিত শায়কে বিঁধিয়া তাহায়
জাগালি তাহারে মূর্খ যবে,
তীক্ষ্ণ নখরে প্রাণ দিয়ে তার
এবে প্রতিফল সহ রে তবে।"

এত বলি বালা ছুটিয়া পড়িল
দর্পে শত্রু সেনার মাঝে,
বজ্র যেমন নামে মেঘ হ'তে
দমিতে ক্ষুব্ধ সিন্ধু তেজে।

জ্বলিছে চিকণ অয়স-কিরীট
দীপ্ত অরুণ কিরণ জালে,
হস্তে চমকে নগ্ন কৃপাণ
অরাতি দলের নয়ন ঝলে।

বিস্মিত হয়ে দেখে সবে চেয়ে
বীর-ললনার বীর্য্য বিভা ;
নিমিষে শতেক শত্রুর শির
চুমিছে ধরণী ত্যজিয়া গ্রীবা।

দনুজদলনী ঈশানীর মত
বীর-অঙ্গনা শত্রু দলে'
সমরাঙ্গনে নরের শোণিত
নদী সম যেন বহিয়া চলে।

ঝন্ ঝন্ বাজি পড়ে অসি আসি
চারি দিক হ'তে বর্ম্ম 'পরে।
আঘাতে আঘাতে ছুটিছে অগ্নি
কঠিন লৌহ টুটে বা ওরে।

টুটিল টুটিল সত্যই শেষে
টুটিল বর্ম্ম, পড়িল খসি,
নারীর কোমল অঙ্গের শোভা
কুসুমের মত ফুটিল হাসি।

করকা যেন কঠিন প্রহারে
ছেঁড়ে প্রসূনের পাপ্‌ড়ি গুলি,
তেমতি দেখিতে দেখিতে শত্রু
নির্দ্দয় হৃদে রোষেতে জ্বলি,
বীর-ললনার কোমল অঙ্গ
একে একে একে অসির ঘায়,
ছিন্ন ভিন্ন করে দিল সবে,
শোণিতের ধারা বহিয়া যায়।
ভ্রূক্ষেপ নাই তবু বীর বাই
ঘুরায় গর্ব্বে খড়্গ তাঁর,
"দিনু দিনু প্রাণ চিতোরের তরে
বল বল তাতে কি ক্ষতি আর।
চিতোর! চিতোর! প্রাণের চিতোর
তবুও রাখিতে নারিনু তো'রে,
মোশলেম্ বুঝি চির তরে হায়
স্বাধীনতা তোর লইল হরে।"
বলিতে বলিতে বীর-ললনার
নয়নে ঝরিল অশ্রুজল
অবশ হস্ত, পড়ে অসি খসি,
চুমে নিজে শেষে ধরণী-তল।
গেল নিবে গেল উজ্জ্বল জ্যোতিঃ
আকাশে উল্কা আলোক প্রায়,
ক্ষণিক দীপিয়া মলিন করিয়া
স্থির উজ্জ্বল কোটী তারায়।
শুধু একবার যেন শোনা গেল
অরাতির জয়-নাদের মাঝে,
মিশে যায় কার কাতর কণ্ঠ
"প্রাণের চিতোর—নারিনু রে যে!"

শ্রীতারাপ্রসন্ন ঘোষ।

চিত্রের কথা।

মাতা ও পুত্র—সন্তানের কল্যাণের জন্য মাতার হৃদয় কি প্রকার ব্যাকুল থাকে সংসারে সকলেই তাহা প্রত্যক্ষ করিতেছেন। গৃহে গৃহে, পরিবারে পরিবারে প্রতি মাতৃ-হৃদয় প্রতিদিন তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। কিন্তু মাতার জীবনের অবস্থা ভেদে, আদর্শ ভেদে এই ব্যাকুলতারও পার্থক্য আছে। সন্তান সুখে থাকুক, প্রত্যেক জননীই এই আকাঙ্ক্ষা করেন, কিন্তু এই সুখের আদর্শ সকল জননীর হৃদয়ে সমান নহে। কেহ ইচ্ছা করেন, সন্তান ধনী হউক, কেহ আকাঙ্ক্ষা করেন, সন্তান বিদ্বান হউক, কেহ চাহেন, সন্তান ধার্ম্মিক হউক। খৃষ্টান জগতের সাধ্বী মণিকা দেবী প্রত্যেক জননীর সম্মুখে সন্তানের প্রতি কর্ত্তব্যের যে আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন তাহা বাস্তবিকই অতি উচ্চ। ইতিপূর্ব্বে "মণিকার প্রার্থনা" নামক চিত্র উপলক্ষে মণিকা ও তৎপুত্র অগষ্টিন সম্বন্ধে "ভারত-মহিলায়" কিছু লিখিত হইয়াছে। অদ্য আমরা উভয়ের আর একটী চিত্র প্রকাশ করিতেছি। মণিকার পুত্র অগষ্টিন প্রতিভাশালী যুবক, তাঁহার পাণ্ডিত্যের খ্যাতি চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়াছে, কিন্তু তিনি দুশ্চরিত্র। সংসারে অনেক জননী সন্তানের এই সকল দোষে তত ব্যথিত হন না, তাঁহারা সন্তানের যশ প্রতিপত্তিতেই সুখী। কিন্তু মণিকা দেবী অত্যন্ত ভক্তিমতী ঈশ্বরপরায়ণা নারী ছিলেন। সংসারের সুখকে, সংসারের ধন, মান, যশকে তিনি গ্রাহ্যই করিতেন না। তিনি চাহিতেন, পুত্র ধার্ম্মিক হউক। কিন্তু পুত্র তাঁহার আকুল ক্রন্দন ও কাতর অনুনয় উপেক্ষা করিয়া দুষ্ক্রিয়াতে সর্ব্বদাই আসক্ত থাকিত। দুঃখিনী মণিকা অনাথশরণ ভগবানের নিকট আপন গভীর মনোবেদনা জ্ঞাপন করিতেন, আর নির্জ্জনে ক্রন্দন করিতেন। ভজনালয়ে উপাসনান্তে আচার্য্যকে অনুরোধ করিতেন, "আমার পুত্রের জন্য প্রার্থনা করুন।" কয়েকদিন প্রার্থনা করিবার পর আচার্য্য বলিলেন, "ভদ্রে, আপনি গৃহে যাউন, যে সন্তানের জন্য এত চক্ষের জল পতিত হয়, সে কি বিপথে থাকিতে পারে?" আচার্য্যের বাক্য সফল হইল, অগষ্টিনের মতি ফিরিল। অবশেষে সকল প্রকার পাপ হইতে নিবৃত্ত হইয়া গভীর অনুতাপে অনুতপ্ত অগষ্টিন ঈশ্বরারাধনায় নিযুক্ত হইলেন। কঠোর সাধনবলে পুণ্যজীবন লাভ করিলেম। পাপী অগষ্টিন খৃষ্টান জগতে পরম পূজনীয় "সাধু অগষ্টিন" আখ্যা প্রাপ্ত হইলেন। কত লোক তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া সাধুজীবন, ধর্ম্মজীবন লাভ করিল। এখনও খৃষ্টান, অ-খৃষ্টান কত লোকে তাঁহার লেখা হইতে

ধর্ম্ম সাধনে কত সাহায্য পাইতেছেন। আশাতীত রূপে মণিকা মাতার প্রার্থনা পূর্ণ হইয়াছে। সন্তানের প্রকৃত কল্যাণের জন্য মা যদি এমন করিয়া ব্যাকুল হইতে পারেন তবে কি তাহা পূর্ণ না হইয়া যায়? বর্ত্তমান চিত্রে নব-জীবন প্রাপ্ত পুত্র ও ধর্ম্মপ্রাণা মাতার মিলনের অবস্থা অঙ্কিত হইয়াছে। উভয়ের দৃষ্টিতে যেন অতীতের কত স্মৃতি ফুটিয়া উঠিয়াছে। ঈশ্বরের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা উভয়ের মুখেই দেদীপ্যমান।

বর্ত্তমান চীন-সম্রাট—ভগবানের আশীর্ব্বাদে এসিয়া মহাদেশের জাগরণের সূত্রপাত হইয়াছে। জাপান নব উষার প্রথম আগমন বার্ত্তা এই নিদ্রিত মহাদেশে প্রথম ঘোষণা করিয়াছে। ভারত, আফগানিস্থান, পারস্য, সর্ব্বত্রই নব জীবনের উন্মেষ দেখা যাইতেছে। সুষুপ্ত, মৃতপ্রায়, বিশালদেহ চীনেরও নিদ্রা ভঙ্গ হইতেছে। পাশ্চাত্য জাতিগণ চীনকে মৃতপ্রায় দেখিয়া চীনদেশটাকে আপনাদের মধ্যে বণ্টন করিয়া লইবার আয়োজন করিয়াছিল। কিন্তু ১৮৯৪ অব্দে চীন-জাপান যুদ্ধে জাপানের পদাঘাতে চীনের নিদ্রা ভাঙ্গিবার সূত্রপাত হয়। এখন চীনে বিদেশীর প্রভাব দিন দিন হ্রাস পাইতেছে, ঘোর রক্ষণশীল চীন জগতের বর্ত্তমান অবস্থা বুঝিয়া আত্ম-সংস্কার-কার্য্যে ব্রতী হইয়াছে। এই উন্নতির প্রধান সহায় বর্ত্তমান চীন সম্রাট।

"মোদের কুটীরখানি"—গত মাসে আমরা মাননীয়া কবি গিরীন্দ্রমোহিনীর অঙ্কিত একখানি প্রাকৃতিক দৃশ্য চিত্র প্রকাশ করিয়াছি। এই মাসে কবির অঙ্কিত ওয়ালটেয়ারের সমুদ্র তীরের একখানি কুটীরের চিত্র প্রকাশিত হইল। ওয়ালটেয়ারে প্রবাসকালে কবি এই গৃহে বাস করিতেন, তাঁহার অনেক কবিতা এই গৃহে রচিত হইয়াছে। গত মাসে প্রকাশিত "ডলফিন্স্ লোজের" ন্যায় এই চিত্রখানিতেও শিল্পীয় সূক্ষ্ম দৃষ্টি ও চিত্রনৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

বিশ্ববিদ্যালয়ে নারী— এবৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ, পরীক্ষায় তিন জন মহিলা উত্তীর্ণা হইয়াছেন। তন্মধ্যে শ্রীমতী বিক্টোরিয়া মুখোপাধ্যায় ইংরাজী সাহিত্যে অনার (অর্থাৎ সম্মানের সহিত) পাশ করিয়াছেন। সাতটী মহিলা এফ, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে কুমারী পুণ্যলতা রায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণা হইয়াছেন। কুড়িটী মহিলা এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়াছেন, তন্মধ্যে সাত জন প্রথম বিভাগে স্থান পাইয়াছেন।

বাঙ্গালীর বীরত্ব—নিঃসম্পর্কিত লোকের জন্য নিঃস্বার্থ ভাবে আপনার জীবন যাঁহারা বিপন্ন করিতে পারেন তাঁহারা প্রকৃতই বীর। সংসারে এরূপ বীর-আত্মা নর নারী সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। সে দিন কলিকাতা ভবানীপুরে এইরূপ এক জন বীরপুরুষ দুই জন কুলির জীবন রক্ষা করিতে যাইয়া আপনার প্রাণ দিয়াছেন। ইঁহার নাম নফর দাস কুণ্ডু। দুই জন মিউনিসিপালিটীর কুলি ভূগর্ভস্থ নর্দ্দমা পরিষ্কার করিতে করিতে বিষাক্ত বায়ুর প্রভাবে অজ্ঞান হইয়া পড়ে। কোলাহল করিতে করিতে অনেক লোক সেই খানে জড় হয়, কিন্তু বিপন্ন কুলি দুইজনকে উদ্ধার করিতে চেষ্টা করিয়া কেহই আপন জীবন বিপদগ্রস্ত করিতে প্রস্তুত হইল না। নফর বাবু সেই রাস্তা দিয়া যাইতেছিলেন, তিনি ব্যাপার অবগত হইয়া মুহূর্ত্তমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া সেই ভূগর্ভস্থ নর্দ্দমায় প্রবেশ করেন। কিন্তু তিনিও প্রবেশ মাত্রই অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন, আর চেতনা ফিরিয়া আসিল না। অপরিচিত দুই জন কুলির প্রাণরক্ষার চেষ্টায় তিনি আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন। তাঁহার বিধবা পত্নী শিশুগণ সহ এখন অনাথা। নফর বাবুই পরিবারের একমাত্র উপার্জ্জনশীল লোক ছিলেন, তাঁহার আর্থিক অবস্থাও ভাল ছিল না। সুখের বিষয় এই, যে কয়েক জন সহৃদয় বাঙ্গালী ও ইংরাজের চেষ্টায় এই অনাথ পরিবারের জন্য একটী ধন-ভাণ্ডার খোলা হইয়াছে। আমাদের পাঠক পাঠিকাগণের মধ্যে যাঁহারা এই পরিবারের সাহায্যার্থ কিছু দান করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা "বেঙ্গলী সম্পাদক, ৭০ কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা," অথবা "ষ্টেটস্ম্যান সম্পাদক, ৪নং চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা", এই ঠিকানায় সাহায্য পাঠাইবেন। যিনি যাহা দান করিবেন তাহাই ধন্যবাদের সহিত গৃহীত হইবে।

বোম্বাইয়ে উচ্চ হিন্দু-বালিকাবিদ্যালয়—অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে বোম্বাই নগরে শীঘ্রই একটী

উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু বালিকাবিদ্যালয় স্থাপিত হইবে। একজন স্ত্রীশিক্ষানুরাগী ভদ্রলোক এই বিদ্যালয় স্থাপনের জন্ম চারি লক্ষ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। এ দেশের প্রচলিত বালিকাবিদ্যালয় সমূহে এখন যে শিক্ষা দেওয়া হয় বালকদিগের শিক্ষার সহিত তাহার কোনই পার্থক্য নাই। অনেকে আশা করিতেছেন, প্রচুর অর্থের সাহায্যে বোম্বাইয়ে যে নূতন বালিকাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে জাপান প্রভৃতি দেশের অবলম্বিত প্রণালী অনুসারে তাহাতে বালিকাদিগের উপযোগী বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা হইবে, এবং ইহা এ দেশের বালিকাবিদ্যালয় সমূহের আদর্শস্বরূপ হইবে। এ অঞ্চলের ধনকুবেরগণের হস্ত স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে কবে একটু প্রসারিত হইবে?

জৈন মহিলা-পরিষদ—অল্প দিন হইল গুজরাট আমেদাবাদে জৈন মহিলাদিগের একটী সভা হইয়া গিয়াছে। সাধারণতঃ মাড়োয়ারী প্রভৃতি ব্যবসায়ী জাতিই জৈন ধর্ম্মাবলম্বী। ইহাদের পুরুষদিগের মধ্যেই শিক্ষিত লোকের সংখ্যা অধিক নহে, সুতরাং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে শিক্ষা অতি সামান্ত পরিমাণেই প্রসার লাভ করিয়াছে। কিন্তু ভারতের সকল শ্রেণীর স্ত্রীলোকের মধ্যেই যেন আত্মোন্নতির একটা স্পৃহা জাগিয়া উঠিয়াছে। জৈন মহিলাগণও তাঁহাদের অবস্থার উন্নতির জন্ম ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছেন। সভামণ্ডপে প্রায় পাঁচ হাজার মহিলা উপস্থিত হইয়াছিলেন। শ্রীমতী সম্বর শেঠানী সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সভার আলোচনাতে স্থির হইয়াছে, অল্পবয়স্কা জৈন বালিকাগণকে শারীরিক, মানসিক ও ধর্ম্ম বিষয়ে শিক্ষাদানের জন্ম এবং বয়স্কাগণকে ধর্ম্ম ও শিল্প শিক্ষা দিবার জন্ম বিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে। কুমারী অনুসূয়া সারাভাই স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে অতি চিন্তাপূর্ণ একটী বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন যে, শিক্ষা ব্যতীত এদেশের নারীগণ কিছুতেই তাঁহাদের কর্ত্তব্য সম্পাদনে সমর্থ হইবেন না। প্রস্তাবিত সংকল্প কার্য্যে পরিণত করিবার জন্ম সভাস্থলেই সাত হাজার টাকা সংগৃহীত হইয়াছে।

নারীর উচ্চ পদ—সম্প্রতি এলাহাবাদে কুমারী ওয়েষ্ট স্কুল ইনস্পেক্টরের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। ইনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ, উপাধিধারী এবং গণিতের অতি কঠিন ট্রিপস পরীক্ষায় সম্মানের সহিত (অনার) উত্তীর্ণা হইয়াছেন।

—আমেরিকায় ম্যারীল্যাণ্ড প্রদেশের গবর্ণর মহাশয় শ্রীমতী ডয়সি রিচার্ডসন নাম্নী একজন সুশিক্ষিতা ইতিহাসবিদ মহিলাকে এক অতি দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন। অসংখ্য লেখা হইতে বাছিয়া বাছিয়া তাঁহাকে রাজকীয় ইতিহাস রচনার উপকরণ সংগ্রহ করিতে হইবে। উপযুক্ত পুরুষ-প্রার্থী থাকিতেও এইরূপ ধীরতা ও অভিজ্ঞতাপূর্ণ কার্য্যে গবর্ণর যে ইঁহাকে নিযুক্ত করিয়াছেন ইহা নারীগণের পক্ষে কম শ্লাঘার বিষয় নহে। শিক্ষাপ্রভাবে নারীগণ দিন দিন কত উন্নতি লাভ করিতেছেন, তাঁহাদের কার্য্য-শক্তি কত বৃদ্ধি পাইতেছে, ইহা তাহার একটী প্রমাণ।

—আমেরিকার মেছাচুচেট প্রদেশে কুমারী বেউলা হিল আর একটী গুরু দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে তিনি বিজ্ঞান শাস্ত্রে বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হন। এই পরীক্ষায় তিনি এত অধিক নম্বর পাইয়াছিলেন, যে আর কোন ছাত্র আজ পর্য্যন্ত সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে এই পরীক্ষায় তত নম্বর পায় নাই। পরীক্ষা পাশ করিবার পর বহুদিন তিনি মঙ্গল গ্রহের অবস্থা ও তাহাতে প্রাণী বাস করে কি না, তাহার আলোচনায় নিযুক্ত ছিলেন। সম্প্রতি তিনি সুবিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ অধ্যাপক লাওয়েলের সহকারীর পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

নারীর আবিষ্ক্রিয়া—আকাশে উড়িবার জন্ম বায়ব যন্ত্রের আবিষ্কারের চেষ্টা বহুদিন যাবৎ চলিতেছে। সম্প্রতি নিউইয়র্ক সহরে এই শ্রেণীর বায়ব যন্ত্রের এক প্রদর্শনী হইয়াছিল। কুমারী টড নাম্নী একটী মহিলা তাঁহার আবিষ্কৃত বায়ব যন্ত্র প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ইহার নির্ম্মাণ-কৌশল দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইয়াছিলেন। অভিজ্ঞগণ আশা করেন, কুমারী টড ক্রমে এই যন্ত্রের উন্নতি সাধন করিয়া আকাশচারী যন্ত্র নির্ম্মাণে সফলকাম হইবেন। কুমারী টড শিক্ষিত ও কর্ম্মিষ্ঠা রমণী। ইনি সুবিখ্যাত সেণ্টলুই প্রদর্শনীর মহিলা-বিভাগের প্রেসিডেণ্ট মহোদয়ার সেক্রেটারীর কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং সর্ব্বদাই নানাপ্রকার আবিষ্কার কার্য্যে নিযুক্ত আছেন।

কৃপাভিক্ষা।

The woman's cause is man's; they rise or sink
Together, dwarfed or God-like, bond or free;
If she be small, slight-natured, miserable,
How shall men grow?

Tennyson.

৩য় ভাগ। শ্রাবণ, ১৩১৪। ৪র্থ সংখ্যা।

প্রকৃত পথ।

ভগবানের কৃপায় এদেশে বর্ত্তমান সময়ে জাতীয় জীবন সঞ্চারের যে অভিনব স্পন্দন অনুভূত হইতেছে তাহাতে দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেরই অন্তরে যুগপৎ আনন্দ ও গুরুতর চিন্তার উদ্রেক করিয়াছে। জগতের অতীত ইতিহাসে ভারতবর্ষের অবস্থার সহিত তুলনা করিবার মত দৃষ্টান্ত একটীও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কত দেশ, কত জাতি দীর্ঘ কাল পরাধীন থাকিয়া, হীন দশায় যাপন করিয়া, পুনরায় স্বাধীনতা-সুখ লাভ করিয়াছে, কিন্তু সমগ্র দেশের নরনারীকে একটী মহাজাতি রূপে, একই জন্মভূমির সম সুখদুঃখভাগী সন্তান রূপে পরিণত করিতে, দৃঢ় একতায় দেশবাসীকে সম্বদ্ধ করিতে, এদেশে যত বাধা বর্ত্তমান আর কোন দেশে তাহা ছিল না, এখনও নাই। এত প্রকার বিভিন্ন ভাষা, বিভিন্ন অঞ্চলের লোকদিগের মধ্যে আহার বিহার, চাল চলন, রীতি নীতি ও প্রকৃতিগত এত পার্থক্য, সর্ব্বোপরি এই প্রকার ধর্ম্মশাস্ত্র-বিহিত কঠিন জাতিভেদ আর কোন দেশে দেখা যায় না। অথচ এ সকল বর্ত্তমান থাকিতে দেশের উদ্ধার সুকঠিন ব্যাপার।

এই সকল কথা চিন্তা করিলে মনে হয়, তবে এই দেশের উদ্ধারের উপায় কি? এ দেশ কি চিরকাল অধঃপতিতই থাকিবে? বিধাতার রাজ্যে তাহা কি সম্ভব? কত শক্তিশালী জীবজন্তু প্রকৃতির নিয়মে পৃথিবীপৃষ্ঠ হইতে লোপ পাইয়াছে, কত জাতি চির দিনের জন্য কালগর্ভে মিশিয়া গিয়াছে, ভারতবাসী—ভারতের হিন্দুজাতি তেমনই কি ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে? মহামারী, দুর্ভিক্ষ দেশকে লোকশূন্য করিতেছে, সামাজিক প্রথাসমূহ দেশের লোকসংখ্যা বৃদ্ধির অন্তরায় স্বরূপ হইয়াছে, এ জাতির ধ্বংস কি অসম্ভব ব্যাপার? উদ্ধারের তবে পথ কি?

বাহিরের উৎসাহ, বাহিরের কোলাহল, বাহিরের উত্তেজনা—এসকলের একটা মূল্য আছে। এসকল উপায়ে দেশবাসীর নিদ্রিত চিত্ত জাগ্রত হয়, মোহের ঘোর ভাঙ্গিয়া মানুষকে প্রকৃত কর্ম্মে আহ্বান করে। কিন্তু এই উৎসাহ ও উত্তেজনায় যদি দেশের মুক্তির প্রকৃত উপায় আবিষ্কারে দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ না করে, তবে সেই আন্দোলন সম্যক সুফল প্রসব করিল, এরূপ বলা যাইতে পারে না। এই কষ্টি পাথরে বিচার করিলে বর্ত্তমান স্বদেশী আন্দোলন সম্বন্ধেও বলিতে হয়—এই আন্দোলন আশানুরূপ সুফল প্রসব করে নাই। এই আন্দোলন উপলক্ষে বাঙ্গালী যাহা করিয়াছে কোন কোন বিষয়ে বাস্তবিকই তাহা অত্যন্ত প্রশংসনীয়, কিন্তু তেমনি এই আন্দোলন অনেক বিষয়ে নিরাশাও উৎপন্ন করিয়াছে। বর্ত্তমান আন্দোলনের একটী প্রধান কার্য্য স্বদেশী বস্ত্র-প্রচার, স্বদেশী শিল্পের উন্নতি সাধন। আপনার স্বার্থ সাধনের সঙ্গে দেশের উপকার যখন জড়িত

থাকে তখন তাহা সহজসাধ্য বলিয়াই মনে হয়। প্রকৃতির দুর্ব্বলতা ও চরিত্রের লঘুতা এবং অন্যান্য নানা কারণে দেশের বহু লোক স্বদেশী বস্তু ব্যবহারের সংকল্প গ্রহণ করে নাই, অনেকে গ্রহণ করিয়াও তাহা পালন করিতে পারে নাই; পতিত দেশের পক্ষে ইহা সম্পূর্ণই সম্ভব। কিন্তু দেশে কল কারখানা স্থাপন দ্বারা আপনার স্বার্থ ও দেশের কল্যাণ সাধন করা নিতান্ত কঠিন কাজ নহে। অথচ এই বঙ্গদেশে এই তুমুল আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য একটী মাত্র কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। দেশের শত্রুগণ হাসিতেছে, আর বলিতেছে—বাঙ্গালী বক্তৃতাতেই শুধু পটু, প্রকৃত কার্য্যক্ষেত্রে—যেখানে প্রকৃত জীবনীশক্তি, দৃঢ়তা ও কর্ম্মশীলতার পরিচয় দিতে হয় সেখানে বাঙ্গালীকে দেখিতে পাইবে না। ভিতরের দিকে দৃষ্টি করিলে আমাদিগকে অন্ততঃ মনে মনে স্বীকার করিতে হয়, যে আমরা নিতান্তই অসার।

আমাদের যে এই অসারতা ইহা এক দিনে জন্মে নাই। শত শত বৎসরের পরাধীনতা এবং শত শত বৎসরের সামাজিক অত্যাচার ও স্বার্থপরতা জাতীয় জীবনে এই জড়তা আনয়ন করিয়াছে—আমাদিগকে এই প্রকার অন্তঃসারশূন্য করিয়া ফেলিয়াছে। দুই দিনে ইহার প্রতিকার হইবে না। দু দিনের চেষ্টায় শত বৎসরের আবর্জ্জনা দূর হইবে না। দেশকে জাগ্রত করিতে হইলে, জগতের জীবন্ত জাতি সমূহের সহিত এক ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইতে হইলে—ধীরভাবে চিন্তা করিয়া রোগের প্রকৃত ঔষধ নির্ব্বাচন করিতে হইবে, শান্তভাব ও সহিষ্ণুতার সহিত দীর্ঘকাল সেই ভাবে চলিতে হইবে, সেই সাধনা করিতে হইবে। দুঃখের বিষয় সেই দিকে দৃষ্টি অতি অল্প লোকেই দিতেছেন।

দেশের উদ্ধার করিতে হইলে এখন প্রথম কর্ত্তব্য একদল খাঁটি দেশ-সেবক প্রস্তুত করা। সমগ্র ভারতে এক মাত্র গোখলে মহোদয় সেই চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। নীরবে, শান্ত সমাহিত চিত্তে স্বদেশ-সেবার্থীর যে গভীর রাজনৈতিক সাধনার প্রয়োজন, অন্যান্য নেতৃবর্গ তাহা যেন তেমন উপলব্ধি করিতেছেন না। আমাদের দেশের লোক এখনও দায়িত্ব ও নীতিজ্ঞানহীন বক্তাদের বক্তৃতার উপর প্রচুর পরিমাণে নির্ভর করে।

দ্বিতীয় কর্ত্তব্য—জন-সাধারণের শিক্ষা। দেশের নিম্ন শ্রেণী না জাগিলে দেশের প্রকৃত উন্নতি সম্ভবপর নহে। দেশবাসীকে লইয়াই ত দেশ। দেশের পোনর আনা লোকই অশিক্ষিত, দেশের হিতাহিত চিন্তায় উদাসীন। দেহের অধিকাংশই অবশ হইলে শুধু দুই একটী প্রকৃতিস্থ অঙ্গ দ্বারা যেমন কাজ চলে না, তেমনি সমস্ত লোককে পশ্চাতে ফেলিয়া রাখিয়া মুষ্টিমেয় শিক্ষিত লোকের দ্বারা দেশের কাজ চলিতে পারে না। এই যে পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দু মুসলমানে বিরোধ—শিক্ষার অভাবই কি তাহার কারণ নহে? স্বদেশী আন্দোলন যে দেশের নিম্ন শ্রেণীতে ভাল করিয়া প্রসার লাভ করিতেছে না শিক্ষার অভাবই কি তাহারও প্রধান কারণ নহে? ইংরেজরাজ যে আমাদিগকে এত উপেক্ষা করেন তাহার প্রধান কারণ নিম্ন শ্রেণীর হীন দশা ও মূর্খতা। আমরা যখন ইংরেজকে বলি,—সমগ্র দেশ তোমার অবিচারের প্রতিবাদ করিতেছে,—তখন ইংরেজ মনে মনে হাসে ও বলে,—আমরা জানি, তোমাদের চীৎকার শূন্যগর্ভ, দেশের পোনর আনা লোকেরই তাহাতে যোগ নাই।

এই যে নিম্ন শ্রেণীকে শিক্ষিত করা, ইহা অতি গুরুতর কার্য্য। দীর্ঘকাল ব্যাপী সহিষ্ণু চেষ্টা ব্যতীত এ কার্য্য সম্ভব নহে। ইহার জন্য প্রচুর অর্থের আবশ্যক, অনেক মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন। কিন্তু দেশের নেতাগণ এ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন। বরং গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে সম্প্রতি একটু মনোযোগী হইয়াছেন। সামাজিক অত্যাচারে নিম্ন শ্রেণীকে এতদিন নিষ্পেষিত করিয়া তাহাদিগকে এখন তুলিয়া ধরিতে আমাদের মন সহজে রাজি হয় না। সম্প্রতি শুনিতে পাইলাম, পূর্ব্ববঙ্গের কোন সহরে একটী নমঃশূদ্র জাতীয় লোক উকীল হইয়াছেন, স্থানীয় উকীলগণ তাঁহার সহিত আদালত গৃহে একাসনে বসিতে রাজি নহেন, তাঁহাকে উকীল লাইব্রেরীতে সমান অধিকার দিতেও তাঁহারা নাকি প্রস্তুত নহেন। শুনিয়া মনে হয়—ভগবান্, তুমি এই দেশকেও যদি এত অধঃপতিত না করিবে তবে আর কাহাকে করিবে? আর মনে হয়, ইংরেজ যে এ দেশের লোককে ঘৃণা করে তাহা ত ঠিকই। আমার স্বদেশের একটী শিক্ষিত লোককে যদি আমি নিম্নশ্রেণীর বলিয়া এত ঘৃণা করিতে পারি তবে

বিজেতা, শ্বেতকায়, সবল ইংরেজ, বিজিত, কৃষ্ণকায়, দুর্ব্বল ভারতবাসীকে যে আরো ঘৃণা করে না, কুকুর বিড়ালের মত দেখিলেই দূর্ দূর্ করে না তাহাই আশ্চর্য্য। এ দেশ যদি স্বাধীন হয় তবে উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা নিম্ন শ্রেণীর লোকদিগকে বোধ হয় দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়াও সন্তুষ্ট হইবে না, কুকুর বিড়ালে পরিণত করিতে পারিলে তাহাই করিবে। ভগবান্ কি এ সকল দেখেন না, যে তিনি এমন জাতিকে স্বাধীন করিবেন?

তৃতীয় কর্ত্তব্য—স্ত্রীশিক্ষা। নারী জাতির উন্নতি না হইলে, দেশে স্ত্রী-শিক্ষার বিস্তার না হইলে, দেশের উন্নতি যে অসম্ভব, যুক্তিতর্কের খাতিরে তাহা আজ কাল অনেকেই অন্ততঃ মুখে স্বীকার করিতেছেন। দেশের অর্দ্ধাংশ—জননীজাতি। তাহাদের হাতেই জাতিগঠনের ভার। স্বদেশী আন্দোলনে দেশের নেতাগণ এ সকল কথা পুনঃ পুনঃ স্বীকার করিয়াছেন, নারীদিগকে অনেক উৎসাহবাণী শুনাইয়াছেন, তাঁহাদের সাহায্যও অনেক চাহিয়াছেন। কিন্তু আমরা দেখিতেছি, মুখের কথা ছাড়া দেশবাসী এ বিষয়ে একতিল কাজ করিতে প্রস্তুত নহে। বঙ্গদেশের কোন কোন স্থানে অন্তঃপুরে স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের জন্য "সম্মিলনী" গুলি বেশ কাজ করিতেছিল, স্বদেশী আন্দোলনে এই সম্মিলনীগুলি মারা পড়িয়াছে। জাতীয় প্রণালীতে শিক্ষা দিবার জন্য "জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ" গঠিত হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে স্ত্রী-শিক্ষার নামগন্ধ নাই। যেন এদেশে স্ত্রীজাতির অস্তিত্বই নাই! কি হাস্যাস্পদ ব্যাপার! আমাদের কবিই লিখিয়া গিয়াছেন :—

"না জাগিলে সব ভারত-ললনা,
এ ভারত আর জাগে না জাগে না।"

জিজ্ঞাসা করি, এই প্রকারেই কি ভারত-ললনাকে জাগাইবে? এই প্রকারেই কি দেশ উদ্ধার হইবে? কখনই নয়। ভাই স্বদেশবাসী, বৃথা আশা করিও না। যদি দেশের কল্যাণ চাও, দেশের নিম্নশ্রেণীকে জাগাও, দেশের মাতৃজাতিকে সুমাতা করিতে চেষ্টা কর। এদিকে উদাসীন হইলে আর শত চেষ্টাতেও কিছু করিতে পারিবে না। আসল কাজে মনোযোগী হও, ভগবান প্রসন্ন হইবেন, অন্তরে শক্তিলাভ করিবে, ইংরেজও আমাদিগকে অবহেলা করিতে ভয় পাইবে।

বউ-কথা-কও পাখী।

১

এস এস আরো এস, আকাশের সখা!
দেখা আজি বহুদিন পরে,
সেই যে গিয়েছ চলে, আমি যেন একা
উদাসীন পড়ে আছি ঘরে।

২

যতদিন খগবর, শুনি নাই কাণে
তোমার ও মনোহর গীতি,
নিরালা নি'জন ছিল সমস্ত অবনী,
কি যেন হারায়েছিল স্মৃতি!

৩

কারে যেন খুঁজিবারে যত কাছে যাই,
সে যে চলি যায় তত দূরে,
তপ্ত দীর্ঘশ্বাস সহ উপেক্ষা তাহার
রহে মোর হিয়াখানি পুরে।

৪

মিলনের কত হাসি জাগিত জগতে
আমি শুধু হয়েছিনু পর,
কারে কভু দিতে নিতে পারি নাই কিছু,
কারো সাথে বাঁধি নাই ঘর।

৫

অজ্ঞাতে শ্রবণ-যুগ থাকিত কেবল,
অই দূর নীলিম আকাশে,
কখন আসিবে তুমি অমৃত ছুটায়ে,
পুষ্পরথে মলয় বাতাসে।

৬

সহসা বিকালে আজি শুনিনু শ্রবণে
অই চির পরিচিত গান—
"কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া
আকুল করিল মোর প্রাণ!"

৭

কোন্ জন্মে কোন্ যুগে কে অভিমানিনী
ও হৃদয়ে দিয়েছিল ব্যথা,
প্রেমিক সাধক আজো স্বরগ বীণায়
সাধিতেছ—"বউ কও কথা।"

৮

কিন্নরের কণ্ঠে বহে যে মধুর গীতি
সে অমিয় ছোটে তব তানে,
কত কথা—কারে যেন হয় নাই বলা,
সে অতৃপ্তি মাখা তোর গানে।

৯

প্রবাসী উদাসী যেই সতত একাকী
তুমি তারে আন হে সাধিয়া,
স্নিগ্ধ শান্ত গৃহ-তলে সবাকার সাথে
দাও তার পরাণ গাঁথিয়া।

১০

কতদিন গিয়েছে যে বহুদূরে চলি,
তুমি তারে জাগাও স্মরণে,
কত সোহাগের হাসি কত অভিমান,
উথলয়ে বিশুষ্ক জীবনে।

১১

তুমি সে শ্যামের বাঁশী যমুনার কূলে,
মরতের সুধা সঞ্জীবনী,
বিশ্বের সকল দৈন্য সকল হীনতা,
ঘুচি যায় শুনিলে ও ধ্বনি!

১২

গাও পাখি, গাও সখা, ভরিয়া আকাশ
যাক্ গীতি মন্দাকিনী তীরে,
সেথা যে গিয়েছে চলে—যুগ যুগান্তর,
তোর ডাকে আসে কি সে ফিরে?

শ্রীবীর-কুমার-বধ-রচয়িত্রী।

পুরুষোত্তমের পৌরাণিক ইতিহাস।

পুরুষোত্তমের ধারাবাহিক ইতিহাস নাই। পুরাণে পুরুষোত্তম-ক্ষেত্র ও জগন্নাথ সংক্রান্ত সুদীর্ঘ উপাখ্যান দেখিতে পাওয়া যায়। পুরাণ ও উৎকলের পণ্ডিতবর্গের নিকট হইতে যাহা জানা যায়, তাহার সার সঙ্কলন পূর্ব্বক এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ লিখিত হইল।

আমি ইতঃপূর্ব্বে দুইবার পুরুষোত্তম ক্ষেত্র দর্শন করিয়াছি। তন্মধ্যে বিগত ১৩০৫ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠমাসে যখন প্রথম পুরুষোত্তমে যাই সেই সময় উড়িষ্যায় উপনিবিষ্ট একটি বাঙ্গালী আমাকে বাসুদেব রামানুজ দাসস্বামী নামক রামানুজ সম্প্রদায়স্থ একটী উদাসীনের নিকট লইয়া যান। এই উদাসীন জগন্নাথের মন্দিরের দক্ষিণাংশে পুষ্পকাননের সন্নিহিত "বারভাই হনুমান্" নামক মন্দিরে অবস্থিতি করেন। এই যুবা উদাসীনের ন্যায় প্রকৃত ভগবদ্ভক্ত পুরীধামে একান্ত বিরল। ইঁহার জন্মভূমি অযোধ্যা প্রদেশ। ইনি অষ্টম বর্ষে উপনীত হইবার পরই নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করেন। আর্য্যাবর্ত্ত ও দক্ষিণাপথের প্রায় অধিকাংশ তীর্থক্ষেত্রে ইনি বাস করিয়াছেন। এখন জগন্নাথ মন্দিরে অবস্থিতি করিয়া বেদান্ত ও ভগবদ্গীতার অধ্যাপনা করেন। আমার সহিত যখন প্রথম সাক্ষাৎ হয়, তখন তাঁহার বয়স ৪০ বৎসর, কিন্তু সাধারণে দেখিলে ২৪ বৎসরের অধিক অনুমান করিতে পারিত না। দেহ গৌরবর্ণ ও আকৃতি সুন্দর। শরীরে ব্যাধি কিংবা আলস্যের লেশমাত্র নাই। সর্ব্বদা ভগবৎকথা ভিন্ন অন্য কথা মুখে আনেন না। তাঁহার নিকটে অনেকে অনেক সময় ধর্ম্মোপদেশ গ্রহণের নিমিত্ত আগমন করেন। সমাগত ব্যক্তিরা কোন বৈষয়িক কথা তুলিলেই তিনি সেখান হইতে উঠিয়া গিয়া পুষ্পোদ্যানের মধ্যে অথবা অন্য গৃহে বসিয়া ভগবানের ধ্যানে নিযুক্ত হন।

আমি গিয়া দেখিলাম, ভগবদ্গীতার ১২ শ অধ্যায়—ভক্তিযোগ ব্যাখ্যা করিতেছেন। কয়েকটি বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদী শ্রীবৈষ্ণব উপদেশ গ্রহণে নিযুক্ত। আমাকে দেখিয়াই আসন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। অনেকক্ষণ
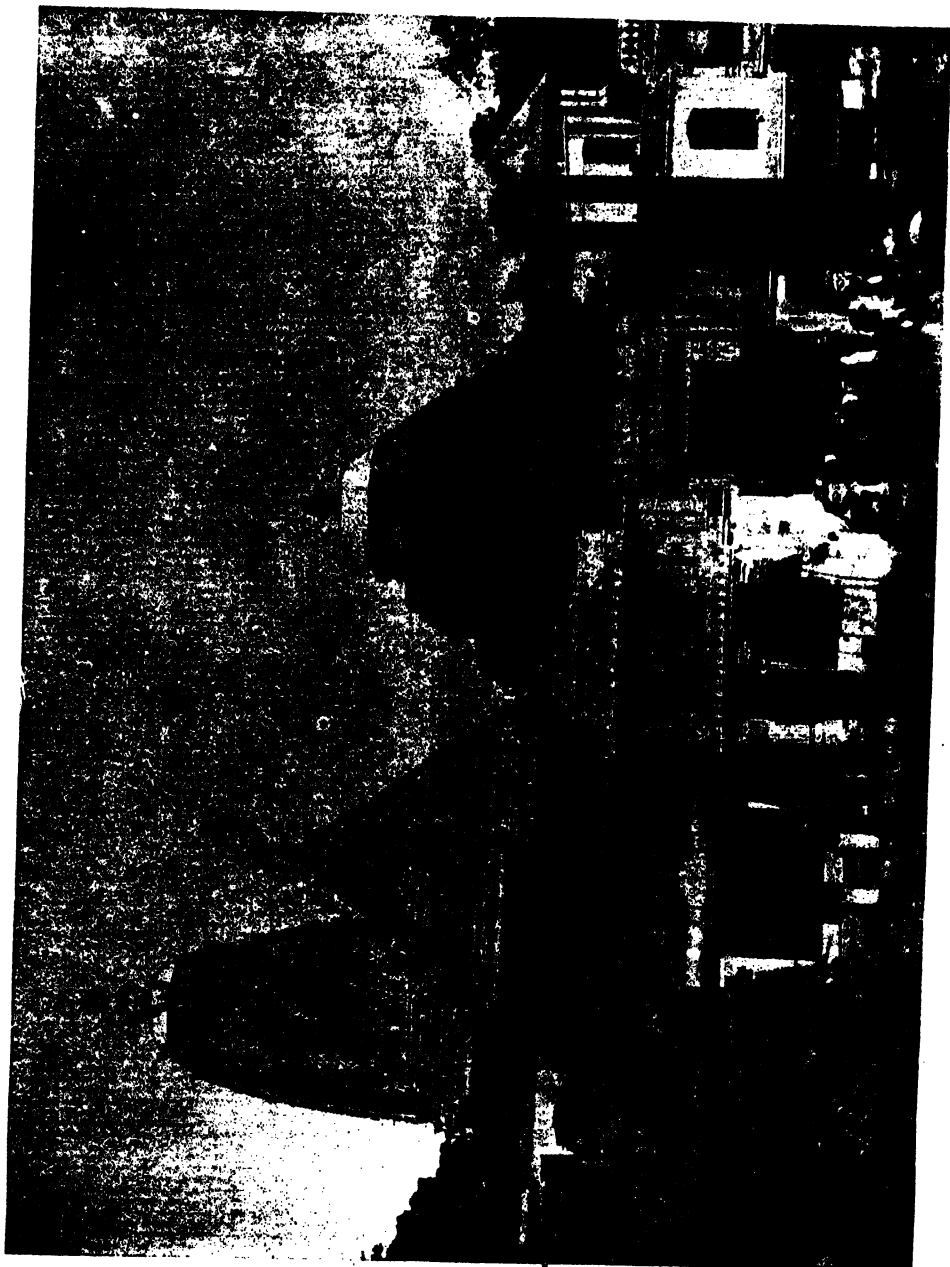
পুরীর জগন্নাথ-মন্দির।

সংস্কৃত ভাষায় ভগবদ্গীতা সংক্রান্ত কথোপকথন হইল। স্বামীজী আমাকে সেখানে একমাস থাকিতে অনুরোধ করিলেন। আমি সাংসারিক বন্ধনের কথা জানাইয়া তখনি বিদায় চাহিলাম। সরল বালকের ন্যায় স্বভাব। তাড়াতাড়ি উঠিয়া গেলেন এবং তৎক্ষণাৎ মোহনভোগ, দুগ্ধের শর ও মিষ্টান্ন থালায় করিয়া আনিয়া উহার কিয়দংশ আমার মুখে তুলিয়া দিলেন এবং হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "মহাপ্রসাদ গ্রহণ করাইতে আমি তোমার অনুমতির অপেক্ষা করিব না।" যাহা হউক, এই সকল ব্যাপারের পর আমি পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের প্রকৃত ইতিবৃত্ত জিজ্ঞাসু হইলাম। স্বামীজী সেই পৌরাণিক যুগের সুদীর্ঘ আখ্যায়িকা বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলেন। আমি উহার কোন কোন অংশ নোটবুকে টুকিতে আরম্ভ করিলে তাড়াতাড়ি একখানি পুস্তক আনিয়া আমাকে উপহার দিলেন। ঐ পুস্তকের নাম "পুরুষোত্তম মাহাত্ম্য"। পুরুষোত্তম মাহাত্ম্য স্কন্দপুরাণের উৎকল খণ্ডের অন্তর্গত পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের ইতিবৃত্ত। প্রথমে ঐ পুস্তকের সাহায্যে যাহা অবগত হওয়া যায় তাহা লিখিত হইতেছে।

সত্যযুগে অবন্তী নগরে ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে এক রাজা রাজ্য করিতেন। তিনি ধার্ম্মিক ও পরম ভাগবত ছিলেন। ইন্দ্রদ্যুম্ন একদিন বিষ্ণুমন্দিরে ভগবানের আরাধনা করিতে গিয়া ব্রাহ্মণদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ—"হে ব্রাহ্মণগণ! আপনারা বলিতে পারেন কি, আমি কোথায় গেলে ভগবান্ জগন্নাথকে সাক্ষাৎ দর্শন করিতে পারি?" একজন তীর্থপর্য্যটক সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলিলেন, "মহারাজ! আমি ভ্রমণকারীদের মুখে শুনিয়াছি, দক্ষিণ সমুদ্রতটে উৎকল প্রদেশে কাননাবৃত নীলাচল মধ্যে পুরুষোত্তমক্ষেত্র বিদ্যমান, ঐ ক্ষেত্র মধ্যে কল্পবট ও উহার পশ্চিমভাগে রৌহিণ কুণ্ড আছে। ঐ কুণ্ডের পূর্ব্বভাগে নীলকান্তমণি-নির্ম্মিত ভগবানের নীলমাধব মূর্ত্তি বিরাজমান। আপনি সেখানে গিয়া ভগবান্‌কে দর্শন করুন।"

রাজা ব্রাহ্মণের কথা সত্য কি না জানিবার জন্য পুরোহিতের ভ্রাতা বিদ্যাধরকে পাঠাইলেন। বিদ্যাধর নানাদেশ অতিক্রম পূর্ব্বক মহানদী পার হইয়া সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইলেন। চতুর্দ্দিকে নিবিড় অরণ্য, কোথায় যাইবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছেন না, এমন সময় নীলগিরির পশ্চাৎ ভাগ হইতে বাদ্যধ্বনি কর্ণগোচর হইল। তিনি শব্দ লক্ষ্য করিয়া যাইতে যাইতে শবর-পল্লীতে উপনীত হইলেন। ঐ সময় বিশ্বাবসু নামক এক বৃদ্ধ শবর ভগবানের পূজা শেষ করিয়া নির্ম্মাল্য, চন্দন ও ভোগাবশেষ লইয়া গৃহে আসিতেছিল। সে বিদ্যাধরের উদ্দেশ্য অবগত হইয়া প্রথম ভগবান্‌কে দেখাইতে চাহিল না, শেষে ব্রহ্মশাপের ভয়ে বিদ্যাধরকে রৌহিণকুণ্ডে লইয়া গেল। বিদ্যাধর ঐ কুণ্ডে স্নান করিয়া ভগবান্ নীলমাধবকে স্তব করিলেন এবং শবরের সহিত তাহার গৃহে আসিয়া তৎপ্রদত্ত ভোগান্ন আহার করিলেন। তাহার পর বিশ্বাবসুর সহিত বন্ধুত্ব করিয়া রাজার জন্য নির্ম্মাল্য গ্রহণ পূর্ব্বক দেশে ফিরিয়া গেলেন।

স্কন্দ পুরাণের উপাখ্যানের এই অংশের সহিত উড়িয়া ভাষায় লিখিত মাগুনিয়া দাস ও শিশুরাম দাসের রচিত ক্ষেত্র-পুরাণের উপাখ্যানের ঐক্য নাই। তবে এটা যেন কেহ মনে না করেন যে, সংস্কৃতে লিখিত স্কন্দপুরাণের উপাখ্যানই প্রামাণিক, দেশভাষায় লিখিত বৃত্তান্ত বিশ্বাসযোগ্য নহে। বস্তুতঃ অন্যান্য বহু স্থলে প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থের কথা অধিক সমাদৃত হইলেও স্কন্দপুরাণ সম্বন্ধে ঐ কথা খাটে না। কারণ স্কন্দপুরাণ বহু বিস্তৃত। অন্যান্য গ্রন্থে প্রক্ষিপ্ততা দোষ থাকিলেও উহার পরিমাণ অধিক নহে, কিন্তু স্কন্দপুরাণে ঐ দোষ নিতান্ত অধিক। এ পর্য্যন্ত সমগ্র স্কন্দপুরাণ মুদ্রিত হয় নাই। ঐ পুরাণের সৃষ্টি হইতে উহাতে অসংখ্য নূতন রচনা প্রবিষ্ট হইয়াছে। এমন কি আধুনিক ঘটনায় পূর্ণ অধ্যায়কে অধ্যায় প্রবেশ লাভ করিয়াছে। এখনও প্রক্ষেপের বিরাম নাই। উৎকলে জগন্নাথের আবির্ভাব সম্বন্ধে পুরাকাল হইতে যে কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে স্কন্দপুরাণের পুরুষোত্তম-মাহাত্ম্য-রচয়িতা, বেঙ্কটাচার্য্য, মাগুনিয়া দাস, শিশুরাম দাস প্রভৃতি সকলেরই সেই কিম্বদন্তী সম্বল। পুরুষোত্তম-মাহাত্ম্য-রচয়িতা কৌশলে এরূপ ভাবে উপাখ্যানটি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে কাহারও গায়ে একটি কাঁটার আঁচড় লাগে নাই। কিন্তু চাতুর্য্যবিহীন উড়িয়া কবি মাগুনিয়া দাস ও শিশুরাম দাস অবিকল কিম্বদন্তীটি লিখিয়া গিয়াছেন। সুতরাং অনেক সত্য কথা বাহির হই-

য়াছে। মাগুনিয়া দাস ও শিশুরাম দাসের লিখিত ঘটনার কোন কোন সাক্ষী অদ্যাপি বিদ্যমান, কিন্তু পুরুষোত্তম-মাহাত্ম্য-রচয়িতার লিপিচাতুর্য্যে ঐ ঘটনা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত।

মাগুনিয়া দাসের বর্ণিত বৃত্তান্ত:—দ্বাপরযুগে মালবদেশে ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে এক রাজা রাজত্ব করিতেন। একদিন দেবর্ষি নারদ তাঁহাকে আসিয়া বলিলেন, "রাজন্, তুমি বিষ্ণুকে লাভ করিবে এবং তজ্জন্য তোমার মহিমা জগতে বিখ্যাত হইবে।" রাজা কৃতাঞ্জলিপুটে দেবর্ষিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেবর্ষে! কোথায় গেলে ভগবানের দর্শন পাইব?" নারদ কহিলেন, "নীলাচলে ভগবান নীলমাধব রূপে বিরাজ করিতেছেন। একজন শবর গুপ্তভাবে তাঁহাকে পূজা করিয়া থাকে। অতএব সেখানে গেলে ভগবানের দর্শন লাভ হইবে।" নারদ চলিয়া গেলে রাজা বিদ্যাপতি নামক এক ব্রাহ্মণকে ভগবানের অনুসন্ধানের নিমিত্ত পাঠাইলেন। বিদ্যাপতি নানাদেশ পর্য্যটন করিয়া দক্ষিণ সমুদ্রের তীরস্থ নীলাচলে উপস্থিত হইলেন। সে সময় ঐস্থলে শবর ব্যতীত অন্য কোন লোকের বাস ছিল না। তিনি বসু নামক এক শবরের গৃহে অতিথি হইলেন। ঐ শবরের ললিতা নামে একটি যুবতী কন্যা ছিল। ঐ কন্যা বিশেষ যত্নপূর্ব্বক বিদ্যাপতির সেবা করিত। বিদ্যাপতি কিছুকাল শবরের গৃহে বাস করিলেন।

বসু শবর একদিন বিদ্যাপতিকে বলিল, "ওহে ব্রাহ্মণ! তুমি আমার এই কন্যা ললিতাকে গ্রহণ কর। আমার বড়ই আদরের কন্যা, আমার নিতান্ত ইচ্ছা, তোমার সহিত ইহার বিবাহ দেই।" বিদ্যাপতি শবরের কথায় সম্মত হইলেন না। উহাতে শবর ক্রোধান্বিত হইয়া বলিল, "আমার পিতা এক বাণে শ্রীকৃষ্ণের প্রাণসংহার করিয়াছিলেন, আর আমি তোমার মত একটা সামান্য ব্রাহ্মণকে বধ করিতে পারিব না!" তখন বিদ্যাপতি ভীত হইয়া শবরের প্রস্তাবে সম্মতি জানাইলেন এবং কিরূপে ঐ শবরের পিতা শ্রীকৃষ্ণের প্রাণ সংহার করিয়াছিল, তাহাও জিজ্ঞাসা করিলেন। যেরূপে শবরের শরাঘাতে শ্রীকৃষ্ণ নিহত হইয়াছিলেন, বসু ঐ বৃত্তান্ত বিদ্যাপতির নিকট বর্ণন করিল এবং বলিল, "তুমি যদি আমার কন্যাকে বিবাহ না কর, তোমারও সেই দশা হইবে।"

অগত্যা বিদ্যাপতি ললিতার পাণিগ্রহণ করিয়া শবরের গৃহে বাস করিতে লাগিলেন। বিদ্যাপতির মনে সুখ নাই, তিনি সর্ব্বদাই চিন্তামগ্ন। ললিতা ঐ ভাব লক্ষ্য করিল। সে একদিন নির্জ্জনে স্বামীকে আদর করিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"নাথ! সত্য করিয়া বল, তুমি সর্ব্বদা কি চিন্তা কর? তোমাকে বিষণ্ণ দেখিলে আমার হৃদয় ফাটিয়া যায়। তোমার পায়ে ধরি, মনের কথা খুলিয়া বল।" বিদ্যাপতি বলিলেন, "ললিতা! তুমি সত্য করিয়া বল, তোমার পিতা শেষরাত্রে কোথায় যান এবং মধ্যাহ্নে তিনি যখন গৃহে ফিরিয়া আসেন, তখন তাহার দেহ হইতে চন্দনের ন্যায় সৌরভই বা বাহির হয় কেন?" ললিতা বলিল, "এই জন্য তোমার চিন্তা? তুমি ত জান না, নীলাচলে নীলমাধব আছেন, আমার বাবা গোপনে গিয়া তাঁহার পূজা করিয়া আসেন। আজ বাবা বাড়ী আসিলে তাঁহাকে অনুরোধ করিব, তুমি নীলমাধবের দর্শন পাইবে।"

বৃদ্ধ শবর বাড়ী আসিলে ললিতা গিয়া তাহাকে ধরিল। শবর কন্যার মুখে ঐ সকল কথা শুনিয়া বিস্মিত হইল এবং কন্যাকে ভর্ৎসনা করিয়া কহিল, "আমি শুনিয়াছি, রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন জগন্নাথের পূজা করিবার জন্য নীলাচলে আসিবেন। বোধ হয় এই ব্রাহ্মণ তাঁহারই চর। উহাকে দেখিতে দিলে নিশ্চয়ই জগন্নাথকে হারাইব।" ললিতা কাঁদিতে লাগিল। কন্যার ক্রন্দনে পিতার মন গলিয়া গেল। অগত্যা শবর বিদ্যাপতির চক্ষু বাঁধিয়া লইয়া গিয়া জগন্নাথ দেখাইতে সম্মত হইল। ললিতা তৎক্ষণাৎ আসিয়া বিদ্যাপতিকে সমস্ত জানাইল। বিদ্যাপতি বলিলেন, "যদি চক্ষু বাঁধিয়া লইয়া যাওয়া হয়, তবে আমার দর্শনে কাজ নাই।" ললিতা বলিল, "নাথ! তার জন্য ভাবনা কি? আমি তোমার পথ চিনিবার উপায় করিয়া দিব। টেঁকে তিল বাঁধিয়া লও, যাইবার সময় পথের দুই পার্শ্বে সেই তিল ছড়াইতে ছড়াইতে যাইবে। গাছ বাহির হইলে তুমি আপনিই পথ চিনিয়া যাইতে পারিবে।"

পরদিন প্রভাতে শবর বিদ্যাপতির চক্ষু বন্ধন করিয়া লইয়া চলিল। বনমধ্যে গিয়া ব্রাহ্মণের চক্ষু খুলিয়া দিল। বিদ্যাপতি বটবৃক্ষ মূলে বহুদিনের বাঞ্ছিত নীলমাধব মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। শবর বিদ্যাপতিকে বটবৃক্ষ মূলে

বসিতে বলিয়া পুষ্প এবং ফল মূল সংগ্রহের নিমিত্ত গেল। ঐ সময়ে বিদ্যাপতি দেখিলেন একটা কাক ঘুমের ঘোরে নিকটস্থ রৌহিণকুণ্ডে পড়িয়া মরিল এবং দেখিতে দেখিতে চতুর্ভুজ এবং শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধারী হইয়া নিকটবর্ত্তী চন্দনবৃক্ষে গিয়া বসিল। উহা দেখিয়া বিদ্যাপতিরও লোভ হইল। তিনি চতুর্ভুজত্ব লাভ ও সংসার হইতে মুক্ত হইবার জন্য রৌহিণকুণ্ডে ঝাঁপ দিবার জন্য উদ্যত হইলেন। তখন সেই চন্দন বৃক্ষস্থ চতুর্ভুজ কাক তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিল, "ওহে ব্রাহ্মণ! তুমি যে কাজে আসিয়াছ, তাহা ভুলিয়া এ কি করিতে যাইতেছ? তোমা হইতে ভগবান্ জগন্নাথ মর্ত্ত্যলোকে প্রকাশিত হইবেন। তুমি তাহাতেই কৃতার্থ হইবে।"

বিদ্যাপতির আর রৌহিণকুণ্ডে ঝাঁপ দেওয়া হইল না। ঐ সময় শবরপতি ফল মূল লইয়া উপস্থিত হইল এবং নীলমাধবের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিয়া বলিল, "মহাপ্রভো! আমার এই সামান্য উপহার গ্রহণ কর।" বৃদ্ধ বারংবার মিনতি করিল, কিন্তু সে দিন ভগবান্ শবরের ফল মূল গ্রহণ করিলেন না। শবর নিতান্ত দুঃখিত হইয়া বলিল, "প্রভো! আমি কি অপরাধ করিয়াছি, কেন আমার ফল মূল গ্রহণ করিতেছেন না?" তখন দৈববাণী হইল, "শবর! তুই ব্রাহ্মণকে কেন এখানে আনিলি? এতদিন তোর কন্দ মূল গ্রহণ করিয়াছি, এখন আর করিব না। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন এদেশে আসিতেছে, আর তোর কাছে থাকিব না। দারুব্রহ্মরূপে প্রকটিত হইয়া নানা উপচারে ভোগ গ্রহণ করিব। সুরাসুর মানব আমার সেই মূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইবে। ব্রহ্মার আয়ুর অর্দ্ধকাল এখানে ছিলাম, অপরার্দ্ধ দারুব্রহ্মরূপে বিরাজ করিব।"

শবর দৈববাণী শুনিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিল। সে বলিতে লাগিল, "হায় হায়! আমার মেয়ে হইতেই সর্ব্বনাশ হইল।" অনেকক্ষণ বিলাপের পর ব্রাহ্মণের চক্ষু বাঁধিয়া লইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিল। বিদ্যাপতির মনস্কামনা সিদ্ধ হইয়াছে। এ দিকে পথে তিল গজাইয়া উঠিল, দুই একদিনের মধ্যেই ব্রাহ্মণ ভাল করিয়া পথ চিনিয়া লইলেন। এখন কিরূপে দেশে যাওয়া যায়, বিদ্যাপতির মনে শুধু এই চিন্তা উপস্থিত হইল। ললিতা একদিন স্বামীকে উদ্বিগ্ন দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "নাথ! আবার তোমার কি দুঃখ উপস্থিত হইল?" বিদ্যাপতি দুঃখিত ভাবে উত্তর করিলেন, "অনেক দিন দেশ ছাড়িয়া আসিয়াছি, আত্মীয় স্বজন কে কেমন রহিল, কিছুই জানি না; তাহাদের দেখিবার জন্য আমার মন বড় আকুল হইয়াছে।" তখন ললিতা কাতর ভাবে কহিল, "হাঁ, এখন জানিলাম, তুমি রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের চর। যাহা হউক পিতাকে বলিয়া তোমায় একবার দেশে পাঠাইয়া দিব, কিন্তু আমার মিনতি, তুমি আমায় ত্যাগ করিও না। তুমি আমার প্রাণসর্ব্বস্ব, তুমি ত্যাগ করিলে আমি জীবন ধারণ করিতে পারিব না। বিদ্যাপতি ললিতার চিবুক ধরিয়া আদর করিয়া বলিলেন, "প্রিয়তমে! তা' কি কখনো হয়, তুমি আমার দ্বিতীয় পক্ষের পত্নী, তোমাকে কি ত্যাগ করিতে পারি?"

তাহার পর, ললিতা আবার পিতাকে গিয়া ধরিল। শবরপতি কন্যার অনুরোধে বিদ্যাপতিকে পথ দেখাইয়া দিল। বিদ্যাপতি আকাশগঙ্গী নামক স্থানে শবরের নিকট হইতে কন্দ মূল ফল লইয়া বিদায় হইলেন। নানা দেশ পর্য্যটন করিয়া কিছু কাল পরে অবন্তী রাজধানীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। * (ক্রমশঃ)

শ্রীশরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী।

কাব্যে লোক-শিক্ষা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(৩)

এদেশে বাঙ্গালা কাব্যের কথা বলিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে মাইকেল মধুসূদন দত্তের নামই উল্লেখ যোগ্য। প্রাচীন কবি চণ্ডীদাস হইতে আরম্ভ করিয়া স্বর্গীয় কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সময়কে আমরা প্রাচীন কাল বলিয়াই নিরূপণ

* এই উপাখ্যানের শেষাংশ সকল গ্রন্থেই প্রায় এক প্রকার। স্কন্দপুরাণের উৎকলখণ্ড, নীলাদ্রিমহোদয় ও ভবিষ্য পুরাণীয় পুরুষোত্তম-মাহাত্ম্য, পুরুষোত্তমপুরাণ, উৎকল ভাষায় লিখিত মাগুণিয়া দাস ও শিশুরাম দাস কৃত ক্ষেত্রপুরাণ, তৈলঙ্গভাষায় লিখিত বেঙ্কটাচার্য্য কৃত জগন্নাথ-মাহাত্ম্য বঙ্গকবি মুকুন্দরাম কৃত জগন্নাথ-মঙ্গল প্রভৃতি গ্রন্থে পরস্পর যৎকিঞ্চিৎ ইতর বিশেষ আছে।

করিতে পারি। তখন পাঠকদিগের যে রকম রুচি ছিল এবং লেখকদিগের লিখিবার যে রকম রীতি ছিল, এখন আর ঠিক্ তেমনটি নাই। এই পরিবর্ত্তন প্রথম বোধ হয় মাইকেল মধুসূদন দত্তের দ্বারাই আরম্ভ হইয়াছিল। যে দিন হইতে মাইকেলের কাব্য প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইল, যে দিন মেঘনাদবধ কাব্যের অভিনব ছন্দের ঝঙ্কারে ও ভাষার বিচিত্র শব্দধ্বনিতে এবং চিত্তোন্মাদকারী বীররস ও করুণরসের উচ্ছ্বাসে বাঙ্গালী পাঠক বিস্মিত, অভিভূত, ও পুলকিত হইয়া উঠিল, সেই দিন হইতেই এই পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইল।

তার পর ত কত কবি কত কবিতাই রচনা করিলেন; সে সকল কবিতার বর্ণনা-চাতুর্য্যে, ভাবের মাধুর্য্যে, কবিত্বের মধুরতায় বাঙ্গালী পাঠক এমন মন্ত্রমুগ্ধ যে, মাইকেলের যশোরশ্মিও এখন ম্লান হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু মেঘনাদবধ পড়িতে পড়িতে বাঙ্গালীর নির্জ্জীব প্রাণে যেমন ভাবের বিদ্যুৎ প্রবাহিত হইত, দুর্ব্বল চিত্ত যেরূপ সবল হইয়া উঠিত, সে রকম কিন্তু আর কোন কাব্য পড়িয়াই হইল না। বাঙ্গালা ভাষায় মেঘনাদবধের ন্যায় কাব্য আর কি কখনো রচিত হইবে না? আর কি কখনো বীররসের বর্ণনা পাঠ করিয়া মনের জড়তা দূর হইবে না?

স্বীকার করি মেঘনাদবধ কাব্যের দোষ ত্রুটি আছে; অনেক জায়গায় কাব্য-কৌশলের অভাব আছে, অনেক স্থলে গ্রন্থকার চরিত্র অঙ্কনে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। কিন্তু তথাপি ভাব-সম্পদে ও ভাষার ঐশ্বর্য্যে এবং মেঘনাদ, প্রমীলা ও সীতা প্রভৃতি উৎকৃষ্ট চিত্রগুলির প্রভাবে এই কাব্যখানি চিরদিন বাঙ্গালী পাঠকের হৃদয় আকৃষ্ট করিবে।

মেঘনাদবধ কাব্যের অধিকাংশ স্থানের বর্ণনাই আমাদের স্মৃতির সঙ্গে জড়িত হইয়া আছে। সুতরাং আমরাও আর সে সকল উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিব না। কেবল দুইটি স্থান হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিব। কারণ এই দুইটি জায়গার বর্ণনা পড়িতে পড়িতে মনে স্বদেশানুরাগ ও মহদ্ভাব জাগ্রত হইয়া উঠে।

প্রথমতঃ রাবণ বীরবাহুর মৃতদেহ দেখিয়া বলিতেছেন :—

"যে শয্যায় আজি তুমি শুয়েছ কুমার
প্রিয়তম, বীরকুল সাধ এ শয়নে
সদা! রিপুদল বলে দলিয়া সমরে
জন্মভূমি-রক্ষা হেতু কে ডরে মরিতে?
যে ডরে, সে ভীরু, সে মূঢ়; শত ধিক্ তারে!"

শেষের দুটি ছত্র আমাদের গৃহে গৃহে স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখা উচিত।

দ্বিতীয়তঃ ইন্দ্রজিতের মৃত্যুতে সীতার বিলাপ। কবি মধুসূদন রাম লক্ষ্মণের প্রতি বড় সদয় নহেন। কিন্তু যেখানেই সীতার কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন, সেইখানেই তাঁহার রচনা সকরুণ ও প্রাণস্পর্শী হইয়া উঠিয়াছে। মেঘনাদবধের নবম সর্গে সীতাদেবী যখন সরমার মুখে ইন্দ্রজিতের মৃত্যু-সংবাদ শুনিলেন, তখন তাঁহার হর্ষোচ্ছ্বাস প্রকাশ করা ত দূরের কথা; কবি বলিতেছেন :—

——"ভবতলে মূর্ত্তিমতী দয়া
সীতারূপে, পরদুঃখে কাতর সতত,
কহিলা—সজল-আঁখি সম্ভাষি সখীরে,—
"কুক্ষণে জনম মম, সরমা রাক্ষসি,
সুখের প্রদীপ সখি, নিবাই লো সদা
প্রবেশি যে গৃহে, হায় অমঙ্গলরূপী
আমি! পোড়া ভাগ্যে এই লিখিলা বিধাতা।
নরোত্তম পতি মম, দেখ বনবাসী।
বনবাসী সুলক্ষণে! দেবর সুমতি
লক্ষ্মণ! ত্যজিলা প্রাণ পুত্রশোকে সখি,
শ্বশুর। অযোধ্যাপুরী আঁধার লো এবে,
শূন্য রাজ সিংহাসন! মরিলা জটায়ু,
* * *
রক্ষিতে দাসীর মান! হাদে দেখ হেথা,
মরিল বাসবজিৎ অভাগীর দোষে।"

ইহার প্রত্যেকটি কথা যেমন জানকীর মর্ম্মবিগলিত অশ্রুধারায় সিক্ত, তেমনই মহত্ত্বের স্বর্ণরশ্মিতে অনুরঞ্জিত। ইহা পড়িতে পড়িতে একদিকে যেমন নয়ন-জলে ভাসিয়া যাইতে হয়, অন্যদিকে সীতাদেবীর হৃদয়-মাহাত্ম্যে মন তেমনি উন্নত হয়। কবির এই কয়েকটি কথার ভিতর দিয়া সীতাকে আমরা ঠিক্ সীতা বলিয়া বুঝিয়া লইতে পারি;—সীতার

মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

কোমল হৃদয়ে কত যে ব্যথা, এবং সেই ব্যথাভরা হৃদয়ের করুণা ও সহানুভূতি যে কি বিচিত্র, তাহা আমরা অনুভব করিতে পারি।

মাইকেল মধুসূদনের ব্রজাঙ্গনা-কাব্যখানি সুমধুর কবিতাবলীতে পরিপূর্ণ। উহার ছন্দ ও ভাষার মাধুর্য্যে মন সুধারসে পূর্ণ হইয়া উঠে। তা ছাড়া অন্যান্য কবিতা-বলীর মধ্যে এমন কয়েকটি কবিতা আছে, যাহা শিক্ষাপ্রদ এবং প্রাণস্পর্শী। যেমন "আত্মবিলাপ" কবিতাটি। উহার—

"আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায়,
তাই ভাবি মনে,
জীবন প্রবাহ বহি কালসিন্ধু পানে ধায়
ফিরাব কেমনে।"

ইত্যাদি কবিতা পড়িয়া, ক্ষণকালের জন্য মনে কেমন একটি বৈরাগ্যের ভাব জাগিয়া উঠে। তা ছাড়া "বঙ্গভূমির প্রতি" কবিতাটির—

"জন্মিলে মরিতে হবে অমর কে কোথা কবে ?
চির স্থির কবে নীর হায়রে জীবন-নদে।"

এবং "পরলোক" শীর্ষক কবিতাটির—

"হে ধর্ম্ম, কি লোভে তবে তোমারে বিস্মরি'
চলে পাপ-পথে নর, ভুলি পাপ-ছলে ?
সংসার-সাগর-মাঝে তব স্বর্ণতরী
তেয়াগি, কি লোভে ডুবে বাতময় জলে ?
দুদিন বাঁচিতে চাহে চিরদিন মরি ?"

পড়িতে পড়িতে আত্মচিন্তা জাগ্রত হয়, জীবনের দিকে দৃষ্টি পড়ে। (ক্রমশঃ)

শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত।

আমন্ত্রিত।

হে দেবি, আবার কেন এ প্রভাতে
আমারেও আজি ডেকেছ,
তোমার সভার একটি প্রান্তে
আমারও স্থান রেখেছ!
তুমি জান মোর সকল বারতা,
পদে পদে ভুল, দীনতা হীনতা,
নিষ্ঠাবিহীন ব্যর্থ সাধনা
সকলি ত তুমি দেখেছ ?
হে দেবি তবুও কেন এ প্রভাতে
আমারেও আজি ডেকেছ।

রুদ্ধ দুয়ার, ঘরে আসি আলো
পড়ে নাই মোর শয়নে,
তাই এত বেলা ছিলাম নিরত
স্বপনের জাল বয়নে।
আহ্বান তব জাগায়ে আমারে,
এনেছে মুক্ত বিশ্ব মাঝারে,
নব রবিকরে রঞ্জিত ধরা
বিকাশিত আজি নয়নে।
রুদ্ধ দুয়ার ঘরে আসি আলো
পড়ে নাই মোর শয়নে।

তোমার পতাকা উদার আকাশে
উড়িছে শান্ত পবনে।
বলে' দাও দেবি, কোন্ কাজ মোর
রয়েছে তোমার ভুবনে!
কোন্ ফুলে তব সাজাইব ডালা,
তোমার চরণে দিব কোন্ মালা;
কোন্ ব্রতে আজি সঁপিয়া পরাণ
ধন্য করিব জীবনে।
তোমার পতাকা উদার আকাশে
উড়িছে শান্ত পবনে।

অযুত ভক্ত গায়িছে তোমার
বন্দনা-গীতি হরষে।
কত না বীণার মিলিত রাগিণী
নিখিলে অমিয় বরষে।
আমি এ সভায় কি গায়িব গান;
এ নীরব বীণা ধূলিলীন, ম্লান,

আপনি বাজিয়া উঠিবে কি আজি
তোমার করুণ পরশে!
অযুত ভক্ত গায়িছে তোমার
বন্দনা-গীতি হরষে।

শ্রীরমণীমোহন ঘোষ।

সন্তান।

মানবজাতি অত্যন্ত সন্তানপ্রিয়। পুত্রকন্যা লাভ করিতে ইচ্ছা করেন না, এমন সংসারী সচরাচর বড় দেখা যায় না। সাধারণতঃ বিবাহিত দম্পতির প্রধান আকাঙ্ক্ষা পুত্রকন্যার মুখদর্শন করা। মানবেতর জীব সন্তান লাভের জন্য এত ব্যাকুল কি না তাহা ঠিক জানা যায় নাই, তবে সন্তান থাকিলে তাহারাও যে পুত্রকন্যার মুখদর্শন জনিত আনন্দের আস্বাদ অনুভব করিতে পারে এ কথা সকলেই জানেন।

পুত্রকন্যার মুখদর্শন যেমন সুখকর তাহাদিগকে ভাল হইতে দেখাও তেমনি আনন্দদায়ক। এমন পিতা মাতা প্রায়ই দেখা যায় না যাঁরা সন্তানগুলিকে ভাল দেখিতে ইচ্ছা করেন না। পিতামাতা পুত্রকন্যাকে যেমন ভাল বাসেন তাহাদের উন্নতি দেখিতেও স্বভাবতঃই তেমনি ইচ্ছা করেন।

আমাদের দেশের পিতামাতারাও অপরাপর দেশের পিতামাতাদের মত সন্তানের উন্নতি দেখিতে আকাঙ্ক্ষা করেন বটে, কিন্তু তাঁহারা পুত্রকন্যাকে উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে অল্পই সাহায্য করেন। অবশ্য সকল পিতামাতাই এ দোষে দোষী নহেন, কিন্তু এদেশে পিতামাতাকে সন্তানের প্রকৃত ভবিষ্যৎ উন্নতি সম্বন্ধে প্রায়ই উদাসীন থাকিতে দেখা যায়।

পুত্রকন্যা জন্মগ্রহণ করিলেই—সন্তানের মুখদর্শন লাভেই—স্বর্গ হাতে পাওয়া গেল এরূপ মনে করা নিতান্ত ভুল। সন্তানের দ্বারা সুখী হইতে হইলে প্রথমতঃ তাহাদের চরিত্রের উন্নতি সাধনে মনোযোগী হইতে হইবে। তার পর বিদ্যাশিক্ষা দ্বারা তাহাদের মানসিক উন্নতি সাধন প্রয়োজন। অবশেষে তাহাদিগকে সৎপথে প্রতিষ্ঠিত দেখিলে তবে পিতামাতা সন্তান-লাভ-জনিত প্রকৃত আনন্দ ভোগের অধিকারী হইতে পারেন।

সন্তানের পিতা কিংবা মাতা হইয়া শুধু ছেলেটীকে বুকে করিয়া কৃতার্থ হইলাম, এরূপ মনে করা কর্ত্তব্য নহে। সে ছেলে কি হইবে কে জানে? তবে এ কথা ঠিক যে পিতামাতা তাহাকে যাহা করিবেন, সে তাহাই হইবে। আমরা যে একই পিতামাতার দুই তিন প্রকার মানসিক বৃত্তিসম্পন্ন সন্তান দেখিতে পাই তাহার কারণ আর কিছুই নহে, হয় তাহাদের পিতামাতা কাহারও মানসিক উন্নতিকল্পে মনঃসংযোগ করেন নাই, অযত্নে রোপিত পুষ্পবৃক্ষের মধ্যে কতকগুলি যেমন মাটীর গুণে সুন্দর পুষ্প দান করে ও আর কতকগুলি অযত্নে পুষ্পাধম প্রসব করে, সেইরূপ পিতামাতার যত্নাভাবে সন্তানদিগের কোনটীর মানসিক বৃত্তি সকল সম্পূর্ণ ভাবে, কোনটীর বা বিকৃত ভাবে স্ফূর্ত্তি পাইয়াছে; না হয় পিতামাতা যেমন করিয়া গঠন করিয়াছেন সন্তানেরা তেমনি চরিত্র প্রাপ্ত হইয়াছে।

সন্তানের পিতামাতা হওয়া যে কত দায়িত্বপূর্ণ তাহা অনেক পিতা মাতাই জানেন না। পুত্র কন্যারা নিরীহ, নিরপরাধ হইয়া জন্মগ্রহণ করে। তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবনের সুখ পিতামাতার উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে। পিতামাতা সন্তান সম্বন্ধে দায়িত্বজ্ঞানশূন্য হইলে, অধিকাংশ স্থলে সন্তানের ভবিষ্যৎ জীবন কালিমাময় হইয়া পড়ে, এবং শেষে সেই সকল দায়িত্বজ্ঞানশূন্য পিতামাতাই এ পাপের ফলভোগী হন। পুত্রকন্যাকে ভাল করিয়া গড়িয়া তোলা পিতামাতার অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম। ইহাতে অমনোযোগী হওয়া মহাপাপ।

জন্মগ্রহণ করিবার পর শিশুরা স্বভাবতঃই উচ্ছৃঙ্খল থাকে। তখন তাহারা যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে চায়। উপদেশ, শিক্ষা ও শাসন দ্বারা তাহাদের সেই উচ্ছৃঙ্খলতা দমন করা উচিত। প্রথমতঃ শিক্ষা ও উপদেশদ্বারা সন্তানকে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য; এ দুটীর দ্বারা ভাল ফল না পাইলে অগত্যা অপর উপায় অর্থাৎ শাসনের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। সন্তানকে সৎপথে রাখিবার যতগুলি উপায় আছে তন্মধ্যে শাসন নিকৃষ্টতম, কিন্তু যিনি সন্তান পালন করিয়াছেন তিনিই জানেন, যে সন্তান পালনে

শাসনের প্রয়োগ প্রচুর পরিমাণেই করিতে হয়। সেইজন্য প্রত্যেক পিতামাতার শাসনের ব্যবহার ভাল করিয়া জানা দরকার। কখন শাসন করিতে হইবে ও কখন শিশুকে তাহার নিজের ইচ্ছামত কাজ করিতে দিতে হইবে তাহা বিবেচনা করিবার শক্তি সংগ্রহ করিয়া তবে সন্তান পালনের গুরুভার স্কন্ধে গ্রহণ করা উচিত। শিশুর ২।৩ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তাহাকে শাসন করা বৃথা। কি জন্য শাসিত হইতেছে তাহা যদি শিশু বুঝিতে না পারে তবে শাসনে কোন উপকারই দর্শে না। তাহাতে শুধু মানসিক সদ্‌বৃত্তিগুলি ভোঁতা হইয়া যায়। সে সময় অন্যায় কার্য্য করিতে তাহাদিগকে শুধু বাধা দেওয়াই যথেষ্ট।

সন্তানকে শাসন করিবার পূর্ব্বে তাহাকে বেশ করিয়া বুঝিতে দেওয়া উচিত যে সে কি জন্য দণ্ড পাইতেছে। কোন্ কাজ ভাল, কোন্ কাজ মন্দ সে বিষয়ে প্রথমতঃ শিশুদিগকে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। শাসন করিবার সময় এ কথাটী মনে রাখিতে হইবে যে একাধিকবার আদিষ্ট হইয়াও যদি শিশু কোন কাজ না করে অথবা নিষেধ প্রাপ্ত হইয়াও যদি কোন কাজ করে তবেই তাহাকে শাসন করা উচিত, নতুবা নহে।

ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া শাসন করিতে যাওয়া বড়ই অন্যায়। পুত্রের দোষ হঠাৎ চোখে পড়ায় পিতা ক্রুদ্ধ হইয়া ঘুমন্ত পুত্রকে প্রহার করিয়াছেন এমনও দেখা গিয়াছে। এরূপে পুত্রকন্যার উপর ক্রোধের জ্বালা বর্ষণ করিলে নিশ্চয়ই পাপ হয়। অনেক সময় সামান্য কারণে, এমন কি অকারণেও ক্রোধ উপস্থিত হইতে পারে। সে সময় ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া শাসন করিতে গেলে কারণের সহিত দণ্ডের মাত্রা ঠিক রাখা যায় না।

দোষ নানা শ্রেণীর। একটী দোষে শুধু ধমকানিই যথেষ্ট। আর একটীতে চোখ্‌রাঙ্গানি ও ধমকানি বা কিছুক্ষণের জন্য আদরে বঞ্চিত করাতেই কাজ হয়। অন্য একটীতে হয়তঃ সামান্য কানমলাতেই চলে; আর একটীতে আর এক প্রকার শাসন, ইত্যাদি। কার্য্যে ব্যস্ত থাকার সময় সন্তান কর্ত্তৃক বিরক্ত হইয়া ক্রোধবশতঃ তাহাকে একটা সামান্য ধমকের পরিবর্ত্তে একটা কীল দিলে শিশুর মঙ্গল অপেক্ষা নিজের সুখটাই বেশী দেখা হয়। সেই দোষেরই জন্য হয় ত আর একদিন সে ধমকানিও খায় নাই, আজ হঠাৎ কীল খাইয়া সে কি মনে করিবে?

সন্তানকে শাসন করিবার সময় মনে মনে বিচারকের আসন গ্রহণ করা উচিত এবং তাহার দোষের গুরুত্ব অনুসারে শাসনের মাত্রা ঠিক করা প্রয়োজন। ননীর পুতুলি পেটের ছেলে বলিয়া গুরু শাসন করিতে কুণ্ঠিত হইলে চলিবে না, আবার হঠাৎ ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া অন্যায় পূর্ব্বক গুরু শাসন করিলে তাহাতেও কুফল ফলিবে। এ ক্ষেত্রে যে ছেলের দোষের জন্য ও ভবিষ্যতে তাহাকে সাবধান করিবার জন্য শাসন প্রযুক্ত হইল তাহা নহে, এ শাসন শুধু পিতা কি মাতার নিজের সুবিধার জন্য।

শাসন করিবার সময় মনে রাখা উচিত যে ছেলেরা সকল সময় কার্য্যের দোষ গুণ বিচার করিতে সমর্থ হয় না। তাহারা ইচ্ছা পূর্ব্বক কি না জানিয়া দোষ করিয়া ফেলিয়াছে তাহা ভাল করিয়া দেখা উচিত। কোন বিষয়ে বারম্বার শিক্ষা দেওয়ার পরও যদি সেই বিষয়ে তাহারা দোষী হয়, তবেই শাসন প্রয়োজন। একই কারণে একবার লঘু দণ্ড দেওয়ার পর বারান্তরে গুরুদণ্ড দেওয়া সকল সময় ভাল নয়, কিন্তু একবার গুরুদণ্ড দিয়া বারান্তরে সেই একই দোষের জন্য যেন কখনও লঘু দণ্ড দেওয়া না হয়। দণ্ডের মাত্রা অতি সাবধানতার সহিত ঠিক রাখিতে পারিলে তবে দণ্ডদানে কাজ হইবে। অনেক সময় গুরুতর অন্যায় কাজ করিয়া ফেলিয়া বালকবালিকাকে সবিশেষ অনুতপ্ত দেখিতে পাওয়া যায়। সে ক্ষেত্রে দণ্ডদান না করিয়া তিরস্কার ও উপদেশই যথেষ্ট। এস্থলে বলা বাহুল্য যে গুরুদণ্ডের অর্থ শিশুকে অর্দ্ধমৃত করিয়া ফেলা নহে। বালকবালিকাকে শারীরিক দণ্ড যত কম দেওয়া হয় ততই ভাল।

প্রায়ই ছেলের ঠাকুরমা পিসীমা কি অন্যান্য আত্মীয়গণ ছেলের উপস্থিতিতেই শাসনকর্ত্তাকে নিষেধ ও অনুযোগ করেন। এরূপ করিলে শাসনে সুফল ত হয়ই না, বরং কুফলই হয়। ছেলে নিজের দোষের বদলে শাসনকর্ত্তার দোষ ধরিতে শিখে।

অনেক সময় ছেলেকে দণ্ড লাভের পরেই আদর পাইতে দেখা যায়। শাসনজনিত ক্রন্দন যেন কখনও

আদরের দ্বারা নিবারিত না হয়। ছেলে কাঁদিয়াই চুপ করিবে। শাসনের মূল্য বজায় রাখিতে হইলে ছেলের চোখে জল দেখিয়া বিচলিত হইলে চলিবে না। আদরের সময় আদর ও শাসনের সময় শাসন।

অনেক ছেলে ক্রমে ক্রমে শাসনের প্রতি ভীতিশূন্য হইয়া পড়ে। বিবেচনা পূর্ব্বক দণ্ড দান না করায় এরূপ হয়। কথায় কথায় দণ্ড পাইয়া যখন দণ্ড পাওয়াটা অভ্যাসের মধ্যে দাঁড়াইয়া যায় তখন সে ছেলেকে সোজা করা এক প্রকার অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়।

ছেলেমেয়ে যখন ছোট থাকে তখন কুসঙ্গের ভয় ততটা থাকে না। কিন্তু একটু বড় হইলেই কুসঙ্গ সন্তান পালনের একটা মস্ত ফাঁড়া হইয়া দাঁড়ায়। যতদূর পারা যায় তাহাদিগকে অসৎ সঙ্গ হইতে দূরে রাখা কর্ত্তব্য। কিন্তু যেমন ছেলের গায়ে সর্ব্বদা ফ্লানেলের জামা চাপাইয়া রাখিলে ভবিষ্যতে সর্দ্দির হাত এড়ান অসম্ভব হয় তেমনি যে আজীবন কুসঙ্গ কেমন তাহা জানে না সে কুসঙ্গে যাইলে শীঘ্রই বিকৃত হইয়া পড়ে। কুসঙ্গের দোষ ও কিরূপে তাহা হইতে আত্মরক্ষা করিতে হয় তাহা ছেলেকে ভাল করিয়া শিখাইয়া দিতে হইবে; তাহার মনের সহিত ভাল ও মন্দের জ্ঞান যত্নপূর্ব্বক গাঁথিয়া দেওয়া আবশ্যক। তাহার প্রাণে মন্দের প্রতি ঘৃণা জন্মাইয়া দিতে পারিলে সে কুসঙ্গে কখনই বিকৃত হইবে না। বিবেকের বাণী শুনিবার শক্তি যাহার আছে, সে কখনই অসৎপথ অবলম্বন করিবে না। প্রত্যেক শিশুর সহিত বিবেকের পরিচয় করিয়া দেওয়া পিতামাতার কর্ত্তব্য। যাহা ভাল তাহা পাইবার আকাঙ্ক্ষা ছেলের প্রাণে জন্মাইয়া দিতে হইবে।

দশ হইতে পোনর বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ছেলেদিগকে কুসঙ্গ হইতে দূরে রাখিয়া তাহাদের মনে কুসঙ্গ এড়াইবার প্রবৃত্তি জন্মাইয়া দিয়া, তার পর সঙ্গ সম্বন্ধে একটু স্বাধীনতা দেওয়া মন্দ নয়। এই সময়টা জগতের নানা বিষয় শিখিবার সময়; সর্ব্বদা বাঁধা থাকিলে ছেলেরা বাহিরের কিছুই শিখিতে পারে না। একটু স্বাধীনতা দিয়া বাহিরে মিশিতে দিলে, তাহারা এতদিন যাহা শিখিয়াছে তাহার দৃষ্টান্ত নিজের চক্ষে দেখিতে ও অনেক নূতন বিষয় শিখিতে পারে। ব্যবহার দ্বারা অর্জ্জিত জ্ঞানের উৎকর্ষ সাধিত হয়। বাহিরে কার্য্যক্ষেত্রে সৎপ্রবৃত্তিগুলিকে পরিচালন করিয়া, সে গুলিকে দৃঢ়তর ও মার্জ্জিত করিয়া তুলিতে পারে। কিন্তু স্বাধীনতা দিতে হইবে বলিয়া স্বাধীনতা দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে না। এই সময় জীবনের সন্ধিকাল। জীবনকে ভাল কি মন্দ যাহা হউক একটা কিছু করিয়া গড়িয়া লইবার ইহাই সময়। একথা মনে রাখিয়া পিতা মাতারা যেন সন্তানের উপর হইতে চোখ না তোলেন। সাবধানতার সহিত একটু স্বাধীনতা দিলে ও তাহার মাত্রা বিবেচনা পূর্ব্বক সংযত রাখিলে বেশ সুফল পাওয়া যাইতে পারে।

দয়াশীলতা, পরদুঃখকাতরতা, ভগবানের প্রতি প্রীতি ও কৃতজ্ঞতা প্রভৃতি সৎবৃত্তিগুলিকে প্রথম হইতে বালক বালিকার অন্তরে গাঁথিয়া দেওয়া আবশ্যক। কতকগুলি অভ্যাস লইয়াই চরিত্রের সৃষ্টি। যাহাতে তাহারা কোন বদ অভ্যাসের দাস না হয় সে বিষয়ে সতর্ক হইতে হইবে। ছেলে মেয়ের বয়স একটু বেশী হইলেই জীবনে তাহাদের কি কি প্রকার বিপদের সম্মুখীন হওয়া সম্ভব তাহার একটা আভাস তাহাদিগকে দেওয়া ভাল। ইহাতে তাহারা ভবিষ্যতে সাবধান হইতে সাহায্য পাইবে। জীবনের কর্ত্তব্য ও আদর্শ কি, এবং কিরূপে সংসারে জীবন পরিচালিত করিতে হইবে এ সকল বিষয়ে এই সময়ে তাহাদিগকে শিক্ষা দিতে হইবে। মহৎ লোকের জীবনচরিত পাঠে এ কার্য্যে বিশেষ সাহায্য পাওয়া যায়।

উন্নত ও পবিত্র চরিত্র বলে জগদীশ্বরের কৃপা লাভের অধিকারী হওয়া জীবনের এক পরম সৌভাগ্য। যে ব্যক্তি কৃতজ্ঞ হৃদয়ে দৈনন্দিন জীবনে ভগবানের কার্য্যকুশলতা ও দয়াপ্রবণতার পরিচচয় দেখিতে পায়, তাহার মত সংসারে সুখী কে? বাল্যকাল হইতে বালকবালিকাগণকে পরম পিতার প্রতি ভক্তিসম্পন্ন করিয়া তাহাদিগকে দয়াময়ের উপর সকল বিষয়ে নির্ভর করিতে শিক্ষা দেওয়া উচিত। আমরা যাহা কিছু ভোগ করি তাহাই যে ভগবানের করুণা তাহা যেন তাহারা বাল্যকাল হইতেই অনুভব করিতে শিক্ষা করে। মিথ্যা কথা বলা, অপরকে কষ্ট দেওয়া প্রভৃতি পাপগুলি যে আমাদিগকে ভগবানের করুণায় বঞ্চিত করে একথা জানা থাকিলে ও বাল্যকাল হইতে এরূপ শিক্ষা

প্রাপ্ত হইলে, শিশুদের চরিত্রগঠন সম্বন্ধে আর বড় কিছু ভাবিতে হয় না।

বাল্যকালে শিশুগণ অতিশয় অনুকরণপ্রিয় থাকে। যত জীবনে অগ্রসর হইতে থাকে তাহাদের এই অনুকরণপ্রীতি ততই কমিয়া আইসে। ভাল মন্দের জ্ঞান যত তাহাদের হৃদয়ে পরিষ্কার হয় ততই তাহারা ভালর অনুকরণ করিতে থাকে ও মন্দকে পরিত্যাগ করে। জীবনের প্রারম্ভে যখন ভাল মন্দের মধ্যে পার্থক্য উপলব্ধি করিতে পারে না, তখন বালকবালিকারা যাহা দেখে তাহাই অনুকরণ করিতে চায়। সেইজন্য পিতা মাতার অত্যন্ত সাবধান থাকা উচিত যেন সন্তানদের সম্মুখে কোন অন্যায় কর্ম্ম অনুষ্ঠিত না হয়। তাহাদের সম্মুখে যত ভাল কাজ করা হয় ততই মঙ্গল। বাল্যকাল হইতে দয়াশীলতা ও সচ্চরিত্রতার দৃষ্টান্ত দেখিলে তাহাদের মন উর্দ্ধদিকে ধাবিত হয়, কিন্তু নিষ্ঠুরতা প্রভৃতির দৃষ্টান্তে সুকুমারমতি বালকবালিকার হৃদয় কঠিন হইয়া পড়ে।

গৃহস্থঘরে ছেলেদের অপেক্ষা মেয়েদের সম্বন্ধে একটু শীঘ্র শীঘ্র সাবধানতা অবলম্বন করা হয়। বিলাতে অনেক সময়ে আজীবন কুমারী থাকিতে পারে এরূপ ভাবে মেয়েদিগকে শিক্ষা দেওয়া হয়। ইহাতে অনেক সময় বেশ সুফল উৎপন্ন হয়। কিন্তু আমাদের দেশে এই প্রথা নাই। মেয়েদিগকে সন্তান পালন বিষয়েও শিক্ষা দেওয়া উচিত। মেয়েদের শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে গৃহিনীপনা একটী প্রধান বিষয়। অল্প অল্প ঘরের কাজ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে অবসর মত অন্য শিক্ষা দেওয়া ভাল। ঘরকন্নার কাজ শিখিতে বেশী সময় লাগে না, বিদ্যাশিক্ষায় তাহারা বেশ সময় দিতে পারে।

মেয়েদিগকে শিক্ষা দিবার সময় একটী বিষয় সর্ব্বদা স্মরণ রাখা উচিত। মেয়েরা চিরদিন পিতৃগৃহে থাকিবে না। তাহারা কিরূপ পরিবারে যাইতে পারে তাহার একটা অনুমান করিয়া লইয়া তাহাদিগকে তদুপযোগী শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। বড় লোকের মেয়েকে অনেক সময় গরীব পরিবারে যাইতে হয়। এই সকল কারণে সাবধানতার সহিত পালিত না হইলে মেয়েকে লইয়া অনেক সময় কষ্ট পাইতে হয়। গৃহস্থ ঘরের মেয়ে যেমনটী হওয়া উচিত তেমনটী হইলে মেয়ে যেখানেই যাউক না, সুখী হইবে।

মেয়েদিগকে ঘরকন্নার কাজ অগ্রে শিখাইতে হইবে বলিয়া, তাহাদের অন্য শিক্ষা সম্বন্ধে উদাসীন থাকা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। পুত্রের ন্যায় কন্যার বিদ্যা শিক্ষা বিষয়েও সবিশেষ যত্নবান হওয়া উচিত. বিদ্যাশিক্ষা দ্বারা মানসিক বৃত্তিগুলি বিকশিত হয়। মৌখিক উপদেশ ও অন্য উপায়ে তাহা করা কঠিন। বিদ্যাশিক্ষার দ্বারা প্রবৃত্তি মার্জ্জিত হইলে সংসার তাহাদের নিকট সুখময় হইয়া উঠে। মুর্খেরা সংসারের কেবল অন্ধকার ভোগ করে মাত্র। তাহারা বাহিরের ভোগ্য বস্তু হইতে স্থূল আনন্দ পাইতে পারে বটে কিন্তু অন্তশ্চক্ষুর ভোগ্য—সত্যশিব সুন্দর পরমেশ্বরের জ্ঞান-কৌশলপূর্ণ প্রকৃতি ও মনোরাজ্যের সৌন্দর্য্য অনুভব করা তাহাদের শক্তির অতীত। তাহারা সংসারের শুধু নিকৃষ্ট সৌন্দর্য্যই উপভোগ করে।

ছেলেদিগের বিদ্যাশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সকলেই বুঝেন। অশিক্ষিত পুত্র পিতামাতার মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত। পুত্রের বিদ্যাশিক্ষায় উদাসীন হওয়া যে কখনই উচিত নয় একথা বলাই বাহুল্য।

সচ্চরিত্রতা হইতে জীবনে যত সুখ পাওয়া যায় তেমন আর কিছুতেই পাওয়া যায় না। বিদ্বান চরিত্রহীন সন্তান অপেক্ষা বিদ্যাহীন চরিত্রবান সন্তান অধিক সুখ প্রদান করে। সর্ব্বদা পরমেশ্বরে মতি রাখিয়া তাঁহার প্রতি প্রীতি ও কৃতজ্ঞতাপূর্ণ অন্তরে তাঁহারই নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য সমূহ সাধনজনিত বিমল আনন্দ সর্ব্বক্ষণ অনুভব করাই আদর্শ সংসারীর লক্ষ্য। যে পরিবারে সকলেই চরিত্রবান তাহাতে বহু দুঃখের দ্বার অবরুদ্ধ। যাঁহার মন যত উন্নত তিনি তত সুখী। পুত্র কন্যার পিতা মাতারা কেবল সন্তানের মুখ-দর্শন জনিত ক্ষণিক সুখে সন্তুষ্ট না হইয়া যদি তাহাদের দ্বারা প্রকৃতই সুখী হইতে ইচ্ছা করেন তবে পুত্র কন্যার প্রকৃত সুশিক্ষায় মনোনিবেশ করুন। ইহাতে একমাত্র তাঁহাদেরই হাত। এ সম্বন্ধে তাঁহারা যাহা করিবেন, পরকালের অপেক্ষা করিতে হইবে না, ইহকালেই তাহার ফলভোগ করিবেন। অসচ্চরিত্র ও অশিক্ষিত সন্তানের পিতা মাতা হওয়া অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কিছুই নাই। সে দুঃখ পাওয়া অপেক্ষা অপুত্রক থাকা সমধিক বাঞ্ছনীয়।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

স্বামী পরমানন্দ। *

(১)

সাধিতে মহান্ ব্রত দেশের কল্যাণ,
তুমি দেব, আত্মত্যাগী মহাযোগীবেশে,
ছাড়ি প্রিয় জন্মভূমি প্রিয় পরিজন,
ভাসাইলে আপনারে নিঃস্ব নিরুদ্দেশে।

(২)

অনন্ত কল্যাণমুখী উন্নত বাসনা,
ছুটিয়াছে কোন্ মহা কর্ম্মের সন্ধানে,
রুদ্ধ করি জন্ম গৃহ, অসার কামনা—
বেঁধেছ সুদৃঢ় প্রাণ কর্ত্তব্য-বন্ধনে।

(৩)

যে দিন জাগিয়াছিল কৈশোর তরুণ,
উপেক্ষিয়া চলে গেলে সাধের সংসার,
একলক্ষ্য করি স্থির সন্ন্যাসী নবীন—
আরম্ভিলে সাঁতারিতে পরীক্ষা-পাথার।

(৪)

গুরু তব জ্ঞানময় মূর্ত্তি প্রতিভার,
অন্তর্দৃষ্টি বলে বুঝি হেরিয়া তোমার
হৃদয়ে বৈরাগ্যানল,—দিলেন ফুৎকার,
রহিতে নারিলে স্থির,—ছাড়িলে সংসার!

(৫)

যে জ্ঞান লভিলে ভ্রাতঃ গুরু সহবাসে,
যাঁর সে অমৃত বাণী অগ্নিতে ইন্ধন,
—পূর্ণ হোক্ ও জীবনে স্বদেশে, প্রবাসে—
সে পদাঙ্ক অনুসরি হইয়ো তেমন।

(৬)

সফল হউক কার্য্য, পূর্ণ মনোরথ,
জয়মাল্য ধরি শিরে, ফিরিয়ো হেথায়
ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি রূপে অর্ঘ্য দিব কত,
দাঁড়াইয়ো দীপ্ত মুখে মহা মহিমায়।

শ্রীলাবণ্যলেখা আইচ।

* ইনি লেখিকার সহোদর। কিশোর বয়সেই ইঁহার হৃদয়ে প্রবল ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়। স্বর্গীয় স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাবে তাঁহার সন্ন্যাসীদলভুক্ত হইয়া ইনি এক্ষণে আমেরিকায় বাস করিতেছেন।
ভাঃ মঃ সঃ।

প্যারীসুন্দরী।

৭

সান্যাল মহাশয় বাসাবাড়ীতে যাইয়া প্রধান কার্য্যকারক হরনাথ মিশ্রের সহিত পরামর্শ করিয়া লাঠিয়াল সংগ্রহের জন্য লোক মতাইন করিলেন। হুকুম পাইলে কি আর রক্ষা আছে? ঝাকড়া-চুল লাঠিয়ালেরা দুহাতে সেলাম ঠুকিয়া নিশীথ সময়ে গ্রামে গ্রামে লোক সংগ্রহ করিতে ছুটিল। উপস্থিত বিপদে আবশ্যক মতে সাহায্য করিবে এই আশায়ই মিসেস কেনী নিকটস্থ প্রজাদিগকে আনিতে ও রাত্রি জাগরণে কষ্ট হইবে বলিয়া দ্বিগুণ পারিশ্রমিক দিতে আদেশ করিয়াছেন।

স্বার্থই অনর্থের মূল, স্বার্থই দুর্দ্দশার সোপান, জগতে স্বার্থই পতনের মূল কারণ। প্যারীসুন্দরী বলিয়াছেন, দেশের লোকেই দেশের শত্রু, দেশের অনিষ্টকারী। কেনী বিলাত হইতে লোকজন সঙ্গে করিয়া এদেশে আসেন নাই, দেশের লোক দিয়াই স্বদেশীয়ের সর্ব্বস্বান্ত করিতেছেন। রাত্রি জাগরণে প্রজার কষ্ট হইবে, সে দিকেও মিসেস কেনীর লক্ষ্য ছিল। থাকিয়া কি হইবে? কার্য্যকর্ত্তা বাঙ্গালী, অধীনস্থ চাকরগণ বাঙ্গালী, তাহারা স্বার্থের দাস, দ্বিগুণ পারিশ্রমিক দিয়া লোক সংগ্রহ করার আদেশ, কিন্তু দেশের লোকের হাতে পড়িয়া নিরীহ প্রজাকুলের দুর্দ্দশার আর সীমা রহিল না।

লোক-সংগ্রহকারীরা সেলাম ঠুকিয়া নিকটস্থ গ্রাম সমূহে প্রবেশ করিল। দেওয়ানের হুকুম, কার সাধ্য আর রাত্রে ঘরে থাকিতে পারে? নিদ্রা ত্যাগ করিয়া শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিতে হইল। যে উঠিতে বিলম্ব করিল কি শরীরের অসুস্থতা হেতু কুঠীর পাহারায় যাইতে নারাজ হইল তাহার ভাগ্যে যাহা ছিল তাহা হইল। যন্ত্রণার দায়ে প্রাণের ভয়ে অপমানের ত্রাসে অনেকেই দেওয়ানজীর প্রেরিত লাঠিয়ালের সঙ্গী হইল। যাহারা দুই চারি আনা প্রণামী দিতে সমর্থ হইল, তাহারা আর আসিল না। যাহাদের পয়সা দিবার শক্তি নাই, তাহারা বাধ্য হইয়া যাইতে প্রস্তুত হইল। কুঠী রক্ষার্থে চলিল কাহারা? যাহাদের পেটে অন্ন নাই, সংসারে কষ্টের সীমা নাই। কোথায় যাইতে

হইবে, কি কার্য্য করিতে হইবে কেন টানিয়া লয়, কেনই বা বিনা অপরাধে লাথি, কীল, চড় মারে সে কথা জিজ্ঞাসা করিবার সাধ্য নাই। অনেকেই সারাদিন নীল জমির কারকিত করিয়া বাড়ী আসিয়াছে। নিজের জমি উপযুক্ত সময়ে চাষ আবাদের ক্ষমতা নাই। সময় বহিয়া যাউক, জমি রৌদ্রে পুড়িয়া যাউক, জলে ডুবিয়া যাউক, "গো" মরিয়া যাউক, কার সাধ্য নীল জমি ফেলিয়া ধানের আবাদ করিতে পারে! আগে নীল, পাছে ধান। কৃষকের জীবনোপায় শস্যবপনোপযোগী জমি প্রস্তুত করিতে বিঘ্ন, বুনিতে বাধা, কর দিতেও অক্ষম। কাজেই খাবার সংস্থান অনেকেরই নাই।

বাড়ী আসিয়া কেহ আধপেটা আহার করিয়াই কুহকিনী নিশার কুহকে পড়িয়া ঘুমে বিভোর হইয়াছে। কেহ অনাহারেই মাটিতে শুইয়া পড়িয়াছে। ক্ষুধা নিবারণ জন্য অল্প পরিমাণ এক মুটো অন্নও অনেকের ভাগ্যে জোটে নাই। ছোট ছোট ছেলে মেয়েগুলি দিনের বেলা নিরন্নে থাকিয়া সন্ধ্যার পুর্ব্বেই মায়ের অঞ্চল ধরিয়া কাঁদিতেছিল। মায়ের প্রাণ! যাহা ঘরে ছিল তাহাই সিদ্ধ পোড়া করিয়া প্রাণ হইতে প্রিয়তর সন্তান সন্ততিগণের মুখে শুধু নুন ভাত দিয়া তাহাদের ক্ষুধা নিবৃত্তি করিয়াছে। হাঁড়িতে আর অন্ন নাই। থাকিলে ছেলেমেয়েগুলিই আরও কিছু খাইতে পারিত। কি করে, সজল নয়নে হাঁড়ি-আচড়া পোড়া ভাতগুলি যতনে স্বামীর জন্য রাখিয়া দিয়া স্বামীগতপ্রাণা পত্নী কেবল ঈশ্বরের নাম করিয়া রহিয়াছে। স্বামী সারাদিন নীল কুঠীর কাজ করিয়া বাটী আসিয়াছে, ছেলে মেয়ে দিনে খাইতে পায় নাই। সন্ধ্যাবেলাও ভর পেট হয় নাই। স্ত্রীর মুখে খবর শুনিয়া আর সে পোড়া ভাতও মুখে দিতে সাধ্য হয় নাই। উপায় আর কি আছে? মহাজনের বাড়ীতে গিয়া দ্বিগুণ ত্রিগুণ লাভ স্বীকারে ধান কর্জ্জ করিয়া আনিবে, তাহারও সময় নাই। রাত্রি প্রভাত হইতে হইতেই অমনি খালাসী আসিয়া ধরিয়া লইয়া যায়, নীল জমির কারকির্ত্তি চাষ ইত্যাদিতে নিযুক্ত করে। তবে কিছু প্রণামী দিতে পারিলে সে যমদূতগণের হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারে। তাহাই বা কোথায় পাইবে? পেটে পাথর বান্ধিয়া থাকাই অভ্যাস। দিবসে দুএক পয়সায় জলপানই পুর্ণ আহার। পরিশ্রমের ইতি নাই, নিদ্রা দেবী ছাড়িবেন কেন? বিছানা থাক্ বা না থাক, বালিসে মাথা পড়ুক বা না পড়ুক্, ঘুমের ঘোরে সকলেই কাতর, তাহার উপর এই দৌরাত্ম্য! যাহারা দুই এক আনা দিতে পারিল তাহারা কীল লাথি খাইয়া রক্ষা পাইল। যাহাদের দিবার শক্তি হইল না তাহারাই কুঠীর পাহারা দিতে চলিল। হায়রে বাংলা! হায়রে নীলকর! হায়রে স্বদেশী!

মিসেস কেনী পুর্ব্বেই সংবাদ পাইয়াছিলেন যে প্যারীসুন্দরীর লাঠিয়ালেরা রাত্রি প্রভাত হইতেই কুঠী আক্রমণ করিবে। কৌশলে তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিবেন; তাইতে স্থানীয় মাজিষ্ট্রেটকে গোপনে আনিয়া রাখা। আরও একটুকু সূক্ষ্ম কথা আছে। কেনীর মাথা কাটিয়া সদরপুর লইয়া যাইবে। কোনক্রমে যদি মাজিষ্ট্রেটের মাথাটা কাটা যায় তবে কেনীর মনস্কামনা সহজেই সিদ্ধ হয়। প্যারীসুন্দরীর সর্ব্বস্বান্ত, কেনীর জয় জয় আনন্দ। কুঠী ছাড়িয়া গুপ্ত ভাবে যাওয়ার কারণও তাহাই। মিসেস কেনী সাহসে নির্ভর করিয়া ভিন্ন কক্ষে জাগিয়া আছেন। মাজিষ্ট্রেট সাহেব ভিন্ন কক্ষে নিদ্রিত। স্বয়ং মাজিষ্ট্রেট শান্তিরক্ষকগণ সহ কুঠী রক্ষার জন্য উপস্থিত। কুঠীর লোকজনও সতর্ক; বিপদের আশঙ্কা নাই বলিলেই হয়। কিন্তু মন অস্থির। আজ রাত্রে নিদ্রার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ নাই। ঘটনাচক্রে কোথায় লইয়া যায়, কি ঘটে, কি হয়, সমুদায়ই ভবিষ্যতের অন্ধকার গর্ভে নিহিত, কাজেই মন অস্থির, চঞ্চল, চিন্তায় আকুল।

উষাদূত কুক্কুট রাত্রি শেষ হওয়ার সংবাদ ঘোষণা করিল। পাখীরা এখনও বাসা ছাড়ে নাই। পাখা ঝাড়া দিয়া কেবল ডাকিতেছে। মিসেস কেনী মোরগের ডাকের দিকেই মন দিয়াছেন। এক ডাক, দুই ডাক ক্রমে তিন চারি ডাক শুনিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আরও এক প্রকার শব্দ তাহার কানে প্রবেশ করিল। এরূপ শব্দ তিনি আর একদিন শুনিয়াছিলেন। সেই ডাক, সেই বিকট ভীষণ রব। শরীর রোমাঞ্চিত হইল, হৃদয় কাঁপিতে লাগিল, শব্দ ক্রমেই নিকটবর্ত্তী হইতেছে। তিনি ব্যস্তভাবে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কক্ষের দ্বারে আঘাত করিতে লাগিলেন। মাজিষ্ট্রেট সাহেবও

অর্দ্ধনিদ্রিতভাবে ছিলেন। মিসেস কেনীর গলার স্বর শুনিয়া পালঙ্ক হইতে লাফাইয়া উঠিলেন। দ্বার খুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপার কি?" মিসেস কেনী বলিলেন, "শুনিতেছেন না?"

মাজিষ্ট্রেট। কৈ আমিত কিছুই শুনিতে পাইতেছি না।

মিসেস কেনী। ঐ শুনুন, বিপক্ষদল কুঠীর নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। বাঙ্গালী-বিক্রমের ঐ শব্দ। প্যারীসুন্দরীর লাঠিয়ালগণ ঐরূপ শব্দ করিয়াই আসিয়া থাকে। সে দিনও আসিয়াছিল।

মাজিষ্ট্রেট। কোন চিন্তা নাই। আপনি নিশ্চিন্ত-ভাবে আপনার কামরায় থাকুন। আমি নীচে যাইতেছি। গবর্ণমেণ্টের রাজ্য, আমি বৃটিস গবর্ণমেণ্টের পক্ষের লোক, আমি থাকিতে আপনার কোন ভাবনা নাই। আপনি নির্ভয়ে উপরে থাকুন। আমি নীচে চলিলাম।

মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাড়াতাড়ি আপন পরিচ্ছদ লইয়া নীচে নামিলেন। প্যারীসুন্দরীর লাঠিয়ালেরা বিষম বিক্রমে কালীগঙ্গার পশ্চিম পারে পৌঁছিয়াই পুনরায় ডাক ভাঙ্গিল। দারগা জমাদার সকলেই আপন আপন পোষাক লইয়া সাহেবের আদেশে কোমর বাঁধিলেন। কিন্তু ঘরের বাহির হইলেন না। কুঠীর হাতায় প্রবেশ করিলেই গ্রেপ্তার করিবেন, ইহাই তাঁহাদের ইচ্ছা।

এখনও রাত্রি প্রভাত হয় নাই, ঊষা দেখা দেয় নাই। আবার সেই হো হো শব্দ! সেই রি রি শব্দ! সেই হৃদয় কম্পনকারী, শরীর কম্পনকারী ভীষণ রব মেম সাহেবের কর্ণে প্রবেশ করিল। পশ্চিমেও ঐ শব্দ, দক্ষিণেও ঐ। রামলোচন এবার বিশেষ যোগাড় করিয়াছেন। কুঠীর পশ্চিম এবং দক্ষিণ উভয় দিক হইতে আক্রমণের যোগাড়। মিসেস্ কেনী দুই দিকে দুই প্রকার শব্দ শুনিয়া আরও ভীতা হইলেন। ক্রমে কুঠীর নেগাহবান সর্দ্দারগণ জাগিয়া উঠিল। ঢাল, সড়কী, লাঠি লইয়া সকলেই খাড়া হইল।

মিসেস কেনী মীরসাহেবের চাকর গোপাল সর্দ্দারকে ডাকাইয়া বলিলেন, "গোপাল! তুমি আমার এই ঘর রক্ষা কর। কুঠীর লাঠিয়ালেরা কুঠী রক্ষা করিবে। প্যারীসুন্দরীর লাঠিয়ালদিগের সম্মুখীন হইয়া লাঠি মারিবে, তুমি আমাকে রক্ষা কর।"

পুনরায় দক্ষিণ দিকে পূর্ব্ববৎ শব্দ হইল। গোপাল বলিল, "হুজুর! প্যারীসুন্দরীর লোক পশ্চিম এবং দক্ষিণ এই দুইদিক হইতে নিশ্চয়ই আসিতেছে। দক্ষিণদিকে কোন বাধা নাই। পশ্চিমে নদীতে বেশী জল, অধিক পরিমাণ পরিসর না হইলেও নদী, কিন্তু দক্ষিণে খোলা মাঠ, পূর্ব্বেও তাহাই, তবু পূর্ব্বদিকে তত আশঙ্কা নাই। কারণ দক্ষিণ-দিক হইতেই পূর্ব্বদিকে যাইবার পথ। এক্ষণ দক্ষিণ দিক না ঠেকাইলে কুঠী রক্ষা করা বড়ই কঠিন হইবে। আমি দক্ষিণ দিকেই চলিলাম। হুজুর! আর বিলম্ব করিতে পারি না।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া গোপাল মেম সাহেবকে আবার সেলাম বাজাইয়া বেগে ছুটিল।

কুঠীর লাঠিয়ালেরাও ডাক ভাঙ্গিয়া কুঠীর পশ্চিম দিকে "আনি" বাধিয়া দাঁড়াইল। কতক লোক কুঠীর উত্তর সীমায় প্রবেশ দ্বারে ঢাল তলওয়ার বান্ধিয়া খাড়া হইল। এখনও সম্পূর্ণরূপে প্রভাত হয় নাই। গোপাল সর্দ্দার আপন বেরাদরীদিগকে বলিল, "দক্ষিণে এত আলো কিসের?"

সকলেই দেখিল অনেকের হাতেই মশাল। মশালের আলোতে দেখা গেল, অগণ্য লাঠিয়াল, বিকট চীৎকার করিতে করিতে ক্রমেই অগ্রসর হইতেছে। কালীগঙ্গার পশ্চিম পারেও ঐরূপ আলো, এই প্রকার বিকট রব। দেখিতে দেখিতে কালীগঙ্গার পশ্চিম তট আলোকমালায় পরিশোভিত হইল। জলে স্থলে জ্বলন্ত মশালের জ্বলন্ত শিখা প্রভাত বায়ুর প্রতিঘাতে হেলিতে দুলিতে লাগিল। চমৎকার দৃশ্য! কিন্তু সে সুদৃশ্য বেশীক্ষণ থাকিল না, ঊষাদেবী পূর্ব্বদিক হইতে দুহাতে অন্ধকার সরাইয়া চারিদিক পরিষ্কার করিয়া দিলেন। প্যারীসুন্দরীর লাঠিয়ালেরা "মার মার" শব্দে গঙ্গাজলে ঝাঁপ দিয়া মহা তেজে কুঠী অভিমুখে আসিতে লাগিল।

কুঠীর সকলেই জাগিয়াছে। মুচ্ছদ্দী, দেওয়ান, লাঠি-য়ালগণের হুহুঙ্কারে, ভীষণ চীৎকারে জাগিয়াছেন। কুঠীর লাঠিয়ালেরাও প্রস্তুত হইয়া উভয় দিকের প্রবেশদ্বারে বীর-দর্পে দণ্ডায়মান হইল। প্রায় শতাধিক লাঠিয়াল নদীর পূর্ব্বপারে দাঁড়াইয়া জলস্থ শত্রুদের আগমনে বাধা দিতে লাগিল। প্যারীসুন্দরীর হুকুম, কার্য্য উদ্ধার করিতে পারিলে বিশেষ পুরস্কার আছে। তাহার পর এক হাজার

টাকা অতিরিক্ত। যে সেই কাজ পারিবে তাহার ভাগ্যেই হাজার টাকা। সে হাজার কাহার ভাগ্যে আছে তাহা কেহই জানে না। কিন্তু সকলেরই আশা আছে—"আমিই পাইব।"

প্যারীসুন্দরীর পক্ষের লোকের পূর্ব্বেই স্থির পরামর্শ ছিল, যে পশ্চিম ও দক্ষিণ উভয় দিক হইতেই কুঠী আক্রমণ করিবে। করিলও তাহাই। দক্ষিণ দিকে গোপাল সর্দ্দার। গোপালের দলের সহিত খুব চলিতেছে। স্বয়ং গোপাল সুশিক্ষিত। সঙ্গীরাও বাছা বাছা। সহজে পরাস্ত হইবার নহে। লাঠি, সড়কী সমান ভাবে চলিতেছে। প্যারীসুন্দরীর লাঠিয়ালেরা এক পা-ও অগ্রে বাড়িতে পারিতেছে না।

কিন্তু পশ্চিম দিকে ভিন্ন প্রকার কাণ্ড। একদল জলে ঝাঁপাইয়া ভিজা কাপড়ে ডাঙ্গায় উঠিতে অগ্রসর হইতেছে। অপর পক্ষ উপর হইতে লাঠিদ্বারা আঘাত করিবার চেষ্টা করিতেছে। একশত লোকে কি করিবে? দক্ষিণে ফিরাইতে বামদিক হইতে অসংখ্য শত্রুদল কেনীর লাঠিয়ালদিগকে ঘিরিয়া ফেলিল। এখন তাহাদের প্রাণ যায়। কিছুক্ষণ মাথা-ভাঙ্গা, পা-ভাঙ্গা, মাজা-ভাঙ্গা, হাত-ভাঙ্গা হইয়া অবশেষে পলায়ন করিল।

ক্রমে নদীতীরে লাঠির ঠকাঠক্ শব্দ থামিয়া গেল। কারণ, কুঠীর লাঠিয়ালগণ বেগোছ দেখিয়া সকলেই পিঠটান দিয়াছে। আর কোন বাধা নাই। প্যারীসুন্দরীর লাঠিয়ালগণ কেনীর শয়ন-ঘরের সম্মুখস্থ আঙ্গিনায় আসিয়া কেনীর নাম ধরিয়া বেজায় গালাগালি দিতে আরম্ভ করিল। "আয় নামিয়া আয়। দালানের মাঝে কপাট দিয়া কেন? পুরুষ-বাচ্চা বাহিরে এসো। দেখি একবার তোমাকে। আর তুমি মনে করো না দালানের কপাট এঁটে বাঁচতে পারবে? পঞ্চাশ তোড়া টাকা ছড়াইয়া দিলেও আজ খালি হাতে যাবার লোক নই। তোমার মাথা হাতে হাতে সদরপুর যাইবে। বাহির হও, শীঘ্র বাহির হও।" মিসেস কেনী ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন। মাজিষ্ট্রেট সাহেব নানা প্রকার সান্ত্বনা বাক্যে তাঁহাকে বুঝাইয়া শেষে বলিলেন, "আপনার কোন চিন্তা নাই। এই লাঠিয়ালেরা আর একটু অগ্রসর হইলেই পাকড়া করিব। আপনি ব্যস্ত হইবেন না।"

মুখের কথা মুখে থাকিতে থাকিতে লাঠিয়ালেরা লাঠি ভাঁজাইতে ভাঁজাইতে একেবারে সিঁড়ির নিকটে আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিতে উদ্যোগ করিল। এমন সময় লাল পাগড়ী বাঁধা কয়েকজন লোক বাহিরে আসিয়া "পাকড়ো" "পাকড়ো" শব্দ করিয়া ছুটাছুটি আরম্ভ করিল। লাঠিয়ালের পক্ষে লাল পাগড়ী বড়ই মারাত্মক অস্ত্র, বড়ই ভয়ের কারণ। নাম ডাকের লাঠিয়াল হইলেও লাল পাগড়ীর নিকট মাথা হেঁট। লাল পাগড়ী দেখিয়া প্যারীসুন্দরীর লাঠিয়ালেরা থতমত খাইয়া দাঁড়াইল। দাঁড়াইয়া যাহা দেখিল তাহাতে পূর্ব্বভাব অনেক পরিবর্ত্তন হইল। স্পষ্ট বলিতে লাগিল, "যা থাকে কপালে হইবে, আগে ধর বেটাকে।" এই কথা বলিয়াই আবার যেন কি মনে হইল, পিছে হটিল। ক্রমেই পিছে হটিতে লাগিল। একজন বলিতে দশজন বলিয়া উঠিল, "ও তো কেনী নহে। আমি বেশ চিনিতে পারিয়াছি, কখনই ও কেনী নহে।"

সন্দেহটা শীঘ্রই মিটিয়া গেল। কারণ লাল পাগড়ী-ওয়ালা সেপাহীরা "পাকড়ো পাকড়ো" বলিয়া বেগে ছুটিল। মাজিষ্ট্রেট সাহেবও স্বীয় দলের পৃষ্ঠপোষক হইয়া বলিতে লাগিলেন, "পাকড়ো পাকড়ো দারগা, জল্‌দি পাকড়ো, হাত-কড়ি লাগাও।" লাঠিয়ালেরা বলিতে লাগিল,—"আজ মারা গিয়াছি। ধরা পড়িলাম। এত দিনের পরে মারা পড়িলাম। আর দেখ কি? ও কেনী নহে। বেশ ভাল করিয়া চিনি, ইনিই সেই মাজিষ্ট্রেট।" ইঁহারাও পাকড়ো পাকড়ো করিয়া ছুটিয়াছেন, কিন্তু একজনকেও পাকড়াইতে পারিতেছেন না। শুধু পিছে হটিয়াই লাঠিয়ালেরা নদীতীর পর্য্যন্ত চলিয়া গেল। লাল পাগড়ীধারী সেপাহি সাহেবেরা মুখে পাকড়ো পাকড়ো করিতেছেন, পাকড়া করিবার জন্য হাতও বাড়াইয়া দিতেছেন কিন্তু তাহাদের লাঠির নিকট যাইতে সাহসী হইতেছেন না।

ভাগড়া লাঠিয়ালেরা লাঠি ভাঁজিতে ভাঁজিতে জলে নামিল। সেপাহি সাহেবেরা কাপড় কসিতে কসিতে "ডিঙ্গি নাও —ডিঙ্গি নাও" বলিয়া চেঁচাইতে চেঁচাইতে তাহারা নদী পার হইয়া কালীগঙ্গার পশ্চিম তীরে যাইয়া উঠিল। কেহ পলাইল না। সকলেই দাঁড়াইল এবং সাহেবকে বলিতে লাগিল :—"হুজুর! আপনি রাজা, আপনি দেশের বাদশা। আমরা তাবেদার চাকর, গোলাম নফর, দয়া করিয়া আমা-

দিগকে মাফ করিবেন। হুজুরের সহিত আমাদের কোন কথা নাই।"

জোড়হাতে লাঠিয়ালগণ এইরূপ বলিতে লাগিল। মাজিষ্ট্রেট সাহেব এবং দারগা জমাদার নৌকার উপর থাকিয়াই ঐ সেই কথা সেই বুলি বলিতে লাগিলেন। নৌকা পশ্চিম তীরে লাগিল। মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঘোড়া সহিত পার হইয়াছেন। ঘোড়ায় উঠিয়াই দারগা মামুদবক্সকে বলিলেন, "কি কর, তোমরা কর কি? একজনকেও ধরিতে পারিলে না?" লাঠিয়ালেরা ঐরূপ কাকুতি মিনতি করিতে করিতে ক্রমেই পিছে হাটিতেছে। ইঁহারাও অগ্রসর হইতেছেন। মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঘোড়া উঠাইয়া যাইতেই মামুদবক্স দারগা বলিল, "হুজুর, লাঠিয়াল গ্রেপ্তার করিতে আপনি যাইবেন না। আমরা উপস্থিত থাকিতে আগে হুজুরের যাওয়া ভাল দেখায় না। তবে যে বেটা দৌড় দেবে তাহার পাছে পাছে ঘোড়া ছুটাইবেন। মাজিষ্ট্রেট সাহেব মহাবিরক্ত হইয়া দারগাকে গালাগালি দিয়া বলিলেন, "এত বরকন্দাজ, এত চৌকিদার, কেনীর এত লোকজন থাকিতে উহাদের একগাছি সড়কী কি একখানা লাঠি ধরিতে পারিলে না? লাঠিয়াল গ্রেপ্তার করা তোমার কাজ নহে।

লাঠিয়াল দল হইতে একজন হাত জোড় করিয়া গলায় কাপড় বান্ধিয়া বলিতে লাগিল, "ধর্ম্মাবতার! আজ ফিরিয়া যাউন। দারগা সাহেবকেও ফিরিয়া যাইতে আদেশ করুন। দোহাই ধর্ম্মাবতার, ফিরিয়া যাউন, একজনকেও ধরিতে পারিবেন না। আর আগে বাড়িবেন না। কেনীর কপালের ভারি জোর! হুজুরের সাহায্যে আজ বাঁচিয়াছে, হুজুর না থাকিলে এতক্ষণ তাহার মাথা সদরপুর নিশ্চয়ই যাইত। ধর্ম্মাবতার! জোড় হস্তে বলিতেছি, আজ ফিরিয়া যাউন। আমরা বড়ই কষ্ট পাইতেছি। দারগাসহ আজিকার মত ফিরিয়া যাউন। আমরাও ফিরিয়া যাইতেছি।"

সাহেব শুনিলেন না। বেশীর ভাগ ড্যাম, শুয়ার, ডাকু ইত্যাদি বলিয়া গালাগালি দিলেন এবং মহম্মদবক্সকেও যাহা বলিবার তাহা বলিলেন। জমাদার বরকন্দাজ কেহই বাকী রহিল না। মহম্মদবক্স নিরূপায় হইয়া ত্রস্তপদে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। জমাদার, বরকন্দাজ, চৌকীদারগণও ধর ধর রব করিতে করিতে দারগা সাহেবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল। সাহেবও ত্রস্তপদে ঘোড়া চালাইলেন।

প্যারীসুন্দরীর লাঠিয়াল পুনরায় বলিতে লাগিল, "ধর্ম্মাবতার! আপনি রাজা আমরা প্রজা, আমাদিগকে নষ্ট করিবেন না। আজ ছাড়িয়া দিন্। জোড় হাতে গলায় কাপড় লইয়া বলিতেছি আজ ফিরিয়া যাউন। আর আমাদিগের সঙ্গে সঙ্গে আসিবেন না। আপনি সমস্ত দিন এ প্রকারে সঙ্গে সঙ্গে আসিলেও কিছুতেই আমাদিগকে ধরিতে পারিবেন না।" মাজিষ্ট্রেট সাহেব এ কথায় কর্ণ পাতও করিলেন না। আর একটু ত্রস্তে যাইয়া একেবারে লাঠিয়ালদিগকে ধরিবার উপক্রম করিলেন। লাঠিয়ালগণ তখন উচ্চৈঃস্বরে ডাক ভাঙ্গিয়া "আনি" বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিল :—"ভাই সকল, আর দেখ কি? বাঁচিবার আশা ত নাই। হাতে অস্ত্র থাকিতে রাখালের হাতে ধরা পড়িব, বড়ই দুঃখের কথা! সাহেব কিছুতেই যখন শুনিতেছেন না, আমাদের কথা মানিতেছেন না, এত মিনতি, এত কাকুতি করিয়া বলিলাম, কিছুতেই যখন তাঁহার মত ফিরিল না, তখন স্ত্রীলোকের ন্যায় কান্নাকাটি করিয়া মরি কেন? ধর দারগা। ধর্ জমাদার বরকন্দাজ, নে মাথা, নে এ বেটার মাথা, একে একে দেখিয়া দেই। আয়, আমাদিগকে ধরিয়া নিয়ে যা। দেখি তোদের বুকের পাটা, দেখি তোদের বুকের সাহস। আয় বেটা, কেনীর গোলাম! হারামখোর, আয়! ধর দেখি কা'কে ধরবি! আয়!" মাজিষ্ট্রেট সাহেব ক্রোধে অধীর হইয়া মহম্মদবক্সকে পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন, "পাক্‌ড়ো পাক্‌ড়ো, ডাকু লোককো পাক্‌ড়ো।" সাহেবের আজ্ঞায় মহম্মদ একটু অগ্রসর হইলেই মাজিষ্ট্রেট সাহেব দেখিলেন যে একজন লাঠিয়াল ঢাল মাথায় করিয়া রি রি শব্দ করিতে করিতে আসিয়া মহম্মদবক্সের বক্ষে সড়কী মারিয়া পিঠ পার করিয়া দিল। পলক ফেলিতে ফেলিতে ৮ গাছি সড়কী মহম্মদবক্সের বুকপিঠ পার হইয়া রক্ত-মুখে বাহির হইল। অন্য দিকে আর এক জন বরকন্দাজের মাথা লাঠির আঘাতে ফাটিয়া গেল। সাহেব সকলের পাছে, কিন্তু চক্ষু সকলের অগ্রে চারিদিকে ঘুরিতেছে। নজর পড়িল, তিন চারি গাছা সড়কী তাহার মস্তক বক্ষ লক্ষ্য করিয়া উঠিতেছে। সাহেব

মহম্মদবক্সের অবস্থা দেখিয়াই একপ্রকার চৈতন্য হারাইয়াছেন। কোন্ দিকে কোন্ পথে যাইবেন, সে পথ খুঁজিয়া পাইতেছেন না। দেখিতে দেখিতে সম্মুখে আর একজন বরকন্দাজ পড়িয়া গেল। সাহেব অশ্বকে সজোরে কশাঘাত করিয়া চক্ষের পলকে বাতাসের আগে উড়িয়া বহুদূরে আসিয়া পড়িলেন। জমাদার, বরকন্দাজ এবং চৌকীদারেরা লাঠিয়ালদিগের হাতে পায়ে ধরিয়া আত্মরক্ষা করিল। কিন্তু মহম্মদের মৃতদেহ লাঠিয়ালেরা পশ্চাতে ফেলিয়া গেল না। প্রায় পঞ্চাশ গাছা সড়কীর আগায় গাঁথিয়া ডাক ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে মার মার শব্দে চলিয়া গেল। যেখান হইতে আসিয়াছিল সেইখানে চলিয়া গেল। দারগার লাস লইয়া চলিয়া গেল। মহম্মদবক্সের মৃতদেহ প্যারীসুন্দরীর ভারলের কাছারীতে লইয়া গেলে, কার্য্যকারক মহাশয় ভীত হইলেন না। সাহসের উপর নির্ভর করিয়া কর্ত্তব্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু মুখে বলিলেন, "সর্ব্বনাশ! দারগা খুন! বড় ভয়ানক কথা!"

লাঠিয়ালেরা বলিল, "দারগা খুন সহজ কথা! যে বিপাকে পড়িয়াছিলাম, যে কাজে আজ আপনি আমাদিগকে ফেলিয়াছিলেন, আর একটু থাকিলে মাজিষ্ট্রেট সাহেবকেই এই অবস্থায় দেখিতে পাইতেন। কি করি, প্রাণের দায় মহাদায়! যাহা হইবার হইয়াছে, এক্ষণে যাহাতে আমরা বাঁচি তাহার উপায় করুন। মাজিষ্ট্রেটকেও তাড়াইয়াছি। দারগার দশা আপনি স্বচক্ষেই দেখিতেছেন। বাঁচিবার আশা যে আর নাই তাহা বুঝিয়াই আপাততঃ রক্ষার এক উপায় করিয়া আসিয়াছি মাত্র। আমরা বিদায় হইলাম। আর আমাদের দেখা পাইবেন না। এখন আপনাদের রক্ষার পথ আপনারা দেখুন। আমরা বিদায়। যদি প্রাণে বাঁচি, হুজুরে হাজির হইব। নতুবা এই শেষ দেখা, শেষ বিদায়। আমরা চলিলাম।" এই কথা বলিয়াই লাঠিয়ালেরা ঢাল, সড়কী ফেলিয়া তখনই চলিয়া গেল। কাছারীর আঙ্গিনায় মৃতদেহ পড়িয়া রহিল। কার্য্যকারক মহাশয় কি করিবেন! কোথাকার খুন কোথায় আসিয়া পড়িল কাহার খুন কাহার ঘাড়ে চাপিল। যাহারা খুন করিল তাহার ত চম্পট দিয়াছে। তাহাদের কাহার বাড়ী কোথায়, কি নাম কাহারও জানা নাই। সকলেই অচেনা। মহম্মদবক্সের শরীর সহস্র খণ্ডে খণ্ডিত হইয়া চাপাইগাছির বিলের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইল। প্রকাণ্ড বিল, কোথায় কোন্ মাছ বা কচ্ছপের উদরে গিয়া পড়িল, কে বলিতে পারে? কাল মহম্মদবক্স পাবনায়, আজ মৎস্য কচ্ছপের উদরে!

মাজিষ্ট্রেট সাহেব কুঠীতে আসিয়াই শুইয়া পড়িয়াছেন। নিদ্রার কোলে অচেতন হন নাই। মনে মনে নানা চিন্তা। মহম্মদবক্সের পরিণাম দশা, পরাধীনতার প্রত্যক্ষ প্রতিফল! চাকুরীর দায়ে প্রাণ বিয়োগ! কি উপায়ে অপরাধিগণকে ধৃত করিয়া শাস্তি দিবেন, বুঝি এই সকল চিন্তাই চক্ষু বুজিয়া করিতেছিলেন। কিছুক্ষণ পরে জমাদার বরকন্দাজ প্রভৃতি সঙ্গীয় লোকজন আসিয়া জুটিল। সাহেব সংবাদ পাইয়া শয্যা হইতে উঠিলেন। এবং জমাদারকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহম্মদবক্সের লাস কি হইল?" জমাদার উত্তর করিল, "ধর্ম্মাবতার! লাস শূন্যে শূন্যে যে কোথায় লইয়া গেল, তাহার কোন সন্ধানই করিতে পারি নাই। নিজের প্রাণ লইয়াই পালাইয়াছি। লাসের শেষ অবস্থা কিছুই জানিতে পারি নাই।"

মাজিষ্ট্রেট সাহেব একটু চিন্তা করিয়া কুঠীর হেফাজতে জমাদার, বরকন্দাজ প্রভৃতিকে মতাইন রাখিয়া তখনই জিলায় চলিয়া গেলেন।

(৮)

কুঠী-লুটের মোকদ্দমায় হাজিরা আসামীগণের ফাটক হইয়াছে। দারগা-খুনের মোকদ্দমায় আসামী হাজির হয় নাই, গ্রেপ্তারও হয় নাই। কিছুই সন্ধান হইতেছে না। সরকার বাহাদুর প্যারীসুন্দরীর সমুদয় জমিদারী ক্রোক করিয়া অছি সরবাহকার নিযুক্ত করিয়াছেন। প্যারীসুন্দরী সদর দেওয়ানীতে আপীল করিয়া বহু তদবীর, বহু যত্ন, বহু পরিশ্রম, বহু অর্থব্যয়ে জমিদারী খালাস করিয়াছেন। নিরপরাধ কয়েকজন আমলা বিনা অপরাধে, দোষী সাব্যস্তে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরিত হইল। রামলোচন খালাস পাইলেন। প্যারীসুন্দরী জমিদারীর কতক অংশ পত্তনী ইত্যাদি বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া ঋণদায় হইতে মুক্ত হইলেন। আয়ের শ্রেষ্ঠ অংশই কমিয়া গেল! (সমাপ্ত)

স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র দত্ত।

এই সংসারে পাপ, দুর্নীতি ও হিংসা বিদ্বেষের কিছুমাত্র অভাব নাই। কিন্তু ইহার মধ্যেও এক এক জন মানুষ ধর্ম্মের বিমল রশ্মিতে মণ্ডিত হইয়া, জীবনে এমন সরলতা, পবিত্রতা, এমন ভক্তি ও করুণার পরিচয় দেন যে, তখন আর এই সংসারকে স্বর্গ মনে না করিয়া থাকা যায় না। অরণ্যের সহস্র সহস্র বন্য বৃক্ষের পার্শ্বে, এক একটি কুসুমিত তরু যেমন আপনার পুষ্পাভরণে ও সুঘ্রাণে বনস্থলীকে রমণীয় করিয়া তোলে, তেমনি সহস্র সহস্র সাধারণ মানুষের মধ্যে এক একটি ভক্ত-জীবন পবিত্রতার সৌন্দর্য্যে এবং প্রীতির মাধুর্য্যে মানবসমাজকে সুন্দর ও মনোহর করিয়া তোলে।

সংসারকে যে এত মলিন ও দুঃখময় বলিয়া মনে হয়, তাহার কারণ কি? কারণ মানুষের পাপ এবং দুর্নীতি। মানুষ আপন হৃদয়ের কলঙ্ক-কালিমায় যখন বিশ্বছবিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, তখনই এই বিশ্বের কদর্য্য চেহারা দেখিয়া আর এখানে থাকিতে ইচ্ছা হয় না। কিন্তু আবার একটি সাধু পুরুষ জন্ম গ্রহণ করিয়া আপনার নির্ম্মল আত্মার অমল রশ্মিতে যখন বিশ্বছবিকে রঞ্জিত করিয়া তোলেন এবং এই পৃথিবীর আকাশে ধ্রুবনক্ষত্রের ন্যায় মানব জীবনের একটি উন্নত আদর্শ অঙ্কিত করিয়া দেন, তখন এই জগৎকে কত পবিত্র এবং এই জীবনকে কত স্পৃহণীয় বলিয়া মনে হয়!

এই বাঙ্গলা দেশে অগণ্য লোকের সঙ্গে মিশিয়া অনেক কুৎসিত দৃশ্য দেখিয়াছি, অনেক মানুষের পাপাচার, নিষ্ঠুরতা ও নীচতা দেখিয়া পৃথিবীকে অনেক বার ঘৃণা করিয়াছি। এবং এই মানব-জীবনকেও জঘন্য বলিয়া মনে করিয়াছি। কিন্তু ইহার মধ্যেই আবার এমন কতকগুলি নির্ম্মলচরিত্র ঈশ্বরভক্ত ও ত্যাগী পুরুষের সংসর্গে আসিয়াছিলাম যে, তাঁহাদের ভক্তিবিকশিত পুণ্যোজ্জ্বল জীবনের শুভ্র জ্যোতিতে আমাদের নয়নের আঁধার কাটিয়া গিয়াছে; আমরা এই জগতের কৃষ্ণবর্ণ যবনিকাকে সরাইয়া দিয়া, ইহার দিব্য স্বরূপ ও সত্তা দেখিতে সমর্থ হইয়াছি; এবং এই দুর্লভ মানব জন্ম যে ঈশ্বরের নির্দ্দয় পরিহাস নহে, ইহার ভিতর দিয়া যে তাঁহারই অপূর্ব্ব সৃষ্টিলীলা অভিব্যক্ত, তাহাও বুঝিতে পারিয়াছি।

ঐ সকল ঈশ্বরভক্ত ও ত্যাগী পুরুষদিগের মধ্যে স্বর্গীয় সাধু উমেশচন্দ্রের নামোল্লেখ করিতে পারি। গত অষ্টাদশ বৎসর পর্য্যন্ত উৎসব-ক্ষেত্রে, উপাসনালয়ে, নানা স্থানে নানা প্রকার অনুষ্ঠানে ও সাহিত্য-সেবায় তাঁহার সঙ্গে মিশিয়াছি, তাঁহার স্নেহ এবং উপদেশ লাভ করিয়াছি। এবং তাঁহার অটল ধর্ম্মনিষ্ঠা অদম্য কর্ম্মোৎসাহ এবং বিনয়, বৈরাগ্য, দীনতা ও অকপট ভক্তি দেখিয়া তাঁহাকে ভক্তি করিয়াছি। এই ধর্ম্মহীনতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার দিনে তাঁহার তুল্য একজন সাধুপ্রকৃতির লোকের নির্ম্মল চরিত্রকে দেশের মূল্যবান সম্পত্তি বলিয়া মনে করিয়াছি।

বর্ত্তমান সময় পাশ্চাত্য আদর্শ আমাদের সুকোমল মর্ম্মস্থল হইতে, সুকুমার ঈশ্বরভক্তিকে একেবারে সরাইয়া দিয়াছে; অন্তরের নির্ম্মল বৈরাগ্য ও দীনতা দিন দিনই হ্রাস পাইতেছে, তৎপরিবর্ত্তে ভোগের বাসনা, ঔদ্ধত্য প্রবল হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু উমেশচন্দ্র ইংরাজী শিক্ষায় সুশিক্ষিত হইয়াও যে আত্মার নিভৃত অন্তঃপুরে সুনির্ম্মলা ভক্তিকে রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন, এবং পক্ষিণী মাতা ঝড়ের মধ্যেও যেরূপ আপনার শাবকটীকে বুকে চাপিয়া ধরে, তেমনি যে পাশ্চাত্য ভাবের ঝড়ের মধ্যেও আপনার চরিত্রের নির্ম্মলতা, বৈরাগ্য ও দীনতা জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছিলেন, ইহাতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, তাঁহার ক্ষুদ্র দেহের মধ্যে কি বলিষ্ঠ আত্মা বিরাজ করিত। এই আত্মার বলেই তাঁহার জীবন আমাদের নিকট অতিশয় মূল্যবান সামগ্রীরূপে প্রকাশিত হইয়াছে।

এদেশের অতি দুর্ভাগ্য যে লোকেরা এমন মূল্যবান জীবনেরও সম্পূর্ণ সমাদর করিতে শেখে নাই। দেশের লোক ধনকে সম্মান করিতে শিখিতেছে, উচ্চপদকে সম্মান করিতে শিখিতেছে, কিন্তু পুণ্যাত্মা লোকদিগের অমূল্য চরিত্রই যে যথার্থ জাতীয় সম্পদ, তাহা বুঝিতে পারিতেছে না। সেই জন্যই উমেশচন্দ্রকে দেশের অধিকাংশ লোকেই চিনিতে এবং ভক্তি করিতে পারে নাই; শুধুই একদল নরনারী—তাঁহাদের অধিকাংশই ব্রাহ্ম-সম্প্রদায়ভুক্ত—তাঁহার চরণে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছে।
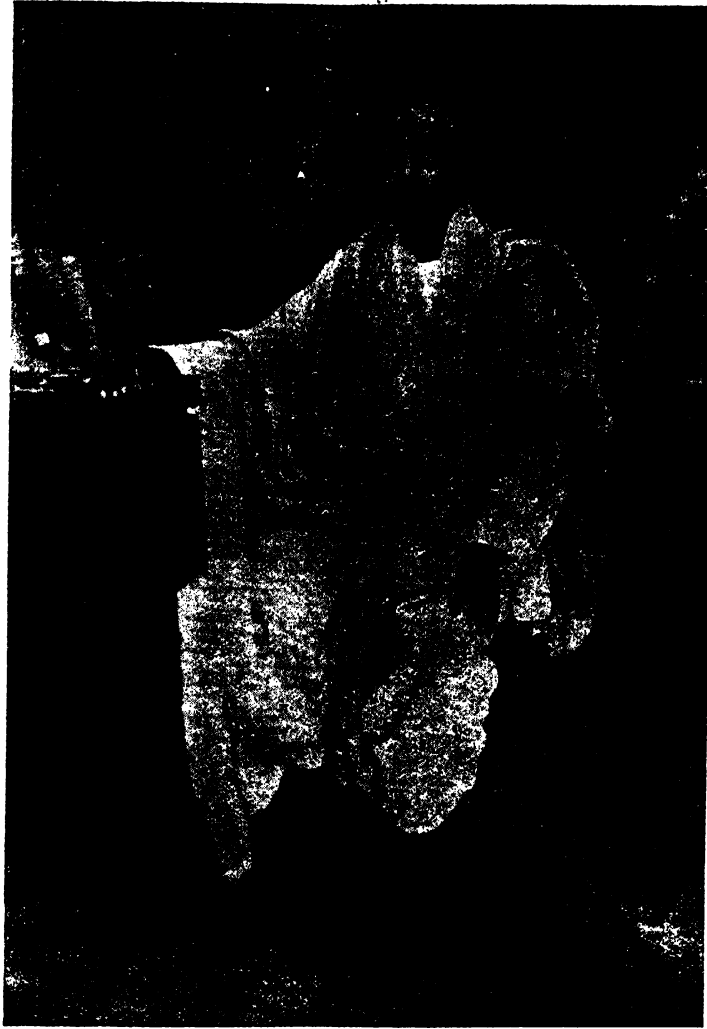
স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র দত্ত।

কিন্তু এদেশের সমস্ত পুরুষ উমেশচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধা অর্পণ করুন বা না করুন, এদেশের সমস্ত নারীর কৃতজ্ঞ অন্তরে তাঁহার নামোচ্চারণ করা আবশ্যক। বাঙ্গলা দেশের অনেক দুঃখ দৈন্য আছে, তাহা দূর করিবার জন্য লোকের চেষ্টাও আছে। কিন্তু বঙ্গমহিলার যে অশেষ দুর্গতি, তাহা দূর করিবার জন্য কয়জন লোক চেষ্টা করিয়া থাকেন? এই উন্নত সভ্যতার যুগে, হাজার হাজার শিক্ষিত লোকের চোখের সাম্‌নে, লক্ষ লক্ষ নারী জ্ঞান, ধর্ম্ম, স্বাধীনতা ও সর্ব্বপ্রকার উন্নত সুখ হইতে বঞ্চিতা হইয়া রহিয়াছে, অথচ শিক্ষিত লোকদিগের হৃদয় তাঁহাদের বেদনায় ব্যথিত হইয়া উঠে না। ব্যথিত হওয়া ত দূরের কথা, বরং যাঁহারা নারীজাতির দুঃখ দুর্দ্দশা দূর করিবার জন্য যত্নবান হন, এবং যে সকল রমণী তাঁহাদের যত্নে শিক্ষা ও স্বাধীনতা লাভ করেন,—দেশের সাহিত্যে, সংবাদ পত্রে, নাটকে, উপন্যাসে তাঁহাদের নিন্দার আর সীমা পরিসীমা থাকে না!

হায় বাঙ্গলা দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ, তোমরা এই রকম করিয়াই কি দেশকে উন্নত করিবে? যে নারীজাতি সমস্ত দেশের অর্দ্ধাংশ অধিকার করিয়া আছে, যে নারীজাতির মাতৃত্ব ও মহত্ত্বের উপর আমাদের জীবন নির্ভর করিতেছে, যে নারীজাতির সুশিক্ষা ভিন্ন দেশের বালক বালিকাদিগের উন্নত হইবার আর উপায় নাই,—সেই নারীদিগকে দাসীত্বে নিযুক্ত রাখিয়া তোমরা দাসত্ব হইতে মুক্তিলাভ করিবে? বৃথা আশা!

এই কথাটা উমেশচন্দ্র বুঝিয়াছিলেন। এবং তাঁহার পরদুঃখকাতর করুণ হৃদয় রমণীদিগের দুঃখে কাঁদিয়াছিল, সেই জন্য সমস্ত জীবন তিনি তাহাদিগের উন্নতির জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। সেই যে চুয়াল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে মহিলাদের সুশিক্ষার জন্য "বামাবোধিনী পত্রিকা" প্রচার করিয়াছিলেন,—অবস্থার পরিবর্ত্তনে, রোগের আক্রমণে, অর্থের অভাবেও সেই বামবোধিনী পরিচালনে তিনি কিছুমাত্র শিথিল ভাব প্রকাশ করেন নাই। তিনি স্ত্রীশিক্ষার কিরূপ উৎসাহদাতা ছিলেন; তাহাও ঐ বামাবোধিনী পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়। আমরা জানি, তিনি অর্থ ব্যয় করিয়াও বামাবোধিনীর জন্য প্রবন্ধ গ্রহণ করিতেন। তিনি ইচ্ছা করিলেই বামাবোধিনীর অনেক অর্দ্ধশিক্ষিত নারীর অসার রচনা বর্জ্জন করিয়া, কাগজ খানিকে উৎকৃষ্ট করিয়া তুলিতে পারিতেন। কিন্তু ঐ সকল অসার রচনা প্রকাশ করিলে লেখিকাগণ উৎসাহান্বিতা হইয়া প্রবন্ধ ও কবিতা রচনায় মনোনিবেশ করিবেন এবং এক সময় তাঁহারাই সুলেখিকা হইয়া উঠিবেন, এই জন্যই উহা মুদ্রিত করিয়া বামাবোধিনীর কলেবর পূর্ণ করিতেন। আমার বোধ হয় শ্রদ্ধেয়া মানকুমারী দেবীর ন্যায় অনেক মহিলাই উমেশচন্দ্রের উৎসাহে সুলেখিকা ও গ্রন্থকর্ত্রী হইয়াছেন।

উমেশচন্দ্র বিশেষ ভাবে মহিলাদিগেরই শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। এনিমিত্ত "ভারত-মহিলায়" বিস্তৃতভাবে তাঁহার জীবন আলোচনা করিতেছি। এই উমেশচন্দ্র সাতষট্টি বৎসর পূর্ব্বে চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত মজিলপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। আট বৎসর বয়সেই তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। গৃহে জননী ছিলেন। তাঁহার ধর্ম্মনিষ্ঠা, কর্ত্তব্য-পরায়ণতা এবং গৃহকার্য্যে নিপুণতার জন্যই উমেশচন্দ্রের বাল্যজীবন কষ্টে সৃষ্টে এক রকম করিয়া কাটিয়াছিল। উমেশচন্দ্রের যেমন ধীর শান্ত প্রকৃতি, তেমনি লেখা পড়ায় তাঁহার অতিশয় মনোযোগ ছিল। তিনি ভবানীপুরের লণ্ডন মিশনারী কলেজ হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া একটি বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বৃত্তি পাওয়ার পর কলিকাতায় কলেজে পড়িতে আরম্ভ করেন। কিন্তু তাঁহার গৃহের অবস্থা এত খারাপ ছিল যে, এই পাঠ্যাবস্থায় বাড়ীতে অর্থ সাহায্য করা প্রয়োজন হইয়া পড়ে। সে জন্য উমেশচন্দ্র একটা বাড়ীর একটি নীচের ঘর ভাড়া করিয়া অতিশয় দীন ভাবে দিন যাপন করিতেন, স্বহস্তে রান্না করিয়া আহার করিতেন এবং কোন কোন জায়গায় ছেলে পড়াইয়া কিছু উপার্জ্জন করিয়া বাড়ীতে অর্থ সাহায্য করিতেন।

এত কষ্ট করিয়াও তিনি পড়াশুনার সম্পূর্ণ সুবিধা করিতে পারিলেন না। তিনি যে বাড়ীতে থাকিতেন, সেখানে অনেক উচ্চৃঙ্খলপ্রকৃতির লোক বাস করিত। তাহারা সুরাপান করিয়া উমেশচন্দ্রের প্রতি নানারূপ উপদ্রব করিত, পড়া শুনায় বিঘ্ন জন্মাইত। কিন্তু দৃঢ়চিত্ত ও প্রশান্তপ্রকৃতি উমেশচন্দ্র নীরবে সকল উপদ্রব সহ্য করিয়া অনবরত অধ্যয়নেই নিযুক্ত থাকিতেন। তৎপরে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায়, কলেজ ত্যাগ করিয়া সামান্য একটি

কর্ম্ম গ্রহণ করেন। এই কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইহার পর হিন্দুস্কুলে, বেথুন কলেজে, হরিনাভি স্কুলে শিক্ষকতার কার্য্য করিয়া, ১৮৭৯ সালে যখন সিটিস্কুল স্থাপিত হয়, তখন তিনি তাহার প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। ঐ স্কুল কলেজে পরিণত হইলে উমেশচন্দ্রই তাহার অধ্যক্ষ হন।

একটি মুদিত পুষ্পকোরকের মধ্যে যেমন তাহার সৌন্দর্য্য ও সৌরভ প্রচ্ছন্ন থাকে, তেমনি বাল্যকাল হইতেই উমেশচন্দ্রের হৃদয়ের নিভৃত স্থানে অকৃত্রিম ধর্ম্মভাব প্রচ্ছন্ন ছিল। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই এই ধর্ম্মভাব বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল। এই ধর্ম্মভাবের আধিক্য বশতঃই বিংশতি বর্ষীয় তরুণ যুবক উমেশচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করেন। যে সময়ের কথা বলা হইতেছে, তৎকালে একটি ভদ্রবংশের যুবককে ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিতে হইলে যে লোকের নিকট কিরূপ ভাবে লাঞ্ছিত হইতে হইত, তাহা আমারা সকলেই জানি। উমেশচন্দ্রকেও ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণের জন্য যথেষ্ট লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল। শুনিয়াছি, একবার তিনি হরিনাভিগ্রামে একটি গৃহে বসিয়া উপাসনা করিতেছিলেন, এমন সময় গ্রাম্যলোকেরা তাঁহাকে ধরিয়া এক বনের মধ্যে ফেলিয়া দিয়াছিল। তিনি বনের বৃক্ষলতার মধ্যে পড়িয়াও ধ্যানস্থ হইয়াছিলেন। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহারই সংসর্গে পড়িয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া, লোকেরা উমেশচন্দ্রের প্রতি এরূপ অত্যাচার করিয়াছিল যে, উমেশচন্দ্র স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া অতি নিঃসম্বল অবস্থায় কলিকাতা আসিয়া উপস্থিত হন।

উমেশচন্দ্র স্বদেশের লোকের দ্বারা অপমানিত, উৎপীড়িত ও লাঞ্ছিত হইয়াও, তাহাদের প্রতি বিরক্ত হন নাই, কিংবা তাহাদের কল্যাণ চিন্তায়ও বিরত হন নাই। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তিনি স্বীয় গ্রামের উন্নতির জন্য চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। এজন্য এখন তাঁহার স্বগ্রামের লোকেরা তাঁহাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করেন।

উমেশচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়া দেশের সামাজিক, আধ্যাত্মিক, রাজনৈতিক এবং সাহিত্যের উন্নতির জন্য নিষ্ঠা ও অনুরাগের সহিত কঠোর শ্রম করিতে আরম্ভ করেন। এই শ্রমের মাত্রা এত অধিক হইয়াছিল যে, বিগত চল্লিশ বৎসরের মধ্যে বাঙ্গলাদেশে যত মহৎকার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে, তিনি তাহার অনেকগুলির সঙ্গেই ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। সকলেই জানেন, উমেশচন্দ্রের দেহ খর্ব্ব এবং শরীর কৃশ ছিল; কিন্তু তাহার অন্তরে কর্ম্মস্পৃহা এমন প্রবল ছিল যে, একমাত্র ইচ্ছাশক্তির জোরেই তিনি দুর্ব্বল শরীর লইয়া বলবান পুরুষের মত নানা সদনুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন।

এরূপ করিতে পারিবার আর একটি কারণ ছিল। উমেশচন্দ্রের দীনদুঃখীর প্রতি প্রবল সহানুভূতি ছিল। দুঃখীর দুঃখে তাঁহার কোমল চিত্ত আর্দ্র হইত। এই জন্যই তিনি অনেক সদনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হইতেন। ইহার দুই একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি।

প্রথমতঃ ইঁহার পরদুঃখকাতর করুণ হৃদয় লোকের যাতনা দেখিয়া কিরূপ বেদনা অনুভব করিত, তাহাই বলি। উমেশচন্দ্রের বাসার নিকটবর্ত্তী কোন কোন দরিদ্রের গৃহে প্লেগ দেখা দিয়াছিল। উমেশচন্দ্র অম্লান বদনে ঐ সকল স্থানের প্লেগ রোগাক্রান্ত রোগীর কাছে গিয়া তাহাদের গায়ে হাত বুলাইতেন, তাহাদের পার্শ্বে বসিয়া ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেন। আমরা কোন বন্ধুর নিকট শুনিয়াছি, তিনি লোকের অজ্ঞাতসারে গরীব দুঃখীর বিস্তর সেবা করিয়াছেন, কিন্তু তিনি লোকের চোখের সাম্‌নে অসহায় বধিরদিগের জন্য যাহা করিয়াছেন এখন তাঁহারই উল্লেখ করিব। এদেশের মূক ও বধিরদিগের দুরবস্থা কাহার না চক্ষে পড়ে? কিন্তু কই? এজন্য দেশের বড় বড় লোকের প্রাণ ত কাঁদিয়া উঠে নাই। উমেশচন্দ্র এবং আর দুচারিজন লোকেরই প্রাণ কাঁদিয়া উঠিয়াছিল। সেজন্য এদেশের মূক ও বধিরদিগের দুঃখ বহু পরিমাণে মোচন হইল। তাঁহাদের শিক্ষা ও সুখের জন্য কলিকাতায় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল। এই বিদ্যালয় এবং অট্টালিকাকে উমেশচন্দ্রের এক প্রধান কীর্ত্তি বলিয়া বর্ণনা করা যাইতে পারে। উমেশচন্দ্রের গরীব দুঃখীর প্রতি সহানুভূতি কেবল এই একটি কার্য্যেই শেষ হয় নাই। তাঁহার সহায়তায় গরীবের সাহায্যের জন্য "অনাথ-বন্ধু সমিতি" নামক একটী দাতব্য ভাণ্ডারও সংস্থাপিত হইয়াছিল।

ঐ দাতব্য ভাণ্ডার হইতে অনেক দুঃখী সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছে।

উমেশচন্দ্র দুঃখীর দুঃখে কাতর হইতেন বলিয়াই হয়ত নারীজাতির উন্নতির জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। এই বড় এক আশ্চর্য্য ব্যাপার যে, এদেশে যাঁহার হৃদয় দুঃখীর জন্য কাঁদিয়া উঠিয়াছে, তাঁহার অন্তঃকরণই নারীজাতির উন্নতির জন্য আকুল হইয়া উঠিয়াছে। স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় ইহার এক প্রধান দৃষ্টান্ত।

কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা উমেশচন্দ্রের ঈশ্বরানুরাগই উল্লেখযোগ্য। মধুপায়ী মক্ষিকা যেমন মধুপূর্ণ পুষ্পটিতে সংলগ্ন হইয়া থাকে, তেমনি উমেশচন্দ্র ব্রহ্মের চিন্ময় স্বরূপে সর্ব্বদা সংলগ্ন হইয়া থাকিতেন। অনেকে মনে করেন, নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা করা যায় না, তাহাতে অন্তরের ভক্তিরস উচ্ছ্বলিত হয় না এবং তদ্দ্বারা প্রকৃত ভূমানন্দলাভ করা যায় না। কিন্তু তাঁহারা যদি একবার দেখিতেন যে, পক্ষী বৃক্ষের শাখায় বসিয়া ফলের মিষ্টরস পান করিতে করিতে যেমন পুলকে পূর্ণ হইয়া উঠে, তেমনি উমেশচন্দ্র নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনায় বসিয়া ভক্তিরস পান করিতে করিতে আনন্দোচ্ছ্বাসে পূর্ণ হইয়া উঠিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের মতের পরিবর্ত্তন হইত। এক একবার এমনও দেখা গিয়াছে যে উমেশচন্দ্র ট্রেণে গমনকালে সঙ্গীদের সঙ্গে বাক্যালাপ না করিয়া সমস্ত রজনী ঈশ্বরের ধ্যানে অতিবাহিত করিয়াছেন। ১১ই মাঘ সূর্য্যোদয় হইতে না হইতে ব্রহ্মমন্দিরে প্রবেশ করিতেন, আর রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত অনাহারে থাকিয়া ব্রহ্মোপাসনা, ব্রহ্মধ্যান ও ব্রহ্মের মহিমা বর্ণন করিতেন। "ভারত-মহিলার" সত্ত্বাধিকারী মহাশয়ের কাছে শুনিয়াছি যে, মৃত্যুর সাত দিন পূর্ব্বে দার্জ্জিলিঙ্গে রুগ্ন শরীর লইয়াই তিনি রাত্রি তিনটার সময় উঠিয়া ঈশ্বরের ধ্যানে তন্ময় হইয়া যাইতেন। দার্জ্জিলিঙ্গে তাঁহারা উভয়ে এক গৃহেই বাস করিতেন। রুগ্ন শরীর লইয়া সমস্ত পৌষমাস লোকের দ্বারে দ্বারে ভোর সঙ্কীর্ত্তন করিতেন। এ সকল আমাদের শুনা কথা নয়। ইহা আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। দেখিয়াছি বলিয়াই বলি, এমন অকৃত্রিম ধর্ম্মানুরাগী লোক একালে আর বড় বেশী দেখিতে পাওয়া যায় না।

দেখিতে পাওয়া যায় না বলিয়াই আমরা উমেশচন্দ্রের মৃত্যুকে দেশের এক ভয়ানক দুর্ঘটনা বলিয়া মনে করিতেছি। তিনি গত কয়েক বৎসর যাবৎ বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হইয়াও কর্ম্ম হইতে বিরত হন নাই। তাই তাঁহার রোগ যে কত কঠিন, আমরা তাহা বুঝিতে পারি নাই। স্বাস্থ্যোন্নতির উদ্দেশ্যে তিনি অল্পদিন পূর্ব্বে দার্জ্জিলিং গিয়াছিলেন। ১৭ই জুন সোমবার কলিকাতা ফিরিয়া আসেন। হঠাৎ ১৯শে জুন বুধবার বিকালে শুনিতে পাইলাম, উমেশচন্দ্রের অন্তিম সময় উপস্থিত। তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া তাঁহার বাসায় গেলাম। গিয়া দেখি, যথার্থই তাঁহার পরলোক যাত্রার সময় নিকট হইয়া আসিয়াছে; মৃত্যু তাঁহার জীবন-পুষ্পকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিবার জন্য দুই নির্দ্দয় হস্ত প্রসারিত করিয়াছে। রাত্রি ১১টার সময়ই চিরদিনের জন্য তাঁহার জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইল। তাহার পরদিন মৃতদেহ চন্দনে চর্চ্চিত ও পুষ্পমাল্যে ভূষিত করিয়া গঙ্গাতীরে শ্মশানে লইয়া যাওয়া হইল। সেখানে বিস্তর পুরুষ ও রমণী উপস্থিত হইয়া স্বর্গীয় আত্মার উদ্দেশে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিলেন। তৎপরে মৃতদেহ চিতার উপরে উঠাইয়া দেওয়া হইল। দেখিতে দেখিতে সেই পবিত্র দেহ চিতানলে ভস্মীভূত হইয়া গেল। দেহ ভস্মীভূত হইল বটে, কিন্তু তাঁহার অমর আত্মার পবিত্র স্মৃতি অক্ষয় অক্ষরে পৃথিবীর বুকে অঙ্কিত হইয়া থাকিবে।

শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত।

চিত্রের কথা।

ধর্ম্মবিশ্বাসের জন্য জগতের কত লোককে যে প্রাণ দিতে হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। বৌদ্ধ প্রাধান্যের পর শঙ্করাচার্য্যের প্রভাবে হিন্দুধর্ম্ম যখন এ দেশে পুনঃ প্রাধান্য লাভ করিতে আরম্ভ করে তখন শত শত বৌদ্ধের মাথা কাটিয়া ঢেঁকিতে তাহা চূর্ণ করা হইয়াছিল। খ্রীষ্টান ও মুসলমান ধর্ম্মের ইতিহাস ত এই প্রকার হত্যাকাহিনীতে পূর্ণ। বর্ত্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত "কৃপা-ভিক্ষা" চিত্রটী ফরাসী ইতিহাসের একটী ঘটনা অবলম্বনে অঙ্কিত। ১৬শ শতাব্দীতে ফরাসী দেশে প্রোটেষ্টাণ্ট মতাবলম্বী খ্রীষ্টানদলের সংখ্যা যখন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল তখন রোমানক্যাথলিকদল "সেণ্ট বারথোলমিউ" নামক পর্ব্বদিনে প্রায় দশ লক্ষ প্রোটেষ্টাণ্টকে হত্যা করে। বর্ত্তমান চিত্রে, নিষ্কাশিত তরবারিহস্তে একজন ক্যাথলিক সেনানী জনৈক বিশ্বাসী প্রোটেষ্টাণ্টকে হত্যা করিতে যাইতেছে, প্রোটেষ্টাণ্টটীর তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই, কিন্তু জনৈক ক্যাথলিক সন্ন্যাসিনীর প্রাণ এই দৃশ্যে অস্থির হইয়াছে। তিনি স্বধর্ম্মাবলম্বী হত্যাকারীকে বিধর্ম্মীর প্রাণসংহারে প্রতিনিবৃত্ত হইতে কাতরে অনুনয় করিতেছেন।

সার-সংগ্রহ।

এখন হইতে আমরা ইংরেজী ও বাংলা পত্রিকাদি হইতে ভারত-মহিলার উপযোগী প্রবন্ধাদির সার-সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিব।

প্রবাসী—বৈশাখ। চীনের বৃদ্ধা সম্রাজ্ঞী—শ্রীযুক্ত রামলাল সরকার "পেকিন রাজপুরী" প্রবন্ধে এবার বৃদ্ধা সম্রাজ্ঞীর বিবরণ দিয়াছেন। উচ্চবংশীয় কুমারী মাঞ্চুরমণীগণ তাঁহাদের সমসাময়িক সম্রাট ও সম্রাট-মাতার নিকট উপহার স্বরূপ প্রেরিত হইয়া থাকেন এবং সম্রাট ও বৃদ্ধা সম্রাজ্ঞীর বাছনি মত যাঁহাকে ইচ্ছা তাঁহাকেই সম্রাটের নিম্নশ্রেণীস্থ পত্নীস্বরূপ গ্রহণ করা হইয়া থাকে। (ইহারাও এক প্রকার বিবাহিতা স্ত্রী, Secondary wife. পাটরাণীর নিম্নে ইঁহাদের স্থান।) প্রায় ১৭।১৮ বৎসর বয়সের সময় বর্ত্তমান বৃদ্ধা মহারাণী তৎকালীন সম্রাটমাতা ও সম্রাটের নিকট প্রেরিত হইয়াছিলেন। তাঁহার সৌন্দর্য্য, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, প্রত্যুৎপন্নমতি এবং মনোমোহন ভাব ও উচ্চবংশ প্রভৃতি গুণের সমবায়ে তাঁহাকে তৎকালীন সম্রাটের অন্যতমা মহিষীরূপে নির্ব্বাচন করা হইয়াছিল। অতি অল্পকাল মধ্যেই ইনি নিজগুণে সম্রাটমাতার, সম্রাটের ও পাটরাণীর অত্যন্ত প্রিয়পাত্রী হইয়া উঠিলেন। বিবাহের দুই বৎসর পর ইঁহার এক পুত্র জন্মে এবং এই পুত্রের জন্মের পাঁচ বৎসর পর সম্রাটের (শিয়েন কোংএর) মৃত্যু হয়। এই শিশুপুত্র টুংছি তখন সম্রাটের পদে অভিষিক্ত হন। টুংছির জননী বর্ত্তমান বৃদ্ধা সম্রাজ্ঞী ও মৃত সম্রাটের পাটরাণী একত্র যোগে সম্রাটমাতা (Empress Dowager) নামে অভিহিত হইয়া টুংছির অভিভাবক নিযুক্ত হইলেন। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে পাটরাণীর মৃত্যু হয়। তদবধি বর্ত্তমান বৃদ্ধা মহারাণীই সুবিশাল চীন সাম্রাজ্যের ভাগ্যপরিচালক। ইঁহার নাম জে-শি (Fze-Hsi)। আভ্যন্তরীণ দুর্ব্বলতাবশতঃ চীনে বৈদেশিকগণের প্রাধান্য অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। সৌভাগ্যক্রমে আভ্যন্তরীণ উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই প্রাধান্য ক্রমে বিলুপ্ত হইতেছে। এই বিদেশী রাজগণের সহিত সদ্ভাব রক্ষা করা চীনের পক্ষে এক অতি দুরূহ রাজনৈতিক ব্যাপার। সম্রাট শিয়েন কোংএর মৃত্যুর পর, বিদেশীদিগকে ঘৃণাকারী কতকগুলি রাজকর্ম্মচারী ঘোষণা করিল যে, "আমরাই বালক সম্রাটের অভিভাবক নিযুক্ত হইয়াছি।" রাণীদ্বয়ও যদি সে সময়ে ইহাদের দলে যোগ দিতেন তাহা হইলে রাজ্যমধ্যে ভয়ানক বিপদ ও অরাজকতা উপস্থিত হইত। কারণ এই বিদেশী-দ্বেষিগণ কখনই পেকিনস্থ বিদেশী রাজদূতগণের সঙ্গে একমত হইয়া কার্য্য চালাইতে পারিত না। এই ভয়ানক সঙ্কটকালে কেবলমাত্র আপনার বুদ্ধিবলে সম্রাজ্ঞী কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিলেন। তিনি বিদেশীদ্রোহিদিগকে ভর্ৎসনা করিলেন। ইংরেজও ফরাসীগণের সঙ্গে সন্ধির প্রস্তাব করা হইল। এই অল্পবয়স্কা মহারাণীর সর্ব্বপ্রথম এই রাজনৈতিক বুদ্ধির পরিচয় সমস্ত জগতমধ্যে প্রচারিত হওয়ায় তাঁহার যশঃ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইল এবং রাজ্যের প্রধান প্রধান রাজনৈতিকগণ প্রকৃত পন্থা বুঝিতে পারিলেন। প্রাপ্ত কাউন্সিলের মেম্বরগণ এবং রাজপরিবারের প্রিন্স বা কুমারগণ এই নবীনা রাণীর বুদ্ধি ও ক্ষমতার পরিচয় পাইয়া সুখে ও দুঃখে আজীবন তাঁহার পক্ষসমর্থন করিয়া আসিতেছেন।

অষ্টাদশ বৎসর বয়সে টুংছি বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করিলে, রাণীরা অবসর লইলেন। কিন্তু দুই বৎসর পরেই সম্রাট টুংছি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। এই সাংঘাতিক পুত্রশোকে বর্ত্তমান বৃদ্ধা রাণী প্রাণে বজ্রসম আঘাত পাইলেন এবং শোকে ম্রিয়মাণ হইলেন; কিন্তু অল্পকাল শোক দুঃখে মগ্ন থাকিয়া পুনরায় রাজ্যশাসনের ভার নিজ হস্তে লইলেন। বর্ত্তমান সম্রাট কোয়াংশিকে পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রম কালে সিংহাসনে বসাইয়া রাজ্যশাসন আরম্ভ করিলেন। বর্ত্তমান সম্রাট ইঁহার দেবর ও ভগ্নীপুত্র।

সম্রাজ্ঞীর শাসনকালের সাম্রাজ্যসংক্রান্ত ঘটনা সকল আলোচনা করিলে তাঁহার শাসনক্ষমতা ও দূরদর্শিতার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। যখন রাজ্যমধ্যে বিদ্রোহস্রোত প্রবল বেগে বহিতে লাগিল, তখন তিনি চীন-তরণীর কর্ণধার হইয়া দুই বিরুদ্ধ পথের মধ্য দিয়া তাহা চালাইতে লাগিলেন। যেমন একদিকে জলমগ্ন পাহাড় এবং অপর দিকে ভয়ানক জলাবর্ত্ত থাকিলে এই দুইয়ের মধ্য দিয়া তরণী চালাইতে হইলে প্রতি মুহূর্ত্তেই বিপদের আশঙ্কা করিতে হয়, সেই সময় এই মহারাণীর পক্ষে চীন-রাজ্য-তরণী চালানও তাদৃশ ভয়াবহ কার্য্য হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত বিদেশীয়গণের সঙ্গে রাজনৈতিক ব্যবহারেও অধিকাংশ সময় তিনি বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন।

১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ২৮ বৎসর রাজ্যশাসনের পর সম্রাজ্ঞী বর্ত্তমান সম্রাট কোয়াংশির হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করেন। সম্রাট কোয়াংশি চীনসাম্রাজ্যের আমূল সংস্কার কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। কিন্তু রক্ষণশীল ও উন্নতিশীলদলের মধ্যে ঘোর মতবিরোধ উপস্থিত হওয়ায় সম্রাটের শক্তি প্রতিপদে বাধা প্রাপ্ত হইতে লাগিল। তখন রাজ্যের একদল লোক ভবিষ্যৎ বিপদ গণিয়া বৃদ্ধা রাণীর শরণাপন্ন হইয়া পুনরায় তাঁহার নিজ হস্তে শাসনদণ্ড পরিচালনা করিবার জন্য প্রার্থনা করিলেন। সম্রাজ্ঞী তাহাতে সম্মত হইলেন এবং সম্রাট বাধ্য হইয়া বৃদ্ধা রাণীর আদেশানুযায়ী কার্য্য করিতে স্বীকার করিলেন। বৃদ্ধা সম্রাজ্ঞী যাহাতে অনুমতি দিবেন না সম্রাটের আর তাহা করিবার অধিকার রহিল না।

সম্রাজ্ঞীর বিচারে বহু সংস্কারপ্রার্থী উন্নতিশীল ধৃত হইয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল। কিন্তু রুশ-জাপান যুদ্ধের পর পুনরায় চীনে সংস্কার কার্য্য দ্রুতগতিতে আরম্ভ হইয়াছে। রাজ্ঞী নিজেও যে ভ্রম বুঝিতে না পারিয়াছেন এমন নহে। তাই তিনি এখন বিদেশীদিগকে অপেক্ষাকৃত অধিক ভালবাসিতে আরম্ভ করিয়াছেন, বিদেশীগণের যাহা ভাল তাহা গ্রহণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন।

জগতের ইতিহাসে এই শক্তিশালিনী সম্রাজ্ঞীর কার্য্যকলাপ চিরদিন অপূর্ব্ব নারীপ্রতিভার সাক্ষ্যদান করিবে।

কলিকাতা, ২৫ নং রায়বাগান ষ্ট্রীট, ভারতমিহির যন্ত্রে সান্যাল এণ্ড কোম্পানি দ্বারা মুদ্রিত।
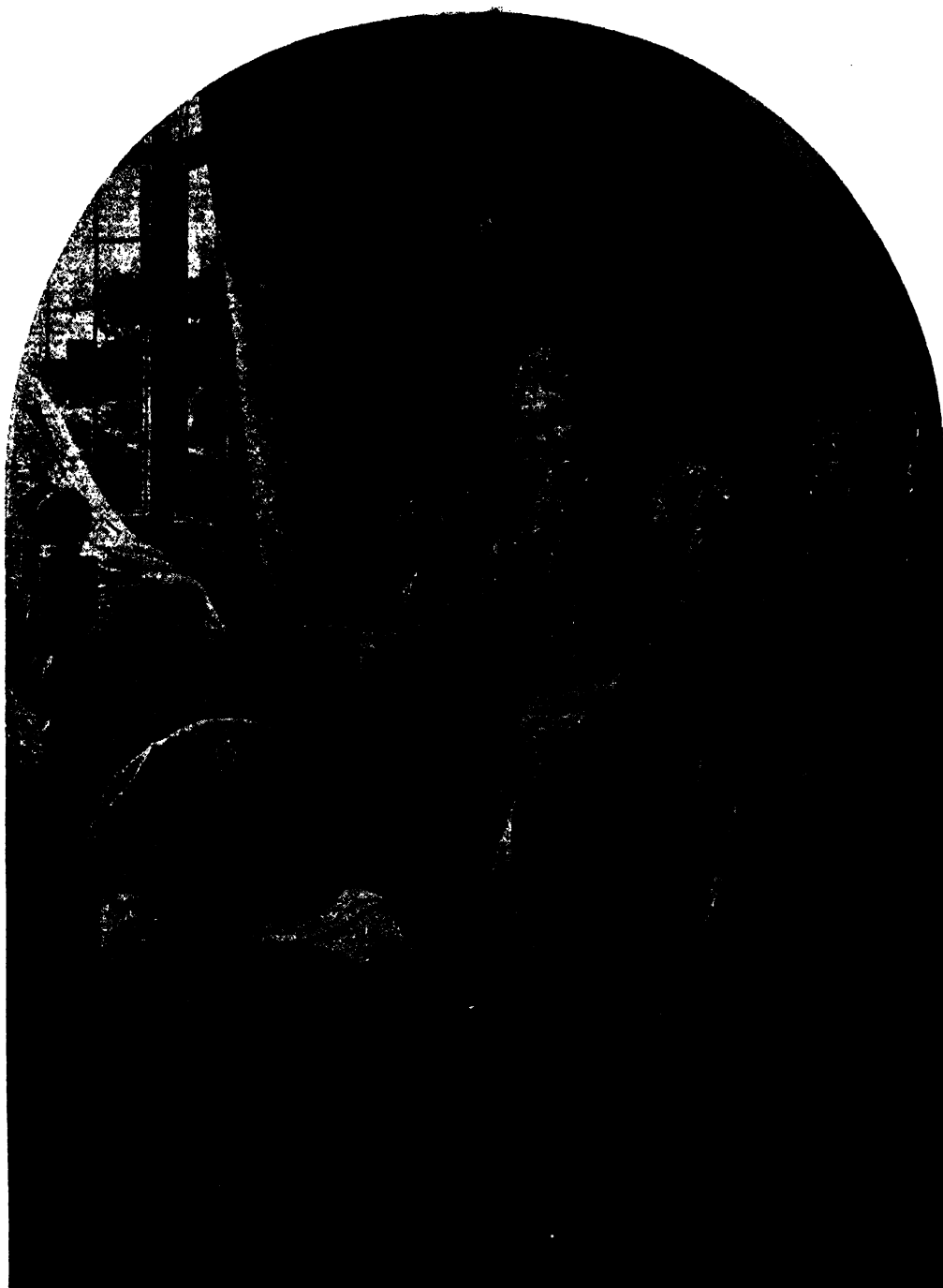
বিরহিনী সৈনিক-পত্নী।

প্রার্থনারতা সৈনিক-পত্নী।

The woman's cause is man's ; they rise or sink
Together, dwarfed or God-like, bond or free ;
If she be small, slight-natured, miserable,
How shall men grow ?

Tennyson.

৩য় ভাগ। | ভাদ্র, ১৩১৪। | ৫মসংখ্যা।

জাগরণ।

ওগো স্বপনের মাঝে দেখা দিয়ে তুমি
মিলালে চকিতে স্বপনে
মনোভবনে !
আমি চকিত পরশে চমকি উঠিয়া
লইনু শরণ চরণে
মনোভবনে !

মুহূর্ত্তের মাঝে একি দেখি আজ,
ফুরাইয়া গেছে ধূলা-খেলা কাজ,
নূতন জীবন লইয়া জাগিনু,
দেখিনু নূতন সকলি ;
মনে হ'ল যেন জীবন যৌবন
কেটেছে বিফলে কেবলি !
ওগো দয়াময়, স্বপনে
কি পরশ দিয়া জাগালে আমারে
ভাঙ্গাইলে ঘুম কেমনে ?

আজ দীর্ঘ সুপ্তি পরে একি জাগরণ—
একি তৃপ্তি আজি জীবনে,
মোর জীবনে !
যেন কুসুম সুবাস, বাঁশরীর স্বর,
ব'হে ল'য়ে আসে পবনে,
আজি জীবনে !

আজি এ হৃদয়ে পরশন তব
চকিতের তরে করি' অনুভব,
বাজিয়া উঠেছে তন্ত্রী সকল
নিমেষে চেতনা লভিয়া ;
আজ যত ছিল অভাব অতৃপ্তি
সকলি গিয়াছে চলিয়া।
করুণার কণাভিখারী
করুণার বিন্দু চাহিয়া পেয়েছে
অপার করুণা তোমারি !

আমি আর কিছু চাহি না, কিছু চাহি না,
সকলি দিয়াছ আপনি,
এত আমি চাহিনি !
না চাহিতে মোর অভাব বুঝেছ,
যাহা আমি কভু বুঝিনি !
আমি চাহিনি !

আপনি দিয়েছ মৃতেরে জীবন,
সে জীবন যেন তোমারি কাজেতে
অর্পিতে পারি হাসিয়া।
তুমি এক মাত্র হৃদয়ের রাজা
নাহি যাই যেন ভুলিয়া।
জীবন-মরণাধিকারি!
যেন এই টুকু মনে রহে, তুমি
জীবনে মরণে আমারি—
আমি তোমারি!

শ্রীমৃন্ময়ী দেবী।

——o——

পুরুষোত্তমের পৌরাণিক ইতিহাস।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

বিদ্যাপতি ভগবান্‌কে দর্শন করিয়া আসিয়াছেন শুনিয়া রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন এবং বলিলেন, "দ্বিজবর! আপনিই আমার উদ্ধার করিলেন। আপনার কৃপায় ভগবানের দর্শন লাভ করিব।" তাহার পর, রাজা অমাত্য, পুরোহিত ও সৈন্য সামন্তসহ বিদ্যাপতিকে লইয়া নীলাচল অভিমুখে যাত্রা করিলেন। অল্প দিনের মধ্যেই রাজা নীলাচলে উপস্থিত হইলেন। বিদ্যাপতি পথপ্রদর্শক হইয়া রাজাকে সেই বটবৃক্ষমূলে লইয়া গেলেন, কিন্তু রাজা সেখানে রৌহিণকুণ্ড এবং নীলমাধব কিছুই দেখিতে পাইলেন না। তখন তিনি বিদ্যাপতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "নীলমাধব কোথায়?" বিদ্যাপতি বলিলেন, "বোধ হয় বসু শবর কোথায় লইয়া গিয়াছে।" তখন শবরকে ধরিয়া আনিবার জন্য রাজপুরুষদের প্রতি আদেশ হইল। রাজপুরুষেরা শবরালয়ে উপস্থিত হইলে বসু শবর কাতরভাবে ভগবানের উদ্দেশে বলিতে লাগিল, "জগদ্বন্ধো! আমার কি শেষে এই দশা করিলে, তোমার আরাধনা করিয়া কি শেষে এই ফল হইল?"

ভক্তাধীন ভগবান্, ভক্তের কাতর ক্রন্দনে তাঁহার হৃদয় গলিল। তখনি ইন্দ্রদ্যুম্নের প্রতি দৈববাণী হইল, "এখন অগ্রে আমার মন্দির নির্ম্মাণ কর, দেবলোক হইতে ব্রহ্মাকে আনিয়া মন্দির প্রতিষ্ঠা কর, তাহার পর আমি দেখা দিব।" তৎক্ষণাৎ রাজার আদেশে রাশি রাশি প্রস্তর আসিয়া পড়িতে লাগিল। বৈশাখ মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে মাহেন্দ্রক্ষণে মন্দিরনির্ম্মাণ আরম্ভ হইল। বহু অর্থব্যয় করিয়া ইন্দ্রদ্যুম্ন মন্দির নির্ম্মাণ শেষ করিলেন। এই সময় নারদ উপস্থিত হইলেন। ইন্দ্রদ্যুম্ন নারদের সহিত তাঁহার ঢেঁকিতে চড়িয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। ব্রহ্মা রাজার অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া বলিলেন, "তুমি ক্ষণকাল অপেক্ষা কর, আমি সন্ধ্যা তর্পণাদি শেষ করিয়া আসি।" ইন্দ্রদ্যুম্ন ব্রহ্মার দ্বারে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন, এদিকে শতাব্দী কাটিয়া গেল। সাগরের তরঙ্গে ইন্দ্রদ্যুম্নের প্রাসাদও ক্রমে ক্রমে বালুকামধ্যে ঢাকা পড়িল। এই সময়ের মধ্যে উড়িষ্যায় বহু রাজা রাজত্ব করিয়া ইহলীলা শেষ করিলেন। তাহার পর, মাধব নামক এক রাজা উৎকলের আধিপত্য প্রাপ্ত হইয়া রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। একদা মাঘমাসের দশমী তিথিতে রাজা মাধব সমুদ্রস্নানে যাইতেছিলেন। অনুচরগণ অগ্রে অগ্রে বালুকা ঠেলিয়া পথ পরিষ্কার করিতে করিতে যাইতেছিল। তাহারা হঠাৎ মন্দিরের চূড়া দেখিতে পাইয়া রাজাকে জানাইল। রাজা ঐ স্থান খনন করিবার জন্য অনুচরদিগকে আদেশ করিলেন। দীর্ঘকাল খননের পর সম্পূর্ণ মন্দির বাহির হইল। রাজা মাধব ভাবিলেন, "বোধ হয় আমার কোন পূর্ব্বপুরুষ মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন। অতএব আমি ইহাতে দেবমূর্ত্তি স্থাপন করিব।"

এদিকে দেবলোকে ব্রহ্মার সন্ধ্যা তর্পণ শেষ হইল। তিনি ইন্দ্রদ্যুম্ন ও নারদের সহিত নীলাচলে আগমন করিলেন। তাঁহারা দেখিলেন, মন্দির পূর্ব্ববৎই রহিয়াছে, কতকগুলি দৌবারিক মন্দিরের দ্বারদেশে অপেক্ষা করিতেছে। তাহারা ব্রহ্মা প্রভৃতিকে মন্দিরে যাইতে নিষেধ করিল, কিন্তু ইন্দ্রদ্যুম্ন তাহাদের কথায় ভ্রূক্ষেপ করিলেন না। তখন দৌবারিকেরা রাজা মাধবকে জানাইল, "ইন্দ্রদ্যুম্ন নামক এক ব্যক্তি আপনার আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিয়াছে।" রাজা মাধব ক্রুদ্ধ হইয়া মন্দিরে আগমন করিলেন এবং ইন্দ্রদ্যুম্নকে বলিলেন, "তোমরা কি জন্য

এখ [illegible] মি দেবতা প্রতিষ্ঠা করিতে আসিয়াছি।" মাধব সদর্পে কহিলেন, "এ মন্দির আমার, তোমার ইহাতে কোন অধিকার নাই।" এইরূপ রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের সহিত রাজা মাধবের ঘোর বিবাদ উপস্থিত হইল। ব্রহ্মা মধ্যস্থ হইয়া বলিলেন, "তোমাদের কাহার কি সাক্ষী আছে?" রাজা মাধব বলিলেন, "আমি নিজে মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছি, তাহার আবার সাক্ষী কি?" ইন্দ্রদ্যুম্ন বলিলেন, "আমার সাক্ষী আছে। প্রথম সাক্ষী ভুষণ্ডী কাক ও দ্বিতীয় সাক্ষী ইন্দ্রদ্যুম্ন-সরোবরবাসী কচ্ছপগণ।" ব্রহ্মা সাক্ষ্য গ্রহণ করিলেন, সকলেই ইন্দ্রদ্যুম্নের অনুকূলে সাক্ষ্য দিল। ব্রহ্মা রাজা মাধবকে বলিলেন, "যাও তুমি মিথ্যাবাদী।"

তাহার পর, ব্রহ্মা মহাসমারোহে মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া ব্রহ্মলোকে প্রস্থান করিলেন। মন্দির প্রতিষ্ঠা হইল বটে কিন্তু কিরূপে দেবতা প্রতিষ্ঠা করিবেন রাজা কেবল তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। একদিন রাত্রিকালে ভগবান্ স্বপ্নে দেখা দিয়া রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নকে বলিলেন, "কল্য প্রভাতে সাগরতীরে যাইবে, সেখানে আমি দারুব্রহ্মরূপে দেখা দিব। পরদিন রাজা সসৈন্যে সাগরতীরে আসিয়া দারুব্রহ্মের (নিম্ববৃক্ষের) দর্শন পাইলেন। তখন সকলে সেই মহাকাষ্ঠকে তীরে তুলিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু কোন প্রকারেই সমর্থ হইল না। এমন কি হস্তী পর্য্যন্ত সেই মহাকাষ্ঠকে নড়াইতে পারিল না। সেই দিন রাত্রিকালে ভগবান্ পুনরায় স্বপ্নে দেখা দিয়া ইন্দ্রদ্যুম্নকে বলিলেন, "ইন্দ্রদ্যুম্ন! ভক্ত ভিন্ন অন্য কেহ এই কাষ্ঠ নড়াইতে পারিবে না। অতএব বসু শবরকে ডাকিয়া আন, সে এবং তুমি স্পর্শ করিলেই কাষ্ঠ উঠিবে।" ভগবানের প্রত্যাদেশমত কার্য্য হইল। মন্দিরের সম্মুখে গরুড়স্তম্ভের নিকট প্রথম দারু (কাষ্ঠ) স্থাপিত হইল। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন বারো শত সূত্রধরকে জগন্নাথমূর্ত্তি নির্ম্মাণের জন্য নিযুক্ত করিলেন। সাত দিন পরে রাজা যখন কিরূপ মূর্ত্তি হইতেছে দেখিতে আসিলেন, তখন সূত্রধরেরা বিনীতভাবে বলিল, "মহারাজ! মূর্ত্তি নির্ম্মাণ দূরে থাকুক, এ কাষ্ঠ ভেদ করাও আমাদের ক্ষমতায়ত্ত নহে।" রাজা ঐ কথা শুনিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং আদেশ করিলেন, "আগামী কল্য মূর্ত্তি প্রস্তুত না হইলে তোমাদের প্রাণদণ্ড হইবে।" সূত্রধরেরা রাজার এই কঠোর আজ্ঞা শুনিয়া হাহাকার করিতে লাগিল। এমন সময় দৈববাণী হইল, "সূত্রধরগণ! ভয় নাই, আমি তোমাদের রক্ষা করিব।" পরদিন ভগবান্ বিশ্বকর্ম্মাকে সূত্রধরবেশে পাঠাইলেন। বিশ্বকর্ম্মা সহসা এক বৃদ্ধ সূত্রধরবেশে রাজদ্বারে উপস্থিত। তাহার পায়ে গোদ, পিঠে কুঁজ, চক্ষে পিচুটী, তাহাতে আবার বধির। দ্বারবানেরা রাজার নিকট বৃদ্ধের আগমনবার্ত্তা জানাইলে রাজা তাহাকে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করিতে অনুমতি দিলেন। মন্ত্রীরা দেখিয়াই উপহাস করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহার সাহঙ্কার উক্তি শুনিয়া রাজা পরীক্ষার্থ তাহাকে মূর্ত্তি নির্ম্মাণের আদেশ করিলেন। রাজা বৃদ্ধকে সঙ্গে করিয়া সেই মহাবৃক্ষের নিকট আনিলেন। বৃদ্ধ নখ দিয়াই সেই বৃক্ষের ছাল তুলিয়া ফেলিল। সকলে দেখিয়া অবাক্। বৃদ্ধ রাজাকে বলিল, "মহারাজ! আমি মন্দিরমধ্যে থাকিয়া মূর্ত্তি প্রস্তুত করিব। ২১ দিন দ্বার রুদ্ধ থাকিবে। এই কয়দিন কেহ দ্বার খুলিতে পারিবে না।" রাজা বৃদ্ধের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

বৃদ্ধ মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিল। রাজা দ্বার রুদ্ধ করিয়া গৃহে চলিয়া গেলেন। রাজার মহিষীর নাম গুণ্ডিচা। রাজা তাঁহাকে বড় আদর করিতেন। তিনি একদিন রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "নাথ! তুমি আমায় জগন্নাথ দেখাইবে বলিয়াছিলে, কৈ দেখাইলে না ত?" রাজা রাণীর নিকট পূর্ব্বের ঘটনা সমস্ত বলিলেন। রাণী হাসিয়া বলিলেন, "বার শত ছুতার যে কাজ করিতে পারিল না, এক বৃদ্ধ কি করিয়া সেই কাজ করিবে? হয়ত সে এত দিনে অনাহারে মরিয়া গিয়াছে।" রাণীর কথা শুনিয়া রাজারও কিছু চিন্তা হইল। তিনি মন্ত্রীর সহিত মন্দিরে গমন করিলেন। দ্বারের কাছে অনেকক্ষণ কাণ পাতিয়া রহিলেন, কিন্তু কোন শব্দ শুনিতে না পাইয়া দ্বার খুলিতে আদেশ দিলেন। তৎক্ষণাৎ দ্বার খোলা হইল, রাজা প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, সিংহাসনের উপরে দারুব্রহ্ম জগন্নাথ বিরাজমান। তাঁহার হস্ত পদ অঙ্গুলি কিছুই নাই। বৃদ্ধ অন্তর্হিত হইয়াছে। রাজা বৃদ্ধকে দেখিতে না পাইয়া প্রথমে বিস্মিত হইলেন। প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়াছেন

ভাবিয়া অত্যন্ত অনুতাপ হইল। শেষে কুশশয্যা রচনা করিয়া অনাহারে শয়ন করিয়া রহিলেন। গভীর রজনীতে জগন্নাথ স্বপ্নে দেখা দিয়া বলিলেন, "রাজন্! তোমার চিন্তা নাই। আমি কলিযুগে হস্তপদবিহীন বুদ্ধরূপে এখানে বিরাজ করিব।" রাজা কৃতাঞ্জলিপুটে জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভো! কে আপনার পূজা করিবে?" জগন্নাথ বলিলেন, "যে বসু শবর আমার সেবা করিত তাহার দৌহিত্র দৈতাপতি শবর আমার সেবা করিবে। বলভদ্র গোত্রীয় শওঅরগণ আমার রন্ধনকার্য্য নির্ব্বাহ করিবে। আমার প্রসাদ সকল বর্ণেই জাতিভেদ ভুলিয়া একত্র বসিয়া আহার করিতে পারিবে।" রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন জগন্নাথের আদেশ অনুযায়ী সেবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।

উপরি উক্ত উপাখ্যানে দেশ-কাল-পাত্রগত সামঞ্জস্য নাই; না থাকুক। তথাপি "নহ্যমূলা জনশ্রুতিঃ"—জনশ্রুতি কখনও অমূলক নহে, এই ন্যায় অনুসারে উহার আংশিক সত্য স্বীকার করা যাইতে পারে। এই উপাখ্যানের বিশ্লেষণ করিতে গেলে অনেক ঐতিহাসিক রহস্য মনোমধ্যে উদিত হয়। এক সময় দক্ষিণাপথ—বিশেষতঃ উৎকল প্রদেশ শবর জাতিতে পরিপূর্ণ ছিল। প্রথম সেই সমুদ্রতীরবর্ত্তী আরণ্যভূভাগস্থ অনার্য্য শবরগণের অধিপতি কর্ত্তৃক নীল প্রস্তরখণ্ডে দেবপূজা। তাহার পর, বিষ্ণুভক্ত আর্য্য নৃপতির শবরগণের প্রসিদ্ধ দেবতার সন্ধানার্থ চরপ্রেরণ। যুবতী শবর-রাজকুমারীর রূপে ব্রাহ্মণ দূতের চিত্তচাঞ্চল্য ও তাহার প্রতি আসক্তি। পরস্পরের আসক্তি জানিয়া শবররাজ কর্ত্তৃক বল পূর্ব্বক বিবাহ সম্পাদন। আর্য্য নৃপতি ইন্দ্রদ্যুম্ন কর্ত্তৃক অনার্য্য দেশ অধিকার ও মন্দির নির্ম্মাণ পূর্ব্বক বিষ্ণুমূর্ত্তি স্থাপন। ইন্দ্রদ্যুম্নের বংশ লোপ। বৌদ্ধ নৃপতি কর্ত্তৃক উৎকল অধিকার ও বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার। বৌদ্ধ কোন নৃপতি ও ইন্দ্রদ্যুম্ন নামধারী কোন পরবর্ত্তী হিন্দু নৃপতিতে পুরাতন মন্দির লইয়া বিবাদ এবং হিন্দু নৃপতির জয়লাভ। প্রাচীন মন্দিরে হিন্দু নৃপতি কর্ত্তৃক বৌদ্ধমূর্ত্তির হিন্দুপদ্ধতিতে অর্চ্চনা, ইত্যাদি অনেক কথা অনুমানের বিষয়ীভূত হইয়া পড়ে।

স্কন্দপুরাণের উৎকল-খণ্ডের রচয়িতা শবরকুমারীর ব্যাপারটা একেবারে উড়াইয়া দিয়াছেন। শবরে ব্রাহ্মণে মিলনটা অশাস্ত্রীয়, তজ্জন্য বোধ হয় ঐ বিষয়ের উল্লেখে তাঁহার প্রবৃত্তি হয় নাই। কিন্তু বিদ্যাপতির কীর্ত্তি অদ্যাপি জাজ্বল্যমান। শবরকন্যা ললিতার নাতি নাতিনীর বংশধরেরা এখনও জগন্নাথের সেবায় নিযুক্ত। এখন যাহারা জগন্নাথের ভোগ পাক করে, তাহাদিগের নাম "শওঅর" কিন্তু উড়িয়ারা উহাদিগকে "শূয়ার" বলে। শওঅরই হউক আর শূয়ারই হউক, ঐ শব্দটি "শবর" শব্দের অপভ্রংশ, তদ্বিষয়ে অতি অল্প সন্দেহ আছে। ইহাদের আকৃতি অনার্য্যোচিত এবং ইহাদিগকে সন্ধ্যা আহ্নিক বা শাস্ত্র পাঠ করিতেও দেখা যায় না। শওঅরেরা অতি পরিশ্রমী। পূর্ব্বে আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না, এখন ক্রমে ভাল হইতেছে। বিশেষ বিশেষ যাত্রা উৎসবে ইহারা প্রতিদিন পঞ্চাশ সহস্র লোকের উপযোগী রন্ধনকার্য্য নির্ব্বাহ করে। জিজ্ঞাসা করিলে বলে, 'বলভদ্র গোত্রীয় ব্রাহ্মণ।' শাস্ত্রে বলভদ্র গোত্রের উল্লেখ দেখা যায় না। পুরী ব্যতীত অন্য কোথায়ও এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণ নাই।

এই প্রবন্ধে প্রত্নতত্ত্বের প্রকৃত ইতিহাসের আলোচনা কিছুই করা হইল না। সময়ান্তরে স্বতন্ত্র প্রবন্ধে ঐ বিষয়ে আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

শ্রীশরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী।

বনিতা-বিনোদ।

দ্বিতীয় বিনোদ।

ক্রোধ-শান্তি।

সকলেই জানেন, যে ক্রোধ অত্যন্ত অহিতকর, উহাতে ক্ষতি ভিন্ন কখনও কোন লাভ হয় না। এই জন্য যতদূর সম্ভব ক্রোধ হইতে দূরে থাকা নিতান্ত দরকার। কিন্তু ক্রোধ-সম্বরণ করা কম কঠিন কাজ নহে। একজন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার বলিয়াছেন, যাঁহার হৃদয়ে মর্ম্মভেদী কথায় কোন ক্লেশ উৎপন্ন হয় না, যাঁহার মোটেই রাগ হয় না, কিংবা যিনি রাগকে অঙ্কুরেই দমন করিতে পারেন, তিনিই প্রকৃতপক্ষে সুধীর ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি। ছোট ছোট কথায় চোক

লাল করিলে মনের দুর্ব্বলতাই প্রকাশ পায়। প্রায়ই দেখা যায়, যে ধনবান লোক অপেক্ষা দরিদ্রের, মোটা সবল লোক অপেক্ষা দুর্ব্বল পাতলা লোকের, সুস্থ ব্যক্তি অপেক্ষা রোগীর, যুবা অপেক্ষা বালক ও বৃদ্ধের—আর পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের রাগ সহজে হয়। সুস্থাবস্থায় যাঁহাদিগকে বেশ শাদা-শিধা এবং আমোদে লোক বলিয়া দেখা যায়, রোগের সময় তাহাদিগকেও খিট্‌খিটে এবং রাগী হইতে দেখা গিয়া থাকে। এই সকল কারণে বেশ বুঝা যায়, যে রাগ দুর্ব্বলতার চিহ্ন এবং যাহাদের মন দুর্ব্বল, তাহারাই বড় রাগী হইয়া থাকে। যে লোক যত গম্ভীর এবং দৃঢ়চিত্ত তাহার রাগও তত কম, আর যে যত "ছেব্‌লা" ও "ছেলেমানুষ" তাহার রাগও তত বেশী। যাহার রাগ যত কম, লোকে তাহাকে তত গম্ভীর ও বুদ্ধিমান বলিয়া সম্মান করিয়া থাকে। "লোকে আমাকে ভাল বলুক" এইরূপ ইচ্ছা অন্তরে পোষণ করেন না, এমন রমণী কোথায়?—তথাপি আপনার রাগ সহজেই দমন করিতে পারেন এরূপ নারীর সংখ্যা খুব কম। ইহা হইতেই প্রমাণ হয়, যে ক্রোধ সম্বরণ করা বড়ই কঠিন কাজ, নচেৎ সকল লোকেই ক্রোধ দমন করিয়া সুনাম ও সুখ্যাতি লাভ করিতে পারিত।

"অমুক কাজ করিলে লোকে আমাকে 'বড় লোক' বলিয়া ভাবিবে" মনে করিয়া আমরা অনেক কাজ করিয়া থাকি, কিন্তু শেষে ঐ সকল কাজে আমাদের "ছেলেমানুষী"ই প্রকাশ পাইয়া থাকে। উপযুক্ত আসন দেওয়া হয় নাই বলিয়া রাগ করিয়া নিমন্ত্রণ-স্থান হইতে চলিয়া গিয়াছেন এরূপ মহিলা অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন। একবার দুইবার কেন—এরূপ ঘটনা আমরা অনেকবার দেখিয়াছি! এরূপ ক্ষেত্রে বেশ বুদ্ধিমতী এবং লেখাপড়া-জানা নারীগণও একেবারে নিজের মান সম্ভ্রম ও বিদ্যার গৌরব ভুলিয়া রাগে অন্ধ হইয়া নানা প্রকার অনুচিত কথা বলিতে বলিতে চলিয়া গিয়াছেন—আমরা এরূপ দেখিয়াছি, আর নিজ মনে লজ্জা অনুভব করিয়াছি। এরূপ রাগের ফলে তাহাদের অসারতাই প্রকাশ হইয়া পড়ে এবং তাহারা যাহা ভাবিয়া এত রাগ করেন, তাহার অধিক উল্টা উৎপত্তি হয়! তাঁহারা ভাবেন, যে ঐরূপ ভাবে রাগে অধীর হইলে লোকে তাঁহাদিগকে বড়লোক ভাবিয়া কত প্রশংসাই না করিবে, কিন্তু ফলে লোকে তাঁহাদিগকে নিতান্ত অসার ও অহঙ্কারী বলিয়া বুঝিয়া লয়! তাহাতে বেচারীদের যেটুকু মান সম্ভ্রম ছিল, তাহাও নষ্ট হইয়া যায়!

হিন্দী ভাষায় বৈষ্ণব ও সাধুদিগের একখানি প্রসিদ্ধ পদ্য জীবন-চরিত আছে, উহার নাম "ভক্তমাল" এবং উহার গ্রন্থকার মহাত্মা নাভাদাসজী। একবার উক্ত নাভাদাস বাবাজীর বাটীতে দেশের অনেক ভক্ত সাধু একত্র হইয়াছিলেন। অনেক ভক্ত একত্র দেখিয়া কেহ কেহ বলাবলি করিতেছিলেন যে এখানে "ভক্তমাল" (ভক্তের মালা) ত সম্পূর্ণ গাঁথা দেখিতেছি, কিন্তু এই মালার 'খামি' (মধ্যমণি) কোথায় তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখা দরকার। একজন ভক্তশিরোমণি পাইলেই এই "ভক্তমাল" পূর্ণ হইয়া যায়। এইরূপ কথাবার্ত্তা চলিতেছে এমন সময় ভক্তদিগের ভোজনের ব্যবস্থা আরম্ভ হইল। পরিবেশনকারী খাদ্য সামগ্রী লইয়া পরিবেশন করিতে করিতে পংক্তির শেষে আসিয়া দেখেন, যে পংক্তির শেষে মহাত্মা তুলসীদাস গোস্বামী* বসিয়া আছেন, কিন্তু তাঁহার সম্মুখে ভোজনের "পাতা" নাই। গোস্বামী প্রভু "হাম বড়" হইয়া সকলের মাঝে গিয়া বসেন নাই, কিন্তু প্রকৃত বৈষ্ণবের মত আপনাকে "তৃণ হইতেও নীচ" জানিয়া তিনি সকলের শেষে পংক্তির এক নিভৃত কোণে গিয়া বসিয়াছিলেন এবং যে ব্যক্তি "পাতা" বাঁটিয়া গিয়াছে সে তাঁহাকে লক্ষ্য করে নাই। গোস্বামী মহারাজও আধুনিক "সাধু"র মত উদর-সর্ব্বস্ব পেটুক ব্রাহ্মণ ছিলেন না, সুতরাং "পাতা" চাহিয়া লওয়াও আবশ্যক বোধ করেন নাই, অথবা সে সময়ে তাঁহার "রামময় প্রাণ" কোথায় কোন্ স্বর্গে ভক্তির অমৃত পান করিতে বিভোর ছিল তাহা কে বলিতে পারে? যাহা হউক পরিবেশক মহা বিপদে পড়িলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, যে ইঁহার খাদ্যসামগ্রী কোথায় দিই?—পরিবেশক

---

* মহাত্মা তুলসীদাস গোস্বামী এক জন প্রসিদ্ধ সাধুভক্ত এবং সুবিখ্যাত হিন্দী রামায়ণ "রামচরিত মানস" ইহার প্রতিভার অমর কীর্ত্তিস্তম্ভ। রামায়ণ ভিন্ন আরও কতিপয় গ্রন্থ তিনি লিখিয়াছিলেন। ভারতে এই রামায়ণের যত প্রচার ঐরূপ প্রচার আর কোনও গ্রন্থের নাই। জন্ম ১৫৩২ খ্রী, মৃত্যু ১৬২৩ খ্রীঃ। এই ব্রাহ্মণকুমার ব্রহ্মচারী ছিলেন।

ঐরূপ চিন্তা করিতেছেন, এদিকে মহাপুরুষ হঠাৎ আসন হইতে উঠিয়া কোন অজ্ঞাত এক ভক্তের একপাটী "নাগোরা" জুতা লইয়া নিজের সম্মুখে রাখিয়া পরিবেশককে বলিলেন, "এই আমার 'পাতা' আপনি আনন্দের সহিত আমার অংশ ইহাতে দিন, ইহা এক ভক্তের পদধূলি-পূত জুতা, আমার পক্ষে ইহা অপেক্ষা ভাল পাত্র আর কি হইতে পারে? পরিবেশক ত অবাক! এই সব দেখিয়া শুনিয়া গোলমালে আরও অনেকে তথায় আসিলেন। মহাত্মা নাভাদাস বাবাজী ছুটিয়া আসিয়া গোস্বামী মহাপ্রভুর শ্রীচরণে পড়িয়া লুঠিতে লাগিলেন এবং অন্য সমস্ত ভক্ত হর্ষবিস্ময়ে গদগদ হইয়া সমস্বরে বলিতে লাগিলেন, যে আমরা "ভক্তমালের খামি" খুঁজিতেছিলাম, এই ত "খামি" ত আমাদের মধ্যেই রহিয়াছেন। সকলেই গোস্বামীজীর পায়ে দণ্ডবৎ প্রণাম করিতে লাগিলেন, কেহ বা হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন, সকলে গোস্বামী প্রভুর জয় ঘোষণা করিতে লাগিলেন। সেই সময় হইতে লোকে গোস্বামী মহাপ্রভুকে ভক্তশিরোমণি বলিয়া আসিতেছে। এখন ভাবুন দেখি, যদি তুলসীদাস গোস্বামী সকল ভক্ত অপেক্ষা তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ আসন দেওয়া হয় নাই বলিয়া রাগে "গরগর" করিয়া চোখ লাল করিয়া ভ্রূকুটি-কুটিল মুখে বক্ বক্ করিতে করিতে প্রস্থান করিতেন, তাহা হইলে কি তাঁহার প্রশংসা ও যশ বাড়িত এবং অদ্যাবধি তাঁহাকে লোকে ভক্তশিরোমণি বলিয়া শ্রদ্ধা করিত?

প্রসিদ্ধ কবি মালিক মহম্মদ (হিন্দী ভাষার এক কবি, ইন্দ্রাবতী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ কাব্যের রচয়িতা) কাণা এবং কুরূপ ছিলেন। একবার কোন রাজা তাঁহাকে দেখিয়া ব্যঙ্গ করিয়া হাসিয়াছিলেন। কবি বুঝিতে পারিলেন, রাজা নিতান্ত মূর্খ। তিনি কিছু মাত্র রাগ না করিয়া অতি শান্তভাবে হাস্যমুখে রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মোহিকা হসেসি কি কোহরৈ?" অর্থাৎ হে রাজন্, আপনি ব্যঙ্গ করিতেছেন কাহাকে? আমাকে অথবা আমার সৃষ্টিকর্ত্তাকে? আমি ত মাটীর পুতুল বই নই! আমাকে সেই কুম্ভকার নিজের ইচ্ছামুরূপ যেমন গড়িয়াছেন, আমি ত সেইরূপই হইয়াছি, আমি ত নিজের ইচ্ছায় এইরূপ হই নাই। রাজন্! আপনি আমাকে কুরূপ ও কাণা দেখিয়া হাসিতেছেন, এই বিদ্রূপ ত আমাকে করা হইতেছে না, এ বিদ্রূপ করা হইতেছে আমার সৃষ্টিকর্ত্তা সেই পরম পুরুষ ভগবানকে। রাজা লজ্জায় মুখ নামাইলেন এবং কবির নিকট নানা প্রকারে ক্ষমা-প্রার্থনা করিলেন। এক্ষেত্রে কবি যদি রাজার কথা শুনিবা মাত্র রাগে "অগ্নিশর্ম্মা" হইয়া উঠিতেন, তিনিই ঠকিতেন। বাস্তবিক পক্ষে যদি কোন ব্যক্তি অন্ধ, কাণা, কালা, খোঁড়া অথবা অন্য কোন প্রকারে হীনাঙ্গ হয়, তাহাতে ঐ ব্যক্তির দোষ কি? উহার ঐ ত্রুটি দেখিয়া যদি কেহ ঠাট্টা বিদ্রূপ করে, তাহা হইলে ঐ বিদ্রূপকারীরই মূর্খতা প্রকাশ পায়। কিন্তু যদি দেখা যায়, যে কেহ ঐরূপ দোষের জন্য কাহাকেও ঠাট্টা করিতেছে, আর ঐ ব্যক্তি ঠাট্টাকারীর উপর চোক লাল করিয়া ঝগড়া বাধাইতেছে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, দুইজন সমান মূর্খ একত্র হইয়াছে।

কোনও ব্যক্তির তিরস্কারে অথবা উপহাসে ক্রোধোদয় হইলে তাহা সম্বরণ করিবার উপায় পরমার্থচিন্তা। অর্থাৎ উপহাসকারী কে, আমি কে—উপহাস বা তিরস্কারের সত্যতা আছে কি না, এই প্রকার চিন্তা। (ক্রমশঃ)

শ্রীসত্যবন্ধু দাস।

অনুবাদক

সহানুভূতি।

১

কলেজ ছাড়িয়া যখন গ্রামে গেলাম তখন পিতার যৎকিঞ্চিৎ যা ভূসম্পত্তি ছিল তাহা পর্য্যবেক্ষণের ভার আমার উপর আসিয়া পড়িল।

আমাদের বাসগ্রাম চন্দ্রভাগ হইতে প্রায় তিন ক্রোশ দূরে একখানি মুসলমানপ্রধান গ্রাম আছে। ঐ গ্রামে আমাদের অনেকগুলি মুসলমান প্রজা ছিল। প্রজাদের অবস্থা নিতান্ত মন্দ নহে। কিন্তু খাজনা দিতে ইহারা বড় অভ্যস্ত ছিল না। ইহাদের কেহ কেহ খাজনা দিলেও বাবর আলি নামক এক ব্যক্তি তিন বৎসর একটী পয়সাও খাজনা দেয় নাই। পিতা অনেকবার লোক পাঠাইয়া

হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার নিমিত্ত সে বহুবিধ উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিল। এই বিষয় অবগত হইয়া আমি বাবরকে বশীভূত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলাম।

চৈত্র মাসের শেষে একদিন দুই জন হিন্দুস্থানী দরওয়ান লইয়া আমি উক্ত গ্রাম পরিদর্শনে গেলাম। গ্রামে প্রবেশ করিয়া একটী অশ্বত্থ বৃক্ষের তলে পাল্কী রাখিয়া আমরা পদব্রজে গ্রাম প্রদক্ষিণ করিলাম। অবশেষে আমরা বাবরের কুটীরদ্বারে উপস্থিত হইলাম। বাবর তখন নূতন খড়ের দ্বারা গৃহের চাল সংস্কার করিতেছিল। আমাদের দেখিয়া সে নামিয়া আসিল।

বেলা দ্বিপ্রহর। অতি প্রত্যুষে কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া আসিয়াছিলাম। বাড়ীতে থাকিলে এতক্ষণ আহারাদি শেষ করিয়া নিদ্রাভিভূত হইতাম। রৌদ্রের সঙ্গে আমার মেজাজটাও একটু রুক্ষ হইয়াছিল। সে নামিয়া আসিতেই আমি বলিলাম, "উস্কো পিঠ্ পর্ বিশ জুতি লাগাও।"

যে ব্যক্তি তিন বৎসর খাজনা দেয় নাই এবং নানা কৌশলে পেয়াদার তাগাদা হইতে অব্যাহতি পাইয়াছে তাহাকে বিশ ঘা জুতা মারা আমার নিকট অন্যায় বোধ হয় নাই।

যখন দরওয়ান মস্তকের উষ্ণীষ নামাইয়া দক্ষিণ চরণ হইতে খুরাবিশিষ্ট নাগ্‌রা জুতাটী খুলিয়া লইল তখন একটী বালিকা আসিয়া বাবরের পশ্চাতে দাঁড়াইল। বালিকাটী দেখিতে সুন্দরী না হইলেও তাহার মুখে একটী করুণ কমনীয় ভাব দেদীপ্যমান ছিল। তাহাকে বালিকা না বলিয়া কিশোরী বলিলেই ঠিক বলা হয়।

দরওয়ান যখন বাবরকে মারিতে প্রস্তুত তখন বালিকা বলিল, "ওগো মোর বাপ্‌কে মেরো না—ও আজ খায়নি।" কুটীরের মধ্য হইতে একটী রমণী বলিল, "বাবু, কাল স'ন্ধে হ'তে আমরা উপোস করে আছি, খাজনা দিতে পাল্লে কি আমরা চুপ করে থাকি ? হাতে কিছু নেই বাবা, থাক্‌লে না খেয়ে দেতুম্, আমার বাবরকে মেরো না বাবা।" এমন সময়ে দুইটী উলঙ্গ শিশু আসিয়া বাবরের নিকট দাঁড়াইল। একটী শিশুর মুখে ভাত লাগিয়াছিল। গৃহে চাউল নাই বলিতেছে, অথচ শিশুর মুখে ভাত দেখিয়া আমার ক্রোধ বাড়িল। বলিলাম, "মারো হারামজাদ্‌কো।" দরওয়ান কয়েক ঘা জুতা মারিল। বাবর অসীম ধৈর্য্যের সহিত নিশ্চেষ্টভাবে দাঁড়াইয়া রহিল—তাহার শরীরের যেখানে যেখানে জুতার আঘাত লাগিল সেই সেই স্থান নিমেষের মধ্যে ফুলিয়া উঠিল। মেয়েটী মাটীতে লুটাপুটি করিয়া কাঁদিতে লাগিল। শিশু দুটী ভয়ে অন্তঃপুরে পলাইয়া গেল। কম্পিত-কলেবর বাবর তখনও করযোড়ে দণ্ডায়মান। হায়রে জমিদারের শাসন !

বৈশাখ মাসের মধ্যে সমুদয় খাজনা শোধ করিতে না পারিলে ডিক্রি করিয়া সর্ব্বস্ব নিলামে চড়াইব বলিয়া আমি সেদিনকার মত বাড়ী ফিরিলাম। যখন মাঠের মধ্যে পাল্কীতে আসিতেছিলাম তখন গ্রামান্তরে চড়কের বিপুল বাদ্য বাজিতেছিল। আর বেলাবসানে চৈত্র-বায়ুর সঙ্গে একটী কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইতেছিলাম—সে কণ্ঠস্বর বাবরের কন্যার।

২

সবে কলেজ ছাড়িয়া আসিয়াছিলাম, তাই মনুষ্যত্ব (humanity), দয়ামায়া (benevolenee) প্রভৃতি কথাগুলি তখনও ভুলিতে পারি নাই। উক্ত ঘটনার কয়েকদিন পরে বাবরকে ডাকাইয়া পাঠাইলাম। অশ্রুসিক্তনয়নে বাবর আমার নিকট উপস্থিত হইল। শুনিলাম, অনাহারে কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাহার কন্যার জর হইয়াছে। দুই দিন যাবৎ সে জ্বরে অচেতন।

যাহাতে বালিকার চিকিৎসার অভাব না হয় তাহার বন্দোবস্ত করিয়া দিলাম। কিন্তু বালিকা বাঁচিল না।

শোকগ্রস্ত বাবর যাহাতে অন্নের ক্লেশ না পায় সেজন্য তাহাকে আমার একটা কাজে নিযুক্ত করিলাম। বাবর অম্লানবদনে আমার কাজ করিতে লাগিল। তাহার মুখে আপত্তি ওজর কোনোদিন শুনি নাই। বুঝি বিধাতা তাহাকে সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্ত্তি করিয়া গড়িয়াছিলেন। আর দেখিতে পাইতাম, তাহার সেই কঠিন মুখচ্ছবির অন্তরালে একখানি সুকোমল, স্নেহময় হৃদয় লুক্কায়িত আছে। সে আমার তিন বৎসরের কন্যা মিনিকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিত।

৩

আষাঢ় মাস। মিনি দিন দিন বড় কৃশ হইয়া যাইতেছিল। ডাক্তার বায়ু পরিবর্ত্তন করিতে বলিলেন। সাহাবাদ জেলার দক্ষিণে শোণের তীরে ডিহিরি নামক একটী স্বাস্থ্যকর স্থান আছে। মিনির জন্য সেখানে একটী বাংলা ভাড়া লওয়া গেল, শ্রাবণ মাসে মিনিকে লইয়া সেখানে গেলাম। মিনির মা সঙ্গে রহিলেন। বাবরকেও সঙ্গে আনিতে হইল।

ডিহিরিতে শোণের এপার-ওপার দেখা যায় না। তাতে বর্ষাকাল। মধ্যে মধ্যে পাহাড় হইতে জল নামিলে শোণ বঙ্গোপসাগরের মত ভীষণ হইয়া উঠে। মিনিকে লইয়া আমরা প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় বেড়াইতে বাহির হইতাম।

এত যত্ন চেষ্টা সত্ত্বেও মিনি সুস্থ না হইয়া উত্তরোত্তর কৃশ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে লাগিল। তাহার সে বর্ণের ঔজ্জ্বল্য আর রহিল না। চক্ষের নিম্নে কালিমা পড়িল। তাহার কুঞ্চিত কেশগুচ্ছ কাটিয়া ফেলিতে হইল। রাত্রে নিদ্রা হয় না। আমাদেরও রাত্রির পর রাত্রি অনিদ্রায় কাটিতে লাগিল। বাবর বাংলার একটী প্রান্তগৃহে (side room) শয়ন করিত। সে অনিদ্রায় রাত্রি যাপন করিত। রাত্রে প্রয়োজন হইলে তাহাকে কখনও একাধিক বার ডাকিবার প্রয়োজন হইত না।

ডাক্তার দেখিয়া বলিলেন, ব্রঙ্কাইটিস্ হইয়াছে। সাসিরাম হইতে ভাল ডাক্তার আনাইলাম। চিকিৎসা চলিতে লাগিল। কিন্তু কোন ফল হইল না।

এক দিন সন্ধ্যায় রোগ খুব বৃদ্ধি পাইল। মিনির মা বাড়ী ফিরিবার নিমিত্ত বড় পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, বালিকার বাঁচিবার যেটুকু আশা আছে ট্রেণে উঠাইলে সেটুকুও নির্ম্মূল হইবে।" মিনির জননী অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন।

সে দিন বাবরকে আমাদের ঘরে রাখিলাম। সন্ধ্যার পর হইতে খুব ঝড় বহিতেছিল, মিনি অচেতন অবস্থায় ছিল। মধ্যে মধ্যে তাহার ঠোঁট দুইটী কাঁপিয়া উঠিতেছিল। আর যখন ঝড় খুব প্রবল হইতেছিল তখন সে এক একবার চম্‌কিয়া চোক মিলিতেছিল। তাহার সে দৃষ্টি কি ভয়ঙ্কর!

রাত্রি দুইটার পর বালিকা চক্ষু মেলিয়া গৃহের চারিদিকে একবার চাহিয়া দেখিল। সহসা একটা ঝাপ্‌টা বাতাসে গৃহের একটী বাতায়ন খুলিয়া গেল। টেবিলের উপর একটা মোমবাতি জ্বলিতেছিল, বাতাসে সেটা উপড়িয়া গেল। মিনি একটা অস্ফুট শব্দ করিল, তার পর বাতি জ্বালিয়া দেখিলাম, মিনির প্রাণবায়ু নিঃশেষিত হইয়া গেছে।

মিনির জননী রোদন করিতে লাগিলেন। উন্মুক্ত গবাক্ষের নিকট দাঁড়াইয়া নীরবে অশ্রু মুছিতে মুছিতে মনে হইল, পশ্চাতে কেহ দাঁড়াইয়া আছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কে?" অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে উত্তর হইল, "আজ্ঞে—আমি, বাবর!"

আর একটী দিনের স্মৃতি আমার মনে উদিত হইল। সেই শোক ও বিষাদের মুহূর্ত্তে, ঝটিকাময়ী তামসী রজনীর বিরাট বিজনতার মধ্যে একটী সত্য আমার নিকট আলোক-রেখায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল;—আমি বুঝিলাম, অনুভূতি মানব জাতির প্রকৃতি-গত, সহজ সম্পত্তি—ধনীর একচেটিয়া নহে। সেই সময়ে বাহিরে বায়ুবিতাড়িত শিশুবৃক্ষ সমূহের মধ্য হইতে কে যেন বলিয়া উঠিল—"ওগো মোর বাপ্‌কে মেরো না—ও আজ খায়নি।"

শ্রীইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়।

পিপাসিতা।

১

নব-ঘন ঘন ঘন গরজিছে শূন্যে
পরাজিয়া রবি শশী,
দামিনী হাসিছে হাসি,
এত রূপ পাইয়াছে কি জানি কি পুণ্যে?

২

কালো আমি, হীন আমি, ভূমে উপবিষ্ট,
পালক-ভূষণ-সার,
নাহি জ্যোতি-অলঙ্কার,
নাহি মম বিম্বাধরে হাসিরাশি মিষ্ট।

৩

দেখে পরিতুষ্ট হবে তুমি মনোচোর ?
কিছু নাহি অভাগীর,
আছে শুধু আঁখি-নীর,
আর আছে বুকে একগাছি প্রেম-ডোর।

৪

কাছে এস পরাইয়া দিব নীল কণ্ঠে,
প্রিয়া তব সৌদামিনী,
সদ্য বিষ-প্রসবিনী
কি জানি কখন বজ্র হেনে দিবে মুণ্ডে ?

৫

চির পিপাসিত আমি দগ্ধ মোর হিয়া,
হে মেঘ ! তোমার রূপে
মজিয়াছি চুপে চুপে
তৃপ্ত কর এক বিন্দু প্রেম-বারি দিয়া।

৬

কি জানি কি ভাবি আমি বসি তরু-শাখে,
যখন গরজ ঘন,
বিশ্ব কর আচ্ছাদন,
তখন কি অভাগীর কোন জ্ঞান থাকে ?

৭

ছুটে আসি, উড়ে বসি ঊর্দ্ধগামী ডালে
যথা গেলে ঐ আঁখি,
পরিষ্কার রূপে দেখি,
তুমিও দেখিতে পাও,—যদি মন গলে ?

৮

অনিমিষ হয়ে আমি উর্দ্ধে থাকি চেয়ে,
হয়ে বায়ু-সঞ্চালিত,
ভ্রম তুমি ইতস্ততঃ,
গুড়ু গুড়ু গুড়ু রবে প্রেম-গীতি গেয়ে।

৯

আহা মেঘ কি সুন্দর, প্রকৃতি কি ধন্য !
না পাইনু পরশন,
বড় সুখ দরশন,
আহা আমি করেছিনু কত শত পুণ্য ?

১০

পরাণ দিয়েছি ঢেলে প্রেমাধিনী আমি,
ওরূপ নয়নে হেরি,
ওরূপ হৃদয়ে ধরি,
কভু হাসি, কভু কাঁদি—দেখ কি তা স্বামী ?

১১

গুড়ু গুড়ু গরজনে যবে তুমি ডাক
শুনি সেই গুড়ু গুড়ু,
প্রাণ করে উড়ু উড়ু,
উড়ে আসি শাখে বসি যথা তুমি থাক।

১২

চাতকিনী আমি থাকি বারি আশে চেয়ে,
পাই যদি এক বিন্দু,
ভাবি যেন শত সিন্ধু,
আনন্দ আবেগে মন উঠে স্ফীত হয়ে।

১৩

এইরূপ মাঝে মাঝে দেখা দিও সখা,
অথবা নাই বা দিলে,
তবু রব পদতলে,
চাতকীর মর্ম্মস্থলে মেঘরূপ আঁকা।

শ্রীঅম্বুজাসুন্দরী দাস গুপ্তা।

রাণী চাঁদবিবি।

বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশের রমণীগণ অন্তঃপুরের প্রাচীর-কারায় আবদ্ধ থাকিলেও, চিরকাল তাঁহাদিগকে এই-ভাবে থাকিতে হয় নাই। পর্দার অন্তরালে অবগুণ্ঠনবতী হইয়া থাকিতে থাকিতে এদেশের রমণীগণ যেমন কোমল-হৃদয়া ও ভীরুস্বভাবা আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন, পূর্ব্বকালে ইহার সম্পূর্ণ অসদ্ভাব না ঘটিলেও তাঁহাদের হৃদয় কেবলমাত্র স্ত্রীজনসুলভ উপাদানে গঠিত হইত না। সে কালের অধিকাংশ রমণীই 'বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদুনি কুসুমাদপি' ছিলেন। প্রয়োজন হইলে তাঁহারা শয্যায় প্রাণসম শিশু পুত্রকে শায়িত করিয়া উন্মুক্ত কৃপাণহস্তে উন্মাদিনী বেশে

রণক্ষেত্রে পর্য্যটন করতঃ শত্রুদলন করিতে পারিতেন। আবার হৃদয়ের দুঃসহ শোকাবেগ প্রশমিত করিয়া হাসিমুখে জলন্ত চিতায় আরোহণ পূর্ব্বক মৃত স্বামীর পার্শ্বে শয়ন করিয়া সতী-মাহাত্ম্যের জয় ঘোষণা করিতেন। ইতিহাসের মুক বক্ষ উদ্ঘাটন করিলে রমণীর বীরত্ব ও মহত্ত্বের এইরূপ শত শত দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। এখন এরূপ ঘটনা একবারে যে দেখা যায় না, তাহা বলিতে পারি না; কিন্তু তাহা বিরল। অবশ্য দেশ কাল ও অবস্থা বিবেচনায় রমণীগণের এখন আর এরূপ শৌর্য্য বীর্য্য প্রদর্শন করিবার সুযোগ ঘটে না। কিন্তু আমরা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি, এ দেশ যদি আবার কখন জাগিয়া উঠে, এ পোড়া দেশের অদৃষ্টে যদি ভগবান্ সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি লিখিয়া থাকেন, তবে আমাদের ভগিনীগণও আবার তাঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তিনীদিগের পদানুসরণ করিতে সমর্থ হইবেন।

অদ্য আমরা যে বীর্য্যবতী রমণীর বিষয় আলোচনা করিতেছি, তিনিও এককালে সমগ্র ভারতকে বিস্ময়-বিমুগ্ধ করিয়াছিলেন,—রমণী-শৌর্য্যের অত্যুজ্জল বিভায় স্বদেশ ও স্বজাতিকে পবিত্র ও মহিমোজ্জল করতঃ প্রাচীন ভারতের রমণী-গৌরব সার্থক করিয়াছিলেন।

চাঁদবিবি আহম্মদনগর-রাজ-দুহিতা। দক্ষিণ ভারতের বিজাপুর ও আহম্মদনগর এক সন্ধি-সূত্রে গ্রথিত হইয়া, একই উদ্দেশ্য লইয়া যাহাতে স্বদেশের হিতসাধনে রত থাকিতে পারে, এই অভিপ্রায়ে আহম্মদনগর-রাজ স্বীয় অলৌকিক সৌন্দর্য্য-সম্পন্না কন্যা চাঁদকে বিজাপুর-রাজ আলী আদিল সাহের করে সম্প্রদান করেন। চাঁদবিবির বিবাহের অনতিপূর্ব্বে, মোসলমান শাসন-ক্ষমতার মহত্ত্ব জ্ঞাপনার্থ দক্ষিণ ভারতে এক মহাযুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই আহবে মোসলমান-শক্তি জয়লাভ করে এবং বহুতর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য বিজাপুর রাজ্যের অন্তর্গত হয়। কিন্তু বিজাপুর-নরপতি দীর্ঘকাল এই সকল রাজ্যের উপর প্রভুত্ব পরিচালন করিতে সক্ষম হন নাই, ১৫৮০ অব্দে আলী আদিল শাহের মর জগতের লীলাখেলার অবসান হয়। এই সময় চাঁদবিবির বয়স মাত্র পঞ্চবিংশতি বর্ষ। মৃত্যুদশায় আলী আদিল শাহ ভ্রাতুষ্পুত্র ইব্রাহিম আদিল শাহকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া তদীয় অপ্রাপ্ত বয়স পর্য্যন্ত পত্নী চাঁদবিবিকে তাহার পক্ষে শাসনদণ্ড পরিচালন করিবার অনুমতি করিয়া যান।

চাঁদবিবির শাসনের প্রথম কতিপয় বৎসর নানা অশান্তি ও বিদ্রোহে অতিবাহিত হয়। তাঁহার নিজের সর্দ্দারগণ বিদ্রোহী হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে এবং তাঁহাকে রাজ্য হইতে বিতাড়িত করিয়া রাজ্যাধিকার লাভ করিতে চেষ্টা পায়। প্রথমতঃ তাঁহার মন্ত্রীদল বিপক্ষ পক্ষের প্ররোচনায় ও অলীক প্রলোভনে বিমুগ্ধ হইয়া চাঁদবিবির ও স্বদেশের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন। বহুদিন পর্য্যন্ত চাঁদবিবিকে এই বিদ্রোহদলন কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতে হয়। প্রথম প্রথম বিদ্রোহী দল এতই শক্তিশালী হইয়া উঠে যে, তাহাদের অত্যাচারে তাঁহাকে প্রাসাদ হইতে প্রস্থান করিতে এবং পরে বিদ্রোহী কেশোয়ার খাঁ কর্ত্তৃক সাতারা দুর্গ হইতে বিতাড়িত হইয়া অন্যত্র পলায়ন করিতে বাধ্য হইতে হয়। রাণী পলায়নপরা হইলে কেশোয়ার জাঁকজমকের সহিত দেশবাসীগণকে এক ভোজে আহ্বান করিয়া তাহাদিগকে তুষ্ট রাখিতে প্রয়াস পান। কিন্তু বেশী দিন তাঁহার পাপের ভরা ভাসিল না, অনতিবিলম্বে তিনি ঘাতকের গুপ্ত আঘাতে জীবনাহুতি প্রদান পূর্ব্বক স্বদেশদ্রোহিতার প্রায়শ্চিত্ত করিলেন! তাঁহার মৃত্যুর পর একলাস খাঁ নামক এক আবিসিনিয়ান রাণীর দক্ষিণহস্ত স্বরূপ হইয়া উঠেন। একলাস অতিশয় দুর্দ্দান্ত, কলহপ্রিয় এবং ক্রূরপ্রকৃতি লোক ছিলেন। কিন্তু এতৎ সত্ত্বেও তিনি সামরিক শৌর্য্য বীর্য্যে ভূষিত এবং প্রভুর বিশ্বাসের পাত্র ছিলেন। একলাস রাণীর সৈন্যদিগের অধিনায়কত্ব গ্রহণ করিয়া অতি সাহসিকতা ও বিশ্বস্ততার সহিত তাহাদিগকে শত্রুর বিপক্ষে পরিচালিত করেন। তাঁহারই পরিচালনাগুণে আক্রমণকারীগণের ভ্রান্ত ধারণা বিদূরিত হয়; তাহারা বিজাপুর আক্রমণ ও অধিকার যত সহজ বিবেচনা করিয়াছিলেন, প্রকৃতপক্ষে কার্য্যে তাহার বিপরীত হইল। এই যুদ্ধসময়ে রাণী রণক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়া সৈন্যগণকে উৎসাহিত ও পরিচালিত করেন। প্রথমতঃ বিপক্ষ-সৈন্য নগর-প্রাচীর ভঙ্গ করে এবং বর্ষার বিপুল বারিধারায় ঐ ভগ্ন স্থান অধিকতর প্রশস্ত হয়। কিন্তু রাণী ঐ প্রাচীর অধিকার না করা পর্য্যন্ত একই স্থানে

দণ্ডায়মান থাকিয়া সৈন্যদিগকে বিপুল উৎসাহে মাতাইয়া রাখেন। তৎপর যুদ্ধ নিবৃত্ত হয়, সকলেই তাঁহাকে রাণী বলিয়া স্বীকার করে, সঙ্গে সঙ্গে দেশে শান্তি সংস্থাপিত হয়। কিন্তু এক বিদ্বেষ্টার ঈর্ষা-প্রণোদিত কৃপাণাঘাতে একলাস খাঁ অন্ধত্ব প্রাপ্ত হন এবং সমস্ত ক্ষমতা হইতে বিচ্যুত হন। একলাসের এই শোচনীয় দশা প্রাপ্তির পর রাণীরও শাসন-ক্ষমতা খর্ব্ব হইয়া যায়, কিন্তু শীঘ্রই আবার শান্তি সংস্থাপিত হয় এবং বিজাপুর উন্নতির সোপানে আরোহণ করিতে থাকে।

বালক ইব্রাহিম আদিল শাহ প্রাপ্তযৌবন হইবার সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যের দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যগুলির ভার ক্রমে ক্রমে স্বহস্তে লইতে আরম্ভ করেন। এই অবস্থায় কিছুদিন বিশ্রাম-সুখ সম্ভোগ করিবার আশায় চাঁদবিবি পিত্রালয় আহম্মদনগরে গমন করেন। কিন্তু অধিক দিন তিনি শান্তিতে থাকিতে পারিলেন না,—রাজ্যের ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু সাম্প্রদায়িক কলহ এবং অবিচ্ছেদ মিত্র ও স্বদেশদ্রোহিতায় বিজাপুরের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখা অসম্ভব হইয়া উঠে। কাযেই রাণী তাঁহার পিত্রালয় পরিত্যাগ করতঃ অচিরে বিজাপুরে প্রত্যাবৃত্তা হন। রাজা এবং রাজ্যবাসীগণ মহা সমাদর ও সম্ভ্রমের সহিত তাঁহার অভ্যর্থনা করেন। তাঁহার আগমনে দেশে আবার শান্তি-সুখের হিল্লোল বহিতে আরম্ভ করিল, নবীন নরপতি নিরুপদ্রবে রাজ্য-শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। রাজা রাজ্যভ্রমণে বহির্গত হইলে কিম্বা শত্রু-দমনার্থ সমরক্ষেত্রে যাত্রা করিলে, রাণী প্রত্যক্ষভাবে শাসন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন, তদ্ব্যতীত এই সময় হইতে তিনি নিজে আর বড় রাজকার্য্য পরিদর্শন করিতেন না। চাঁদবিবি একদিকে যেমন সদাশয়, তীক্ষ্ণমেধাবী, সুদক্ষ রাজনৈতিক ছিলেন, অপর দিকে তেমনি সরল এবং আশ্রিত-বৎসল বলিয়া খ্যাতিলাভ করেন।

এদিকে চাঁদবিবির বিবাহের পর হইতে আহম্মদনগর রাজ্যের অবস্থা শোচনীয় হইতে থাকে। রাজা যুদ্ধক্ষেত্রে অনন্তনিদ্রায় অভিভূত হইলে, ক্ষমতাশালী দলপতিগণ আপনাদের নির্ব্বাচিত ব্যক্তিকে সিংহাসনে উপবিষ্ট করাইতে চেষ্টিত হন। ডেকানী-দল (Dekkani party) রাজবংশসম্ভূত বলিয়া অপর জাতীয় এক বালকের মস্তকে রাজমুকুট পরাইয়া দেন; অপর পক্ষে অপর এক দল পরলোকগত নরপতির শিশু পুত্রের দাবী অগ্রগণ্য বলিয়া প্রচার করেন। এই ভাবে উভয় দলে প্রবল সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, শেষোক্ত দল রাণী চাঁদবিবির সাহায্য প্রার্থনা করে। দলপতি রাণীর নিকট উপস্থিত হইয়া সানুনয়ে নিবেদন করেন,—"রাজ্ঞি! আপনার এমনি প্রভাব যে, আপনি পদার্পণ করিবামাত্রই শান্তিদেবী হাসিমুখে আহম্মদনগরের প্রতি কটাক্ষপাত করিবেন।"

চাঁদবিবি প্রহৃষ্টান্তঃকরণে উত্তর করেন,—"ইহা তো আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম এবং খোদারও অভিপ্রেত, আমি অবশ্যই তথায় গমন করিব।" অতঃপর তিনি বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী আব্বাস খাঁ ও তাঁহার পত্নী প্রিয়তমা জোরাকে সঙ্গে লইয়া পিতৃরাজ্য অভিমুখে যাত্রা করেন। সমস্ত আহম্মদনগরবাসী সসম্ভ্রমে তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করে, তিনিও তাহাদিগকে নিজের স্বাভাবিক সদাশয়তা এবং বাকপটুতায় মুগ্ধ করিয়া, তৎকালোপযোগী নানাবিধ সারগর্ভ উপদেশ প্রদান করতঃ নূতন আশায় প্রবুদ্ধ করেন। ডেকানী-দলপতি—যিনি চাঁদবিবির আগমনে পলায়ন করিয়াছিলেন, তিনিও দুঃখ প্রকাশ করিয়া পত্র লিখেন এবং তাঁহার সাহায্যার্থে সৈন্য সংগ্রহ করিতে না পারা পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন না, এরূপ সঙ্কল্প জ্ঞাপন করেন। এস্থলে বলা আবশ্যক যে, রাজ্যের বিশ্বস্ত অনুচরদিগের দলপতি চাঁদবিবির নিকট প্রতিকারপ্রার্থী হইলে, ডেকানী-দলপতি দিল্লীর যুবরাজ মুরাদের শরণাপন্ন হন। যুবরাজ এই সময় বিপুল বাহিনী সমভিব্যাহারে ডেকানের নিকটেই অবস্থান করিতেছিলেন এবং আহম্মদনগরে যেরূপ দলাদলি, দাক্ষিণাত্যের অপরাপর অনেক রাজ্যেই তদ্রূপ দলাদলি চলিতেছিল। কাযেই এই সুযোগে দিল্লীর রাজ্যবৃদ্ধি করিবার আশা যুবরাজ ত্যাগ করিতে পারেন নাই। তিনি যে কোনও দেশ আক্রমণ করিবার সুযোগের অপেক্ষায় ডেকানের নিকট বাহিনীসহ বসিয়াছিলেন। এমন সময় আহম্মদনগরের ডেকানী-দলপতির আহ্বান তিনি সাদরে গ্রহণ করেন।

চাঁদবিবির সাহায্যার্থে বিজাপুর এবং গোলকণ্ডা হইতে সৈন্যদল আগমন করে; তাহারা আহম্মদনগরের উত্তর দিকস্থ গিরিশ্রেণী রক্ষায় নিযুক্ত হয়। পরলোকগত নর-

পতির পুত্রই আহম্মদনগরের যথার্থ উত্তরাধিকারী বলিয়া ঘোষিত হন এবং মহা আড়ম্বর ও নাগরিকদিগের বিপুল জয়ধ্বনির মধ্যে যুবরাজের অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া যায়। কিন্তু এই আনন্দ-বাসরের মধ্যে বিশ্বাসঘাতক কিল্লাধিপতি যুবরাজ মুরাদকে লিখিয়া পাঠায়,—"শাহাজাদা! অবিলম্বে অগ্রসর হইতে মর্‌জি হয়। এক অসাধু রমণী শাসনভার গ্রহণপূর্ব্বক একটী বালককে সিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়াছেন,—এই বালকের বংশের কোন পরিচয় জ্ঞাত হওয়া যায় না।" কিন্তু কিল্লাধিপতির এই বিশ্বাসঘাতকতা ও রাজদ্রোহিতার বিষয় অধিক দিন গোপন রহিল না; প্রকাশ হওয়া মাত্র সে রাজাজ্ঞায় ঘাতকের হস্তে জীবন ডালি দিয়া উপযুক্ত কর্ম্মের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত ভোগ করে।

রাজদ্রোহীর শাস্তি প্রদানপূর্ব্বক চাঁদবিবি মুরাদকে লিখিলেন,—"যুবরাজ! অতীত ঘটনা আপনার অপরিজ্ঞাত নহে। ডেকানী-দলপতি মিত্রতা করিয়াছে। আপনি প্রতাপশালী সম্রাটের পুত্র—যেমন ক্ষমতাশালী তেমনি সদাশয়, আমরা আপনার সাদর অভ্যর্থনা করিব। তথাচ যদি আপনি বিরুদ্ধাচরণ করিবার অভিপ্রায়ে আগমন করেন এবং মিত্রতার বন্ধন ছিন্ন করেন, তাহা হইলে আমি আপনাকে সতর্ক করিতেছি, আপনি আসিবেন না। আমি উপযুক্ত সৈন্যবলে বলীয়ান, আসিলে আপনাকে লাঞ্ছিত হইতে হইবে।" কি তেজোগর্ভ বাক্য! রমণীমুখ-নিঃসৃত এইরূপ নির্ভীক উক্তি ইতিহাসে বড় দেখিতে পাওয়া যায় না। মুরাদ কিন্তু রাণীর এ বাক্যের প্রতি মনোযোগ প্রদান করিলেন না, কাজেই রাণী ভাবী সংঘর্ষের নিমিত্ত প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

ডেকানী-দলপতি সৈন্যদলের সহিত আসিয়া চাঁদবিবির সহিত মিলিত হইবার পূর্ব্বেই মুরাদ আহম্মদনগর আক্রমণ করিতে মনস্থ করেন।

এই সঙ্কটকালে দলপতিগণ সমস্ত সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ বিস্মৃত হইয়া স্বদেশরক্ষার্থ একত্র সম্মিলিত হইয়া চাঁদবিবির পার্শ্বে দণ্ডায়মান হন। রাণী প্রশান্তচিত্তে সমস্ত উদ্যোগ করিতে লাগিলেন, শস্যাগার খাদ্য-শস্যাদিতে পরিপূর্ণ করিলেন। আব্বাস খাঁর সহিত প্রত্যহ রাণী নগরের সমস্ত স্থান পরিদর্শন করিতে আরম্ভ করিলেন। বিজাপুর সৈন্যদলকে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিলেন। নীলদুর্গ হইতে দ্বাদশ সহস্র অশ্বারোহী মোগল সৈন্যের পথাবরোধ করিতে প্রেরিত হইল। আহম্মদনগরের দুর্গ পর্য্যন্ত দক্ষিণ পথ সম্পূর্ণ উন্মুক্ত রহিল।

বাহির হইতে সাহায্য আসিবার কোন পন্থাই রহিল না। এদিকে মোগলসৈন্যও ধীরে ধীরে নগরের দুর্গ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া উত্তর দক্ষিণ এবং পশ্চিম দিক্ হইতে আক্রমণ করিল। নানারূপ ষড়যন্ত্র, অত্যাচার এবং বিক্রম প্রদর্শন পূর্ব্বক তাহারা ক্রমে ক্রমে দুর্গের অতি নিকট উপস্থিত হইলেও দুর্গের গাত্র স্পর্শ করিতে সক্ষম হইল না, কারণ আরবদেশীয় বীরগণ অব্যর্থ সন্ধানে তাহাদের সন্ধান ব্যর্থ করিতে লাগিল। আহম্মদনগরের প্রত্যেক কার্য্যই রাণীর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হইতেছিল, তিনি মোগলদের সুড়ঙ্গের প্রতিকূলে সুড়ঙ্গ খনন করিয়া তাহাদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করিতে লাগিলেন। এদিকে দুর্ভিক্ষ রাক্ষসী দেশে করাল বদন ব্যাদন করায় এবং বিপক্ষের দুর্গ সম্পূর্ণ অনতিক্রম্য বিবেচিত হওয়ায় যুবরাজ মুরাদ প্রস্থানের নিমিত্ত আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিলেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল।

চন্দ্র।

সাহিত্য-সমাজে চন্দ্রের অত্যন্ত সমাদর। যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু তৃপ্তিদায়ক বা শান্তিপ্রদ তাহাকেই চন্দ্রের সহিত তুলনা করা হইয়া থাকে। আবার কত কবি চন্দ্রকে প্রেমোচ্ছ্বাসময় কাব্যোপহার দান করিয়াছেন। কেবল সাহিত্য-সমাজে কেন, স্নেহ-প্রেম-সরলতামাখা অশিক্ষিত পল্লীবাসীর জীবনেও চন্দ্রের অত্যন্ত সমাদর। বঙ্গবাসী চন্দ্রের সহিত অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছে। মাতৃক্রোড় হইতে বাঙ্গালী শিশু কচি কচি হাত তুলিয়া মধুর স্বরে চির পরিচিতের ন্যায় "চাঁদ-মামা"কে কতই আদরে আহ্বান করে। যৌবনে প্রেমের স্বপ্নের মধ্যে ঐ চাঁদমুখখানা জাগিয়া উঠে। প্রবীণ বয়সে চন্দ্রের সুধা পান করিতে করিতে প্রাণে ভগবৎভক্তির তরঙ্গ উত্থিত হয়। চন্দ্রের সহিত আমাদের এইরূপ আত্মীয়তা দর্শন করিয়া অনেকে মনে

চন্দ্র।

করিতে পারেন, আমরা চাঁদকে খুব ভাল করিয়া জানিয়াছি। কিন্তু প্রকৃত কথা বলিতে গেলে লজ্জার সহিত স্বীকার করিতে হয়, আমাদের অনেকে চাঁদের মুখখানাও ভাল করিয়া দেখিতে শিখেন নাই। যদি ভাল করিয়া দেখিতেন তাহা হইলে কখনও পূর্ণিমা-নিশিতে চন্দ্রের স্নিগ্ধোজ্জল কিরণে স্নাত হইয়া চাঁদ-মুখের প্রতি চাহিয়া চাহিয়া তাহার কলঙ্ক বর্ণনা করিতেন না। চাঁদ যদি আমাদের এই কৃতঘ্নতার খবর লইত তাহা হইলে অনন্ত কাল আমাদের এই নিষ্ঠুর পৃথিবীটাকে প্রদক্ষিণ করিয়া নৃত্য করিতে করিতে অনন্ত গগনে ছুটিয়া বেড়াইত না। বাস্তবিকই কি চাঁদের মুখে কলঙ্ক-রেখা বর্ত্তমান? তোমরা চাঁদের মুখখানা ভাল করিয়া দেখ নাই, তাই চাঁদের যাহা ঐশ্বর্য্য তাহাকেই কলঙ্ক মনে করিয়া দুঃখিত হইতেছ। ঐ অশোভন ঈষৎকৃষ্ণ চিহ্ন গুলিকে প্রাচীন জ্যোতির্ব্বিদেরা সমুদ্র বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহারা ঐ সকল সাগরের অতি সুন্দর সুন্দর নাম দিয়াছেন। সে কথা পরে বলিব।

চাঁদ যদিও আকাশের কপালে একটী সুশোভন সোনার টিপের মত সাজিয়া রহিয়াছে, তাহাকে ভাল করিয়া পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাই, সে আমাদের পৃথিবীরই মত একটা প্রকাণ্ড মৃৎপিণ্ড; কিন্তু আকারে ধরিত্রী হইতে ৪৯। গুণ ছোট। তাহার বক্ষঃস্থল সুদৃশ্য পর্ব্বতমালায় সুশোভিত। এই সকল পর্ব্বত স্থানে স্থানে অতি বিস্তৃত গোলাকার সমতল ভূখণ্ড সকলকে প্রাচীরের ন্যায় বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। চন্দ্রের গাত্রে অনেকগুলি আগ্নেয় গিরির গহ্বর দৃষ্টিগোচর হয়। এই সকল পর্ব্বতের গাত্র ও শিখরদেশে সূর্য্যরশ্মি প্রতিহত হইয়া ইতস্ততঃ বিচ্ছুরিত হয়। এভাবে দেখিতে গেলে মনে হইবে কপট চাঁদ পরদত্ত পোষাকে স্বীয় দেহ আবৃত করিয়া মহিমান্বিত হইয়াছে। কিন্তু এই স্নিগ্ধোজ্জ্বল পরিচ্ছদ পরিধান করিতে চাঁদকে অশেষ ক্লেশ ভোগ করিতে হয়; বায়ুমণ্ডলবিরহিত চন্দ্রগাত্র অসহ্য সূর্য্যোত্তাপে দগ্ধ হইয়া যায়, তথাপি প্রেমিক চাঁদ অগ্নিময় সূর্য্যকিরণজাল হইতে কয়েকটী অতি স্নিগ্ধ, অতি কোমল, সুধাময় রশ্মি বাছিয়া লইয়া চিরসঙ্গী পৃথিবীকে উপহার দেয়। বিমুগ্ধ মানব তাই চাঁদকে "সুধাকর" নাম দিয়াছে।

চন্দ্র ২৭ দিন, ৭ ঘণ্টা, ৪৩ মিনিটে একবার পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে। এই কালকে আমরা এক চান্দ্রমাস বলি। এক পূর্ণিমা হইতে পরবর্ত্তী পূর্ণিমা, বা এক অমাবস্যা হইতে পরবর্ত্তী অমাবস্যা পর্য্যন্ত এক চান্দ্রমাস। আমাদের এক চান্দ্রমাসে চন্দ্রের পক্ষে এক দিবস হয়, অর্থাৎ এই সময়ে চন্দ্রের এক আবর্ত্তন হয়। চন্দ্রের গতি ত্রিবিধ; চন্দ্র আপনি রথচক্রের ন্যায় ঘুরিতেছে, আবার ঘুরিতে ঘুরিতে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিতেছে, এবং পৃথিবীদ্বারা আকৃষ্ট হইয়া তাহারই সঙ্গীরূপে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। আমরা সচরাচর চন্দ্রের একার্দ্ধমাত্র অবলোকন করি, অপরার্দ্ধের কিয়দংশ চন্দ্রের গতির হ্রাস বৃদ্ধির সময় দৃষ্টিগোচর হয়।

পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিবার সময় চন্দ্র একবার পৃথিবী ও সূর্য্যের মধ্যস্থলে উপনীত হয়, আর একবার পৃথিবীর অন্তরালে গমন করে। চন্দ্র যখন দ্বিতীয়োক্ত স্থানে উপনীত হয় তখন আমাদের পূর্ণিমা তিথি, কারণ এই সময় চন্দ্রের যে অর্দ্ধ সূর্য্যদ্বারা আলোকিত হয় সেই অর্দ্ধই আমাদের সম্মুখবর্ত্তী। অমাবস্যাতে চন্দ্রের যে অর্দ্ধ পৃথিবী হইতে দেখিতে পাওয়া যায় তাহাতে সূর্য্যালোক পতিত হয় না। অন্যান্য তিথিতে, চন্দ্রের যে অর্দ্ধ সূর্য্যালোকে উদ্ভাসিত, তাহার অংশবিশেষ মাত্র আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। সেই জন্য আমরা ভিন্ন ভিন্ন তিথিতে চন্দ্রের ভিন্ন ভিন্ন রূপ দেখিতে পাই।

আমরা চন্দ্রমুখের বর্ণনা ছাড়িয়া অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি। চন্দ্রের ঐশ্বর্য্য তাহার সোণালী রঙে অথবা স্নিগ্ধোজ্জ্বল আলোকেই পরিসমাপ্ত হয় নাই। চন্দ্রবক্ষে যে সকল সুদৃশ্য গগনস্পর্শী পর্ব্বতরাজি ও সুদূরব্যাপী প্রান্তর দেখিতে পাওয়া যায় ভূপৃষ্ঠে তাহার তুলনা মিলে না। পণ্ডিতগণ এই গুলির নানা প্রকার নামকরণ করিয়াছেন।

আমরা যে চিহ্নগুলিকে চাঁদের কলঙ্ক বলিয়া বর্ণনা করি প্রাচীন পণ্ডিতেরা নানা কারণে মনে করিয়াছিলেন, যে সে গুলি এক একটী মহাসাগর (maria)। চন্দ্রবক্ষের পশ্চিমপ্রান্তস্থ সাগরটীর নাম "প্রশান্ত সাগর", পূর্ব্ব প্রান্তের সাগরটীর নাম "বারিদ সাগর", "প্রশান্ত সাগরের" দক্ষিণে "শান্তি সাগর", ইহার পশ্চিমে, প্রান্ত সীমায় "বিপদ সাগর।" ইহা ব্যতীত পূর্ব্বে ও দক্ষিণে আরও কতকগুলি

তথাকথিত সাগর বিদ্যমান। আধুনিক জ্যোতির্ব্বিদেরা এই নাম বজায় রাখিলেও সিদ্ধান্তটী গ্রহণ করেন নাই। তাঁহারা স্থির করিয়াছেন, যে তথাকথিত মহাসাগরগুলি বিস্তীর্ণ সমতল ক্ষেত্র ব্যতীত আর কিছু নহে।

চন্দ্রমুখের যে অংশ অতি উজ্জ্বল তাহা অত্যুচ্চ গিরি-শৃঙ্গে পূর্ণ। এই সকল গিরিশৃঙ্গ হইতে সূর্য্যরশ্মি প্রতি-ফলিত হইয়া ধরাতে সুধাবৃষ্টি করে। চন্দ্রবক্ষস্থ পর্ব্বতমালার মধ্যে "আপেনাইন" ২০০০০ ফুট, "আল্‌ সের" শিখর "মণ্ট্‌-ব্লাঙ্ক" ১২০০০ ফুট, "আণ্টাই শ্রেণী" ১৩০০০ ফুট, "লাইব্‌-নিজের" শিখর "নিসন" ৩৬০০০ ফুট, "ডোয়ারফুল" ২৬০০০ ফুট, "রুক পর্ব্বত" ২০০০০ ফুট উচ্চ। ইহা ব্যতীত আরও অনেক উচ্চশির পর্ব্বত পৃথিবী হইতে দেখিতে পাওয়া যায়।

চন্দ্রে অতি অদ্ভুত গিরিগহ্বর সকল দেখিতে পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ পূর্ব্বে এই সকল গহ্বর হইতে অগ্ন্যুদ্গম হইত। চন্দ্রের দক্ষিণ প্রান্তে ঈষদুজ্জ্বল একটী "কলঙ্ক"-চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়, উহাই "টাইকো" নামক আগ্নেয় গিরির মহাগহ্বর; উত্তর প্রান্তের সন্নিকটে আর একটী কাল চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়, উহাই "প্লেটো" গহ্বর; কেন্দ্রস্থলের নিকটে একটী প্রকাণ্ড গহ্বর আছে তাহার নাম "কোপার নিকস্‌।" চন্দ্রের পূর্ব্বোত্তর সীমায় যে উজ্জ্বল চিহ্নটী দেখিতে পাওয়া যায় তাহাই "আরিষ্টারফাস্‌" নামক গহ্বর। দক্ষিণ প্রান্তের নিকট আর একটী বৃহৎ গহ্বরের নাম "ক্লাভিয়াস্‌।" এই গহ্বরটীর ব্যাস ১৪০ মাইল। পূর্ব্ব দিকে একটী কৃষ্ণকায় গহ্বরের নাম "গ্রিমল্ডী," ইহাকে সময় সময় যন্ত্রাদির সাহায্য ব্যতীতও দেখিতে পাওয়া যায়।

এই সকল গহ্বর এক একটী প্রকাণ্ড প্রান্তরের ন্যায় বৃহৎ। উচ্চতা অনুসারে উজ্জ্বল বা অনুজ্জ্বল দেখা যায়। চন্দ্রে আর কতকগুলি পর্ব্বতপ্রাচীরে পরিবেষ্টিত বহুদূরব্যাপী সমতল ক্ষেত্র আছে। ইহাদের মধ্যে "টোলেমিউসের" ব্যাস ১১৫ মাইল, "শিকার্ডের" ১৩০ মাইল, কেন্দ্রস্থ "আলবাটেগ্‌-নিয়াসের" ব্যাস ৬০ মাইল। পর্ব্বতবেষ্টিত সমতল ক্ষেত্র-গুলির সহিত পূর্ব্বোক্ত গহ্বরগুলির অত্যন্ত সাদৃশ্য দেখা যায়। কিন্তু গহ্বরগুলির অধিকাংশই সুগভীর। "থিওফিলস্‌" নামক গহ্বরের গভীরতা ১৮০০ ফুট, "টাইকোর" ১৭০০০ ফুট।

স্থানে স্থানে বহুদূর পর্য্যন্ত চন্দ্রবক্ষ বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে। "হাইগেনিয়স্‌" নামক আগ্নেয় গিরির গহ্বরের উপর দিয়া এইরূপ একটী "ফাটা" (cleft) দেখিতে পাওয়া যায়—ইহা দৈর্ঘ্যে ৯ মাইল ও প্রস্থে ১½ মাইল। "আরিডিয়াস্‌" নামক আর একটী "ফাটা" আরও বৃহৎ। ইহা ব্যতীত আর কতকগুলি সলিলহীন নদী দেখিতে পাওয়া যায়। চন্দ্রের পূর্ব্ব প্রান্তে "সিরসালিস্‌" নামক এইরূপ একটী নদী-খাতের দৈর্ঘ্য ৪০০ মাইল। আমরা চন্দ্রের যে অংশ দেখিতে পাই তাহাতে প্রায় এক সহস্র এইরূপ নদী-খাত ও ফাটা দুরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখিতে পাওয়া যায়।

চন্দ্রে আর একটী অতি অদ্ভুত পদার্থ দৃষ্টিগোচর হয়। "টাইকো", "আরিষ্টার্ফাস্‌" প্রভৃতি গহ্বর হইতে কতকগুলি অত্যুজ্জ্বল আলোকরশ্মি নির্গত হইতেছে। পূর্ণিমার চন্দ্রে এই সকল রশ্মি অতি উজ্জ্বল ও স্পষ্টভাবে দৃষ্ট হয়; ইহারা পর্ব্বত, উপত্যকা গহ্বর প্রভৃতির উপর দিয়া বৈদ্যুতিক আলোকের ন্যায় সরল রেখায় ছুটিয়া যাইতেছে।

আমরা যদিও পৃথিবী হইতে দুরবীক্ষণ সাহায্যে এই সকল অদ্ভুত পদার্থ দর্শন করিতেছি, কিন্তু কখনও চন্দ্রে কোন গতিশীল পদার্থ দেখিতে পাই না। চন্দ্রবক্ষে সকলই নীরব ও নিশ্চল—যেন গভীর নিদ্রামগ্ন। সেখানে বায়ুহিল্লোল নাই, জলরাশির তরঙ্গবিক্ষেপ নাই, জীবগণের বিচরণ নাই, —অন্ততঃ পৃথিবী হইতে আমরা চন্দ্রে কোন প্রকার গতি প্রত্যক্ষ করি না। ইহার কারণ কি?

যতদূর জানা গিয়াছে, চন্দ্রের আকাশে বায়ু নাই, কাজেই চন্দ্রবক্ষে জল নাই। যদি জল থাকিত, বায়ুহীন আকাশে সে জল বাষ্পাকারে উড়িয়া যাইত। বায়ু ও জল উভয়ই যদি থাকিত তাহা হইলে আমরা নিশ্চয়ই চাঁদের আকাশে মেঘের খেলা দেখিতাম! কিন্তু এ যাবৎ কখনও কোন যন্ত্র-সাহায্যে চন্দ্রাকাশে মেঘ দেখা যায় নাই।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে পৃথিবীর প্রায় ১ মাসে চন্দ্রের দিবা-রাত্রি হয়। অতএব এক এক স্থান প্রায় ১৫ দিন দিবা ও ১৫ দিন রাত্রি ভোগ করে। দিবাভাগে প্রচণ্ড সূর্য্যকিরণে ভূমি দগ্ধ হইয়া যায়, আবার রাত্রিকালে সমস্ত উত্তাপ বায়ুহীন আকাশে বিকীর্ণ হইয়া যাওয়াতে

ভূমি তুষার-শীতল হইয়া পড়ে। এত তাপ ও শীতে কোন প্রাণীর পক্ষে সেখানে বাস করা একরূপ অসম্ভব। যদি এই অদ্ভুত দেশে কোন প্রাণী থাকিত তাহারা অতি প্রকাণ্ডকায় হইত। চন্দ্রের মাধ্যাকর্ষণ এত অল্প যে, যে মানুষের ওজন এখানে ১২ মণ চন্দ্রে তাহার ওজন মাত্র ১০ সের হইবে। অতএব সেখানকার দেড় মণ ওজনের একটী সাধারণ মনুষ্য লঙ্কার অতিকায় হইতেও ভীষণদেহ। কিন্তু এই সকল অতিকায় জন্তু এপর্য্যন্ত কখনও দৃষ্টিগোচর হয় নাই। অতএব প্রকাণ্ড পর্ব্বতশ্রেণী, উপত্যকা, গহ্বর প্রভৃতি পরিশোভিত চন্দ্রবক্ষ প্রকৃত পক্ষে এক মহা শ্মশান।

এখানকার নীরবতা কোনরূপেই ভগ্ন হয় না। শব্দ-বহের অভাবে এ রাজ্যে চির নিস্তব্ধতা বিরাজমান। নদ নদী না থাকাতে প্রাকৃতিক দৃশ্যের বিচিত্রতা অনেকাংশে লোপ পাইয়াছে। শীতোষ্ণের ঘোর পরিবর্ত্তনে পর্ব্বত-গাত্র নিয়ত ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে এবং তাহার শব্দ মৃত্তিকা দ্বারা ইতস্ততঃ নীত হইতেছে—তথাপি নিস্তব্ধতা দূর হয় না। এদেশে কোন শব্দ শ্রবণ করিতে হইলে মৃত্তিকায় কর্ণ রক্ষা করিতে হয়। এ দেশে যদি কোন জন্তু বাস করিত তাহার কাণ মস্তকে না হইয়া সম্ভবতঃ পদে হইত।

আমাদের পৃথিবী এক বায়ুমণ্ডলে আবৃত। এই বায়ুমণ্ডলে ধূলিকণা ও অন্যান্য কঠিন পদার্থের পরমাণু সকল সর্ব্বদা ভাসিয়া বেড়াইতেছে। সূর্য্যরশ্মি এই সকল কণাদ্বারা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া আকাশকে আলোকিত করে—নতুবা দিবাভাগেও আকাশমণ্ডল অন্ধকারাবৃত থাকিত এবং নক্ষত্রাদি দৃষ্টিগোচর হইত। চন্দ্রে বায়ুর এরূপ আবরণ না থাকাতে তাহার আকাশ কখনও উজ্জ্বল হয় না; অতএব অন্ধকার রজনীতে দূরস্থিত দীপালোকের ন্যায় দিবাভাগে নক্ষত্রপুঞ্জ দেখিতে পাওয়া যায়। জ্যোতিষ্কগণ-মধ্যে সূর্য্য তেজঃপুঞ্জরূপে বিরাজ করে। সম্ভবতঃ সূর্য্যের বায়বীয় আবরণও দেখিতে পাওয়া যায়।

চন্দ্রের রাত্রি কিরূপ?—চন্দ্রে বায়ুমণ্ডল নাই, এজন্য আকাশে আলোক প্রতিবিম্বিত হইতে পারে না, অতএব গোধূলির শোভা নাই—সূর্য্য ডুবিলেই দিনের আলো একেবারে নিবিয়া যায়। রাত্রিকালে চন্দ্রের দুই অর্দ্ধে দুই প্রকার দৃশ্য দেখা যায়। যে অর্দ্ধ আমাদের সম্মুখবর্ত্তী তাহার আকাশে পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্য-ভাণ্ডার লইয়া এক প্রকাণ্ড চন্দ্ররূপে আমাদের এই পৃথিবী উদিত হয়, এবং প্রায় ১৫ দিন পর্য্যন্ত একই স্থানে নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া থাকে। তাহারও ভিন্ন ভিন্ন তিথিতে হ্রাসবৃদ্ধি আছে। চন্দ্রের অপরার্দ্ধের দৃশ্য অতি অদ্ভুত। সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে ঘোর অন্ধকারে সমস্ত পদার্থ আবৃত হয়। উর্দ্ধাকাশে অসংখ্য তারকা উজ্জ্বল প্রদীপের ন্যায় জ্বলিতে থাকে। যে দিকে দৃষ্টিপাত কর তারকারাজি সাজিয়া রহিয়াছে—বড়, ছোট, অসংখ্য ও অত্যুজ্জ্বল। যে সকল নক্ষত্র আমাদের নিকট অদৃশ্য, অন্ধকারে প্রদীপের ন্যায় চন্দ্রাকাশে তাহারাও দীপ্তিমান। ছায়াপথ সেখানে ছায়ারূপী নহে—যে অগণ্য তারকারাজি লইয়া এই ছায়াপথ নির্ম্মিত হইয়াছে তাহাদের সকলেই চন্দ্রাকাশে দীপ্তি পাইতেছে। কিন্তু এই গ্রহনক্ষত্রের মহাসভায় কোন চন্দ্র উদিত হয় না। অতএব এই দেশে চির অমাবস্যা বিরাজমান। কোন জ্যোতির্ব্বিদ এই স্থানে যন্ত্র স্থাপন করিয়া উপবেশন করিলে ৩৫০ ঘণ্টাকাল অবিরাম গ্রহনক্ষত্রাদির গতি ও আকারাদি নিরীক্ষণ করিতে পারিতেন। তাঁহার লক্ষ্য মেঘ, চন্দ্রালোক অথবা গোধূলি দ্বারা বিকৃত হইত না। কিন্তু কি ভয়ানক রাত্রি!—১৫ দিনব্যাপী ঘোর অন্ধকার রাত্রি কল্পনাতেও কষ্টদায়ক!

শ্রীজগদীশচন্দ্র সেন।

কাব্যে লোক-শিক্ষা।

(৪)

মাইকেল মধুসূদনের পরই কবি হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের নামোল্লেখ হইয়া থাকে। মাইকেলের পর ইঁহারাই কবিতা রচনা করিয়া সাহিত্য-সমাজে যশস্বী হইয়াছিলেন এবং বাঙ্গালা দেশে আশ্চর্য্য প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন।

কবিবর হেমচন্দ্র বিবিধ বিষয়ে বিস্তর কবিতা রচনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে বৃত্রসংহার, দশমহাবিদ্যা ও কবিতা-

বলীরই অত্যন্ত প্রশংসা শুনিতে পাওয়া যায়। এই তিন খানি গ্রন্থের মধ্যেই তাঁহার রচনাশক্তি পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। ছন্দোবৈচিত্র্যে, শব্দলালিত্যে দশমহাবিদ্যার অনেকগুলি কবিতা সুখপাঠ্য। তা ছাড়া বৃত্রসংহার কাব্য অনেকটা মেঘনাদবধ কাব্যের অনুকরণে রচিত। আমরা বাল্যকাল হইতে এই কাব্যের প্রশংসা শুনিয়া আসিতেছি। অনেক বড় বড় লেখক এই গ্রন্থকে মহাকাব্যের মধ্যে গণ্য করেন। রবীন্দ্রবাবু মেঘনাদবধ কাব্যের সমালোচনায় বলিয়াছেন :—"হেম বাবুর বৃত্রসংহারকে আমরা এইরূপ নামমাত্র মহাকাব্যের শ্রেণীতে গণ্য করি না।" অর্থাৎ তিনি বৃত্রসংহারকে মহাকাব্য বলিয়াই মনে করেন। বৃত্রসংহার বাস্তবিকই মহাকাব্য কিনা, তাহা বিচার করিবার মত বিদ্যাবুদ্ধি আমাদের নাই। আমরা কেবল একটা কথা বলিতে পারি ; হেম বাবু কাব্যের চরিত্র অঙ্কনে মাইকেলের অপেক্ষা অনেক পরিমাণে কৃতকার্য্য হইয়াছেন বটে, কিন্তু মেঘনাদবধের কবির ন্যায় তাঁহার ভাব-সম্পদ কোথায় ? মেঘনাদবধ কাব্যে যেমন কবির কবিত্ব, উপমা-কৌশল ও শব্দযোজনার ক্ষমতা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়, বৃত্রসংহারে সেরূপ কবিত্ব, উপমাকৌশল ও বিচিত্র ধ্বনিযুক্ত শব্দাবলী দেখিতে পাওয়া যায় না। বৃত্রসংহারের পয়ার, ত্রিপদী প্রভৃতি ছন্দ মন্দ হয় নাই বটে, কিন্তু অমিত্রাক্ষর ছন্দ নির্জ্জীব ও প্রাণহীন।

যা হো'ক বৃত্রসংহার কাব্য সম্বন্ধে আমরা আর অধিক কিছু বলিব না। এই সর্ব্বজনপ্রশংসিত গ্রন্থখানির কাব্য-রস যথেষ্ট পরিমাণে আস্বাদন করিতে পারিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। সেই জন্যই বিস্তৃত ভাবে ইহার আলোচনা করিতে কুণ্ঠিত হইতেছি। তবে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, কবির চরিত্রকল্পনা প্রশংসনীয়। শচীদেবীকে কবি বেশ সুন্দররূপে অঙ্কিত করিয়াছেন। বৃত্রের পুত্রবধূ ইন্দুবালার ছবিখানিও অতিশয় মনোহর। হৃদয়ের মহত্ত্বে ও মাধুরীতে ইন্দুবালা সহজেই আমাদের চিত্তকে আকৃষ্ট করে। শচীদেবী ইন্দুবালার শত্রুপত্নী ;—তাঁহাকে বন্দিনী করিবার জন্য ইন্দুবালার স্বামী যুদ্ধে গমন করিয়াছেন ; অথচ ইন্দুবালা শচীর দুঃখ কল্পনা করিয়া, বিষাদে ম্রিয়মাণ হইয়া বলিতেছেন :—

"আমিও রমণী শচীও রমণী
তবে তিনি কেন তায়,
না করিয়া দয়া হইয়া নিষ্ঠুর
ধরিতে গেলা ধরায় !"

কিন্তু সমগ্র কাব্যখানির মধ্যে মহর্ষি দধীচির কাহিনীই অতিশয় চিত্তাকর্ষক। সান্ধ্য-গগনের একটি ক্ষুদ্র তারা যেমন অসীম নীলাকাশকে সুন্দর করিয়া তোলে, তেমনি মহর্ষি দধীচির সংক্ষিপ্ত কাহিনী এই সুবৃহৎ কাব্যখানিকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু হায়, গ্রন্থকার দধীচির আত্ম-ত্যাগের কাহিনী যদি আর একটু বিস্তৃত ভাবে বর্ণনা করিতেন ! তিনি কত দেবতা-দানবের দীর্ঘ কাহিনীতে গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছেন, দধীচির বর্ণনা অত সংক্ষেপে কেন ? দেববালাগণ ইন্দ্রকে দধীচি সম্বন্ধে বলিতেছেন :—

"ব্রত—পর উপকার, স্বার্থ-পরিহার ;
কল্পনা, কামনা, চিন্তা, পরের মঙ্গল ;
কিবা কীটে, কি পতঙ্গে সদা দয়াশীল,
মুনীন্দ্র কৃপার সিন্ধু—"

এই কয়েকটি সংক্ষিপ্ত কথায়ই মহর্ষি দধীচির মহত্ত্ব বুঝিতে পারা যাইতেছে ! ইহার পর ইন্দ্র দধীচির আশ্রমে গমন করিলেন। দধীচি ইন্দ্রের মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া, দেবতাদিগের হিতার্থে জীবন দান করিতে প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু তাহাতে তাঁহার শিষ্যদিগকে বিচলিত হইতে দেখিয়া বলিতে লাগিলেন :—

"হে বৎসমণ্ডলী, হেন সৌভাগ্যে আমার
কর সবে অশ্রুপাত ? এ ভবমণ্ডলে
পরহিতে প্রাণ দিতে পারে কত জন !
হিতব্রত সাধনেতে হৃদয়ে বেদনা ?
হায়রে অবোধ প্রাণী—এ নশ্বর দেহ
না ত্যজিলে পরহিতে, কিসে নিয়োজিবে ?
লভি জন্ম নরকুলে কি ফল হে তবে ?
* * *
জগত-কল্যাণ হেতু নরের সৃজন ;
নরের কল্যাণ নিত্য সে ধর্ম্ম পালনে ;
নিঃস্বার্থ মোক্ষের পথ এ জগতীতলে।"
* * *

কর্ত্তব্য নরের নিত্য স্বার্থ পরিহার,
জীবকুল কল্যাণ সাধন অনুদিন।"

অন্য কোন বাঙ্গলা কাব্যে দধীচির ন্যায় একজন যথার্থ ধার্ম্মিকের উজ্জ্বল চিত্র দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। দধীচির মহৎ চরিত্র অবলম্বনে স্বতন্ত্র একখানি উৎকৃষ্ট কাব্য রচিত হইতে পারে।

বৃত্রসংহারের মধ্যে লোকশিক্ষার উপযোগী বর্ণনার অভাব নাই। তবে তাহা কবিত্ববিহীন শুষ্ক কথা বলিয়াই আমাদের দুঃখ হয়।

(৫)

এখন আমরা কেবল মহৎভাবোদ্দীপক ও স্বদেশানুরাগ-পূর্ণ কবিতা সম্বন্ধেই আলোচনা করিব। এই শ্রেণীর কবিতাগুলিই সাক্ষাৎভাবে লোকশিক্ষার উপযোগী। তাহা বলিয়া এই কবিতাগুলি যে কাব্যাংশে নিকৃষ্ট হইবে, অথবা কাব্যানুরাগী ভাবুক ব্যক্তিদিগের মনোরঞ্জন করিতে পারিবে না, তাহা নহে। যে সকল গ্রন্থে কঠোর প্রস্তরখণ্ডের মত শুধুই নীতিকথা ও উপদেশ আছে, তাহাকে আমরা কাব্যের মধ্যে গণ্য করিতে ইচ্ছা করি না। কারণ কবিত্ব ও কাব্য-রস ব্যতীত শুষ্ক নীতিকথা বা উপদেশের কোন মূল্য নাই। উহা ডিরেক্টার সাহেবের টেক্‌ষ্ট বুক কমিটীর কাজে আসিতে পারে এবং বেতের ভয় দেখাইয়া তরুণবয়স্ক বালক-বালিকা-দিগকে গিলাইয়া দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু রসগ্রাহী পাঠকের নিকট ঐরকম কবিতার কোনই মূল্য নাই। তবে আমাদের সাহিত্যবাজারে যথার্থ ভাবুকের সংখ্যা নাকি অতি অল্প, তাই লেখকদিগের নামের জোরে শুষ্ক কাষ্ঠের ন্যায় অনেক রসহীন নীতিকথাও কবিতা-কুসুম বলিয়া ফুলের দামে বিকাইয়া যায়। আমাদিগকে বাধ্য হইয়া সেই সকল শুষ্ক কাষ্ঠের ভিতর হইতেও রস বাহির করিবার চেষ্টা করিতে হইবে।

আমরা হেমচন্দ্রের বৃত্রসংহার কাব্য সম্বন্ধে পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি। এইবার তাঁহার "কবিতাবলী" ও "বিবিধ কবিতা"র আলোচনা করিব।

"কবিতাবলী" হেমচন্দ্রের সর্ব্বোৎকৃষ্ট রচনা বলিয়া সর্ব্বত্র সমাদৃত; অথচ উহার অনেক কবিতার মধ্যে কাব্য-রসের যথেষ্ট অভাব আছে। তবে একথা আমাদিগকে বলিতেই হইবে যে, এই অবসন্ন জাতিকে জাগাইবার জন্য—এই দুর্দ্দশাগ্রস্ত জাতির আত্মত্যাগে ও স্বার্থ-ত্যাগে প্রবৃত্তি জন্মাইবার জন্য, উক্ত গ্রন্থের তুল্য গ্রন্থ আর নাই।

আমাদের মনে হয়, কবিতাবলীর অনেক উৎকৃষ্ট কবিতা লতাকুঞ্জের কুসুমিত লতিকা নহে; উহা ললিত লাবণ্যে ও মধুর গন্ধে সৌখীন পাঠকদিগের মনোরঞ্জন করে না। কিন্তু উহা বিদ্যুৎ-শিখা। উহার ভিতরে এমন তেজ আছে যে, নির্জ্জীব মানুষকে জীবন্ত করিতে পারে; উহার ভিতরে এমন শক্তি আছে যে, নিরাশ প্রাণে আশা উদ্দীপ্ত করিতে পারে; নিরুৎসাহ অলস মানুষকে কর্ম্মোৎ-সাহে উন্মত্ত করিয়া তুলিতে সমর্থ হয়। এই জন্যই আমরা এই কবিতাবলীর সমাদর করি।

বোধ হয়, সমগ্র বাঙ্গলা সাহিত্যের মধ্যে কবিতাবলীর "ভারত সঙ্গীত"ই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতীয় ভাবোদ্দীপক কবিতা। এই কবিতা যখন রচিত হইয়াছিল, তখন ইহা পাঠ করিয়া বাঙ্গালী পাঠক বিস্মিত হইয়াছিল। কারণ, বাঙ্গলা ভাষায় যে এমন জোরের কবিতা রচিত হইতে পারে, তাহা পূর্ব্বে কেহই মনে করেন নাই। এই কবিতা পড়িতে পড়িতে বাঙ্গালী জাতির শিরায় শিরায় বৈদ্যুতিক তেজ সঞ্চারিত হইয়াছিল, বাঙ্গালীর অন্তরে স্বদেশানুরাগ উদ্দীপিত হইয়া উঠিয়াছিল। এখন আবার এই স্বদেশী আন্দোলনে এই সঙ্গীতের প্রতি লোকের দৃষ্টি পড়িয়াছে। কত স্বদেশ-সেবক জাতীয়ভাবে পূর্ণ হইয়া উচ্চকণ্ঠে গাহিতেছেন :—

"এখনো জাগিয়া উঠরে সবে,
এখনো সৌভাগ্য উদয় হবে,
রবিকর-সম দ্বিগুণ প্রভাবে
ভারতের মুখ উজ্জ্বল ক'রে।
একবার শুধু জাতিভেদ ভুলে
ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ বৈশ্য শূদ্র মিলে,
কর দৃঢ় পণ এ মহীমণ্ডলে
তুলিতে আপন মহিমা-ধ্বজা।

এই "ভারত-সঙ্গীত" ব্যতীত "কবিতাবলী"র মধ্যে জাতীয় ভাবোদ্দীপক ও অন্যান্য কতকগুলি প্রাণস্পর্শী কবিতা আছে। তন্মধ্যে ভাবিবার, শিখিবার ও করিবার

অনেক বিষয় আছে। উহা প্রত্যেক স্বদেশহিতৈষী ব্যক্তিরই পাঠ করা কর্ত্তব্য।

"কবিতাবলী" ব্যতীত হেম বাবুর "বিবিধ কবিতা"রও অনেকগুলি কবিতা সুমিষ্ট এবং চিত্তাকর্ষক। উহার ছন্দ ও ভাষা অতিশয় মনোহর। উক্ত গ্রন্থের কয়েকটি হাস্যোদ্দীপক কবিতা, হাস্যরসে পাঠকের মনকে সরস ও উৎফুল্ল করিয়া তোলে। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা "রীপণ-উৎসব"-শীর্ষক কবিতাটীই আমাদের পুনঃ পুনঃ পাঠ করিতে ইচ্ছা হয়। ভাবিয়া দেখিলে রীপণের সময় হইতেই আমাদের জাতীয় জীবনে এক নূতন ভাব প্রবেশ করিয়াছে, স্বদেশের উন্নতির জন্য চিত্ত আকুল হইয়া উঠিয়াছে। তৎকালে আমাদের সূক্ষ্মদর্শী কবি, তাঁহার উদার কল্পনায় ভাবী ভারতের সৌভাগ্য চিন্তা করিয়া কি সুন্দর কবিতাটিই রচনা করিয়াছিলেন! কবিতাটি পড়িলে বুঝা যায়, স্বদেশহিতৈষী কবি কিরূপ ব্যাকুলচিত্তে মাতৃভূমির কল্যাণচিন্তা করিতেন!

কবি রীপণোৎসবে ভারতবাসীর জাতীয় ভাব ও স্বদেশানুরাগ দেখিয়া আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছেন এবং আশায় উৎফুল্ল হইয়া লিখিয়াছেন :—

"ভুলোনা ভারত রীপণ-উৎসব
ছিঁড়ো না যে ডোরে মিলেছ আজ,
এক বাণী ধর ভারত-সন্তান
যেখানে যে থাক পর যে সাজ।
মনে করো সবে নিভৃতে ;—উৎসবে
রীপণ-বিদায় নহে এ খালি।

* * *

আজি আর কালি পাবেরে সকলি
আর এ ভারত নিদ্রিত নয়,
সম তৃষ্ণাতুর সব পুত্র তার
একই পথ পানে চাহিয়া রয়।
একই পথ পানে চাহে মহারাষ্ট্র
চাহে যে পারসী, পঞ্জাবী, শিখ,
চাহে ভারতের বীর পুত্রগণ
রাজোয়ারাময় যত নির্ভীক।
ভারত-নন্দন মহম্মদীগণ—
তাহারাও আজি জাগো মা বলে ;

* * *

একা বঙ্গ নয়, হিমালয় হতে
কুমারী প্রান্ত যেখানে শেষ,
আজি একপ্রাণ হিন্দু মুসলমান
জাগাতে তোমারে জেগেছে দেশ!

এই শ্লোকগুলি পাঠ করিয়া স্তম্ভিত হইতে হয়। মনে হয়, হেমচন্দ্রের অ-শরীরী আত্মা আজিকার এই স্বদেশী আন্দোলনের মধ্যে যেন উপস্থিত আছেন ; তাই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া এই শ্লোকগুলি রচনা করিয়াছেন এবং লোকচক্ষুর অগোচরে উহা তাঁহার গ্রন্থাবলীর মধ্যে নিবদ্ধ করিয়াছেন! চিন্তাশীল কবিরা এইরূপ ভবিষ্যদ্দর্শীই বটে।

হেমচন্দ্রের কবিতার আর একটি বিশেষত্ব আছে। আমাদের সমাজে যে সকল কুরীতি ও কুসংস্কার ছিল এবং এখনো আছে, তিনি তাহার বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। হেমচন্দ্র যেমন স্বদেশহিতৈষী ছিলেন, তেমনি তাঁহার করুণ হৃদয় অতিশয় কোমল ছিল। তাই তিনি নারীজাতির দুঃখ সহিতে পারেন নাই। হিন্দুজাতির নারীদিগের প্রতি যে ব্যবহার, তাহাকে তিনি পৈশাচিক কাণ্ড মনে করিয়াছেন ; সেই জন্য মনের মর্ম্মান্তিক যাতনায় লিখিয়াছেন :—

"অরে কুলাঙ্গার হিন্দু দুরাচার,
এই কি তোদের দয়া সদাচার?
হয়ে আর্য্যবংশ অবনীর সার
রমণী বাঁধছ পিশাচ হয়ে!
এখনো ফিরিয়া দেখ না চাহিয়া
জগতের গতি ;—ভ্রমেতে ডুবিয়া
চরণে দলিয়া মাতা, সুতা, জায়া
এখনো রয়েছ উন্মত্ত হয়ে?"

হেমচন্দ্র হিন্দুজাতিকে শুধু এই তিরস্কার করিয়াই ক্ষান্ত রহিলেন না। তিনি স্বদেশবাসীদিগকে দুঃখের কাহিনী বুঝাইবার জন্য "কুলীন-মহিলা-বিলাপ"-শীর্ষক একটি কবিতা রচনা করিলেন। এই কবিতায় রমণীগণ বিলাপ করিয়া বলিতেছেন ;—

"আয় আয় সহচরী, ধরিগে বৃটনেশ্বরী
করিগে তাঁহার কাছে দুঃখের রোদন,

এ জগতে আমাদের কে আছে আপন ?
বিমুখ নিষ্ঠুর ধাতা, বিমুখ জনক ভ্রাতা,
বিমুখ নিষ্ঠুর তিনি পতি নাম যাঁর,
আশ্রয় ভারতেশ্বরী ভিন্ন কেবা আর ?
* * *
সাত শত বর্ষ মাতঃ পৃথিবী ভিতরে
এইরূপ অহরহঃ অশ্রুধারা ঝরে,
* * *
হিন্দু বৌদ্ধ মুসলমান ম্লেচ্ছ অধিকার
শাস্ত্র ধর্ম্ম মতামত কতই প্রকার,
উঠিল ভারত ভুমে, হইল পতন,
আমাদের দুঃখ আর হ'ল না মোচন !"

নারীদিগের এই করুণ বিলাপ পাঠ করিয়া কত হৃদয়-বান ব্যক্তির চিত্ত বিগলিত হইয়া গিয়াছিল, তাহা কে বলিবে ? এখন ত নারীজাতির অবস্থা তবু একটু ভাল হইয়াছে। কিন্তু হেমচন্দ্র যখন এই কবিতা রচনা করেন, তখন নারীজাতির অবস্থা যেরূপ শোচনীয় ছিল, তাহা স্মরণ করিয়া সমাজকে ধিক্কার না দিয়া পারা যায় না। এখনো বেহার অঞ্চলে বাস করিলে, নারীদিগের দুর্গতি দেখিয়া হিন্দুসমাজের প্রতি আর কিছুতেই শ্রদ্ধা রাখা যায় না।

হেমচন্দ্রের যৌবনকালে হেমচন্দ্র প্রভৃতি অনেক স্বদেশ-হিতৈষী লেখক নারীজাতির উন্নতির জন্য এবং সামাজিক দুর্গতি দুর করিবার জন্য লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন ; তাই আমাদের সমাজ কিঞ্চিৎ উন্নত হইয়াছে। কিন্তু এখনো আমাদের সমাজ উন্নত আদর্শ হইতে কত দূরে পড়িয়া রহিয়াছে। এখনো আমাদের অসংখ্য রমণীর অবস্থা ইতর প্রাণীর অপেক্ষা বড় যে অধিক উন্নত, তাহা নহে। তাঁহারা জ্ঞান ও গৌরব হইতে বঞ্চিত হইয়া, আহার নিদ্রা এবং সন্তানরক্ষা—প্রধানতঃ এই তিন কাজেই সন্তুষ্ট থাকেন। তদ্ভিন্ন অন্যান্য দেশের নারীগণ যে সাহিত্য, বিজ্ঞান ও কাব্যকলার রসাস্বাদন করিতেছেন, এবং সাহিত্য বিজ্ঞানে নিজেরও কৃতীত্ব দেখাইতেছেন ; ধর্ম্মসাধনে ও স্বদেশের সেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়া গৌরবান্বিতা হইতে-ছেন এবং সন্তানদিগের শৈশব-শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদের অন্তরে মহৎভাব ও গৌরবস্পৃহা জাগাইয়া তুলিতেছেন ;—সে খবরও তাঁহারা রাখেন না ; সেরূপ আদর্শও তাঁহাদের কাছে প্রকাশিত হয় না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ইহার নিমিত্ত এদেশের লেখকদিগকে ক্ষোভ করিতেও দেখা যায় না। বরং দৈবাৎ কোন লেখক এই সম্বন্ধে কিছু লিখিলে, এদেশের অনেক লেখক বিদ্রূপ উপহাস করিয়া তাহাকে নাস্তা নাবুদ করিতে চাহেন। তবে সুকবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় সময় সময় সামাজিক কুসংস্কারের দুর্গের উপর গোলা-গুলি ছুঁড়িয়া থাকেন বটে ! ইহাতে যে সমাজের উপকার হয় না, তাহা কে বলিবে ? বর্ত্তমান সময় কবিগণ যেমন জাতীয় ভাবের সঙ্গীত ও কবিতা রচনা করিতেছেন, তেমনই তাঁহাদের সামাজিক দুর্নীতি ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে কবিতা রচনা করা আবশ্যক। নচেৎ বাঙ্গালীর সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি কখনই সম্ভব হইবে না।

শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত।

ব্যাপ্তি।

তুমি ছিলে, হে সুন্দরি, একান্ত যতনে
অন্তরের অন্তঃপুরে ; জানি না কেমনে
বাহিরিয়া চুপে চুপে
শতদলে শতরূপে
মিশিয়া গিয়েছ আজি নিসর্গের সনে !

বনে বনে উঠে নিত্য উষায় বিকাশি'
স্মিত শুভ্র পুষ্পদলে—ওই সুধাহাসি ;
সুনির্ম্মল নীলাকাশে
নয়ন-নীলিমা ভাসে,
শিশিরে—তোমারি হেরি অশ্রুমুক্তারাশি !

শ্রাবণে গগনভরা নীরদ চঞ্চল,—
বেণীমুক্ত যেন তব নিবিড় কুন্তল।
শ্যামল কানন-শিরে
সন্ধ্যা টানি' দেয় ধীরে
সুবর্ণরঞ্জিত যেন তোমার অঞ্চল।

মৃদু কলতানে নদী বহে নিরন্তর,
তা'রি সাথে মিশিয়াছে তোর কণ্ঠস্বর !
দখিণা পবন—তোর
দেহের সৌরভে ভোর,
পরশি আকুল করে আমার অন্তর।

শ্রীরমণীমোহন ঘোষ।

তালগাছের কথা।

এতদিন পরে তালপুকুরের রাস্তা দিয়ে ও কে যায় ? আজ কাল আর মানুষের মুখ দেখিতে পাই না—একটু বস্‌বে ? বস না। এখানে আর রৌদ্র নাই, আমার পায়ের কাছে ঘাস গুলিও বেশ নরম—একটু বস।

তালপুকুর বল্লাম বলে হাসি পাচ্ছে ! পাবারই কথা ; কোথায় তাল, আর কোথায় পুকুর ! কিন্তু এই পুরাণ নামটি বল্‌তে গেলে আমার শরীরের প্রতি তন্তু শিহরিয়া উঠে, আমার পাতা ক'খানি অজ্ঞাতে কাঁপিয়া উঠে। কথাটা আর একটু খোলসা করে বলি—তুমি শুন্‌ছ ত ?

যেখানে আজ নিরবচ্ছিন্ন বন দেখ্‌ছ, সেখানে ত্রিশ চল্লিশ বৎসর আগে বেশ একটি ছোট খাট গ্রাম ছিল। গ্রামটির নাম তালপুকুর। আর যে সঙ্কীর্ণ বনপথ ধ'রে তুমি আজ এখানে উপস্থিত, তারও বেশ একটা ইতিহাস আছে। সংক্ষেপে এই টুকু জানিয়া রাখ, যে কোন পুণ্যবতী ভূম্যধিকারিণী, এই গ্রামের পার্শ্ববর্ত্তী নদীতে স্নান করিবার জন্য এক বিস্তৃত রাজপথ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তারই শেষ চিহ্ন এই বনপথ, আর সে নদী এখন কালস্রোতের পশ্চাতে পশ্চাতে বহুদূর গিয়া পড়িয়াছে।

আমার বেশী ছোট বেলাকার কথা মনে পড়ে না—কারই বা পড়ে। অতীতের যে শেষ স্তরে গিয়া আমার স্মৃতি অবসন্ন হইয়া পড়ে, সে বড় মধুর। আষাঢ় মাসের প্রথম ; সকাল বেলা ; আকাশে ধূসর বর্ণের মেঘ জমিয়া রহিয়াছে। ওই যে, যেখানে একটু উঁচুতে কতকগুলা ভেরাণ্ডা গাছ হয়েছে, ওই খানে আমার অধিকারী বাচস্পতি মহাশয়ের চণ্ডীমণ্ডপ ছিল। বাচস্পতি মহাশয়ের ঠাকুরদাদা তখন ছোট। চণ্ডীমণ্ডপের পাশেই একট ফুলের বাগান ছিল। কামিনীফুলের পাপ্‌ড়িগুলি ঝুর্‌ঝুর্‌ করিয়া ঝরিতেছিল। সকালে সকালে কালিপদ ও জীবনতারা দুটি ভাইবোনে এক জন ডোম সঙ্গে ক'রে এসেছে। আমার কিন্তু সে সব বড় ভাল লাগিত। ডোম মুখ কাটিয়া ছোট ছোট কচি কচি ফলগুলি গালে তুলিয়া দিতেছে, আর সাগ্রহে সাহ্লাদে দুই জোড়া ছোট কচি হাত তাহা লইয়া মুখে তুলিতেছে, দেখিয়া আমার ফলভার বহন করা সার্থক বোধ হইত। অকিঞ্চিৎকর ছায়াহীন তাল বৃক্ষ যে বৃথা প্রকৃতির কোলে স্থান পায় নাই, এই সচেতনতার অপূর্ব্ব পুলকে আমার বৃক্ষ-জীবন প্রকৃত পক্ষে আরম্ভ হইয়াছিল।

তুমি মনে করিতেছ, আমি বুঝি চিরকাল এমনি একা দাঁড়াইয়া আছি। দাঁড়াইয়া আছি সত্য, কত শীত, কত বর্ষা আমার রৌদ্রতপ্ত, শিশিরসিক্ত পাতাগুলির উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে, কতকাল ধরিয়া মানুষের সুখদুঃখের, গ্রামের উত্থান-পতনের আমি নীরব সাক্ষী। কিন্তু আমি একা ছিলাম না, ভাইগুলির মত চারিদিকে ঘেসাঘেসি করিয়া আমার মত আর সাতটি গাছ দাঁড়াইয়াছিল—একটু লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইবে, তাহাদের ক্ষয়িত মূল মৃত্তিকা-চ্ছাদিত হইয়া সমাধিচিহ্নের মত এখনও আশে পাশে বর্ত্তমান আছে।

সে কথা যাক্‌ ; বাচস্পতি মহাশয়ের জীবনতারা বলে ছোট মেয়েটিকে আমি বড় ভালবাসিতাম,—ভালবাসিতাম অর্থাৎ দেখিলে বড় আহ্লাদ হইত। সমুখে ওই যে অশথ গাছটি রয়েছে, ওটা তখন আরও ছোট ছিল ; ওর তলায় একখানা সিঁদুরমাখান পাথর ছিল ব'লে লোকে ওখানটাকে 'ষষ্ঠীতলা' বলিত। কচি মেয়েটিকে যখন একদিন শাঁখ বাজিয়ে খই ছড়িয়ে, পাথরটার সমুখে মাথা ছুঁইয়ে, ষষ্ঠীতলা থেকে ফিরিয়ে নিয়ে আসছিল, তখন তার বড় বড় কাজল-পরা চোখ দুটি দেখে আমার বড় আহ্লাদ হয়েছিল। তুমি বোধ হয় বিশ্বাস কর্‌চ না ; গাছের আবার আহ্লাদ কি ? আমার এই দুঃখ, তোমরা তাহা বুঝ না। গাছের যে তৃপ্তি-অতৃপ্তি, আকাঙ্ক্ষা বেদনা প্রভৃতি চেতনবৃত্তি থাকিতে পারে তা' তোমাদের মনে হয় না। আচ্ছা, যখন সমস্ত রাত্রির অন্ধকারের পর প্রভাতের সূর্য্যকিরণ আমার উপর

আসিয়া পড়ে, তখন অন্ধকার-পীড়িতের আলোক প্রাপ্তি জনিত একটা তৃপ্তি—একটা স্বচ্ছন্দতার আভাস কি আমার মুখে জাগিয়া উঠে না? যখন নিদাঘ-মধ্যাহ্নের অবসানে পশ্চিম দিকে কালো মেঘ উঠে, তখন আমার দিকে চাহিলে কি মনে হয় না, একজন তাপ-পীড়িত শীতল বারি-সেকের আশায় উৎকণ্ঠিত, উৎগ্রীব হইয়া আছে?

জানি না তুমি বিশ্বাস করিবে কি না, কিন্তু সত্য বলিতেছি, আমি বালক হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সকলের সহিত সমভাবে সহানুভূতি অনুভব করিয়াছি। যখন প্রত্যূষে নদীতে স্নান করিয়া বৃদ্ধ বাচস্পতি মহাশয় একখানি নামাবলি গায়ে দিয়া ভক্তি-গদগদ কণ্ঠে মহিম্নস্তব আবৃত্তি করিতে করিতে বাটী আসিতেন, তখন পূর্ব্বাকাশে নবোদ্ভাসিত রক্তিমচ্ছটার দিকে চাহিয়া ও ব্রাহ্মণের কণ্ঠোচ্চারিত সুমধুর সংস্কৃত শুনিয়া আমার এক অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইত, পাতাগুলি নিস্পন্দ হইয়া কি এক ভক্তি-রোমাঞ্চের সৃষ্টি করিত। আবার যখন অপরাহ্নে ছেলেরা কপাটী খেলিয়া ছুটাছুটি করিয়া ক্লান্ত হইয়া আমার তলায় আসিয়া বসিত, তখন আমার এই নীরব হৃদয় অতিথি-বাৎসল্যে উদ্বেল হইয়া উঠিত। ক্রমে অন্ধকার নদীবক্ষে প্রতিফলিত হইত, ওপারের আমবাগান অস্পষ্ট কালির দাগের মত দেখাইত, অদূরে ধান্যক্ষেত্রের স্বর্ণশীর্ষগুলি ঈষৎ অবনমিত করিয়া সর্ সর্ শব্দে মৃদু বাতাস বহিয়া যাইত; তখন বালকদিগের আলাপ জল্পনে ও আমার পাতাগুলির আনন্দ-মর্ম্মরে সন্ধ্যা বেলাটি সজীব হইয়া উঠিত।

আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন ওই যে বড় তেঁতুল গাছটায় বাদুড় ঝুলিতেছে—তুমি বুঝি দেখিতে পাইতেছ না? আমার ওই একটা বেশ সুবিধা; চলিতে পারি না বটে, কিন্তু খুব উঁচু বলিয়া বেশ দেখিতে পাই। সকলের আগে ঝড় হইবে কিনা বুঝিতে পারি, কারণ, মেঘখানা আকাশের কোলে উঠ্‌তে না উঠ্‌তে আমি দেখিতে পাই। এমন কি যখন বাড়ীর ভিতর রান্নাঘরের দাওয়ায় নিরাভরণা বাচস্পতি-গৃহিনী, একখানি কস্তাপেড়ে শাড়ী পরিয়া, শাখা হাতে দিয়া, চতুষ্পাঠীর ছাত্রদিগকে প্রসন্নমুখে অন্নব্যঞ্জন পরিবেশন করিতেন, তখন আমি বেশ দেখিতে পাইতাম, আর তখন তাঁহাকে বেশ সুন্দর দেখাইত! হাঁ, কি বলিতেছিলাম? ওই তেঁতুল গাছের কাছে তখন বাজার বসিত, আর ওই বাজারের পাশে একটু মাঠের মত ছিল, সেইখানে প্রতি বৎসর রথের মেলা বসিত। সে সময় বালকবালিকার হর্ষধ্বনি, প্রবহমান জলস্রোতের কলরব আর পণ্যবিক্রেতার অকারণ হুড়াহুড়ি সমগ্র পল্লীতে একটা নব জীবনের সঞ্চার করিত। ছেলেমেয়েদের হাতে—পাঁপরভাজা, মাটীর রথ ও কাঠের বাঁশী—আর মুখে হাসি। জীবনতারা প্রায় একখানি ছোট বঁটি, একটা সোনার পাখী, আর ছোট ছোট মাটীর হাঁড়ি কিনিয়া আনিত। পরদিন বুঝি তার ছোট খেলাঘরটিতে সইএর নিমন্ত্রণ হইত—বড় ধুম পড়িয়া যাইত। আজ এই বিজন নিস্তব্ধতার মধ্যে সে সব আনন্দের চিত্র মনে হইলে আমার শুষ্ক পাতাগুলির ভিতর একটা হাহাকার জাগিয়া উঠে, মনে হয়, যাহা গিয়াছে তাহা স্বপ্ন, স্মৃতি—চিন্তাবিকার। কিন্তু সে সব স্বপ্নে মনে করিতে আমার প্রাণ ফাটিয়া যায়, সে যে সেদিনকার কথা!

একদিন জীবনতারার বিবাহ হইয়া গেল। একখানি লাল চেলীতে সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া নববধূবেশে ছোট মেয়েটি পাল্কীতে উঠিল। তার পর বহুদিন তাকে দেখি নাই। আবার যখন দেখিলাম তখন সে বিধবা। চণ্ডীমণ্ডপের সম্মুখে যে বকফুলের গাছটি ছিল, এক শরতের নির্ম্মল প্রভাতে স্নানান্তে শুভ্র বসন পরিয়া তাহার একটি শাখা নীচু করিয়া পূজার ফুল পাড়িতেছিল। ছেলেবেলাকার তাহার সেই নোলকপরা হাসিমাখা মুখখানি, তার পর সেদিন পাল্কিতে উঠিবার সময়, বিদায়কালের ব্যথাভরা অথচ সলজ্জ মুখের ভাবটি মনে পড়িয়া গেল। মনে হইল, সে দিনও যে দাদার সঙ্গে কাচপোকা ধরিতে আমার তলায় ছুটিয়া আসিয়াছে, তাহার সহিত আজিকার ওই শুভ্রবসনা অষ্টাদশবর্ষীয়া সন্ন্যাসিনীর ম্লানকান্তি বিষাদগম্ভীর মুখের কি কোন সাদৃশ্য আছে? সংসারের প্রবেশপথে যে মলয়ান্দোলিত মাধবীলতাকে দেখিয়াছিলাম, সংসার হইতে নির্ব্বাসিত আজিকার ওই একান্তসঙ্কুচিত লতাটি কি তাহাই? মনে হইল জীবনতারা মরিয়াছে।

মনুষ্যের সুখদুঃখ আমার সমস্ত উদ্ভিদ্-প্রাণকে অধিকার করিয়াছিল। তরঙ্গতাড়িত বেলাভূমির মত, কাল আমার উপর যে তরঙ্গচিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে উহা মানুষের

দুঃখে বিশীর্ণ আমার দেহের এক একখানি অস্থিপঞ্জর। যখন নব বরষায় ঘনঘোর মেঘ দিগন্ত ছাইয়া ফেলিত, নদীর জল কালো হইয়া উঠিত, আকাশের গায়ে শ্রেণীবদ্ধ বকগুলি আরও সাদা দেখাইত, তার পর, পরপারের আম-বাগানের উপর দিয়া, গ্রামপ্রান্তের পরিণত-ফল শ্যামজম্বুবন মুখরিত করিয়া বড় বড় স্নিগ্ধ শীতল ফোঁটাগুলি নামিয়া আসিত, নদীর জল কূলে কূলে ছাপিয়া উঠিত, শস্যক্ষেত্র সদ্যস্নানে উজ্জ্বল হইয়া উঠিত, তখন আমার প্রাণ শান্ত-তাপ গ্রামখানির স্বচ্ছন্দতার মধ্যে পূর্ণ তৃপ্তি লাভ করিত। আবার যখন, বৈশাখ-অপরাহ্নে আকাশে এক রুদ্র অভিনয়ের আয়োজন হইত, তখন আসন্ন ঝড়ে নিজের দুরবস্থা অপেক্ষা দরিদ্রের জীর্ণভিত্তি আশ্রয়টুকুর পরিণাম চিন্তা আমায় ব্যাকুল করিয়া তুলিত। কিন্তু এরূপ হর্ষে-বিষাদে আশায়-চিন্তায় একটা তৃপ্তি ছিল। কেবল যখন মনে হইত, আর ফল নাই বলিয়া কেহ আমার দিকে চাহে না, তখন আমার অভিমানভরা হৃদয়ে একটু ব্যথা অনুভব করিতাম; মনে হইত, ফল নাই বলিয়া আর কেহ ত' আমাকে অবজ্ঞা করে না; মেঘ তাহার বারিবিন্দু দিয়া তেমনি আমার অঙ্গগ্লানি ধৌত করে, প্রাতঃসূর্য্য উঠিবা-মাত্র তাহার স্বর্ণকিরণচ্ছটা আমার মুখে মাখাইয়া দেয়, অস্তমান সূর্য্যও কম্পিত করে তেমনি আমাকে আশীর্ব্বাদ করে, মানুষ কেন চাহিয়া দেখে না। মানুষ যে আমার অনেক উপকার করিয়াছে, তাহার সুখদুঃখের মধ্যে আমাকে অতি আপনার জনের মত টানিয়া লইয়াছে, কাঁদিয়া কাঁদাইয়াছে, হাসিয়া হাসাইয়াছে, তখন তাহা বুঝিতে পারি নাই; তবে বুঝিতে বড় বিলম্বও হয় নাই।

কয়েক বৎসর পরে তালপুকুরে মহামারী আসিল। উপর্য্যুপরি দুই বৎসর ওলাউঠায় ছোট গ্রামখানি বিধ্বস্ত হইয়া গেল। তখন দিকে দিকে মৃত্যুর ছায়া; একটা বিষাদ—একটা অন্ধকার—জল স্থল আবরিয়া রহিয়াছে। রাখাল বালক আর মাঠে গান গাহে না, জেলেরা নদীতে মাছ ধরিতে আসে না; সন্ধ্যার সময়, শ্যামসুন্দরের মন্দিরে আর আরতির ঘণ্টা বাজিয়া উঠে না, একটা শীতল নিস্তব্ধতা গ্রামখানিকে দ্বিগুণ চাপিয়া ধরে। গ্রাম শ্মশান হইয়া গেল। আমি এইখানে দাঁড়াইয়া সব দেখিয়াছি। বৃদ্ধ বাচস্পতি মহাশয়ও তাঁহার বিধবা কন্যা ছাড়া তাঁর সংসারে আর কেহ রহিল না। তাঁহারাও একদিন কোথায় চলিয়া গেলেন, জানিতে পারিলাম না। চণ্ডীমণ্ডপ পড়িয়া গেল, ফুলের বাগান জঙ্গল হইয়া উঠিল, ধ্বংসপ্রায় গৃহখানি শৃগালের বাসস্থান হইল। তার পর বৎসরের পর বৎসর চলিয়া গিয়াছে—কত শ্রাবণের বারিধারা, হেমন্তের শীত-কুহেলি, শূন্য নগ্ন গ্রামটির উপর দিয়া বিনা অভ্যর্থনায় চলিয়া গিয়াছে—আমার বেদনাময় স্মৃতির একটি পাতাও অস্ফুট করিতে পারে নাই। জানি না কেন, যখন সন্ধ্যা হয়, আকাশে একটি একটি করিয়া তারা জ্বলিয়া উঠে, আর নিরবচ্ছিন্ন বৃক্ষশ্রেণী অন্ধকারে পরস্পরে মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করিয়া ভূতের মত দাঁড়াইয়া থাকে, তখন দূর হইতে একটা অস্ফুট গুঞ্জনধ্বনি ভাসিয়া আসে ও আমার শুষ্ক জীর্ণ পাতাগুলির ভিতর একটা খড়্‌খড়্ শব্দ জাগিয়া উঠে।

আর তোমার এখানে বসিয়া কাজ নাই, রাত্রি আসি-তেছে, শীঘ্র অন্ধকার চারিদিক ঘেরিয়া ফেলিবে। আমার কিন্তু এখন অন্ধকার ভাল লাগে; দিনের আলোক গ্রামের ধ্বংসচিত্র আঙুল দিয়া দেখাইয়া দেয়, কিন্তু অন্ধকার অতি ধীরে, অতি সন্তর্পণে তাহার উপর একটা আবরণ টানিয়া ফেলে—আমি একটু অন্যমনস্ক হইবার সুবিধা পাই।

আচ্ছা, তুমি যে গ্রাম হইতে আসিতেছ তাহা কি আমার তালপুকুরের মত? সন্ধ্যা হইলে সেখানে কি ঘরে ঘরে প্রদীপ জ্বলিয়া উঠিবে? গৃহস্থবধূরা শাঁক বাজাইবে ত? অন্ধকার নদীবক্ষে বুঝি নৌকাগুলির আলো চিক্ চিক্ করিবে, আর কর্ম্মশ্রান্ত মাঝিদের গান বাতাসে ভাসিয়া আসিবে?

তুমি যাও। আমি দাঁড়াইয়া আছি—যন্ত্রণার অবসান-প্রতীক্ষায়। যেন সন্ধ্যার সময় কি রাত্রিশেষে, যখন আমার পাতাগুলি এলাইয়া পড়িবে, দিগন্তে সূর্য্যচ্ছটা নিবিয়া যাইবে, কিম্বা নবীন আলোকে পূর্ব্বদিক্ জ্বলিয়া উঠিবে, তখন একটা প্রবল বাতাস, কি একটা ছোট ঝড় অতর্কিতে আসিয়া আমায় ভূলুণ্ঠিত করে—আমি আমার গ্রামের কোলে ঘুমাইয়া পড়িব।

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার।

জাগরণ। *

আশাহীন হৃদি হায়! তবু অকারণ
এতকাল করিলাম বৃথা জাগরণ।
অতৃপ্ত পরাণ শুধু তমসা-আগার,
অপেক্ষায় আছি, খোল ত্রিদিব দুয়ার!
স্বরগের দূতরূপে হেথা এসেছিলে,
যতদিন ছিলে ভবে কি সুধা ঢালিলে!
সদাই মোহের ঘোরে ছিনু অচেতন,
প্রয়াস পাইতে কত নাশিতে বন্ধন।
দূর হ'তে লক্ষ্য ক'রে কাঁপিত হৃদয়,
ভাবিতাম এই বুঝি গ্রাসিল প্রলয়।
আমার কল্যাণ-তরে মুদিতে না আঁখি,
এখনও সেই দৃশ্য সমুখেতে দেখি।
আমি যে গো অতি হীন ধুলার মতন,
বুঝি নাই কিবা অর্থ তব জাগরণ।
মঙ্গল হইবে ভেবে সভয় হৃদয়ে
যেতেম সদাই হায় দূরে পলাইয়ে।
সেই স্মৃতি শেলসম বিঁধিছে এখন,
বৃথা কি গিয়েছে দেব তব জাগরণ?
এখন ত নাই ঘুম, ভেঙ্গেছে স্বপন,
পাই না কেন গো তবে তোমার সন্ধান?
মনে হয় দিবে দেখা আকাশের গায়,
সফল হয় না আশা করি হায় হায়।
কতকাল রব ভবে শুধু জাগরণ,
শুনিব না এই কাণে তোমার আহ্বান!
শুধু হাহাকার, আর অশ্রু বরিষণ
অদৃষ্টেরে নিন্দা আর বৃথা জাগরণ!

স্বর্ণপ্রভা বসু।

* স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসু মহাশয় আদর্শ-পুরুষ ছিলেন। দ্বিতীয় ভাগ "ভারত-মহিলা"র দ্বিতীয় সংখ্যায় সঞ্জীবনী-সম্পাদক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয় "আদর্শ-পুরুষ আনন্দমোহন" নামক প্রবন্ধে তাঁহার চরিত্রের সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশের বিষয় বিস্তৃতরূপে আলোচনা করিয়াছেন। ধর্ম্মসমাজে, সমাজ-সংস্কারে, রাজনৈতিক আন্দোলনে, গৃহ পরিবারের সকল সম্বন্ধের মধ্যে, তিনি তাঁহার জীবনের উচ্চ আদর্শ রক্ষা করিতে সর্ব্বদা যত্নশীল ছিলেন। স্বর্গীয় মহাত্মার পত্নীলিখিত এই কবিতাটীতে স্বীয় পত্নীকে ধর্ম্মজীবনে অগ্রসর করিবার জন্য— প্রকৃতই সহধর্ম্মিণী করিবার জন্য—তিনি প্রতিনিয়ত কিরূপ চেষ্টা করিতেন, তাহার সুন্দর আভাস পাওয়া যায়। বস্তুতঃ শত গুণে গুণবান হইলেও, শত মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেও, স্ত্রীকে শত সাংসারিক সুখে সুখী করিলেও, যে পতি স্বীয় পত্নীকে আধ্যাত্মিক সম্পদে ভূষিত করিতে কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করেন না, তিনি কখনও আদর্শ পতি নহেন। ভাঃ মঃ সঃ।

চিত্রের কথা।

বর্ত্তমান সংখ্যার প্রথম ও দ্বিতীয় চিত্র দুখানি জনৈক যুদ্ধযাত্রী সৈনিকের পত্নীর। পতি যুদ্ধে গিয়াছেন, আর ফিরিবেন কি না, ইহজীবনে আর তাঁহার প্রেমমুখ দেখিতে পাইবেন কি না, সে বিষয়ে গভীর সন্দেহ। বিরহ-বিধুরা গভীর বিষাদে অবসন্না। প্রথম চিত্রে এই অবস্থা অঙ্কিত হইয়াছে। কিন্তু নারীজাতি স্বভাবতঃ ধর্ম্মপ্রাণা। সৈনিক-পত্নীর বিষাদ-ভারাক্রান্ত হৃদয়ও অবশেষে অসহায়ের একমাত্র গতি ভগবানের চরণে আশ্রয় লইয়াছে, তিনি পতির কল্যাণ কামনায় প্রার্থনায় নিমগ্ন হইয়াছেন। সম্মুখে পতির জীবন্ত প্রতিচ্ছবি শিশুপুত্র নিদ্রিত। দূরে—যুদ্ধক্ষেত্রে পত্নীর প্রার্থনা—শুভকামনা—সেই সৈনিককে কিরূপে আগুলিয়া রহিয়াছে, দ্বিতীয় চিত্রটীতে তাহা অতি সুন্দররূপে পরিস্ফুট। ঈশ্বরে একান্ত নির্ভর রাখিয়া প্রেম-পরায়ণা ধর্ম্মশীলা নারী স্বামীর কল্যাণের জন্য যে প্রার্থনা করেন তাহার মূল্য বুঝাইয়া দেওয়াই এই চিত্রের উদ্দেশ্য।

সার-সংগ্রহ।

সাহিত্য—বৈশাখ। "বৌদ্ধধর্ম্মে রমণীর স্থান" শ্রীযুক্ত রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুরের ইংরেজী প্রবন্ধের অনুবাদ। আমরা নিম্নে সারসঙ্কলন করিয়া দিলাম।

খৃষ্টানের ধর্ম্মগ্রন্থ বাইবেলের মতে, পুরুষ ভগবানের বিশেষ অনুগ্রহে রমণীরত্ন লাভ করিয়াছে। রমণী স্বর্গের দান। বিধাতা প্রথমে পুরুষকে গড়িয়াছিলেন। তার পর পুরুষের বক্ষঃপঞ্জর লইয়া রমণীর সৃষ্টি করেন। নারী হইতেই আবার পুরুষের অধঃপতন সংঘটিত হয়।

হিন্দু-পুরাণ মতে প্রজাপতি ব্রহ্মা মানবের আদি জনক-জননীকে এক-দেহাত্মক করিয়া সৃষ্টি করিয়াছিলেন। দক্ষিণাংশ জনক বা পুরুষ; বাম ভাগ জননী বা নারী। দক্ষিণাংশ অপেক্ষা বাম ভাগ গৌরবর্ণ ছিল। এই যুগল মূর্ত্তির নাম "গৌরী-শঙ্কর।" স্বর্গ হইতে ধরাতলে আসিয়া তাঁহারা স্বতন্ত্র দেহ ধারণ করেন। 'গৌরী-শঙ্কর' রূপক। কিন্তু জীবসৃষ্টির নিগূঢ় তত্ত্ব এই রূপকে নিহিত আছে। 'গৌরী' অর্থে

প্রকৃতি বা জননী; 'শঙ্কর' অর্থে পুরুষ বা জনক। প্রকৃতি ও পুরুষ হইতে মানবজাতির অভ্যুদয়। এই 'গৌরী-শঙ্করের' রূপক কল্পনায় পবিত্র বিবাহ-বন্ধনের কি সুন্দর বিশ্লেষণ! কিন্তু পরিণয়-ব্যাপার ত্রিদিব ধামে সংঘটিত হয় নাই, মর্ত্ত্যলোকেই সম্পাদিত হইয়াছিল। এই দৃষ্টান্ত হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়, যে পৃথিবীতে নরনারীর আত্মায় আত্মায় যে মিলন হয়, স্বর্গলোকে গমনের পরে তাহা আর স্বতন্ত্রভাবে থাকে না। তখন উভয়ের একই দেহ, একই আত্মা। স্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণভাবে লোপ পায়। বাইবেলে দেখিতে পাওয়া যায়, ভগবান প্রথমে পুরুষ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহার সুখ ও সুবিধার জন্য পরে নারীর উৎপত্তি। কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রের মতে, প্রজাপতি ব্রহ্ম একই সময়ে নরনারীর সৃষ্টি করেন। তাই তিনি উভয়কে স্বামীস্ত্রীরূপে পৃথিবীতে পাঠাইয়াছিলেন। স্বামী স্ত্রীর সখা, স্ত্রী স্বামীর সখা।

বিস্ময়ের বিষয় এই, নারীজাতি সম্বন্ধে হিন্দুর এই মতের সহিত ইংরাজের মতের অনেকটা সাদৃশ্য আছে। অর্দ্ধাঙ্গের উপরোক্ত অর্থ উপলব্ধি না করিয়াও ইংরেজ পত্নীকে শ্রেষ্ঠার্দ্ধ (better half) সংজ্ঞা দান করিয়াছেন। হিন্দুমতে শঙ্করের শ্রেষ্ঠার্দ্ধ অর্থাৎ সুন্দরতর অংশ গৌরী (সুন্দরী)। আর্য্যগণ রমণীর মর্য্যাদা সম্যকরূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এইজন্য বিরাট আর্য্যবংশের শাখা প্রশাখা হইতে যে যে জাতির উদ্ভব হইয়াছে, সকলেই রমণীকে সম্মান করিতেন এবং তাহাকে পুরুষের সমকক্ষ বলিয়া স্বীকার করিতেন। আদিম কালের মিসরবাসী, গ্রীক, রোমক, ইতালী ও ভারতবাসী, সকলেই জাতীয় উন্নতির যুগে রমণীকে শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি দান করিয়াছিলেন। ইরাণী জাতির বর্ত্তমান বংশধরগণ এখনও রমণীকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। জাতীয় অধঃপতনের যুগে ভারতবাসী বৌদ্ধদিগের সংস্কার ও সেমিটিক জাতির ভাবরাশির অনুকরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাহার ফলে তাঁহারা ক্রমশঃ রমণীর প্রতি শ্রদ্ধাপ্রকাশে কুণ্ঠিত হইলেন, নারীকে পুরুষ অপেক্ষা নিকৃষ্ট জীব বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। নারী যে পুরুষের সমকক্ষ, তাহা বিস্মৃত হইলেন। এইরূপে যে আদর্শের কল্পনা সর্ব্বপ্রথমে ভারতবাসীর মস্তিষ্কে বিকশিত হইয়াছিল, তাহা তাঁহারা হারাইতে বসিয়াছেন। নারীজাতির প্রতি কর্ত্তব্য পালনে ভারতবাসী ঔদাসীন্য প্রকাশ করায় পৃথিবীর যাবতীয় সভ্যসমাজ তাঁহাদিগকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়া থাকে।

বৌদ্ধধর্ম্ম রমণীকে পুরুষের সর্ব্বপ্রকার দুঃখের নিদান বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকে। সুতরাং বৌদ্ধধর্ম্মের মতে নারী-সংস্পর্শ সর্ব্বতোভাবে পরিহার্য্য। বুদ্ধদেব স্বয়ং প্রিয়তমা সহধর্ম্মিণী গোপাকে প্রসব-বেদনাক্লিষ্ট অবস্থায় পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। ৩৫ বৎসর বয়সে বুদ্ধ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন। ইহার অব্যবহিত পরেই তিনি, পুরুষগণ সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করিবে, এই মত প্রচার করেন। তিনি স্পষ্টাক্ষরে প্রচার করিয়াছিলেন, প্রত্যেক বিবাহিত পুরুষ পত্নী ও সন্তান ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করুক, স্ত্রীপুত্রের অদৃষ্টে যাহাই ঘটুক না কেন, সে বিষয়ে চিন্তা করিবার প্রয়োজন নাই। ৪৫ বৎসর ধরিয়া বুদ্ধ এই মত জনসমাজে প্রচার করিয়াছিলেন।

রমণীর প্রকৃতি স্বভাবতঃ কোমল ও দুর্ব্বল বলিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের মতে নারী পুরুষ অপেক্ষা নিকৃষ্ট। অতএব জন্মান্তরে পুরুষ-দেহ প্রাপ্তির জন্য তাঁহাকে তপস্যা অর্থাৎ পুরুষোচিত গুণের অনুশীলন করিতে হইবে। নারীজন্মে সে কখনই পুরুষের সমকক্ষ হইতে পারে না। নির্ব্বাণ মানবের চরম লক্ষ্য, নারী যদি নির্ব্বাণ লাভ করিতে চায় তাহা হইলে পরজন্মে পুরুষ হইবার ঐকান্তিক চেষ্টা তাহাকে করিতেই হইবে। নহিলে নির্ব্বাণের পথ তাহার পক্ষে রুদ্ধ। এই কারণে বুদ্ধ প্রথমতঃ রমণীকে ভিক্ষু সম্প্রদায়ভুক্ত করিতে চাহেন নাই। কেবল পুরুষকে ভিক্ষু হইবার অধিকার দান করিয়াছিলেন।

মগধরাজ্যের জনসাধারণ ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক বুদ্ধের প্রচারিত নবধর্ম্ম গ্রহণ করিবার কয়েক বৎসর পরে তিনি মঠ বা সন্ন্যাসাশ্রমসমূহের প্রতিষ্ঠা করেন। অতঃপর তিনি জন্মভূমি কপিলাবস্তু নগরে গমন করেন। তখন তাঁহার পরিত্যক্তা পত্নী ও ধাত্রী মহাপ্রজাবতী ভিক্ষু-সম্প্রদায়ভুক্ত হইবার প্রার্থনা করেন। বুদ্ধদেব প্রথমতঃ তাঁহাদের এই সানুনয় প্রার্থনা পূর্ণ করিতে সম্মত হন নাই। কিন্তু পরিশেষে আনন্দের অনুরোধে নারীদিগের মঠ বা সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবেশ করিবার অধিকার দান করিয়াছিলেন। রমণীর পক্ষে মঠের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল বটে; কিন্তু সন্ন্যাসিনীদিগের পক্ষে কঠোরতম নিয়ম পালনের ব্যবস্থা হইল। বুদ্ধদেবের দেহত্যাগের পর আনন্দকে এইজন্য বহু নির্য্যাতন ও লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইয়াছিল। আনন্দের অনুরোধেই বুদ্ধদেব নারীজাতিকে প্রব্রজ্যা বা সন্ন্যাস অবলম্বনের অনুমতি দিয়াছিলেন বলিয়া মহাকাশ্যপ প্রকাশ্যভাবে আনন্দকে তিরস্কার করিয়াছিলেন। এই কারণে তিনি কয়েক বৎসরের জন্য অর্হতপদ-লাভে বঞ্চিত ছিলেন। বৌদ্ধ নারীগণের জন্য প্রতিষ্ঠিত সন্ন্যাসাশ্রম কোনকালে উন্নতি লাভ করে নাই। অতীত যুগে ভারতবর্ষে বা অন্য কোনস্থলে এই প্রথা আদৃত হয় নাই। বর্ত্তমান কালে তিব্বত বৌদ্ধধর্ম্মের প্রধান তীর্থস্থান। এখানে অসংখ্য মঠ বিদ্যমান; বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর সংখ্যাও গণনাতীত; কিন্তু এখানেও সংসারত্যাগিনী বৌদ্ধসন্ন্যাসিনীর সংখ্যা শতাধিক নহে। চীন, জাপান, ব্রহ্ম বা শ্যাম সিংহলেও বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনী বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। নারীজাতির সম্পূর্ণ অস্তিত্বলোপই বৌদ্ধধর্ম্মের মূল লক্ষ্য। * সুতরাং বৌদ্ধধর্ম্মপ্রধান দেশে সন্ন্যাসিনী নারীর সংখ্যা অতি সামান্য হইবে, ইহা আর বিচিত্র কি? ভারতীয় আর্য্যগণ বুদ্ধের প্রচারিত এই মত গ্রহণে সম্মত হন নাই। নারী যে পুরুষের অপেক্ষা হীনবুদ্ধি, নিকৃষ্ট,—ইহা তাঁহারা স্বীকার করিতেন না। নারীর প্রতি বৌদ্ধধর্ম্মের এই বিতৃষ্ণা দেখিয়া আর্য্যগণ উহা পরিত্যাগ করিলেন। † কালক্রমে জনসাধারণ বৌদ্ধধর্ম্মের মত সম্পূর্ণরূপে পরিবর্জ্জন করিল, সুতরাং বুদ্ধের প্রচারিত ধর্ম্ম ভারতবর্ষে স্থায়ী হইতে পারিল না। * * *

---

* লেখক রায় বাহাদুর মহাশয়ের এই সকল উক্তি ইতিহাস দ্বারা সমর্থিত নহে। বৌদ্ধ নারীভিক্ষু-সম্প্রদায় তৎকালে দেশে এক প্রবল শক্তিরূপে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন; বিদেশে ধর্ম্মপ্রচারেও তাঁহারা অল্প সাহায্য করেন নাই। সঙ্ঘমিত্রা, মালিনী প্রভৃতি শক্তিশালিনী মহিলার জীবনী বৌদ্ধসাহিত্যে চিরদিন নারীমহিমার ও বৌদ্ধ জগতে নারীর প্রভাবের সাক্ষ্য দান করিবে। শঙ্করাচার্য্যের মায়াবাদ প্রচারের সঙ্গে সঙ্গেই প্রকৃত প্রস্তাবে এদেশে নারীর দুর্গতির সূত্রপাত। বৌদ্ধ হউন, আর হিন্দুই হউন, অধিকাংশ পুরুষ প্রভু ভুলিয়া যান, এই মহা ঘৃণিতা, ধর্ম্মপথের কণ্টকরূপিণী নারীগণ তাঁহাদের মাতৃজাতি—যাঁহাদের কল্যাণে এই "শোভা সুখপূর্ণ আনন্দময় বিশ্ব"দর্শনের সুযোগ এবং পরম মুখরোচক নারীনিন্দা করিবার রসনা—তাঁহারা লাভ করিয়াছেন। নারীগণ যদি বলেন, এই সংসার পুরুষশূন্য হইলে নারীর পতনের আর কিছুমাত্র সম্ভাবনা থাকিত না, তবে প্রভুরা কি উত্তর দেন, জানিতে ইচ্ছা করে। ভাঃ মঃ সঃ।

† ইতিহাস রায়বাহাদুর মহাশয়ের এই উক্তিরও সমর্থন করে না। বৌদ্ধধর্ম্মের পতনের কারণও ইহা নহে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি এদেশে নারীর প্রকৃত দুর্গতি বৌদ্ধধর্ম্মের পতনের এবং পুনরায় হিন্দুধর্ম্মের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হয়। ভাঃ মঃ সঃ।

কলিকাতা, ২৫ নং রামবাগান ষ্ট্রীট, ভারতমিহির যন্ত্রে সান্যাল এণ্ড কোম্পানী দ্বারা মুদ্রিত।

কারাগারে।

ভারত-মহিলা

The woman's cause is man's ; they rise or sink
Together, dwarfed or God-like, bond or free ;
If she be small, slight-natured, miserable,
How shall men grow ?

Tennyson.

৩য় ভাগ। | আশ্বিন, ১৩১৪। | ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

জননী।

মা'র মত মিষ্ট পদার্থ, "মা" নামের মত মিষ্ট নাম এ সংসারে আর কি আছে? সকল দেশে, সকল ভাষায় মানবশিশুর প্রথমোচ্চারিত শব্দ "মা," জীবনের শেষ মুহূর্ত্তেও এই অমৃতময় নাম উচ্চারণ করিতে করিতে মানুষ দেহত্যাগ করে। মানব-হৃদয়ের এমন প্রিয়তম, মধুরতম মাতৃপদ লাভের অধিকার দিয়া জগদীশ্বর নারীজাতিকে পরম গৌরবে গৌরবান্বিত, পরম সৌভাগ্যে সৌভাগ্যবতী করিয়াছেন। ভক্তগণ বলিয়া থাকেন—ঈশ্বর প্রেমস্বরূপ— God is love. হৃদয় প্রেমে যতই পরিপুষ্ট হয় মানব ততই ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী হয়। প্রেমের এই বিকাশের সুযোগ মাতৃহৃদয়ের ন্যায় আর কাহার ভাগ্যে ঘটে? দাম্পত্য প্রেম স্বর্গীয় পদার্থ, কিন্তু নারী মাতৃত্ব লাভ না করা পর্য্যন্ত সে প্রেমও পূর্ণতা লাভ করে না। বিকশিত শতদলে সূর্য্যরশ্মি যেমন দলে দলে নৃত্য করে, দুহিতা, পত্নী ও জননী রূপে নারীপ্রকৃতি পূর্ণ নারীত্ব লাভ করিলে ভগবৎ-প্রেমও তাহাতে তেমনি আপনার পূর্ণ প্রভাব বিস্তারের সুযোগ পায়। বস্তুতঃ সংসারে জননী হইবার অধিকার স্বর্গীয় অধিকার। যতদিন পর্য্যন্ত নারীবক্ষ সন্তানের সুকোমল স্পর্শলাভ না করে ততদিন পর্য্যন্ত নারী-প্রকৃতির শক্তিগুলি পূর্ণভাবে বিকশিত হইতে পারে না। জননী-পদ লাভের সঙ্গে সঙ্গে নারীর দুর্ব্বলতা সবলতায় এবং ভীরুতা সাহসে পরিণত হয়, তাঁহার অবিকশিত বহু শক্তি বিকশিত হইয়া তাঁহাকে অপূর্ব্ব নারী-মহিমায় মণ্ডিত করিয়া তুলে। রূপহীনা নারীর মুখমণ্ডলেও মাতৃস্নেহ-বিগলিত হাস্য যে স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া তুলে তাহা দেখিয়া কাহার প্রাণ না মুগ্ধ হয়? পিতা সন্তানের গৌরবে গৌরবান্বিত হ'ন, সন্তান ভবিষ্যতে তাঁহার নাম যশ অক্ষুণ্ন রাখিবে, তাহা বর্দ্ধিত করিবে এই আশায় তিনি উৎফুল্ল হন, কিন্তু মাতার ভালবাসা অহেতুকী—সন্তানে তিনি তন্ময় হইয়া যান। সন্তানের জন্য জননী কোন্ কষ্ট সহিতে অপ্রস্তুত? যে নারী পূর্ব্বে স্বার্থপর ছিল, আপনার সুখের সামান্য ব্যাঘাতে যে অস্থির হইত, মাতৃপদ লাভ করিয়া সেই নারী আজ অনাহারে অনিদ্রায় রাত্রির পর রাত্রি যাপন করিতেছে। অপরের সামান্য দুর্ব্ব্যবহারে পূর্ব্বে যাহার ধৈর্য্যচ্যুতি উপস্থিত হইত, আপনার কুপথগামী পুত্রের শত দুর্ব্ব্যবহার সেই নারী আজ কত ধীরতার সহিত সহ্য করিতেছে। সকলে যখন তাহার বিপথগামী সন্তানের উদ্ধারের আশা পরিত্যাগ করে জননীর প্রাণ তখনও আশান্বিত, যেখানে ভয়ের কোন কারণ নাই অমঙ্গলের আশঙ্কায় জননীর প্রাণ সেখানেও সন্ত্রস্ত। সংসারের দুঃখ দুর্ঘটনায় কোমলপ্রাণা নারীর হৃদয় কতই ভীত, কিন্তু আপনার সন্তান দুঃখ দুর্ঘটনায় পতিত হউক, দেখিবে নারী অকম্পিত হস্তে,

শান্ত বদনে তাহার সেবায় প্রবৃত্ত হইবে। দুঃখ বিপদে সকলে পরিত্যাগ করিলেও আমাদের জননী সর্ব্বদাই আমাদের পার্শ্বে। আমরা পাপে নিমগ্ন হইলে সকলে ঘৃণা করিতে পারে কিন্তু মাতৃহৃদয় তখনও ক্রোধ ও বিরক্তিতে অধীর না হইয়া দুঃখে ও মনোকষ্টেই অভিভূত হয়, এবং আমাদের উদ্ধারের জন্য কাতর ভাবে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করে।

মহৎ লোকদিগের জীবনে মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব যে বহুল পরিমাণে তাঁহাদের জননীগণ দ্বারা অনুপ্রাণিত আজকাল সকলেই তাহা স্বীকার করিয়া থাকেন। মাতার নিকট হইতে তাঁহারা হৃদয়ের কোমলতা, পবিত্রতা ও উন্নত ভাবগুলি লাভ করেন। আমাদের বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতি মহাত্মাগণের জীবনে তাঁহাদের জননীগণের প্রভাবের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। রাজা রামমোহন রায়ের সহিত তাঁহার পিতামাতার ধর্ম্মবিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল, কিন্তু আপনার বিশ্বাসানুগত ধর্ম্মে তাঁহার যে প্রবল অনুরাগ ছিল তাহা তিনি মাতার নিকট হইতেই লাভ করিয়াছিলেন। স্বর্গীয় স্বামী বিবেকানন্দ অতি তেজস্বী ও ধর্ম্মপ্রাণ পুরুষ ছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত "যুগান্তরের" মোকদ্দমায় কারাগারে গমন করিলে তাঁহার মাতা বলিয়াছিলেন, "দেশের কল্যাণের জন্য আমার পুত্র কারাগারে গিয়াছে, ইহা ত গৌরবেরই কথা।" এদেশের নারীগণ যেরূপ কোমলস্বভাবা তাহাতে সন্তানের কঠিন কারাক্লেশেও যে নারী এই কথা বলিতে পারেন তাঁহার হৃদয়ের শক্তি সামান্য নহে। এই প্রকার তেজস্বিনী জননীর গর্ভে জন্মগ্রহণ না করিলে স্বামী বিবেকানন্দ আজ জগদ্বিখ্যাত হইতে পারিতেন না।

মহাবীর নেপোলিয়ন তাঁহার অসামান্য শক্তি ও গুণাবলী প্রধানতঃ তাঁহার মাতার নিকট হইতেই পাইয়াছিলেন। বিষয়মোহে মুগ্ধ হইয়া তিনি আপন বন্ধুবান্ধব এবং প্রিয়তমা পতিপ্রাণা পত্নীর প্রতিও বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছেন কিন্তু জননীর প্রতি তিনি চিরদিন গভীর ভক্তি প্রদর্শন করিয়াগিয়াছেন। জীবনে যাহা কিছু মহৎ, যাহা কিছু উন্নত, সকলই জননীর নিকট লাভ করিয়াছেন এবং জননীই শৈশব হইতে ধীরে ধীরে সে গুলি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, সে কথা নেপোলিয়ন কখন বিস্মৃত হন নাই। সন্তানের জীবনে মাতার প্রভাবের কথা তিনি নানা ভাবে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। এক জন শিক্ষিতা মহিলার সঙ্গে প্রাচীন শিক্ষাপ্রণালীর অকর্ম্মণ্যতা বিষয়ে কথোপকথনচ্ছলে তিনি বলিয়াছিলেন, "একটী কথায় একটী উৎকৃষ্ট শিক্ষাপ্রণালী নিহিত, সে কথাটী 'মা'; সন্তানদিগকে সুশিক্ষা দিতে পারেন এমন মা প্রস্তুত করিতে আপনারা যত্নশীল হউন।" একজন চিন্তাশীল জ্ঞানী বলিয়াছেন, সমগ্র পৃথিবীর সভ্যজাতি সমূহের সংস্পর্শে আসিলে তাহাতে জীবনে যে শিক্ষা লাভ হয়, জননীর প্রদত্ত শৈশবশিক্ষার প্রভাব তদপেক্ষা অনেক অধিক।

বস্তুতঃ জননীর দায়িত্ব অতি কঠিন। সন্তানের ভবিষ্যৎ সুখদুঃখ প্রধান ভাবে জননীর উপরই নির্ভর করে। সুশিক্ষা ব্যতীত সুমাতা হওয়া যায় না। অনেক অশিক্ষিতা মহিলাও যে জগৎকে সুসন্তান দিয়া গিয়াছেন তাহা তাঁহাদের স্বভাবসিদ্ধ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও স্বাভাবিক সদ্‌গুণরাশির ফলে। তাঁহারা যদি সুশিক্ষিতা হইতেন তবে তাঁহাদের সন্তানগণ যে জগতে আরও অধিক কাজ করিয়া যাইতে পারিতেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

মাতার কর্ত্তব্য যথোচিত রূপে সম্পন্ন করিতে হইলে প্রয়োজনানুসারে সন্তানের প্রতি কখন কোমল ব্যবহার করিতে হইবে, কখন দৃঢ়তা প্রকাশ করিতে হইবে, শিক্ষাদানে নিপুণতা লাভ করিতে হইবে,আবার নিজে নূতন নূতন বিষয় শিক্ষা করিবার জন্যও সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকিতে হইবে; একদিকে সন্তানের গভীর শ্রদ্ধা ভক্তি আকর্ষণ করিতে হইবে, আবার অন্যদিকে গভীর সহানুভূতির সহিত তাহাদিগের সঙ্গে মিশিতে হইবে। ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল বিষয়ে সন্তানগণের সহিত যে মাতা সহানুভূতি প্রকাশ করিতে পারেন না, সন্তানগণ মন খুলিয়া তাঁহার নিকট সকল কথা খুলিয়া বলিতে পারে না। এই সকল সুকঠিন মাতৃকর্ত্তব্য সাধন করিতে হইলে জননীগণকে ধর্ম্মপরায়ণা ও প্রার্থনাশীলা হইতে হইবে। সর্ব্বদা ঈশ্বরের সাহায্য প্রার্থনা ব্যতীত এই সকল কর্ত্তব্য যিনিই সম্পন্ন করিতে যাইবেন তাঁহাকেই পরাস্ত হইতে হইবে। আপনার গুরু দায়িত্ব জননীগণের সর্ব্বদাই স্মৃতিপথে জাগ্রত রাখা উচিত। একজন সুপণ্ডিত

ইংরেজ লেখক জননীগণকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন :—"হে জননী, তোমার পুত্রকন্যা সংসার-ক্ষেত্রের প্রবেশ-দ্বারে উপস্থিত। সেই অপরিচিত রাজ্যের কত মধুর কল্পনা-চিত্রে তাহাদের প্রাণ মুগ্ধ! তাহাদিগকে যদি এই সংসার-সংগ্রামের উপযুক্ত অস্ত্রশস্ত্রে তুমি সজ্জিত করিয়া না দাও তবে ভবিষ্যতে তোমাকে কত অনুতাপে জর্জ্জরিত হইতে হইবে, একবার চিন্তা কর। জীবন-সংগ্রামের অর্দ্ধমাত্র অতীত না হইতেই যদি তোমার সন্তান আহত হইয়া রক্তাক্ত কলেবরে ভূলুণ্ঠিত হয় এবং তোমাকে উদ্দেশ করিয়া বলিতে থাকে, 'মা, সংগ্রামক্ষেত্রে পাঠাইলে কিন্তু যুদ্ধোপযোগী ঢাল তরবারি কিছুই দিলে না, কাহার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে হইবে তাহার শক্তির কোন পরিচয় দিলে না, যুদ্ধ-ক্ষেত্রের বিপদের কথা পূর্ব্বে কিছুই বলিয়া দিলে না; এখন দেখ, আমি অকালে আহত হইয়া রক্তাক্ত কলেবরে ভূলুণ্ঠিত হইতেছি!'—তবে তোমার প্রাণ কি গভীর দুঃখেই না অভিভূত হইবে?"

সুপ্রসিদ্ধ ইংরেজ ঔপন্যাসিক কিংস্‌লি লিখিয়াছেন: "দিন দিন আমার এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হইতেছে, এবং শরীর-তত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণও ক্রমেই এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইতেছেন, যে পিতামাতার মধ্যে সন্তানের উপর মাতার প্রভাবই অধিক; বিশেষতঃ পুত্রসন্তানের পক্ষে মাতাই সর্ব্বস্ব।" গভীর প্রেমই সন্তানের উপর জননীর এই প্রভাব বিস্তারের কারণ। সংসারে অনেক জ্ঞানী ও গুণী লোক থাকিতে পারেন, কিন্তু চন্দ্র ও সূর্য্যের মধ্যে চন্দ্র ক্ষুদ্রতর ও অল্প শক্তিশালী হইলেও যেমন নিকটতা দ্বারা সমুদ্রবক্ষকে উচ্ছ্বসিত করে, তেমনি জননী অল্প শক্তিবিশিষ্টা হইলেও হৃদয়ের নিকটতা দ্বারা সন্তানের উপরে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হন। এই অতলস্পর্শ মাতৃস্নেহ আমাদের শৈশবকে মধুময় করে, যৌবনকে মধুর স্মৃতিতে পূর্ণ রাখে। এই মাতৃস্নেহই প্রকৃতপক্ষে পিতা ও সন্তানগণের মধ্যে প্রকৃত বন্ধনসূত্র। জীবনের অন্ধকারপূর্ণ ঝঞ্ঝাবাতময় সমুদ্রে এই মাতৃস্নেহ আমাদের আলোক-স্তম্ভ। এই মাতৃস্নেহ আমাদের শৈশব-ক্রীড়া, যৌবনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং পরিণত বয়সে জীবনের সফলতাকে সমান ভাবে মধুরতায় অনুরঞ্জিত করে; আবার পরাজয়ে, পতনে ও নিরাশায় সান্ত্বনা ও আশ্বাস দেয়। এই জন্যই কবিগুরু বাল্মীকি বলিয়াছেন, "জননী ও জন্মভূমি স্বর্গ হইতেও গরীয়সী"; একজন ইংরেজ সুধী লিখিয়াছেন, "তুলাদণ্ডের এক দিকে সমস্ত জগৎ আর এক দিকে জননীকে রাখিলে জননীই শ্রেষ্ঠ প্রমাণিত হইবেন।"

অসীম প্রেম মাতৃহৃদয়কে এত মহৎ ও উচ্চ করিয়াছে। এই প্রেমই তাঁহাকে সন্তানের সকল ভার বহন করিতে, নিজের অপেক্ষাও সন্তানের ভাবনা অধিক ভাবিতে সমর্থ করে। এই প্রেম যখন মোহ ও আসক্তি হইতে মুক্ত হয় তখন মানবের প্রতি ভগবানের প্রেমের সহিত ইহার অল্পই পার্থক্য থাকে। সেণ্ট অগষ্টিনের প্রতি তাঁহার মাতা মণিকা দেবীর গভীর প্রেমের বিষয় ইতিপূর্ব্বে "ভারত-মহিলায়" উল্লিখিত হইয়াছে। বিপথগামী পুত্রকে ধর্ম্মের পথে ফিরাইয়া আনিবার জন্য মণিকা কি কঠোর সাধনাই না করিয়াছিলেন। আমরা যখন বিপথগামী হই তখন পরম জননী পরমেশ্বরও আমাদিগকে ধর্ম্মের পথে ফিরাইয়া আনিবার জন্য এই প্রকার ব্যাকুল হন, আমাদের উদ্ধারের জন্য শত উপায় অবলম্বন করেন। মাতৃস্নেহ যখন সংসারের আবিলতা হইতে বিমুক্ত হয় তখন তাহা সন্তানকে ধর্ম্মের পথে অগ্রসর দেখিবার জন্যই সর্ব্বাগ্রে অস্থির হয়। ধার্ম্মিকা জননী আমাদের পরিত্রাণের বিশেষ সহায়। পবিত্র মাতৃস্নেহের আস্বাদ পাই বলিয়াই, জননীর আত্মহারা প্রেম জীবনে সম্ভোগ করিতে পারি বলিয়াই আমরা আমাদের প্রতি ঈশ্বরের মাতৃপ্রেম কিরূপ তাহা ধারণা করিতে পারি। সেণ্ট অগষ্টিন যদি তাঁহার উদ্ধারের জন্য মাতৃহৃদয়ে এত ব্যাকুলতা না দেখিতেন তবে তাঁহার এত শীঘ্র উদ্ধার হইত কি না সন্দেহ। বস্তুতঃ অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, জগতে যত মহৎ ও উন্নতচিত্ত লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের সকলেরই মাতা উন্নতচরিত্রা নারী ছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ ইউরোপীয় পণ্ডিত গেটের জননীর সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিয়া একজন ভদ্রলোক বলিয়াছিলেন, "এতদিনে বুঝিলাম, গেটে কি প্রকারে গেটে হইতে পারিয়াছেন।" ইনি সুপণ্ডিতা, তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালিনী ও সন্তানের প্রতি পরম স্নেহময়ী নারী ছিলেন। শৃঙ্খলা ও শান্তি তাঁহার গৃহে সর্ব্বদা বিরাজ করিত। তিনি লিখিয়া গিয়াছেন, "আমি ক্ষিপ্রহস্তে আমার দৈনিক কর্ত্তব্যগুলি সম্পাদন করি, যাহা

সর্ব্বাপেক্ষা কষ্টদায়ক তাহা সর্ব্বাগ্রে শেষ করি। আমার অন্তর আমি সর্ব্বদা প্রফুল্ল রাখিতে চেষ্টা করি। প্রফুল্ল-চিত্ততায় আমি কাহারও অপেক্ষা পশ্চাৎপদ হইতে প্রস্তুত নই। আমি মানুষকে অতিশয় ভালবাসি এবং আবালবৃদ্ধ সকলেই আমার এই মনুষ্যপ্রীতি অনুভব করিতে পারে। আমি কাহাকেও বড় বড় নীতি উপদেশ দিই না। মানুষের চরিত্রে কি গুণ আছে শুধু তাহাই অন্বেষণ করি, দোষ যাহা আছে তাহার জন্য পরমেশ্বরের উপরই নির্ভর করি। এই উপায়ে আমি মনে অপূর্ব্ব শান্তিসুখ লাভ করি।" গল্প বলা জননীগণের একটী অতি আবশ্যকীয় গুণ। এবিষয়ে তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। তিনি লিখিয়াছেন, "প্রকৃতির নানা দৃশ্য ও ঘটনা আমি মানুষের আকারে সাজাইয়া সন্তানগণের নিকট উৎসাহ সহকারে বর্ণনা করিতাম। তাহারা গল্প শুনিবার জন্য যত ব্যস্ততা প্রকাশ করিত, আমিও তাহাদের শিশুহৃদয়ের সহিত সহানুভূতিতে পূর্ণ হইয়া গল্প বলিবার জন্য তদপেক্ষা কম ব্যস্ত হইতাম না। নীল আকাশে নক্ষত্র-রাজ্য, নক্ষত্র হইতে নক্ষত্রান্তরে গমনের পথ, নক্ষত্রলোকবাসী দেবতাগণ এবং মৃত্যুর পর সেই দেবলোকে তাঁহাদের সহিত আমাদের সম্ভাবিত সাক্ষাতের কথা বর্ণনা করিয়া আমি পরম আনন্দ লাভ করিতাম। শিশু গেটে তাহার কাল কাল চোখের তীব্র দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত, আর কখনো বা অধর্ম্মের কথা শুনিয়া তাহার শিরাগুলি ক্রোধে ফুলিয়া উঠিত, কষ্ট ও দুঃখে তাহার চক্ষু জলভারাক্রান্ত হইত। কোন গল্প অর্দ্ধ সমাপ্ত করিয়া যখন আমি সেই রাত্রির মত বিদায় লইতাম তখন মনে মনে জানিতাম, আমার গেটে এই অবসর টুকুর মধ্যে গল্পের অবশিষ্টাংশ কল্পনা করিয়া লইবে। ইহাতে আমার কল্পনাশক্তি আরো উত্তেজিত হইত। যখন আমি তাহাকে বলিতাম সত্যই তাহার কল্পনা আমার গল্পটী সম্পূর্ণ করিয়া লইয়াছে তখন আনন্দে ও উৎসাহে শিশুর হৃদয় নাচিয়া উঠিত।" মাতা ও সন্তানের কি মধুর চিত্র! জগতের মহাপুরুষদিগকে এই রূপে গড়িয়া তুলিবার ক্ষমতা ও অধিকার পরমেশ্বর নারীজাতিকেই দিয়াছেন।

(ক্রমশঃ)

রাজা রামমোহন রায়।

নিবিড় তিমিরাচ্ছন্ন ভারতের পুণ্যদ প্রাঙ্গনে
মহান্ যজ্ঞের সেই—অতি ধীরে—অতি সংগোপনে
হয়েছিল আয়োজন—হয়ে তা'রি প্রথম ঋত্বিক
তুমি এসেছিলে দেব! ধন্য করি হর্ষে দশদিক্!

সে মহা জীবন-যজ্ঞে আপনার সারা মন প্রাণ
আহুতি প্রদানি' তুমি সমাদরে করিলে আহ্বান
মোহান্ধ সোদরবৃন্দে, জড়-নিদ্রা দূরে পরিহরি'
দাঁড়াতে সে যজ্ঞক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য সযতনে ভরি'!

সাপিনীর মত বেড়ি' নানারূপ পাপ দেশাচার
সমাজের মেদ মজ্জা নিতেছিল শুষি' অনিবার;—
বাস্তব কল্যাণ-মন্ত্রে তা'র সেই সমুদ্যত ফণা
লুটালে হে আদি মনুজেন্দ্র! হে আদি উন্নতমনা!

জ্ঞানের বর্ত্তিকা হস্তে দেখাইলে তুমি হর্ষভরে
কত রত্ন লুক্কায়িত আমাদের শাস্ত্র রত্নাকরে,
যুগ-যুগান্তর ধরি' বিশ্ব-ত্রাসী তীব্র তপস্যায়
আমাদেরি পিতৃগণ সু-সঞ্চয় করেছিলা যায়!

তখন দেখেনি কেহ, শোনে নাই সে দেব-আহ্বান,
তড়িৎ পশ্চাতে যথা মেঘমন্দ্র করে অবস্থান
তেমতি তোমার শুভ্র দীপ্তি-পূত প্রতিভা আলোক
অগ্রে আসি দিয়েছিল সবাকার রোধি যেন চোক!

ঘুচিয়াছে আজি ধাঁধা—আবাহন শুনিতেছে প্রাণ—
উজ্জ্বল আদর্শ তব, হে সুন্দর! হে সৌম্য মহান্!
দাঁড়াও সম্মুখে আসি ধরি চির বিজয়ীর বেশ,
তব মহা জয়ধ্বনি ভরিয়া উঠুক দেশ-দেশ!

তোমার কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, সুনির্ম্মল চরিত্র উদার
মাতৃ-যজ্ঞে জনে জনে এনে দিক্ স্বরগ-সম্ভার!
পবিত্র পদাঙ্ক তব এ জাগ্রত বসুন্ধরা-তলে
আমাদের লক্ষ্য হয়ে জাগায়ে রাখুক কুতূহলে!

আজি এ মাহেন্দ্রক্ষণে তুচ্ছ করি কাল-ব্যবধান,
মুক্ত হয়ে উঠিয়াছে ভারতের ত্রিংশ কোটি প্রাণ

তব পানে, হে বরেণ্য! সুসার্থক করিয়া সকলি
লহ লহ স্মিতমুখে সবাকার এ পূজা অঞ্জলি!

শ্রীজীবেন্দ্র কুমার দত্ত।

রাণী চাঁদবিবি।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

এক রাত্রিতে রাণী কতিপয় অনুচর সহ দুর্গ-প্রাচীরে দাঁড়াইয়া আছেন, এমন সময় কে যেন রজনীর ঘনান্ধকারে শরীর আবৃত করিয়া পরিখার অপর পার হইতে চীৎকার করিয়া বলিল,—"রাণি! আত্মসমর্পণ করুন। প্রজার রক্তে আর ধরণীর বক্ষঃ রঞ্জিত করিবেন না, ভূগর্ভে পাঁচটী খাত (mines) ইতিপূর্ব্বেই খনিত হইয়াছে, তদ্দ্বারাই আপনার দুর্গ-প্রাচীর উৎখাত হইবে—এমন কি আপনি যে স্থানে দাঁড়াইয়া আছেন, তাহারও অস্তিত্ব থাকিবে না। আপনার পরাজয় অনিবার্য্য।" সেনানীগণ এই নেপথ্য-বাণী শ্রবণে ভীতচিত্তে আত্মসমর্পণ করিতে উৎসুক হয়, কিন্তু রাণী সতেজে বলিতে লাগিলেন,—"সত্য সত্যই কি আমরা আত্মসমর্পণ করিব এবং স্ত্রীকন্যাগুলিকে মোগল-দিগের তরবারিমুখে অর্পণ করিব? আমি রমণী হইলেও শরীরে একবিন্দু প্রাণ থাকিতে এ স্থান ত্যাগ করিব না। খোদা আমাকে এ বিপদ হইতে উদ্ধারের সাহায্য করিবেন। আমার দুর্ব্বল অঙ্গুলিই সেই গুপ্ত নিখাত হইতে মৃত্তিকা-রাশি অপসারণ করিতে এবং স্বদেশের বিপদরাশি বিনষ্ট করিতে সক্ষম হইবে।" রাণীর এই জ্বালাময়ী বাক্য শ্রবণ করতঃ সৈন্যমণ্ডলী হইতে উচ্চরোল উত্থিত হইল,—"জয় রাণীজিকি জয়, আমরা কখনই আপনাকে পরিত্যাগ করিব না; খোদার মর্জ্জি হইলে আমরা অক্লেশে জীবন বিসর্জ্জন করিব, তথাচ বিপক্ষের হস্তে আত্মসমর্পণ করিব না।"

রাণী স্বহস্তে গাঁতি (Pickaxe) লইয়া জ্বলন্ত উৎসাহের সহিত শ্রেণীবদ্ধ সৈন্যদলকে ভূনিম্নস্থ খাতের মুখে লইয়া গিয়া কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। সৈন্যগণও প্রভু-কন্যার উৎসাহ-বাক্যে প্রোৎসাহিত হইয়া অক্লান্ত পরিশ্রমে মৃত্তিকা খননে নিযুক্ত হইল। তৎপরে রাণী শীতল পানীয় ও শরবৎ লইয়া এ মুখ হইতে সে মুখে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্লান্ত কর্ম্মিগণের পিপাসা নিবারণ করিতে লাগিলেন। প্রত্যূষে প্রাচ্য গগন লোহিতাভা ধারণ করিবার পূর্ব্বেই তিনটী খাত অকর্ম্মণ্য হইয়া গেল। তৎপরে একটি খাতের মুখ হইতে বিকট শব্দ উত্থিত হইয়া দুর্গ-প্রাচীর পর্য্যন্ত প্রকম্পিত করিয়া তুলিল। স্ত্রীকন্যাগণের জীবন ও মর্য্যাদা রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে রাণী সেই খাতের সম্মুখে সৈন্যগণকে যুদ্ধার্থে অগ্রসর হইতে তাড়না করিতে লাগিলেন। তিনি নিজে কঠিন বর্ম্মে নিজের গৌর মুখমণ্ডল আবৃত করতঃ উন্মুক্ত তরবারি ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া বজ্র নির্ঘোষে বলিলেনঃ—"কে আমার অনুসরণ করিবে? কে মহিমামণ্ডিত মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়া ধন্য হইবে?"

সৈন্যমণ্ডলী রাণীর জ্বলন্ত উৎসাহবাক্যে উত্তেজিত হইয়া তাঁহার চতুর্দ্দিকে কোলাহল করিয়া উঠিল। সকলেই তাঁহার অনুসরণ ও প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল।

মধ্যাহ্ন উপস্থিত হইল; আক্রমণকারীগণ এই সুরক্ষিত মাইন-মুখে অগ্রসর হইতে এবং অতি অপ্রশস্ত পথে বিপুল সৈন্য-স্রোত প্রবহমান করিতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। অবশেষে কতিপয় সাহসী যোদ্ধা গর্ত্তের মুখে অগ্রসর হইল; তাহাদের পশ্চাতে বিপুল জনস্রোত ভাঙ্গিয়া পড়িল। রাণীর দুর্গ হইতে ভীমদর্শন কামান সমূহ গভীর গর্জ্জন করিয়া অনলবর্ষণ করিতে লাগিল। জনস্রোত তরঙ্গের পর তরঙ্গে খাতের মুখে দুর্গ অভিমুখে অগ্রসর হইয়া গোলার আঘাতে নশ্বর কায়া পরিত্যাগ করিতে লাগিল। এদিকে মাইনের মুখে কি দশা ঘটিতেছে জানিতে না পারিয়া মোগল দলপতিগণ নিশ্চিত জয়ের আশায় অধিকতর সৈন্য প্রেরণ করিতে লাগিলেন। চারি ঘণ্টা ধরিয়া যুদ্ধ চলিল; এই সময়ের মধ্যে মোগলদলের অসংখ্য জীবন বিনষ্ট হইল। যে সময় অতুল বিক্রমে যুদ্ধ চলিতেছিল, রাণী সেই সময় সৈন্যদলের অগ্রবর্ত্তী হইয়া মুখের অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া দাঁড়াইয়া সকলকে উৎসাহিত ও পরিচালিত করেন। সন্ধ্যা সমাগমে মোগলসৈন্য হতাশচিত্তে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে রাণীর অনলবর্ষী সৈন্যশ্রেণী তাহাদের পশ্চাদনুসরণ করে। শত্রুদল পলায়ন করিলে আব্বাস খাঁ গহ্বর মুখে আসিয়া দেখিলেন, রাণী তাঁহার পুত্রবধূ ও অন্যান্য সঙ্গীদের লইয়া

বাহুতে বাহুতে আবদ্ধ হইয়া এই ঘোর বিপদের দিনেও আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতেছেন।

পরদিবস প্রাতঃকালে যুবরাজ মুরাদের শিবিরে একজন দূত প্রেরিত হয়। যুবরাজ তাহার মারফত প্রস্তাব করিয়া পাঠান :—"চাঁদবিবি যদি আমাদের পশ্চাদ্ধাবন না করেন এবং বেরার প্রদেশ মোগল-হস্তে অর্পণ করিতে প্রতিশ্রুত হন, তবে আমরা আহম্মদনগর পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিতে সম্মত আছি। যেহেতু বেরার হইতে আহম্মদনগর রাজ্যের কোনই হিতসাধন হয় না।" বর্ত্তমান দুর্গ আর একবার বিপক্ষের আক্রমণ সহ্য করিবে কিনা, রাণী প্রথমতঃ তাহা পরীক্ষা করিয়া দরবারে যুবরাজের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। দলপতি ও মন্ত্রীবর্গ সকলেই এই প্রস্তাবে সম্মত হন। তাঁহারা বেরার ত্যাগ করিতে সম্মত হইলে মুরাদ সসৈন্যে প্রস্থান করেন।

ক্ষণকালের নিমিত্ত আহম্মদ নগরে শান্তি ফিরিয়া আসিল। কিন্তু মন্ত্রীগণ বৃথা ক্ষমতা-গর্ব্বে স্ফীত হইয়া পুনরায় আত্মকলহে রত হইল। দিল্লীশ্বর এই সংবাদ জ্ঞাত হইয়া ডেকানে ক্ষমতা বিস্তারের সুবিধার নিমিত্ত আহম্মদ নগর আক্রমণ করিতে খান- খানান্ ও যুবরাজ দানিয়ালের অধীনে আবার একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। রাণী চাঁদবিবি এই বিষয় জ্ঞাত হইয়া, ধীরচিত্তে আত্মরক্ষার আয়োজনে নিযুক্ত হইলেন, কিন্তু এবার তাঁহার সেনাবল পূর্ব্বাপেক্ষা প্রভূত পরিমাণে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে। এবাত্রা মোগল সৈন্যের গতিরোধ করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব বিবেচিত হইলেও তিনি শেষ চেষ্টায় নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিতে পারিলেন না।

হামিদ খাঁ নামক এক ব্যক্তির হস্তে দুর্গের ভার ছিল। রাণী ইঁহাকে অতিশয় স্নেহ করিতেন; বাল্যকাল হইতে হামিদকে তিনি লালনপালন ও পরে শিক্ষিত করিয়া রাজকার্য্যে নিযুক্ত করেন। হামিদ খোজা ছিলেন; মোগলদিগের সহিত শেষযুদ্ধে তিনি বিলক্ষণ বীরত্ব প্রদর্শন করায় এই উচ্চপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি আব্বাস খাঁকে অতিশয় ঘৃণা করিতেন এবং সততই তাহার অনিষ্ট সাধন করিবার সুযোগ অন্বেষণ করিতেন। হামিদের ক্রোধ কেবল আব্বাসের উপরই সীমাবদ্ধ ছিল না; রাণী তাহা অপেক্ষাও উচ্চতর পদে আব্বাসকে প্রতিষ্ঠিত করায় হামিদের ক্রোধ রাণীর প্রতিও উদ্দীপ্ত হয়। তজ্জন্য হামিদ রাণীর হস্ত হইতে সমস্ত ক্ষমতা অপহরণ করিয়া নিজে সিংহাসন অধিকার করিতে সংকল্প করেন। রাণী এসকল বিষয় কিছুই জানিতে পারেন নাই, কাজেই পূর্ব্বের ন্যায়ই তাহাকে বিশ্বাস করিতে লাগিলেন।

ইত্যবসরে মোগল-সৈন্য আহম্মদনগর-প্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইল। একদা রাত্রিতে হামিদ খাঁ একদল ক্ষুদ্র অথচ সাহসী যোদ্ধা লইয়া গোপনে শত্রুপক্ষকে আক্রমণ করিবার অভিপ্রায়ে দুর্গ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে ওসমান বেগ কর্ত্তৃক ধৃত হন। এই ওসমান নানারূপ ষড়যন্ত্র করিয়া আব্বাসের পত্নী জোরাকে পাইবার চেষ্টায় ফিরিতেছিল। তাহার সমস্ত চেষ্টা নিষ্ফল হইলে, সে শেষ অবলম্বন স্বরূপ মোগল-সৈন্যদলভুক্ত হয়; উদ্দেশ্য, এই ভাবে সে আহম্মদ নগরে প্রবেশ করিয়া জোরাকে ধৃত করিতে সক্ষম হইবে। ওসমান ও হামিদ একত্র মিলিত হইলেন এবং দুই ক্রূরকর্ম্মা একটী কু অভিসন্ধি স্থির করিয়া উভয়ে উভয়কে সাহায্য করিতে সম্মত হইলেন। হামিদ ওসমানের হস্তে দুর্গ সমর্পণ করিতে স্বীকৃত হইলেন। তৎপর তিনি শত্রু হইতে প্রাণ লইয়া প্রস্থানের ভাণ করিয়া তাড়াতাড়ি সৈন্যদল লইয়া দুর্গে ফিরিয়া গেলেন।

আব্বাস খাঁ পুনঃপুনঃ চাঁদবিবিকে আহম্মদ নগর ত্যাগ করিতে অনুরোধ করেন কিন্তু তিনি দৃঢ়তা সহকারে সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। সৈন্যগণ সোৎসাহে প্রচার করে যে, রাণী যদি পূর্ব্বের ন্যায় তাহাদিগকে যুদ্ধে চালনা করেন, তবে তাহারা শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিবে। অতঃপর একটী চিন্তা তাঁহার মনোমধ্যে উদিত হয়; ইহাতে যুদ্ধ নিরস্ত হইয়া নরশোণিতপাত বন্ধ হইতে পারে ভাবিয়া তিনি হামিদ খাঁকে আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করেন :—

"আমার সৈন্যগণ যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত আছে ?"

"পূর্ব্বের ন্যায় এবারও যদি আপনি তাহাদিগকে পরিচালন করেন, তবে তাহারা হয় বিজয়লক্ষ্মী করতলগত, না হয় আত্মপ্রাণ আহুতি প্রদান করিবে।"

"আহা! এ তো স্বতন্ত্র কথা! এখন অনেকেই রাজোদ্রোহী হইয়াছে, আমি বিশ্বাস করিব কাহাকে ?"

রাণীর বাক্য শ্রবণ করিয়া হামিদ ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন, কিন্তু তৎসঙ্গেই নিজের বিশ্বাসঘাতকতার বিষয় প্রকাশিত হইবার আশঙ্কায় ভীত হইলেন। রাণী তাহার সে ভাব লক্ষ্য না করিয়া বলিলেন,—"আমার অনুচর সকলকে নির্ব্বিঘ্নে নগর ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে দিবার জন্য যুবরাজকে অনুরোধ এবং বৃথা রক্তপাত নিবারণ জন্য দুর্গ তাঁহাদের হস্তে প্রদান করা হউক্। আমরা যুদ্ধ করিলে নিশ্চয়ই পরাজিত হইব। আমার এই প্রস্তাব সম্বন্ধে তোমার কি অভিমত, বল। নগরবাসীগণের জীবন রক্ষার্থে আমি এই কার্য্য করিতে ইচ্ছা করি। নিশ্চয়ই বিপক্ষেরা আমাকে এবিষয়ে অন্য কোন অভিসন্ধির নিমিত্ত দোষারোপ করিতে পারিবে না।" হামিদ খাঁ এই প্রস্তাব শুনিয়া চীৎকার করিতে করিতে প্রাসাদ হইতে বহির্গত হইয়া, সৈন্যদল যথায় যুদ্ধের আয়োজন করিতেছিল, তথায় গমন করিলেন। সৈন্যদলে প্রবিষ্ট হইয়া তিনি ক্রোধে স্বীয় শিরস্ত্রাণ সজোরে ভূমিতে নিক্ষেপ করতঃ উচ্চকণ্ঠে বলিলেন:—"ভ্রাতৃবৃন্দ! তোমরা সকলে রাজবিদ্রোহী! চাঁদবিবি বিপক্ষের হস্তে দুর্গ সমর্পণ করিতে ইচ্ছা করেন দিন্! দিন্! * সকলে আমার অনুবর্ত্তী হও, তাঁহার প্রাণবধ করিতে হইবে।"

সৈন্যমণ্ডলী হইতে ঘন ঘন গর্জ্জন উত্থিত হইতে লাগিল। "বিশ্বাসঘাতকতা! শীঘ্র আমাদিগকে রাস্তা দেখাইয়া দিন। আমরা রাণীকে তরবারি দ্বারা খণ্ডবিখণ্ড করিব।"

হামিদের প্ররোচনায় সৈন্যগণ সতেজে ও উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া প্রাসাদে প্রবিষ্ট হইল। অদূরে রাণী উপবিষ্ট ছিলেন, তিনি এই উগ্রমূর্ত্তি সৈন্যদল দেখিয়াই বুঝিলেন—বিপক্ষদল দুর্গে প্রবেশলাভ করিয়াছে। উন্মত্ত সেনাদলকে তাঁহার দিকেই অগ্রসর হইতে দেখিয়া, তিনি ধীর ও স্থির ভাবে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। শ্রদ্ধেয়া রাণীকে দেখিয়াই অধিকাংশ সৈন্যের ক্রোধ প্রশমিত হইল এবং তাঁহার অনিষ্ট করিতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিল, কিন্তু হামিদ খাঁ নিতান্ত বর্ব্বরের ন্যায় তাঁহার উপর পতিত হইয়া, তরবারির অগ্রভাগ রাণীর বক্ষঃস্থলে বসাইয়া দিলেন। গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হইয়া রাণী ভূপতিত হইলেন। জোরা সেই বিপুল জনতা ভেদ করিয়া অগ্রসর হইয়া রাণীর পার্শ্বে উপবেশন করতঃ তাঁহার লুণ্ঠিত মস্তক স্বীয় ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন। তৎপর তাঁহার অন্তিম সময় বোধে রাণীর শুষ্ক ওষ্ঠে ধীরে ধীরে জল দিতে লাগিলেন। কিন্তু রাণী তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করতঃ মৃদুহাস্য করিয়া জল দিতে নিষেধ করিলেন। ক্ষতস্থান হইতে প্রবল বেগে রক্ত বহির্গত হইতে থাকায়, অচিরেই তিনি হতচৈতন্য হইয়া প্রলাপ বকিতে লাগিলেন:—"ঐ গেল, ঐ—দেবদূত ডাক্‌ছে! যাই, প্রভু যাই, আর আমি বিলম্ব কর্‌ব না। হা, খোদা, এই কি তোমার ইচ্ছা ছিল!" তৎপর একটী গভীর দীর্ঘ নিঃশ্বাস রাণীর বক্ষ হইতে নাসিকা ভেদ করিয়া বহির্গত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার পবিত্র আত্মাও দেহত্যাগ করিল।

ইত্যবসরে ওসমান বেগের সৈন্যদল প্রাসাদে প্রবেশ করতঃ বিগতপ্রাণ রাণীর পার্শ্বে উপবিষ্টা শোকাতুরা জোরাকে ধৃত করতঃ বন্ধন করিয়া লইয়া গেল। এ সময় আব্বাস খাঁ যুদ্ধের আয়োজন করিতেছিলেন; তিনি যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন, এমন সময় একটী অনুচর হাঁপাইতে হাঁপাইতে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল:—"রাণী চাঁদবিবি বিপক্ষ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছেন।" এই সংবাদ জ্ঞাত হইবামাত্র, আব্বাস খাঁ প্রাসাদাভিমুখে ছুটিলেন। তথায় প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, একখানি কৃষ্ণ বস্ত্রে আবৃত একটী শব গোরস্থানাভিমুখে নীত হইতেছে এবং নিষ্ঠুর ওসমান বেগ তাহারই পার্শ্বে দণ্ডায়মান আছে। নিমেষ মধ্যে আব্বাস খাঁ সমস্ত ব্যাপার উপলব্ধি করতঃ কোষ হইতে তরবারি মুক্ত করিয়া ওসমান বেগের বক্ষঃস্থলে আমূল বিদ্ধ করিলেন। ওসমান তদ্দণ্ডেই বিগতজীবন হইয়া ধূল্যবলুণ্ঠিত হইলেন। অতঃপর আব্বাস জোরার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া অচিরেই তাঁহাকে শত্রুকবল হইতে উদ্ধার করিলেন।

আব্বাস উদাস হৃদয়ে অনুচরগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এই ভয়ানক দুর্ঘটনার মূল কে? কে এই সকল শোচনীয় কাণ্ড উপস্থিত করিল?"

সহস্র কণ্ঠ হইতে প্রতিধ্বনি উত্থিত হইল,—"হামিদ

* ইংরাজদিগের "হিপ্, হিপ্, হুররের" ন্যায় "দিন! দিন!" মুসলমানদিগের জয়ধ্বনি।

খাঁ; তিনিই এই দুর্ঘটনার মূল! তিনিই স্বহস্তে রাণীকে আঘাত করেন।"

আব্বাসের আদেশে অনুচরবৃন্দ হামিদের অন্বেষণে নিযুক্ত হইল। বহু অনুসন্ধানে তাহাকে নিকটবর্ত্তী এক জঙ্গলের মধ্যে লুক্কায়িত অবস্থায় দেখিতে পাওয়া গেল। আব্বাসের অনুচরগণ তাহাকে দেখিবামাত্র ধৃত করিয়া ফেলিল। তৎপর আব্বাসের আদেশে শক্রর—প্রভুর প্রাণ-হন্তার—গলে ফাঁস অর্পণ করিয়া এক উচ্চ বৃক্ষ-শাখায় তাহাকে ঝুলাইয়া দিল। এই ভাবে হাতে হাতে হামিদ রাজ-বিদ্রোহিতা ও স্বদেশ-দ্রোহিতার ফল প্রাপ্ত হইল।

পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেও রাণী চাঁদবিবির বদনের সে স্বর্গীয় বিভা, অপূর্ব্ব জ্যোতি বিলুপ্ত হয় নাই। প্রজামণ্ডলী সমাধিস্থানে রাণীর শবদেহের চতুষ্পার্শ্বে সমবেত হইয়া তাঁহার জন্য অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিল।

অচিরেই আহম্মদনগর দুর্গ মোগলদিগের হস্তগত হইল। আব্বাস খাঁ ও তদীয় পত্নী নিরাপদে বিজাপুরে প্রত্যাগমন করিলেন। আহম্মদনগর রাজবংশের শিশু যুবরাজের নির্ব্বাসন ব্যবস্থা হইল। তৎপর দুই এক পুরুষের মধ্যেই এই বংশের অস্তিত্ব পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইয়া যায়। একটী মহীয়সী নারীর তিরোধানে একটী স্বাধীন রাজ্যের অস্তিত্ব চিরতরে বিলুপ্ত হইয়া গেল।

শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল।

কবিতার প্রতি।

কাছে এস, আরো কাছে এস, হে অনন্ত-
যৌবনা সুন্দরি!
তোমার হৃদয় হ'তে দাও মোরে দাও ওগো,
সুধা পাত্র ভরি'!
কোন বাধা নাহি থাকে যেন আমাদের মাঝে,
বিরাজিত থাক হৃদে সতত মোহিনী সাজে,
দূরে যাবে সব জ্বালা, ওরে নন্দনের বালা,
মোর মনোচোর,
শত স্বর্গ-শোভা আমি দেখিব এ মর্ত্ত্য মাঝে
প্রমোদ-বিভোর।
আমি যে ভিখারী দীন, মিটে না বাসনা,
মণি মুক্তা হারে
পারি না সাজাতে তব সুকুমার দেহলতা;
ভাসি অশ্রুধারে!
তবু পরাইয়ে তোরে বনফুলে গাঁথি' মালা,
সাজা'য়ে কুসুমদলে, ওরে মোর বনবালা,
আকুল উন্মত্ত প্রাণে তোর ওই মুখ পানে
চেয়ে দেখি যবে,
মনে হয় স্বর্গে মর্ত্ত্যে তোর ও রূপের কাছে
পরাজিত সবে।

ভাল কি বেসেছ মোরে বল সত্য করি'
হে চির সুন্দরি?
জনমের মত তবে লও সখি, লও মোরে
আপনার করি'।
ভুলে যাব সব সাধ, দিবস যামিনী ভোর
তোরি কাছে বসি' শুধু বীণা বাজাইয়ে মোর,
গাহিব তোমারি গান, কামনাবিহীন প্রাণ,
ভুলি' আপনারে।
আমার আমিত্বটুকু ধীরে ধীরে মিলে যাবে
তোমারি মাঝারে।

শ্রীপ্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বনিতা-বিনোদ।

দ্বিতীয় বিনোদ।

ক্রোধ-শান্তি।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

রাজর্ষি ভরত তাঁহার জীবনের শেষাবস্থায় একটী হরিণ-শিশুর উপর অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ হইয়াছিলেন, এমন কি মৃত্যুর সময় ঐ হরিণটীর বিষয় ভাবিতে ভাবিতে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন এবং সেই হেতু পরজন্মে তিনি হরিণ হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পূর্ব্বজন্মের তপস্যা বলে হরিণ হইয়াও কিন্তু গত জন্মের কথা ভুলিয়া যান নাই, সুতরাং তাঁহার অত্যন্ত অনুতাপ হইয়াছিল। হরিণদেহে তাই সমস্ত

আর বৃষ্টি নাই।

স্নেহপাশ হইতে দূরে থাকিতেন। তাহার পর তিনি ব্রাহ্মণ-দেহ লাভ করেন। এ জন্মেও তিনি পূর্ব্বজন্মের কথা ভুলিয়া যান নাই। মোহাসক্তি, স্নেহ মায়া প্রভৃতি দ্বারা মানুষের যে নৈতিক অধঃপতন হয়, তাহা তিনি বিলক্ষণ জানিতেন, এজন্য এই ব্রাহ্মণদেহ পাইয়াও তিনি কাহারও সহিত মিশিতেন না, কথাবার্ত্তা ভাল করিয়া কহিতেন না, এমন কি জড়বৎ ব্যবহার করিতেন; এজন্য লোকে তাঁহাকে "জড় ভরত" বলিত। এখনও অজ্ঞান জড় লোককে মানুষ "জড় ভরত" বলিয়া অবজ্ঞা করিয়া থাকে। ঐ "জড় ভরতের" দেহ বেশ সবল ও হৃষ্টপুষ্ট ছিল। একদা তিনি রাস্তায় বসিয়া আছেন, এমন সময় সেই দেশের রাজা সেই পথ দিয়া যাইতেছিলেন। এ কালের মত সেকালেও রাজার কাজের জন্য "বেগার" ধরা প্রচলিত ছিল। রাজার পাল্কী বহিবার জন্য বেহারা "বেগার" ধরিবার জন্য রাজার লোকজন অন্যান্য কতিপয় লোকের সহিত "জড় ভরত"কে ধরিয়া লইয়া গেল এবং তাঁহার সবল হৃষ্টপুষ্ট দেহ দেখিয়া তিনি গরু বা গাধার মত খুব বোঝা বহিতে পারিবেন মনে করিয়া রাজার পাল্কীতে লাগাইয়া দিল। তিনি মহা সাধুপুরুষ, তাঁহার মনে আত্মপর ভেদ নাই, জগতের সকলেই তাঁহার মিত্র, নিজ দেহের উপরও তাঁহার কিছুমাত্র অহঙ্কার অভিমান ছিল না। তিনি বিনা আপত্তিতে পাল্‌কী বহিতে লাগিলেন।

তিনি পাল্‌কী বহিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু এক মহা গোল বাধিয়া গেল। ভরত মহাজ্ঞানী পুরুষ, পাছে রাস্তার কোন কীটপতঙ্গ তাঁহার পায়ের তলায় পড়িয়া মরিয়া যায়, এই ভয়ে তিনি সাবধানে রাস্তার দিকে চাহিয়া চাহিয়া চলিতে লাগিলেন, তাহাতে অন্যান্য বাহকদিগের সহিত তাঁহার "কদম" মিলিল না, সুতরাং পাল্কীতে রাজার দেহে ধাক্কা লাগিতে লাগিল। রাজা মহা সুখী মানুষ, দুই একটা ধাক্কা খাইয়াই চটিয়া গেলেন এবং বেহারাদিগকে গালি দিতে লাগিলেন। বেহারাগণ ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, "মহারাজ, আমাদের ত কোন দোষ নাই—ঐ লোকটা—অর্থাৎ ভরত—কি এক বে-আড়া রকমে পা ফেলিতেছে, তাহাতে আমাদের সকলকার পা-ই ঠিক রকম পড়িতেছে না—আমরা কি করিব," ইত্যাদি। তাহাতে রাজা ক্রুদ্ধ হইলেন এবং ভরতকে সম্বোধন করিয়া উপহাস করিয়া বলিলেন, "অহো, ভাই, তোমার কি কষ্ট! তুমি একাই আমার পাল্কী আনিতেছ কি না, আর তুমি বড় রোগা, দুর্ব্বল, তোমার শরীর ভারি ক্ষীণ—অহো, তোমার বড় কষ্ট হইতেছে, নয়?" ইত্যাদি। ভরত এই উপহাসে কিছুমাত্র উত্তর না দিয়া চলিতে লাগিলেন, আবার সেইরূপ সাবধানে রাস্তার দিকে চাহিয়া চাহিয়া চলিতে লাগিলেন—আবার রাজার দেহে ধাক্কা লাগিতে লাগিল। এবার রাজা ক্রোধে অধীর হইয়া পাল্কী হইতে বাহির হইলেন এবং ভরতকে বলিলেন, "আরে! তুই মরা নাকি? আমি তোর মনিব, তুই আমার হুকুম শুনিস্ না! তোর এত বড় সাহস যে আমার অপমান করিতেছিস্, দাঁড়া, যম যেমন পাপীর শাস্তি দেন, আমিও তোকে সেইরূপ শাস্তি দিব, তবে তুই সাবধান হবি," ইত্যাদি। এইরূপ কটুবাক্য শুনিয়া এবং রাজা এখনি তাঁহাকে প্রহার করিবেন জানিয়াও তাঁহার মনে ক্রোধের উদয় হইল না। তিনি নিজে অতিশয় তপোবলসম্পন্ন ছিলেন, ইচ্ছা করিলে তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মতেজে রাজাকে ভস্মীভূত করিতে পারিতেন, কিন্তু ভস্মীভূত করা ত দূরের কথা, তিনি একটুকুও রাগ করিলেন না, তিনি হাস্যমুখে রাজাকে বলিলেন, "হে রাজন্, হে বীর, তুমি আমাকে পরিহাস করিয়া যাহা যাহা বলিলে, তাহা সমস্তই সত্য, পরিহাস নহে। দেখ, ভার বলিয়া যদি কোন জিনিস থাকিত, আর তাহা আমাকে বহিতে হইত, আর যে বহিবে সে যদি আমার দেহের মধ্যে থাকিত, আর তোমার গন্তব্য পথ বলিয়া যদি কিছু থাকিত, তাহা হইলেই তোমার কথাগুলি ঠাট্টা বলিয়া লওয়া যাইত। দেখ মহারাজ, আমার আত্মা বা চৈতন্য মোটা বা পাতলা নহে, দেহই মোটা রোগা হইতে পারে। দেহ টা কি? কেবল মাটী বই ত নয়! দেহে যার অভিমান আছে অর্থাৎ দেহকেই যে আত্মা বলিয়া মনে করে সেই ভাবে, যে আমি মোটা হইলাম, আমি রোগা হইলাম, আমার ক্ষুধা তৃষ্ণা বোধ হইল, আমার ক্রোধ গর্ব্ব হইল—অথবা আমি যুবক বা বৃদ্ধ হইলাম। আমি ঐরূপ নহি—সুতরাং আমার ঐ সকল বোধ নাই। আর দেখ, আমি একাই "মরা" নহি, যে সকল বস্তু জন্মিয়াছে, যাহার আদি ও অন্ত আছে, সে

সকল বস্তুই "মরা"। আর দেখ এখন আমি তোমার চাকর, তুমি আমার মনিব ঠিক বটে, আবার কিছু দিন পরে যদি তোমার রাজ্য যায়, আর আমি রাজ্য পাই, তাহা হইলে তখন উল্টা হইবে, অর্থাৎ তুমি চাকর হইবে। আমি মনিব হইব। সুতরাং দেখ, চাকর আর মনিব ইহার কিছু স্থিরতা নাই; যদি স্থিরতা থাকিত তাহা হইলে তোমার হুকুম দেওয়া আর আমার হুকুম শোনা ঠিক হইতে পারিত। আর দেখ, তোমার দৃষ্টিতে আমি জড় বটে, কিন্তু আমি সেই পরম ব্রহ্মের সহিত লীন হইয়া আছি,—আমাকে শাস্তি দিয়া তোমার কি হইবে? আর যদি আমার কথায় বিশ্বাস না কর, এবং আমাকে প্রকৃতই জড় বা "মরা" ঠিক বুঝিয়া থাক, তাহা হইলে "মরা"কে মারিয়া তোমার কি হইবে? সে ত কেবল চর্ব্বিত চর্ব্বণ করা মাত্র!"

রাজা নির্দ্দোষ ও জড় একজন বেহারার মুখে এই পরমার্থতত্ত্ব শুনিয়া একেবারে অবাক হইলেন এবং নিজের রাজত্বের অভিমান সমস্ত ভুলিয়া গেলেন। তিনি ভাবিলেন, এরূপ বাক্য যে বলিতে পারে সে সামান্য ব্যক্তি নয়। তিনি ভরতের চরণে ধরিয়া মিনতি করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

বাস্তবিক পক্ষে বুদ্ধিমান ব্যক্তি কখনো ক্রোধের বশীভূত হন না। বিখ্যাত পারসিক কবি সেখ সাদী বলিয়াছেনঃ—

"দুইজন বুদ্ধিমান ব্যক্তির মধ্যে কখনও কোন কারণে লড়াই দাঙ্গা হয় না; অথবা দুই জনের মধ্যে যদি একজন সমঝদার এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি "ছেবলা"—ছেলেমানুষ—হয়, তাহা হইলেও ঝগড়া হয় না; কিন্তু যদি দুইজন "ভবচন্দ্র" একত্র হয়, তাহা হইলে শিকল দিয়া উহাদিগকে বাঁধিয়া রাখিলেও উহারা শিকল ছিঁড়িয়া দুইজনে পরস্পরের মাথা ফাটাইতে ছাড়িবে না।"

রাগাইলে যে ক্ষেপে, মানুষ তাহাকেই ক্ষেপাইয়া থাকে। সকল সমাজেই দুই একজন বদমেজাজী রাগী লোক থাকে, আর লোকেও অপর সকলকে ছাড়িয়া উহাদিগকেই রাগায়। ঐ হতভাগারা তুচ্ছ কথায় জ্বলিয়া উঠে, এবং যে ঐ কথা বলে, তাহাকে নানা প্রকার গালি মন্দ দেয়, এমন কি উহাকে মারিবার জন্য পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়াইতে থাকে। যে সকল লোকের আত্মসম্মান বা মর্য্যাদাবোধ নাই, কোন কাজ কর্ম্ম নাই, এরূপ মানুষ ঐ প্রকার রাগী লোককে লইয়া খুব নাচাইতে থাকে। কিন্তু কোন বুদ্ধিমান লোক কি ঐ প্রকার তুচ্ছ ভাঁড়ের কথায় রাগ করেন? কখনও নহে। রাগ না করিলে বা গ্রাহ্য না করিলে যে ব্যক্তি রাগাইতে আসে সে নিজেই লজ্জিত হইয়া প্রস্থান করে।" রাগ না করিলে কেহই রাগায় না।

শ্রীসত্যবন্ধু দাস।
অনুবাদক।

শ্রীরামচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র কে?*

লব ও কুশের মধ্যে কে জ্যেষ্ঠ এ বিষয় বিলক্ষণ মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। অনেকের মতে লব জ্যেষ্ঠ ও কুশ কনিষ্ঠ। অনেকের মত আবার তদ্বিপরীত, অর্থাৎ তাঁহাদের মতে কুশ বড়, লব ছোট। বস্তুতঃ ভারতের সূর্য্যবংশীয়দিগের ইতিবৃত্তে এই বিষয়টী বিশেষ জটিল ও সন্দেহপূর্ণ। হিন্দুদিগের কাল গণনানুসারে উক্ত ঘটনা আট লক্ষ উনসত্তর হাজার বৎসর পূর্ব্বে সংঘটিত। আধুনিক ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মতে ইহা ২৫০০ আড়াই হাজার বৎসরের পুরাতন ঘটনা। যদিও রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণাদি দ্বারা ইহার সত্যাসত্য নিরূপণ করা যাইতে পারে, কিন্তু তাহাতে সম্যকরূপে সন্দেহমুক্ত হওয়া যায় না। স্বতন্ত্র ভাবে অনুসন্ধান করিবার পরিবর্ত্তে রাজপুত কবিদিগের প্রবাদ বাক্যে আস্থা স্থাপন করিতে হয়। অবশ্য পুরাণ হইতেই প্রবাদের সৃষ্টি। হিন্দু রাজন্যবর্গের রাজ্যস্থিত দেবমন্দিরগুলিতে সর্ব্বদা এই সকল পুরাণাদির ব্যাখ্যা হয়। হিন্দু নরপতিগণ নিত্য প্রাতে যখন দেবদর্শনার্থ দেবমন্দিরে গমন করেন, তখন কিয়ৎকাল পুরাণাদি শ্রবণ করা রাজস্থানের নিয়ম। অতএব আমি কেবল এই সকল পুরাণোক্তি দ্বারাই এ বিষয়ের মীমাংসা করিব।

* কাশীর "নাগরী প্রচারিণী পত্রিকা" নাম্নী হিন্দী ত্রৈমাসিকে, এসিয়াটিক সোসাইটীর সভ্য, মীবার রাজ্যের ভূতপূর্ব্ব অমাত্য ও প্রতাপগড় রাজ্যের ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান, সুপণ্ডিত মোহনলাল বিষ্ণুলাল পাণ্ড্যা মহাশয় লিখিত হিন্দী প্রবন্ধের অনুবাদ।

ভারতবর্ষে আদিকাল হইতে চন্দ্র ও সূর্য্য এই দুই বংশ রাজত্ব করিয়া আসিতেছেন, ইহা সকলেই অবগত আছেন। ভারতে বর্ত্তমান সময়ে সূর্য্যবংশের অগণিত শাখা প্রশাখা বিদ্যমান আছে। এই সকল শাখাবংশোদ্ভব নরপতি হইতে সামান্য কৃষক পর্য্যন্ত প্রত্যেক রাজপুত নিজকে ভগবান রামচন্দ্রের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়া গৌরবানুভব করেন। এখন পর্য্যন্ত রাজপুত কবিদিগের ঐতিহাসিক গাথা ও কর্ণেল টডকৃত রাজস্থান এবং অন্যান্য পুরাতত্ত্বাদির সাহায্যে সকলে লবকে জ্যেষ্ঠ ও কুশকে কনিষ্ঠ বলিয়াই জানেন। টড সাহেব উভয় ভ্রাতার প্রধান প্রধান বংশধরগণের বংশাবলী নিম্নলিখিত রূপে দিয়াছেন।

"সূর্য্যবংশের বর্ত্তমান রাজপুত জাতি আপনাদিগকে রামচন্দ্রের উভয় পুত্র লব ও কুশের সন্ততি বলিয়া পরিচয় দেন, কেহই দশরথের অন্য পুত্রত্রয়ের বংশধর হইতে স্বীকৃত নহেন। মীবারের মহারাণা নিজকে জ্যেষ্ঠপুত্র লবের বংশধর বলেন। কেবল ইঁহারাই নহেন, বীর গুর্জ্জর জাতিও আপনাদিগকে লব-বংশীয় বলেন। ইঁহারা পুরাকালে আধুনিক অম্বর নগরের সীমার মধ্যে বলবান জাতি বলিয়া খ্যাত ছিলেন। ইঁহাদের বংশধরেরা এখন গঙ্গাতটবর্ত্তী অনুপসহরে বাস করিতেছেন। কুশ হইতে নীরবর এবং অম্বরের কুশবাহ রাজাগণ ও উঁহাদের অসংখ্য শাখা-বংশ রহিয়াছে। যদিও বর্ত্তমান কালে অম্বররাজই ধনবলে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কিন্তু ইঁহারা সেই প্রাচীন নীরবর রাজবংশধর। এই রাজ্য এক সহস্র বৎসর পূর্ব্বে স্থাপিত হয়। এই রাজবংশীয়গণ প্রসিদ্ধ নলরাজের বংশধর। বর্ত্তমান সময়ে বিস্তৃত রাজ্যের পরিবর্ত্তে সামান্য কয়েক জেলার উপসত্ব ভোগ করিতেছেন। মারবার রাজবংশ নিজকে এই বংশের শাখা বলিয়া পরিচয় দেন। বংশবেত্তাদিগের ভ্রম বশতঃ অর্থাৎ কুশবংশীয়দিগকে কান্যকুব্জের ও কৌশাম্বির কৌশিক বংশের সহিত গোলমাল করিয়া দেওয়াতে উক্ত মতের সৃষ্টি হইয়াছে। সূর্য্যবংশের বংশবেত্তাগণ এই কৃত্রিম বংশাবলী স্বীকার করেন না।"

এস্থলে টড সাহেবের প্রমাণগুলির অনুসন্ধান করা নিতান্ত আবশ্যক। তিনি নিজেই স্বরচিত রাজস্থানে স্পষ্ট লিখিয়াছেন :—

"পশ্চিম ও মধ্য ভারতের সৈনিকজাতির (রাজপুত) ইতিবৃত্ত পরিজ্ঞাত হইতে ইচ্ছা করিলে সর্ব্ব প্রথমে ইঁহাদের উৎপত্তি কিরূপে হইল তাহা অবগত হওয়া একান্ত আবশ্যক। এই উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া পণ্ডিতমণ্ডলীর একটী সভা আহ্বান করা হয়। আমি উদয়পুরের মহারাণার রাজকীয় পুস্তকালয় হইতে কেবল ধর্ম্মগ্রন্থ ও পুরাণাদি লইয়া, উক্ত সভা সমীপে উপস্থিত করিলাম। জ্ঞানচন্দ্র নামক এক বিদ্বান যতী মহাশয় উক্ত সভার নেতৃত্বে বরিত হন। ঐ সকল গ্রন্থ হইতে সুপ্রতিষ্ঠিত সূর্য্য ও চন্দ্র বংশের ঐতিহাসিক ও ভৌগলিক বৃত্তান্ত এবং বংশাবলী সংগ্রহ করা হইল।"

(রাজস্থান, প্রথম ভাগ, ২০ পৃষ্ঠা)

"রামায়ণ ও ভাগবৎ পাঠে রাম এবং জরাসন্ধ ও রাজতরঙ্গিনী ও রাজাবলী পাঠে পাণ্ডবদিগের বংশ-পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।"

(রাজস্থান, প্রথম ভাগ, ৪৩ পৃষ্ঠা)

এস্থলে আমি টড সাহেবের সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ এবং অন্যান্য কবিদিগের লিখিত ও কথিত ইতিহাসের সত্যাসত্য পরীক্ষা করিব, কারণ ইহাই বর্ত্তমান কালে সর্ব্বসাধারণের বিশ্বাস্য। আমি পুরাণ ও সংস্কৃত সাহিত্যগ্রন্থ হইতে প্রকৃত পক্ষে লব রামের জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন কি না, তাহাই প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিব। সংস্কৃত "জ্যেষ্ঠ" শব্দের অর্থ জন্ম ও গুণানুসারে যে সর্ব্ব প্রথম। যে সকল গ্রন্থ হইতে আমার মতের পুষ্টিসাধন হয়, সে সকল যথাক্রমে নিম্নে প্রদত্ত হইল।

(ক) সর্ব্বাগ্রে কবিবর কালিদাসের সর্ব্বপ্রিয় গ্রন্থ রঘুবংশ হইতে প্রমান দিতেছি, যে শ্রীরামের স্বর্গারোহণের পর কুলরীত্যানুসারে, সর্ব্ব প্রথমে জন্মগ্রহণ জন্য এবং গুণেও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পুরবাসীরা কুশকেই উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। নিম্নে রঘুবংশের যে দুই ছত্র উদ্ধৃত করা হইল তাহা ভারতের প্রায় সকল প্রান্তীয় স্কুল কলেজের সংস্কৃত-শিক্ষার্থী ছাত্রবর্গের পাঠ্য পুস্তকে নির্দ্দিষ্ট আছে।

অথেতরে সপ্তরঘুপ্রবীরা জ্যেষ্ঠং পুরোজন্মতয়া গুণৈশ্চ।
চক্রুঃ কুশং রত্নবিশেষভাজং সৌভ্রাত্রমেষাং হি কুলানুসারি॥

রঘুবংশ, সর্গ ১৬।১॥

(খ) সংস্কৃত বাল্মীকি-রামায়ণ দ্বারাই রামচন্দ্র বা তদীয় সন্তানগণের প্রকৃত তথ্য অবগত হইতে পারা যায়।

বাল্মীকি-রামায়ণের নিম্ন উদ্ধৃতাংশ ও কুশকেই জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রমাণিত করিতেছে। "পুরোজাত" অর্থাৎ প্রথমে জন্ম গ্রহণ করিবার জন্য কুশই রামের জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন। মহর্ষি বাল্মীকি এই যুগ্ম সহোদরকে "কুশ লবৌ" আখ্যায় আখ্যাত করিয়াছেন। এই অনুসারে সংস্কৃতের অন্যান্য গ্রন্থকর্ত্তারাও উক্ত বাক্য ব্যবহার করিয়াছেন। নিম্নে বাল্মীকি রামায়ণ হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করা হইল—

কুশমুষ্টিমুপাদায় লবং চৈব তু স দ্বিজঃ।
বাল্মীকিঃ প্রদদৌ তাভ্যাং রক্ষাং ভূতবিনাশনীম্॥
যস্তয়োঃ পূর্ব্বজো জাতঃ স কুশৈর্ম্মন্ত্রসংকৃতৈঃ।
নির্ম্মার্জ্জনীয়স্তু তদা কুশ ইত্যস্য নাম তৎ॥
যশ্চাবরো ভবত্তাভ্যাং লবেন সুসমাহিতঃ।
নির্ম্মার্জ্জনীয়ো বৃদ্ধাভির্লবেতি চ সনামতঃ॥
এবং কুশলবৌ নাম্না তাবুভৌ যমজাতকৌ।
মৎকৃতাভ্যাং চ নামভ্যাং খ্যাতিযুক্তৌ ভবিষ্যতঃ॥

বাল্মীকি রামায়ণ, উত্তর কাঃ ৭ সঃ ৬৬। ৬—৯॥

(গ) নিম্নে সংস্কৃত সাহিত্যের সুপ্রসিদ্ধ নাটককার ভবভূতি-রচিত উত্তর রামচরিত নামক নাটক হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল। এতদ্দ্বারা উপরোক্ত সিদ্ধান্ত পুষ্টিলাভ করিতেছে।

কৌশ—জাদ, ভাদাবি দে অত্থি। (জাত! ভ্রাতাপি তেঽস্তি)
লবঃ—অস্ত্যার্য্যঃ কুশো নাম।
কৌশ—জেট্‌ঠোত্তি ভণিদং হোদি। (জ্যেষ্ঠ ইতি ভণিতং ভবতি)
লবঃ—এবমেতৎ প্রসবক্রমেণ স কিল জ্যায়ান্ ইতি।
জন—কিং যমজাবায়ুষ্মন্তৌ।
লবঃ—অথ কিম্।
জন—কথয় কথাপ্রবন্ধস্য কীদৃশঃ পর্য্যন্তঃ।
লবঃ—অলীক-পৌর-প্রবাদোদ্বিগ্নেন রাজ্ঞা নির্ব্বাসিতাং দেবযজনসম্ভবাং সীতাদেবীমাসন্নপ্রসববেদনামেকাকিনীমরণ্যে পরিত্যজ্য লক্ষ্মণঃ প্রতিনিবৃত্ত ইতি।

উত্তররামচরিতম্, চতুর্থোঽঙ্ক॥

(ঘ) নিম্নে কয়েকটী পুরাণ হইতে প্রমাণ দেওয়া যাইতেছে। উল্লিখিত "খ" অঙ্কিত স্থলে মহর্ষি বাল্মীকি যে অর্থে "কুশলবৌ" পদ ব্যবহার করিয়াছেন, এই সকল পুরাণেও উক্ত পদ সেই অর্থে প্রয়োগ করা হইয়াছে। যদিও পুরাণকারেরা পুরাণাদিতে বাল্মীকি রামায়ণের কথা ভাগ গ্রহণ করা হইয়াছে কি না, সে বিষয় স্পষ্ট কিছু লেখেন নাই, তথাপি উঁহাদের উক্ত গ্রন্থের আশ্রয় গ্রহণ করা অসম্ভব নহে।

(১) মৎস্যপুরাণ।

বাল্মীকিস্তস্য চরিতং চক্রে ভার্গবসত্তমঃ।
তস্য পুত্রৌ কুশলবাবিক্ষ্বাকুকুলবর্দ্ধনৌ॥

অধ্যায় ১২।৫১॥

(২) অগ্নিপুরাণ।

রামপুত্রৌ কুশলবৌ সীতায়াং কুলবর্দ্ধনৌ।
অতিথিশ্চ কুশাজ্জজ্ঞে নিষধস্তস্য চাত্মজঃ॥

অধ্যায় ২৭৩।৩৬॥

(৩) লিঙ্গপুরাণ।

দশবর্ষসহস্রাণি রামো রাজ্যং চকার সঃ।
রামস্য তনয়ো জজ্ঞে কুশ ইত্যভিবিশ্রুতঃ॥
লবশ্চ সুমহাভাগঃ সত্ত্ববানভবৎসুধীঃ।
অতিথিস্তু কুশাজ্জজ্ঞে নিষধস্তস্য চাত্মজঃ॥

অধ্যায় ৬৬॥৩৭॥৩৯॥

(৪) ভাগবৎপুরাণ।

অন্তর্বত্ন্যাগতে কালে যমৌ সা সুষুবে সুতৌ।
কুশো লব ইতি খ্যাতৌ তয়োশ্চক্রে ক্রিয়াং মুনিঃ॥

স্কং ৯॥ অঃ ১১॥১১॥

(৫) কূর্ম্মপুরাণ।

রামস্য তনয়ো জজ্ঞে কুশ ইত্যভিবিশ্রুতঃ।
লবশ্চ সুমহাভাগঃ সর্ব্বতত্ত্বার্থবিৎ সুধীঃ॥
অতিথিস্তু কুশাজ্জজ্ঞে নিষধস্তৎসুতোঽভবৎ।
নলশ্চ নিষধস্যাসীন্নভাস্তস্মাদজায়ত॥

অধ্যায় ২১॥৫৭॥৫৯॥

(৬) হরিবংশ পুরাণ।

রামস্য তনয়ো জজ্ঞে কুশ ইত্যভিবিশ্রুতঃ।
অতিথিস্তু কুশজজ্ঞে নিষধস্তস্য চাত্মজঃ॥

অধ্যায় ॥১৫॥২৭॥

(৭) শিবপুরাণ।

রামো দশরথাজ্জজ্ঞে ধর্ম্মারামো মহাযশাঃ।
রামস্য তনয়ো জজ্ঞে কুশ ইত্যভিবিশ্রুতঃ॥
অতিথিস্তু কুশাজ্জজ্ঞে নিষধস্তস্য চাত্মজঃ।
নিষধস্য নলঃ পুত্রো নভাঃ পুত্রো নলস্য তু॥

অধ্যায় ॥৬১॥৬২॥৬৩॥

(৮) বিষ্ণুপুরাণ।

রামস্য তু কুশলবৌ পুত্রৌ লক্ষ্মণস্যাঙ্গদচন্দ্রকেতু
তক্ষপুষ্করৌ ভরতস্য সুবাহুশূরসেনৌ চ শত্রুঘ্নস্য।
কুশস্যাপ্যতিথিরতিথেরপি নিষধঃ পুত্রোঽভবৎ।
নিষধস্যাপি নলস্তস্যাপি নভোনভসঃ।
পুণ্ডরীকস্তত্তনয়ঃ ক্ষেমধন্বা তস্য চ দেবানীকঃ।
অংশ ৪ অঃ ।৪৭।

(ঙ) উদয়পুর রাজ্যান্তর্গত রাজনগর ও কাঁকরৌলী মধ্যে "রাজ প্রশস্তি" নামে একটী প্রশস্ত শিলালিপি আছে। এই বিখ্যাত শিলালিপিটী সুপ্রসিদ্ধ মহারাণা রাজসিংহ দ্বারা ১৬৭৫ খৃঃ স্থাপিত হয়। এতদ্দ্বারাও আমার মত সমর্থিত হইতেছে, এবং উল্লিখিত প্রমাণ সমূহের সহিত ইহার সম্পূর্ণ ঐক্য আছে। এই শিলালিপিটীর বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে সাধারণের মতের বিপরীতে কুশ হইতেই মীবার রাজবংশের উৎপত্তি লেখা হইয়াছে। সর্ব্ব সাধারণে লব হইতেই উক্ত বংশের উৎপত্তি এরূপ বলিয়া থাকেন। নিম্নে অনুবাদ সহ উক্ত শিলালিপির একটী শ্লোক উদ্ধৃত করা হইল।

মূল।

সুমিত্রায়াং লক্ষ্মণশ্চ শত্রুঘ্নশ্চেতি রামতঃ।
শ্রীসীতায়াং কুশো জাতো লবশ্চেতি কুশাদভূৎ ॥ ১৯ ॥
কুমুদ্বত্যামতিথিকো নিষধোঽস্য ততো নলঃ।
নভসঃ পুণ্ডরীকোঽস্য ক্ষেমধন্বা ততোঽভবৎ ॥ ১৩ ॥

সুমিত্রার গর্ভে লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন এবং সীতার উদরে কুশ ও লব জন্মগ্রহণ করেন। (১৮)

কুমুদ্বতীর উদরে কুশপুত্র অতিথিক জন্ম লন। অতিথিকের পুত্র নিষধ, নিষধের পুত্র পুণ্ডরীক, পুণ্ডরীকের পুত্র ক্ষেমধন্বা। (১৯)

(চ) আমি এ পর্য্যন্ত যথাসাধ্য মীবার রাজবংশের উৎপত্তির অনুসন্ধান করিলাম, এ অবধি যে সকল প্রমাণ পাইলাম তদ্দ্বারা কুশই মীবার রাজবংশের আদি পুরুষ প্রতিপন্ন হইলেন। * (ক্রমশঃ) প্রবাসিনী।

* এস্থলে লেখক মহাশয় মৌলবী মহম্মদ আবদুল্লা নামক জনৈক মুসলমান ইতিহাস-লেখকের "তবারীখ তোহফয়ে রাজস্থান" নামক উর্দ্দু গ্রন্থ হইতেও নিজ মত সমর্থনকারী প্রমাণ দিয়াছেন। এই মুসলমান লেখক মহোদয় আধুনিক ব্যক্তি। প্রবন্ধ-লেখক মহাশয় আর কয়েকটী হিন্দী ও সংস্কৃত গ্রন্থ হইতেও বহু প্রমাণ স্বপক্ষে প্রদর্শিত করিয়াছেন, কিন্তু সে পুস্তকগুলির সহিত সম্ভবতঃ বঙ্গীয় পাঠক-পাঠিকাবর্গের কোন পরিচয় নাই বলিয়া অনুবাদে সে সকল পরিবর্জ্জিত হইল।—অনুবাদিকা।

মাতৃহীনা ভগিনী।

("ভারত-মহিলা" সম্পাদিকার মাতৃবিয়োগ-সংবাদ শ্রবণে লিখিত)

আহা বোন্, অকস্মাৎ
মৃত্যুময় বজ্রাঘাত,
তোমারো কোমল হিয়া দিয়াছে ভাঙিয়া,
অমার তামসী রাতি,
নিবিয়াছে দীপ্ত বাতি,
স্নেহময়ী মা' তোমার গেছেন চলিয়া?

মরতে একটী প্রাণ
জ্বালা জুড়া'বার স্থান,
একটী স্নেহের বুক, লুকা'বার ঠাঁই,
নিরাপদ, নির্ব্বিকার,
অমৃতের পারাবার,
সেই মা করুণাময়ী আজি ঘরে নাই?

অপরাধে নাহি শাপ,
নাহি দৈন্য, নাহি পাপ,
পুণ্য-প্রসন্নতা-ভরা সে আনন্দ ধাম;
সাধনায় মিলে স্বর্গ,
মিলে নাকি চতুর্ব্বর্গ,
কোথা মিলে মাতৃ-স্নেহ কোথা সে আরাম?

শৈশবের বোঝা ভার,
সহিতে শকতি কার,
ক্রমে আবদার রক্ষা, মুছি কাদা ধূলি;
সেই উপকথা রাশি,
দুষ্টামিতে মিষ্ট হাসি,
সেই পীড়াকালে কত আকুলি ব্যাকুলি!

কিসে তুমি সুখে রবে,
শুভ, জ্ঞান, ধর্ম্ম হবে,

নিজ সুখ শান্তি প্রাণ তুচ্ছ তাহে কার,
মরতের ইতিহাসে,
স্বরগের চিত্র আসে !—
এ ধরা অমরা, মরি ! মহিমায় মা'র !

এ হেন মমতা ছাড়ি,
আঁধারিয়া ঘর বাড়ী,
যদি সে করুণাময়ী গিয়াছেন আগে,
তবুও ভরসা আসে,
প্রেমার্ণবে বিশ্ব ভাসে,
অণু পরমাণু মাঝে কত স্নেহ জাগে ;

যাঁর স্নেহে মাতৃস্নেহ,
যাঁর প্রেম-মাখা গেহ,
জনক জননী কিবা সোদর সোদরা,
দম্পতির হৃদি-তলে
যে প্রেম-উচ্ছ্বাস চলে
তনয় তনয়া-মুখে যে মমতা ভরা ;

দেখ না ভগিনী অয়ি !
অই সে মমতাময়ী,
মা'য়ে মা'য়ে মিশি আজি এসেছেন কাছে
অলক্ষ্যে ও শিরোপর,
দি'ছেন অভয়, বর,
কিসে তুমি মাতৃহীনা, কি বেদনা আছে ?

শ্রীবীরকুমার-বধ-রচয়িত্রী।

কাব্যে লোকশিক্ষা।

(৬)

নবীনচন্দ্রের কাব্য।

এইবার আমরা কবি নবীনচন্দ্রের কাব্য সম্বন্ধে আলোচনা করিব। নবীন বাবুর পরিশ্রমের শক্তি অসাধারণ। তিনি সরকারী চাকুরী করিয়াও বহু কাব্য রচনা করিরাছেন। তাঁহার "অবকাশ রঞ্জিনী", "রঙ্গমতী" ও "পলাশির যুদ্ধ" এই তিনখানি কাব্য প্রথম বয়সের লেখা। ইহার মধ্যে পলাশির যুদ্ধ কাব্য রচনা করিয়াই কবি যশস্বী হইয়াছেন। মেঘনাদ-বধ কাব্যের পর বোধ হয় পলাশির যুদ্ধই সর্ব্বশ্রেণীর পাঠকের নিকট সমাদৃত হইয়াছে। এই কাব্যখানি ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা মূলক বলিয়া আমরা ইহাকে অধিক মূল্যবান জ্ঞান করি। ইহার এক একটি স্থানের রচনা সরল ও মর্ম্মস্পর্শী; পড়িতে পড়িতে মন করুণ ও মধুর ভাবে পূর্ণ হয়; এক একটি স্থানের বর্ণনা বীরত্বব্যঞ্জক ও উদ্দীপনাপূর্ণ; পড়িতে পড়িতে গর্ব্বে, পৌরুষ ভাবে প্রাণ পূর্ণ হইয়া উঠে।

নবীন বাবু স্বদেশহিতৈষী। তিনি দেশের জন্য চিন্তা করেন। এজন্য পলাশির যুদ্ধের এক একটি জায়গায় এমন কথা বলিয়াছেন, যাহা বাঙ্গালা দেশের পক্ষে ভবিষ্যদ্বাণী হইয়া উঠিয়াছে। পলাশির যুদ্ধের মহাবীর মোহনলাল রোষে গর্ব্বে ও ক্ষোভে অধীর হইয়া সমুদ্রের জলকল্লোলের ন্যায় গভীর গর্জ্জনে যাহা বলিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে চিত্ত চঞ্চল ও অধীর হইয়া উঠে। কবি মোহনলালের মুখ হইতে কি সত্য কথাই বাহির করিয়াছেন !—

"দাসত্ব শৃঙ্খল ভার
ঘুচিবে না জন্মে আর
অধীনতা বিষে হবে জীবন সংশয়।"

নবীনচন্দ্র শেষ বয়সে "রৈবতক", "কুরুক্ষেত্র" ও "প্রভাস" কাব্য রচনা করিয়াছেন। তা' ছাড়া খ্রীষ্ট, চণ্ডী ও গীতা শীর্ষক আরো বোধ হয় তাঁহার আধ ডজন কাব্য আছে। কিন্তু আমাদের বলিতে কিছু মাত্র আপত্তি নাই যে, সে গুলির চারি পাঁচ পৃষ্ঠার অধিক পড়িবার সুযোগ হয় নাই। তিনি প্রধানতঃ লোকশিক্ষার জন্য রৈবতক, কুরুক্ষেত্র এবং প্রভাস রচনা করিয়াছেন। সেই জন্য আমরা এই তিনখানি কাব্য সম্বন্ধেই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

এই তিনখানা কাব্যের মধ্যে রৈবতকই সুখপাঠ্য। রৈবতকের এক একটি স্থানের ছন্দ ও ভাষা মনোহর। কুরুক্ষেত্র আমাদের নিকট নীরস বলিয়া মনে হয়। কিন্তু ভাগবতের একটা বাজে কথা শুনিলেও বৈষ্ণবেরা যেমন

ভাবে গদগদ হন, তেমনি তত্ত্বকথার নামেই যাঁহাদের ভাব হয়, তাঁহারা হয় ত এই তিনখানা গ্রন্থের মধ্যে কুরুক্ষেত্রকেই সর্ব্বাপেক্ষা সুমিষ্ট কাব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিবেন। যা'হোক এই তিনখানা গ্রন্থই একখানি কাব্যের ভিন্ন ভিন্ন অংশ মাত্র। সুতরাং তিনখানা কাব্যকেই একখানা ধরিয়া লইতে পারি। ইহা পড়িলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, লেখক পৃথিবীর অনেক উর্দ্ধে উঠিয়া কাব্যের কল্পনা করিয়াছিলেন। তিনি অন্তরে গভীর ধর্ম্মভাব লইয়া ও মানব জীবনের মহৎ আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এজন্য তাঁহার কাব্যগুলির দ্বারা লোকশিক্ষার যথেষ্ট সাহায্য হইবে।

কবির "রৈবতক" কাব্যের এক স্থানে কৃষ্ণ বলিয়াছেন;—

"আমার অনন্ত বিশ্ব ধর্ম্মের মন্দির;
ভিত্তি সর্ব্ব-ভূত-হিত, চূড়া সুদর্শন;
সাধনা নিষ্কাম কর্ম্ম; লক্ষ্য নারায়ণ।
এই সনাতন ধর্ম্ম, এই মহা নীতি—
ব্যাসদেব জ্ঞানবলে, পার্থ বাহুবলে,
ভারতে, জগতে, করে সর্ব্বত্র প্রচার
নারায়ণে কর্ম্মফল করি সমর্পণ।
বিনাশিয়া স্বার্থ-জ্ঞান হইলে নিষ্কাম
সাম্রাজ্য, সমাজ, ধর্ম্ম হইবে অচিরে
খণ্ড এ ভারতে "মহাভারত" স্থাপিত—
প্রেমময়, প্রীতিময়, পবিত্রতাময়!"

অন্যত্র:—

"এক মহারাজ্য, প্রভু হয় না স্থাপিত—
এক ধর্ম্ম, এক জাতি, এক সিংহাসন?
* * *
* * জননী ভারত!
শক্তি-স্বরূপিনী তুমি, শক্তি-প্রসবিনী!
ব্যাসের অনন্ত জ্ঞান, ভুজ অর্জ্জুনের,
তোমার সেবায় মাতঃ, হলে নিয়োজিত,
কোন্ কার্য্য নাহি পারে হইতে সাধিত?"

উদ্ধৃত কৃষ্ণোক্তির দ্বারা বুঝা যাইতেছে, শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের ও ব্যাসদেবের সাহায্যে ভারতে এক মহা ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। সেইরূপ ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইলেই যে ভারতবর্ষের যথার্থ উন্নতি হইবে;—এই কথাটা বুঝানই কবির কাব্যের একটা উদ্দেশ্য। তা ছাড়া হিন্দুর সর্ব্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থ ভগবদ্গীতার বিবিধ তত্ত্বের মধ্যে, মানব-জীবনের যে মহান্ আদর্শ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, কবির দিব্য কল্পনার সম্মুখে সেই আদর্শই ছবির মত উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। ভাবোন্মত্ত কবি সেই ছবি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন; এবং সেই ছবির আদর্শেই অর্জ্জুন, সুভদ্রা ও কাব্যের নায়ক নায়িকাদিগের চরিত্র অঙ্কিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন।

কিন্তু কোন চিত্রকর যখন দার্জ্জিলিং গমন করেন, তখন যদি তাঁহার চোখের সম্মুখে হিমালয়ের চিরতুষারাচ্ছন্ন শৃঙ্গ তরুণ সূর্য্যালোকে অনুপম সুন্দর হইয়া উঠে, তবে সেই সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হওয়া কত সহজ! কিন্তু সেই অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্যের একখানি ছবি আঁকা কতই কঠিন! সেইরূপ কবির কোন শুভ মুহূর্ত্তে কল্পনায় মানব জীবনের কোন মহৎ আদর্শ উজ্জ্বল হইয়া উঠিতে পারে; সেই আদর্শের বিষয় চিন্তা করিয়া কবি সহজেই মুগ্ধ হইতে পারেন। কিন্তু ভাষা এবং ছন্দের সাহায্যে কতগুলি রক্ত-মাংসময় মানুষ গড়িয়া, তাহার মধ্যে উক্ত আদর্শকে পরিস্ফুট করিয়া তোলা বড়ই শক্ত কাজ। এক ব্যক্তির মধ্যে অর্জ্জুনের বীরত্ব, শঙ্করের জ্ঞান, বুদ্ধদেবের সাম্য ও মৈত্রী এবং চৈতন্যদেবের হরিভক্তি ছিল;—ইহা বলিয়া দেওয়া ত কত সহজ! কিন্তু তাহা পাঠকদিগকে বিশ্বাস করান বড় কঠিন। বিশ্বাস করাইতে হইলেই কবির ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতা থাকা আবশ্যক। সেরূপ ক্ষমতা লইয়া যাঁহারা জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারা ক্ষণজন্মা পুরুষ। দুঃখের বিষয় ক্ষণজন্মা লোকের সংখ্যা কোন দেশেই অধিক নয়। এই জন্য মহাকাব্য লিখিবার লোকও অতি অল্প।

এই সকল কথা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, নবীনচন্দ্র যে মহৎ উদ্দেশ্য ও অত্যুচ্চ আদর্শ চোখের সম্মুখে রাখিয়া কাব্য রচনা করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন, যদি তাহাতে সম্যক্‌রূপে কৃতকার্য্য না হইয়া থাকেন, তাহা হইলে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই।

নবীনবাবু রৈবতকে কৃষ্ণার্জ্জুনের প্রতি দুর্ব্বাশার অভিশাপ, সুভদ্রা হরণ; কুরুক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ, অভিমন্যুবধ; প্রভাসে যদুবংশধ্বংস ও অনার্য্যদিগের কৃষ্ণপ্রেমে মত্ততা প্রভৃতি ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া বিস্তর কথাবার্ত্তা, হাসিগল্প, প্রেমাভিনয়, ধর্ম্মতত্ত্ব, কর্ম্মতত্ত্ব, কৃষ্ণলীলা ও কৃষ্ণপ্রেমের বর্ণনা করিয়াছেন; এবং ইহার মধ্য দিয়া তাঁহার কাব্যের অত্যুচ্চ আদর্শ পরিস্ফুট করিতে, কাব্যের সুমহৎ উদ্দেশ্য পূর্ণ করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

আমাদিগকে সসঙ্কোচে অতি বিনীত ভাবে বলিতে হইতেছে, মাননীয় কবির চেষ্টা বোধ হয় সম্পূর্ণ সফল হয় নাই। তিনি তাঁহার কাব্যের মধ্যে ধর্ম্মজীবনের গূঢ়তত্ত্ব, দার্শনিক সমস্যা ও গভীর ভক্তিভাবের অবতারণা করিয়া উহাকে অত্যুৎকৃষ্ট ধর্ম্মগ্রন্থ করিয়া তুলিয়াছেন বটে; কিন্তু সূক্ষ্ম কাব্য-কৌশল ও চিত্রাঙ্কনী প্রতিভা দ্বারা তাঁহার বর্ণিত বিষয়গুলিকে চিত্তাকর্ষক এবং নির্ম্মিত চরিত্রগুলিকে স্বাভাবিক করিয়া তুলিতে পারেন নাই। তাঁহার সুভদ্রার সেবার কাহিনী পড়িতে পড়িতে কুমারী নাইটেঙ্গেলের কথাই মনে পড়িয়া যায়। আবার বাসুকীর প্রেমোন্মত্ততার বিবরণ পড়িতে পড়িতে প্রভাসের পরিবর্ত্তে নবদ্বীপের কথাই মনে পড়ে;—যেন গৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতাচার্য্য হরিসঙ্কীর্ত্তনে প্রমত্ত হইয়া বলিতেছেন :—

"দেখিব আমার সেই ননীচোরা নীলমণি,
পুষি তারে কি আদরে দিয়া প্রেম ক্ষীর ননী।
কত শাসি, কত হাসি, সাজাই সে তনুখানি।
আমি তাঁর পিতা নন্দ, যশোদা জননী আমি!
শ্রীদাম সুদাম আমি, কত খেলা খেলি সঙ্গে,
ব্রজের কিশোরী আমি কত ক্রীড়া করি রঙ্গে।"

পাঠকেরা মনে করিবেন না যে, এই শ্লোকগুলি আমরা কবিরাজ গোস্বামীর চৈতন্যচরিতামৃত হইতে উদ্ধৃত করিয়াছি। ইহা প্রভাস কাব্যের কৃষ্ণ-প্রেমোন্মত্ত অনার্য্য বাসুকীর উক্তি।

ইহা ছাড়া কবি কুরুক্ষেত্র কাব্যের যে সকল স্থানে হাস্যরসের অবতারণা করিয়াছেন, সে সকল জায়গার বিরুদ্ধেও আমাদের কিছু বলিবার আছে। কবির কল্পিত সুলোচনা ঠাকুরাণীটি শুধুই উত্তরা, অভিমন্যু ও বিরাট রাজাকে বিরক্ত করিয়া ক্ষান্ত হন নাই। স্থানে অস্থানে খাপছাড়া রসিকতা করিয়া পাঠকদিগকেও বড় জ্বালাতন করিয়াছেন। কুরুক্ষেত্রের "পুতুল খেলা" সর্গটিতে "পুতুলের নাচ" ও "বানরের নাচ" না দেখাইলেই ভাল হইত। উহাতে কাব্যের সৌন্দর্য্য নষ্ট হইয়াছে। শাস্ত্রজ্ঞ ও দার্শনিক নবীন বাবু জটিল ধর্ম্মতত্ত্বের ব্যাখ্যা লিখিয়া যাইতে পারেন; কিন্তু হাস্যরসের বর্ণনায় খুব পাকা হাতের পরিচয় দিতে পারেন না।

কিন্তু এ সকল কথা যাক্‌। এই প্রণয়-প্লাবিত গীতিকবিতার যুগে, লোকহিতৈষী তত্ত্বদর্শী কবি পার্থিব ক্ষুদ্রভাব হইতে অনেক ঊর্দ্ধে উঠিয়া, বহু পরিশ্রম করিয়া, এই যে আধ্যাত্মিক ভাবপূর্ণ তিনখানি আখ্যানকাব্য রচনা করিয়াছেন; এবং শিক্ষিত বাঙ্গালীর সম্মুখে মানবজীবনের মহান্‌ আদর্শ অঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছেন, এজন্য কবির নিকট মস্তক অবনত করিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করিয়া পারি না। এই কাব্যগুলির দোষ ত্রুটী থাকিলেও বাঙ্গলা ভাষায় লোকশিক্ষার উপযোগী এরূপ আখ্যান কাব্য আর কোথায়?

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রৈবতক কাব্যখানি সুখপাঠ্য। রৈবতকের ব্যাসাশ্রমের বর্ণনা অতি মনোহর। আমরা একটু উদ্ধৃত করি। কৃষ্ণ বলিতেছেন :—

"কি সুন্দর শত শত বিটপী বল্লরী
অশোক, কিংশুক, বক, চম্পক, শিরীষ,
* * *
ফলবান পুষ্পবান তরু মনোহর।
আধিত্যকা উপত্যকা করি আচ্ছাদিত
কেহ ফলে, কেহ ফুলে, পল্লবে মুকুলে
সাজায়ে শ্যামল অঙ্গ আছে চিত্রার্পিত।"

তৎপরে :—

"মহর্ষি ব্যাসের ওই শান্তি সরোবর
দেখ পার্থ, সম্মুখেতে কিবা মনোহর!
ঋষি-শিশুগণ সহ নানা জলচর
খেলিতেছে কি আনন্দে! ভাই ভগ্নী মত
দেখ শিশুগণ কত করিছে আদর,"

অন্যত্র :—

——"জগতের শান্তির নিবাস
সংসার সমুদ্র-তীর! আকাঙ্ক্ষালহরী
অনন্ত অসংখ্য,—নাহি প্রবেশে হেথায়।
নাহি ফলে হেথা সুখ দুঃখ ফল
বিষয়-বাসনা-বৃক্ষে; নাহি ফুটে ফুল
পাপের কণ্টক-বৃন্তে চিত্তমুগ্ধকর।
নাহি হেথা সুখে দুঃখ, শান্তিতে বিষাদ,
প্রেমেতে স্বার্থের ছায়া, দারিদ্র্যে দাহন!

কবির এই সুন্দর বর্ণনাটী পাঠ করিয়া, ঋষিদিগের একটি আশ্রম দেখিবার জন্য মনে আগ্রহ উপস্থিত হয়!

কুরুক্ষেত্রে সুভদ্রার চিত্র স্থানে স্থানে খুব স্বাভাবিক হয় নাই বটে, কিন্তু তথাপি সুভদ্রার কাহিনী পাঠ করিয়া মন উন্নত হয়। সুভদ্রার ন্যায় যে নারী মানবী হইয়াও ধর্ম্মে ও নিষ্কাম কর্ম্মে, ধৈর্য্যে ও আত্মত্যাগে, সেবায় ও ক্ষমায় দেবী হইয়া উঠিতে পারেন, আমরা তাঁহাকে আদর্শ রমণী বলিয়া ভক্তি করিতে পারি। বাঙ্গলা সাহিত্যে এখন এই রকম নারীচরিত্র অঙ্কন করাই ত অত্যন্ত প্রয়োজন হইয়াছে। নচেৎ বাঙ্গালীর মেয়ে যে স্বামীকে খুব ভালবাসিতে পারে, তাহা স্বচক্ষে ঢের দেখিয়াছি, কেতাবেও ঢের পড়িয়াছি; কিন্তু বাঙ্গালীর মেয়ে যে আত্মসুখ তুচ্ছ করিয়া পরের সেবা করিতে পারে, দেশের দুঃখ দূর করিবার জন্য সকল দুঃখ প্রসন্নমুখে বহন করিতে পারে, এবং পুত্রের মৃত্যুকালেও ঈশ্বরের মঙ্গলভাব স্মরণ করিয়া শোক সংবরণ করিতে পারে, সে দৃশ্য চোখেও দেখি নাই, সে কথা কাব্যেও পড়ি নাই; পড়িতে বড় ইচ্ছা করে।

এই জন্যই মনে হয়, সুভদ্রার এক একটি কথা স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখিবার উপযুক্ত। সুভদ্রার উক্তি হইতে আমরা কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি :—

"জগৎ অনন্ত কণ্ঠে দিতেছে উত্তর
একতানে,—বিহঙ্গের বিহঙ্গত্বে সুখ,
পশুর পশুত্বে, সুখ পুষ্পত্বে পুষ্পের;
মনুষ্যত্বে তবে বোন, সুখ মানুষের।"

"না, দিদি! আমরা নারী বিশ্বজননীর ছবি,
আমাদের শত্রু মিত্র নাই,
বরিষার ধারা সম অজস্র জননী প্রেম
সর্ব্বত্র ঢালিয়া চল যাই।"

সুভদ্রা অভিমন্যুকে বলিতেছেন :—

"জলধির হিত যাহা, তাহা জলবিন্দু হিত,
জগতের হিত বৎস, তোমার হিত নিশ্চিত।
অভ্যাস ও জ্ঞান বলে ইন্দ্রিয় করি সংযত
জগতের হিতে করি নিজ স্বার্থ পরিণত
স্বপ্রকৃতি অনুসারে স্বধর্ম্ম কর পালন
এইরূপে কর্ম্মফল ব্রহ্মে করি সমর্পণ।"

কবে এদেশের জননীগণ সন্তানদিগকে এইরূপ সুশিক্ষা প্রদান করিবেন? হায়, তাঁহারা নিজেরাই যে অশিক্ষিতা!

এইবার "রৈবতক" হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিব :—

"জগতের সুখ যাহা আমাদের সুখ তাহা
সকলে জগৎসুখে সমর্পিলে প্রাণ,
হবে ধরাতলে কিবা স্বর্গ অধিষ্ঠান।
অন্যথা সকলে পার্থ, সাধে যদি নিজ স্বার্থ
কি পশুত্বে পরিণত হইবে মানব,
আজি এ ভারত তার দৃষ্টান্ত পাণ্ডব।"

অন্যত্র :—

"এক ধর্ম্ম, এক জাতি, এক রাজ্য এক নীতি,
সকলের এক ভিত্তি—সর্ব্বভূত-হিত;
সাধনা নিষ্কাম কর্ম্ম, লক্ষ্য সে পরম ব্রহ্ম,
একমেবাদ্বিতীয়ং করিব নিশ্চিত
ওই ধর্ম্ম-রাজ্য মহাভারতে স্থাপিত।"

এই জাতীয় উত্থানের দিনে, স্বদেশহিতৈষী কবির এই মহদ্ভাব অন্তরে ধারণ করিয়া যদি দেশের উন্নতি করিবার চেষ্টা করিতে পারি, তাহা হইলে শুধুই কবির শ্রম সার্থক হয় না, আমাদেরও জন্ম সফল হয়। কবির এই উক্তিগুলি প্রত্যেক গৃহের "মটো" করিয়া রাখা উচিত।

কবির এই সকল উচ্চ ভাবপূর্ণ রচনা পড়িয়া এক এক সময় শুধুই ক্ষোভের উদয় হয়। মনে হয়, এই গভীর

তত্ত্বপূর্ণ কাব্যগুলি কেন কাব্যাংশে উৎকৃষ্ট হইল না? কুরুক্ষেত্রের অনেক স্থানের বহুমূল্য উপদেশ শুধুই উপদেশ মাত্র; সুমিষ্ট কবিতা নহে। আবার অনেক স্থানের রচনা এমন কর্কশ ও জটিল, মনে হয় যেন টোলের ভট্টাচার্য্য কৃত গীতার অনুবাদ পড়িতেছি। প্রভাসের রচনায় কবির সংযমের বড় অভাব। ভাবের উচ্ছ্বাসে কতই কি বলিয়া যাইতে থাকেন। ইহাতে রচনাটী যে বুদ্ধিমান পাঠকের নিকট নিতান্তই কবির খেয়াল বলিয়া মনে হইতে পারে, সে কথা কবি ভাবিয়াই দেখেন না। "সাহিত্য" পত্রে স্বর্গীয় কবি নিত্যকৃষ্ণ বসু মহাশয়ের ডায়েরিতে পড়িয়াছি, নবীন বাবু হাতে কাগজ ও পেন্সিল লইয়া হাকিমের সাক্ষীর জোবানবন্দী লেখার মত অতি দ্রুত রাশি রাশি কবিতা লিখিয়া যান; প্রেসে কাপি পাঠাইবার সময় একবার পড়িয়াও দেখেন না। সেই জন্য নবীন বাবুর রচনা অনেক স্থলে কবিত্ব-কৌশল-বিহীন শুষ্ক কথাই হইয়া দাঁড়ায়;—সে কথা নিত্যকৃষ্ণ বাবু ইঙ্গিতে বলিয়া গিয়াছেন। আমরা নবীন বাবুর কাব্য সমালোচনা করিতে বসিয়া নিত্যকৃষ্ণ বাবুর কথাই সত্য বলিয়া অনুভব করিতেছি। আমাদের আশঙ্কা আছে, কবিত্ব এবং মিষ্টতার অভাবেই এই উচ্চ ভাবপূর্ণ কাব্যগুলি রসজ্ঞ লোকদিগের নিকট আদৃত হইবে না। তবে শ্রদ্ধাস্পদ হীরেন্দ্র বাবুর ন্যায় দার্শনিক ও ধার্ম্মিকদিগের নিকট আদৃত হইবে বলিয়াই বিশ্বাস করি।

শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত।

শান্তি।

শান্তির অনন্ত উৎস হে বিশ্ব রাজন্,
যখন এ চরাচর কর নিমগন
অনন্ত শান্তির মাঝে, ঘোর রজনীর
সুগভীর নীরবতা, নিবিড় তিমির
এবিশ্ব আলয় খানি থাকে আবরিয়া
তখনো কি কর্ম্মস্রোত থাকে না জাগিয়া?
তখনো কি এ ধরার ভীম আবর্ত্তন
বন্ধ হয়, প্রকৃতির অঙ্গের ভূষণ
মুকুলে কুসুমে পত্রে তরু লতিকার
হয় না মধুরতর শোভার সঞ্চার?
তোমার এ শান্তি নহে মরণের পাশ,
অবসাদ, দৈন্য নহে; কর্ম্ম-অবকাশ?—
তাও নহে। শুধু এক কর্ম্মবন্ধ হ'তে
নিয়ে যায় পুণ্যতর আর এক স্রোতে।

বোলপুর শান্তিনিকেতন
১লা ভাদ্র, ১৩১৪। } শ্রীইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়।

খাসিয়া জাতি।

আসামের দক্ষিণ পশ্চিমাংশে খাসিয়া পাহাড়। সমুদ্রকূল হইতে খাসিয়া পাহাড়ের উচ্চতা স্থান বিশেষে ৩০০০ হইতে ৬০০০ ফিট। ইহার অধিকাংশ স্থানে সমস্ত বৎসর ব্যাপিয়া শীত থাকে, এবং উচ্চ উচ্চ স্থানে শীতকালে বরফ পতিত হয়। চেরাপুঞ্জী এবং জোয়াই নামক স্থানে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বৃষ্টি পতিত হয়। এমন কি সময়ে সময়ে চেরাপুঞ্জীর এক সপ্তাহের বৃষ্টিজল কলিকাতার সমস্ত বৎসরের বৃষ্টিজলকে অতিক্রম করে। এই পাহাড়ের অনেক স্থানের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতিশয় মনোরম। স্থানে স্থানে অত্যুচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গ, নিবিড় অরণ্যরাজি, কলনাদী স্রোতস্বতী, গভীর গহ্বর এবং প্রকাণ্ড জলপ্রপাত দেখিয়া বিশ্বস্রষ্টার অপার মহিমার কথা স্মরণ হয়। স্থূলভাবে বলিতে গেলে ইংরাজি ১৮৩৫ সালে খাসিয়া পাহাড় ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের অধিকৃত হইয়াছে। এখনও অনেক গ্রাম স্বাধীনভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজা বা সর্দ্দারদিগের দ্বারা শাসিত হইতেছে।

খাসিয়াদের পূর্ব্ব ইতিহাস কিছুই জানা যায় না। কিন্তু তাহারা যে মঙ্গোলীয় বংশসম্ভূত তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। আসামের অন্যান্য অসভ্য জাতি অপেক্ষা খাসিয়াগণ অনেক পরিমাণে সভ্য ও উন্নত। এই পাহাড়ের অন্তর্গত শিলঙ্গ পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের অন্যতম রাজধানী। খৃষ্টিয়ান পাদ্রীগণ গত ৫০ বৎসরের অধিক কাল যাবৎ ইহার নানা স্থানে কার্য্য করিতেছেন। এই দুই কারণে খাসিয়ারা জ্ঞান, সভ্যতা এবং আচারব্যবহার সম্বন্ধে অনেক

অগ্রসর হইয়াছে। কয়েকজন খাসিয়া যুবক উচ্চ শিক্ষা লাভ করিতেছে। অনেক যুবক মোটামুটি ইংরাজি শিখিয়া গভর্ণমেণ্ট আফিসে কার্য্য করিতেছে। ইংরাজ এবং বাঙ্গালীদিগকে দেখিয়া অনেকে নানাবিধ বিলাসের বস্তু ব্যবহার করিতে শিখিয়াছে। খাসিয়া পুরুষগণ এখন বাঙ্গালীর অনুকরণে ধুতি প্রভৃতি পরিধান করে। স্ত্রীলোকদিগের বস্ত্র পরিধানপ্রণালী অতি সুন্দর। খাসিয়াগণ অতিশয় মাংসপ্রিয়। ভাতের সহিত মৎস্য বা মাংসই ইহাদের প্রধান আহার। প্রায় সকল প্রকার মাংস এবং মৎস্য ইহারা খাইয়া থাকে। টাট্‌কা না পাইলে শুষ্ক মৎস্য বা মাংস আহার করে। অতি অল্প লোকেই ডাইল, তরকারী, ঘৃত, দুগ্ধ প্রভৃতি খাইতে জানে। শিশু সন্তানদিগকে দুগ্ধ না দিয়া ইহারা পক্ব কদলী খাওয়াইয়া থাকে। খাসিয়াগণ বেশ বলিষ্ঠ। তাহারা কৃষিকার্য্য, মজুরী, ব্যবসায়, ঠিকাকার্য্য, চাকুরী এবং মোটবহন প্রভৃতি কার্য্য দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ করে। রমণীগণ কার্য্যক্ষেত্রে পুরুষের সমকক্ষরূপে কার্য্য করিয়া থাকে। খাসিয়ারা স্বভাবতঃ নিরীহপ্রকৃতি। পরদ্রব্য অপহরণ করিতে তাহারা প্রায় জানে না, কিন্তু সভ্যতা দুই চারি জনকে এ শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহারা প্রকৃতিতে সরল, উদার এবং সর্ব্বদাই প্রফুল্লচিত্ত। নৈতিক, সামাজিক এবং আধ্যাত্মিক সকল প্রকার বন্ধনের শিথিলতা তাহাদের মধ্যে দেখা যায়। পুরুষগণের মধ্যে অনেকেই তাহাদের স্বদেশজাত মদ্য পান করিয়া থাকে। ব্যভিচারী পুরুষ বা রমণীকে সমাজ-পরিত্যক্ত হইতে হয় না, লোকের নিকট একটু হীন হইতে হয় মাত্র। স্বার্থপরতার ভাব তাহাদের মধ্যে বড় প্রবল। আতিথ্য এবং পরোপকার তাহারা একবারেই জানে না। সত্যপ্রিয়তা অনেকের মধ্যে দৃষ্ট হয় না। পিতামাতার সেবা, স্ত্রীপুত্র প্রতিপালন, উপকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা, আত্মীয় স্বজনের সাহায্য প্রভৃতি মানবজীবনের পবিত্র কর্ত্তব্য সম্বন্ধে তাহাদের জ্ঞান উজ্জ্বল নহে। পরস্পরের সুবিধা এবং সামাজিক প্রথার অনুরোধে তাহাদিগকে কতকগুলি সহানুভূতিব্যঞ্জক কার্য্য করিতে দেখা যায়। গৃহনির্ম্মাণ বা জীর্ণসংস্কারের সময় গ্রামবাসী সকলে পরস্পরের সাহায্য করে। কাহারও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় মৃতের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ পল্লীস্থ প্রত্যেক পরিবারের কোনও না কোন লোক শবের অনুসরণ করে। যদিও খাসিয়াগণ অন্যান্য পার্ব্বতীয় জাতি অপেক্ষা সভ্য, তথাপি তাহাদের অনেকের মধ্যে বড় অপরিচ্ছন্নতা দৃষ্ট হয়। অনেকের গৃহে প্রবেশ করিলে শুষ্ক মৎস্য, মাংস কুক্কুট এবং শূকরের দুর্গন্ধ অনুভূত হয়। যাহারা সভ্য হইয়াছে তাহারা সময়ে সময়ে স্নান এবং বস্ত্র ধৌত করে। ক্ষুদ্র বালক হইতে বৃদ্ধগণ দিবারাত্রি তামাকু খাইয়া থাকে। স্ত্রীলোক ও পুরুষ সকলেই সারাদিন কাঁচা সুপারী ও পান চর্ব্বণ করে। পান দিয়াই ইহারা লোকের প্রতি ভদ্রতা বা সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকে।

খাসিয়াদের মধ্যে বাল্যবিবাহ একেবারেই নাই। স্বাধীনতা সম্বন্ধে স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে কোনও প্রভেদ নাই, এজন্য স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই নিজের ইচ্ছামত বিবাহ করিয়া থাকে। বিবাহান্তে প্রায়ই পতি পত্নীর গৃহে আসিয়া বাস করে। উভয়ে ইচ্ছা করিলেই সহজে বিবাহবন্ধন ছিন্ন করিতে পারে। বিবাহবন্ধন ছিন্ন হইলে স্ত্রীলোকেই সকল সন্তান ও গৃহসম্পত্তির অধিকারিণী হয়। বহু বিবাহ খাসিয়াদের মধ্যে প্রায় কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। কাহারও একাধিক স্ত্রী থাকিলে বুঝা যায়, যে একজনই তাহার প্রকৃত স্ত্রী, অন্যান্য রক্ষিতা মাত্র। খাসিয়াদের মধ্যে জাতিভেদ একেবারেই নাই। তবে এক গোত্র বা কুলের লোকদিগের মধ্যে বিবাহ কখনই হইতে পারে না। মাতার যে গোত্র বা যে কুল, পুত্র ও কন্যার সেই গোত্র ও কুল হয়। পুরুষের অবিবাহিত অবস্থার সম্পত্তি তাহার মাতা এবং বিবাহিত অবস্থার সম্পত্তি তাহার স্ত্রী প্রাপ্ত হয়। কন্যাই মাতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হয়। স্বকুলের লোকেই মৃতের সৎকারাদির অধিকারী হইয়া থাকে। মহা সমারোহে মৃতের অন্ত্যেষ্টিকার্য্য সম্পাদিত হয় এবং তাহার অস্থি প্রস্তরাধারের মধ্যে প্রোথিত করিয়া স্মরণচিহ্ন স্বরূপ তদুপরি এক বা ততোধিক প্রস্তর-খণ্ড স্থাপন করা হয়।

খাসিয়া জাতির কোনও ধর্ম্মশাস্ত্র ও ধর্ম্মশিক্ষক নাই। অধিক কি কোনও নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মমত নাই। তাহাদের ধর্ম্মভাব অতি অস্ফুট। ধর্ম্ম বলিয়া তাহাদের ভাষায় কোনও কথা নাই। বাঙ্গালা "নিয়ম" কথার অপভ্রংশ "নিয়াম" এই

কথা ধর্ম্মের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয়। তাহার অর্থ অনুষ্ঠান-প্রণালী,—অর্থাৎ রোগ, দুঃখ বা বিপদ প্রভৃতির শান্তির জন্য তাহারা কতকগুলি অনুষ্ঠান পালন করিয়া থাকে। তাহারা একমাত্র সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বরে বিশ্বাস করে। পূর্ব্বে তাহারা "ঈশ্বর" শব্দ স্ত্রীলিঙ্গে ব্যবহার করিত, খৃষ্টীয় ধর্ম্মের ভাব বিস্তৃত হওয়াতে এক্ষণে তাহা পুংলিঙ্গে ব্যবহৃত হয়। ঈশ্বরকে স্রষ্টা, পাতা, নিরাকার, অনন্ত, সর্ব্বশক্তিমান্ বলিয়া স্বীকার করে, অথচ তাঁহার পূজা না করিয়া উপ-দেবতার পূজা করে। তাহারা বিশ্বাস করে, যে এই সকল উপদেবতা নির্জ্জন পর্ব্বত, বন বা নদীতে বাস করে এবং ক্রুদ্ধ হইলে মানবের উপরে পীড়া বা দুঃখ প্রেরণ করিয়া থাকে। রোগ বা দুঃখের সময় ইহাদের ক্রোধশান্তির জন্য তাহারা কুক্কুট, ছাগ বা শূকর বলিদান করে এবং মন্ত্রপূত ডিম্ব ভাঙ্গিয়া বা বলিদানের ছাগ বা কুক্কুটের অন্ত্র পরীক্ষা করিয়া বিপদ বা রোগের কারণ নির্দ্দেশ করে। পাপ, পুণ্য এবং নরক এই সকল কথার প্রতিশব্দ তাহাদের ভাষায় ছিল না। বাঙ্গালা "পাপ" এবং পারসিক ভাষার "হক" এবং "দোজক" উক্ত তিন শব্দের পরিবর্ত্তে যথাক্রমে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। পাপ ও পুণ্যের ফলে তাহারা বিশ্বাস করে এবং এক্ষণে স্বর্গ ও নরকেও বিশ্বাস করিয়া থাকে। তাহাদের মতে মৃত্যুর পরে আত্মার বিনাশ হয় না।

শুনা যায় যে খাসিয়াদের মধ্যে এরূপ এক সম্প্রদায় আছে যাহারা উপদেবতাদিগকে পরিতুষ্ট করিয়া ঐহিক সুখ সম্পদ লাভ করিবার জন্য গুপ্তভাবে নরহত্যা করিয়া নর-শোণিত সংগ্রহ করে। তাহারা এরূপ গোপনে কার্য্য করে যে তাহাদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিতে পারা যায় না—এমন কি পুলিস অনুসন্ধান করিয়াও হত্যাকারী-দিগকে ধরিতে পারে না। তবে সময়ে সময়ে এরূপ ঘটনা ঘটে বলিয়া এই প্রবাদের মূলে যে সত্য আছে তাহা অস্বীকার করিতে পারা যায় না। ইহাদিগকে নংরিথ্লেন (Nongrithlen) অর্থাৎ সর্পরক্ষক বলে। তাহার কারণ এই যে ঐ উপদেবতার আকার অনেক পরিমাণে বাইবেলোক্ত সর্প বা (সয়তানের) ন্যায় বলিয়া শুনা যায়।

ওয়েল্‌স্ প্রেসবিটিরীয় সম্প্রদায়ের খৃষ্টীয় পাদ্রীগণ ৫০ বৎসরের অধিক কাল যাবৎ খাসিয়া পাহাড়ে আপনাদের ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন। ইহার মধ্যে পাহাড়ে ঘোর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। খাসিয়াগণ অজ্ঞানান্ধ-কারে ডুবিয়াছিল, লিখিতে পড়িতে জানিত না, তাহাদের লিখিবার ভাষা * ছিল না, পড়িবার কোনও পুস্তক ছিল না। পাদ্রীরা খাসিয়া ভাষায় ইংরাজি অক্ষর প্রবর্ত্তিত করিয়া পুস্তক মুদ্রিত করিয়াছেন, শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করিয়া নানা স্থানে পাঠশালা স্থাপন করিয়াছেন। এক্ষণে অনেক খাসিয়া পুরুষ ও রমণী লিখিতে পড়িতে শিখিয়াছে। কয়েকজন ইউরোপীয় প্রচারক সপরিবারে তাহাদের মধ্যে বাস করিতেছেন। কেহ বা শিক্ষা দিয়া, কেহ কেহ বা রোগীর চিকিৎসা করিয়া এবং কেহ বা অন্যান্য উপায়ে তাহাদের হিতসাধন করিতেছেন। এই সকল কার্য্যে তাঁহাদের প্রত্যেক বৎসরে অনেক সহস্র টাকা ব্যয় হইতেছে। তাঁহাদের অর্থসাহায্যে আকৃষ্ট হইয়া অনেক লোক খৃষ্টিয়ান হয়। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ ৩। ৪ বার আসিয়া খৃষ্টান হয়, আবার খৃষ্টীয়ধর্ম্ম ছাড়িয়া চলিয়া যায়। পাদ্রীগণ অর্থ দ্বারা লোকদিগকে প্রলুব্ধ করিয়া অনেকের চক্ষে আপনাদের ধর্ম্মকে হীন করিয়া ফেলিতেছেন। একদিকে খাসিয়াগণ জ্ঞান ও সভ্যতা শিখিতেছে, অপরদিকে তৎসঙ্গে সঙ্গে বিলাসিতা এবং সুখপ্রিয়তা শিক্ষা করিয়া জাতীয় চরিত্র হইতে বিচ্যুত হইতেছে। খৃষ্টীয়ানদিগের বর্ত্তমান সংখ্যা প্রায় পোনর হাজার। কয়েক বৎসর হইল রোমান্ ক্যাথলিক কয়েকজন পাদ্রী খাসিয়া পাহাড়ে আসিয়াছেন। তাঁহারাও নানা ভাবে খাসিয়াদের মধ্যে কার্য্য করিতেছেন।

পাহাড়ের পার্শ্বদেশে একস্থানে কয়েকজন খাসিয়া আপনাদিগকে শূদ্র (অর্থাৎ শূদ্র বা হিন্দু) বলিয়া পরিচয় দেয়। তাহারা মূর্ত্তিপূজা করে না, রাম নাম করে; কিন্তু সে রাম দশরথের পুত্র নন, তিনি সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বর। তাহারা খোল করতাল লইয়া কীর্ত্তন করে। কয়েকটা বাঙ্গালা গান অর্থ না জানিয়া পাখীর ন্যায় মুখস্থ করিয়া

* খাসিয়া ভাষার সঙ্গে বাঙ্গালা, ইংরাজি বা অন্য কোনও ভাষার সাদৃশ্য নাই, তবে অনেক বাঙ্গালা কথা অপভ্রংশ হইয়া খাসিয়া ভাষার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে।
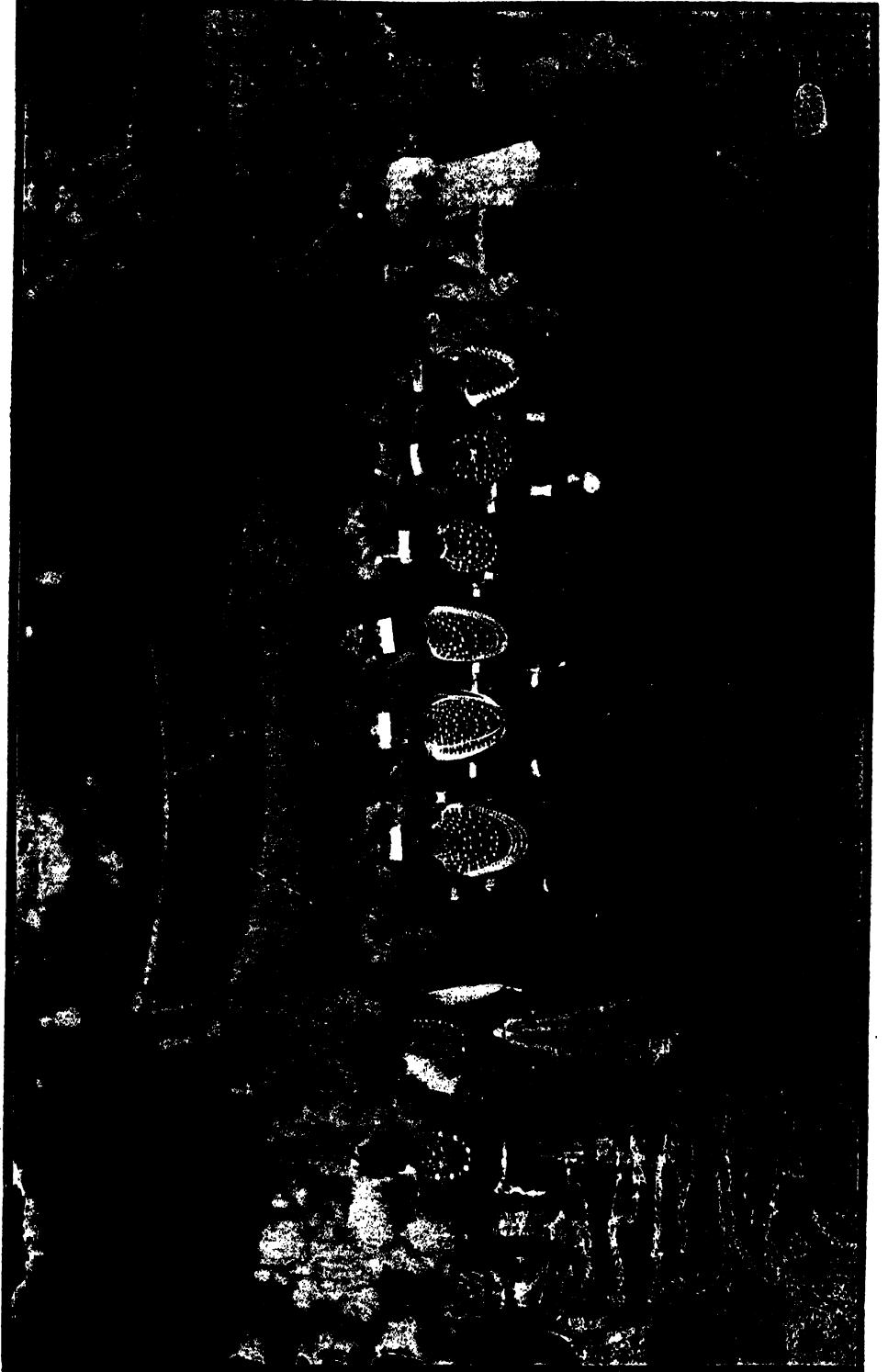
খাসিয়া নৃত্য।

গান করে। ইহাদের সংখ্যা অধিক নয়। সম্ভবতঃ ইহারা রামানুজদিগের নিকট এরূপ ভাব শিখিয়াছে। *

মন্ত্র।

(৩০শে আশ্বিন, রাখিবন্ধনের দিনে)

দ্বেষ হিংসা ভুলি,
পূত মন্ত্র গুলি
উচ্চে কহি আমি।

উচ্চে কহি—
"বন্দে মাতরম্।"

উচ্চে কহি—
"এক দেশ, এক ভগবান,
এক জাতি, এক মন প্রাণ।"

উচ্চে কহি—
"ভাই ভাই এক ঠাঁই,
ভেদ নাই, ভেদ নাই।"

উচ্চে কহি—
"বাঙালীর প্রাণ বাঙালীর মন
বাঙালীর ঘরে যত ভাই বোন্
এক হউক, এক হউক,
এক হউক, হে ভগবান।"

উচ্চে কহি—
শত্রু হও মিত্র হও
আলিঙ্গন করি,
আশ্বিনের পুণ্য প্রাতে।

উচ্চে কহি—
স্নেহ দিয়ে ভক্তি দিয়ে
বেঁধে দিনু "রাখি",
বুক ভরা আশা নিয়ে
ঊর্দ্ধে তুলি আঁখি।

শ্রীহিমাংশুপ্রকাশ রায়।

---

* খাসিয়া পাহাড়ের ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক শ্রীযুক্ত নীলমণি চক্রবর্ত্তী লিখিত "খাসিয়াজাতি ও খাসিয়া মিশন" হইতে সংগৃহীত। এই প্রচারক মহাশয়ের চেষ্টায় খাসিয়া পাহাড়ে ব্রহ্মধর্ম্মও ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করিতেছে। ভাঃ মঃ সঃ।

কল্যাণী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

"ওরে পোড়ারমুখো, ও লক্ষ্মীছাড়া, বল্‌ছি ওরে হতভাগা, শুন্‌ছিস্? বাজারে যাবিনে? জিনিষগুলি আন্‌বিনে? খদ্দেররা যে সব এসে এসে ফিরে যাচ্ছে। বলি উপায়টা কি হবে?"

ত্রয়োদশ-বর্ষীয়া বালিকা কল্যাণী তাহার দ্বাদশবর্ষীয় ভাই নরেনকে এইরূপ সাদর সম্ভাষণে তৃপ্ত করিতেছিল। গুণধর ভাই ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "আবাগী, আগে থাক্‌তে বল্‌তে পারিস্ না? তিন বেলা জালার মত পেটটা বোঝাই করতে কখন ত ভুলিস না, কাজের বেলাই শুধু ভুল! বল্ কি কি আন্‌তে হবে?"—এই বলিয়া সে যেই কেরোসিনের টিনটা কাত করিয়া দেখিতে গেল, হঠাৎ টিন উল্টিয়া টিনের তৈলটুকু সব ঘরময় ছড়াইয়া পড়িল। নরেন তখনি চম্পট, কল্যাণী চীৎকার করিতে লাগিল। চীৎকার শুনিয়া কল্যাণীর মা গৃহে প্রবেশ করিয়া বলিল, "হাঁ লা, কলি, পাঁটার মত চেচামেচি কেন? তোরা কি আমায় একটু ঘুমুতে দিবিনে? আর ত যাতনা সয় না!"

মাতার প্রতি কন্যা দৃক্‌পাতও করিল না; অনুচ্চ স্বরে বলিতে লাগিল, "তোমার আর ঘুম ছাড়া সংসারে কি আছে? সংসার যে উচ্ছিন্ন গেল, তাতে তোমার কিছু আসে যায় না!" বক্ বক্ করিতে করিতে মা গৃহান্তরে চলিয়া গেল, কন্যা গৃহ পরিষ্কার করিতে লাগিল।

বাহিরে কে ডাকিল, "সুধীন্দ্র বাবুর কি এই বাড়ী? সুধীন্দ্র বাবু বাড়ী আছেন?" কল্যাণী বিরক্ত হইয়া উত্তর করিল, "কে গো, সুধীন্দ্র বাবু, সুধীন্দ্র বাবু ক'রে চেঁচাচ্ছ? সুধীন্দ্র বাবু বাড়ী নেই।" তাহার কথা শেষ হইতে না হইতে একটী মধ্যবয়স্কা ভদ্রমহিলা ভৃত্য সঙ্গে গৃহে প্রবেশ করিলেন। ঘর খানার অপরিষ্কার ও বিশৃঙ্খল অবস্থা দেখিয়া, আর কল্যাণীর অভদ্রোচিত কথাবার্ত্তা শুনিয়া মহিলাটীর মুখ ম্লান হইয়া গেল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাছা, সুধীন্দ্র বাবুর স্ত্রীকে একটু খবর দাও

ত ?" কল্যাণী বলিল, "তাঁকে খবর দিয়া কি হবে ? আপনি এখন তাঁহার দেখা পাইবেন না।"

মহিলাটী উত্তর করিলেন, "বাছা, তোমার নাম কল্যাণী নয় ? তুমি সুধীন্দ্রের জ্যেষ্ঠা কন্যা ? মা কল্যাণী, আমি তোমার পিসিমা, এস মা, কাছে এস।" কল্যাণীকে কাছে টানিয়া তিনি তাহার মলিন মুখ চুম্বন করিলেন, আদরে তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন। বলিলেন, "আয় বাছা, তোর মার কাছে যাই।" কল্যাণী বলিল, "পিসিমা, আমি প্রথমে আপনাকে চিনিতে পারি নাই, আর যে ভাবে দিন কাটাই, মেজাজটা সর্ব্বদা পঞ্চমেই চড়িয়া থাকে।"

পিসিমা বলিলেন, "হাঁ বাছা, আমি সব শুনিয়াছি, আর এখন ত নিজ চক্ষেই দেখিতেছি! তোমার বাবা সকল কথা, তোমার কথা, আমাকে লিখিয়াছেন, সেই জন্যই আমি আজ এখানে আসিয়াছি।"

মনের আনন্দে কল্যাণী পিসিমার হাত ধরিয়া তাঁহাকে ভিতরে লইয়া গেল। কিন্তু আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে লজ্জা আসিয়া তাহার মনকে অধিকার করিতে লাগিল। তাহাদের অপরিষ্কার ঘর বাড়ী, তাহাদের নিতান্ত দুরবস্থা, আর এই দুরবস্থার প্রকৃত কারণ, পিসিমা সকলই দেখিতেছেন, সকলই জানেন, ভাবিয়া কল্যাণীর মুখখানা গম্ভীর হইয়া পড়িল। সুধীন্দ্র বাবু আসিয়া ভগ্নীকে প্রণাম করিলেন। পরস্পর কুশল প্রশ্নাদি ও অন্যান্য আলাপের পর সুশীলা দেবী (কল্যাণীর পিসিমা) বলিলেন, "ভাই, তোমার পত্র পাইয়া আমি কল্যাণীকে নিতে আসিয়াছি, শীঘ্রই আমাকে ম—তে ফিরিতে হইবে, তুমি কল্যাণীর যাইবার আয়োজন করিয়া দাও। ভগবান্ আমায় ছেলেমেয়ে দেন নাই, কল্যাণীকে আমি মেয়ের মত করিয়া পালন করিব, মনের মত করিয়া গড়িব। একাকী দিন কাটাই, কল্যাণীকে পাইলে আমার সুখের সীমা থাকিবে না।" কল্যাণীর মা পার্শ্বে বসিয়া সকলি শুনিতেছিলেন, ক্রোধে অধীর হইয়া বলিতে লাগিল, "তোমরা ত দেখিতেছি আমাকে জিজ্ঞাসা না করিয়াই আমার মেয়েকে বিলাইয়া দিবার বন্দোবস্ত করিয়াছ, সে ত যেন সুখে থাকিবে বুঝিলাম, কিন্তু মেয়ে না হ'লে আমার চলিবে না। পিতৃ-কুটুম্বের বাড়ী থাকিয়া আপনার মাকে ঘৃণা করিতে শিখিতে কখনো দিব না। আমি তাহাকে কোথাও যাইতে দিব না।"

সুধীন্দ্র বাবু তাহাকে এক ধমক দিয়া বলিলেন :—

"তুমি চুপ কর, তোমার কোন কথা শুনিতে চাই না, তুমি ঘুমাও গিয়া।"

পত্নীর আর কোন কথা না শুনিয়া সুধীন্দ্র বাবু ভগ্নীকে লইয়া গৃহান্তরে চলিয়া গেলেন। কল্যাণীর তাহার পিসিমার বাড়ী যাওয়া স্থির হইয়া গেল। পিতামাতা ও ভাই ভগিনীদের ছাড়িয়া যাইবার কথায় তাহার দুঃখ হইতে লাগিল বটে, কিন্তু সে তাহার ঘৃণিত দৈনন্দিন জীবনের প্রতি এতই হতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল, যে এই পরিবর্ত্তন প্রস্তাবে তাহার আনন্দই অধিক হইল।

সুধীন্দ্র বাবু ও তাহার ভগ্নী বংশানুক্রমে খৃষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বী। সুধীন্দ্র বাবু পশ্চিমে একটি ক্ষুদ্র সহর স—তে বাস করেন, একটা আফিসে সামান্য চাকুরী করিয়া কিছু পান। বাড়ীতে একটা দোকান আছে, ছেলে মেয়েকে দোকানটি চালায়, ইহাতেও দুচার পয়সা আসে। কায়ক্লেশে কোনরূপে অন্নাচ্ছাদন জুটে। কিন্তু পরিবারটিতে শান্তিসুখ নাই। সুধীন্দ্র বাবুর পিতা মধ্যবিত্ত ধর্ম্মপরায়ণ খৃষ্টান ছিলেন, কিন্তু সুধীন্দ্র বাবুর লেখাপড়ায় মন ছিল না, ভাল লেখা পড়া শিখিতে পারেন নাই। প্রতিবাসী একজন খৃষ্টানের সুন্দরী কন্যার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। কিন্তু সুধীন্দ্রের পত্নীর শুধু রূপই ছিল, রূপের অনুরূপ গুণ ছিল না। বিলাসিতা তাহার হাড়ে হাড়ে প্রবেশ করিয়াছিল, অবশেষে সাহেবী-আনার সঙ্গী পানদোষও তাহাকে স্পর্শ করিয়াছিল। পত্নীর দোষে তাহার সংসারটী ছারখার হইয়াছে। ছেলেমেয়েগুলির প্রকৃতিও খারাপ হইয়াছে, সংসার হইতে শান্তিসুখ বিদায় লইয়াছে। কল্যাণীর প্রকৃতি অপেক্ষাকৃত ভালই ছিল, সে পরিবার মধ্যে যথাসম্ভব, শৃঙ্খলা, সৌন্দর্য্য ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত রাখিতে চেষ্টা করিত, কিন্তু অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইয়াছিল তাহাতে তাহার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইত। ক্রমে তাহার প্রকৃতিও পরিবারের অপর সকলের প্রকৃতির অনুযায়ী হইয়া উঠিতেছিল। সুধীন্দ্র বাবু কল্যাণীর প্রকৃতির সদ্‌গুণগুলি উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাহার পরিবর্ত্তনও

দিন দিন লক্ষ্য করিতেছিলেন। পিতৃহৃদয় কন্যার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছিল। সুদূর ম—সহরে তাঁহার বিধবা দিদি সুশীলা দেবী বাস করিতেন। ভ্রাতার প্রতি তাঁহার যথেষ্ট ভালবাসা ছিল, সুধীন্দ্র বাবু তাঁহার শরণ লইলেন, কল্যাণীর ভার লইতে তিনি দিদিকে অনুরোধ করিলেন। নিঃসন্তান সুশীলা দেবীও এই প্রস্তাবে আনন্দিত হইয়া কল্যাণীকে নিতে আসিয়াছেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীকল্পনাময়ী দেবী।

বঙ্গবালার ভ্রমণকাহিনী।

শ্রদ্ধেয়া লেখিকা তাঁহার স্বর্গীয় স্বামী আনন্দমোহন বসু মহাশয়ের সঙ্গে, কখনো বা অন্যান্য আত্মীয়গণের সঙ্গে ভারতবর্ষের বহু দর্শনীয় ও দুর্গম স্থানে ভ্রমণ করিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় আর কোন মহিলা ভারতের নানাস্থানে এত ভ্রমণ করিয়াছেন কি না জানি না। এই সকল ভ্রমণকাহিনী আমাদের পাঠিকা ভগিনীগণের নিকট নিশ্চয়ই আদরণীয় হইবে মনে করিয়া আমরা সাদরে ভারত-মহিলায় প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলাম। ভাঃ মঃ সঃ।

দেশভ্রমণ জ্ঞানলাভ ও হৃদয় প্রশস্ত করিবার প্রধান উপায়। সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা আমাদের এই ভারতমাতার সুবিস্তৃত বক্ষের অন্তরালে প্রকৃতি সতী উন্মুক্ত সুষমারাশি বিকাশ করিয়া ভগবানের আশ্চর্য্য সৃষ্টিকৌশলের যে পরিচয় দিতেছেন তাহা প্রত্যক্ষ করা প্রত্যেক ভারত-সন্তানের অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া আমার ধারণা। সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সমাজে যে ভাবে বিলাসিতার আধিপত্য প্রবেশ করিতেছে তাহা লক্ষ্য করিয়া হৃদয় কম্পিত হয়। ইহার বিষময় ফলের কোথায় যে পরিসমাপ্তি, কে বলিতে পারে? আমি পিঞ্জরাবদ্ধ হিন্দুনারী হইয়া আজীবন দেশপর্য্যটনের জন্য ব্যাকুল ছিলাম। ভগবানের অসীম আশীর্ব্বাদ বলে নানা প্রকার বিঘ্ন বাধা সত্ত্বেও আকাঙ্ক্ষা অনেক পরিমাণে সফল হওয়াতে নিজকে ধন্য মনে করিতেছি। আমি যে স্থানেই গমন করিয়াছি, যথাযথ ভাবে দৈনিকলিপিতে ভ্রমণকাহিনী লিপিবদ্ধ করিতে অন্যথা করি নাই। এই গুলি দীর্ঘকাল পূর্ব্বে লিখিত হইলেও তাহা পাঠ করিয়া এই শোকবিহ্বল, রোগ ও উদ্বেগপূর্ণ হৃদয়ে যথেষ্ট আনন্দ লাভ করিয়া থাকি। বঙ্গমহিলাগণ বেশ বিন্যাস ও অলঙ্কারে অর্থ অপচয় না করিয়া যদি সুবিধা মতে আমাদের মাতৃভূমির ভুবনবিখ্যাত স্থানগুলি দর্শন করেন তবে জ্ঞান ও স্বদেশপ্রীতি প্রদীপ্ত হইয়া সঙ্কীর্ণ মন মাতৃভক্তিতে পূর্ণ করিবে এই আশায় সম্পাদিকার বিশেষ অনুরোধে আমার ভ্রমণকাহিনী দৈনিক লিপি হইতে যথাযথ ভাবে ভারত-মহিলাতে প্রেরণ করিতেছি।

আমরা শৈশব হইতে সুশীতল ব্রাহ্মসমাজের উদার বক্ষে স্থানলাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলাম বটে, কিন্তু শ্বশুরগৃহের গুরুজনের বিরাগভয়ে কম্পিত থাকিতে হইত। কিন্তু সদাশয় স্বামী মহাশয় সকল তাড়নার ভার নিজ মস্তকে লইতেন এবং আমাকে সঙ্গে লইয়া মাতৃভূমির নানাস্থান পর্য্যটন করিতেন। শোক, তাপ ও রোগে ক্লিষ্ট হইয়া ইতিপূর্ব্বে আমি প্রকৃতির সুরম্য ক্রীড়াকানন দারজিলিংবাসী হইয়াছিলাম। ঐ স্থানেই চিরবাসস্থান করিব সংকল্প ছিল। হঠাৎ পূজার ছুটির সময় স্বামী মহাশয় অনুরোধ করিলেন যে পেশোয়ার পর্য্যন্ত ভ্রমণে আমি তাঁহার সঙ্গিনী হই। তাঁহার এই উদার অনুরোধ অবহেলা করা উচিত মনে করি নাই। কিন্তু অসহায় অপোগণ্ড শিশুগুলিকে চন্দননগরস্থ পিতৃগৃহে রাখিবার প্রস্তাবে মন অত্যন্ত বিহ্বল হইল। অনেক অশ্রুবিসর্জ্জনের পর মনকে যাত্রার জন্য প্রস্তুত করিলাম।

২৮শে সেপ্টেম্বর ১৮৮৭।

অদ্য (রবিবার) রাত্রির মেলট্রেণে আর দুইজন সহযাত্রীর সহিত পেশোয়ার যাত্রীরূপে হাওড়া ষ্টেশন ত্যাগ করিলাম। ট্রেণ চলিবামাত্রই মন অভূতপূর্ব্ব আনন্দে পূর্ণ হইল। কলিকাতার অসহ্য কোলাহল, ধূলি ও মশকপূর্ণ সংসার-পিঞ্জরাবদ্ধা বিহঙ্গিনী আজ যেন মুক্ত আকাশপথে উঠিয়াছে। সারারাত্রি একভাবে বেঞ্চের উপর বসিয়া নিস্তব্ধ প্রকৃতির উন্মুক্ত সৌন্দর্য্য লক্ষ্য করিয়া হৃদয় প্রগাঢ় শান্তিতে মগ্ন হইল। পরদিন অর্থাৎ সোমবার অপরাহ্ণ চারিটার সময় আমরা কাশীধামে পৌঁছিলাম। একভাবে ট্রেণে বসিয়া গ্রীষ্ম ও ধূলির দৌরাত্ম্যে অত্যন্ত ক্লান্ত ছিলাম, সেইজন্য নদীর প্রশস্ত পুল পদব্রজে পার হইয়া এ পারে পৌঁছিলাম। পুলের উপর হইতে অস্তগামী সূর্য্যের কিরণ প্রতিফলিত বিশ্বেশ্বর-মন্দিরের চূড়াগুলি চিত্রতুল্য দৃষ্ট হইতেছিল। একমনে তাহা অবলোকন

করিতে করিতে মন বিস্ময়ে অভিভূত হইল। এই সময় কাশী সহর (city) ওলাউঠার প্রকোপপূর্ণ শুনিয়া আমরা চারি মাইল দূরবর্ত্তী সিক্রোলে প্রস্থান করা বিহিত মনে করিলাম। দুর্ভাগ্যক্রমে তৃতীয় শ্রেণীর একখানা অতি কদর্য্য গাড়ী আমাদের ভাগ্যে জুটিল। একে ক্ষুধা তৃষ্ণায় একান্ত পীড়িত, তাহার উপর দারুণ গ্রীষ্ম। ধূলি-পূর্ণ চারি মাইল পথ এই কদর্য্য যানে গমন যে কি ভয়ানক ক্লেশকর হইল তাহা এখনও আমার মনে জাগিতেছে। আমরা সকলেই মর্ত্ত্যের জীব, স্নান ও বিশ্রামের জন্য ব্যাকুল। শুধু বসু মহাশয় প্রগাঢ় শান্তিপূর্ণ। কোন কষ্টে ভ্রূক্ষেপ করা দূরে থাকুক, কেবলই বলিলেন, "অতি সুন্দর।" তখন আমার বিষম ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিবার উপক্রম হইল। অনেক কষ্টে চুপ করিয়া রহিলাম। প্রায় সন্ধ্যার সময়, সিক্রোলের বিস্তীর্ণ প্রান্তরস্থিত অতি ক্ষুদ্র ডাক বাঙ্গালায় পৌঁছিয়া যেন দেহে প্রাণ আসিল। বাংলা একমাত্র চৌকিদারের অধীন। ভয়ানক অপরিষ্কার। সহযাত্রী ডাক্তার রায় মহাশয়, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কোনও ধার ধারেন না। তাঁহার নবপরিণীতা পত্নীও তদনুরূপ। তাঁহারা পৌঁছিয়াই অপরিষ্কার খাটিয়াগুলিতে লম্বা হইয়া পড়িলেন। শুধু আমি মাত্র যাত্রীদল হইতে স্বতন্ত্র প্রকৃতির জীব। ঘরগুলি ঝাঁট দিয়া ও ধোয়াইয়া স্নানাদি করিলাম। সঙ্গের লেবু দ্বারা প্রচুর পরিমাণে সরবত প্রস্তুত করিয়া সকলে পান পূর্ব্বক পরিতৃপ্ত হইলাম। আমার আহারের সঙ্গে কোন দিনই বেশি সম্পর্ক নাই। নূতন স্থানে নূতন লোককে বকাবকি করিয়া কার্য্য করাইতে ডাক্তার রায় বিলক্ষণ পটু ছিলেন। তাঁহার প্রতি এই প্রীতিকর কার্য্যের ভার দিয়া আমি ভ্রমণে বাহির হইলাম। (ক্রমশঃ)

স্বর্ণপ্রভা বসু।

ভরা ভাদরে।

আজি এই ভরা ভাদরে,
কূল বিপ্লাবিয়া নদী,
ছুটিতেছে নিরবধি,
কি জানি কিসের আশে খুঁজিতে কারে;
আজি এই ভরা ভাদরে।

আজি ভাদর ভরা।
নদী জলে আসে বান,
অনন্তের কল তান,
গাহিয়া শুনায়ে যায় প্লাবিয়া ধরা।
আজি নদী ভাদর ভরা।

আজি ভরা ভাদর দিনে।
মেঘ ভরা নীলাকাশে,
চপলা চমকি হাসে,
কি ভাষা জানায় মেঘে, নয়নকোণে,
আজি ভরা ভাদর দিনে।

আজি ভরা ভাদর নিশি।
আকাশে ফোটেনি তারা,
ধরা যেন দিশেহারা,
চাঁদ যেন গেছে আজ আঁধারে মিশি,
আজি ভরা ভাদর নিশি।

ওগো আজ ভাদর রাতে,
গাহিতে গেলেম গান,
ভাঙা বীণে দিয়ে তান,
ছিঁড়ে গেল তার তা'র মাঝ খানেতে;
আজি ভরা ভাদর রাতে।

ওগো আজ ভরা ভাদরে,
শুধু ঝরে আঁখিধারা,
প্রাণ শুধু কেঁদে সারা,
হারাণ কি কথা যেন পাইতে ফিরে;
আজি এই ভরা ভাদরে।

শ্রীমৃন্ময়ী দেবী।

চিত্রের কথা।

বর্ত্তমান সংখ্যার "কারাগারে" ও "আর বৃষ্টি নাই" এই দুইখানি চিত্রই করুণ ভাবোদ্দীপক। বন্দীর স্ত্রী তাহার পুত্রক্রোড়ে স্বামীকে দেখিতে গিয়াছে, বন্দী শিশু পুত্রকে আদর করিতেছে। ঈশ্বর মানবাত্মাকে আপনার দিকে আনিবার জন্য যত উপায় অবলম্বন করেন মানব ক্রমে ক্রমে তাহার সকলই উপেক্ষা করিতে পারে, কিন্তু প্রেমসূত্র কিছুতেই ছিন্ন করিতে পারে না। অপরকে ভাল না বাসুক, আপনার জনকেও পাপাসক্ত হৃদয় যখন ভালবাসে তখন ঈশ্বর সেই কোমলতার সূত্রে ধরিয়া পাপীর হৃদয়ের নিকটবর্ত্তী হন। অপর চিত্রটীতে তিনটী অসহায় শিশু বৃষ্টিকালে ঘাসের আঁটির নীচে আশ্রয় লইয়াছে, আর হাত বাড়াইয়া দেখিতেছে, বৃষ্টি আছে কিনা।

কলিকাতা, ২৫ নং রামবাগান ষ্ট্রীট ভারতমিহির যন্ত্রে সান্যাল এণ্ড কোম্পানী দ্বারা মুদ্রিত।

The woman's cause is man's; they rise or sink
Together, dwarfed or God-like, bond or free;
If she be small, slight-natured, miserable,
How shall men grow?

Tennyson.

৩য় ভাগ। কার্ত্তিক, ১৩১৪। ৭ম সংখ্যা।

ভারত-মহিলার অবস্থা।

ভারতবর্ষের কোনও কোনও প্রদেশে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যা বেশী এবং কোনও কোনও প্রদেশে কম। কিন্তু মোটামুটি হিসাবে ধরিলে, সমগ্র ভারতের স্ত্রীপুরুষের সংখ্যা প্রায় সমান। ভারতের নরনারী-সম্মিলিত সমাজ-দেহকে যদি সমান দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়, তাহা হইলে এই সমাজের এক অর্দ্ধাঙ্গ পুরুষ, এবং অপর অর্দ্ধাঙ্গ হয় নারী। জীবের যেরূপ দেহ আছে, সমাজেরও সেইরূপ দেহ কল্পিত হইয়া থাকে। জীব-দেহের সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গের যথোচিত বিকাশ ও কার্য্যকারিতার উপর যেরূপ তাহার বিকাশ ও কার্য্যকারিতা নির্ভর করে, তদ্রূপ সমাজ-দেহেরও সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গের যথোচিত বিকাশ হওয়া ও কার্য্যকারিতা থাকা আবশ্যক। নতুবা সমাজ-দেহের কোনও অঙ্গ হীন, দুর্ব্বল ও অপটু হইলে, তাহার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি ও বিকাশ হইতে পারে না এবং তজ্জন্য তাহার কার্য্যকারিতারও খর্ব্বতা হয়।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, রমণীগণ সমাজ-দেহের অর্দ্ধাঙ্গ স্বরূপ। সুতরাং এই অর্দ্ধাঙ্গ যদি হীন, দুর্ব্বল ও অবিকশিত থাকে, তাহা হইলে সমগ্র সমাজ-দেহকে কদাপি পূর্ণ, সবল ও বিকশিত বলা যাইতে পারে না। এইরূপ সমাজ যে কর্ম্মপটু নহে এবং উন্নতির পথেও অগ্রসর হইতে অসমর্থ, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

আজ সমগ্র ভারতবাসী উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে ব্যাকুল হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের সমাজ-দেহের বর্ত্তমান যেরূপ অবস্থা, তাহাতে তাঁহারা তাঁহাদের মহৎ সঙ্কল্প কার্য্যে কতদূর পরিণত করিতে পারিবেন, তাহা বিবেচ্য বিষয়। তাঁহাদের সমাজ-দেহের অর্দ্ধাঙ্গ যে সবল ও পটু নহে, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। এই দুর্ব্বল ও অপটু দেহ লইয়া তাঁহারা প্রবলের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে সমর্থ হইবেন কি?

আমরা সমাজ-দেহ-তত্ত্ব বুঝিবার জন্য এতক্ষণ সমগ্র ভারতবাসীকে যেন এক সমাজ-ভুক্ত বলিয়াই ধরিয়া লইয়াছিলাম। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে, ভারতবাসীগণ এক সমাজভুক্ত নহেন। ভারতে অসংখ্য জাতি ও ধর্ম্মসম্প্রদায় বিদ্যমান রহিয়াছে। এক একটি জাতি ও ধর্ম্মসম্প্রদায় লইয়া এক একটী সমাজ গঠিত হইয়াছে। এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজের সংখ্যা করা যায় না। কিন্তু এই সমাজগুলিকে প্রধানতঃ কতিপয় বিশিষ্ট বিভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, যথাঃ—হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, পারসীক ইত্যাদি। ভারতবাসিদিগের মোট সংখ্যা প্রায় তেত্রিশ কোটি। ইহাদের মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা ত্রিশ কোটির অধিক;

মুসলমানের সংখ্যা পাঁচ কোটিরও অধিক ; অবশিষ্ট সংখ্যক ব্যক্তির মধ্যে, খৃষ্টান, পারসীক, শিখ, ব্রাহ্ম ও আদিম অধিবাসিগণ আছেন। খৃষ্টান, পারসীক ও ব্রাহ্ম-সমাজ ব্যতীত, অন্য সমস্ত সমাজে অর্দ্ধাঙ্গ-স্বরূপিণী নারীগণের অবস্থা শোচনীয়। সুতরাং, এই শেষোক্ত সমস্ত সমাজ-দেহ যে পূর্ণাঙ্গ, সবল ও কর্ম্মক্ষম আছে, তাহা বিশ্বাস করা যায় না। খৃষ্টান, পারসীক প্রভৃতির সংখ্যা সমগ্র ভারতবাসীর তুলনায় সামান্য মাত্র। অগত্যা বলিতে হয় যে, জাতীয় উন্নতির পথে অগ্রসর হইবার নিমিত্ত, সমগ্র ভারতবাসিগণের সমাজ-দেহ এখনও সবল, পটু ও কর্ম্মক্ষম হয় নাই।

ভারত-মহিলাগণ লইয়া সমাজ-দেহের যে অর্দ্ধাঙ্গ গঠিত হইয়াছে, এতক্ষণ তাহারই কথা বলিতেছিলাম। কিন্তু পুরুষগণ লইয়া সমাজ-দেহের যে অপর অর্দ্ধাঙ্গ গঠিত হইয়াছে, তাহার কথা কিছু বলি নাই। সমাজ-দেহের এই অর্দ্ধাঙ্গও যে সুস্থ, সবল ও কর্ম্মক্ষম রহিয়াছে তাহা কেহই বলিবেন না। পুরুষগণের মধ্যে শিক্ষিত ব্যক্তির সংখ্যা অতি সামান্য মাত্র। অধিকাংশ ব্যক্তিই অশিক্ষিত, নিরক্ষর, অজ্ঞান, দারিদ্র্যক্লিষ্ট ও হিতাহিত বিবেচনাশূন্য। সমাজ-দেহের এই অর্দ্ধাঙ্গকে পুষ্ট, সবল ও কর্ম্মক্ষম করিতে হইলে, লোকশিক্ষার বহুল প্রচারের আবশ্যকতা আছে, এবং দেশীয় কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যেরও শ্রীবৃদ্ধি সাধন করা একান্ত প্রয়োজনীয়। এতৎসম্বন্ধে কোনও প্রকার চেষ্টা যে না হইতেছে, তাহা বলিতেছি না। কিন্তু এই চেষ্টার মধ্যে এখনও সম্যক দৃঢ়তা ও একপ্রাণতা উপস্থিত হয় নাই। এখন উপস্থিত না হউক, কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই যে তাহা উপস্থিত হইবে, তাহার লক্ষণ দেখা যাইতেছে। ইহা আশার কথা, সন্দেহ নাই। কিন্তু, সমাজ-দেহের অপর অর্দ্ধাঙ্গকে পূর্ণ, সুস্থ ও সবল করিবার নিমিত্ত কাহারও বিশেষ কিছু যত্ন ও চেষ্টা দেখা যাইতেছে না। দেহের এক অর্দ্ধাঙ্গের চিকিৎসার সঙ্গে সঙ্গে অপর অর্দ্ধাঙ্গেরও চিকিৎসায় প্রবৃত্ত না হইলে, সমগ্র দেহের স্বাস্থ্য, চৈতন্য ও সবলতা সাধিত হইবার সম্ভাবনা নাই।

ভারতবাসিগণের মধ্যে হিন্দুর সংখ্যাই অপেক্ষাকৃত সমধিক। এই হিন্দুসমাজ-দেহ সম্বন্ধেই যৎসামান্য আলোচনা করা যাউক। সেই আলোচনা দ্বারা অন্যান্য সমাজ-দেহেরও অবস্থা অনেকটা বুঝা যাইবে।

হিন্দু সমাজে অশিক্ষিত ব্যক্তিগণের তুলনায়, শিক্ষিত ব্যক্তিগণের সংখ্যা অতিশয় অল্প। স্ত্রীশিক্ষাও হিন্দু সমাজে তাদৃশ প্রচলিত নহে। হিন্দুসমাজে এক শত স্ত্রীলোকের মধ্যে একজনও লিখিতে পড়িতে জানেন কি না, সন্দেহ স্থল। অধিকাংশ পুরুষের ন্যায়, অধিকাংশ রমণীই অজ্ঞা। কিন্তু পুরুষ সমাজ অপেক্ষা, স্ত্রীসমাজে অজ্ঞতার মাত্রা সমধিক। তাঁহাদের দৃষ্টি সঙ্কীর্ণ, কার্য্য-ক্ষেত্র ক্ষুদ্র, এবং চিন্তা গৃহের চতুঃসীমার মধ্যেই আবদ্ধ। স্বামী, পুত্র, শ্বশুর শাশুড়ী, দেবর প্রভৃতিই তাঁহাদের আত্মীয় স্বজন। ইহাদের মঙ্গল ও সুখ দুঃখেই তাঁহাদের সুখ দুঃখ এবং ইহাদের সেবা শুশ্রূষা ও লালন পালনেই তাঁহাদের আনন্দ। পিতৃগৃহ ও শ্বশুরগৃহই তাঁহাদের একমাত্র জগৎ। এই জগতের বহির্ভাগে কি হইতেছে, তাহা জানিতে তাঁহাদের কোনও কৌতূহল হয় না। গৃহের বহির্ভাগে যে জগৎ আছে, তাহা তাঁহাদের পক্ষে যেন একটী স্বপ্নময় ও অবাস্তব রাজ্য। সে রাজ্যের কোনও বিষয়ে ও ব্যাপারে তাঁহাদের মনোযোগ আকৃষ্ট বা চিত্ত সংলগ্ন হয় না। বঙ্গদেশ কতদুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত, বিহার কোথায়, পঞ্জাব কোথায়, মহারাষ্ট্র কোথায়, মান্দ্রাজ কোথায়, তাহা তাঁহারা অবগত নহেন। বিহারে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়া লক্ষ লক্ষ লোক প্রাণত্যাগ করিলে, বাঙ্গালীরা কেন তাহাতে ব্যথিত হন, তাহাও তাঁহারা সম্যকরূপে বুঝিতে পারেন না। মুসলমানেরা কোথা হইতে আসিলেন, ইংরাজেরাই বা আমাদের দেশের রাজা হইলেন কেন, এই সমস্ত বিষয় তাঁহারা অবগত নহেন। স্বদেশ কি, শিল্প কি, বাণিজ্য কি, শিল্পবাণিজ্যের উন্নতি সাধনের আবশ্যকতা কেন, ইহাও তাঁহারা বুঝিতে পারেন না। তাঁহারা কেবল আপনাপন গৃহ-ব্যাপারেই লিপ্ত থাকেন, এবং তাহাতেই তাঁহাদের উদ্যম, চেষ্টা, যত্ন পরিশ্রম ও চিন্তা পর্য্যবসিত হইয়া যায়। মনের সম্যক বিকাশ ও চিত্তবৃত্তির যথোচিত কর্ষণ হইতে তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিতই থাকেন। ধর্ম্ম কর্ম্ম ব্যাপারেও তাঁহারা গতানুগতিকের ন্যায় কার্য্য করেন। ব্রতবিশেষ

রা ক্রিয়াবিশেষের অনুষ্ঠানেই তাঁহাদের ধর্ম্মপ্রবৃত্তি চরিতার্থ হয়। কোনও রমণী ব্রতবিশেষের অনুষ্ঠান করিতেছেন দেখিয়া অপর রমণীরাও তাহার অনুষ্ঠান করিতে আগ্রহান্বিত হ'ন। কেহ কোনও তীর্থে গমন করিতেছেন দেখিয়া, অপর সকলেও সেখানে গমন করিতে ব্যাকুল হ'ন। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, ইহাই হিন্দু রমণীর স্থূল চিত্র। কিন্তু এস্থলে ইহাও বলা উচিত যে, প্রাচীন হিন্দুসমাজের হিতকর নিয়ম, অনুশাসন ও প্রথার বলে, হিন্দুরমণী অশিক্ষিতা হইয়াও যে সকল গুণের আধার হইয়া আছেন, তাহা জগতের অন্য কোনও সমাজের স্ত্রীলোকের মধ্যে দুর্লভ। হিন্দু-জননীর ন্যায় স্নেহময়ী ও কল্যাণময়ী জননী, হিন্দু-স্ত্রীর ন্যায় প্রেমময়ী ও পতিব্রতা সহধর্ম্মিণী, হিন্দু ভগিনীর ন্যায় স্নেহময়ী ভগিনী এই বিশাল সংসার মধ্যে কোথায় দেখিতে পাইবে? হিন্দু অধঃপতিত, সংসার তাপে সন্তপ্ত এবং দারিদ্র্যক্লেশে ক্লিষ্ট হইলেও, তাঁহার করুণাময়ী জননী, তাঁহার প্রেমময়ী সহধর্ম্মিণী, তাঁহার স্নেহময়ী ভগিনীই তাঁহার দুঃখময় জীবনে সুখ, শান্তি ও আনন্দ আনয়ন করিয়া থাকেন। হিন্দু-রমণী-চরিত্রের যে ক্ষেত্র, তাহার ন্যায় উর্ব্বর ক্ষেত্র জগতে দুর্লভ। সেই ক্ষেত্র যদি সম্যক্ রূপে কর্ষিত হয়, তাহা হইলে, দুর্লভ সদ্গুণনিচয়ে বিভূষিত হইয়া, হিন্দুরমণী জগতে মহিমাময়ী হইয়া উঠেন।

হিন্দু-রমণীর যেরূপ বর্ত্তমান অবস্থা, তাহাতে আমরা পারিবারিক সুখ শান্তি হইতে বঞ্চিত না হইলেও, জাতীয় উন্নতি-সাধনের নিমিত্ত আমাদের মনে যেরূপ আশা, আকাঙ্ক্ষা ও আগ্রহের উৎপত্তি হইয়াছে, আমাদের জননী, ভগিনী এবং স্ত্রীর মনেও সেইরূপ আশা, আকাঙ্ক্ষা ও আগ্রহের উৎপত্তি হওয়া আবশ্যক। পারিবারিক উন্নতি সাধনের জন্য আমরা সকলে যেরূপ এক আশা ও এক আকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী হইয়া একযোগে কার্য্য করিয়া থাকি জাতীয় উন্নতি সাধনার্থও আমাদিগকে সেই ভাবে কার্য্য করিতে হইবে। নতুবা সমাজ-দেহের এক অঙ্গ সবল এবং অন্য অঙ্গ দুর্ব্বল থাকিলে, কদাপি সামাজিক, তথা জাতীয় উন্নতি সাধিত হইবে না। এই কারণে, নারীগণেরও সুশিক্ষার আবশ্যকতা। আমাদের মন যেরূপ বিকশিত, চিত্তবৃত্তি যেরূপ মার্জ্জিত, দৃষ্টি যেরূপ বিস্তৃত, এবং কার্য্যক্ষেত্র যেরূপ প্রসারিত হইয়াছে, নারীগণেরও মন তদ্রূপ বিকশিত, চিত্তবৃত্তি তদ্রূপ মার্জ্জিত, দৃষ্টি তদ্রূপ বিস্তৃত এবং কার্য্যক্ষেত্র তদ্রূপ প্রসারিত হওয়া আবশ্যক। একমাত্র প্রকৃত জ্ঞানলাভ দ্বারাই এই সমস্ত ফললাভ করা যাইতে পারে। শিক্ষাই জ্ঞানলাভের প্রশস্ত উপায়। সুতরাং স্ত্রীশিক্ষার প্রতি সম্পূর্ণরূপে মনোনিবেশ করা প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য হইয়াছে। নারীগণ যাহাতে প্রকৃত শিক্ষা লাভ করিয়া জাতীয় উন্নতি সাধনে আমাদের সহায় হইতে পারেন;—এক অঙ্গ যেরূপ সবল হইতেছে, অপর অঙ্গও যাহাতে তদ্রূপ সবল হইতে পারে,—তজ্জন্য আমাদিগকে প্রাণপণে চেষ্টা করিতে হইবে। নতুবা জাতীয় উন্নতিসাধন কেবল আকাশ-কুসুমবৎ চিরকাল অলীকই থাকিয়া যাইবে। জাতীয় উন্নতি সাধনার্থ নরনারী, বালক বালিকা,—সকলকেই প্রস্তুত হইতে হইবে। প্রত্যেক বালক-বালিকা এবং প্রত্যেক নর-নারীকেই স্বদেশের প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাস উত্তমরূপে পাঠ করিতে হইবে, এবং যে কারণে প্রাচীন আর্য্যগণ একদিন উন্নতির সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, এবং যে কারণে তাঁহারা সেই সর্ব্বোচ্চ শিখর হইতে অধঃপতিত হইয়াছেন, তাহাও অবগত হইতে হইবে। মুসলমানেরা কে, ইংরাজেরা কে, তাঁহাদের সহিত আমাদের প্রথমে কিরূপ সম্বন্ধ ছিল, এবং বর্ত্তমান কালেই বা কিরূপ সম্বন্ধ রহিয়াছে, তাহাও জানিতে হইবে। পঞ্জাবী, মহারাষ্ট্রী, হিন্দুস্থানী, মান্দ্রাজী প্রভৃতির সহিত আমাদের কিরূপ জাতিগত, সমাজগত ও ধর্ম্মগত সম্বন্ধ রহিয়াছে, তাহাও বুঝিতে হইবে। জীবনের উদ্দেশ্য কি, ধর্ম্ম কি, চরিত্রবল কি, ধর্ম্মসাধন আবশ্যক কেন, ধর্ম্মের সহিত ব্যক্তিগত জীবনের, ব্যক্তির সহিত জাতির, স্বজাতির সহিত পৃথিবীর অন্যান্য জাতির এবং সমগ্র মানব-জাতির সহিত পরস্পরের কিরূপ সম্বন্ধ রহিয়াছে, তাহাও হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। আত্মোন্নতির সহিত সামাজিক উন্নতির এবং সামাজিক উন্নতির সহিত জাতীয় উন্নতির কিরূপ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে, তাহাও হৃদয়ঙ্গম করা আবশ্যক। যে শিক্ষা দ্বারা এই সকল মহৎ ফল সমুৎপন্ন হইতে পারে,

সেইরূপ শিক্ষাই বর্ত্তমান কালে হিন্দুসমাজের নরনারী মাত্রেরই পক্ষে আবশ্যক হইয়াছে।

হিন্দুসমাজের নরনারীর সুশিক্ষা সাধনের নিমিত্ত যাহা বলা হইল, ভারতের অন্যান্য সমাজের নরনারীর সুশিক্ষা সাধনের জন্যও তাহাই বক্তব্য। যদি আমরা জাতীয় উন্নতি সাধনের নিমিত্ত সত্য সত্যই ব্যাকুল ও আগ্রহান্বিত হইয়া থাকি, তাহা হইলে, যাহাতে সমাজের সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গের যুগপৎ বিকাশ ও উন্নতি হয়, তদ্বিষয়ে সচেষ্ট হওয়া আবশ্যক।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস।

প্রার্থনা।

আমারে সুন্দর কর',
তোমার অনিন্দ্য অনন্ত মধুর
সুষমার বিন্দু বিতর'।
অই ফুটিল উষার আলোক নির্ম্মল,
ফুটিল কুসুম রূপে ঢল ঢল
বিমল চরণে তব;
ওগো, খর্ব্ব করিতে তোমার সুষমা
আমিই শ্রী-হীন রব?
ওগো, অন্তরযামী,
তোমার প্রসাদ যাচিয়া লইয়া
অর্ঘ্য রচিব আমি।
তোমার শুভ্র পুণ্য বিভায়,
সুন্দর করে লও হে আমায়
নাশি' ম্লান ভাব যত;
শেষে তোমারি সেবায় লইও তুলিয়া
পূজার ফুলের মত।

শ্রীসরোজকুমারী গুহ।

জ্ঞানফল। *

(রূপ কথা)

আদম ও হাভা পূর্ব্বে ইডেন উদ্যানে থাকিতেন। তাঁহারা প্রভু পরমেশ্বরের অতিথিরূপে পরম সুখে স্বর্গে ছিলেন; তাঁহাদের কোন অভাব ছিল না। পরমেশ্বর আদম দম্পতিকে কেবল একটি বৃক্ষের ফল খাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন।

একদা হাভা স্বর্গোদ্যানের সুকুমার জাফরান মণ্ডিত পথে ভ্রমণ করিতে করিতে সেই নিষিদ্ধ তরুর ছায়াতলে আসিয়া পড়িলেন। তিনি মুগ্ধনেত্রে কাননের সৌন্দর্য্য অবলোকন করিতে লাগিলেন। শাখাস্থিত বিহগের মধুর কাকলি শুনিতে শুনিতে তিনি অন্যমনস্ক হইয়া সেই বৃক্ষের কয়েকটি ফল চয়ন করতঃ একটি ভক্ষণ করিলেন।

ফল ভক্ষণ করিবামাত্র হাভার জ্ঞানচক্ষু উন্মিলিত হইল। তিনি তখন বুঝিতে পারিলেন, তাঁহারা যদিও রাজ-অতিথিরূপে রাজভোগে আছেন, তথাপি তাঁহার প্রকৃত অবস্থা এই যে তাঁহার বর-অঙ্গে একখানি চীর পর্য্যন্ত নাই। তিনি তৎক্ষণাৎ আজানুলম্বিত কেশদামে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিলেন। কেমন এক প্রকার অভিনব মর্ম্মবেদনায় তাঁহার হৃদয় দুঃখভারাক্রান্ত হইল।

এই সময় তথায় আদম গিয়া উপস্থিত হইলেন। হাভা তাঁহাকে স্বীয় হস্তস্থিত ফল খাইতে অনুরোধ করিলেন। পত্নীর উচ্ছিষ্ট জ্ঞানফল ভক্ষণে আদমেরও জ্ঞানোদয় হইল। তখন তিনি নিজের দৈন্যদশা হৃদয়ের পরতে পরতে অনুভব করিতে লাগিলেন।—এই কি স্বর্গ? প্রেমহীন, কর্ম্মহীন অলসজীবন,—ইহাই স্বর্গসুখ? আরও বুঝিলেন, তিনি রাজবন্দী,—এই ইডেন কাননের সীমানার বাহিরে পদার্পণ করিবার তাঁহার ক্ষমতা নাই! তিনি স্বর্ণ-রৌপ্যের ইষ্টক এবং (শুরকি মসলার স্থলে) প্রবাল ও মুক্তাচূর্ণ-নির্ম্মিত সুরম্য প্রাসাদে থাকেন, অথচ "আপন" বলিতে এক কড়ার জিনিষ তাঁহার নাই,—এমন কি পরিধানের এক খণ্ড বস্ত্র পর্য্যন্ত নাই! এ কেমন রাজভোগ? এখন অজ্ঞতা-

* এস্থলে কোরাণ-সরিফ বা বাইবেলের বর্ণিত ঘটনার অনুসরণ করা হয় নাই।

রূপ স্বর্গ সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল,—জ্ঞানের জাগ্রত অবস্থা স্পষ্ট উপলব্ধ হইতে লাগিল! সুতরাং মোহ ও শান্তির স্থলে চেতনা ও অশান্তি দেখা দিল! তিনি হাভাকে বলিলেন, "এতদিন আমরা কি মোহে ভুলিয়াছিলাম! আমাদের এই অবস্থায় কত সুখী ছিলাম!"

হাভা উত্তর দিলেন, "তাই ত! এই যে সৌন্দর্য্যের ললাম ভূমি,—সুগন্ধি জাফরাণ কুসুমশস্য যাহাতে দূর্ব্বা-রূপে বিরাজমান; এই যে হীরক-প্রসূন-ভূষিতা ললিতা বল্লরী; এই যে মরকত-কিশলয়-শোভিত তরুরাজি-শীর্ষে পদ্মরাগ ফুল,—ইহারা নয়ন রঞ্জন করে বটে কিন্তু ইহাতে প্রাণের আকাঙ্ক্ষা মিটে কই? 'কওসর' জলাশয়ের মকরন্দ প্রতিম অমিয়া বারি তৃষ্ণা নাশ করে বটে, কিন্তু তাহাতে হৃদয়ের পিপাসা মিটে কই? এ সব স্বর্গীয় ঐশ্বর্য্যে আমাদের কি প্রয়োজন?" কোন এক অজ্ঞাত পরিবর্ত্তন লাভের জন্য তাঁহারা ব্যাকুল হইলেন।

পরমেশ্বর উদ্যান-ভ্রমণে আসিয়া দেখিলেন, আদম দম্পতি তাঁহাকে দেখিয়া বৃক্ষান্তরালে লুক্কায়িত হইলেন। প্রভু তাঁহাদিগকে ডাকিলেন, কিন্তু তাঁহারা ক্ষোভে, অভিমানে, লজ্জায় বিভুসমীপে যাইতে পারিলেন না। সর্ব্বজ্ঞ জগদীশ্বর সকলই অবগত ছিলেন, তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "তোরা স্বাধীনতা চাহিস? যা তবে দুর হ! পৃথিবীতে গিয়া দেখ্ স্বাধীনতায় কত সুখ!"

আদম-দম্পতি সেই দিন পতিত হইয়া পৃথিবীতে আসিলেন। এখানে তাঁহারা অভাব-স্বাচ্ছন্দ্য, শোক-হর্ষ রোগ-আরোগ্য, দুঃখ-সুখ প্রভৃতি বিবিধ আলো-আঁধারের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রকৃত দাম্পত্য জীবন লাভ করিলেন! হাভা কন্যাদিগকে অধিক ভালবাসিতেন; তিনি আশীর্ব্বাদ করিলেন, কন্যাকুল দীর্ঘায়ু হইবে; সুখে শান্তিতে গৃহে অবস্থিতি করিবে; প্রেমের অক্ষয় ভাণ্ডার তাহাদের হৃদয়ে সঞ্চিত থাকিবে।

আদম আবার পুত্রদিগকে অধিক স্নেহ করিতেন, কিন্তু তাঁহার ইচ্ছাশক্তি তাদৃশ প্রবল না থাকায় তিনি তনয়দিগকে বিশেষ কোন বরদান করেন নাই।

জননী হাভার আশীর্ব্বাদ মতে তাঁহার দুহিতানিচয় জন্মে এক গুণ, বাড়ে দ্বিগুণ, দীর্ঘায়ুঃ হয় চতুর্গুণ! আর আদমের প্রিয় তনয় জন্মে এক গুণ, অতি সোহাগে প্রতিপালিত হয় বলিয়া রোগ ভোগ করে দ্বিগুণ, মরে চতুর্গুণ! স্বাভাবিক মৃত্যু না হইলে তাহারা যুদ্ধচ্ছলে পরস্পরে মারামারি কাটাকাটি করিয়া মরে! একদল কারাগারে পচে, অবশিষ্ট নানা ক্লেশ ভোগ করে!

স্বর্গচ্যুতা হাভা তাঁহার ভুক্তাবশিষ্ট যে জ্ঞানফলটি পৃথিবীতে ফেলিয়া দিলেন, তাহার বীজে ধরণীর পূর্ব্বাংশে এক বিশাল মহীরুহ জন্মিল। সময়ে শাখীটি ফুলে ফলে পরিপূর্ণ হইল; কিন্তু সে দেশের লোকে তৎকালে ইহার যথেষ্ট আদর করিতে জানিত না। তরুতলে রাশি রাশি সুপক্ক ফল পড়িয়া থাকিত, শৃগাল ও কাক তদ্দ্বারা উদরপূর্ত্তি করিত। অবশিষ্ট ফল নিকটবর্ত্তী শাস্তানদীর বেলায় পুঞ্জীভূত হইতে লাগিল; কতক গড়াইয়া নদীগর্ভে পড়িল!

জ্ঞানফলের রসমিশ্রিত নদীজল যথাকালে বিরাট সাগরে গিয়া মিশিতেছিল। বিরাট সাগরের পরপারে পরীস্থান।

পরীস্থানের নরনারী দেখিতে অতি সুন্দর; কিন্তু শারীরিক সৌন্দর্য্য ব্যতীত বড়াই করিবার উপযুক্ত আর বিশেষ কিছু তাহাদের ছিল না। সে দেশে কেবল মাকালের বন; উপযুক্ত খাদ্য-সামগ্রীর একান্ত অভাব। জিনগণ * নানা কৌশলে অতি যত্ন-পরিশ্রমেও কর্কশ অনুর্ব্বর ভূমি কর্ষণ করিয়া উপযুক্ত ফললাভ করিতে পারিত না। পরীগণ অমরাবতী তুল্য বিলাসভবনে বাস করে, নানা প্রকার বিলাস-সামগ্রীতে পরিবেষ্টিত থাকে; তাহাদের ঐশ্বর্য্যও প্রচুর, তথাপি তাহারা জঠরানলের জ্বালায় ক্লেশ পায়!—বিধাতার লীলা এমনই চমৎকার!

একবার কতিপয় জিন অবগাহন কালে ক্ষুধার তাড়নে আকুল হইয়া বিরাট সাগরের লবণাম্বু খানিকটা গলাধঃকরণ করিল। জলপান করিবামাত্র তাহাদের অজ্ঞতারূপ আবরণ অপসারিত হইল। এতকাল তাহারা যে অন্নচিন্তা-রূপ জটিল সমস্যার মীমাংসা করিতে পারে নাই, এখন সে মীমাংসা সহজেই হইয়া গেল। জ্ঞানের দিব্য চক্ষে তাহারা পথ দেখিতে পাইল।

* জিন—নর। পরী—নারী।

সেইদিন উক্ত জিনগণ মনস্থ করিল, তাহারা নানা দেশে গিয়া বাণিজ্য ব্যবসায় করিবে। অতঃপর তাহারা মাকাল ফলে জাহাজ বোঝাই করিয়া বাণিজ্য-ব্যপদেশে যাত্রা করিল। জিনদের জাহাজখানি নানাস্থান ঘুরিয়া বিরাট সাগরের উপকূলে কনক দ্বীপের এক বন্দরে উপনীত হইল। কনক দ্বীপে এক জাতি সুবর্ণকায় মানবের বসতি ছিল।

কনক দ্বীপের সমৃদ্ধিশালী নগর দেখিয়া জিন বণিকের চক্ষু স্থির হইল। তাহাদের ধারণা ছিল, যে তাহাদের দেশের মত ঐশ্বর্য্যশালী দেশ আর নাই—তাহারা 'ধুলামুঠা ধরিলে সোণামুঠা' হয়! কিন্তু কনকদ্বীপের ভূমি রত্নগর্ভা! এখানে নানা জাতি সুস্বাদু ফলের গাছ আছে, তন্মধ্যে আম্রকানন প্রধান। এখানকার সুসভ্য ঋষিপ্রকৃতি লোকেরা প্রধানতঃ ফল ভক্ষণে জীবনধারণ করে। জিন বণিক মনে করিল, কোনরূপে একবার ইহাদিগকে ভুলাইতে পারিলে হয়। তখন তাহারা কনকদ্বীপবাসীদের নিকট হইতে মাকাল বিনিময়ে কতকগুলি সোণামুখী, আঁধারমাণিক প্রভৃতি আম্র লইল। এইরূপে প্রতি বৎসর তাহারা মাকাল বোঝাই জাহাজ লইয়া আসিত আর আম্র-পূর্ণ জাহাজ লইয়া যাইত। ক্রমে বাণিজ্য বেশ পাকিয়া উঠিল। কিন্তু তাহাদের বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কনক দ্বীপে আম্রফলের দুর্ভিক্ষ হইতে লাগিল।

পরবৎসর বণিকেরা বিপণিতে আম্রের অভাব দেখিয়া চিন্তিত হইল। তাহারা নগর ছাড়িয়া পল্লীগ্রামে আম্রের সন্ধানে বেড়াইতে লাগিল। গ্রামে গিয়া তাহারা দেখিল, হৈমন্তিক ক্ষেত্র সমূহ সুবর্ণ ধান্যে পরিপূর্ণ! কৃষককুল রাশি রাশি ধান্য লইয়া মনের আনন্দে গৃহে গমন করিতেছে। তদ্দর্শনে জিনেরা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল,—"ইহারা ক্ষুধার যন্ত্রণা জানে না!" অতঃপর কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়া বণিক কৃষকের নিকট মাকাল বিনিময়ে ধান্য প্রার্থনা করিল। কৃষক তাহার ভাষা বুঝিল না; অপিচ ছোট ছোট হৃষ্টপুষ্ট বালক বালিকার দল সবিস্ময়ে জিনদের পরিবেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল; তাহারা কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিতে জিনদের সুন্দর বদনমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতে লাগিল! বণিক মনে মনে ভাবিল, "একি রঙ্গ! আমরা এই কৃষক-শিশুদের তামাসার বিষয় হইলাম দেখি!"

যাহা হউক, কোন প্রকারে কৃষককে বণিকেরা নিজেদের মনোভাব জ্ঞাপন করিল। কৃষক প্রথমে মাকালের পরিবর্ত্তে ধান্য দান করিতে অস্বীকৃত হইল; কিন্তু তাহার পুত্র বলিল, "আহা! দাও; ওরা ক্ষুধার্ত্ত। আমাদের এত ধান আছে!"

জ্ঞানবিজ্ঞানে উন্নত পরীস্থানে প্রতি বৎসর বাণিজ্য-তরীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। এখন আর খাদ্য-দ্রব্যের অপ্রতুলতা নাই, সুতরাং পরীদিগের আর কোন প্রকার ক্লেশ নাই। তাহারা মনের সাধে ঐন্দ্রজালিক রথারোহণে সময় সময় কনক দ্বীপে ভ্রমণ করিতে আসিত। তাহাদের সহিত কনকদ্বীপবাসিনী ললনাদের বেশ ঘনিষ্ঠতা হইল। ফলে তাহারা পরীদের বেশভূষার অনুকরণ প্রয়াসী হইতে লাগিল! বাকী রহিল কেবল পরীর পাখা দুইটির অনুকরণ!

পূর্ব্বে দুই একখানি জাহাজে বৎসরে একবার মাত্র মাকালের আমদানি হইত; পরে অসংখ্য তরীপূর্ণ মাকাল বৎসরে তিন চারিবার কনক দ্বীপে আসিতে লাগিল। আর রাশি রাশি ধান্য পরীস্থানে রপ্তানী হইতে চলিল। মাকালের মায়া এমনই যে কৃষক আর কিছুতেই আত্মসংযম করিতে পারিতেছিল না। আর কৃষক সম্বৎসরের জন্য ধান্য সঞ্চয় করিয়া রাখে না; ক্রমে এমন হইল, অদ্য যে ধান্য ক্ষেত্র হইতে কর্ত্তন করিয়া আনে, কল্য তাহা মাকাল বিনিময়ে বিক্রয় করে! সুতরাং কনক দ্বীপে দুর্ভিক্ষ রাক্ষসী আসিয়া ঘর বাঁধিল!

এই মাকাল বাণিজ্যের সময় একটি বিশেষ উল্লেখ যোগ্য ঘটনা ঘটিয়াছিল। বিরাট সাগরতীরে পরীস্থানে একটি অপরূপ পেয়ারা গাছ হইয়াছিল। জ্ঞানফলের রসমিশ্রিত জল দ্বারা পুষ্ট হওয়ায় ঐ পেয়ারা ফল কিছু কিছু জ্ঞানফলের গুণ প্রাপ্ত হইয়াছিল। জিন পরীগণ ঐ পেয়ারা নিজেদের জন্য সযত্নে সংগ্রহ করিয়া রাখিত। কিন্তু একদিন বণিকেরা যৎকালে জাহাজে মাকাল তুলিতেছিল, সেই সময়ে দৈবাৎ তরু-চূড়া হইতে গোটাকত পেয়ারা জাহাজে পড়িল। সেই পেয়ারা মাকালের সহিত কনক দ্বীপে আনীত ও বিক্রীত হইল।

কনকদ্বীপবাসী দুই চারি জন ভাগ্যবান ব্যক্তি পরীস্থান

হইতে আনীত পেয়ারা ভক্ষণ করিয়া তাহার বীজ ফেলিয়া দিলেন। সেই বীজে কনকদ্বীপেও পেয়ারা গাছ হইল। ক্রমে শতাধিক বৎসর অতীত হইল।

*   *   *   *

পেয়ারা ফলের কল্যাণে কতিপয় কনকদ্বীপবাসী ভদ্রলোক এখন ভ্রান্তিস্বপ্ন হইতে জাগিয়া উঠিলেন! দীর্ঘ কালের,—শত শত বৎসরের মোহনিদ্রার পর এ কি তীব্র জাগরণ! অন্ধ চক্ষু প্রাপ্ত হইয়া ঘোর অন্ধকারে পড়িলেন!! তাঁহারা বিস্ময়বিস্ফারিত নয়নে চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন, জিনগণ এক মাকাল ফলের পরিবর্ত্তে দেশের সর্ব্বস্ব লইয়া গিয়াছে; এখন জলৌকার ন্যায় তাঁহাদের বুকের অবশিষ্ট রক্ত শোষণ করিতেছে! কনকের দৈন্য দুর্দ্দশা দেখিয়া তাঁহাদের হৃদয় শতধা হইতে লাগিল।

আর সে আম্র কানন নাই; কোন স্বাদু ফলগাছেই আর ফল নাই; ক্ষেত্রে স্বর্ণ শস্য নাই; রত্নগর্ভা ধরণী ধূলিগর্ভা হইয়া পড়িয়াছে। ঘরে ঘরে "হা অন্ন! হা অন্ন!" আর্ত্তনাদ উঠিয়াছে। পূর্ব্বের মত কৃষকের আর কান্তিপুষ্টি নাই, তাহার দেহ কঙ্কালসার, পরিধানে শতগ্রন্থি চীর! কনকদ্বীপবাসীর আর কিছুই নাই; আছে কেবল মাকাল আর মাকাল! নগরে রাজপথের দ্বিধারে পণ্য-বিথীকায় মাকাল; গ্রামে হাটে বাজারে মাকাল, গ্রাম্য মুদির দোকানে মাকাল,—সমুদয় দেশ মাকালে আচ্ছন্ন! এখন উপায়?

কনকদ্বীপবাসী শাপে বর প্রাপ্ত হইয়াছে, মাকালের সহিত জ্ঞানপেয়ারা লাভ করিয়াছে, সুতরাং উপায় ভাবিতে আর বিলম্ব হইবে না। তাহারা প্রতিজ্ঞা করিল, আর মাকাল গ্রহণ করিবে না। আবালবৃদ্ধবনিতা,—সকলে এক যোগে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিল, তাহারা আর মাকালের মায়ায় ভুলিবে না। তাহারা এখন যে নব উৎসাহ, প্রবল শক্তি লাভ করিয়াছে,—মাকালে নাকাল না হইলে এত শীঘ্র তাহা লাভে সমর্থ হইত না। এ জন্য, তাহারা কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে জিনদিগকে শতবার ধন্যবাদ দিল।

এ দিকে যথানিয়মে জিন সওদাগর পূর্ব্ব অভ্যাস মত জাহাজ বোঝাই মাকাল লইয়া বন্দরে পৌঁছিল। কিন্তু এবার আর মাকাল বিক্রয় হইল না। যখন কিছুতেই বণিকেরা বেসাতির কূল কিনারা করিতে পারিল না, এবং ভারে ভারে নয়নরঞ্জন মাকাল পচিয়া নষ্ট হইতে লাগিল, তখন তাহারা নিরুপায় হইয়া পরীস্থানে এই দুঃসংবাদ প্রেরণ করিল!

পরীস্থানে বণিক সভায় এ বিষয়ের তুমুল আন্দোলন হইতে লাগিল,—আন্দোলন-প্রলয়ে বিরাট্ সাগরের সুগভীর শান্ত জল পর্য্যন্ত আলোড়িত হইল! পরিশেষে জনৈক গলিতদন্ত পলিতকেশ বৃদ্ধ বলিলেন, "অনুসন্ধান করিয়া দেখ, কনকদ্বীপবাসী কেন মাকালে বিরাগী হইল।"

বণিকদল কনক দ্বীপের নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া, নানা প্রকার জনরব শুনিয়া অবগত হইল যে, যাঁহারা পেয়ারার আস্বাদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারাই মাকালে বিরোধী। সওদাগর এই সন্দেশ মায়া বলে এক নিমেষেই পরীস্থানে প্রেরণ করিল। সেই দিনই বণিকনেতা আদেশ দিলেন, "কনকের পেয়ারা তরু সমূলে উৎপাটন কর।"

পুনরায় বণিকেরা মায়া সন্দেশবহ দ্বারা তাহাদের নেতাকে জ্ঞাপন করিল, "অত বড় মহীরুহ সমূলে উৎপাটন করা অসম্ভব। অতএব কি আদেশ?" বণিক-নেতা তৎক্ষণাৎ আজ্ঞা দিলেন, "উহার মূল ছেদন কর!"

পেয়ারা তরুর মূলে শত শত শাণিত কুঠারের আঘাত পড়িতে লাগিল। তদ্দর্শনে কনক দ্বীপবাসী প্রথমে ত অবাক হইল, পরে বুঝিল, ব্যাপারখানা কি! তাহারা প্রথমতঃ অনুনয় বিনয় দ্বারা জিন বনিককে বৃক্ষচ্ছেদনে বাধা দিল,—পরে সওদাগরের পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত হইয়া সরোদনে নিষেধ করিল। কিন্তু জিনেরা কিছুতেই নিবৃত্ত হইল না। তখন কনকদ্বীপে ভয়ানক হৈ চৈ পড়িয়া গেল, শান্তিপূর্ণ দেশটির দিকে দিকে অশান্তি-অনল জ্বলিয়া উঠিল! জিন তবু নাছোড়বন্দা! তাহারা বরং সুবর্ণকায়-দিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করিল :—

"ঈশ্বর যখন জ্ঞানফল মানবের পক্ষে নিষিদ্ধ করিয়াছেন এবং এই ফল গ্রহণদোষেই আদিমাতা স্বর্গবিচ্যুতা হইয়াছিলেন, তখন নিশ্চয় জানিও এ ফল মানবের অতীব অনিষ্টকারী। অতএব তোমাদের পরম উপকারের জন্যই আমরা এত পরিশ্রম করিয়া এ গাছ কাটিতেছি।"

দেশের লোকেরা যথেষ্ট জ্ঞান বুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহারা আর ফাঁকা তর্কে ভুলিবার পাত্র নয়! তাহারা বলিল, "তবে তোমরা ও ফল খাও কেন? আগে পরীস্থানের পেয়ারাগাছ কাট গিয়া, পরে আমাদের গাছ কাটিও। আর আদি জননী যখন ঐ ফল বিনিময়ে স্বর্গ-সুখ তুচ্ছ করিয়াছেন, তখন ও ফলের মূল্য কত, তাহা সহজেই অনুমেয়। স্বর্গ হইতে আনীত ফল মর্ত্ত্যে অবশ্য অবশ্য অতি যত্নে রক্ষণীয়।" কিন্তু সে কথা শুনে কে?—এ যে আঁতে ঘা!

বৃক্ষ কর্ত্তন উপলক্ষে কনকে কিছু কাল খুব বাক্ বিতণ্ডা চলিতে লাগিল। এই সময় কোন অশীতিপর পণ্ডিত বলিলেন, "এ বিকৃত পেয়ারা গাছের জন্য তোমরা বৃথা কলহ কর কেন? ইহা ত সে আদি জ্ঞানফলের রূপান্তরিত ফল মাত্র। তোমরা হাভা কর্ত্তৃক রোপিত সেই আদি বৃক্ষের অনুসন্ধান কর। শাস্ত্র পাঠে জানা যায়, তাহা পৃথিবীর পূর্ব্বাংশে আছে। চল, আমরা তাহারই সন্ধানে যাই।" বৃদ্ধের কথামতে সকলে বর্ত্তমান ছাড়িয়া অতীতের সন্ধানে চলিল! বৃদ্ধ পণ্ডিত কিন্তু তাহাদের সঙ্গে গেলেন না,—তিনি উপদেশ দান করিয়াই নিশ্চিন্ত রহিলেন।

অনেক দিনের পর্য্যটনে বহু নদ, নদী, জনপদ, পর্ব্বত, প্রান্তর এবং অরণ্য অতিক্রম করিয়া কনকবাসীরা যথাস্থানে একটি সুবৃহৎ মৃত তরু সন্নিকটে উপস্থিত হইল। অনেক শাস্ত্র দেখিয়া, বহু কিম্বদন্তী শুনিয়া তাহারা শেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইল যে এই শুষ্ক তরুই আদি জ্ঞানবৃক্ষ। তখন মর্ম্মান্তক ক্ষোভে, দুঃখে, হতাশে তাহাদের বক্ষঃ বিদীর্ণ হইতে লাগিল! তাহারা এত পরিশ্রম করিয়া, দীর্ঘ প্রবাসে আহার নিদ্রা তুচ্ছ করিয়া, এত কষ্ট সহিয়া এদেশে আসিল এই মৃত তরুর জন্য? স্থানীয় লোকেরা বলিল, প্রায় দ্বিশতাধিক বৎসর হইল গাছটি মরিয়াছে। জনৈক আগন্তুক তদুত্তরে বলিল, "তবু ভাল, তোমরা যে, অনুগ্রহ পূর্ব্বক ইহাকে ইন্ধনরূপে অনলে উৎসর্গ কর নাই, তাই রক্ষা!"

এখন কি করা যায়? কি উপায়ে জ্ঞানবৃক্ষ পুনর্জ্জীবিত হইবে? কেহ বলিল, প্রাণপণে জল সেচন কর, কেহ বলিল, অশ্রুসেক কর; কেহ বলিল, হৃদয়ের শোণিত দান কর, ইত্যাকার নানা প্রস্তাব উত্থাপিত হইতে লাগিল। এমন কি দুই এক জন মানবের প্রাণ বিনিময়ে যদি তরুবর সঞ্জীবিত হয়, তবে তাহারা তাহাতেও কুণ্ঠিত নয়।

সকলে শুষ্ক তরুর নানা প্রকার যত্ন করিতে লাগিল,—অশ্রুধারা, রক্তধারা—কিছুই দিতে কুণ্ঠিত হইল না! কিন্তু মৃত কবে সঞ্জীবিত হয়? সমুদয় চেষ্টা পরিশ্রম ব্যর্থ হইল দেখিয়া তাহারা মর্ম্মাহত হইয়া নানা প্রকার বিলাপ করিতে লাগিল। রোদনে ক্লান্ত হইয়া এক ব্যক্তি তরুমূলে শয়ন করিয়াছিলেন; তিনি তন্দ্রাবেশে স্বপ্ন দেখিলেন, যেন কোন সন্ন্যাসী বলিতেছেন:—

"বৎস! ক্রন্দনে কোন ফল হইবে না। দুই একটি কেন, দুই লক্ষ নরবলি দান করিলেও জ্ঞানবৃক্ষ পুনর্জ্জীবিত হইবে না। দুই শত বৎসর হইল এই দেশের অদূরদর্শী স্বার্থপর পণ্ডিত-মূর্খেরা ললনাদিগকে জ্ঞানফল ভক্ষণ করিতে নিষেধ করে; কালক্রমে ঐ নিষেধ সামাজিক বিধানরূপে পরিগণিত হইল এবং পুরুষেরা এ ফল নিজেদের জন্য এক-চেটিয়া করিয়া লইল। রমণীবৃন্দ এ ফলের চয়ন ও ভক্ষণে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় এ গাছের সেবা শুশ্রূষায় বিমুখ হইল। কালে নারীর কোমল হস্তের সেবা-যত্নে বঞ্চিত হওয়ায় জ্ঞানবৃক্ষ মরিয়া গিয়াছে! যাও, তোমরা দেশে ফিরিয়া যাও; এখন সেই পেয়ারার বীজ বপন কর গিয়া। জিন-গণ যে গাছ কাটিতে চাহে, কাটুক; তোমরা তাহাদের বাধা না দিয়া গোপনে বীজ সঞ্চয় করিয়া রাখিও। এখন তোমরা নরনারী উভয়ে মিলিয়া নব রোপিত পেয়ারা চারার যত্ন করিও, তাহা হইলে আশানুরূপ ফল প্রাপ্ত হইবে। সাবধান! আর কন্যাজাতিকে পেয়ারায় বঞ্চিত করিও না! নারীর আনীত জ্ঞানফলে নারীর সম্পূর্ণ অধি-কার আছে, একথা অবশ্য স্মরণ রাখিবে!" নিদ্রাভঙ্গে তিনি এই স্বপ্নবৃত্তান্ত সঙ্গীদিগকে বলিলেন; তাহারা ইহা শুনিয়া সকলে একবাক্যে বলিল, চল তবে ফিরিয়া যাই। জনৈক উদারহৃদয় ভদ্রলোক বলিলেন, "তাই ত, পুরুষেরা নদী পার হইয়া কুমীরকে কলা দেখাইয়াছিল,—নারীর আহৃত জ্ঞানে নারীকেই বঞ্চিত করিয়াছিল,—তাহার ফল হাতে হাতে!"

"বাবা আস্‌ছে বাড়ী।"

কনক দ্বীপের উদ্যমশীল বালকেরা উদ্যানের এক কোণে খানিকটা স্থান পরিষ্কার ও চিহ্নিত করিল, পরে বালিকাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "আইস ভগিনি! তোমরাও যোগদান কর; আমরা কোদালি দ্বারা ভূমি প্রস্তুত করি, তোমরা স্বহস্তে বীজ বপন কর! আজি কি শুভদিন, এখন হইতে আমাদের নিজের গাছ হইবে।" বিস্ময়স্তম্ভিত জিনেরা নীরবে দাঁড়াইয়া চাহিয়া রহিল, কনকবাসীর এ শুভকার্য্যে তাহারা বাধা দিতে পারিল না। নব উৎসাহে অনুপ্রাণিত কনকবাসীদের এ মহৎ কার্য্যে—জিন দূরে থাকুক,—দৈত্যও এখন বাধা দিতে অক্ষম!

অতঃপর কনক দ্বীপ পুনরায় দ্বিগুণ ত্রিগুণ ধনধান্যে পূর্ণ হইল; অধিবাসীগণ পরম সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিল। তাহারা আর কোনপ্রকার ইন্দ্রজালে ভুলিবার পাত্র নয়! কারণ এখন ললনাগণ জ্ঞান কাননের অধিষ্ঠাত্রী হইয়াছেন।

'কনকের রূপ কথা' অমৃত সমান;
মৃত ব্যক্তি যদি শুনে পায় প্রাণদান!'

মতিচুর-রচয়িত্রী।

শ্রীরামচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র কে?

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(ছ) টড সাহেবের মতে অগ্নিপুরাণ ও ভাগবৎ হইতে রামচন্দ্রের বংশের প্রকৃত তথ্য অবগত হইতে পারা যায়। কিন্তু উক্ত পুরাণদ্বয়ের উক্তি উঁহার প্রদত্ত সূর্য্যবংশের তালিকা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। টড সাহেব লব হইতে বংশোৎপত্তি মানিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার প্রামাণিক পুরাণ-দ্বয়ে কুশ হইতে বংশোৎপত্তি বিবরণ লেখা আছে। নিম্নে ভাগবৎ ও অগ্নিপুরাণ হইতে প্রমাণ দেওয়া হইল।

(১) ভাগবৎপুরাণ।

শ্রীশুকউবাচ ॥

কুশস্য চাতিথিস্তস্মান্নিষধস্তৎসুতো নভাঃ।
পুণ্ডরীকোঽথ তৎপুত্রঃ ক্ষেমধন্বা ঽভবত্ততঃ ॥ ১ ॥
দেবানীকস্ততোঽনীহঃ পারিযাত্রো ঽথ তৎসুতঃ।
ততো বলস্থলস্তস্মাৎ বজ্রনাভোঽর্কসংভবঃ ॥ ২ ॥
সুগণস্তৎসুতস্তস্মাদ্বিধৃতিশ্চাভবৎসুতঃ।
ততো হিরণ্যনাভোঽভূৎ যোগাচার্য্যস্তু জৈমিনেঃ ॥ ৩ ॥
শিষ্যঃ কৌশল্য অধ্যাত্মং যাজ্ঞবল্ক্যোঽধ্যগাদ্যতঃ।
যোগং মহোদয়মৃষির্হৃদয়গ্রন্থিভেদকম্ ॥ ৪ ॥
পুষ্পো হিরণ্যনাভস্য ধ্রুবসংধিস্ততোঽভবৎ।
সুদর্শনোঽগ্নিবর্ণশ্চ শীঘ্রস্তস্যমরুঃ সুতঃ ॥ ৫ ॥
যোঽসাবাস্তে যোগসিদ্ধঃ কলাপগ্রামমাশ্রিতঃ।
কলেরন্তে সূর্য্যবংশং নষ্টং ভাবয়িতা পুনঃ ॥ ৬ ॥
তস্মাৎপ্রসুশ্রুতস্তস্য সংধিস্তস্যাপ্যমর্ষণঃ।
সহস্বাংস্তৎসুতস্তস্মাৎ বিশ্বসাহ্বোঽভ্যজায়ত ॥ ৭ ॥
ততঃ প্রসেনজিত্তস্মাত্তক্ষকো ভবিতা পুনঃ ॥ ৭ ॥
ততো বৃহদ্বলো যস্তু পিত্রা তে সমরে হতঃ।
এতেহীক্ষ্বাকুভূপালা অতীতাঃ শৃণ্বনাগতান্ ॥ ৮ ॥
বৃহদ্বলস্য ভবিতা পুত্রো নাম বৃহদ্রণঃ।
উরুক্রিয়স্ততস্তস্য বৎস বৃদ্ধো ভবিষ্যতি ॥ ৯ ॥
প্রতিব্যোমস্ততো ভানুর্দিবাকো বাহিনীপতিঃ ॥
সহদেবস্ততো বীরো বৃহদশ্বোঽথ ভানুমান্ ॥ ১০ ॥
প্রতীকাশ্বো ভানুমতঃ সুপ্রতীকো ঽথতৎসুতঃ।
ভবিতা মরুদেবোঽথ সুনক্ষত্রোঽথ পুষ্করঃ ॥ ১১ ॥
তস্যাংতরিক্ষস্তৎপুত্রঃ সুতপাস্তদমিত্রজিৎ।
বৃহদ্রাজস্তু তস্যাপি বর্হিস্তস্মাৎকৃতংজয়ঃ ॥ ১২ ॥
রণংজয়স্তস্য সুতঃ সংযয়ো ভবিতা ততঃ।
তস্মাচ্ছাক্যো ঽথশুদ্ধোদো লাঙ্গলস্তৎসুতঃ স্মৃতঃ ॥ ১৩ ॥
ততঃ প্রসেনজিত্তস্মাৎ শূদ্রকো ভবিতা ততঃ।
রণকো ভবিতা তস্মাৎসুরথস্তনয়স্ততঃ ॥ ১৪ ॥
সুমিত্রো নাম নিষ্ঠান্ত এতে বার্হদ্বলান্বয়াঃ।
ইক্ষ্বাকূণাময়ং বংশঃ সুমিত্রান্তো ভবিষ্যতি ॥
যতস্তম্প্রাপ্য রাজানং সংস্থাং প্রাপ্স্যতি বৈ কলৌ ॥ ১৫ ॥

ইতি শ্রীভাগবতে নবমস্কন্ধে শ্রীরামচরিত বর্ণনং
নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

(২) অগ্নিপুরাণ।

রামপুত্রৌ কুশলবৌ সীতায়াং কুলবর্দ্ধনৌ।
অতিথিশ্চ কুশাজ্জজ্ঞে নিষধস্তস্য চাত্মজঃ ॥ ১৬ ॥
নিষধাৎ তু নলো জজ্ঞে নভোঽজায়ত বৈ নলাৎ।
নভসঃ পুণ্ডরীকো ঽভূৎসুধন্বা চ ততো ঽভবৎ ॥ ১৭ ॥
সুধন্বনো দেবানীকো ঽহয়হীনাশ্বশ্চ তৎসুতঃ।
অহীনাশ্বাৎ সহস্রাশ্বশ্চন্দ্রাবলোকস্ততোঽভবৎ ॥ ১৮ ॥

চন্দ্রাবলোকতস্তারাপীড়োঽস্মাচ্চন্দ্রপর্ব্বতঃ।
চন্দ্রগিরেভভিরথঃ শ্রুতায়ুস্তস্য চাত্মজঃ॥
ইক্ষ্বাকুবংশপ্রভবাঃ সূর্য্যবংশধরাঃ স্মৃতাঃ॥ ১৯॥

অধ্যায় ২৭৩।

সার উলিয়ম জোন্স ও মিঃ জন বেণ্টলে (Sir-William Jones and Mr. Bentali) ও সূর্য্যবংশের তালিকার সহিত এই প্রবন্ধের প্রমাণগুলি সম্পূর্ণ মিলিতেছে। ইঁহারাও রাজপুতানার কবীশ্বরদিগের বা কর্ণেল টডের মত সুমিত্র পর্য্যন্ত বংশাবলী উৎপত্তি বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তবে আশ্চর্য্যের বিষয় কোন প্রমাণাদি না দিয়াই কুশের সন্তানদিগকে লবের বংশধর বলিয়াছেন। *

বর্ত্তমান সময়ের অনুসন্ধানানুসারে ইহা স্পষ্টই জ্ঞাত হওয়া যাইতেছে, যে কবীশ্বরগণ বা কর্ণেল টড্ কথিত ইতিহাস লেখকগণ পুরাণাদি হইতে প্রমাণ দিয়াছেন বটে, কিন্তু কেহই সেই গ্রন্থগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পাঠ করিবার শ্রম স্বীকার করেন নাই। কেবল রাজপুতানার কবিদিগের ও পণ্ডিতদিগের কথার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছেন; সেই জন্য অগ্নিপুরাণ বা ভাগবতাদি পুরাণ তাঁহাদের মতের অনুমোদন করে না।

যাহা হউক এ অবধি আমি যে সকল গ্রন্থের অবতারণা করিলাম তদ্দ্বারা কোন না কোন রূপে ইহাই স্থির হইতেছে যে কুশই রামের জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন, এবং কুশ হইতেই সুমিত্র পর্য্যন্ত বংশাবলীর বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। এসম্বন্ধে ভারতে যতগুলি সংস্কৃত বা হিন্দী ভাষার পুস্তক আছে, তন্মধ্যে কোনটীতেই লবের সন্তানাদির কোন উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। এই কারণে লবের সন্তানাদি ছিল কি না, সে বিষয় বিশেষ সন্দেহ রহিয়াছে। রাজপুত কবীশ্বরগণ ও টড সাহেব, ইঁহারা সকলেই ভুলক্রমে কুশের সন্তানাদির স্থানে লবের সন্তান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। রাজপুতানার কবীশ্বরদিগের ইতিহাস ব্যতীত সূর্য্যবংশের বংশাবলীর এরূপ গোলমাল আর কোথায়ও পরিলক্ষিত হয় না।

তদ্ব্যতীরেকে টড সাহেবের রাজস্থান পাঠে (যাহা রাজপুত কবীশ্বরদিগের ইতিহাসের রূপান্তর মাত্র) সর্ব্ব সাধারণে ইহা জ্ঞাত হয়েন যে, লাহোর লবের রাজধানী ছিল এবং যত দিন কনকসেন সৌরাষ্ট্রে গমন করেন নাই তত দিন লবের বংশধরগণ লাহোরেই ছিলেন। এ ধারণা নিতান্তই ভ্রমমূলক। টড সাহেব লিখিয়াছেন, "রামের লব ও কুশ নামে দুই পুত্র ছিলেন। রাণা বংশীয়গণ নিজকে লবের বংশোদ্ভব বলেন। লব লাহোর নগর নির্ম্মাণ করেন এবং পুরাকালে লাহোরের নাম "লোহকোট" ছিল। কনকসেনের দ্বারকা যাইবার পূর্ব্বে মীবার রাজকুলের শাখা বংশীয়গণ উক্ত লোহকোটে বাস করিতেন।" (রাজস্থান, প্রথম ভাগ, ৭৯৮ পৃষ্ঠা)

বাল্মীকি রামায়ণের নিম্ন উদ্ধৃতাংশ হইতে জ্ঞাত হওয়া যাইতেছে যে কুশ অযোধ্যা পরিত্যাগ করিলে পরে, রাম বিন্ধ্যগিরির নিকটবর্ত্তী দক্ষিণ কৌশল নামক এক নবীন রাজ্য স্থাপন করিয়া কুশকে ও উত্তর কৌশল অর্থাৎ শারাবতী বা শ্রাবস্তী লবকে দান করেন।

কোশলেষু কুশং বীরমুত্তরেষু তথা লবম্।
অভিষিচ্য মহাত্মানা বুভৌ রামঃ কুশীলবৌ॥ ১৭॥
অভিষিক্তৌ সুতাবঙ্কে প্রতিষ্ঠাপ্যপুরেততঃ।
রথানাস্তু সহস্রাণি নাগানাময়ুতানি চ।
দশা চাশ্ব-সহস্রাণি একৈকস্য ধনং দদৌ॥ ১৮॥
বহুরত্নৌ বহুধনৌ হৃষ্টপুষ্টজনাশ্রয়ৌ।
স্বে পুরে স্থাপয়ামাস ভ্রাতরৌ তৌ কুশীলবৌ॥ ১৯॥
অভিষিচ্য ততো বীরৌ প্রস্থাপ্য স্বপুরে তদা।
দূতান্ সম্প্রেষয়ামাস শত্রুঘ্নায় মহাত্মনে॥ ২০॥

বাল্মীকি রামায়ণ উত্তর কাং অধ্যায় ১০৭।

লক্ষ্মণস্য পরিত্যাগং প্রতিজ্ঞাং রাঘবস্য চ।
পুত্রয়োরভিষেকং চ পৌরানুগমনং তথা॥ ৩॥
কুশস্য নগরী রম্যা বিন্ধ্যপর্ব্বতরোধসি।
কুশাবতীতি নাম্না সা কৃতা রামেণ ধীমতা॥ ৪॥
শ্রাবস্তীতি পুরী রম্যা শ্রাবিতা চ লবস্য হ।
অযোধ্যাং নির্জ্জনাং কৃত্বা রাঘবো ভরতস্তথা॥ ৫॥
স্বর্গস্য গমনোদ্যোগং কৃতবন্তৌ মহারথৌ।
এবং সর্ব্বং নিবেদ্যাশু শত্রুঘ্নায় মহাত্মনে॥ ৬॥

বাল্মীকি রামায়ণ উত্তর কাং অধ্যায় ১০৮।

---

* See the first and fifth (1 & V) Antiquity reports of the Asiatic Society of Bengal.

বর্ত্তমান সময়ের অনুসন্ধানানুসারে আউধ-প্রান্তের গোঁডা জেলার "সাহেত মাহেত" নামক স্থানই পুরাকালে শ্রাবস্তী নামে খ্যাত ছিল। এই স্থানের ভগ্নাবশেষ জেনারেল কানিংহাম সাহেব দ্বারা সর্ব্ব প্রথমে আবিষ্কৃত হয়। মিঃ লাসেন ('Mr Lausen) ইহার অবস্থা দেখিয়া এই সিদ্ধান্ত দৃঢ়ীকৃত করিয়াছেন, এবং মিঃ ডবলু, সি, বেনেট সি, এস, (W. C. Benat Esqr C. S) মহোদয় "আউধ গেজিটিয়ারে" (Oudh gazetteer) বাল্মীকির উক্তি অনুসারে ইহা প্রমাণিত করেন যে ইহাই লবের রাজ্য ছিল।

রামায়ণের সময়ে শ্রাবস্তী রামচন্দ্রের সাম্রাজ্যের উত্তর প্রান্ত বা উত্তর কোশলের রাজধানী ছিল। রামের স্বর্গারোহণের পর ইহা লবের অধিকারভুক্ত হয়।

উপসংহারে আমার বক্তব্য এই যে আমি নিজ বিবেচনা অনুযায়ী এ বিষয়ে যথেষ্ট তর্ক বিতর্ক করিলাম। যদি সময় ও সুবিধা হয় তাহা হইলে বারান্তরে পুনরায় এসম্বন্ধে আলোচনা করিব। *

প্রবাসিনী।

বঙ্গবালার ভ্রমণকাহিনী।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

সিক্রোলের কোলাহলশূন্য নীরব বিস্তৃত প্রান্তরে অনেকক্ষণ একাকী পাদচারণা করিয়া পথের সমস্ত শ্রান্তি যেন হৃদয় হইতে অপসারিত হইল। সংসার-পিঞ্জর হইতে আপনাকে মুক্ত করিতে পারিয়াছি বলিয়া ভগবানকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিলাম। কোলাহলপূর্ণ কলিকাতা নগরীতে জীবনের এতকাল অতিবাহিত হইল। প্রকৃতির এমন নিখুঁত সৌন্দর্য্য লক্ষ্য করিয়া নয়ন তৃপ্ত করিবার সুযোগ ঘটে নাই। বিস্তীর্ণ প্রান্তরের মধ্যে প্রকাণ্ড তরুগুলি জোনাকীর বাতিতে পরিশোভিত হইয়া আমার মত তৃষাতুর জীবকে যেন স্বর্গের পথে যাইতে ইঙ্গিত করিতেছিল। ঐ নিস্তব্ধ প্রান্তরে সেই নিস্তব্ধ নিশীথে কত সুভাবের যে লহরী খেলিতে লাগিল। ভাবিলাম তাহার একটিও যদি কলিকাতার কোলাহলময় জীবনে কার্য্যে পরিণত করিতে পারি, নিজকে ধন্য মনে করিব। সহযাত্রীগণের ভরসা ছিল যে সত্বরেই আহার্য্য সামগ্রী পাইবেন। কিন্তু ডাক-বাঙ্গলায় প্রত্যেক আহার্য্য দ্রব্য সংগ্রহ করা এত দুরূহ যে, সামান্য খাদ্য প্রস্তুত করিতেই অনেক রাত্রি হইয়া গেল। রাত্রি নয়টার সময় ডাক্তার রায় ক্ষুধায় অধীর হইয়া ল্যাণ্টার্ন হস্তে আমাকে খুঁজিতে বাহির হইলেন। রাত্রি নয়টার সময় ঐ সামান্য আহারীয় পরম তৃপ্তির সহিত ভোজন করিয়া বিশ্রাম করিতে গেলাম। ডাক্তার রায়কে, আহারের সময় ব্যঙ্গচ্ছলে তাঁহার খাদ্যদ্রব্যাদি এবং শীঘ্র আহার্য্য পাইলাম ইত্যাদি বলিয়া বিলক্ষণ ব্যঙ্গোক্তি করিলাম, তাহার ফলে তিনি আর ওদিকেও যাইবেন না বলিয়া স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়া বসিলেন। বসু মহাশয় মধ্যস্থ ভাবে মীমাংসা করিলেন যে এস্থলে মিলামিশা করিয়া থাকিতে হইবে। অতি প্রত্যূষে উঠিয়া আমাদিগকে কাশীর দর্শনীয় স্থানগুলি দেখিতে যাইতে হইবে বলিয়া, যাহাতে যাত্রার পূর্ব্বে চা প্রস্তুত হয় সেই ভার আমাকে দিলেন।

পাঁচটার পূর্ব্বে উঠিয়া ভ্রমণ করিলাম। চা প্রস্তুত হইল। কিন্তু রায় মহাশয়ের নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই। অনেক অপেক্ষার পর সাতটার সময় আমরা নগর দেখিতে যাত্রা করিলাম। তথায় পঁহুছিয়া আমরা একখানা নৌকা ভাড়া করিলাম। প্রশান্ত গঙ্গার বক্ষ হইতে কাশীর দৃশ্য চমৎকার দেখাইতেছিল। আমরা নগরীর (city) একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বারম্বার নৌকায় ভ্রমণ করিলাম। অবশেষে বিখ্যাত দশাশ্বমেধ ঘাটে অবতরণ করিয়া মহারাজা জয়সিংহ প্রতিষ্ঠিত মানমন্দিরের উপর উঠিলাম। জ্যোতিষ শাস্ত্রেও হিন্দুজাতি যে এতটা প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন, আমার পূর্ব্বে সে ধারণা ছিল না। কালের প্রবল ঝটিকাঘাতেও জ্যোতিষ শাস্ত্রানুযায়ী গণনার চিহ্নাদি বিলুপ্ত হয় নাই। বসু মহাশয় যেটি দেখিতেন তন্ন তন্ন করিয়া তাহার সমস্ত বিষয় অনুসন্ধান না করিয়া ছাড়িতেন না। প্রায় এক ঘণ্টাকাল আমাদিগকে মানমন্দিরের

---

* লেখক মহোদয় যদি পুনরায় এ সম্বন্ধে কিছু লেখেন, তবে তাহারও অনুবাদ "ভারত-মহিলায়" দেওয়া হইবে।

গণনা-চিহ্ন গুলি বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। পরে আমরা মন্দির দেখিতে পদব্রজে বাহির হইলাম। প্রস্তর-নির্ম্মিত পথ প্রচণ্ড রৌদ্রের উত্তাপে যেন অগ্নি বিকীর্ণ করিতে লাগিল। প্রকাণ্ড বৃষগুলি আমাদিগের অনুগমন করিতে লাগিল। প্রথমে অত্যন্ত ভয় পাইলাম। শেষে ঐ ভীতি তিরোহিত হইল। পথে পাণ্ডাদের বিষম দৌরাত্ম্যে প্রাণ অস্থির হইল। যে সকল মন্দির দেখিলাম তন্মধ্যে অন্নপূর্ণা এবং বিশ্বেশ্বর মন্দিরই দর্শনযোগ্য। আমি হিন্দু ধর্ম্মের বিশেষ ভক্ত নই বলিয়া যতটা পারি পশ্চাতে পড়িয়া থাকিতাম; বসু মহাশয় নগ্নপদে মন্দিরে প্রবেশ করিতেন, এদিকে আমাকে একা পাইয়া পাণ্ডাগুলি দক্ষিণা পাওয়ার জন্ত প্রাণান্ত করিত। বারটার সময় সেই দিনের মত কাশীদর্শন পর্ব্ব শেষ করিয়া সিক্রোলে যাইবার জন্য গাড়ীর অন্বেষণে চলিলাম। দুর্ভাগ্যক্রমে কোনমতেই গাড়ী পাওয়া গেল না। আমরা বাধ্য হইয়া বিখ্যাত ইতিহাস-প্রসিদ্ধ গোকুল দাস তেজপালের বাগানের প্রশস্ত ঘাটে উপবেশন করিয়া গাড়ীর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। সিপাহী-বিদ্রোহের সময় এই স্থানে ইংরাজেরা আশ্রয় লইয়া প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। সম্মুখের প্রকাণ্ড দীর্ঘিকায় প্রকাণ্ড মাছগুলি নির্ভয়ে খেলা করিতেছিল দেখিয়া এক পয়সার খই ছড়াইয়া দিলাম। ভোজ্য পদার্থ দর্শনে আকৃষ্ট হইয়া অনেক মৎস্য নির্ভয়ে সিঁড়ির উপর আসিল। স্বয়ং ডাক্তার রায় গাড়ীর জন্য বাহির হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। গাড়ী পাওয়া গেল না! সকলেই ক্ষুধা তৃষ্ণা ও গ্রীষ্মে অস্থির হইলাম। অনেক অনুসন্ধানের পর বেলা একটার সময় পূর্ব্ব দিনের ন্যায় একখানা অতি কদর্য্য গাড়ী আমাদের ভাগ্যে জুটিল। ডাক-বাঙ্গালায় পৌছিয়া স্নানাদি ও আহার করিতে তিনটা বাজিয়া গেল। এই দুই বারের যাতায়াতের বিষম কষ্টে আমার ও ডাক্তার রায়দের পুণ্যধাম কাশী দর্শনের সাধ যথেষ্ট মিটিয়াছিল। আমরা তো পলায়ন করিতে পারিলেই বাঁচি, কিন্তু বসু মহাশয় কিছুতেই সে প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। অগত্যা স্থির হইল, যে আমরা ঐ দিনই কাশীর এক যাত্রীনিবাসে আশ্রয় লইব। আমি যে কত কষ্টে এই প্রস্তাবে সম্মত হইলাম তাহা আমিই জানি। এত ক্লান্ত শরীরে পৌছিয়া যে দুঘণ্টা বিশ্রাম করিব তাহা ঘটিল না। আহার শেষ হওয়া মাত্রই আমাদের জিনিষ পত্র প্যাক করিয়া চাকরের সঙ্গে কাশীর সহরের (city) নির্দ্দিষ্ট বাসায় প্রেরণ পূর্ব্বক বৌদ্ধগণের বিখ্যাত তীর্থস্থান "সারনাথ" দর্শনে যাত্রা করিলাম। আমার ধারণা ছিল, ইহা একটী মন্দির। কিন্তু দেখিলাম বিস্তৃত স্থান ব্যাপিয়া ভগ্ন ইষ্টক এবং পাষাণ-স্তূপ পড়িয়া আছে। এগুলির উপর দিয়া কত যুগ যুগান্তের ঢেউ চলিয়া গিয়াছে। আমি একান্ত চিত্তে তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। কত ভাবলহরী অন্তরে খেলিতে লাগিল। একজন বৃদ্ধের মুখে সারনাথ সম্বন্ধে অনেক গল্প শুনিলাম। সারনাথের সম্মুখেই জৈনদিগের এক প্রকাণ্ড মন্দির বর্ত্তমান, তাহাও দেখিয়া লইলাম। শুভ্র জ্যোৎস্নাবিভাসিত নিঝুম রজনী; লোকসমাগমবর্জ্জিত বিস্তীর্ণ প্রান্তরে দাঁড়াইয়া অপূর্ব্ব লীলামাধুরীপূর্ণ প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে মন ডুবিয়া গেল। আমরা গাড়ীতে উঠিলাম, বিশাল তরুরাজিপূর্ণ বিস্তীর্ণ প্রান্তর অতিক্রম করিয়া কাশীধামের নির্দ্দিষ্ট বাসায় পৌছিতে অনেক রাত্রি হইয়া গেল। দেহ ক্লান্তিতে অবসন্ন তথাপি বসু মহাশয়ের একান্ত অনুরোধে বাধ্য হইয়া আমাদের নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও দশাশ্বমেধ ঘাটে যাইয়া বসিলাম। সম্মুখে কলনাদিনী গঙ্গা বহিতেছে, তাহারই অপর কূলবর্ত্তী শ্যামল গহন ভেদ করিয়া সাম বেদের মধুর গম্ভীর সঙ্গীত কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র আমি শিহরিয়া উঠিলাম। পবিত্র সত্যযুগের মহান্ দৃশ্য—স্বর্গের ছবি—অন্ধ নয়নের সম্মুখে উদ্ঘাটিত হইল। জীবনে এমন উচ্চ ভাবে ডুবি নাই। আমি ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্লান্তি সমস্ত ভুলিয়া গেলাম। ডাক্তার রায় ও তাঁহার পত্নী বাসায় আসিলেন। আমরা দুজনে কতক্ষণ ঐ মহান ভাবে ডুবিয়াছিলাম, বলিতে পারি না। আমাকে স্বীকার করিতেই হইল যে, cityতে (সহরে) আসা সর্ব্বতোভাবে সার্থক হইয়াছে। পরদিন বিশ্রাম করা গেল। রাত্রের ট্রেণেই আমরা ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে কাশীর দৃশ্য পশ্চাতে ফেলিয়া চলিলাম। (ক্রমশঃ)

স্বর্ণপ্রভা বসু।

অহল্যাবাই।

প্রাতঃস্মরণীয়া অহল্যাবাইয়ের জীবনের পবিত্র কথা বঙ্গসাহিত্যে একাধিক বার বিবৃত হইয়াছে। কিন্তু তদীয় পুত-চরিত পুনঃপুনঃ আলোচনার যোগ্য। একারণ অদ্য আমরা তাঁহার পুণ্য কাহিনী পাঠকপাঠিকাদিগকে উপহার প্রদান করিব।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মোগল সাম্রাজ্যের অধঃপতন ও মহারাষ্ট্রশক্তির অভ্যুদয়ের ফলে ভারতবর্ষে ঘোর রাজবিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল। এই রাজবিপ্লবের ঘূর্ণনে রাজা হঠাৎ পথের কাঙ্গাল হইতেছিলেন, এবং পথের কাঙ্গাল ভাগ্যলক্ষ্মীর অচিন্ত্য কৃপায় রাজসিংহাসনে আরোহণ করিতেছিলেন। এই শেষোক্ত শ্রেণীর সৌভাগ্যশালী পুরুষগণ-মধ্যে মলহর রাওয়ের নাম উল্লেখযোগ্য।

মলহর রাও ১৬৯৩ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা একজন মেষপালক ছিলেন। মধ্যভারতের নীরা নদীর তীরে হোল নামক পল্লীতে তাঁহার বাস ছিল। আদি বাসস্থানের নামানুসারেই মলহর রাও কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত রাজবংশের নাম হোলকার হইয়াছে। "কার" শব্দের অর্থ অধিবাসী।

১৭২৪ খৃষ্টাব্দে মলহর রাও পেশওয়ার সৈন্যবিভাগে প্রবেশ লাভ করেন। মলহর রাও অধ্যবসায় ও শৌর্য্যবীর্য্যের অবতার স্বরূপ ছিলেন। তিনি অপূর্ব্ব প্রতিভা বলে সুদীর্ঘকালব্যাপী (১৭২৪—৬৫ খৃঃ) সাধনায় এক বিস্তীর্ণ রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত রাজ্যের রাজস্ব ৭০ লক্ষ মুদ্রা ছিল।

সৌভাগ্য-লক্ষ্মীর কৃপা মলহর রাওয়ের মস্তকে অজস্রধারে বর্ষিত হইয়াছিল; কিন্তু তাঁহার সন্তানভাগ্য তাদৃশ প্রসন্ন ছিল না। তিনি একটীমাত্র পুত্রসন্তান লাভ করেন। এই পুত্রের নাম কুন্দি রাও। কুন্দি রাও প্রাতঃস্মরণীয়া অহল্যাবাইয়ের পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই বিবাহের ফলে এক পুত্র এবং এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে। মলহর রাও হোলকার বৃদ্ধ বয়সে পৌত্র পৌত্রীর মুখ সন্দর্শন করিয়া আনন্দিত হন; কিন্তু অল্পদিন মধ্যেই কুন্দিরাও অকালে কালগ্রাসে পতিত হন। অহল্যাবাই বিংশবর্ষে পদার্পণ করিবার পূর্ব্বেই বিধবা হয়েন।

শোকক্লিষ্ট মলহর রাও বিধবা পুত্রবধূ অহল্যাবাই, পৌত্র মল্লি রাও এবং পৌত্রী মুচা বাইকে রাখিয়া ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। অতঃপর মল্লি রাও পিতামহ পরিত্যক্ত রাজ্যের আধিপত্যে বৃত হন। কিন্তু তিনি অচিরে বিকৃতমনা হইয়া উঠেন এবং নয় মাস মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। পুত্রের মৃত্যুতে অহল্যাবাই হোলকার রাজ্যের উত্তরাধিকারিণী হন। কিন্তু রাজমন্ত্রী গঙ্গাধর যশোবন্ত হোলকার-বংশের সংসৃষ্ট একজন শিশুকে রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া তাহার নামে নিজে সমস্ত রাজক্ষমতা গ্রাস করিবার প্রয়াসী হইলেন। এই প্রস্তাব শ্রবণ করিয়া অহল্যাবাই দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেন, "আমি মলহর রাওয়ের পুত্রের পত্নী এবং তদীয় পৌত্রের মাতা; রাজ্যে কেবল আমারই অধিকার।" অতঃপর তেজস্বিনী বীরনারী সমস্ত বিপদ অগ্রাহ্য করিয়া আপনার স্বত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য দণ্ডায়মান হইলেন। হোলকার রাজ্যের সৈন্য সামন্ত তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিল। কিন্তু পেশওয়ার প্রধান সেনাপতি এবং পিতৃব্য বীরবর রাঘব গঙ্গাধর যশোবন্তের অর্থে বশীভূত হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহাতে অহল্যা কিঞ্চিন্মাত্রও বিচলিত না হইয়া তাঁহাকে বলিয়া পাঠাইলেন, "নারীর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়া কোন পৌরুষ নাই, তাহাতে মর্য্যাদা ও যশের লাঘব হইতে পারে।" অহল্যা এই ভয় প্রদর্শনের অনুরূপ কাজ করিবার উদ্দেশ্যে যুদ্ধায়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন এবং নিজে রণক্ষেত্রে অবতরণ করিবার সংকল্প প্রকাশ করিলেন। সিন্ধিয়া, ভোঁসলা এবং অন্যান্য নরপতি রাঘবের ব্যবহারের প্রতিবাদ করিয়া বিধবার পক্ষ সমর্থন করিলেন; স্বয়ং পেশোয়া বিধবা অহল্যাবাইয়ের দাবি ন্যায্য বিবেচনা করিয়া পিতৃব্যকে তাঁহার প্রতিকূলাচরণ করিতে নিষেধ করিলেন। অহল্যার সৈন্যবলের সহিত পেশোয়ার পক্ষ-সমর্থন ও সমগ্র প্রদেশের আনুকূল্য মিলিত হইয়া তাঁহাকে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক্ষেত্রে সফলকাম করিল।

অহল্যাবাই দরিদ্র ও ব্রাহ্মণদিগকে ধন বিতরণ ও সৎ

কার্য্যের জন্য অর্থ নিয়োজিত করিয়া শাসন-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি সর্ব্ব প্রথমেই স্বসৈন্যের অধিনায়ক নির্ব্বাচনে মনোযোগী হইলেন। সেই রাজবিপ্লবের যুগে উপযুক্ত লোকের নির্ব্বাচন জন্য সাতিশয় সূক্ষ্ম বিবেচনার আবশ্যক ছিল। অহল্যাবাই তাদৃশ বিচার-ক্ষমতার অধিকারিণী ছিলেন। তিনি তুকাজি নামক একজন স্বজাতীয় সৈনিক পুরুষকে প্রধান সেনাপতি ও অমাত্যের পদে নিযুক্ত করেন। তুকাজি পরিণতবয়স্ক, স্থিরবুদ্ধি ও জনপ্রিয় ছিলেন, তাঁহার চরিত্র দুরাকাঙ্ক্ষা এবং অযথা ক্ষমতা-প্রিয়তা দ্বারা কলুষিত ছিল না। বস্তুতঃ তাঁহার অপেক্ষা আর উপযুক্ত ব্যক্তির নির্ব্বাচন অসম্ভব ছিল। অহল্যাবাই তাঁহাকে সর্ব্বদা শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করিতেন, তিনিও অহল্যা বাইকে মাতৃ সম্বোধন করিয়া ভক্তি ও প্রীতি পূর্ণ ব্যবহার করিতেন। অহল্যাবাই ও তুকাজি পরস্পরের প্রতি সদ্ভাবের বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া এক মনঃপ্রাণে শাসন কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

অহল্যাবাই রাজকার্য্যে নিরত হইয়া প্রজার চিত্তরঞ্জনই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য করিয়াছিলেন। দেশের শ্রীবৃদ্ধি ও প্রজাগণের উন্নতি সাধনই তাঁহার কার্য্যাবলীর মুখ্য লক্ষ্য ছিল। পরিমিত পরিমাণে রাজস্ব নির্দ্ধারণ এবং গ্রাম্য কর্ম্মচারী ও ভূম্যধিকারিগণের স্বত্ব অক্ষুণ্ণভাবে সংরক্ষণ তাঁহার অনুসৃত রাজনীতির মূল সূত্র ছিল বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। অহল্যাবাইয়ের নিজের কোন সৈন্য ছিল না। তিনি কেবল প্রাদেশিক সৈন্য ও আপনার ন্যায়পরতার দ্বারাই আভ্যন্তরীণ শান্তি রক্ষা করিতে সক্ষম ছিলেন। এইসকল সৈন্য এবং তাঁহার নিজের সুযশই বহিঃশত্রুর আক্রমণ নিবারণ কল্পে যথেষ্ট ছিল। অহল্যা বাই করদ সামন্তগণের সঙ্গে সাতিশয় সদ্ব্যবহার করিতেন। কুসীদজীবী, ব্যবসায়ী, জোতদার ও কৃষকের শ্রীবৃদ্ধি দেখিলে তাঁহার আনন্দের পরিসীমা থাকিত না; তিনি প্রজাকুলের সমৃদ্ধি দেখিয়া ছলে বলে সে ধনের কিয়দংশ গ্রাস করিবার জন্য কখনও হস্ত প্রসারণ করেন নাই, কিন্তু তাহাদের সম্পত্তি রক্ষার জন্য সুবন্দোবস্ত করিয়া দিতেন। অহল্যাবাইয়ের যত্নে অসভ্য গোন্দ ও ভিলেরা কিয়ৎপরিমাণে সভ্য হইয়া উঠে এবং লুণ্ঠন ব্যবসায় পরিত্যাগ করে। অহল্যাবাইয়ের হৃদয় অতি উদার ছিল; তিনি ধর্ম্মের নামে কখনও কাহাকে উৎপীড়িত করেন নাই; অন্য ধর্ম্মাবলম্বী প্রজাগণ তাঁহার বিশেষ স্নেহের পাত্র ছিল; তিনি তাহাদের প্রতি সর্ব্বদা সদয় ব্যবহার করিতেন।

অহল্যাবাই প্রকাশ্য দরবারে বসিয়া রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেন। স্বরাজ্যের উন্নতি সম্পর্কীয় সমস্ত বিষয় তিনি অবিচলিত ধৈর্য্য সহকারে অক্লান্তভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিতেন। তিনি স্বয়ং সমস্ত অভিযোগ শ্রবণ করিতেন; তার পর তৎসমুদয়ের মীমাংসার জন্য আবশ্যক মত সালিসের বন্দোবস্ত অথবা আদালতে প্রেরণ করিতেন। প্রজাগণ বিনা বাধায় সর্ব্বদা তাঁহার দর্শন লাভ করিতে পারিত। বিচারকার্য্য সম্পর্কে তাঁহার কর্ত্তব্যবুদ্ধি অতিশয় প্রবল ছিল; কেহ তাঁহার নিজের নিকট বিচারপ্রার্থী হইলে তিনি কেবল যে উভয় পক্ষের বক্তব্য ধৈর্য্যসহকারে শ্রবণ করিতেন, তাহা নহে, অতি ক্ষুদ্র বিষয়ও তন্ন তন্ন করিয়া স্বয়ং অনুসন্ধান করিয়া দেখিতেন।

অহল্যাবাই অতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া পূজা আহ্নিকে নিরত হইতেন, পূজা আহ্নিক শেষ হইলে তিনি ব্রাহ্মণ ও দরিদ্রদিগকে অর্থদান করিতেন। এবং পুরাণ পাঠ শ্রবণ করিতেন। পুরাণশাস্ত্র তাঁহার নিকট জ্ঞান ও নীতির উৎসস্বরূপ ছিল। অতঃপর আহারান্তে তিনি কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিয়া দরবারে গমন করিতেন এবং সেখানে অপরাহ্ণ দুই ঘটিকা হইতে সন্ধ্যা ছয় ঘটিকা পর্য্যন্ত সর্ব্বপ্রকার রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। রাজকার্য্য শেষ করিয়া পুনর্ব্বার সন্ধ্যা বন্দনা প্রভৃতি ধর্ম্মানুষ্ঠানে নিরত হইতেন। অতঃপর অমাত্যবৃন্দের সহিত রাজকার্য্য সম্বন্ধে আলোচনা ও মন্ত্রণাকক্ষে দুই ঘণ্টা অতিবাহিত করিয়া কিঞ্চিৎ জলযোগ অন্তে শয়নকক্ষে বিশ্রামার্থ প্রবেশ করিতেন। অহল্যাবাইয়ের জীবন আত্মসংযমের নামান্তর রূপে ব্যাখা করা যাইতে পারে; তাঁহার আচার ব্যবহার রীতিনীতি সমস্তই ধর্ম্মভাবে অনুরঞ্জিত দেখা যাইত। তিনি দৈনিক কার্য্য সম্পাদনকালে আপনাকে শাসনক্ষমতা পরিচালন বিষয়ে জগদীশ্বরের নিকট দায়ী বলিয়া বিবেচনা করিতেন। কাহারও প্রতি কঠোর ব্যবহারের জন্য প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে তিনি বলিতেন "আমরা নশ্বর জীব,

আমাদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, আমরা সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের ক্রিয়ার ধ্বংস সাধন করিতেছি।" অহল্যা বাই আপনাকে দুর্ব্বলচিত্ত এবং পাপী বলিয়া বিবেচনা করিতেন। তিনি তোষামোদ অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন। একবার একজন ব্রাহ্মণ তাঁহাকে একখানি গ্রন্থ উপহার স্বরূপ প্রদান করেন, অহল্যাবাইয়ের অতি স্তুতিবাদে এই গ্রন্থ পূর্ণ ছিল; এ কারণ তিনি উহা নর্ম্মদা নদীর গর্ভে নিক্ষেপ করিতে আদেশ দেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত।

ইংরাজ-গৃহিণী।

বর্ত্তমান সময়ে সভ্যজগতে নারী-সমাজে ইংরাজ-মহিলাই শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছেন। মহাবীর নেপোলিয়ন ইংরাজ-জাতি অপেক্ষা ফরাসীজাতির হীনতার কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন, "আমাদের নারীগণ ইংরাজনারীর ন্যায় উন্নত হউক, ফরাসীজাতিও ইংরাজজাতির ন্যায় শ্রেষ্ঠতা লাভ করিবে।" নারীগণ যে দেশে উন্নত, পুরুষগণও সে দেশে উন্নত হইবে, ইহা স্বতঃসিদ্ধ কথা।

এ দেশে আমরা আদর্শ ইংরাজ-গৃহস্থ ও পরিবার অতি অল্পই দেখিতে পাই। ইংরাজ এ দেশে বিজেতার বেশে উপস্থিত হয়, পরাধীন জাতির উপর কর্ত্তৃত্ব করিবার জন্য আসে, তাহার স্ত্রীপুত্র পরিবার সকলের মনেও এই ভাবই বিদ্যমান থাকে, সুতরাং তাহাদের স্বাভাবিক ঘর-সংসার দেখিবার তেমন সুযোগ আমরা পাই না। যে ইংরাজমহিলাকে দেশে থাকিলে স্বহস্তে রান্না বান্না হইতে ধোপার যাবতীয় কার্য্যই সম্পন্ন করিতে হয় এদেশে আসিলে তাঁহার গৃহই আয়া বাবুর্চিতে পূর্ণ হয়। সুতরাং তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ আর দেখা যায় না।

কিন্তু স্বদেশে মধ্যবিত্ত ইংরাজগৃহস্থের পরিবার অতি সুন্দর। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীই ইংলণ্ডের গৌরব ও প্রকৃত শক্তি। "ভারত-মহিলার" পাঠিকাগণকে আমরা অদ্য ইংলণ্ডের মধ্যবিত্ত পরিবারের ঘরকন্নার বিবরণ উপহার দিতেছি।

গৃহিণী লইয়াই ঘর-সংসার। আমাদের দেশের গৃহিণী ও ইংরাজ-গৃহিণী এই দুইয়ে অনেক পার্থক্য। ইংরাজগৃহিণী সাধারণতঃ সুশিক্ষিতা ও বহু অভিজ্ঞতাশালিনী। বহিঃপ্রকৃতি ও বাহ্য সংসারের সহিত সংস্পর্শ বশতঃ তাঁহার জ্ঞান ও শক্তির যে বিকাশ হয় এদেশের গৃহিণীগণ তাহা হইতে সম্পূর্ণই বঞ্চিতা। আমাদের দেশের সাধারণ গৃহিণীগণ কঠোর পরিশ্রম করেন সত্য কিন্তু তাহা কখনই ইংরাজ-গৃহিণীর শ্রমের তুল্য নহে। অভিজ্ঞতা এবং শরীর ও মনের শক্তিতে আমাদের গৃহিণীগণ ইংরাজ-গৃহিণী অপেক্ষা এত নিম্নে অবস্থিত, যে আমাদের গৃহিণীগণের পক্ষে বর্ত্তমান অবস্থায় ইংরাজ-গৃহিণীগণের সমকক্ষতা লাভ করা কঠিন ব্যাপার। আমাদের গৃহিণীগণের দশ ঘণ্টা আপ্রাণ পরিশ্রম ও ইংরাজ-গৃহিণীর দশ ঘণ্টা পরিশ্রম এই দুইয়ের কার্য্যকারিতার তারতম্য অনেক।

ইংলণ্ডে মধ্যশ্রেণীর গৃহস্থগণ পত্নীর হস্তে মাসের নির্দ্দিষ্ট খরচ হিসাব করিয়া দেন, গৃহিণী ঘর-সংসারের যাবতীয় কার্য্য নির্ব্বাহের ব্যবস্থা করেন। খাদ্য দ্রব্যাদি ক্রয় করা, দেনা পাওনা শোধ করা, হাট বাজার করা, প্রভৃতি সকল কার্য্যই গৃহিণী করিয়া থাকেন। আমাদের দেশে কি পুরুষ, কি স্ত্রীলোক শারীরিক পরিশ্রমকে সকলেই হীনচক্ষে দেখিয়া থাকে। কিন্তু ইংরাজ স্ত্রীপুরুষ শারীরিক শ্রমকে অত্যন্ত গৌরবের চক্ষে দেখেন। নিজের শক্তি সামর্থ্যে যতদূর সম্ভব তাঁহারা তাহা স্বহস্তেই করিয়া থাকেন। অনেক নব দম্পতি চাকর চাকরাণী রাখিবার অবস্থা থাকিলেও বিনা চাকর চাকরাণীতেই সংসার আরম্ভ করেন। প্রত্যেক সুগৃহিণী ঘরকন্নার সকল কাজই জানেন। পূর্ব্বে ইংরাজ নারীগণের এ অবস্থা ছিল না। তাঁহারা উলের কাজ, কার্পেটের কাজ, মোমের কাজ প্রভৃতি নানারূপ বিলাসিতা ও সখের কাজ নিয়াই ব্যস্ত থাকিতেন, কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতেই এই সকল বিকৃত ভাব দুর হইয়াছে। তাঁহারা শারীরিক পরিশ্রমকে সম্মানের চক্ষে দেখিতে শিখিয়াছেন। এখন কর্ম্মিষ্ঠ মধ্যশ্রেণীর ইংরাজগৃহে গৃহিণী রাত্রেই উননে কাগজ, কাঠ ও কয়লা দিয়া জ্বালিবার জন্য প্রস্তুত করিয়া রাখেন, স্বামী ভোর বেলা উঠিয়া রন্ধন গৃহে যাইয়া একটী দেশলাই ধরাইয়া দেন, ও এক কেট্‌লি জল চা বা কাফির জন্য উননে চড়াইয়া দেন।

ইতিমধ্যে গৃহিণী সেই ভোর বেলাই শীতল জলে স্নান করেন অথবা জলে স্পঞ্জ ভিজাইয়া শরীর মুছিয়া ফেলেন। পাঁচ মিনিটের মধ্যে এই স্নানকার্য্য শেষ হয়, শীতপ্রধান দেশে এইরূপ স্নান স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ উপকারী। স্নানান্তে পরিষ্কার পোষাক পরিয়া গৃহিণী একটু প্রার্থনা করেন এবং তৎপরে নীচে যাইয়া পূর্ব্বোল্লিখিত গরম জলে চা অথবা কাফি প্রস্তুত করেন এবং প্রাতঃকালের জলখাবার প্রস্তুত করেন। আহারের টেবিলটী সুন্দর করিয়া সজ্জিত করেন। তখন স্বামীও আসিয়া তাঁহার সহিত যোগ দেন এবং ধর্ম্মানুরাগ থাকিলে উভয়ে মিলিত হইয়া দিবসের কর্ত্তব্য উত্তমরূপে সম্পাদন ও পাপ প্রলোভন হইতে রক্ষা করিবার জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করেন। তৎপর প্রাতরাশের পর স্বামী বিষয়কার্য্যে বাহির হইয়া যান।

স্বামী বাহিরে গেলে পত্নী বাসন কুশন ধুইয়া ঘর দরজা ও জিনিষ পত্র পরিষ্কার করেন এবং ভাড়ারে কি কি জিনিষের অভাব আছে তাহার এক তালিকা প্রস্তুত করেন এবং মধ্যাহ্ন আহার্য্য রন্ধনের আয়োজন করেন। আয়োজন সমাপ্ত করিয়া তিনি উপর তলায় গিয়া ঘর পরিষ্কার ও শয্যা প্রস্তুত করেন এবং জিনিষ পত্র যথাস্থানে সজ্জিত করেন। ঘুম হইতে উঠিয়া নীচে যাইবার পূর্ব্বেই তিনি দরজা জানালাগুলি খুলিয়া বিছানার চাদরগুলি জানালায় ঝুলাইয়া দিয়া গিয়াছেন। সুতরাং এই সময়ের মধ্যে সে গুলি বেশ একটু রৌদ্র ও বাতাস পাইয়াছে। একজন কর্ম্মিষ্ঠা সুগৃহিণীর পক্ষে এই সকল কাজ করিতে আধঘণ্টার অধিক সময় লাগে না। এই সকল কাজ তাঁহার নিকট কিছুমাত্র ভারবহ বোধ হয় না। তিনি জানেন, স্বামীর হৃদয়-রাজ্যের এবং তাঁহার ক্ষুদ্র গৃহরাজ্যের তিনিই রাণী, সুতরাং প্রীতিপ্রফুল্ল মনে, পরম আনন্দে তিনি তাঁহার গার্হস্থ্য কর্ত্তব্য সম্পাদন করেন।

তৎপর তিনি ফর্দ্দ অনুসারে জিনিষ পত্র ক্রয় করিতে নিজেই বাজারে বাহির হন। ইহাতে বাজার করা এবং একটু প্রাভাতিক বিমল মুক্ত বায়ুসেবন দুই কাজই হয়। স্বামী ফিরিয়া আসিলে বেলা একটা বা দুইটার সময় তাঁহারা মধ্যাহ্ন ভোজন করেন। ইংলণ্ডে মধ্যাহ্ন ভোজন এই সময়েই হইয়া থাকে। আহারান্তে স্বামী পুনরায় কাজে চলিয়া যান, পত্নী গৃহ সজ্জিত করিয়া পাঠ, শেলাই, গীত-বাদ্য প্রভৃতি কাজে নিযুক্ত হন। আকাশ পরিষ্কার থাকিলে শেলাই নিয়া কোন তৃণাচ্ছাদিত মাঠে চলিয়া যান, সেখানে মুক্ত বায়ুসেবন এবং শেলাই দুই-ই একসঙ্গে হয়। ইংলণ্ডে গ্রীষ্মের অপরাহ্ণ অতি মধুর ও অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ। সেই সময় পত্নী সাধারণতঃ সন্ধ্যাকালে স্বামীর সঙ্গে ভ্রমণ, অশ্বারোহণ অথবা কোন বক্তৃতা শ্রবণে গমন করেন।

সাধারণতঃ ইংরাজ পরিবারের ময়লা কাপড় ধোপার বাড়ী দেওয়া হয় না। সপ্তাহে একদিন করিয়া ধোপানীর সাহায্যে বাড়ীর গৃহিণী ও মেয়েরা কাপড় পরিষ্কার করেন। ভাল ভাল কাপড় গৃহিণী নিজ হস্তে ইস্ত্রী করিয়া থাকেন। এই সকল কাজে প্রত্যেক ইংরাজ গৃহিণীই সুশিক্ষিতা।

ইংরাজ-গৃহিণী গৃহকার্য্য যেমন শৃঙ্খলা ও দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করেন জীবনের উচ্চতর বিষয়েও তেমনি স্বামীর সাহায্য করিয়া থাকেন। আমাদের দেশে এম, এ,-পাশ স্বামীর স্ত্রীর বিদ্যার দৌড় যেমন সাধারণতঃ বোধোদয় ও বঙ্কিম বাবুর উপন্যাস পর্য্যন্ত, ইংলণ্ডে সে প্রকার নহে। সে দেশে জ্ঞানালোচনায়, রাজনৈতিক আন্দোলনে, দেশের অবস্থালোচনায় ও বিবিধ জনহিতকর কার্য্যে পত্নী সর্ব্বদা স্বামীর সহকর্ম্মিণী ও সহভাবিনী। ঘরকন্নায়ও আমাদের গৃহিণীরা যে কিছুতেই তাঁহাদিগকে পশ্চাতে ফেলিতে পারিবেন না পূর্ব্বোক্ত বিবরণেই তাহা উপলব্ধি হইবে।

ইংরাজের জাতীয় চরিত্রে অনেক দোষ ত্রুটী আছে সত্য, কিন্তু মোটের উপর ইংরাজ-জাতি যে বর্ত্তমান সময়ে পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠতম জাতি সে বিষয়ে পৃথিবীর সভ্যজাতি সমূহের মতদ্বৈধ নাই। ইংরাজ-নারীই এই শ্রেষ্ঠতার প্রধান কারণ। সুপ্রণালীতে গৃহধর্ম্ম পালনে ও শৈশবে মাতৃস্তন্যের সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজ-মাতা ইংরাজ শিশুর অন্তরে যে শৃঙ্খলা, পরিপাট্য, সংযম ও স্বগৃহানুরাগ সঞ্চারিত করিয়া দেন তাহাতেই ইংরাজ-জাতিকে আজ জগজ্জয়ী করিয়া তুলিয়াছে।

রমণীর উদ্ভিদপ্রেম।

রাস্কিন বলিয়াছেন :—"To watch the corn grow or the blossoms set; to draw hard breath over ploughshare or spade; to read, to think, to love, to pray—these are the things that make men happy." অর্থাৎ শস্যের উদ্গম ও মুকুলের দলসংকোচন, হলচালনা ও মৃত্তিকাকর্ষণ, অধ্যয়ন ও চিন্তা, লোকের প্রতি প্রেমপূর্ণ ব্যবহার ও প্রার্থনা—এ সকলি মানুষকে প্রকৃত সুখী করিতে পারে।

রাস্কিনের এই কথাগুলি কি সুন্দর! সংসারের বড় বড় স্বার্থত্যাগ যেমন মানুষকে সুখী করে—তেমনি ছোট খাট শ্রম, ছোটখাট চিন্তা ও ছোটখাট স্বার্থত্যাগ মানুষকে দিন দিন মহত্ত্বের পথে লইয়া যায়। আমাদের জীবন ত এই সকল কাজেরই সমষ্টি মাত্র। বড় কাজ করিবার সুযোগ সকলের মিলে না। আর মিলিলেও ছোট কাজের দ্বারা, ছোট কর্ত্তব্য পালনের দ্বারা যে মহত্ত্ব লাভ হইয়া থাকে, বড় কাজের দ্বারা অনেক সময় তাহা লাভ হওয়া কঠিন। ছোট কাজ আমাদের দৈনিক জীবনের অঙ্গীভূত—বড় কাজ পোষাকি রকমের—প্রাত্যহিক জীবনের সহিত তাহার দেখাসাক্ষাৎ নাই বলিলেও হয়। সময়বিশেষে বড় কাজ করিবার অবসর আসে—কিন্তু যে ছোট কাজ করিয়া শক্তি সঞ্চয় করিয়াছে সে ব্যতীত আর কাহারও বড় কাজ করিবার অধিকার নাই।

যাক্। ছোট ও বড় কাজের দার্শনিক ব্যাখ্যা করা আমার উদ্দেশ্য নয়। সাদা কথায় গাছগাছড়া সম্বন্ধে দু'একটী কথা বলিবার সঙ্কল্প ছিল সুতরাং দর্শনশাস্ত্র ছাড়িয়া উদ্ভিদ রাজ্যে প্রবেশ করাই ভাল।

বিজ্ঞান-জ্ঞান-সমুজ্জ্বল ইউরোপখণ্ডে যখন যে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের আবিষ্কার হয় তখন তাহার একটা মন্দীভূত ঢেউ আসিয়া বঙ্গোপসাগরের কিনারায় লাগিয়া আবার বিক্ষিপ্ত হইয়া ফিরিয়া যায়। এতবড় ভারতবর্ষের দুই চারিজন লোক যখন সেই তত্ত্বটীর মর্ম্মগ্রহণে বদ্ধপরিকর, অন্য লোকগুলি তখন সুখনিদ্রায় অভিভূত। এমন শ্রমবিমুখ ও চিন্তাবিমুখ জাতি বুঝি জগতের আর কোথাও নাই!

উদ্ভিদ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে ইউরোপখণ্ডে নানাপ্রকার গবেষণা চলিতেছে। আমাদের দেশে শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু ও শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রমুখ কয়েক জন পণ্ডিত উদ্ভিদ-রাজ্যের অনেক রহস্য উদ্ঘাটন করিতেছেন। মহিলাদের মধ্যে শ্রীযুক্তা হেমপ্রভা বসুর উদ্ভিদ-বিদ্যানুরাগ অনেকেই জ্ঞাত আছেন। ইনি উক্ত বিষয়ে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এম্, এ, উপাধিধারিণী। বিশ্ববিদ্যালয় এফ্, এ, পরীক্ষার্থিনীদিগের নিমিত্ত প্রাকৃত বিজ্ঞানের পরিবর্ত্তে উদ্ভিদ-বিজ্ঞানের ব্যবস্থা করিয়া ভাল করিয়াছেন কি না বলা যায় না, কিন্তু সাধারণতঃ রমণীদিগের উদ্ভিদ-বিজ্ঞানের প্রতি বিশেষ অনুরাগ দেখিতে পাওয়া যায়। ইউরোপ ও আমেরিকার অনেক স্থানেই উদ্ভিদ-বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় তত্ত্বনিরূপণ বিষয়ে রমণীগণ বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন ও করিতেছেন। ইংলণ্ডের ডালউইচ্ (Dulwich) নামক স্থানে একটী বালিকাবিদ্যালয় আছে। সেখানে অপেক্ষাকৃত অধিকবয়স্কা বালিকারা উদ্ভিদরাজ্যের যে সকল অদ্ভুত তত্ত্ব নিরূপণ করিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে বিস্মিত হইতে হয়। আমাদের দেশে পল্লীগ্রামে রমণীদিগের আশ্চর্য্য উদ্ভিদপ্রেম দেখা গিয়া থাকে। আমরা এমন দেখিয়াছি যে কোন কোন রমণী আপনার পতিপুত্র অপেক্ষাও যেন স্বহস্তরোপিত তরুলতার প্রতি অধিক স্নেহবতী। অনেক পল্লী কলহের মূলে সামান্য একটী বৃক্ষের শাখাচ্ছেদনের অতিরিক্ত আর কিছুই দেখা যায় না। এরূপ কলহ পুরুষদিগের মধ্যে হইলেও অনেক সময়ে দেখা যায়, রমণীগণই তাহার জনয়িত্রী। পাঠিকাগণ মনে করিবেন না, যে আমি পুরুষ অপেক্ষা রমণীদিগের কলহ-প্রিয়তা অধিক এই কথা প্রমাণ করিতে বসিয়াছি। রমণীগণের উদ্ভিদবাৎসল্য বা উদ্ভিদপ্রেম যে পুরুষ অপেক্ষা অধিক এই কথা বলাই আমার উদ্দেশ্য। মহাকবি কালিদাসও বনতরুর প্রতি শকুন্তলার 'সোদরস্নেহ' ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তরুলতার প্রতি রাজা দুষ্মন্তের বিন্দুমাত্রও আকর্ষণ প্রদর্শন করেন নাই।

বায়ু ও ভ্রমর যে পুংপুষ্প ও স্ত্রীপুষ্পের মধ্যে 'ঘটকালি' করিয়া থাকে এ কথাটা আজকাল অনেকেই জানিতে পারিয়াছেন। সুতরাং সে কথার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন।

৺অক্ষয়কুমার দত্তের চারুপাঠ প্রথম ভাগেই এ কথার উল্লেখ আছে। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট যে সকল নূতন "বিজ্ঞান-পাঠ" প্রচলিত করিয়াছেন তাহাতে অক্ষয়কুমারের কথা অনেকে ভুলিতে আরম্ভ করিয়াছে। যাহা হউক কথাটা তবু মোটের উপর অনেকের জানা আছে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

কেন্দ্রীয় শক্তি (বা মাধ্যাকর্ষণ শক্তি) ও আলোকের প্রভাবে উদ্ভিদ-জগতে অনেক অভাবনীয় ঘটনা ঘটিতেছে। আলোক ও বায়ু (প্রধানতঃ নাইট্রোজেন) উদ্ভিদের প্রাণ-স্বরূপ। আলোক-বিহীন স্থানে যদি কোন বীজ অঙ্কুরিত হয় তাহা হইলে দেখা যাইবে উহার শ্যামলতা নাই। অধিক দিন প্রগাঢ় অন্ধকারে বাস করিলে সেই শ্যামলতা বিহীন অঙ্কুরটুকুও মরিয়া যাইবে। যদি একটী ক্ষুদ্র বৃক্ষ বা লতাকে, ভিতরে বর্দ্ধিত হইতে পারে এরূপ পরিসর-বিশিষ্ট কোন বস্তু দ্বারা আপাদশীর্ষ আবৃত করা যায় এবং যদি সেই সুকঠিন আবরণের এক পার্শ্বে আলোক ও বায়ু প্রবেশের নিমিত্ত একটি নিতান্ত ক্ষুদ্র ছিদ্র থাকে, তাহা হইলে দু'একদিনের মধ্যে দেখা যাইবে যে ঐ বৃক্ষ বা লতা উন্মুখ হইয়া সেই ছিদ্রাভিমুখে আপনার শাখা প্রসারিত করিয়া দিয়াছে। শিশু যেমন দুই বাহু প্রসারিত করিয়া স্নেহময়ী জননীর উদার ক্রোড়ে ঝাঁপাইয়া পড়ে তরুর শাখা তেমনি ব্যাকুলতার সহিত সেই ছিদ্রাভিমুখে প্রধাবিত হয়।

আধার-সমেত (টব) একটী বৃক্ষকে উল্টাইয়া নিম্নাভিমুখ করিয়া রাখিলে কিছুদিন পরে দেখা যাইবে, তাহার নবোদ্গত শাখাপ্রশাখা সকলি উর্দ্ধমুখী হইতেছে। যে মানব-জীবনে সৃষ্টির চরমোৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে সেই মানব-জীবন কত সময় নিম্নাভিমুখীন হইয়া থাকে কিন্তু প্রাণী জগতের শেষ সীমায় অবস্থিত উদ্ভিদরাজ্যের সর্ব্বদাই উর্দ্ধমুখীন গতি। মানবের প্রতি উদ্ভিদের কি তীব্র তিরস্কার, কি নীরব ধিক্কার!

বিজ্ঞান কত অদ্ভুত কার্য্য করিতেছে তাহা ভাবিলে স্তম্ভিত হইয়া যাইতে হয়। পক্ষীর ডিম্ব হইতে কৃত্রিম উপায়ে শাবক উৎপাদন করিবার নিমিত্ত এক প্রকার যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে, উহাকে ইংরাজীতে ইন্‌কিউবেটার (incubator) বলিয়া থাকে। ইহার অনুকরণে পুষ্প বা ফলের বীজ হইতে সহজে অঙ্কুর উৎপন্ন করিবার নিমিত্ত একপ্রকার যন্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছে উহাকে seed-incubator বলা হয়। ইহার অধিকাংশই রমণীদিগের চেষ্টা ও গবেষণার ফল।

নানা জাতীয় উদ্ভিদের বৃদ্ধি-বৈচিত্র্য স্থির করিবার নিমিত্ত এক প্রকার যন্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছে। এই মাপকযন্ত্র অনেক কাজে আসিতেছে। ইহা দ্বারা উদ্ভিদের মাসিক, সাপ্তাহিক, দৈনিক বৃদ্ধি নির্ণয় করা সহজ হইবে।

আমরা মাটিতে গাছ রোপণ করিয়া থাকি। কখন বোতলে জল দিয়াও আমরা তন্মধ্যে গাছ রাখিয়া থাকি। সে সময়ে একটী ছিপি (cork) দিয়া বোতলের মুখ বন্ধ রাখা হয়। ইংলণ্ডে পরীক্ষার নিমিত্ত আর এক উপায়ে বৃক্ষ পালন করা হইতেছে। জল ও অন্যান্য কয়েকটী দ্রব্যের সংমিশ্রনে এক প্রকার জলীয় পদার্থ প্রস্তুত করিয়া তাহা বোতলে বা বৃহৎ কাচ-পাত্রে রক্ষিত হইতেছে; এবং এই জলীয় পদার্থে বৃক্ষমূল নিমজ্জিত রাখিয়া উক্ত কাচ-পাত্রের মুখ ছিপি-দ্বারা বন্ধ করিয়া রাখায় বৃক্ষসকল জীবিত থাকিতেছে এবং ভূপৃষ্ঠ-জাত তরুলতার ন্যায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। জলের সহিত যে সকল দ্রব্য মিশ্রিত করা হয় তাহার প্রত্যেকটাই উদ্ভিজ্জীবনের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। এই জলীয় পদার্থকে ইংরাজিতে ফুড সলিউশন্ (food solution) বলা হয়।

ফুড্ সলিউশনে রক্ষিত বৃক্ষ সমূহ অন্যান্য বৃক্ষের ন্যায় হেমন্ত কালে (ইংলণ্ডের autumn) পত্র-পুষ্প বিবর্জ্জিত অবস্থায় বাস করে। তার পর বসন্তের সমাগমে তাহাদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে নব যৌবনের চিহ্ন সকল পরিস্ফুট হইয়া উঠে। বসন্তের সঙ্গে জড় ও চেতন উভয়েরই যে একটা বেশ গভীর সম্বন্ধ আছে তাহা অনেক বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক স্বীকার করিয়াছেন। শুনিয়াছি, ফরাসীদেশীয় কোন এক বৈজ্ঞানিক কতকগুলি সৌরভ বিশিষ্ট ফুল নিরুদ্ধ-বায়ু (air-tight) কাচ-পাত্রে বহু বৎসর রক্ষা করিয়াছিলেন। ফুলগুলি কালক্রমে কৃষ্ণবর্ণ ও গন্ধবিহীন হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু উক্ত বৈজ্ঞানিক দেখিতেন, প্রতি বসন্তে সেই শুষ্ক, কৃষ্ণবর্ণ পুষ্পদল হইতে ক্ষীণ সৌরভ নিঃসৃত হইত—আবার

বসন্তের অবসানে তাহার মৃদু সৌরভ আপনা আপনি বিদায় লইত। ফুড্ সলিউশনে রক্ষিত তরুলতাও হেমন্তের করস্পর্শ ভয়ে নিরাভরণ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে। তার পর প্রকৃতির স্বহস্ত-বীজিত তাল বৃন্তের মৃদুহিল্লোল তাহার হিম-তুষার-ক্লিষ্ট নগ্ন দেহকে স্পর্শ করিলে সে আপনি সাড়া দেয়, আপনি লজ্জায় সরমে আপনার নগ্ন তনু পত্র-পুষ্পফলে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলে!

উদ্ভিদ রাজ্যের এই সকল অপূর্ব্ব কাহিনী দেশে দেশে আলোচিত হইতেছে। জ্ঞান ও ধ্যান-স্তিমিত লোচনে কত সাধক সন্দেহ কুজ্ঝটিকার মধ্য দিয়া অদূরবর্ত্তী অসীম রহস্যের সুবর্ণ শৃঙ্খলবেষ্টিত, শুভ্র [illegible]রণ-সুশোভিত মহা-মন্দির দেখিতে পাইতেছেন। কে কবে গৃহকোণ অথবা বিশ্রাম-মন্দির হইতে "প্রাপ্তোঽস্মি" "প্রাপ্তোঽস্মি" বলিয়া ছুটিয়া বাহির হইবেন সে কথা কে বলিতে পারে? বঙ্গ দেশের নিভৃত অন্তঃপুর হইতে হয়ত এমন সত্যের আবিষ্কার হইবে যে জগৎ স্তম্ভিত হইয়া যাইবে। ভগবান করুন, সেই শুভদিন আমাদের দেশে আসুক্।

শ্রীইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিদায়। *

দেবি!

আজি হেথা হাহাকার;
উদ্‌ঘাটিত পুষ্পদ্বার
অমর আনন্দ-লোকে।

জননীর ভাঙ্গা প্রাণ,
ভেঙ্গে হেথা শত খান,
শত ধারা বহে বুকে;
সেথা উচ্ছ্বসিত প্রাণ
যাচিছে আশ্রয় দান,
পুণ্য পিতৃ স্নেহ-নীড়ে।
যাও সাধ্বী শুভ্র বেশে,
সে উজ্জ্বল মহাদেশে,
ওগো হাসিমুখী, ধীরে।
যে ঐশ্বর্য্য পুণ্যবতী,
দেখায়েছ নিতি, নিতি,
'সহিষ্ণুতা' 'ধর্ম্ম' ধন,
নিদারুণ যাতনায়
দেহ ভেঙ্গে চূর্ণ হয়,
তবু প্রফুল্ল আনন।
বংশের গৌরব-মণি,
নারীকুল শিরোমণি,
দেবি! নমি শতবার,
দাঁড়ায়ে সংসার-তীরে,
পদধূলি নিতে শিরে
আজি এসেছি আবার।

যে শয়ানে তুমি রাণী,
শায়িতা অচলা স্থির,
আকাঙ্ক্ষিত চির তরে
এই শয্যা রমণীর;
ঘোর ব্যথা জননীর,
স্বামী প্রাণে হানি বাজ,
হে দেবী এ মহাযাত্রা
অকালে সাজে কি আজ?
বধূরাণী হে কল্যাণী!
ছিলে তুমি যে গৃহের,
শোক দুঃখ হাহাকার
চির সঙ্গী সে গেহের।

* গত ২২শে আশ্বিন স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসু মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা আগ্রা কলেজের বিজ্ঞানাধ্যাপক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রচন্দ্র নাগ এম, এ, মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী শ্রদ্ধেয়া নলিনী নাগ অকালে পরলোক গমন করিয়াছেন। আমরা বাল্যকাল হইতে স্বর্গীয়া মহিলার সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত ছিলাম। তরুণীদিগের মধ্যে ইঁহার ন্যায় সর্ব্বগুণান্বিতা, সরল, ধর্ম্মনিষ্ঠ নারী সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। ইনি দেবপ্রকৃতি পিতার বহু গুণের অধিকারিণী হইয়াছিলেন। পিতা যেমন সর্ব্বদাই লোকচক্ষুর অন্তরালে আপনার শক্তি ও সদ্গুণরাশি লুক্কায়িত রাখিতে চেষ্টা করিতেন,' কন্যাও তেমনি নীরব জীবন যাপনে সচেষ্ট ছিলেন। এই জন্যই তাঁহার অমূল্য চরিত্রের সৌরভ শুধু ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দিগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিত, বাহিরে তাহা বিস্তৃত হইতে পাইত না। ইঁহাকে হারাইয়া বঙ্গদেশ একটী প্রকৃত রমণীরত্ন হারাইয়াছেন। ভাঃ মঃ সঃ।

চরণ পরশে তব
শ্মশানে ফুটিল ফুল,
থামি অশ্রু, হাহাকার,
বহে বায়ু অনুকূল।
বরষ বরষ যাপি,
প্রেমের সাধনা লয়ে,
"নগেন্দ্র" "নলিনী" পানে
অনিমেষে ছিল চেয়ে,
গোধূলি মুহূর্ত্ত শুভ
পবিত্র মাহেন্দ্র ক্ষণে,
শুধু দু দিনের তরে
মিলেছিলে দুই জনে।
দেববালা সুরলোকে
বিদায় দিতে গো তোরে,
কত আঁখি অশ্রু ভরা
কত হিয়া ভেঙ্গে পড়ে।

শ্রীসরলা দত্ত।

কাব্যে লোকশিক্ষা।

(৭)

"আলো ও ছায়া"-রচয়িত্রীর কাব্য।

এখন আমরা শ্রদ্ধেয়া কামিনী রায়ের কাব্য সম্বন্ধে আলোচনা করিব। গ্রন্থকর্ত্রী "আলো ও ছায়া" রচনা করিয়া যেরূপ যশ ও খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, এরূপ অল্প লোকের ভাগ্যেই ঘটে। বাঙ্গলা দেশে "আলো ও ছায়ার" পাঠক-সংখ্যা বিস্তর। এমন কাব্যানুরাগী লোক বোধ হয় খুব কমই আছেন যে, "আলো ও ছায়া" পাঠ করেন নাই। কবির নামোচ্চারণ করিলে দেশের প্রায় সকল লোকই তাঁহাকে "আলো ও ছায়া"র গ্রন্থকর্ত্রী বলিয়া চিনিতে পারেন।

"আলো ও ছায়া" গ্রন্থের মধ্যে তাঁহার আশ্চর্য্য ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি যথার্থই কবি। তাঁহার প্রতিভা আছে, ভাব-সম্পদ আছে, ভাষার উপরও আশ্চর্য্য অধিকার আছে। তাঁহার সৌন্দর্য্যগ্রহণের ও চিত্রাঙ্কনের শক্তিও সামান্য নহে। তাঁহার অঙ্কিত ছবির মধ্যে প্রকৃতির সৌন্দর্য্য রেখাগুলি বর্ণে ও সুষমায় উজ্জ্বল হইয়া উঠে। গ্রন্থকর্ত্রীর ধ্যানদৃষ্টি অতিশয় উজ্জ্বল। সে দৃষ্টি বিশ্বমানবের মর্ম্মস্থানে প্রবেশ করিতে পারে। এজন্য মানবের মর্ম্মস্থানের গভীর প্রেমের কথা ও গভীর সুখদুঃখের কাহিনী তিনি অকৃত্রিম-ভাবে বর্ণনা করিতে পারেন। তাঁহার বর্ণনা পড়িয়া মনে হয়, বিশ্বের নরনারী হৃদয়ের আবরণ উন্মুক্ত করিয়া গভীর প্রেম ও গভীর সুখদুঃখ সকলই যেন তাঁহাকে দেখাইয়াছে; তাই তিনি বিশ্বমানবের প্রেম ও বেদনার কাহিনী অতি প্রাণস্পর্শী ভাষায় বর্ণনা করিতে পারিয়াছেন।

গ্রন্থকর্ত্রীর ভাষা এরূপ সুললিত, ছন্দ এরূপ সুমধুর যে, এক একটা কবিতা পড়িতে পড়িতে মিষ্টরসে মন পূর্ণ হইয়া উঠে। এমন পবিত্রতা মাখানো আন্তরিকতাপূর্ণ সরল ও অকৃত্রিম কবিতা অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়।

"আলো ও ছায়া"র মধ্যে নানা ভাবের কবিতা আছে। তন্মধ্যে মহদ্ভাবোদ্দীপক ও স্বদেশানুরাগপূর্ণ কয়েকটি কবিতা সম্বন্ধেই আলোচনা করিব। কিন্তু তৎপূর্ব্বে "সে কি ?"-শীর্ষক কবিতাটি সম্বন্ধে দু একটা কথা বলিব। বাঙ্গলা কাব্যে প্রেমের বর্ণনা ত যথেষ্ট আছে। কিন্তু আমাদের গ্রন্থকর্ত্রী কি সুন্দর, কি পবিত্রভাবে প্রেমের বর্ণনা করিয়াছেন, একবার দেখুন :—

"সে কি ?
"প্রণয় ?"
"ছি !"
"ভালবাসা—প্রেম ?"
"তাও নয়।"
"সে কি তবে ?"
"দিও নাম দিই পরিচয়—
আসক্তি বিহীন শুদ্ধ ঘন অনুরাগ,
আনন্দ সে নাহি তাহে পৃথিবীর দাগ ;
আছে গভীরতা তার উদ্বেল উচ্ছ্বাস,
দুধারে সংযম-বেলা ঊর্দ্ধে নীলাকাশ,
উজ্জ্বল কৌমুদীতলে অনাবৃত প্রাণ,
বিম্ব প্রতিবিম্ব করে প্রাণে অধিষ্ঠান ;
ধরার মাঝারে থাকি ধরা ভুলে যাওয়া,
উন্নত কামনা ভরে, ঊর্দ্ধ দিকে চাওয়া ;

পবিত্র পরশে যার, মলিন হৃদয়
আপনাতে প্রতিষ্ঠিত করে দেবালয়,
ভকতি-বিহ্বল, প্রিয় দেব-প্রতিমারে
প্রণমিয়া দূরে রহে, নারে ছুঁইবারে;
আলোকের আলিঙ্গনে, আঁধারের মত,
বাসনা হারায়ে যায়, দুঃখ পরাহত;

* * *

আপনারে বিকাইয়া আপনাতে বাস,
আত্মার বিস্তার ছিড়ি ধরণীর পাশ।
হৃদয়-মাধুরী সেই, পুণ্য-তেজোময়,
সে কি তোমাদের প্রেম? কখনই নয়।
শতমুখে উচ্চারিত, কত অর্থ যার,
সে নাম দিও না এরে মিনতি আমার।"

প্রেমের কি মহৎ আদর্শ? গ্রন্থকর্ত্রী যেন কোনো উন্নত লোকে বসিয়া প্রেমের কল্পনা করিয়াছেন; তাই তাঁহার কবিতার মধ্যে সংসারের প্রেম স্বর্গীয় হইয়া উঠিয়াছে! অথবা নারীই প্রেমের আরাধ্যা দেবী; তাই গ্রন্থকর্ত্রী প্রেমের যথার্থ মর্য্যাদা বুঝিয়াছেন, এবং প্রেমের আদর্শ যত উন্নত হইতে পরে, গ্রন্থকর্ত্রী ঠিক্ ততটা উন্নত স্থানেই প্রেমের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

অতঃপর গ্রন্থকর্ত্রীর মহত্ত্বাবোদ্দীপক ও স্বদেশানুরাগপূর্ণ দুই তিনটি কবিতা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি। এ সংসারে অধিকাংশ মানুষই ভোগ ও আত্মতৃপ্তির মধ্যে সুখ খুঁজিয়া বেড়ায়। কিন্তু তাহাতে ত প্রকৃত সুখ পাওয়া যায় না। তবে প্রকৃত সুখ কোথায়? গ্রন্থকর্ত্রী বলিতেছেন:—

"কার্য্যক্ষেত্র ওই প্রশস্ত পড়িয়া,
সমর-অঙ্গণ সংসার এই;
যাও বীরবেশে, কর গিয়া রণ;
যে জিনিবে সুখ লভিবে সেই।
পরের কারণে স্বার্থ দিয়া বলি,
এ জীবন মন সকলি দাও,
তার মত সুখ কোথাও কি আছে?
আপনার কথা ভুলিয়া যাও।"

কবে আমরা এই মহৎ সুখকেই জীবনের লক্ষ্য স্থির করিয়া সংসারের ক্ষুদ্র সুখের আশা ত্যাগ করিব? যেদিন তাহা পারিব, সেই দিনই আমাদের দেশ উন্নত হইবে।

গ্রন্থকর্ত্রী স্বয়ং যেন এই উন্নত সুখই চাহেন। কিন্তু তিনি রমণী। রমণীদিগের এ সুখের পথে বিঘ্ন অনেক। তাঁহারা ইচ্ছা সত্ত্বেও লোকনিন্দার ভয়ে দেশের জন্য, অপরের জন্য আত্মবিসর্জ্জন করিয়া দুর্লভ সুখের অধিকারিণী হইতে পারেন না। গ্রন্থকর্ত্রী তাই ক্ষোভ করিয়া বলিতেছেন:—

"করিতে পারি না কাজ,
সদা ভয়, সদা লাজ,
সংশয়ে সংকল্প সদা টলে,—
পাছে লোকে কিছু বলে।
আড়ালে আড়ালে থাকি,
নীরবে আপনা ঢাকি,
সম্মুখে চরণ নাহি চলে,
পাছে লোকে কিছু বলে।
হৃদয়ে বুদ্বুদ মত,
উঠে শুভ্র চিন্তা কত,
মিশে যায় হৃদয়ের তলে,
পাছে লোকে কিছু বলে।

* * *

মহৎ উদ্দেশ্যে যবে,
এক সাথে মিলে সবে,
পারি না মিলিতে সেই দলে,
পাছে লোকে কিছু বলে।
বিধাতা দেছেন প্রাণ,
থাকি সদা ম্রিয়মাণ,
শক্তি মরে ভীতির কবলে,
পাছে লোকে কিছু বলে।"

এই কবিতাটি যেন শিক্ষিতা রমণীদিগের উন্নত হৃদয়ের অতি মনোরম একখানি ছবি। পুরুষেরা শিক্ষালাভ করিয়া পরোপকার এবং দেশের কাজ করিয়া যেমন জীবন ধন্য করিতে চাহেন, শিক্ষার গুণে নারীহৃদয়েও সেই মহৎ আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু পুরুষদিগের মত তাঁহাদের কাজের সুবিধা কোথায়? "পাছে লোকে কিছু

বলে” এই ভয়েই তাঁহারা দেশের কার্য্যক্ষেত্রে বিপুল জন-সঙ্ঘের সহিত মিশিতে পারেন না; সেইজন্য তাঁহাদের কোন কাজ করিবারও সুবিধা হয় না। জলবুদ্বুদের ন্যায় তাঁহাদের মনের উচ্চ আশা মনে উঠিয়া, মনের মধ্যে লয় হয়; তাঁহাদের শক্তি “ভীতির কবলে”ই বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

গ্রন্থকর্ত্রী ইহাতে মর্ম্মপীড়িত হইয়া ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন:—

“ওহে দেব, ভেঙ্গে দাও ভীতির শৃঙ্খল,
ছিঁড়ে দাও লাজের বন্ধন,
সমুদয় আপনারে দিই একেবারে
জগতের পায়ে বিসর্জ্জন।”

কি উন্নত কামনা! কি উচ্চ প্রার্থনা! পড়িতে পড়িতে মন উন্নত হইয়া উঠে! বিধাতা যেদিন নারী-হৃদয়ের এই পবিত্র প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন, সেদিন আমাদের দেশও উন্নত হইয়া উঠিবে।

অতঃপর জন্মভূমির বিদুষী কন্যা জননী জন্মভূমিকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন:—

“যেই দিন ওচরণে ডালি দিনু এ জীবন
হাসি, অশ্রু সেই দিন করিয়াছি বিসর্জ্জন।
হাসিবার কাঁদিবার অবসর নাহি আর,
দুঃখিনী জনমভূমি—মা আমার, মা আমার।
* * *
মরিব তোমারি কাজে, বাঁচিব তোমারি তরে,
নহিলে বিষাদময় এ জীবন কেবা ধরে?
যতদিনে না ঘুচিবে তোমার কলঙ্ক ভার,
থাক্ প্রাণ, যা'ক প্রাণ,—মা আমার, মা আমার।”

বর্ত্তমান জাতীয় উত্থানের দিনে এই সুমধুর কবিতা কয়েক পংক্তি প্রত্যেকের চোখের সাম্‌নেই উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিয়া রাখা উচিত।

সর্ব্বশেষে গ্রন্থকর্ত্রীর “চাহিবে না ফিরে?” শীর্ষক অপূর্ব্ব কবিতাটি হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিব। এই সংসারের সঙ্কটময় কণ্টকাকীর্ণ পথে চলিতে চলিতে যে সকল দুর্ভাগ্য পুরুষ ও দুর্ভাগিনী নারীর পদস্খলন হয়, লোকে তাহাদিগকে পতিত মানব ও পতিতা নারী বলিয়া ঘৃণা করে; কিন্তু হায়, এই বিশ্বসংসারে তাহাদের দুঃখের কথা কেহই ভাবে না। শত সহস্র মানবের মধ্যে একটি লোকের হৃদয়ও তাহাদের ব্যথা অনুভব করে না! প্রতিদিন কত শত বোবার জ্বালাময় হৃদয় হইতে কত অব্যক্ত যন্ত্রণার ধ্বনি উত্থিত হইতেছে; কিন্তু তাহা কে বুঝিবে? কে তাহার জন্য একবিন্দু অশ্রু ত্যাগ করিবে? সেইরূপ পতিত মানব ও পতিতা নারীদিগের হৃদয়ের জ্বালাও কেহ বুঝে না—কেহই তাহাদের জন্য একবিন্দু অশ্রু ত্যাগ করে না। কিন্তু আমাদের “আলো ও ছায়া”-রচয়িত্রী নারী; প্রেম, করুণা ও সহানুভূতিতেই নারীর শ্রেষ্ঠত্ব। তাই হতভাগ্য পতিত মানব ও হতভাগিনী নারীর দুঃখে গ্রন্থকর্ত্রীর প্রাণ কাঁদিয়া উঠিয়াছে, তাঁহার নারীহৃদয়ে করুণা ও সহানুভূতির উদয় হইয়াছে। সেইজন্য তিনি বলিতেছেন:—

“পতিত মানব তরে নাহি কি গো এ সংসারে
একটী ব্যথিত প্রাণ, দুটি অশ্রুধার?
পথে পড়ে' অসহায়, পদে তারে দলে' যায়
দু'খানি স্নেহের কর নাহি বাড়াবার?
সত্য, দোষে আপনার চরণ স্খলিত তার;
তাই তোমাদের পদ উঠিবে ও শিরে?
তাই তার আর্ত্তরবে সকলে বধির হবে
যে যাহার চলে যাবে—চাহিবে না ফিরে?
বর্ত্তিকা লইয়া হাতে চলেছিল এক সাথে,
পথে নিবে গেছে আলো, পড়িয়াছে তাই;
তোমরা কি দয়া করে' তুলিবে না হাত ধরে
অর্দ্ধদণ্ড তার লাগি থামিবে না, ভাই?”

এই হৃদয়াদ্রকারী কবিতাটিতে গ্রন্থকর্ত্রীর উৎকৃষ্ট কাব্যখানি অত্যন্ত মূল্যবান হইয়া উঠিয়াছে।

“আলো ও ছায়া” রচনার পর গ্রন্থকর্ত্রী নির্ম্মাল্য শীর্ষক একখানি কাব্য রচনা করিয়াছেন। কাব্যখানি অতিশয় ক্ষুদ্র। কিন্তু ক্ষুদ্র একটি বেলফুলের ছোট ছোট দলগুলি যেমন সৌরভে ও সুষমায় রমণীয় হইয়া উঠে, তেমনি এই ক্ষুদ্র কাব্যের কয়েকটি ছোট ছোট কবিতা ভাবের সৌন্দর্য্যে ও ভাষার মাধুর্য্যে অতিশয় মনোহর হইয়া উঠিয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কয়েকটি সুমিষ্ট কবিতার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতে ইচ্ছা হইতেছে। কিন্তু প্রবন্ধটি অতিশয় দীর্ঘ হইবার ভয়ে সে ইচ্ছা ত্যাগ করিতে হইল। তবে দু একটী

কবিতা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিবার প্রলোভনও ছাড়িতে পারিতেছি না। গ্রন্থকর্ত্রীর "সুলভ" শীর্ষক কবিতাটি কি সুন্দর! উহার সর্ব্বশেষের শ্লোকটি এইঃ—

"সুলভ সমীর, রবি-চন্দ্রমা-কিরণ,
কি সুলভ বিধাতার প্রেমের সমান,
যে হবে দুর্লভ হয়ে হোক মূল্যবান্,
আশীর্ব্বাদ কর, হো'ক সুলভ এ জন।"

এ সংসারে অধিকাংশ মানুষই আপন আপন শক্তি-প্রভাবে জগতের নিকট দুর্লভ হইয়া উঠিতে চায়। কিন্তু গ্রন্থকর্ত্রীর মানবের প্রতি সহানুভূতি কি প্রবল! তিনি সকলের পক্ষে সুলভ হইয়াই থাকিতে চাহেন।

গ্রন্থকর্ত্রী কবিত্ব এবং দিব্য কল্পনা শক্তি লাভ করিয়াও কেবল ভাবের উচ্ছ্বাসে সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন না। জগতের কাজের জন্য তাঁহার প্রাণ এরূপ ব্যাকুল যে তিনি তাঁহার "আকাঙ্ক্ষা" শীর্ষক কবিতায় বলিতেছেন ঃ—

"বিনা কাজে দিন আসে যায়।
যাই করি কিছু যেন করি,
স্বপন না ভাল লাগে আর,
সাধিয়া একটি ক্ষুদ্র ব্রত
সাঙ্গ হো'ক জীবন আমার।"

আমরা নির্ম্মাল্য হইতে আর একটি কবিতা উদ্ধৃত করিব। আজ কাল যে সমস্ত লোক বর্ত্তমানকে অগ্রাহ্য করিয়া একমাত্র অতীত প্রাচীনের দিকেই ফিরিয়া যাইতে চাহেন, কবি তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন ঃ—

"ভুলে ওরা বর্ত্তমান গাহে অতীতের গান
আঁখি দুটি পিছু পানে চায়,
চরাচর অগ্রসর হইতেছে নিরন্তর
সে কথা কেবলি ভুলে যায়!
ক্ষুদ্র রেখাটির মত থেকে যাবে অল্লায়ত
মৃদু গতি, অতি অগভীর।
বহুল সরিতে মিশে জানে না হইবে কিসে
মহানদ বিশাল শরীর।
জানে না যে কি নীরধি সম্মুখেতে নিরবধি
বক্ষপাতি সকলেরে লয়,
সঙ্কীর্ণ স্বাতন্ত্র্য তরে এরা যে শুকায়ে মরে,
কিবা অর্দ্ধ পথে পড়ে রয়!

এই কবিতাটি ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু ইহার শক্তি সামান্য নয়। যে সকল ব্যক্তি একমাত্র অতীতের মায়ায় অন্ধ, আমরা আশা করি এই ক্ষুদ্র কবিতার প্রভাবে তাঁহাদের দৃষ্টিশক্তি কিঞ্চিৎ উন্মেষিত হইবে। গ্রন্থকর্ত্রীর চিন্তাশক্তির এই এক আশ্চর্য্য গুণ যে, তিনি এক একটি গভীর ভাব, অকাট্য সত্য মনের মধ্যে পরিষ্কার ধারণা করেন, এবং তাহা অতি অল্প কথায় খুব সুন্দর ভাবে প্রকাশ করেন।

নির্ম্মাল্যের পর গ্রন্থকর্ত্রীর "পৌরাণিকী" শীর্ষক ক্ষুদ্র একখানি কাব্য প্রকাশিত হইয়াছে। উহার মধ্যে "একলব্য" নাটকখানি উল্লেখযোগ্য। তরুণবয়স্ক পাঠকদিগের নিকট ইহার আদর নিতান্ত অল্প নহে। অনেক স্থানের বালকগণ আগ্রহের সহিত ইহার অভিনয় করিয়া থাকে।

গ্রন্থকর্ত্রী সম্প্রতি "গুঞ্জন" নামে একখানি শিশুরঞ্জন কাব্য প্রকাশ করিয়াছেন। এই গ্রন্থের ছবিগুলি অতি উৎকৃষ্ট; কিন্তু ছবি অপেক্ষাও কবিতাগুলি অতিশয় মনোহর। এই কবিতার মধ্যে কবির প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। অনেকের বিশ্বাস ছেলেদের জন্য সুমিষ্ট ভাষায় সুললিত ছন্দে কবিতা লিখিতে পারিলেই উত্তম শিশুপাঠ্য গ্রন্থ রচিত হয়। সে কথা ঠিক্ নহে। তাহার মধ্যে কবিত্ব থাকা চাই। আমাদের গ্রাম্য ছড়াগুলি ছেলেদের এত প্রিয় জিনিস কেন? উহার কোন শৃঙ্খলা নাই বটে, কিন্তু উহার যাহা আছে, তাহাকেই যথার্থ কবিত্ব বলা যাইতে পারে। কই, এত ত কবি রহিয়াছেন, একটি শৃঙ্খলাবিহীন উৎকৃষ্ট ছড়া রচনা করুন দেখি। তাহা পারা বড় মুস্কিল। ঐ অসম্ভব ছড়াগুলি আবৃত্তি করিতে করিতে শিশুদিগের মনে যে একটি জিজ্ঞাসা, একটি কল্পনা, একটি উদাস ভাব জাগিয়া উঠে, তাহাই যথার্থ সাহিত্যের কাজ বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে। সুতরাং গ্রাম্য ছড়ার উদাস ভাবটুকু, অব্যক্ত সৌন্দর্য্যটুকু যিনি ছেলেদের কবিতার মধ্যে পরিস্ফুট করিয়া তুলিতে পারেন, তিনিই ছেলেদের কবিতা রচনায় প্রশংসা পাইবার যোগ্য। "আলো ও ছায়া"-রচয়িত্রী গুঞ্জনের কয়েকটি কবিতায় গ্রাম্য ছড়ার সৌন্দর্য্যটুকু পরিস্ফুট করিয়া তুলিতে পারিয়াছেন;

সে জন্য সেই কবিতাগুলি অতিশয় মনোরম বলিয়া মনে হইয়াছে।

শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত।

চিত্রের কথা।

বর্ত্তমান সংখ্যার চিত্রগুলিমধ্যে "বাবা আস্‌ছে বাড়ী" নামে একটী গার্হস্থ্য চিত্র প্রকাশিত হইল। আমাদের দেশে স্বভাব-চিত্র ও গার্হস্থ্য-চিত্রের যথোচিত আদর নাই। কিন্তু ইউরোপে গার্হস্থ্য চিত্রের অত্যন্ত আদর। মনোবৃত্তির বিকাশের পক্ষে এগুলির প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত অধিক। এই প্রকার চিত্র অঙ্কন করা অত্যন্ত কঠিন। আশা করি আমাদের দেশীয় চিত্রকরগণও ক্রমে এদেশের সাজপোষাকে স্বদেশী গার্হস্থ্য চিত্র অঙ্কনে মনোযোগী হইবেন।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

৩০শে আশ্বিন—বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসে ৩০শে আশ্বিন এখন এক জাতীয় পর্ব্ব দিনে পরিণত হইতে চলিল। এবারও এই দিনে বঙ্গদেশের প্রায় সর্ব্বত্র বঙ্গব্যবচ্ছেদের প্রতিবাদের জন্য প্রতিবাদ সভার অধিবেশন হইয়াছিল। বহুগৃহে সেদিন রন্ধন হয় নাই। বাঙ্গালীজাতির মধ্যে জাতীয় ভাব বর্দ্ধনের জন্য পরস্পরের হস্তে রাখিবন্ধন করা হইয়াছিল। কলিকাতায় এই পর্ব্বানুষ্ঠানে এবৎসর অন্যান্য বৎসর অপেক্ষাও উৎসাহ ও নিষ্ঠা দেখা গিয়াছিল। রাত্রি প্রভাতের পূর্ব্বেই দলে দলে কীর্ত্তন-দল পথে পথে পল্লীতে পল্লীতে দেশমাতার বন্দনাগীতি গান করিয়া কলিকাতা-বাসীকে উদ্‌বুদ্ধ করিতে আরম্ভ করেন। কলিকাতা ও হাওড়ার গঙ্গার ঘাটে বহুসহস্র হিন্দু গঙ্গাস্নান করিয়াছিলেন। হিন্দু মুসলমান সকলেই পরস্পরকে পরম প্রীতির সহিত আলিঙ্গন ও পরস্পরের হস্তে রাখিবন্ধন করিয়াছিলেন। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলে যেরূপ আনন্দ ও উৎসাহের সহিত এই জাতীয় অনুষ্ঠানে যোগ দিয়াছিলেন তাহাতে অতি নিরাশ প্রাণেও আশার সঞ্চার হইয়াছে।

সহরের দোকান পাট অধিংকাশই সে দিন বন্ধ ছিল। বাজারের সামান্য তরিতরকারী-বিক্রেতাগণ ও মৎস্য-জীবীগণ পর্য্যন্ত যথেষ্ট ক্ষতি স্বীকার করিয়া সে দিনের জন্য ব্যবসায় বন্ধ রাখিয়াছিল।

অপরাহ্নে বঙ্গের জাতীয় মিলন-মন্দিরের ভূমিতে এক বিরাট সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সহরের ভিন্ন ভিন্ন দিক হইতে দলে দলে কীর্ত্তন করিতে করিতে সহরবাসীগণ যখন সভাস্থলে উপস্থিত হইতেছিলেন তখন সে দৃশ্য অতি অপূর্ব্ব বোধ হইয়াছিল। সেই বিস্তীর্ণ সভাস্থলে লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল। অনেকে অনুমান করেন ত্রিশ চল্লিশ সহস্র লোক সেখানে সম্মিলিত হইয়াছিলেন। বস্তুতঃ তৎকালে সভাস্থল যেন তরঙ্গায়িত বিশাল জনপ্রবাহের ন্যায় প্রতীয়মান হইয়াছিল। অমৃত-বাজার পত্রিকা-সম্পাদক শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ সভাপতিপদে বৃত হইয়াছিলেন। সভাস্থলে সভাপতির বক্তৃতা ব্যতীত আর কোন দীর্ঘ বক্তৃতা হয় হয় নাই। বক্তাগণ শুধু প্রস্তাব উত্থাপন ও সমর্থন করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন। বঙ্গ ব্যবচ্ছেদ ও কলিকাতার সাধারণ উদ্যানগুলিতে সভাসমিতির অধিবেশন বন্ধ করিবার আদেশের বিরুদ্ধে প্রস্তাব গৃহীত হইলে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় মহাশয় প্রথম বঙ্গব্যবচ্ছেদ দিনে স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসু মহাশয়ের রচিত বঙ্গীয় জনসাধারণের সংকল্প-জ্ঞাপক ঘোষণাপত্র পাঠ করেন এবং সমবেত ত্রিশ চল্লিশ সহস্র লোক সমস্বরে স্বদেশীব্রত পুনঃ গ্রহণ করেন।

এইরূপে বঙ্গব্যবচ্ছেদের তৃতীয় সাম্বৎসরিক অনুষ্ঠান-কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছে। এই দৃশ্য দেখিয়া কে আর অস্বীকার করিতে পারে, যে বঙ্গব্যবচ্ছেদ বাঙ্গালীর জীবনে নব শক্তির সঞ্চার করিয়াছে! লর্ড কার্জ্জন বাঙ্গালীজাতিকে দ্বিখণ্ডে বিভক্ত করিয়া যে উদ্দেশ্য সাধন করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত ফল উৎপন্ন হইল। ভগবানের লীলাই এইরূপ।

কলিকাতা, ২৫ নং রামবাগান ষ্ট্রীট, ভারতমিহির যন্ত্রে সান্যাল এণ্ড কোম্পানী দ্বারা মুদ্রিত।

কুমারী ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল।

ভারত-মহিলা

The woman's cause is man's; they rise or sink
Together, dwarfed or God-like, bond or free;
If she be small, slight-natured, miserable,
How shall men grow?

Tennyson.

৩য় ভাগ। | অগ্রহায়ণ, ১৩১৪। | ৮ম সংখ্যা।

পাশ্চাত্য জগতে নারীশক্তি।

বর্ত্তমান যুগের জ্ঞান বিজ্ঞান পৃথিবীর জনসমাজে নানা প্রকারে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে। প্রাচীন কালে আপনার ধনৈশ্বর্য্য, রুচি ও ধর্ম্মাদি লইয়া জাতিসমূহ অপেক্ষাকৃত অন্যনিরপেক্ষ হইয়া নিশ্চিন্ত ও নিরুপদ্রবে বাস করিতে পারিত। ধনলুব্ধ অত্যাচারীগণ দেশ বা জাতিবিশেষের উপর যে উপদ্রব করিত তাহা ক্ষণস্থায়ী ও সাময়িক মাত্র ছিল। ভারতবর্ষ, চীন, মিশর প্রভৃতি স্বাধীন ও ঐশ্বর্য্যশালী দেশগুলি প্রাচীন কালে বহু পরিমাণে জগতের অন্যান্য জাতি ও দেশের সহিত সম্পর্কশূন্য থাকিয়া আপনার ভাবে আপনি কার্য্য করিত। কিন্তু বর্ত্তমান যুগের জ্ঞান বিজ্ঞান ও সভ্যতা কোন জাতিকে আর সে ভাবে থাকিতে দিতেছে না। তুমি ইচ্ছা কর আর না কর, তোমাকে জগতের সঙ্গে চলিতেই হইবে, সম্বন্ধ রাখিতেই হইবে। চলিতে না পার, পতন ও মৃত্যু তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ চীন দেশের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। চীনের ন্যায় প্রাচীন, রক্ষণশীল, স্বাধীন দেশ যত দিন এই দ্রুতগামী সভ্যতার আহ্বান অবহেলা করিতেছিল তাহার দেহ ততই বিদেশীগণ কর্ত্তৃক খণ্ডবিখণ্ড হইতেছিল। নূতন সভ্যতা যেন তাহার দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিল, 'হয় আমাকে গ্রহণ কর, নতুবা আমার উপাসকদিগের হস্তে আত্মবলিদান কর।' রক্ষণশীল চীনের পক্ষে এই আহ্বানে কর্ণপাত করা কি কঠিন ব্যাপার! কিন্তু চীন প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করিয়া আত্মরক্ষার জন্য নব সভ্যতাকে বরণ করিয়া লইল। তাই আজ চীনের রক্ষা পাইবার সম্ভাবনা হইয়াছে। তাই আজ চীনের নব জাগরণের সূচনা দেখা যাইতেছে। এসিয়ার অন্যান্য স্বাধীন দেশেও নব সভ্যতার এই আহ্বান পৌঁছিয়াছে। যে কর্ণপাত করিতেছে তাহারই রক্ষা পাইবার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। ভারত পরাধীন, কিন্তু চিরদিন পরাধীনতা বিধাতা কাহারও অদৃষ্টে লেখেন নাই। তাই নব সভ্যতা তাহার দ্বারে উপস্থিত হইয়া বলিতেছে, 'যদি জাগিতে চাও, যদি উঠিতে ইচ্ছা কর, তবে আমাকে বরণ কর, নতুবা চিরকালের তরে বিনাশ প্রাপ্ত হইতে প্রস্তুত হও।' ভারত সে আহ্বানে কর্ণপাত করিয়াছে, তাই আজ সমগ্র ভারতে নব জীবনের স্পন্দন অনুভূত হইতেছে। কিন্তু এই নব সভ্যতাকে পূর্ণাঙ্গ ভাবে গ্রহণ করা সুকঠিন ব্যাপার। ইহাকে গ্রহণ করিতে হইলে কত যুগ-যুগান্তরের প্রচলিত রীতি-নীতিকে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্জ্জিত করিতে হয় তাহার ইয়ত্তা নাই।

নারীজাতিকে তাঁহাদের ন্যায্য অধিকার প্রদান এই নব সভ্যতার এক প্রধান অঙ্গ। প্রচলিত রীতি-নীতি যাহাই

থাকুক, যদি পৃথিবীতে একটী জাতিরূপে দণ্ডায়মান হইতে ইচ্ছা কর, বিভিন্ন জাতির ঘাত প্রতিঘাতে যদি আপনার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইতে দিতে না চাও, তবে নারীজাতিকে তাঁহাদিগের প্রাপ্য ন্যায্য অধিকার দিতেই হইবে। প্রাচ্য দেশগুলিতে এক সময়ে যদিও নারীজাতির উচ্চ সম্মান ও অধিকার ছিল, কিন্তু কালক্রমে এসিয়া মহাদেশে তাঁহাদের অবস্থা অতি হীন হইয়া পড়িয়াছে। ইউরোপ এবং আমেরিকায়ও নারীজাতির অবস্থা আশানুরূপ উন্নত নহে। কিন্তু অনেক দেশেই নারীশক্তি বিকাশের জন্য এখন প্রবল চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে।

সুখের বিষয়, অধিকাংশ স্থলে পুরুষগণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই নারীজাতিকে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে সাহায্য করিতেছেন। কারণ, তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছেন, নারীগণ উন্নত না হইলে পুরুষদের উন্নতিও পূর্ণাঙ্গ হইতে পারে না, এবং নারীগণ পশ্চাতে পড়িয়া থাকিলে অপেক্ষাকৃত উন্নত ও শক্তিশালী জাতিসমূহের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় স্বদেশের পরাজয় অনিবার্য্য। এই জন্য জাপান শুধু পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান গ্রহণ করিয়াই বিরত থাকে নাই, জাপানের নারীগণকেও উন্নত করিয়া তুলিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে। অল্প দিনের মধ্যে জাপানীগণ তাহাদের নারীগণ সংখ্যানুপাতে প্রায় পুরুষদিগের সমান শিক্ষা প্রদান করিয়াছে। চীনে নারীজাতির অবস্থা অতি হীন ছিল। কিন্তু পৃথিবীর গতি বুঝিতে পারিয়া চীনও এখন নারীজাতির উন্নতি সাধনে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। দুঃখের বিষয়, ভারতবাসী এখনও এ বিষয়ে তেমন মনোযোগী হন নাই, এ বিষয়ের গুরুত্ব এখনও তেমন ভাবে তাঁহারা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। পুরুষগণ নারীগণের উন্নতি সাধনে যখন উদাসীন, নারীদিগের উন্নতির উপর তাঁহাদিগের উন্নতি কি পরিমাণে নির্ভর করিতেছে তাঁহারা যখন তাহা ভালরূপে বুঝিতে পারিতেছেন না, তখন আত্মোন্নতির জন্য এ দেশের নারীগণকেই সর্ব্ব প্রযত্নে চেষ্টা করিতে হইবে। আপনাদের জীবনের উন্নতি ও শক্তির বিকাশের জন্য আমরা প্রত্যেকেই ঈশ্বরের নিকট দায়ী, স্বদেশের নিকট দায়ী। পুরুষগণ আমাদিগকে সাহায্য করিতেছেন না, এই কারণে ঈশ্বরের নিকট ও জননী জন্মভূমির নিকট আমরা কিছুতেই ক্ষমার্হ হইব না। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে দেখিতে পাইতেছি, নারীগণ পুরুষগণের সহিত তুল্য রাজনৈতিক অধিকার লাভের জন্য প্রবল সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আমাদিগের পক্ষে সেরূপ কোন সংগ্রামের প্রয়োজন উপস্থিত হয় নাই, কারণ এ দেশের পুরুষগণেরও কোন মূল্যবান্ রাজনৈতিক অধিকার নাই। অন্যান্য বিষয়েও পুরুষগণের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে এ দেশের নারীগণের পক্ষে বরং বাধা অল্প। কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বিতা ব্যতীতও ভারত-নারীর আত্মোন্নতি, আত্মশক্তি বিকাশের বিস্তৃত ক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে। পাশ্চাত্য নারীগণ এই শ্রেণীর বহু কার্য্যে আমাদের আদর্শস্থানীয়া। এই প্রবন্ধে আমরা তাঁহাদিগের কার্য্যপ্রণালীর কিঞ্চিৎ বিবরণ সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিতেছি। দেশ, কাল ও অবস্থা ভেদে কার্য্যেরও পার্থক্য ঘটিবে সন্দেহ নাই, কিন্তু এ দেশের নারীগণ সম্মিলিত শক্তি প্রভাবে যে নারীজাতির শক্তি বিকাশ ও দেশের উপকার সাধনে যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারেন পাশ্চাত্য মহিলাগণের কার্য্যকলাপ আলোচনা করিলে তাহা সহজেই বোধগম্য হইবে।

জনৈক ইংরাজ-মহিলা লিখিয়াছেনঃ—ইউরোপে পরার্থে জীবন নিয়োগ করিবার আদর্শ নারীজাতির পরসেবা ব্রতে দীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, বলিলে অত্যুক্তি হয় না। অনেকে মনে করেন, সভ্যতার শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই পরসেবার ভাবও পাশ্চাত্য দেশে পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে। তাঁহারা মনে করেন, সভ্যতা যেন বন্য বৃক্ষের ন্যায় মনুষ্য-সাহায্য-নিরপেক্ষ হইয়া আপনা আপনি বৃদ্ধি পায়। কেহ কেহ বলেন, খৃষ্টধর্ম্মের প্রভাবেই খৃষ্টান দেশে পরসেবার ভাব বর্দ্ধিত হইয়াছে। কিন্তু খৃষ্টধর্ম্মের প্রভাবেই যদি এই ভাব পরিপুষ্টি লাভ করিত তাহা হইলে খৃষ্টধর্ম্মের অভ্যুদয়ের পর প্রায় দুই সহস্র বৎসর এই ভাব অবিকশিত থাকিত না। নারীজাতিই পাশ্চাত্য জগতে নিঃস্বার্থ পরসেবা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তিনি বলেন, প্রাচীন কালে ইউরোপে লোকহিতকর বহু কার্য্য অনুষ্ঠিত হইত বটে, কিন্তু সে সকল কার্য্যে ও বর্ত্তমান লোকহিতকর কার্য্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ। সে কালেও লোকে মঠ, বিদ্যামন্দির ও চিকিৎসালয় প্রভৃতি নির্ম্মাণ করাইত, কিন্তু

তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য থাকিত পুণ্য-সঞ্চয়,—যাহাদিগের জন্য এই সকল লোকহিতকর কার্য্য অনুষ্ঠিত হইত, তাহাদিগের প্রার্থনা পরকালে দাতার মুক্তি সুলভ করিবে—এই ধারণা। কিন্তু প্রাচীন রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্মের প্রতি যখন লোকের বিশ্বাস কমিতে লাগিল এবং জ্ঞানপ্রধান প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্ম আধিপত্য লাভ করিতে লাগিল তখন লোকের উক্ত ধারণা ও বিশ্বাস ক্রমেই দূরীভূত হইতে লাগিল, এবং পরোপকারাকাঙ্ক্ষাও কমিতে লাগিল। এমন কি অষ্টাবিংশ শতাব্দীতে দুঃখ কষ্ট নিম্নশ্রেণীর লোকের স্বাভাবিক অবস্থা, এবং তাহা দূর করিবার চেষ্টা বিধাতার বিরুদ্ধাচরণ বলিয়াই বিবেচিত হইত। বস্তুতঃ উন্নত বিংশ শতাব্দীর এই উষাকালে দণ্ডায়মান হইয়া অষ্টাবিংশ শতাব্দীর কারাগার, দরিদ্র-নিবাস, হাঁসপাতাল প্রভৃতির বিভীষিকাপূর্ণ অবস্থার বিষয় চিন্তা করিলে মনে হয়, কিরূপে মানুষ এই সকল অবস্থা দেখিয়াও সেকালে নিরুদ্বেগে বাস করিত? উনবিংশ শতাব্দীতে মধ্যে মধ্যে কতিপয় পরহিতৈষী ব্যক্তির অভ্যুদয় দেখিতে পাওয়া যায়। ইঁহাদের অধিকাংশই নির্ভীকপ্রকৃতি হৃদয়বতী নারী। কত নিন্দা কুৎসা, সাধারণের নিরুৎসাহ, এবং বিরুদ্ধ ভাবের মধ্যে ইঁহাদিগকে কাজ করিতে হইয়াছিল, ভাবিলে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইতে হয়।

ইংলণ্ডের কারা সংস্কারের প্রথম আন্দোলনকারিণী জনৈক নারী—শ্রীমতী এলিজাবেথ ফ্রাই। অসহায় শ্রমজীবি সন্তানগণের ক্রন্দনে প্রথম কর্ণপাত করেন এক জন নারী—শ্রীমতী এলিজাবেথ ব্যারেট। আমেরিকার শ্রীমতী ডরথিয়া ডিক্স দরিদ্র-নিবাসের অবস্থা ও উন্মাদদিগের পাশবিক চিকিৎসা-প্রণালীর উন্নতির প্রতি সাধারণের দৃষ্টি প্রথম আকর্ষণ করেন। আমেরিকার দাসত্ব-প্রথা দূরীকরণের অন্ততঃ অর্দ্ধেক গৌরব সে দেশের নারীগণের প্রাপ্য।

গত রুষ-জাপান যুদ্ধে "রেড্ ক্রস সোসাইটী" নামক সেবিকা সম্প্রদায়ের অদ্ভুত কার্য্যপ্রণালীর বিষয় এদেশের অনেকেই সংবাদপত্রে পাঠ করিয়াছেন। কুমারী ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল নাম্নী একটী মহিলার শক্তি ও প্রতিভাই এই মহোপকারী ও শক্তিশালী সম্প্রদায়ের জনয়িত্রী।

পাশ্চাত্য নারী যখনই জ্ঞানালোক লাভ করিয়া প্রথম অনুভব করিলেন, তিনি শুধু পুরুষের ক্রীড়াপুত্তলি নহেন, শুধুই দাসী নহেন, তখনই আপনার মনুষ্যত্ব ও মাতৃত্ব স্মরণ করিয়া তিনি পৃথিবীর জনসঙ্ঘের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন; কাহাকে তাঁহার সাহায্য করিবার শক্তি আছে, ভাবিতে লাগিলেন। দেখিতে পাইলেন, জগত দুঃখপূর্ণ, গৃহে গৃহে রোগশোকের ক্রন্দন, গৃহে গৃহে অভাব ও দুঃখ। আর দেখিলেন, দুঃখী ও আর্ত্তের সেবার জন্য অতি অল্প লোকই অগ্রসর। তখন তিনি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার কার্য্যক্ষমতা ও মাতৃহৃদয় লইয়া তিনি মানবজাতির পবিত্র সেবা-কার্য্যে বঞ্চিত থাকিবেন কেন? প্রাচীন কালে উচ্চপদস্থ দু একটী সম্ভ্রান্ত মহিলা মাত্র আপনার ধন সম্পদের সাহায্যে লোকসেবায় সহায়তা করিতেন, অথবা উচ্চ ধর্ম্মভাবপ্রণোদিত হইয়া পবিত্র সেবাব্রতে দীক্ষিত হইতেন; কিন্তু এখন পাশ্চাত্য দেশে গৃহে গৃহে নারীগণ অনুভব করিতেছেন,—ভগবৎপ্রদত্ত মাতৃশক্তির কার্য্য শুধু গৃহের চতুর্প্রাচীরের মধ্যেই আবদ্ধ থাকিবে না, কিন্তু নারীজন্ম লাভ করিয়া আপনার জন্মগত বিশেষত্ব বলে স্ত্রীজাতি বিশ্ব জগতের সেবিকা।

পাশ্চাত্য নারীর এই নব অনুভূতি কার্য্যে পরিণত করিবার পক্ষে পুরুষজাতি অল্প বাধা প্রদান করে নাই। পাশ্চাত্য দেশসমূহে স্বাধীনতা, ন্যায়, বিজয়লক্ষ্মী, শিল্পকলা, বাণিজ্য, বিশ্বাস, দয়া প্রভৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা নারী আকারে কল্পিত। যাবতীয় উচ্চভাবে ভূষিত করিয়া শিল্পীগণ এই সকল দেবমূর্ত্তি গঠন করিয়াছেন। কিন্তু কল্পিত নারী-মূর্ত্তিতে দেব ভাব, দৃঢ় সংকল্প দেখিতে অভিলাষী বলিয়াই পুরুষজাতি প্রাকৃত নারীতেও এই সকল সদ্গুণ দেখিতে অভিলাষী, এরূপ মনে করা ভ্রম। শিক্ষকদিগের মহাসম্মিলনীতে শিক্ষাকার্য্যে নিযুক্তা একজন মহিলা—কুমারী সুসান এণ্টনি—যখন প্রথম শিক্ষাসম্বন্ধে আপনার অভিজ্ঞতা বিষয়ে বক্তৃতা করেন তখন পুরুষ-মহলে মহা হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছিল। পুরুষগণ তখন আশঙ্কা করিয়াছিলেন, একটী সম্ভ্রান্ত মহিলাকে এইরূপ প্রকাশ্য বক্তৃতা করিতে দিলে সামাজিক পবিত্রতা বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা। শিল্পকলায় কল্পিত নারীদেবতার দেবোচিত গুণাবলী দেখিতে চাওয়া সহজ, কিন্তু স্বাভাবিক নারীতে সেই সকল গুণের বাস্তব বিকাশ

দেখিলে সকল দেশের পুরুষগণই ভীত হইয়া পড়েন। কিন্তু কুমারী সুসান এণ্টনির নির্ভীকতাই পাশ্চাত্য দেশে নারীর কার্য্যশক্তির দ্বার প্রথম উদ্ঘাটন করিয়াছিল। নারী-শক্তি বিকাশের পথে সে সময়ের পুরুষগণ যে কিরূপ বিরুদ্ধাচরণ করিতেন আধুনিক মহিলাগণের পক্ষে তাহা কল্পনা করাও কঠিন।

১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার একটী ক্ষুদ্র সহরে নারীদিগের প্রথম সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সমিতির নাম "উয়িমেন্স খৃষ্টিয়ান টেম্পারেন্স ইউনিয়ন।" প্রথমে মদ্যপান নিবারণই এই সভার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু ক্রমে ক্রমে আরও বিবিধ সামাজিক সংস্কার ইহার উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। এই সমিতির শক্তি-প্রভাবে প্রথমে আমেরিকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের এবং শেষে যুক্তরাজ্যের গবর্ণমেণ্ট, বিদ্যালয়ে মিতাচার বিষয়ক পুস্তক পাঠ্য নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। এই সকল পুস্তক এই নারী-সমিতির সভ্যগণ কর্ত্তৃক লিখিত।

অভিজ্ঞতা দ্বারা সমিতির মহিলাগণ বুঝিতে পারিয়াছেন, মদ্যবিক্রয় রাজস্ব বৃদ্ধির একটী প্রধান উপায় হওয়াতে মদ্যবিক্রয় বিষয়ক আইন প্রণয়নে হস্তক্ষেপ করিতে না পারিলে মদ্যপান নিবারণে আশানুরূপ সফলতা লাভ করা কঠিন। এই জন্য বাধ্য হইয়া তাঁহাদিগকে রাজনৈতিক আন্দোলনেও প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছে। রাজবিধি প্রণয়নে অধিকার লাভের জন্যও ইঁহারা এখন চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছেন। ইংলণ্ড ও আমেরিকার রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে সকল মহিলা পুরুষের তুল্য অধিকার দাবী করিতেছেন তাঁহারা এখন "সাফ্রেজিষ্ট" নামে অভিহিত হইতেছেন; ইঁহারা সকলেই পূর্ব্বোক্ত মদ্যপান-নিবারিণী নারী-সমিতির সভ্য।

এখন পৃথিবীর প্রায় পঞ্চাশটী দেশে এই বিশাল নারী-সমিতির শাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং ইংলণ্ড ও আমেরিকায় এই সমিতি সমাজও রাজনীতি উভয় ক্ষেত্রেই বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছে। সহস্র সহস্র পুস্তক পুস্তিকা প্রচার এবং বক্তৃতা দ্বারা সমিতি সর্ব্বত্র মদ্যপানের বিরুদ্ধে লোকের অভিমত গঠিত করিতেছে।

শ্বেতসূত্র নির্ম্মিত একটী ধনুক এই সমিতির সভ্যগণের পোষাকে অঙ্কিত। "ঈশ্বর, গৃহ এবং সকল দেশের সেবা" এই সমিতির উদ্দেশ্য। ঠিক মধ্যাহ্ন কাল উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত সভ্যগণের প্রার্থনার সময়।

নারীজাতির দ্বিতীয় বৃহৎ সমিতির নাম "ইণ্টারন্যাশনাল কাউন্সিল অব উয়িমেন।" ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে যুক্তরাজ্যের রাজধানী ওয়াসিংটন নগরে এই সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ইংলণ্ডের শ্রীমতী ফসেট ইহার সভানেত্রী মনোনীত হন। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে যে সকল মহিলা সমিতি আছে সে সকলের মধ্যে একতা ও সম্প্রীতি স্থাপন এবং পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের নারীগণের একত্র সম্মিলন, এবং সমাজ, পরিবার ও ব্যক্তিগত কল্যাণ বিষয়ে আলোচনা এই সমিতির উদ্দেশ্য। প্রতি পাঁচ বৎসরে এই সমিতির এক মহা অধিবেশন হয়। আমেরিকার চিকাগো, ইংলণ্ডের লণ্ডন এবং জার্ম্মেনীর বার্লিন নগরে সমিতির মহা অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার কানাডা দেশে পুনরায় এই মহা অধিবেশন হইবে। ইহার কার্য্যক্ষেত্র সমূহে লোকসেবা, ধর্ম্ম ও শিল্পকলার উন্নতি বিষয়ে যে সকল সভাসমিতি আছে ইহা তাহার সকল গুলিকেই আপনার অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছে। কিন্তু সম্প্রতি এই সমিতির সভ্যগণও বুঝিতে পারিয়াছেন, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারীজাতির উপযুক্ত অধিকার না থাকিলে কার্য্যক্ষেত্রে সফলতা লাভ সুকঠিন, এই জন্য ইহার সভ্যগণও "সাফ্রেজিষ্ট" দলভুক্ত হইতে আরম্ভ করিয়াছেন। যে সকল দেশে প্রতিনিধি-প্রণালীতে শাসন-কার্য্য নির্ব্বাহিত হয় সে সকল দেশে শাসন-কার্য্যে নরনারীর তুল্যাধিকার স্থাপন এবং নারীজাতির শক্তি-পরিচালনা ও বিবিধ লোকহিতকর বিষয়ে এই সমিতি যথেষ্ট কার্য্য করিতেছে।

এই সমিতির প্রত্যেক শাখা দেশের বৃহত্তর সমিতিতে দুই জন করিয়া প্রতিনিধি প্রেরণ করে, এবং দেশের বৃহত্তর সমিতি দুইজন করিয়া প্রতিনিধি অন্তর্জাতিক মহা সমিতিতে প্রেরণ করে। সম্প্রতি লেডি এবার্ডিন এই অন্তর্জাতিক সমিতির সভানেত্রী। কুড়িটী দেশে এই মহাসমিতির কার্য্য চলিতেছে। দুঃখের বিষয় এসিয়া মহাদেশের কুত্রাপি এ পর্য্যন্ত ইহার শাখা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। সমিতির প্রতিষ্ঠা-পত্রে সমিতি স্থাপনের নিম্নলিখিত উদ্দেশ্য লিপিবদ্ধ আছে:—"আমরা সর্ব্বজাতীয় নারীগণ সরল

ভাবে বিশ্বাস করি, যে চিন্তা, সহানুভূতি ও উদ্দেশ্যের ঘনীভূত একতা দ্বারা মানবজাতির মহোপকার সাধিত হইবে, এবং নারীজাতির একটী সুগঠিত মহাসমিতি গৃহ পরিবার ও রাজ্যের কল্যাণ সাধনে বিশেষ ভাবে কার্য্যকারী হইবে। এই জন্য আমরা এই মহাসমিতির কার্য্যে যোগদান করিতেছি। আমরা সমাজ, রীতি নীতি এবং রাজবিধি,—সর্ব্বত্র ঈশ্বরের অভিপ্রায় পূর্ণ দেখিতে সাধ্যানুসারে যত্নবতী হইব।"

ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশে নারীজাতির উন্নতি সাধনের জন্য আরো বহু সভা সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তন্মধ্যে "জেনারেল ফিডারেশন অব উয়িমেন্স ক্লাবস্" বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আমেরিকার নারীজাতির জ্ঞান-পিপাসা ও আত্মোন্নতির অদম্য স্পৃহা হইতে এই সমিতির জন্ম। সাধারণতঃ অলস ও চিন্তাবিহীন ভাবে সময়ক্ষেপ নারীদিগের পক্ষে অভ্যাস দোষে স্বাভাবিক হইয়া পড়ে, কিন্তু নারীজাতি যখন শিক্ষালাভ করিয়া জীবনের মূল্য বুঝিতে পারেন তখন শুধু দৈনন্দিন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাজে অথবা শোনা কথায় পরমুখে জ্ঞানলাভ করিয়া তাঁহারা তৃপ্ত থাকিতে পারেন না। আত্মোন্নতির জন্য তাঁহাদের চিত্ত তখন অস্থির হইয়া উঠে। আমেরিকার নারীগণ সুশিক্ষা লাভ করিয়া যখন নারীজীবনের মহৎ উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব উপলব্ধি করিলেন তখনই নানা স্থানে সভা সমিতি করিয়া তাঁহারা জীবনের উন্নতি বিষয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। পুরুষগণ তাঁহাদিগকে বিদ্রূপ করিতে লাগিলেন, এমন কি বিরুদ্ধাচরণ পর্য্যন্ত করিতে ক্ষান্ত হইলেন না। কিন্তু ভগবানের কৃপায় উক্ত সমিতি আমেরিকায় এখন এক প্রবল শক্তিরূপে দণ্ডায়মান হইয়াছে। প্রথমে সাধারণ গৃহকর্ম্ম হইতে অবসর লাভ করিয়া বিশ্রাম সময় টুকু ভাল ভাবে যাপন ও জ্ঞানালোচনার জন্য নানা স্থলে "উয়িমেন্স্ ক্লাব" প্রতিষ্ঠিত হয়। আমেরিকার এই সকল ক্লাবের সংখ্যা সাত লক্ষেরও উপর। এখন এই সকল ক্লাব সমষ্টির নাম হইয়াছে, "জেনারেল ফিডারেশন অব উয়িমেন্স ক্লাবস্।" প্রত্যেক ক্লাবের কার্য্য স্বতন্ত্র হইলেও সকলগুলিই এক মহিলা-সমিতির অধীন। নারীজাতির উন্নতি ও শক্তিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এখন এই সকল ক্লাবের উদ্দেশ্য এবং কার্য্যক্ষেত্রও বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। জ্ঞানোন্নতি সাধন ও বিশুদ্ধ আনন্দ সম্ভোগ ব্যতীত সমাজ ও দেশের বিবিধ কল্যাণকর কার্য্যেও এই ফিডারেশন হস্তক্ষেপ করিয়াছে। বস্তুতঃ এই সমিতির সাহায্যে নারী গৃহধর্ম্ম প্রকৃষ্ট রূপে সম্পাদন বিষয়ে যেরূপ সাহায্য লাভ করেন দেশের কল্যাণ কার্য্যেও তেমনি সহায়তা করিতে সমর্থ হন। এইরূপ সুশিক্ষিতা ও সুমার্জ্জিতা, বহুদর্শিতাশালিনী ও কর্ম্মশীলা আমেরিকান-জননীর সন্তানগণ যে সভ্য জগতে শীর্ষ স্থান অধিকার করিতেছে ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

এখন দুই বৎসর অন্তে যুক্তরাজ্যের এক একটী প্রধান সহরে এই ফিডারেশনের দ্বিবাৎসরিক বিশেষ অধিবেশন হয়। সাতলক্ষ ক্লাবের প্রতিনিধিগণ এই মহা অধিবেশনে উপস্থিত হইয়া নারীজাতির ও দেশের কল্যাণকর নানা বিষয়ে আলোচনা করেন। লোকসেবা, সাহিত্য, শিল্প বিজ্ঞান, দেশের রাজকীয় বিধি ব্যবস্থা, গৃহধর্ম্ম প্রভৃতি সকল বিষয়ে এই সমিতিতে আলোচনা হয়। পাশ্চাত্য জগতে জনসাধারণের মতামতের মূল্য অতি অধিক। এই জন-সাধারণের মতামতের উপরেই আমেরিকার সম্রাটস্থানীয় সভাপতি বা দেশনায়ক নির্ব্বাচনের ভার অর্পিত। এই জনসাধারণের মতামত গঠনে "ক্লাব ফিডারেশনের" প্রভাব সামান্য নহে। বর্ত্তমান সময়ে এই ফিডারেশন নিম্ন লিখিত একাদশটী বিষয়ে আপনার শক্তি নিয়োগ করিতেছে। (১) শিল্প (২) নাগরিক শাসন (৩) শাসন-প্রথার উন্নতিসাধন (৪) শিক্ষার উন্নতি (৫) গার্হস্থ্যবিজ্ঞান ও খাদ্যের বিশুদ্ধতা রক্ষা (৬) শ্রমজীবিদিগের উন্নতি (৭) সর্ব্বত্র পুস্তকালয় স্থাপন (৮) সাহিত্য (৯) রাজকীয় বনবিভাগের উন্নতি (১০) রাজকীয় বিধি ব্যবস্থা বিষয়ে আলোচনা (১১) পরস্পরের সাহায্য।

এই একাদশটী বিষয়ে একাদশটী বিভাগ স্থাপিত হইয়াছে। দ্বিবাৎসরিক অধিবেশনে প্রত্যেক বিষয়ের কার্য্য আলোচিত হয় এবং সেই সেই বিষয়ে রাজ্যের সর্ব্বাপেক্ষা অভিজ্ঞ ব্যক্তি—পুরুষই হউন বা নারীই হউন—বক্তৃতা করেন। আমেরিকার সহরে সহরে, গ্রামে গ্রামে এই সমিতিভুক্তা মহিলাগণ কত কাজ করিতেছেন শুনিলে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইতে হয়। তাঁহারা গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক খাদ্য বিষয়ক আইন, অল্পবয়স্ক শ্রমজীবি-শিশুদিগের অতিরিক্ত পরিশ্রম নিবারণ বিষয়ক আইন প্রভৃতি অনেক

আইন পাশ করাইয়া লইয়াছেন। অন্য দিকে সামান্য সামান্য কার্য্য—যথা অমুক গ্রামের রাস্তাগুলি ও অমুক বিদ্যালয়ের আলোক এবং বাতাস প্রবেশের ব্যবস্থা স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের বিধিমতে সংস্কার করিয়া লওয়া, অমুক স্থানে একটী ফোয়ারা স্থাপন, অমুক স্থানে একটী স্মৃতিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করা, অমুক জনাকীর্ণ সহরে উদ্যান স্থাপন করা—প্রভৃতি কত কার্য্যে যে তাঁহারা হস্তক্ষেপ করিতেছেন, এবং সফলতা লাভ করিতেছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। রাজনৈতিক বিষয়ে, গৃহপরিবারে জ্ঞানালোচনার বিস্তারে এই "ফিডারেশন" আমেরিকায় যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

প্রাচীন কালের আমেরিকান-মহিলাগণ এইরূপ বিবিধ বিষয়ে আলোচনা করিতেন না। তাঁহারা পুষ্পচয়ন করিতেন, কিন্তু ভবিষ্যতে দেশের বনবিভাগের অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইবে, পুষ্পচয়নে ভবিষ্যদ্বংশের কিরূপ সুবিধা থাকিবে, সে বিষয়ে তাঁহারা কখনও চিন্তা করিতেন না। বাজারের অবিশুদ্ধ আহার্য্যে তাঁহাদেরও পরিজনের স্বাস্থ্য নষ্ট হইত কিন্তু সেই আহার্য্যের বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য তাঁহারা কিছুই করিতে পারিতেন না। প্রাচীন নারীগণের এই যে উদাসীনতা ও জ্ঞানের অভাব, এই যে বাহিরের বিষয়ে, ভবিষ্যতের বিষয়ে দৃষ্টি অন্ধ রাখিয়া গৃহকর্ম্মে, সংসারের সংকীর্ণ ক্ষেত্রে আপনার কার্য্য ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ রাখা, ইহাই অনেকের নিকট এখনও নারীজীবনের চরম লক্ষ্যও পরম প্রীতিকর আদর্শ বলিয়া মনে হয়। কিন্তু আমেরিকার নব্যতন্ত্রের মহিলাগণ বলেন, এই অজ্ঞানতা ও দুর্ব্বলতা, বাহিরের দিক্ হইতে দৃষ্টিকে সংযত করিয়া শুধু গৃহকর্ম্মেই সন্তোষ লাভ যদি মাতৃত্বের আদর্শ হয় তবে নারীজীবনের প্রকৃত সার্থকতা কোথায়? বস্তুতঃ বিশ্বসংসারের নানা বিভাগের সহিত সংস্পর্শে না আসিলে এবং জ্ঞানে গভীরতা ও প্রেমে বিশালতা লাভ না করিলে নারীজীবন অপূর্ণই থাকিয়া যায়। যাঁহাদের পক্ষে "উয়িমেন্স ক্লাব ফিডারেশনের" দ্বিবাৎসরিক উৎসব প্রত্যক্ষ করিবার অথবা ঘনিষ্ঠ ভাবে এই ফিডারেশনের কর্ম্মকর্ত্রীগণের সংস্পর্শে আসিবার সুযোগ ঘটিয়াছে তাঁহারা একদিকে ইঁহাদের বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা, অপূর্ব্ব কর্ম্মক্ষমতা এবং পক্ষান্তরে ইঁহাদের কমনীয় গুণাবলী—নারীজনোচিত কোমলতা ও মধুরতা এবং হৃদয়ের উচ্চতা দেখিয়া এ কথার সত্যতা বুঝিতে পরিয়াছেন।

আমেরিকার নারীগণ জগৎকে দেখাইয়াছেন, লোকহিতকর কার্য্যে, ধর্ম্মমন্দিরে আচার্য্যের বেদীতে ধর্ম্মব্যাখ্যাতারূপে, চিকিৎসা বিষয়ে এবং রাজকার্য্যে—সকল বিষয়েই নারীজাতি মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া জীবনপথে অগ্রসর হইতে, মহৎভাবে জীবন যাপন করিতে সমর্থ; উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে, অসহায় ভাবে, চিন্তাবিহীন ভাবে শুধু গলগ্রহ হইয়া থাকাই নারীর নিয়তি নহে।

পাশ্চাত্য মহিলাগণ জগতের সমক্ষে যে উচ্চ আদর্শ দেখাইয়াছেন, দেশকাল ও পাত্রভেদে পরিবর্ত্তিত আকারে প্রত্যেক দেশের নারীজাতিকে সেই উচ্চ আদর্শের দিকে লইয়া যাইতে যত্নবান হওয়া প্রত্যেক দেশের পুরুষগণেরই দিন দিন এক প্রধান কর্ত্তব্য হইয়া দাঁড়াইতেছে। নারীগণের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া নহে, কিন্তু আত্মরক্ষার জন্য, অন্তর্জ্জাতিক মহা প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষা করিবার জন্য ইহা বিশেষ আবশ্যকীয় হইয়া পড়িয়াছে। আজ যদি আমেরিকার সহিত অন্য কোন রাজশক্তির সংগ্রাম উপস্থিত হয় তবে আমেরিকার সুশিক্ষিতা জননীর গর্ভোৎপন্ন, তাঁহাদের দ্বারা সুশিক্ষিত আমেরিকান পুরুষকেই যে শুধু গণনা করিতে হইবে, তাহা নহে। আমেরিকার সুশিক্ষিতা, স্বাস্থ্যসম্পন্না নারীগণও প্রবল বিক্রম প্রকাশ করিয়া নারীদেহের শেষ রক্তবিন্দু স্বদেশের জন্য অর্পণ করিবে। অধঃপতিত ভারতের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, এদেশের কয়টী নারী দেশের মূল্য, স্বাধীনতার মূল্য বুঝিতে পারেন? দেশের কথা কয়টী নারী চিন্তা করেন? দেশের জন্য কয়টী নারী একটু স্বার্থসুখ পরিত্যাগ করিতে উৎসুক? হায়! কবে এদেশের নরনারীর দৃষ্টি এই দিকে পতিত হইবে? কবে এদেশের নারীশক্তি জাগ্রত হইয়া দেশকে প্রকৃতরূপে জাগাইবে?

তবু।

কতবার কত দিন গিয়াছে চলিয়া,
তবু মনে হয়,
পশ্চাতে আমার আরো রয়েছে দাঁড়ায়ে,
দীর্ঘ দিনচয়।
কতবার কত পথ গেছি অতিক্রমি,
তবু সম্মুখেতে,
ডাকে নিত্য নব পথ দিগন্তেরে চুমি
আরো হবে যেতে।
আসিয়াছি কত স্বর্ণ দিগন্তের ভূমি
ছাড়িয়া পশ্চাত।
তবু অন্য স্বর্ণ দিগন্তের গভীর সুদূর
রয়েছে অজ্ঞাত।
জীবনের কত শেষ পূর্ণ-রেখাটির
হয়েছি সম্মুখ,
তবু অন্য পূর্ণতর রেখা রচেগো সুদূর
যেন যুগ যুগ।
কতবার জেগে উঠে সম্মুখে পশ্চাতে
কত সুখ সমারোহ,
তবু মনে হয় আছে কোন লুকায়ে নেপথ্যে,
তার সম্পূর্ণ প্রবাহ।
কতবার কত শেষ ধ্বনি থেমে যায়,
তবু মনে হয়,
অধিক সমাপ্তি তার কোন্ সে দুরান্তে,
পড়িয়া লুটায়।
কতবার মধুমাস আসিয়াছে এই,
ধরণীরে ডাকি;
তবু যেন তার অন্য পূর্ণ আবির্ভাব
রহিয়াছে বাকী।
কতবার বীণাটীতে গিয়াছে ধ্বনিয়া,
পরিপূর্ণ সুর,
তবু সে গো গাহিবার থাকে অপেক্ষায়
আরো সুমধুর।

লজ্জাবতী বসু।

বনিতা-বিনোদ।

দ্বিতীয় বিনোদ।

ক্রোধ-শান্তি।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

ভাল করিয়া বিচার করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে ক্রোধ এক প্রকার উন্মাদ রোগ। রাগী ও পাগল উভয়ের লক্ষণ প্রায় এক প্রকার। পাগলের যে রকম চেহারা বিকৃত হয়, মুখ ও চোখ লাল হয়, গা কাঁপিতে থাকে, মুখ দিয়া ঠিক কথা বাহির হয় না, ভাল মন্দ বিবেচনার শক্তি থাকে না, কাহাকে কি বলে তাহার বোধ থাকে না, রাগীরও ঠিক সেইরূপই হয়। রাগের সময় লোকে কত অন্যায় কাজ করিয়া থাকে, গুরু ও পূজ্য লোককে গালাগালি দেয়, ভগবানকে পর্য্যন্ত মন্দ কথা বলে, এমন কি নিজের স্বামী পুত্র এবং নিজের আত্মারও অপকার করিতে ছাড়ে না। এরূপ হতভাগিনী স্ত্রী দেখা গিয়াছে যে, সে পরম গুরু স্বামীর উপর রাগ করিয়া নিজের সৌভাগ্য-চিহ্ন শাঁখা চুড়ি লোহা প্রভৃতি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া দিয়া সীঁথির সিন্দুর মুছিয়া ফেলিয়া, আত্মীয় ও পাড়াপড়সীদিগের ঘরে ঘরে বলিয়া বেড়ায় যে, "অমুক (তাহার স্বামী) মরিয়া গিয়াছে।" রাগে নিজের মাথা খুঁড়িয়া, কপল ফাটাইয়া, ঠোঁট কাটিয়া রক্তারক্তি করিয়াছে, এমন স্ত্রীও আমরা দেখিয়াছি। ক্রুদ্ধ হইয়া আপনার অবোধ নিরপরাধ শিশু সন্তানকে ঘরের উচ্চ দাবা হইতে নীচে ফেলিয়া দিয়াছে এরূপ নারীর সংখ্যা কম নহে। আর সমস্ত দোষ লোকের নিকট অল্পাধিক গোপন করা যায় কিন্তু এই ক্রোধরূপী আগুণ গোপন করিবার উপায় নাই। ক্রোধের জন্য জগতে যে কত ভয়ানক কাণ্ড হইয়া যাইতেছে তাহার তালিকা লইলে স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইতে হয়! অজ্ঞান বালক মাটিতে পড়িয়া গেলে সে যেমন উঠিয়া মাটিতে সজোরে লাথি মারিতে থাকে, রাগী লোকও তেমনি রাগের বশে নির্জীব পদার্থের উপর রাগের ঝাল ঝাড়িতে থাকে। প্রদীপ জ্বালিতে গিয়া কোন কারণে ২।৪ বার নিবিয়া গেল অথবা কয়বার চেষ্টা করিয়া জ্বলিল না—প্রদীপটাকে ফেলিয়া দিল;—কাপড়ে দাগ পড়িয়াছে,

বার বার চেষ্টা করিয়াও দাগ উঠিল না—কাপড়খানা ছিঁড়িয়া ফেলিল,—ঘড়ীটা পুনঃ পুনঃ মেরামত করান হইলেও ঠিক সময় দিতেছে না—ঘড়ীটা ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিয়া ফেলিল, এরূপ রাগী লোকের সংখ্যা অনেক। রাগী লোক পশু পক্ষীর উপর নিতান্ত নিষ্ঠুর ব্যবহার করে এবং উহাদিগকে অকারণ যাতনা দেয়। ঘোড়া চলিতে চলিতে থামিলে বা ঠোকর খাইলে তাহাকে অত্যন্ত প্রহার করিয়া থাকে। কোন কোন ব্যক্তি ক্রোধে একেবারে অন্ধ হইয়া ভগবানের নিকট প্রার্থনা করে, যে অমুকের সর্ব্বনাশ হউক, বা অমুকের বংশনাশ হউক। এমনও শুনা গিয়াছে যে পরের মন্দ করিবার উদ্দেশ্যে রাগী লোক উপবাস করিয়া থাকে! শুনিতে পাওয়া যায়, যে রোমের এক রাজা শত্রুজয় করিবার জন্য আপনার সৈন্য সামন্ত লইয়া যাত্রা করিলে পথে একটী নদী ঐ সেনাদলের সম্মুখে পড়ে। সেনাদল সহিত রাজা অনেক চেষ্টায় নদী পার হইয়া কিছুদুর অগ্রসর হইয়া দেখেন যে, ঐ নদী বাঁকিয়া আসিয়া আবার তাঁহার পথরোধ করিয়াছে। এবারও রাজা ঐ নদীর উপর বিরক্তি প্রকাশ না করিয়া পারের আয়োজন করিয়া নদী পার হইলেন। তাহার পর কিয়দ্দূর গিয়া দেখেন যে পুনশ্চ ঐ নদী তাঁহার সম্মুখে। এবারে তিনি ক্রোধে অধীর হইয়া আজ্ঞা দিলেন, যে ঐ নদীকে সম্পূর্ণরূপে মাটী দিয়া না বুজাইয়া আর এক পা-ও অগ্রসর হইবেন না। তাঁহার আজ্ঞায় তাঁহার অনুচরেরা নদী বুজাইতে আরম্ভ করায়, যোদ্ধাগণ অস্ত্র শস্ত্র ও যোদ্ধৃবেশ পরিত্যাগ করিয়া ঝুড়ি কোদাল লইয়া নদীর সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত হইল, অপর দিকে রাজার শত্রুপক্ষ ঐ সংবাদ পাইয়া সদল বলে আসিয়া সসৈন্যে ঐ মুর্খ রাজার উচ্ছেদ সাধন করিল।

কোন কোন লোকের অভিমত এই যে, অকারণ যে ক্রোধের উৎপত্তি হয় তাহা মন্দ বটে, কিন্তু কাহারও প্রতি কোন অত্যাচার হইতে দেখিয়া ঐ অত্যাচার নিবারণের উদ্দেশ্যে যে রাগের উৎপত্তি হয় তাহা উত্তম। পরদুঃখে দুঃখী হওয়া সজ্জনের চিহ্ন এবং সকলেরই তাহা কর্ত্তব্য তাহাতে সংশয় নাই, কিন্তু এরূপ ক্ষেত্রেও ক্রোধের অধীন হওয়া উচিত নহে। ক্রোধের বশীভূত না হইয়াও আমরা পরের দুঃখমোচন, অত্যাচার দমন ও অত্যাচারের প্রতিশোধ লইতে পারি। যে ব্যক্তি অপরের প্রতি কোন প্রকার অত্যাচার করে, আইন তাহাকে যথোচিত দণ্ড দিয়া থাকে। আইন-প্রণয়ন-কর্ত্তা অথবা বিচারক কি কখনও দোষী ব্যক্তির উপর রাগ করিয়া দণ্ড দিয়া থাকেন? ভবিষ্যতের জন্য দোষীর চরিত্র সংশোধনই দণ্ডের মুখ্য উদ্দেশ্য, কচিৎ লোক-শিক্ষার উদ্দেশ্যেও দণ্ড দেওয়া হইয়া থাকে; কিন্তু ক্রোধের বশে কখনও দণ্ড দেওয়া হয় না। বিচারকগণ অতিশয় শান্ত ভাবে, বিশেষ বিবেচনার সহিত দোষী ব্যক্তির দোষের পরিমাণ ও অবস্থা বিবেচনা করিয়া তবে তাহার দণ্ড দিয়া থাকেন। বিচার শান্তির ফল—ক্রোধের নহে।

ক্রোধ সাধারণতঃ তিন প্রকারে হইয়া থাকে। (১) নির্জ্জীব জড় পদার্থ, ইতর প্রাণী, অথবা নির্ব্বোধ বালক বালিকার উপর; (২) সাধারণ উপহাসকারী ব্যক্তির উপর, (৩) নিন্দুক, অপরাধী, আততায়ী ব্যক্তির উপর। আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি যে জড় পদার্থ, ইতর প্রাণী অথবা অবোধ শিশু সন্তানের উপর রাগ করা এক প্রকার উন্মাদের কাজ, এবং উপহাসকারীর প্রতি রাগ করিলে অধিকতর উপহাসভাজন হইতে হয়। এক্ষণে আমরা তৃতীয় প্রকার ক্রোধের বিষয়ে আলোচনা করিয়া দেখিব। এরূপ ক্রোধ দমন করা প্রকৃত পক্ষে কঠিন।

প্রথমেই আমাদের মনে রাখা উচিত যে কোন অবস্থাতেই রাগ করা ভাল নহে। তাহাতে লাভের কোন আশা নাই, পরন্তু ক্ষতির বিশেষ সম্ভাবনা আছে। রাগের সময়ে মানুষের বিচারবুদ্ধি একেবারে তিরোহিত হইয়া যায়। আর যে কাজ বিনা বিচারে করা যায় তাহা কদাপি ভাল হওয়ার কথা নহে। আমরা যখন দেখি, যে এক জন লোক বিনা কারণে কাহাকেও মারিতেছে কি অন্যপ্রকার অত্যাচার করিতেছে তখন স্বভাবতঃ আমাদের মনে প্রতিশোধ লইতে ইচ্ছা হয়—এবং এই প্রতিশোধের ইচ্ছা হইতেই ক্রোধের উদয় হইয়া থাকে। এরূপ ক্ষেত্রে আমাদের মনে ক্রোধের উদ্রেক হইলে কিছু করিবার পুর্ব্বে মনে মনে নিম্নলিখিত পাঁচটী বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত। তাহার পর অপরাধীর প্রতি শাস্তি বা প্রতিশোধের ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।

প্রথম পরিচ্ছদ পরিধান।

(১) ঐ ব্যক্তি যাহা করিয়াছে তাহা সত্য সত্য ক্রোধের যোগ্য কিনা ?

(২) ঐ কার্য্য সত্য সত্যই অনুচিত কি না ?

(৩) যদি ঐ কাজ অনুচিত হয়, তাহা হইলে ক্ষমা করিতে পারি, এতটুকু মহত্ব আমার আছে কি না ?

(৪) যদি ক্ষমা না করিতে পারি, কিরূপ ভাবে প্রতিশোধ লওয়া উচিত ?

(৫) অপরাধীকে কিরূপ ও কি পরিমাণ দণ্ড দেওয়া উচিত ?

এক্ষণে আপত্তি হইতে পারে, যে ক্রোধের সময় মানুষের বিবেচনা-শক্তি একেবারেই লুপ্ত হইয়া যায়, তবে এত বিবেচনা করিবে কে ? আমাদের উত্তর এই যে, বিবেচনা-শক্তি লুপ্ত হয় বলিয়াই রাগ হইবামাত্র কোন কাজ করা ভাল নহে। রাগী লোক রাগের বশে অধীর হইয়া নানা অকার্য্য করিয়া ফেলে। প্রথমে যে কাজ গর্হিত ও অনুচিত বলিয়া মনে হইয়াছে, বিবেচনা করিয়া দেখিবার পর তাহা সম্পূর্ণ উচিত ও করণীয় বলিয়া জানিতে পারা গিয়াছে—এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। অনেক সময় দেখা গিয়াছে, যে আমি যে অত্যাচার দেখিতে না পারিয়া অত্যাচারীকে শাস্তি দিলাম,আমার কাজ অপরাধীর সেই কাজ অপেক্ষা শতগুণে হেয় ও কদর্য্য হইয়াছে। গরুর প্রতি অত্যাচার নিবারণ করিতে গিয়া নরহত্যা হইয়াছে তাহার দৃষ্টান্ত অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। ক্রোধের বশে যা' তা' করা কখন উচিত নহে। বিশেষ বিচার বিবেচনা করিয়া কাজ করাই উচিত, ইহাই ঐ পাঁচটি প্রশ্নের তাৎপর্য্য। এই প্রশ্ন কয়টার সমাধান করিবার জন্য সময়ের আবশ্যক, ধৈর্য্যের আবশ্যক, বিলক্ষণ বিবেচনার আবশ্যক। এইরূপ ধীর ভাবে, সময় লইয়া বিচার করিতে গেলেই রাগের যে মোহ তাহা কাটিয়া যাইবে এবং দোষের প্রকৃত মাত্রা ও স্বভাব বুঝা যাইবে। শান্ত ভাবে বিচার করিয়া কাজ না করিলে কোন না কোন গোলযোগ হইবেই হইবে। দেশে যত খুন, মারপিট প্রভৃতি ভয়ানক অপরাধ সংঘটিত হইতেছে ইহা কেবল মাত্র ক্রোধ রিপুর উত্তেজনার ফল।

মহাভারতে লিখিত আছে একবার যুদ্ধভূমিতে মহাবীর কর্ণের সহিত মহারাজ যুধিষ্ঠিরের যুদ্ধ হয়। যুধিষ্ঠির কর্ণের পরাক্রম সহ্য করিতে না পারিয়া প্রাণভয়ে যুদ্ধস্থান হইতে পলাইয়া নিজ শিবিরে আসিয়া প্রাণরক্ষা করেন। কিন্তু সম্রাট হইয়া একজন সামান্য সেনাপতির হস্তে এরূপ লাঞ্ছনা ভোগ করায় মনে বড় ক্ষোভ পাইয়াছিলেন। মনের দুঃখে যখন তিনি নিতান্ত কাতর হইয়া অধোমুখে বসিয়া কত কি ভাবিতেছিলেন, এমন সময় মহাবীর অর্জ্জুন যুদ্ধস্থলের অপর দিক হইতে জ্যেষ্ঠের এই দুর্দ্দশার কথা শুনিতে পাইয়া তাঁহাকে প্রবোধ দিবার জন্য আসিলেন। অর্জ্জুন গৃহে আসিয়া মহারাজকে প্রণাম করিবা মাত্র যুধিষ্ঠির ভাবিলেন, বিজয়ী অর্জ্জুন বুঝি যুদ্ধে কর্ণের প্রাণ বিনাশ করিয়া সেই শুভসংবাদ দিতে আসিয়াছেন, তাই তিনি অর্জ্জুনকে আলিঙ্গন করিয়া শতমুখে তাঁহার প্রশংসাবাদ করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুন একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "মহারাজ, আমি এখনও কর্ণকে বিনাশ করি নাই, আপনার বিপদের কথা শুনিবামাত্র আপনাকে দেখিতে আসিয়াছি। আপনার শ্রীচরণ দর্শন করা হইল, এক্ষণে আমি যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়া কর্ণকে যথোচিত শাস্তি দিব, এবং তাহাকে বিনাশ না করিয়া আজ ফিরিব না।" যুধিষ্ঠিরের অন্য অন্য অনেক গুণ থাকিলেও তিনি দুর্ব্বলচিত্ত ছিলেন ; অর্জ্জুনের এই কথা শুনিবামাত্র একেবারে ক্রোধে উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন এবং নানাপ্রকার অসহ্য দুর্ব্বাক্য বলিয়া অর্জ্জুনকে গালি দিতে লাগিলেন। বীরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন সেরূপ দুর্ব্বাক্য আর কখনও কাহারও নিকট শুনেন নাই। এখন বিনাদোষে এইরূপ অপমানিত হইয়া তাঁহারও ক্রোধাগ্নি জ্বলিয়া উঠিল ও অগ্রজের শিরশ্ছেদন করিবার জন্য খড়্গ উত্তোলন করিলেন। যদি এই সময় পাণ্ডবদিগের অকৃত্রিম সুহৃদ শ্রীকৃষ্ণ তথায় উপস্থিত না থাকিতেন— তাহা হইলে সেই দিনই পাণ্ডবদিগের বংশ ধ্বংস ও জয়াশা নির্ম্মূল হইত। শ্রীকৃষ্ণ নানাপ্রকার মিষ্ট সান্ত্বনা বাক্যে উভয় ভ্রাতাকে নিরস্ত করিয়াছিলেন, তাই রক্ষা। যুধিষ্ঠির যদি একটু বুদ্ধি এবং বিবেচনার সহিত কার্য্য করিতেন তাহা হইলে ঐ সময়ে ক্রোধের কোন কারণই ছিল না। রাগের সময় কাজ করিলে সাক্ষাৎ ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের পদস্খলন হয়, সামান্য লোকের কথা কি ? বাস্তবিকপক্ষে যাঁহারা ধার্ম্মিক ও মহানুভব ব্যক্তি, তাঁহাদের উপর শত শত অত্যাচার হইলেও তাঁহারা প্রতিশোধ লইতে

ইচ্ছা করেন না। কৈকেয়ী দেবীর অনুরোধেই মহারাজ দশরথ প্রিয়পুত্র রামচন্দ্রকে চৌদ্দ বৎসর বনবাস দিয়াছিলেন, কিন্তু রামচন্দ্র একদিনের জন্যও কৈকেয়ীর উপর রাগ করেন নাই; বরং সর্ব্বদা তাঁহাকে মা বলিয়া ডাকিতেন, জননী কৌশল্যা হইতে কৈকেয়ীকে পৃথক ভাবিতেন না। যুধিষ্ঠির রাজর্ষি পিতামহ ভীষ্মের নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "পিতামহ,—কি উপায়ে আপনাকে বধ করিতে পারা যাইবে, দয়া করিয়া বলিয়া দিন্।" পিতামহ ভীষ্ম এই অন্যায় প্রশ্নে কিছুমাত্র বিচলিত বা ক্রুদ্ধ না হইয়া সহাস্যমুখে আপনার বিনাশের উপায় বলিয়া দিয়াছিলেন। রাজা পরীক্ষিত বিনা অপরাধে ধ্যানমগ্ন মহর্ষি বিভাণ্ডকের গলায় একটা মৃত সর্প জড়াইয়া দিয়াছিলেন এবং সেই জন্য ঋষিপুত্র শৃঙ্গী পরীক্ষিতকে দারুণ ব্রহ্মশাপ প্রদান করেন। মহর্ষি বিভাণ্ডক ধ্যানশেষে এই বৃত্তান্ত শুনিয়া রাজার প্রতি বিন্দুমাত্রও রাগ করিলেন না, বরং পুত্রের শাপ দেওয়ার জন্য দুইজন ঋষিকে রাজার নিকট পাঠাইয়া সংবাদ দিয়াছিলেন। পুরাণে কথিত আছে, মহর্ষি ভৃগু বৈকুণ্ঠে নারায়ণকে দর্শন করিতে গিয়া দেখেন যে ভগবান নিদ্রিত রহিয়াছেন। ভৃগু ভাবিলেন, যে নারায়ণের কি স্পর্দ্ধা! তাঁহার মত একজন ঋষি বাটীতে উপস্থিত, কোথায় বিষ্ণু অতিথিসৎকারের জন্য ব্যস্ত হইবেন, না তিনি সুখে নিদ্রিত! এই ভাবিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া ভৃগু ভগবানের বক্ষে সজোরে পদাঘাত করিলেন। আঘাতে তাঁহার চেতনা হইল। কিন্তু রাগ হইল না! তিনি সহাস্যে ভৃগুকে বলিলেন, "ঠাকুর,—আমার এ বুক বজ্রের মত কঠোর, ইহাতে আঘাত করিতে গিয়া আপনি আপনার কোমল চরণকমলে ব্যথা পান নাই ত?" একবার মহম্মদ অন্য ধর্ম্মাবলম্বী এক ব্যক্তির সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন। যখন আততায়ীকে ভূমিতে ফেলিয়া হজরৎ তাহার বুকের উপর বসিয়াছেন তখন সে তাঁহার মুখে থুথু দিল। হজরৎ বুঝিতে পারিলেন, যে তাঁহার মনে ক্রোধের উদয় হইতেছে; তৎক্ষণাৎ নিজের হস্তের তলওয়ার দূরে নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "এতক্ষণ আমি আমার শত্রুকে পরাস্ত করিয়াছিলাম, কিন্তু এক্ষণে আমিই শত্রুর নিকট পরাস্ত হইলাম।" (অর্থাৎ ক্রোধ আমাকে অভিভূত করিল।) মহাত্মা যীশুখৃষ্ট বলিয়াছেন, যে "যদি কেহ তোমার ডান গালে চপেটাঘাত করে তবে তাহাকে বাম গাল ফিরাইয়া দিও।" মহাত্মা যীশুখৃষ্টকে ক্রুশে আরোহণ করাইয়া যখন তাঁহার শত্রুগণ তাঁহাকে বধ করে তখন পর্য্যন্ত তাঁহার মনে ক্রোধের উদ্রেক হয় নাই। ক্রোধ হওয়া দূরে থাকুক, তিনি ঐ শত্রুদিগের মঙ্গলের জন্য পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ঘোর পাষণ্ড জগাই মাধাইকে হরিনাম দিতে গিয়া নিত্যানন্দ প্রভু কলসীর কানার আঘাত পাইয়াছিলেন, তথাপি তিনি একটুও রাগ করেন নাই! বরং বলিয়াছিলেন :—

"মেরেছিস্ বলে কলসীর কানা,
তাই বলে কি প্রেম দিব না?"

পণ্ডিতপ্রবর সক্রেটিশকে বধ করিবার জন্য বিষ প্রদান করিলে তিনি কিছু মাত্র রুষ্ট না হইয়া সন্তুষ্ট চিত্তে বিষপাত্র হস্তে লইয়া পান করিয়াছিলেন। মহাত্মা কেটোর মুখে নিদারুণ প্রহার করাতেও কিছুমাত্র বিচলিত বা ক্রুদ্ধ হন নাই, যেন তাঁহার কিছুই হয় নাই। এরূপ মহত্ত্বের উদাহরণ পৃথিবীর সমস্ত প্রদেশেই দুই চারিটা পাওয়া যায়, কিন্তু ঈদৃশ ব্যবহার সাধারণ লোকের নিকট আশা করা যাইতে পারে না। আমাদের ন্যায় সাধারণ লোকের কি করা উচিত বা অনুচিত তাহাই আমাদের বিবেচনার বিষয়। (ক্রমশঃ)

শ্রীসত্যবন্ধু দাস।
অনুবাদক।

ঐতিহাসিক বীর-বালা।

রাণী কমলা।

রাণী কমলা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ রাজা সীতারামের পত্নী। মুর্শিদাবাদের নবাবের সৈন্য মহম্মদপুর গড় আক্রমণ করিলে, ইনি দুর্গ রক্ষার্থে স্বহস্তে কামান দাগিয়া বিশেষ বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং সীতারাম যুদ্ধে পরাজিত ও হত হইলে, আত্মহত্যা করিয়া জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। বিস্তারিত বিবরণ জানিতে হইলে শ্রীযুক্ত যদুনাথ ভট্টাচার্য্য প্রণীত "রাজা সীতারাম রায়" গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

যবে মহম্মদপুর গড়ে,
নবাব সৈন্য আসি অগণ্য
ঘিরিল দর্প ভরে,
তখন রজনী দ্বিতীয় প্রহর;

ঘুমেতে মগ্ন সারা চরাচর,
শুধু জাগ্রত প্রাকার উপর
শান্ত্রী বেড়ায় ফিরে,
শাণিত শস্ত্র ধ'রে।

কোটাল অরির হুঙ্কার শুনি,
ত্বরিতে আপন তুরী দিল ধ্বনি,
সৈনিকাবাসে অচিরে অমনি
সৈন্যেরা ফেলি দূরে
শয্যা, উঠিল তেড়ে।

প্রাসাদকক্ষে রাজাসহ রাণী
চমকি চাহিলা বিস্ময় মানি,
"গত পরাজয় ভুলিয়া এখনি
শত্রু কি এল ফিরে!
প্রতিশোধ নিতে কিরে!"

ভাবিলা রাজন, "কি করি এবার,
সমুখ সমর খুলিয়া দুয়ার,
অথবা রহিয়া দুর্গের আড়
পাঠাইব শত্রুরে,
কৌশলে যম-পুরে?"

রাণী কহে, "রাজা, একি তব ভুল,
সিংহ হইয়া শৃগালের তুল,
হাসাইয়া যত অরাতির কুল,
লুকায়ে নিজ বিবরে,
চাহ বধিবারে শত্রুরে!

"এ নহে এ নহে বীরের আচার,
খুলে দাও ত্বরা দুর্গের দ্বার,
সম্মুখ রণে কর ছারখার,
নবাবের সৈন্যেরে,
অজেয় বাহুর জোরে।

"দুর্জ্জয় তব সৈন্যের দল,
অসম সাহসী সেনানী সকল,
বীর বক্তার, পাঠান প্রবল,
পারে একশত শিরে,
উড়াতে অসির ধারে।

"করি দাও দূর ভয় সংশয়,
মার নাম স্মরি, মার গাহি জয়,
স্বাধীনতা-রণে দেও গো দেখায়,
শত্রুরে সত্বরে
বাঙ্গালী কি বল ধরে।

"কি বলিব প্রভু, অবলা যে আমি,
মোর বুকে আজি অন্তরযামী
দেছে নব বল, যা শিখেছি স্বামী
রণ-খেলা তব করে,
দেখাব তা জগতেরে।

"দেখিবে দেখিবে নবাবের সেনা,
স্বাধীনতা তরে বঙ্গ-ললনা,
কামানে করিয়া হাতের খেলানা
কেমনে বহ্নি চারে,
উড়াতে শত্রু শিরে।"

রাজা কহে শুনি রাজ্ঞীর বাণী,
"শতবার তব সাহস বাখানি,
তব উপদেশ নিনু আজি মানি,
বাহিরিব সত্বরে
খুলিয়া দুর্গদ্বারে।"

এত বলি রাজা সাজি বীর সাজে,
চলিল যথায় প্রাঙ্গণ মাঝে,
দল পরে দল পাছে পাছে পাছে
দাঁড়াইয়া সেনা সারে,
আজ্ঞা পাবার তরে।

"দেরি মিছে আর" হাঁকিল রাজন,
"ত্বরা খুলে দাও দুর্গ তোরণ,
বেগে বাহিরাও বীর অগণন,
দলিবারে শত্রুরে
দর্পিত পদভরে।"

আজ্ঞা পাইয়া খুলিয়া দুয়ার,
ছুটিল সৈন্য হাঁকি মার মার,
মশাল আলোকে ঘুচায়ে আঁধার,
পড়িল শত্রু 'পরে,
সিংহের বল ধ'রে।

এদিকে রাজ্ঞী কমলা-রূপিনী,
সহসা সাজিয়া দৈত্যদলনী,
রক্ত বাসের অঞ্চল খানি
আঁটি কটিতট ঘিরে
বাঁধি নিল তরবারে।

সাথে লয়ে তাঁর দুই সহচরী
উঠিল ত্বরিতে বুরুজ উপরি,
যথায় সাজান তোপ সারি সারি,
গোলা গুলি ভারে ভারে,
দুর্গের রক্ষা তরে।

গুড়ুম গুড়ুম অচিরে অমনি,
ডাকিল কামান বজ্রের ধ্বনি,
কাঁপিল আকাশ, কাঁপিল অবনী,
কাঁপে অরি থর থর,
পড়ে অসি ত্যজি কর।

অগ্নির গোলা অশনি সমান
ছুটিল নাশিয়া শত শত প্রাণ,
শত্রু সেনানী ডাকে, "আন আন,
পাত ত্বরা কামানেরে
উড়াতে ও বুরুজেরে।"

গরজি দর্পে নবাবের তোপ,
বুরুজের প্রতি করি মহা কোপ,
রক্ত-লোহিত তপ্ত গোলক
বেগে দিল সত্বর,
লক্ষি বুরুজ-চূড়ে।

পাষাণ রচিত বুরুজের গায়
লাগিয়া গোলক পড়িল ধরায়,
রাণী কহে হাসি, "হায় হায় হায়,
শত্রু কি ভাবে ওরে,
পলাইব মোরা ডরে!

"এক গোলা কেন হানুক শতেক,
তাতে মোরা নাহি করি ভ্রূক্ষেপ,
না হয় জীবন হরিয়া ল'বেক,
বঙ্গের বালা ওরে,
ডরে নাহি মরণেরে।

"স্বাধীনতা" ধন রাখিতে যখন
দাঁড়ায়েছি মোরা করিবারে রণ,
মরণের ভয় সাজে কি তখন,
যতক্ষণ বাঁচিবরে
উড়াব অরাতি শিরে।

"গুড়ুম গুড়ুম" শুন শুন শুন,
ডাকিছে শত্রুর তোপ ঘন ঘন,
প্রাচীর-আড়াল এবার চূর্ণ,
দাঁড়াও বক্ষ ধরে,
অগ্নির মুখে ওরে।

"কোন ভয় নাই ঠাস ত্বরা বেগে
তোপেতে বারুদ, দেও গোলা আগে,
দে' পলিতা দেই এইবার দেগে,
পড়ুক বজ্র জোরে,
অরাতি দর্প হ'রে।"

গুড়ুম গুড়ুম পলকে পলকে
ছুটিল গোলক ঝাঁকে ঝাঁকে ঝাঁকে
নবাব সৈন্য পড়ে ধরা-বুকে,
বঙ্গ নারীর করে,
সে কি কম শক্তি ধরে?

যদিও পাষাণ-আড়াল চূর্ণ,
অরাতির গোলা আসি ঘন ঘন
পড়ে আশে পাশে হয়ে বিদীর্ণ,
তবু নাহি সরে ডরে,
দাগে তোপ থর করে।

এদিকে দুর্গ-তোরণ সমুখে
চলে মহা রণ লাখে লাখে লাখে,
বঙ্গের বীর ঝাঁকে ঝাঁকে ঝাঁকে
পাড়ি সব অরাতিরে,
আগে চলে যায় বেড়ে।

সহসা সহসা একি হ'ল হায়!
রাজা হত একি কথা শোনা যায়!
ভূষনার সেনা ছাড়িয়া পলায়
রণ-অঙ্গন ডরে,
ছি ছি, কাপুরুষ মত ওরে।

বুরুজের পরে চমকিলা রাণী,
রাজা হত হায় একি কথা শুনি!
ঐ যে ঐ যে নবাব-বাহিনী
পশিছে দর্প ভরে
দুর্গের অন্তরে।

"তবে আর তোপ দাগি কি কারণ,
স্বাধীনতা সহ গেল স্বামী ধন,
কি হবে রাখিয়া বৃথা এজীবন,
যাক ত্যজি সত্বরে,
মোর প্রাণ পাখী পিঞ্জরে।"

এত বলি রাণী কটিদেশ হতে
খসাইয়া ছোরা, আপন বুকেতে
বসাইয়া দিলা বিপুল বেগেতে,
ছুটে লহু শত ধারে,
পড়ে লুটি ধরা' পরে।

"চলিনু চলিনু স্বদেশ আমার,
শৃঙ্খল তোর ঘুচিবে কি আর?
যে চাহে ঘুচাতে বিধাতা তাহার
শিরেতে বজ্র মেরে,
কেন, অকালেই লয় হরে!

"হরিল প্রতাপে—না পুরাতে আশা,
ভূষনা-রবির হল সেই দশা,
বিধাতার কাছে বৃথা প্রত্যাশা,
অভাগিনী, যুগ ধরে,
রহিবি শৃঙ্খল প'রে!

"চলিনু চলিনু আশা লয়ে সুখে
জনম আবার লব তব বুকে,
পুনঃ মরিব ঘুচাতে যুগ-ব্যাপী দুঃখে—
এমনি সুখে ওরে,
স্বদেশের অরি মেরে।"

বলিতে বলিতে, রাণী কমলার
প্রাণপাখী ছাড়ি পিঞ্জর তার,
উড়িল আকাশে, স্বর্গের দ্বার
বীর ললনার তরে,
খুলে গেল সত্বরে।

শ্রীতারাপ্রসন্ন দাস।

ইষ্টার্ণ্ গ্রোভ্ লাইট হাউস্।

পাঠকপাঠিকাগণের মধ্যে অনেকেই হয়ত জ্ঞাত আছেন, যে সমুদ্রগামী জাহাজগুলিকে বিপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্য, অথবা পথ জানাইবার জন্য সমুদ্রতীরে বা সমুদ্রমধ্যস্থিত পর্ব্বত বা দ্বীপোপরি কোন কোন স্থানে আলোক দেওয়া হইয়া থাকে। যেখানে এই আলোক থাকে, তাহাকে আলোক-মঞ্চ (Light House) বলে।

আমরা গত ১২ই জানুয়ারী Light house আফিসের বিল্ডার (Builder) নামক লঞ্চে করিয়া রেঙ্গুন নদীর

বহির্ভাগে সমুদ্রতীরে অবস্থিত 'ইষ্টার্ণ গ্রোভ্' (Eastern Grove) নামক আলোকমঞ্চ দর্শন করিতে গিয়াছিলাম। সেদিন শনিবার ছিল। আমরা পূর্ব্ব হইতেই যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করাতে, বড় সাহেব লঞ্চের সারঙ্গকে তদনুযায়ী হুকুম দিয়া রাখিয়াছিলেন। বেলা দেড়টার সময় আমার স্বামী আফিস হইতে বাড়ী ফিরিলে, আমরা গাড়ী করিয়া ষ্টীমার ঘাটে চলিলাম। আমি পূর্ব্ব হইতেই সকল প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলাম। ষ্টীমার ঘাটে গিয়া দেখি, যে চাটগাঁর ষ্টীমারের আগমন প্রতীক্ষায় ঘাটে অনেক লোক অপেক্ষা করিতেছে, আমাদের লঞ্চ আসে নাই। আমাদের যে সময় ঘাটে যাওয়ার কথা ছিল আমরা তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে ঘাটে পৌঁছিয়াছিলাম। সুতরাং ঘাটে গিয়া লঞ্চ আনার জন্য সারঙ্গকে সঙ্কেত করা হইল। অদূরেই লঞ্চ নোঙ্গর করিয়াছিল, আমাদিগকে দেখিবামাত্র ঘাটে আসিল এবং আমরাও তৎক্ষণাৎ তাহাতে আরোহণ করিলাম। লঞ্চ চলিল।

এই সকল আলোকমঞ্চ পরিদর্শন এবং নির্ম্মাণের জন্য পূর্ত্তবিভাগের (Public Works Department) স্বতন্ত্র আফিস আছে। রেঙ্গুন হইতে প্রায় দুই মাইল পূর্ব্বদিকে নদীতীরে 'ডানিড" নামক স্থানে উক্ত আফিস স্থাপিত। এই লঞ্চখানি উক্ত আফিসেরই এবং ইহাতে করিয়া সমুদ্র-মোহানার এবং সমুদ্রমধ্যবর্ত্তী নিকটস্থ আলোকমঞ্চগুলিতে এই আফিস হইতে সর্ব্বদা লোকজন যাতায়াত করে। আমার স্বামীও এই বিভাগে কার্য্য করিয়া থাকেন, তাই আমাদের যাইবার বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল।

কিছুদূর যাইয়া আপিসের নিকট লঞ্চ থামান হইল এবং চাউল ডাউল ইত্যাদি আহার্য্য সামগ্রী এবং আলোকমঞ্চ মেরামত করিবার কিঞ্চিৎ আবশ্যকীয় দ্রব্য উঠাইয়া লওয়া হইল। আলোকমঞ্চে আলো জ্বালিবার জন্য যে সকল লোক (Light Keeper) থাকে বা কার্য্য গতিকে যে সকল লস্কর তথায় যায় বা থাকে তাহাদের আহার্য্য সামগ্রী গবর্ণমেণ্ট হইতে দেওয়া হয়। কারণ প্রায়ই এমন সকল স্থানে এই সকল আলোকমঞ্চ স্থাপিত, যেখানে আহার্য্য দ্রব্য পাইবার সুবিধা নাই। কোন কোন আলোকমঞ্চ ত একেবারে সমুদ্রমধ্যেই অবস্থিত।

আমরা প্রায় তিনটার সময় ডানিড হইতে লঞ্চ ছাড়িয়া দিলাম। রেঙ্গুন হইতে কুড়ি মাইল নদী বাহিয়া গেলে সমুদ্রে উপনীত হওয়া যায়। নদীর উভয় পার্শ্বে বহুদূর পর্য্যন্ত কলকারখানা। পথে যাইতে দেখিলাম, "বার্ম্মা অয়েল কোম্পানি" কলের সাহায্যে কেরাসিন তৈল একেবারে জাহাজের মধ্যে ঢালিয়া দিয়া জাহাজ পূর্ণ করিয়া চালান দিতেছে। এস্থানে নদীর পরই সমুদ্র বেশ দেখা যায়। অনেক স্থানে নদীগুলি যেমন বহুভাগে বিভক্ত হইয়া বা ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়া সমুদ্রের সহিত মিশিয়া গিয়াছে, এখানে সেরূপ নহে। তজ্জন্য নদীর দুই কূল অনায়াসে দেখা যায়, কিন্তু তার পরই সমুদ্রে পড়িলে কূলকিনারা দৃষ্টি-বহির্ভূত হয়। সেজন্য নদীর মোহানাটার নাম "এলিফান্ট্ পয়েণ্ট" (Elephant Point) হিন্দুস্থানীগণ "হাতীপিঠ"—বলে। হস্তীর যে প্রকারে শুণ্ড, মস্তক এবং গ্রীবা অনুপাতে ক্ষুদ্র এবং তৎপরই বিশাল শরীর, এস্থানেও নদী ও সমুদ্রে এই প্রকার দৃষ্ট হয় বলিয়া এই নামকরণ হইয়াছে।

আমরা যাইতে যাইতে বুঝিলাম, যে আজ একটু জোরে বাতাস বহিতেছে। তখন বাতাস খুব জোর না করিলেও সারঙ্গ আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল যে, "নদীর মোহানা পর্য্যন্ত যাইবেন, না কোন খানে থাকিবেন? রাত্রে বাতাস জোরে বহিলে ওদিকে লঞ্চ দুলিবে, তাহাতে কষ্ট হইবে এবং সমুদ্র পীড়াও হওয়া সম্ভব।" আমরা তখন খালে যাইতে অনুমতি করিলে "চৌটান খাড়ির" মুখে লঞ্চ নোঙ্গর করিল।

অতি প্রত্যূষে তথা হইতে চলিয়া বেলা প্রায় সাতটার মধ্যেই আমরা নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিলাম। প্রথমে চাহিয়া আলোকমঞ্চটী দেখিতে চেষ্টা করিলাম। কিন্তু অত্যধিক কুয়াসা হেতু কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। তীরে অত্যন্ত কর্দ্দম দেখিয়া আমি তথায় অবতরণ করিবার ইচ্ছা পরিত্যাগ করিলাম। আমার স্বামী সাম্পানে করিয়া তীরে গিয়া, অতি কষ্টে এক হাঁটু কাদা ভাঙ্গিয়া প্রায় এক মাইল দূরে আলোকমঞ্চাভিমুখে চলিলেন। তখন রৌদ্র উঠিয়াছে, সুতরাং কুয়াসা আর নাই। আমি তখন "বাইনোকিউলার" ধরিয়া দেখিতে লাগিলাম। শুধু চক্ষে চাহিয়া দেখিলে

শুধু আলোকটিকে অতি ক্ষুদ্র আকার দেখা যায়। কিন্তু বাইনোকিউলার (Binocular) সাহায্যে তথাকার লোকজনাদিও বেশ দেখিতে পাইয়াছিলাম।

আলোকমঞ্চটি সমুদ্রতীর হইতে এত দূরে অবস্থিত থাকা সত্ত্বেও জোয়ারের সময় সমুদ্রের জলে তাহার নিম্নভাগ পরিপূর্ণ হইয়া যায়। সুতরাং নিম্নে গৃহাদি কিছুই করিবার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং মৃত্তিকা হইতে সাত আট ফুট উচ্চে একতলা নির্ম্মিত রহিয়াছে। তথায় পানীয় জলের ট্যাঙ্ক এবং রন্ধনাদির জন্য স্থান রহিয়াছে। দ্বিতলে আলোকের জন্য ইঞ্জিন এবং কল কারখানা রহিয়াছে। ত্রিতলে পরিদর্শক এবং অন্যান্য লোকের থাকিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। ত্রিতল হইতে লৌহনির্ম্মিত সিঁড়ি দ্বারা প্রায় ৮০ ফুট উচ্চে উঠিলে, আলোক দিবার স্থানে পৌঁছা যায়। চারিদিক হইতে লৌহ ফ্রেম বা কাঠাম দ্বারা মৃত্তিকা হইতে প্রায় ১২০ ফুট উচ্চে এই আলোকটি রাখা হইয়াছে। মৃত্তিকা এবং আলোকটির মধ্যস্থলে উক্ত গৃহাদি অবস্থিত। এই আলোকটীর তিন দিক লোহার পাত দ্বারা বেষ্টিত। ইহার যে মুখ সমুদ্রের দিকে রহিয়াছে, সেই দিকই কেবল কাচ দ্বারা নির্ম্মিত। এই আলোকটীই ৬ ফুট উচ্চ। ইহার মধ্যে একজন মানুষ গিয়া স্বচ্ছন্দে দাঁড়াইতে পারে। ইহা একটী ঘূর্ণনশীল (Revolving) আলোক। কিন্তু এটী সম্পূর্ণ ঘোরে না। কেন না ইহার অন্য তিন দিকেই তীর, সুতরাং ইহার চারিদিক দেখাইবার আবশ্যক নাই। সেই জন্যই তিন দিক লৌহপাতে বেষ্টিত। আলোকটী বৃহদাকারে দেখাইবার জন্য ম্যাগ্নিফাইং গ্লাস্ (magnifying glass) আছে। তাহাতেই বহুদুর হইতেও আলোকটীর ঘূর্ণন দ্বারা ইহাকে একবার অতি উজ্জল এবং একবার অতি নিষ্প্রভ দৃষ্টি গোচর হয়। যেন মনে হয়, অলোটী প্রায় নিভিয়া যাইতেছে, এবং একবার যেন দপ্ করিয়া খুব জলিয়া উঠিতেছে।

পূর্ব্বে কলিকাতা হইতে আসিবার বা রেঙ্গুন হইতে যাইবার সময় অতি আগ্রহে এই সকল আলো দেখিতাম, কিন্তু তখন জানিতাম না, যে ইহা কি প্রকারে নির্ম্মিত।

এই সকল আলোক ব্যতীত নদী-মুখে এবং তথা হইতে কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত মধ্যে মধ্যে জাহাজ সকল নোঙ্গর করিয়া রাখিয়া (যতদুর সমুদ্রমধ্যে মৃত্তিকা পাইয়া নোঙ্গর করা সম্ভব) তাহাতেও আলোক দিয়া থাকে। তাহাকে লাইট্ ভেসেল (light-vessel) বলে। আমরা বাইনো-কিউলার সাহায্যে একটী লাইট-ভেসেলও দেখিতে পাইলাম।

ইষ্টার্ণগ্রোভ আলোকমঞ্চ হইতে কয়েকজন লস্কর এবং একজন পরিদর্শকের ফিরিয়া আসার কথা ছিল। তাহারা সকলে সাড়ে নয় কি দশটার সময় লঞ্চে আসিলে লঞ্চ ছাড়িয়া দিল। আমাদের একবার এলিফ্যাণ্ট্ পয়েণ্টে নামিবার ইচ্ছা ছিল, তাই সারঙ্গকে তথায় লঞ্চ থামাইতে বলায় লঞ্চ থামান হইল। তখন বেলা প্রায় বারটা। অত্যন্ত রৌদ্র দেখিয়া আমি নামিলাম না, কারণ দেখিলাম যে ষ্টীমার হইতেই অক্লেশে সকলই দেখা যাইতেছে।

এ স্থানে একটী পাকা বাধান শ্বেত স্তম্ভ আছে। পূর্ব্বে এই খানেই আলোক দিত। পরে এই মোহানা ছাড়াইয়া ইহার বিপরীত দিককার তীর ধরিয়া সমুদ্রের মধ্যে কিছু দুর গিয়া উক্ত ইষ্টার্ণগ্রোভ্ লাইট হাউস্ নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। তদবধি এখানে এটী স্তম্ভাকারে এলিফ্যাণ্ট পয়েণ্টের চিহ্ন স্বরূপ হইয়াছে। ইহার নিকটেই পোষ্ট আফিস্ এবং টেলিগ্রাফ আফিস আছে। এখান হইতে সমুদ্রের আগমনশীল জাহাজের পতাকা বাইনোকিউলার সাহায্যে দেখিয়া কোথা হইতে জাহাজ আসিতেছে তাহা টেলিগ্রাফ্ দ্বারা রেঙ্গুনে জানাইয়া থাকে। তদনুসারে রেঙ্গুনে প্রকাণ্ড দণ্ডোপরি বিভিন্ন প্রকারের পতাকা সকল খাটাইয়া রেঙ্গুন সহরবাসীকে জানান হয় যে কোথাকার মেল আসিতেছে। বিলাতের ডাক আসিবার সময় তোপ ফেলা হয়।

আমার স্বামী এখানে তীরে অবতরণ পূর্ব্বক একেবারে জলের ধারে দাঁড়াইলেন। সমুদ্রের ঢেউ আসিয়া তাঁহার পাদস্পর্শ করিতে লাগিল। কতকগুলি লাল কাঁকড়া শুইয়া আছে দেখিয়া, তাহাদিগকে ধরিবার উদ্দেশ্যে নিকটবর্ত্তী হইলেন। কিন্তু তাঁহারা অত্যল্প শব্দ শ্রবণ মাত্র জলে নামিয়া গেল।

তিনি কিয়ৎক্ষণ বেলাভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়া সমুদ্রের জল স্পর্শ এবং সমুদ্রের সেই মহান গম্ভীর ভাব দর্শন করিতে লাগিলেন। পরে লঞ্চ ফিরিয়া আসিলে লঞ্চ ছাড়া হইল। তখন পূর্ণ জোয়ার ছিল। সুতরাং আমরা দুই ঘণ্টার মধ্যেই কুড়ি মাইল পথ অতিক্রম করিয়া বেলা তিনটার সময় গৃহে ফিরিলাম।

শ্রীপ্রেমকুসুম রাহা।
রেঙ্গুন।

কামরূপের কথা।

শৈশব কালে দিদিমাদের কাছে গল্প শুনিতাম, কামরূপে আসিলে মানুষ ভেড়া হয়, আর দেশে যাইতে পারে না। বয়স এবং অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে এই গল্পের অসারতা বুঝিতে পারিতেছি বটে, কিন্তু এই প্রদেশের প্রাকৃতিক অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিলে বুঝিতে পারা যায়, যে এই দেশ সম্বন্ধে প্রাচীনাগণের উল্লিখিত রূপ ধারণার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে। কাশী, প্রয়াগ প্রভৃতি তীর্থ বঙ্গ দেশ হইতে অপেক্ষাকৃত দূরবর্ত্তী হইলেও মুশলমান আমল হইতেই রাস্তা ঘাটের সুবন্দোবস্ত আছে বলিয়া অনেক কাল হইতেই হিন্দুগণ তীর্থ করিবার মানসে ঐ সকল স্থানে যাতায়াত করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে কামরূপে আসা বস্তুতঃই এরূপ ভয়ানক এবং বিস্ময়কর ব্যাপার ছিল, যে যদি কেহ দৈবাৎ এ দেশে একবার আসিত তবে তাহার আর প্রায় ফিরিয়া যাওয়া হইত না। সুতরাং আমাদের সরলপ্রাণা ঠাকুরমাগণ এ দেশে আগমনকারীকে পূর্ব্বোক্ত নিরীহ জন্তুটিতে পরিণত করিবেন, ইহাতে আর বিচিত্র কি?

তখন বিরল অধিবাসীবিশিষ্ট ক্ষুদ্র ও বৃহৎ পাহাড় শ্রেণীতে পরিবৃত আসাম প্রদেশ বঙ্গমাতার অযত্নসম্ভূত খাদ্য দ্রব্যে পরিপুষ্ট বাঙ্গালীর নিকট এক অপূর্ব্ব দুর্গম প্রদেশ বলিয়াই মনে হইত। তা ছাড়া ব্রহ্মপুত্র নদ তাঁহার নদীস্বভাব দুর্ল্লভ গাম্ভীর্য্য দ্বারা আসামকে আরও ভয়ানক করিয়া তুলিয়াছিলেন। আমাদের দেশে পদ্মানদী নিতান্ত বদরাগী বলিয়া পরিচিত; তবু তাকে ততটা পর বলিয়া বোধ হয় না। এত যে রাগ তবু অসংখ্য ধীবর সর্ব্বদা মাছ ধরিতেছে, বহু যাত্রীর নৌকা যাতায়াত করিতেছে, সেই এক দৃশ্য! আবার তীরে হয়ত তিনি একখানা গরিবের গৃহের অর্দ্ধাংশ দ্বারা জলযোগ করিয়াছেন, তথাপি নারিকেল সুপারি বাঁশ প্রভৃতি বেষ্টিত দুই একখানি বাড়ী দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, বধূরা ঘোমটা দিয়া জল নিতেছে, ছেলেরা কেহ দৌড়া দৌড়ি করিতেছে, ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের কেহ কেহ হয়ত উলঙ্গ হইয়া তীরে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সুতরাং পদ্মার তরঙ্গমালা সত্ত্বেও যেন ইহলোকেই আছি বলিয়া মনে হয়।

কিন্তু ব্রহ্মপুত্র পদ্মার মত রাগী না হইলেও বড় গম্ভীর; যেন নিতান্ত দরকারী কাজে দ্রুতবেগে কোথাও চলিয়াছেন, এ দিক ওদিক দেখিবার অবকাশ পান না। তীরস্থ স্থানগুলি ততোধিক গম্ভীর। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড উইর ঢিপির ন্যায় পাহাড়-শ্রেণীতে পরিবৃত, মাঝে মাঝে খানিকটা সমতল ভূমি, মানুষ বা জীব জন্তুর নাম গন্ধ নাই। সেকালে পদব্রজে এইরূপ প্রায় এক মাসের পথ অতিক্রম করিলে কামাখ্যায় পৌঁছা যাইত। যে নেতা ধোপানীর ঘাটে দেবতাদের কাপড় কাচা হইত বলিলে তখনকার লোকে অবিশ্বাস করিত না, সেই নেতা ধোপানীর ঘাট ধুবড়ী কামরূপের অর্দ্ধপথে অবস্থিত।

অধ্যবসায়ী এবং অদ্ভুতকর্ম্মা ইংরাজ ভেড়া হইবার ভয়ে ভীত হইবার লোক নহেন। ষ্টিমার করিয়া এক মাসের পথ ৪।৫ দিনের রাস্তা করিয়াছেন, আবার এ, বি, রেল পথে তো না করিয়াছেন এমন কাণ্ডই নাই। সমস্ত আসামের পাহাড় পর্ব্বতের মধ্য দিয়া রাস্তা করিয়া বাঙ্গালা ও আসামকে এপাড়া ওপাড়া করিয়া ফেলিয়াছেন বলিলেই হয়। পূর্ব্ববঙ্গ এবং আসাম লইয়া একটী স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠিত হওয়া অবধি গবর্ণমেণ্টও উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন, ঢাকা সহরকে এত দূরে রাখিয়া তাঁহাদের মন উঠিতেছে না; তাই কি যদি পারেন তবে যেন ঢাকাকে টানিয়া আনিয়া শিলঙ্গের কাছে বসাইতে পারিলে ছাড়েন না।

ব্রহ্মপুত্রই আসামের মূল নদ। ইহার উৎপত্তি সম্বন্ধে পৌরাণিক কাহিনী এই, যে কৈলাস পর্ব্বতের সীমান্তস্থিত গন্ধমাদন পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী লৌহিত্য নামক সরোবরের

তীরে শান্তনু নামক একজন মুনি তদীয় পত্নী অমোমার সহিত বাস করিতেন। ব্রহ্মা লোকোদ্ধারের মানসে নদী সৃষ্টি করিতে ইচ্ছুক হইয়া তাঁহাদিগকে স্বকীয় তেজ প্রদান করেন। তদ্দ্বারা শান্তনু-পত্নী অমোমা জলরাশি এবং তন্মধ্যে কিরীট ও নীলবস্ত্র-পরিশোভিত চতুর্ব্বাহু, রত্নমালা-ভূষিত এক পুত্র প্রসব করেন। শান্তনু উঁহাকে উত্তরে কৈলাস, দক্ষিণে গন্ধমাদন, পশ্চিমে জারুধি ও পূর্ব্বে সম্বর্ত্ত, এই পর্ব্বত চতুষ্টয়ের মধ্যে স্থাপন করেন। ইহাই ব্রহ্মকুণ্ড নামে খ্যাত। পরশুরাম মাতৃহত্যা পাপ হইতে মুক্ত হইবার নিমিত্ত যখন সমস্ত তীর্থ পর্য্যটন করেন, তখন এই ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করাতে তাঁহার হস্তস্থিত কুঠার খসিয়া যায়। তিনি ব্রহ্মকুণ্ডের প্রত্যক্ষ ফল দর্শনে মুগ্ধ হইয়া ব্রহ্মপুত্রকে পৃথিবীতে আনয়ন করেন। পর্ব্বত হইতে ব্রহ্মপুত্র যে স্থানে পতিত হইয়াছে, তাহাকে পরশুরামকুণ্ড কহে। আসামে ইংরাজ-রাজ্যের শেষ সীমা সদীয়া হইতে পরশুরামকুণ্ড নৌকাযোগে প্রায় ১২ দিনের পথ। তীর্থ করিবার মানসে কেহ কেহ ঐ স্থানে এখনও গমন করিয়া থাকেন। লৌহিত্য সরোবরে উৎপন্ন বলিয়া ব্রহ্মপুত্রের অপর নাম লৌহিত্য। (ক্রমশঃ)

শ্রীশতদলবাসিনী বিশ্বাস।
গৌহাটী।

রায় বাহাদুর।

(১)

গোপীনাথ বক্সীকে খালি চতুর লোক বলিলে, সে যাহা, তাহা ঠিক বুঝা যাইবে না। বিধাতা তাহাকে পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের অতিরিক্ত আর একটি ইন্দ্রিয় দিয়াছিলেন। সে সেই ইন্দ্রিয়ের বলে সকলের সেরা হইয়া উঠিয়াছিল। ধূর্ত্তামি, নষ্টামি, চালাকি ও প্যাচালো বুদ্ধিতে কেহই তাহার সঙ্গে পারিয়া উঠিত না। তাই সে রাতারাতি বড় মানুষ হইয়াছিল। নহিলে মুচিখোলার থানার রাইটার কনেষ্টবল-গিরিতে ঢুকিয়া পুলিসের বড়সাহেবের পদ পাওয়া কাহার কপালে ঘটে? কেই বা পাকা বাড়ী করিয়া বসিতে পারে?

লোকে বলে, আশার আর সীমা নাই। এই বক্সী-পুত্রেরও দেখিতেছি আশার সীমা পাওয়া যায় না। সে রাইটার কনেষ্টবলের কাজ হইতে পুলিশের বড় পদ পাইয়াছে; এখনও পায়ের উপর পা রাখিয়া দুই শত টাকা পেন্সন পকেটস্থ করিতেছে; তবু তাহার আশার নিবৃত্তি নাই। এখন তাহার দুইটী কামনা। একটি, সে রায় বাহাদুর হইবে, আর একটি, তাহার বি, এ পাশ ছেলেকে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট করিবে।

এই দুই কাজের জন্য যে কতটুকু তেল খরচ করা দরকার, সে জ্ঞান গোপীনাথের বেশ ভাল রকমই আছে। সেই জন্যই ত গোপীনাথ স্বদেশী আন্দোলনের ঘোর বিরোধী। দেশের লোক প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, কিছুতেই বিলাতি জিনিস কিনিবে না। গোপীনাথের প্রতিজ্ঞা, বিলাতি জিনিস পাইতে আর দেশী জিনিস কিনিবে না। শুধু কি তাই? গোপীনাথ সহরের এক জন অবৈতনিক গোয়েন্দা। এ কাজটি যে সরকার হইতে তাহাকে দেওয়া হইয়াছে, তাহা নয়। সাহেব সুবার মন রাখিয়া, নিজের মান বাড়াইবার জন্য নিজেই সে সখ করিয়া গ্রহণ করিয়াছে। সরকারের যে সকল মাইনা-করা গোয়েন্দা, তাহারা ত বাহিরের লোকের পশ্চাতেই লাগিয়া আছে। যে সকল মুন্সেফ, ডেপুটী সরকারের নুন খায়, কিন্তু আড়ালে গিয়া গুণ গায় স্বদেশী লোকের, তাহাদের চলাফেরা ও কথা-বার্ত্তার উপর চোখ কাণ রাখিয়া উপরওয়ালা সাহেবদের কাছে গিয়া যে লাগানো,—সেরূপ নীচতা সরকারী গোয়েন্দার নাই। সে কাজটা সম্প্রতি গোপীনাথের দ্বারাই সম্পন্ন হইয়া থাকে।

ছুটির দিন আসিলেই গোপীনাথের একটা জরুরি কাজ আসিয়া পড়ে—তাহাকে সাহেব সুবার কাছে গিয়া সেলাম ঠুকিতে হয়। আজ রবিবার। তাই গোপীনাথ চোগা-চাপকান পরিয়া, মাথায় মোগলাই পাগড়ি লাগাইয়া ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের বাসায় গিয়া পৌঁছিল। প্রথমেই চাপরাসীদের সঙ্গে দেখা হইল। গোপীনাথ একগাল হাসিয়া কহিল:—"কি গো চাপরাসী সাহেবেরা, ভাল আছ ত?" চাপরাসীরা হাসিয়া জবাব দিল:—"খোদার মেহের-বানীতে ভালই আছি।"

তার পর স্বয়ং ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। দুঃখের বিষয় ম্যাজিষ্ট্রেট একজন আইরিশম্যান; সেজন্য সেখানে বক্সীপুত্রের কথাবার্ত্তা তত জমে না। যা'হোক, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন :—

"কি বাবু, সহরের খবর কি? পূজার ছুটি ত আসিল। বাজারে বিলাতি জিনিস বিক্রি হয় ত?"

গোপী। কিচ্ছুই না। সমস্ত বাজার ঘুরিয়া এক গজ বিলাতি কাপড় কিম্বা সিকি পয়সার বিলাতি নুন পাওয়ার যো নাই। স্কুলের ছোঁড়াগুলা এমন করিয়া লোকের পেছনে লাগিয়া আছে যে, তাদের ভয়ে কেহ বিলাতি জিনিস বেচিতেও চায় না, কিনিতেও চায় না।

সাহেব। বটে! এত লোক জেলে গেল, তবুও ছেলেদের ভয় হয় না।

গোপী। ছেলেগুলা এক একটা পালের ষাঁড় হইয়া উঠিয়াছে। তাদের আবার ভয়! ওদের যাহারা নাচাইয়া তোলে, দেশের সেই মোড়লগুলাকে ধরিয়া জেলে না পুরিলে কিছুতেই কিছু হইবে না।

সাহেব। আচ্ছা বাবু, তুমিও ত এ দেশের লোক। নিজের জন্মভূমির দুরবস্থা দেখিয়া তোমার কি একটু কষ্ট হয় না? তুমি কেন দেশের লোকের বিরুদ্ধে বলিয়া বেড়াও?

গোপী। সাহেব, এতদিন নুণ খাইয়া মানুষ হইয়াছি সরকার বাহাদুরের, আজ কি গুণ গাহিতে যাইব দেশের লোকের?

সাহেব মনে মনে বলিলেন :—"ধিক্ এ দেশের লোককে! যাহাদের ভিতরটা গোলামিতে এতদুর পূর্ণ হইয়া গিয়াছে তাহারা আবার দেশকে উন্নত করিবে!" প্রকাশ্যে কহিলেন :—

"তোমার ছেলের ডেপুটি হওয়ার কি হইল? কমিসনার সাহেব কি কিছু আশা দিলেন?"

গোপী। হুজুর, কমিসনার সাহেবের আশা দেওয়ার দরকার কি? আপনার একটু কলমের খোঁচায়ই সব হইতে পারে।

সাহেব। না বাবু, আমার কোনই ক্ষমতা নাই।

ইহার পর গোপীনাথ সহরের মুন্সেফ, ডেপুটি ও সদরওয়ালাদের বিরুদ্ধে নানা কথা বলিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু সাহেব ঘড়ি খুলিয়া কহিলেন :—"ঢের সময় হইয়াছে, আর আমার কথা শুনিবার অবকাশ নাই।"

গোপীনাথ ক্ষুণ্ণমনে গৃহে চলিল। সাহেব আপন মনে বলিয়া উঠিলেন :—"ড্যাম্ রাস্কেল! আমি নেটিভদের ভিতর সব চেয়ে এই লোকটাকেই ঘৃণা করি; আর প্রতি রবিবার এই লোকটা আসিয়াই আমাকে জ্বালাতন করিবে। এবার চাপরাসীদের বলিয়া দিতে হইবে, এই লোকটা যেন আর আমার কুঠীতে ঢুকিতে না পারে।"

(২)

পূজার ছুটি। আফিস আদালত বন্ধ। সহরের লোকেরা অনেকেই বাড়ী চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু আমাদের গোপীনাথ এখনো সহরে থাকিয়া মোড়লগিরি করিতেছে। তাহার দেশে যাইবার ইচ্ছা নাই। কারণ, দেশে তাহার মোড়লগিরি করা চলে না। সেখানে কেহ তাহার তোয়াক্কা রাখে না, তাহাকে গ্রাহ্যও করে না। সহরের সকলেই বক্সীপুত্রকে মনে মনে ঘৃণা করে। তবু সে জজ কমিসনারের পেয়ারা লোক বলিয়া তাহাকে ভয় করিয়া চলিতে হয়, বাহিরে সম্মান প্রকাশ করিতে হয়।

বক্সীপুত্র প্রায়ই কোন নব্য মুন্সেফ কিম্বা তরুণবয়স্ক ডেপুটির বাড়ী গিয়া, দন্তবিহীন মুখে হাসিতে হাসিতে মুরব্বিয়ানা ঢঙে কহিবে :—"কি হে ভায়া, খবর ভাল ত? ছেলে মেয়েরা কেমন আছে?"

অমনি বাড়ীর কর্ত্তা সসম্ভ্রমে বলিয়া উঠিবেন :—"আসুতে আজ্ঞা হো'ক, বসুতে আজ্ঞা হো'ক। ওরে হরে, শীগ্‌গির তামাক সেজে নিয়ে আয় ত!"

বক্সীপুত্র কহিবে :—"ছুটিতে কোথায় যাবে হে?"

গৃহকর্ত্তা। আজ্ঞে শরীরটা বড় ভাল নয়। তাই মধুপুর যাব মনে করেছি।

বক্সী। ঐ ত তোমাদের কল্‌কাতার বাবুদের একটা রোগ। ছুটির সময় পশ্চিমে হাওয়াটা গায়ে লাগাতেই হবে। নইলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায়!

গোপীনাথ সহরে এইরূপ মুরব্বিয়ানা চাল চালে। গ্রামে গিয়া "হংসমধ্যে বকো যথা" হইতে তাহার ইচ্ছা হইবে কেন? তাহাতে আবার গ্রামের লোকেরা ভয়ানক স্বদেশী। তাহারা সকলে এমন জোট হইয়াছে যে,

সেখানে ম্যাজিষ্ট্রেট গিয়া সিকি পয়সার বিলাতি জিনিস বিক্রীর বন্দোবস্ত করিতে পারেন নাই।

কিন্তু বক্সীগৃহিণীও বুদ্ধির জিলাপির প্যাচ খেলিতে জানেন। তাঁহার একটা মতলব সিদ্ধির জন্য গ্রামে যাওয়া দরকার। কাজেই গোপীনাথকে তিনি ধরিয়া বসিলেন। কহিলেন :—"এই পূজার ছুটিতে দেশে যাইতেই হইবে। নূতন বাড়ীখানা করা গিয়াছে, দুদিন সেখানে বাস না করিলে কেমন হয় ? সব জিনিস পত্র একটা কুঠরিতে বন্ধ করিয়া আসিয়াছি, সেগুলি আছে না চুরি গিয়াছে, বাগানের গাছপালাগুলি গাঁয়ের ছোঁড়াদের দৌরাত্মে আছে না নষ্ট হইয়াছে, তাহাও ত একবার দেখা দরকার।"

গোপীনাথ গৃহিণীর কথায় নরম হইল। দেশে গিয়া কয়েক দিন বাস করাই ঠিক করিল। এক দিন একখানা নৌকা ভাড়া করিয়া কুসুমপুর গ্রামে গিয়া উপস্থিত হইল।

কিন্তু গৃহিণী যে তাঁহার কোন্ মতলব সিদ্ধির জন্য গোপীনাথকে দেশে লইয়া গিয়াছেন, সে কথা এখানে ভাঙ্গিয়া বলা দরকার। তার আগে আমরা গোপীনাথের পুত্র শ্রীমান্ নন্দলালের সম্বন্ধে দু'একটা কথা বলিয়া রাখি।

নন্দলাল বি, এ পাশ। তাহার বাপ সেকেলে ধরণের, কিন্তু নন্দলাল একেবারে উল্টা। সে যুবকদের হাল ফ্যাসানের আদব কায়দায় সম্পূর্ণ অভ্যস্ত হইয়াছে। দেব দেবতায় তাহার একটুকু বিশ্বাস নাই। তা ছাড়া শিবরাম পাঁড়ের তৈরী মাছের ঝোলের চেয়ে, রহিম বাবুর্চ্চির তৈরী মুরগির মাংস তাহার ঢের ভাল লাগে। নন্দলাল যে দশ বছরের নোলক-পরা অশিক্ষিতা মেয়েকে বিবাহ করিবে, তাহা হইতেই পারে না। এজন্য সে বি, এ পাশ করিয়াও বিবাহের জন্য তেমন আগ্রহ প্রকাশ করে নাই। তাহার বাপ পুলিসের কাজে মানুষ ঠেঙ্গাইয়া প্রকৃতিকে এমন করিয়া তুলিয়াছে যে, নিজের পরিবারের কেহ তাহার মতের বিরুদ্ধে চলিলে, পরিবারকেও পুলিসের থানা করিয়া তুলিতে পারে। চাই কি ছেলের পিঠেই দুই এক ঘা লাগাইয়া দিল। সেই ভয়ে নন্দলাল আপনার মনের কথা বাপকে জানাইতে পারে না। কিন্তু মায়ের কাছেও তাহা গোপন থাকে না। মায়ের সবে একটি মাত্র সন্তান ঐ নন্দলাল। তাই তিনি ছেলের সকল আব্দারই সহ্য করেন।

গৃহিণী কোন্ মতলবে কুসুমপুর যাইতেছেন, তাহা এই বার বলিতেছি। কুসুমপুরের কালীকিঙ্কর চৌধুরী দেশের মধ্যে সকলের চেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি। এক সময় তাঁহারাই এ প্রদেশের জমিদার ছিলেন। কিন্তু চঞ্চলা লক্ষ্মীর চঞ্চলতায় তাঁহার পিতামহ সমস্ত সম্পত্তিই হারাইয়াছেন। এখন কালীকিঙ্কর বাবুর কিছু নাখেরাজ জমি এবং বসত বাড়ী খানি আছে। তাহাতেই কষ্টেসৃষ্টে দিন চলিয়া যায়।

কিন্তু তথাপি কালীকিঙ্কর বাবু প্রাচীন বনিয়াদি ঘরের অতি সদ্বংশজাত লোক বলিয়া সর্ব্বত্র তাঁহার সম্মান। আর তিনি যথার্থই সম্মানের পাত্র। তাঁহার ন্যায় সজ্জন ও পরদুঃখকাতর ব্যক্তি এ অঞ্চলে বড় দেখা যায় না। এই কালীকিঙ্কর বাবুর কন্যা কমলা বড়ই সুন্দরী। শুধু সুন্দরী নহে। কমলা একটু লেখা পড়া জানে ও একটু গান করিতে ও বাজাইতে পারে। কমলার মা কলিকাতার একজন সমাজ-সংস্কারকের মেয়ে। তিনি বাল্যকালে বেথুন স্কুলে পড়িয়াছেন। তাঁহার নিকটই কমলা একটু লেখা পড়া শিখিয়াছে। তা ছাড়া মামাবাড়ীতে মামাদের কাছে গান গাহিতে এবং হারমোনিয়ম বাজাইতেও শিখিয়াছে।

কমলার এই গুণের কথা নন্দলাল আগেই শুনিয়াছিল। সম্প্রতি গ্রামে আসিয়া কমলাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছে। তাহার প্রতিজ্ঞা—হয় সে কমলাকে বিবাহ করিবে, নয় ত অবিবাহিত থাকিবে।

কিন্তু এই প্রতিজ্ঞার কথা গোপীনাথকে কে বলিবে ? সে ত শুনিলেই তেলে বেগুণে জ্বলিয়া উঠিবে। ছেলে নিজের বিবাহের পাত্রী নিজে পছন্দ করিয়া বিবাহ করিবে, ইহা তাহার নিকট স্পর্দ্ধার কথা। তা ছাড়া ছেলের বিবাহ সম্বন্ধে তাহার নিজের মনে মনে একটা মতলব আছে। গোপীনাথ ভাবিয়াছে, যে মেয়ের বাপের কপালের খুব জোর আছে, সে-ই তাহার মত পদস্থ লোকের ছেলের কাছে কন্যাদান করিতে পারিবে। তার পর গোপীনাথ যদি ছেলেকে একটা হাকিম করিয়া দিতে পারে, তবে ত আর কথাই নাই। তখন যে ধনী, নিজের রাজকন্যার মত মেয়েটীর সঙ্গে অর্দ্ধেক রাজত্ব দান করিতে পারিবে, তাহার মেয়ের সঙ্গেই ছেলের বিবাহ হইবে। কিন্তু কালীকিঙ্কর চৌধুরীর মেয়েটী রাজকন্যার মত হইলেও

তাহার অর্থের সংস্থান নাই। বিবাহের খরচ পত্রের জন্য হয় ত তাহার নাখেরাজ জমির কয়েক বিঘা বিক্রী করিতে হইবে। এরূপ অবস্থায় গোপীনাথ বক্সী যে কমলার সঙ্গে ছেলের বিবাহ দিবে, সে আশা দুরাশা মাত্র।

তবে বক্সী-গৃহিণী একেবারে নিরাশ নহেন। তিনি জানেন, গোপীনাথের মনের একদিকে একটি ছিদ্র আছে। সেই ছিদ্রটির ভিতর দিয়া ছুঁচ হইয়া প্রবেশ করিতে পারিলে ফাল হইয়া বাহির হওয়াও অসম্ভব নহে। গোপীনাথের নিজের চেহারা ঠিক্ ছোটনাগপুরের সাঁওতালের মত, গৃহিণীর গুণে যদিচ ছেলেটির মুখখানি বড় মিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু বর্ণ সম্বন্ধে সে পিতারই উত্তরাধিকারী। এ জন্য গোপীনাথ একটি ফর্সা টুক্‌টুকে মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিবাহ দিতে চাহেন। তা কমলার মত অমন ফর্সা মেয়ে আর কোথায় পাওয়া যায়? তাহার গায়ের রং যেন ঠিক চাঁপাফুলের রঙের মত। তাই ত গৃহিণী গোপীনাথকে দেশে আনিয়াছেন। যদি সুন্দরী মেয়েটী দেখাইয়া তাহার মন ভুলাইতে পারেন।

(৩)

গোপীনাথ দেশে আসিল। গৃহিণী একদিন কমলাকে তাহার সম্মুখে আনিয়া হাজির করিলেন। গোপীনাথ কমলার অতুল রূপরাশি দেখিয়া বিস্মিত হইল। গৃহিণীকে কহিল :—"হাঁ গা, ইটি কাদের মেয়ে?

গৃহিণী। চৌধুরীদের।

গোপী। বটে! তা যেমন বংশ, তেম্নি মেয়ে। মেয়েটির বিয়ে হয়েছে?

বিবাহের কথা শুনিয়া কমলা লজ্জিত হইল। এবং অন্যত্র চলিয়া গেল।

গৃহিণী কহিলেন :—"না, এখনো বিয়ে হয় নাই।"

গোপী। মেয়ের ত বয়স কম হয় নাই।

গৃহিণী। বয়স কম না হইলে কি হইবে? বর জুটিলে ত বিয়ে।

গোপী। এমন সুন্দরী মেয়েরও বর জোটে না?

গৃহিণী। ওগো, সুন্দরে কি তোমাদের মন উঠে? সুন্দরী মেয়ের আঁচলে যে অনেকখানি সোণা বাঁধিয়া দেওয়া চাই। নইলে মেয়ে হওয়ায় যে পাপ হইয়াছে তাহার প্রায়শ্চিত্ত হয় কই?

ইহার পর গৃহিণী নানা কথায় টালবাহানা করিয়া, ছেলের বিয়ের কথা উপস্থিত করিলেন। কহিলেন :—

"ছেলের এত বয়স হইল, তবু তাহার বিবাহের চেষ্টা কর না। আজ কালকার ছেলেদের চাল চলন ভাল নয়। যদি একটা খিষ্টান মিষ্টানের মেয়ে বিয়ে করিয়া বসে, তাহা হইলে কি হইবে? আমার ঐ একমাত্র ছেলে; আমি যদি তাহাকে লইয়া ঘর করিতে না পারি, তাহা হইলে বিষ খাইয়া মরিব!"

অবসর প্রাপ্ত পুলিস কর্ম্মচারী গোপীনাথ এ কথার কোন জবাব দেওয়া আবশ্যক মনে করিল না। গৃহিণী কহিলেন :—"আমার ইচ্ছা চৌধুরীদের মেয়ে কমলাকেই ছেলের বউ করিয়া ঘরে আনি। তা আমার পোড়াকপালে কি এমন সুখও আছে? অমন ভাল বংশের মেয়ে কি আমার ঘরে আসিবে? তোমার খালি টাকার দিকেই নজর। বউ ভাল না হইলে টাকা ধুইয়া কি জল খাইব? টাকায় দরকার? ছেলে হাকিম হইলে আমার টাকা কে খাইবে, তাহার ঠিক নাই; আমি আবার পরের টাকা কাড়াকাড়ি করিতে যাইব কোন্ লোভে? আর তাতেই কি কিছু লাভ আছে? টাকার খাতিরে বড় লোকের মেয়ে ঘরে আনিব, কিন্তু তাহার দেমাকের চোটে ঘরে টেকা দায় হইবে। একদিন হেঁসেলে যাইতে বলিলেই নবাবের ঝির ঠ্যাকার ঠ্যাকার দেখিয়া চক্ষু স্থির হইবে।"

কথাগুলি গোপীনাথের মনে লাগিল। কে বলিবে কমলার মুখশ্রীর মধ্যে কি লুকানো ছিল, তাহাতে গোপীনাথের পাষাণ মন একটু গলিয়াছিল। তার পর গৃহিণীর শেষের কথাটাও সত্য বলিয়া মনে হইল। কোন ধনীর অর্দ্ধেক রাজত্বের সহিত কন্যাটিকে গৃহে আনিলে, তাহার রাণীগিরির দায়ে যে শেষকালে নিজের লোহার সিন্দুকেই হাত পড়িবে; নহিলে ছেলেটীকেই বিগড়াইয়া দিবে; ছেলে নিজের বাপের চেয়ে স্ত্রীর বাপেরই পক্ষপাতী হইয়া বসিবে;—এ সকল কথা এতদিন গোপীনাথের মনে জাগে নাই। আজ গৃহিণীর কথায় গোপীনাথের এক নূতন চিন্তার রাজ্য খুলিয়া গেল।

বলা বাহুল্য যে, গৃহিণী কর্ত্তাটির কাছে চতুরালী করিয়া, আপন অভীষ্ট সিদ্ধ করিলেন। গোপীনাথ অর্থগ্রহণ না করিয়াই কমলার সঙ্গে ছেলের বিবাহ ঠিক্ করিতে রাজি হইলেন।

(৪)

গোপীনাথ বংশে অতি হীন। কুলীন কালীকিঙ্কর চৌধুরী তাঁহারই ছেলের সঙ্গে যে মেয়ের বিবাহ দিবেন, তাহা স্বপ্নেও ভাবেন নাই। কিন্তু নিজের দুরবস্থার কথা ভাবিয়া নন্দলালের সঙ্গেই কমলার বিবাহ দিতে সম্মত হইলেন। বিবাহ ঠিক্ হওয়ার পূর্ব্বে নন্দলাল কমলার সঙ্গে আলাপ করিতে চাহিল। তাহাতে কালীকিঙ্কর বাবুর আপত্তি হইল না। তাই নন্দলাল কল্কাপেড়ে ফরাসডাঙ্গার ধুতি পড়িয়া, সিল্কের জামায় ও চাদরে সজ্জিত হইয়া, ঘড়ি চেইন ঝুলাইয়া এবং সর্ব্বাঙ্গে সুগন্ধদ্রব্য মাখিয়া চৌধুরী বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইল।

কিন্তু কমলার সাজসজ্জা বড় বেশী নহে। তাহার পরণে একখানি বোম্বাই শাড়ী, গায়ে সিল্কের জ্যাকেট, কাণে দুটি সোণার ফুল, গলায় একটি নেক্লেস্ এবং হাতে কয়েকগাছি সোণার চুড়ি শোভা পাইতেছিল। যেমন সুন্দর গাছটিতে দুচারিটি ফুল ফুটিলেই তাহার সৌন্দর্য্যের আর সীমা থাকে না, তেমনি এই সুন্দরী বালিকার দুচারিখানি গহনায়ই সৌন্দর্য্যের আর সীমা রহিল না। কমলার স্নেহময় পিতা শীঘ্র কমলাকে এরূপ স্বর্ণাভরণে এবং রমণীয় বসনে সুসজ্জিতা দেখেন নাই। তাই আজ তিনি কমলাকে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। কমলা যখন লজ্জানম্রমুখে নন্দলালের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন পিতার স্নেহোচ্ছ্বসিত হৃদয়ে এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের সঞ্চার হইল। তিনি ভাবিলেন—এই বিজয়া দশমীর দিন যে দুর্গা প্রতিমাকে নদীর জলে বিসর্জ্জন করিয়া আসিয়াছেন, আজ সেই প্রতিমাই যেন তরুণ লাবণ্যে মনোমোহিনী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়াছেন!

কমলার পিতা কন্যার অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি শুভ্র ললাট, বঙ্কিম ভ্রূযুগল মধ্যস্থিত নীলোৎপল নেত্র, কুসুমের দলের ন্যায় দুখানি সুকোমল গণ্ড—এবং পৃষ্ঠে বিলম্বিত মেঘমালার তুল্য কৃষ্ণ কেশরাজি, দেখিতে দেখিতে ভাবিতে লাগিলেন, "এই কি আমারই কন্যা কমলা?" অশ্রুতে তাঁহার নয়ন-পল্লব আর্দ্র হইয়া গেল।

নন্দলাল সেই সৌন্দর্য্যপ্রতিমার পানে চাহিয়া লজ্জা ও পুলকে অভিভূত হইয়া পড়িল। তাহার আর কথা বলিবার শক্তি রহিল না। নন্দলালের সঙ্গী একজন বন্ধু কমলাকে জিজ্ঞাসা করিল:—"তুমি কি স্কুলে পড়?"

কমলা লজ্জায় আর মাথা উঁচু করিতে পারিল না। তাহার কণ্ঠ হইতে একটি বাক্যও নির্গত হইল না। তখন কমলার পিতা কহিলেন:—"মা, লজ্জা কি? উনি যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তাহার জবাব দাও।"

কমলা। আমি স্কুলে পড়ি না। আগে মায়ের কাছে পড়িতাম।

বন্ধু। এখন কি কিছুই পড় না?

কমলা। এখন খবরের কাগজ, মাসিক পত্রিকা, আর বাবা যে বই আনিয়া দেন, তাহা পড়ি।

বন্ধু। বটে! তুমি মাসিক পত্রিকা পড়? মাসিক পত্রে কখনো কিছু লিখিয়াছ?

কমলা আবার লজ্জায় আকুল হইল। আবার পিতার অনুরোধে বলিল:—"মুকুলে আর বামাবোধিনীতে আমার কয়টা কবিতা ছাপা হইয়াছে, তাহা ভাল হয় নাই।"

বন্ধু। তুমি হারমোনিয়াম বাজাইতে কি গান গাহিতে জান?

কমলার মুখ লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল। স্নেহমুগ্ধ পিতা কন্যার গুণপণা দেখাইবার জন্য তৎক্ষণাৎ একটি হারমোনিয়াম লইয়া আসিলেন; এবং কহিলেন:—"মা, এঁরা শিক্ষিত লোক। মেয়েদের অধিক লজ্জা পছন্দ করেন না। আমার অনুরোধ রাখ। এঁদের একটি গান গাহিয়া শুনাও।"

কমলা পিতার অনুরোধ অগ্রাহ্য করিতে পারে না। তাই মধুর কণ্ঠে একটি স্বদেশী সঙ্গীত গাহিতে লাগিল। অল্প ক্ষণের জন্য চারিদিকে যেন সুধাবৃষ্টি হইল।

ইহার পর নন্দলাল ও তাহার বন্ধু জলযোগ করিয়া গৃহে গমন করিল। (ক্রমশঃ)

শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত।

অহল্যাবাই।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

অহল্যাবাই স্বরাজ্যের শাসন সংরক্ষণে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন, কিন্তু একমাত্র ইহাই তাঁহার প্রতিভার পরিচায়ক নহে; তিনি কূট নীতিতেও বিচক্ষণ ছিলেন। তিনি পার্শ্ববর্ত্তী রাজন্যগণের সহিত ব্যবহার কালে যথেষ্ট বুদ্ধিকৌশলের পরিচয় দিতেন; ইহার ফলে তাঁহার সুদীর্ঘ রাজত্বকালে (৩০ বৎসর) হোলকার রাজ্য একবারও বহিঃশত্রুর আক্রমণে উৎপীড়িত হয় নাই। অহল্যাবাই অসংখ্য দেব-মন্দির, ধর্ম্মশালা, দুর্গ, কূপ এবং বিন্ধ্যপর্ব্বত-মালার গাত্র দিয়া একটি রাজপথ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।* কেবল মনুষ্যের প্রতি দয়া প্রদর্শন করিয়াই তাঁহার দয়াবৃত্তি পরিতৃপ্ত হয় নাই। তিনি গ্রীষ্মকালে পশুপক্ষী প্রভৃতি ইতর প্রাণীর জন্য জল পানের বন্দোবস্ত করিয়া রাখিতেন; এমন কি মৎস্যাদিও তাঁহার দয়ার অংশ লাভ করিত।

অহল্যাবাই খর্ব্বাকৃতি, কৃশাঙ্গী ও কৃষ্ণবর্ণ ছিলেন। তাঁহার সৌন্দর্য্যের খ্যাতি ছিল না। রাঘবের পত্নী অনন্ত-বাই একজন পরম রূপলাবণ্যবতী রমণী ছিলেন, কিন্তু দৈহিক সৌন্দর্য্যে কি হয়, তাঁহার অন্তঃকরণ অতিশয় কুৎসিৎ ছিল। অহল্যাবাইয়ের সর্ব্বব্যাপী প্রশংসা ও প্রতিপত্তিতে তাঁহার হৃদয়ে ঈর্ষার সঞ্চার হয়। একদা তিনি অহল্যার অঙ্গসৌষ্ঠব কিপ্রকার, তাহা দেখিবার জন্য জনৈক পরিচারিকাকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ঐ রমণী প্রত্যাগত হইয়া নিবেদন করে, অহল্যাবাই সুন্দরী নহেন, কিন্তু তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে একটি স্বর্গীয় জ্যোতিঃ খেলিয়া বেড়াইতেছে। এই বাক্যে অনন্তবাইয়ের ঈর্ষাকুল হৃদয় তৃপ্তি লাভ করে; কিন্তু অহল্যাবাইয়ের শারীরিক সৌন্দর্য্যের অভাব থাকিলেও তাঁহার মুখে চোখে মানসিক সৌন্দর্য্যের আভা প্রস্ফুট দেখা যাইত। প্রকৃতি তাঁহাকে শারীরিক সৌন্দর্য্যে ভূষিত করিবার সময় কার্পণ্য করিয়াছিলেন, কিন্তু তীক্ষ্মবুদ্ধি, সরল বোধ-শক্তি, সতেজ মনস্বিতা এবং নির্ম্মল চরিত্র দ্বারা সে ক্ষতি পূর্ণ হইয়াছিল। শারীরিক সৌন্দর্য্য অপেক্ষা মানসিক গুণরাজিই লোকাদর লাভের প্রকৃষ্টতর উপায়। ফলতঃ অহল্যাবাই শারীরিক সৌন্দর্য্যে বঞ্চিত হই-য়াও মানসিক গুণের জন্য সর্ব্বলোকপ্রিয় ছিলেন।

তৎকালীন ভারত-রমণীর যে প্রকার মানসিক উন্নতি সাধিত হইত, তদপেক্ষা অহল্যাবাইয়ের শিক্ষা গভীর ও প্রশস্ত ছিল। তিনি বাল্য কালে লিখিতে পড়িতে শিক্ষা করিয়াছিলেন কি না তাহা নিশ্চয়রূপে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না; কিন্তু তিনি উত্তর কালে যে প্রকার অসাধারণ মনস্বিতা ও উদারতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা বাল্যকালে জ্ঞানার্জ্জন ও মানসিক বৃত্তি সমূহের অনুশীলন ব্যতীত সম্ভবপর নহে। অহল্যাবাইয়ের চরিত্র অসাধারণ গুণবিশিষ্ট ছিল; নারী-হৃদয়ে আত্মগরিমা-শূন্যতা, ধর্ম্মান্ধ হইলেও পরধর্ম্ম পীড়ণ-বিমুখতা, মন কুসংস্কারবিদ্ধ হইলেও তাহাতে কেবল স্বদেশ ও স্বজাতির উন্নতি চিন্তা, এবং যথেচ্ছ শাসনকর্ত্রী হইলেও প্রকৃত দীনভাব ও সুদৃঢ় আত্মসংযম, তাঁহার চরিত্রের বিশেষত্ব ছিল। হোলকার-রাজ্যবাসীরা তাঁহার স্মৃতির সহিত ঈদৃশ গুণরাজি জড়িত করিয়া তাঁহাকে ভক্তি ও প্রীতির পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতেছে; অহল্যাবাই সে দেশে ঈশ্বরের অবতার রূপে পূজিত হইতেছেন। সর্ব্ব প্রকার অতিরঞ্জন ছাড়িয়া দিলেও ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, অহল্যাবাই পৃথিবীর পবিত্রমনা আদর্শ-চরিত্র রাজন্যমণ্ডলীতে আসন লাভের যোগ্য, এবং সৃষ্টিকর্ত্তা জগদীশ্বরের ইচ্ছার অধীন হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে মানবাত্মার কিপ্রকার মঙ্গল বিধান হয়, তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

এই পুণ্যবতী মনস্বিনীর শেষ জীবন শোচনীয় পারি-বারিক দুর্ঘটনায় ক্লিষ্ট হইয়াছিল। অহল্যাবাইয়ের পুত্র মল্লিরাও অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়া মাতার হৃদয়ে শোক-শল্য বিদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার শোকাচ্ছন্ন হৃদয়ে কন্যা মুচাবাই সান্ত্বনা আনয়ন করিতেন। মুচাবাই গুণবতী ও মাতার উপযুক্ত কন্যা ছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি অহল্যাবাইয়ের শেষ বয়সে বিধবা হন এবং সহমৃতা

* অহল্যাবাই শ্রীক্ষেত্র, গয়া, বারাণসী, কেদারনাথ, দ্বারকা ও সেতুবন্ধ প্রভৃতি তীর্থস্থানে ধর্ম্মভবন প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, এবং তৎসমুদয়ের ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য বার্ষিক সাহায্য প্রদান করিতেন। বারাণসী নগরীস্থিত বর্ত্তমান বিশ্বেশ্বরের মন্দির অহল্যাবাইয়ের কীর্ত্তিস্তম্ভরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। গয়ার মহাদেবের মন্দিরও অহল্যাবাইয়ের নির্ম্মিত।

হইবার সংকল্প প্রকাশ করেন। অহল্যাবাই তাঁহাকে নিবৃত্ত করিবার অভিলাষে নানা প্রকার যুক্তি তর্কের অবতারণা করেন; মুচার অভাবে তাঁহার জীবন কি প্রকার দুঃসহ হইবে, তাঁহার শোকক্ষত হৃদয় কি ভাবে আরও ক্ষত বিক্ষত হইবে, তাহা বিশদভাবে বর্ণিত হইল। কিন্তু মুচাবাই সকল, উপেক্ষা করিয়া বলিলেন, "মা, তুমি বৃদ্ধা হইয়াছ; আর কয়েক বৎসর মধ্যে তোমার পবিত্র জীবনের শেষ হইবে; আমি পতিপুত্রহীনা। মা! তুমিও যখন আমাকে ছাড়িয়া যাইবে, তখন আমার কি দশা হইবে, তাহা একবার ভাবিয়া দেখ। জীবন অসহ্য হইয়া উঠিবে, কিন্তু সগৌরবে জীবন নাশের উপায় থাকিবে না।" অহল্যাবাই মুচাবাইকে এতদূর দৃঢ়সংকল্প দেখিয়া অগত্যা সহমরণের জন্য অনুমতি দিলেন। চিতা সজ্জিত হইল; মুচাবাই অবিচলিত চিত্তে তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু চিতা জ্বলিয়া উঠিলে তাঁহার সকল সংকল্প ভাসিয়া গেল, তিনি অসহ্য যন্ত্রনায় চীৎকার করিতে লাগিলেন। অহল্যাবাই কন্যার আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিয়া তাঁহার উদ্ধারের জন্য ছুটিয়া চলিলেন। কিন্তু সমবেত জনমণ্ডলী তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিল; তাঁহার মূর্চ্ছা হইতে লাগিল। অচিরে চিতাসহ মুচাবাইয়ের মৃতদেহ ভস্মসাৎ হইল। অতঃপর অহল্যাবাই বহু কষ্টে আত্মসম্বরণ করিয়া নর্ম্মদা সলিলে অবগাহন পূর্ব্বক রাজপ্রাসাদে প্রত্যাগমন করিলেন, এবং গভীর শোকে মগ্ন হইয়া তিন অহোরাত্র বাসগৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া রহিলেন। এই দুর্ঘটনায় তাঁহার জরাজীর্ণ দেহ একবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল।

১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে অহল্যাবাই প্রাণ পরিত্যাগ করেন। * "তিনি চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহার সৎ কীর্ত্তি পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে। মৃত্যুর পর যাঁহার সৎগুণ (সুযশঃ) বর্ত্তমান থাকে, তিনি তদপেক্ষা আর কি উৎকৃষ্ট বস্তু কামনা করিতে পারেন?"

শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

জাতীয় মহাসমিতি—এবার নাগপুরে জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশন হইবে, এরূপ স্থির ছিল। কিন্তু নাগপুরের "নরম" ও "গরম" দলের মধ্যে মহাসমিতি-সংসৃষ্ট নানা বিষয়ে মতের অনৈক্য হওয়ায় "অল্ ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটী" এবার বোম্বাইয়ের অন্তর্গত সুরাটে কংগ্রেস করা স্থির করিয়াছেন। দেশের কার্য্যে নাগপুরের উভয় দল একত্র মিলিতে পারিলেন না, ইহা নিতান্তই লজ্জার কথা। সুরাটে দ্রুতগতিতে মহাসমিতির মন্দির নির্ম্মাণাদি কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। বোধ হয় সেখানে মহাসমিতির আনুষঙ্গিক অন্যান্য সভাসমিতির অধিবেশনেরও আয়োজন হইতেছে। ভারত-মহিলা পরিষদের কথাও আশা করি শীঘ্রই শুনিতে পাইব। সারা বৎসর নীরব থাকিয়া বৎসরে একদিন পরিষদের অধিবেশনেও লাভ আছে, স্বীকার করি, কিন্তু সমগ্র বৎসরের নীরবতা ভঙ্গ করিয়া পরিষদ কি প্রকৃত কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে পারেন না?

বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনী—অনেক বাধাবিপত্তির পর এবার কাশিমবাজারে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনীর প্রথম অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সভায় নানা বিষয়ের আলোচনা হইয়াছিল। এই সম্মিলন উপলক্ষে মহারাজা মুনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহাশয় প্রবল সাহিত্যানুরাগ ও বদান্যতার বিশেষ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

---

* অহল্যাবাইয়ের মৃত্যুর পর তাঁহার প্রধান অমাত্য তুকাজী হোলকার-রাজ্যের আধিপত্য লাভ করেন। অহল্যাবাইয়ের মৃত্যুর পর তুকাজী মাত্র দুই বৎসর জীবিত ছিলেন। অতঃপর তাঁহার পুত্র যশোবন্ত রাও রাজ্যাধিকারী হন। মলহর রাও, অহল্যাবাই, তুকাজী ও যশোবন্ত রাওয়ের অধীনে রাজ্যের রাজস্বের পরিমাণ ৭৫ লক্ষ মুদ্রা ছিল। যশোবন্ত রাও শেষ জীবনে বিকৃতমনা হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার অল্পবয়স্ক পুত্র মলহর রাও রাজত্ব লাভ করেন। এই সময় পেশওয়ার সহিত ইংরাজের যুদ্ধ উপস্থিত হয়। অমাত্যগণের প্ররোচনায় মলহর রাও পেশওয়ার পক্ষ অবলম্বন করেন। ইহাতে ইংরাজের সহিত হোলকার-সৈন্যের যুদ্ধ উপস্থিত হয়। ইংরেজ যুদ্ধক্ষেত্রে জয়লাভ করেন এবং হোলকার রাজ্যের বিপুল অংশ ইংরাজ এবং ইংরেজ-পক্ষাশ্রিত সামন্তগণের হস্তগত হয়। হোলকার রাজ্যের বর্ত্তমান পরিমাণ ৮২১৮ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা •৭৬১০০ ও রাজস্ব ৩০ লক্ষ।

উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব—"সন্ধ্যা"-সম্পাদক উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব একজন নিঃস্বার্থ উৎসাহী দেশসেবক ছিলেন। সমগ্র মনপ্রাণ তিনি দেশের সেবায় ঢালিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার অকালমৃত্যুতে দেশের যে ক্ষতি হইয়াছে তাহা সহজে পূর্ণ হইবার নহে।

মুসলমান বালিকাবিদ্যালয়—মুসলমান সমাজে স্ত্রীশিক্ষার দুরবস্থার কথা আমরা পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিয়াছি। সুখের বিষয় মুসলমান ভ্রাতাগণের দৃষ্টি ধীরে ধীরে এদিকে আকৃষ্ট হইতেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানবাসী মুসলমানগণের মধ্যে যে জাতীয় জাগরণের নূতন চিহ্ন দেখা যাইতেছে, স্ত্রীশিক্ষার আশানুরূপ বিস্তার না হইলে তাহা কখনই স্থায়ী হইতে পারিবে না। পৃথিবীর অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, এখন নারীগণকে উপেক্ষা করিলে আর চলিতেছে না। আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম, যে ভারতীয় মুসলমান যুবকদিগকে জাতীয় ভাবে সুশিক্ষা প্রদানের জন্য আলিগড়ে যেমন একটী কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, মুসলমান বালিকাদিগকে সেই ভাবে শিক্ষা দানের জন্যও সেখানে একটী বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আয়োজন হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট এই জন্য এককালীন পোনর হাজার ও মাসিক অনধিক আড়াই শত টাকা সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। বালিকাদিগের জন্য পুস্তক প্রণয়নের নিমিত্ত ভুপালের বেগম সাহেবা পাঁচ হাজার টাকা দান করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

নিজাম-রাজ্য হাইদ্রাবাদেও সম্প্রতি একজন সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত মুসলমান-মহিলার উদ্যোগে ও জনৈক ইংরেজ-মহিলার সাহায্যে একটী বালিকাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মুসলমান সমাজের অভিমতানুযায়ী পর্দ্দা-প্রথা রক্ষা করিয়া এখানে শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আশা করা যায়, হাইদ্রাবাদের সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারের মহিলাগণও এই বিদ্যালয়ে যোগ দান করিবেন।

নারীর বীরত্ব—অবরোধ-প্রথা আমাদের নারীদিগকে কি প্রকার অসহায় করিয়া ফেলিয়াছে, রেলে চলিতে তাহার দৃষ্টান্ত নিত্যই দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের কোমলাঙ্গী বঙ্গবালাগণ আপাদমস্তক বস্ত্রাবৃত করিয়া যে ভাবে রেল গাড়ীতে আরোহণ ও গাড়ী হইতে অবতরণ করেন তাহাতে তাঁহাদিগকে লইয়া পথ চলা পুরুষ আত্মীয়গণের পক্ষে নিতান্ত ভারবহ বোধ হয়। দুর্বৃত্তগণ এই সকল অসহায় নারীগণের উপর সহজেই যে পৈশাচিক অত্যাচার করিতে পারে ইহা কিছুমাত্র আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। আমাদের মহারাষ্ট্র-ভগিনীগণের মধ্যে এই অবরোধ-প্রথা নাই। সুতরাং তাঁহারা স্বভাবতঃই সপ্রতিভ ও তেজস্বিনী। নাগপুর অঞ্চলে সম্প্রতি একজন কনেষ্টবল একটী মহারাষ্ট্র-রমণীর প্রতি অত্যাচার করিতে অগ্রসর হইয়াছিল। রমণী তীক্ষ্ণ ছুরিকার আঘাতে সেই কনেষ্টবলকে শমন-সদনে প্রেরণ করিয়াছেন। বঙ্গমহিলাগণও যতদিন এইরূপ করিতে না পারিবেন ততদিন নরপশুদিগের হস্তে তাঁহাদের লাঞ্ছনা অনিবার্য্য।

২৫ নং রায়বাগান ষ্ট্রীট্; ভারতমিহির যন্ত্রে সান্যাল এণ্ড কোম্পানী দ্বারা মুদ্রিত।
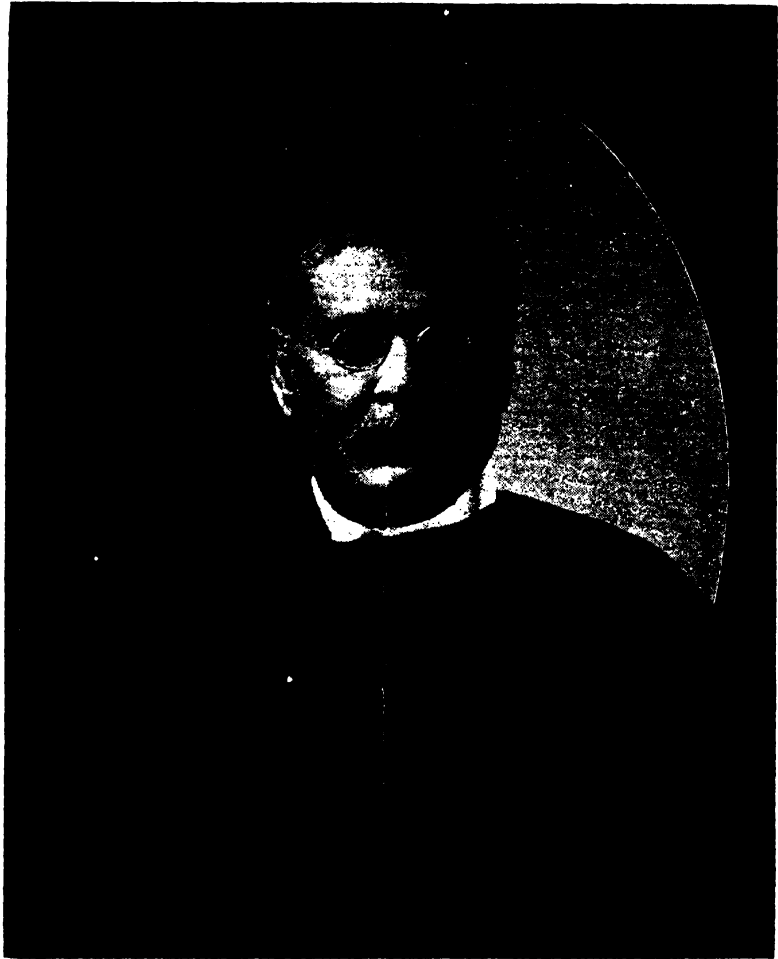
শ্রীযুক্ত রাসবিহারী ঘোষ।

ভারত-মহিলা

The woman's cause is man's; they rise or sink
Together, dwarfed or God-like, bond or free;
If she be small, slight-natured, miserable,
How shall men grow?

Tennyson.

৩য় ভাগ | পৌষ, ১৩১৪। | ৯ম সংখ্যা।

নারীজাতির আশা।

"পাশ্চাত্য জগতে নারীশক্তি" নামক প্রবন্ধে আমরা বলিয়াছি, প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য কোন দেশেই নারীজাতির অবস্থা আশানুরূপ উন্নত নহে। পাশ্চাত্য দেশে অনেক শক্তিশালিনী মহিলা নারীজাতির উন্নতি সাধনে বদ্ধপরিকর হইয়া নারীজাতির ন্যায্য অধিকার লাভের জন্য প্রবল সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছেন এবং ক্রমে ক্রমে শক্তি সঞ্চয় করিয়া অতি কষ্টে দুই একটী করিয়া প্রাপ্য অধিকার লাভ করিতেছেন। কিন্তু আরও কত কাল তাঁহাদিগকে এইরূপ সংগ্রাম করিতে হইবে, তাহা কে বলিতে পারে? এই ত পাশ্চাত্য জগতে নারী-সমাজের অবস্থা। পাশ্চাত্য নারীদিগের অবস্থার সহিত যখন প্রাচ্য জগতের নারী-সমাজের অবস্থার তুলনা করি, তখন শেষোক্তাদিগের অবস্থা আরো কত শোচনীয় দেখিতে পাই। এই সকল কথা চিন্তা করিয়া স্বভাবতঃই এই প্রশ্ন মনে উদয় হয়, সর্ব্ব দেশে নারীজাতির অবস্থা এত হীন কেন? পুরুষদিগের যেমন জ্ঞান, ভাব ও ইচ্ছা এবং আশা আছে, স্ত্রীজাতিরও ত ঠিক তাহাই আছে! সংসারধর্ম্মের সৌকার্য্যার্থে, সৃষ্টির শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য, বিধাতা নর-নারীর মধ্যে কোন কোন বিষয়ে না হয় পার্থক্যই করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু কোন্ অপরাধে নারীজাতি সৃষ্টির আরম্ভ হইতে অদ্য পর্য্যন্ত আপনার প্রকৃত অধিকার লাভে বঞ্চিত রহিয়াছেন?

অনেকে হয়ত বলিবেন, কেন ভারতবর্ষের স্বাধীন অবস্থায়, আর্য্য-সভ্যতার উন্নতির দিনে ভারত-নারী ত অতি উচ্চ অবস্থায়ই অবস্থিত ছিলেন। একথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, যে ভারতের স্বাধীনতার সময়ে, আর্য্য-সভ্যতার গৌরবময় দিনে ভারত-নারীর অবস্থা আদর্শের অনেকটা নিকটবর্ত্তী হইয়াছিল। কিন্তু একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই, যে বৈদিক কালের পরবর্ত্তী সময়ে নারীজাতির প্রতি এদেশের পুরুষগণ ক্রমশঃ অপেক্ষাকৃত হীনতর ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। আদি যুগে যে নারীজাতি বেদমন্ত্র রচনা করিয়া বৈদিক ঋষিগণের মধ্যে উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া গিয়াছিলেন, পরবর্ত্তী কালে সেই নারীকে বেদাদি উচ্চ ধর্ম্ম-শাস্ত্র পাঠে বঞ্চিত করা হইয়াছিল, হিন্দু শাস্ত্রে তাহার প্রমাণ রহিয়াছে। কেন ভারতবর্ষের স্বাধীন অবস্থায়ই নারীজাতির অবস্থা এত হীন হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, সে বিষয়ে মতপার্থক্য দেখা যায়। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা এই মতই যুক্তিযুক্ত বোধ হয় যে, সরল স্বাভাবিক বৈদিক ধর্ম্ম যখন ক্রমশঃ কৃত্রিমতাদ্বারা বিকৃত হইতে লাগিল; নারীজাতি ধর্ম্মজীবন লাভের অন্তরায় স্বরূপ, এই জ্ঞান যখন হিন্দুদিগের অন্তরে আধিপত্য লাভ

করিতে লাগিল, তখনই নারীজাতির অবস্থা ক্রমশঃ শোচনীয় হইতে আরম্ভ হইল। গৃহ পরিবারে ধর্ম্মলাভ হয় না, সংসারে থাকিয়া ঈশ্বরকে লাভ করা যায় না, এই ভাবিয়া হিন্দুগণ যখন সহজলভ্য ধর্ম্ম পাইবার উদ্দেশ্যে বৈরাগ্যের প্রতি অতিরিক্ত প্রীতি দেখাইতে লাগিলেন, তখনই সংসার-ধর্ম্মের প্রাণস্বরূপ নারীর অধঃপতনের সূত্রপাত হইল। তৎপর মুসলমান বিজয়ে সেই অবনতি চরমসীমায় উপস্থিত হইয়া ভারত-নারীকে বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত করিয়াছে।

এই প্রসঙ্গে আর একটী প্রশ্ন মনে উদিত হয়। আচ্ছা, ধর্ম্ম-মতের পরিবর্ত্তন, স্বাধীনতা, অধীনতা এ সকল ত প্রায় সকল দেশেই আছে, পুরুষ এবং নারী উভয়ের অবস্থাই ত তদ্দ্বারা পরিবর্ত্তিত হয়, কিন্তু এই পরিবর্ত্তনে, তুলনায় নারী-জাতির অবস্থা পুরুষগণের অবস্থা অপেক্ষা সর্ব্বত্রই হীনতর হয় কেন? ভারতের ধর্ম্ম-মতের ক্রমিক পরিবর্ত্তন দ্বারা পুরুষগণেরও ত অনিষ্ট হইয়াছে, মুসলমান বিজয়ে তাহা-দেরও ত হীনতা ঘটিয়াছে, তবে নারীদিগের অবস্থা পুরুষ-গণের অবস্থা অপেক্ষাও শোচনীয় হইল কেন?

এই প্রশ্নের সদুত্তর লাভ করিতে হইলে আমাদিগকে সুদূর অতীতে মানবজাতির আদি যুগের অবস্থা আলোচনা করিতে হয়। মনুষ্যজাতির বাল্যকালে মানুষ কেবল বাহু শক্তিরই পূজা করিত। প্রবল ঝঞ্ঝাবাত, ভীষণ বজ্রনাদ, আকাশে বিচিত্র মেঘাড়ম্বর, প্রবল ভূকম্প—এই সকল প্রাকৃত শক্তির প্রবল প্রতাপ অনুভব করিয়া মানবচিত্ত ভয়ে বিকম্পিত হইত, এই সকলের হস্ত হইতে স্ববলে আত্মরক্ষা অসম্ভব দেখিয়া অসহায় মানবপ্রাণ সকাতরে এই সকল দৈব উৎপাতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার প্রসন্নতা সম্পাদনের জন্য তাহাদের স্তুতি করিত। এই প্রকারেই মানব-অন্তরে ঈশ্বর-বুদ্ধি প্রথম জাগ্রত হয়। ভয়ই সেই আদি যুগে মানব হৃদয়ে প্রধান ভাবে আধিপত্য করিত। প্রকৃতির উপাসনা হইতে মানুষ যখন ক্রমে ক্রমে প্রকৃতির দেবতা ঈশ্বরকে অর্চ্চনা করিতে শিক্ষা করে তখনও প্রাথমিক অবস্থায় তাঁহার জ্ঞান, পুণ্য, দয়া প্রভৃতি স্বরূপ সমূহের প্রতি মানবের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নাই। তখনও তিনি মঙ্গলময়, শান্তিদাতা, মানবাত্মার পরম নিরাপদ আশ্রয়—এই ভাবিয়া মানুষ তাঁহার আরাধনা করে নাই। কিন্তু তিনি দুর্দ্ধর্ষ-শক্তি, প্রচণ্ড-বিক্রম দেবতা, তাঁহারই ইচ্ছায় আকাশে তেজোময় সূর্য্য উদিত হয়, তাঁহারই আদেশে প্রভঞ্জন প্রবাহিত হয়, বজ্র নিপতিত হয়, রোগ, মহামারী প্রভৃতি জীবনাস্তকারী উপদ্রব সংঘটিত হয়, তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে না পারিলে মানবের নিস্তার নাই, জীবন রক্ষার উপায় নাই, এই জন্যই মানুষ ভয়-কাতর হইয়া ঈশ্বরের প্রীতি উৎপাদনে চেষ্টা করিত, তাঁহার উদ্দেশ্যে পূজা ও বলি দান করিত।

মানব-সমাজেও তখন পাশব শক্তিরই শ্রেষ্ঠতা স্বীকৃত হইত। শরীরের শক্তি, বুদ্ধিশক্তি যাহার প্রবল থাকিত, মৃগয়াতে বা শত্রুর সঙ্গে সংগ্রামে যে অধিক সাহস ও সামর্থ্য প্রকাশ করিতে সক্ষম হইত, সেই ব্যক্তিই দলস্থ সকলের প্রশংসা এবং বশ্যতা লাভ করিত। সকলে তাহারই নিকট মস্তক অবনত করিত, তাহাকেই দলপতি বলিয়া বরণ করিত।

মানব-সমাজের এই প্রাথমিক অবস্থায় শারীরিক বলে "অবলা" নারীগণের অবস্থা কিরূপ ছিল? মানবের উচ্চ বৃত্তি সমূহ তখন বিকশিত হয় নাই; জীবন ধারণ ও পাশব প্রবৃত্তি সমূহের পরিতৃপ্তি সাধন ব্যতীত তখন মানবের আর কোন কার্য্য ছিল না। সন্তান-বাৎসল্য অথবা পিতৃমাতৃ ভক্তি প্রভৃতি হৃদয়ের কোমল বৃত্তিগুলিও তখন পাশব স্তরের উর্দ্ধে উত্থিত হয় নাই। সেই যুগে শারীরিক বলে পুরুষ অপেক্ষা হীনা নারীগণ যে সকল বিষয়েই পুরুষের হস্তে নিতান্ত কৃপা-পাত্রী ছিলেন সে বিষয়ে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। পুরুষজাতির সেবা, তাহাদিগের ভোগ-বৃত্তির চরিতার্থতা সম্পাদনই তখন নারীর প্রধান কার্য্য ছিল। পুরুষ তখন নারীকে আপনার সুখ-সম্পাদনের উপাদান রূপেই ব্যবহার করিত। অপেক্ষাকৃত শান্ত ভাবাপন্ন জনপদগুলিতে নারীগণ অপেক্ষাকৃত সুখ শান্তিতে বাস করিতেন সন্দেহ নাই; প্রিয়জনের প্রীতি ও আদর তাঁহারা লাভ করিতেন, তাঁহাদের সেবা-পরায়ণতা ও সদ্গুণ-রাশির জন্য তাঁহারা পরিজনের শ্রদ্ধাও লাভ করিতেন, কিন্তু সেই আদি যুগে মানুষ শান্তির আস্বাদন অল্পই লাভ করিত। আপনাদের মধ্যে মারামারি, কাটাকাটি, পার্শ্ব-বর্ত্তী জনপদবাসিগণের সহিত যুদ্ধবিগ্রহ নিয়তই সংঘটিত হইত; অবিচ্ছিন্ন শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করা তাহাদের

ভাগ্যে অল্পই ঘটিত। সুতরাং, নারীর পক্ষেও শান্তজীবন দুর্লভ ছিল। সেই নিত্য অশান্তির মধ্যে নারীর বিড়ম্বনা লাঞ্ছনারও অবধি থাকিত না। মাতা দীর্ঘকাল জঠর-যন্ত্রণা ভোগ করিয়া পুত্র প্রসব করিতেন, সহজাত স্নেহবশে পুত্রমুখ দর্শন করিয়া স্বর্গসুখ ভোগ করিতেন, কিন্তু সেই পুত্রই বয়স্ক হইয়া মাতার প্রতি অত্যাচার করিতে কুণ্ঠিত হইত না। পবিত্র দাম্পত্য বন্ধন তখনও সংস্থাপিত হয় নাই। বলবান ব্যক্তি অকুণ্ঠিত চিত্তে পর-গৃহের নারীকে সবলে লইয়া যাইত, সামাজিক শক্তি তাহার প্রতিরোধ করিত না।

প্রথম যুগের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, সকল দেশেই নারীজাতির এইরূপ হীন অবস্থা ছিল। প্রতিবেশীগণ যুদ্ধে জয় লাভ করিলে বিজিতদিগের গো মহিষাদির সহিত তাহাদিগের নারীদিগকেও কাড়িয়া লইত। ছলে বলে কৌশলে নারীহরণ আদিম যুগের পুরুষদিগের মধ্যে নিত্য ব্যাপার ছিল। অপেক্ষাকৃত উন্নত অবস্থা লাভ করিবার পরেও রোমানগণ প্রতিবেশীগণের নারীদিগকে লুণ্ঠন করিয়া আনিত, গ্রীক ও ফিনিসীয়গণ ছলে বলে কৌশলে পরস্পরের স্ত্রীকন্যা অপহরণ করিত। য়িহুদী জাতির মধ্যে গৃহপালিত পশুর ন্যায় কন্যাবিক্রয় প্রথাও বিস্তৃতরূপে বিদ্যমান ছিল। প্রাচীন আরবদিগের মধ্যে নারীজাতির দুর্দ্দশার সীমা ছিল না। চীন দেশ প্রাচীন কালে জ্ঞান বিজ্ঞান ও সভ্যতায় অতি উচ্চ স্থান লাভ করিয়াছিল। কিন্তু সে দেশের সাধারণ লোকের সংস্কার ছিল, নারীর আত্মা নাই। জাপানেও নারীজাতির অবস্থা চীন অপেক্ষা উন্নত ছিল না।

এই যে মানবজাতির প্রাথমিক অবস্থায় নারীজাতি উপেক্ষা, অনাদর ও লাঞ্ছনা সহ্য করিয়াছিলেন, সভ্যতার ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সেই অবস্থার কিঞ্চিৎ উন্নতি হইলেও তাহা সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হইতেছে না। জ্ঞানালোকে সমুজ্জ্বল পাশ্চাত্য দেশ সমূহেই হউক, কি প্রাচ্য দেশেই হউক, কোথাও নারী প্রকৃত মনুষ্যোচিত সম্মান ও শ্রদ্ধা অদ্য পর্য্যন্ত লাভ করিতে পারেন নাই। বেদ-উপনিষদের যুগে ভারতনারী যে উন্নত অবস্থা লাভ করিয়াছিলেন, ইতিপূর্ব্বে আর কোন দেশের নারীগণ বোধ হয় তদপেক্ষা উন্নততর অবস্থা লাভ করেন নাই। কিন্তু অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তী কালে সমাজের শ্রেষ্ঠতমা নারীদিগকে যে প্রকার লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইয়াছিল, তাহা দেখিয়া মনে হয় না, যে ভারত-নারী কার্য্যতঃ অধিক দিন তাঁহাদের উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। যে রামচন্দ্র আপনার চরিত্র-মাহাত্ম্যে এদেশে ভগবানের অবতার বলিয়া কীর্ত্তিত, ভারতের সেই আদর্শ রাজা, লোকললামভূতা, পূতচরিত্রা, দেবী-সদৃশী সহধর্ম্মিণীকে বিনা দোষে শুধু কুলোকের নিন্দাবাদ শ্রবণ করতঃ হিংস্র জন্তু-সমাকীর্ণ বনবাসে প্রেরণ করিতে সঙ্কুচিত হন নাই। যেন মিথ্যা লোকপ্রীতি লাভের নিকট একটী শ্রেষ্ঠতমা নারীরত্নকে বিসর্জ্জন দেওয়া একটা সামান্য কথা! তার পর মহাভারতের যুগে ভারতের পুণ্যশ্লোক মহাত্মাগণের সম্মুখে— ভীষ্মদ্রোণ, কর্ণার্জ্জুন, যুধিষ্ঠিরাদি নরশ্রেষ্ঠদিগের সাক্ষাতে রাজদুহিতা, রাজরাণী দ্রৌপদীকে বিবস্ত্র করিবার পাশব চেষ্টার কথা, দ্রৌপদীর আকুল ক্রন্দন, আর উক্ত ধুরন্ধর-দিগের নিশ্চেষ্টতার কথা স্মরণ করিলে সহজেই উপলব্ধি হয়, নারীজাতি সেই সময়ে পুরুষের নিকট কি প্রকার ক্রীড়া-পুত্তলি ছিলেন। রাজরাণীদিগেরই যখন এই দশা ছিল, তখন সাধারণ নারীগণের প্রতি কি প্রকার সম্মান প্রদর্শিত হইত তাহা আর বলিবার অপেক্ষা রাখে না। অনেকে বলিতে পারেন, দুই একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা সেই সময়ের নারী-জাতির অবস্থা অনুমান করা সঙ্গত নহে। তাহা সত্য। কিন্তু এই দুইটী দৃষ্টান্ত এমনি বিশেষত্ব-পূর্ণ, যে এই ঘটনা-দ্বয় দ্বারা বিচার করিলে সে কালের পুরুষজাতির অন্তরে নারীজাতির মূল্য কার্য্যতঃ কতদূর ছিল তাহা অনুমান করিয়া লওয়া নিতান্ত অসঙ্গত বোধ হয় না।

আমরা দেখিলাম, অতীত কালে নারীজাতি অনাদর ও লাঞ্ছনার একশেষ ভোগ করিয়াছেন; আমরা আরও বলিয়াছি, বর্ত্তমান কালেও নারীগণ কোন দেশেই সমুচিত সম্মান ও আদর পাইতেছেন না। পাশ্চাত্য জগতে নারী-জাতির অবস্থা অপেক্ষাকৃত উন্নত হইলেও তাঁহাদের অবস্থা এখনও আদর্শের বহু নিম্নে পড়িয়া রহিয়াছে। তবে কি নারীজাতি বিধাতার কোন অভিশাপ লইয়া পৃথিবীতে অব-তীর্ণ হইয়াছে? মনুষ্যোচিত সম্মান, মনুষ্যোচিত স্বাধীনতা কি নারীর ভাগ্যে কখনই ঘটিবে না? পক্ষপাতশূন্য অন্তরে চিন্তা করিলে আমরা আমাদের হৃদয় হইতে এই প্রশ্নের

যে উত্তর পাই তাহা নিতান্তই আশাপ্রদ। মানবজাতি প্রাথমিক অবস্থা হইতে অনেক ভ্রান্ত সংস্কার, অনেক কুরীতির অধীন হইয়া চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। এমন কি, ঈশ্বরের স্বরূপ ও প্রকৃতি সম্বন্ধেও মানুষ অনেক অসত্য ধারণা হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু ক্রমোন্নতি এই বিশ্বের নিয়ম। পৃথিবীর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেই সকল ভ্রান্ত বিশ্বাস, সংস্কার ও রীতিপদ্ধতি ক্রমেই বিশুদ্ধতা লাভ করিতেছে। সত্যস্বরূপ ঈশ্বরের রাজ্যে অসত্যের স্থান নাই, ন্যায়বান বিচারকের রাজ্যে অন্যায় চিরকাল তিষ্ঠিতে পারে না। সজ্ঞানে অজ্ঞানে নারীজাতির প্রতি পুরুষজাতি এতকাল যে অবিচার করিয়া আসিয়াছে, এতকাল তাহাদিগকে যে প্রকারে লাঞ্ছিত করিয়াছে, পরম ন্যায়বান, দুর্ব্বল ও অসহায়ের আশ্রয় ঈশ্বরের রাজ্যে চিরকাল তাহা কখনই অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে না। ধীরে ধীরে ভগবান নারীর সুদিন নিকটবর্ত্তী করিতেছেন। সভ্যদেশসমূহে নারীজীবনের মহত্ত্ব ও গৌরব নারীগণ কতক পরিমাণে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। ঊষার নবালোক প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে একটী পাখী ডাকিয়া উঠিলে যেমন বনময় সকল পাখীই কোলাহল আরম্ভ করে, তেমনি কয়েকটী মনস্বিনী নারীর হৃদয়ে নারীজীবনের উচ্চ লক্ষ্য ও আদর্শ অনুভূত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর সকল দেশেই নারীগণ আত্মোন্নতির জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছেন। মেঘ যেমন সূর্য্যকে চিরকাল আবৃত করিয়া রাখিতে পারে না, মানব জাতির কুসংস্কার, আদি যুগের কলুষিত রীতির অবশেষও তেমনি পবিত্র নারীশক্তিকে চির-প্রতিহত করিয়া রাখিতে সমর্থ হইবে না। যদি নারীর বর্ত্তমান দুর্গতির মূলে কোন দৈব কারণ দেখিতে পাইতাম, যদি বুঝিতাম, নারীশক্তির পূর্ণ বিকাশ ভগবানের অভিপ্রেত নহে, তবে আমাদের নিরাশ হইবার কারণ ছিল; কিন্তু ঐশী শক্তি নারীশক্তির সহায়। জগতের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে পরমেশ্বর নারীশক্তিকে ক্রমশঃ বিকশিত করিতেছেন, নারীর হৃদয়কে উচ্চ ও পবিত্র আত্মোন্নতির আকাঙ্ক্ষাতে ব্যাকুল করিয়া তুলিতেছেন। সভ্যদেশস্থ পুরুষজাতিও ক্রমে ক্রমে অনুভব করিতেছেন, নারীকে বর্ত্তমান দুর্দ্দশা হইতে উন্নত অবস্থায় উত্থিত হইতে সাহায্য না করিলে পুরুষজাতিরও কল্যাণ নাই। আমাদের এই অধঃপতিত দেশেও চিন্তাশীল, হৃদয়বান্ পুরুষদিগের অন্তরে এই চিন্তা জাগ্রত হইয়াছে। এবিষয়ে বঙ্গের জনৈক কৃতী সন্তান ও চিন্তাশীল লোকের * উক্তি আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। তিনি লিখিয়াছেন ঃ—

"এইক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, নারীজাতির এই সামাজিক দুর্গতি কি কোন সময়েই অপনোদিত হইবে না? মানব সমাজ এবং অধুনাতন সভ্যতা কি এই লজ্জাকর অপবাদ হইতে কখনই নির্ম্মুক্তি লাভ করিবে না? আমাদিগের বর্ত্তমান উন্নতি কি সমাজের মুখসৌন্দর্য্যেই বদ্ধ থাকিবে? মনুষ্যের দয়া ধর্ম্ম ন্যায়পরতা এবং পবিত্রতা কি অভিধানেই চিরদিন অবস্থান করিবে? * * এই অন্তর্ভঙ্গুর বহিঃশোভন সভ্যতাতে কি আমরা পরিতৃপ্ত রহিতে পারি! কখনই নহে। আমরা ইচ্ছা করিলেও করুণাসিন্ধু পরমেশ্বর কখনই আমাদিগকে এই অবস্থায় সন্তুষ্টচিত্ত রহিতে দিবেন না। এই যে চতুর্দ্দিকে আমরা অশান্তির আর্ত্তনাদ শ্রবণ করি, দিবসে নিশিতে সকল সময়েই পাপের কোলাহলে ব্যতিব্যস্ত থাকি; এই যে চতুর্দ্দিকেই অসুখ, অন্তর্জ্বালা, লোকহৃদয় দহন করিতেছে,—দুঃখ সন্তাপ ক্লেশ দুর্ভোগে, গৃহগ্রাম জনপদ পরিপূরিত হইতেছে, ইহা দ্বারাই প্রকৃতি এবং প্রকৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আমাদিগকে স্পষ্ট স্বরে উপদেশ প্রদান করিতেছেন যে, প্রীতি এবং পবিত্রতার মস্তকে পদাঘাত করিলে মনুষ্যজাতি কিছুতেই তৃপ্তি লাভ করিতে পারিবে না। সংসারের এই সমস্ত ঘটনাই আমাদিগকে গম্ভীর নাদে শিক্ষা দিতেছে যে, সমাজকে সম্পূর্ণরূপে ন্যায় ধর্ম্মের অটল ভিত্তির উপর স্থাপন না করিলে, নরনারী উভয়ের প্রতি সমান দৃষ্টি রাখিয়া, উভয়েরই যথার্থ উন্নতির জন্য সমান ভাবে যত্ন না করিলে, উভয়েরই অজ্ঞানান্ধতা এবং পাপ দুর্গতি বিনাশের জন্য সমানরূপে তৎপর না হইলে কিছুতেই মনুষ্যজাতির কল্যাণ নাই। পৃথিবীর কোটী মনুষ্যও যদি সমবেত হইয়া যত্ন করে, বিশ্ব সংসারের সমুদয় শক্তিও যদি একত্রিত হইয়া উদ্যম করে, ন্যায়ের অটল দণ্ড তথাপি একবিন্দু টলিবার নহে। ন্যায় সমুদয় অত্যাচার, সমুদয় অন্যায় কার্য্যের অগ্রে অগ্রে ধাবমান হয় এবং উহারা বহু দূর যাইবার পূর্ব্বেই উহাদের গতিপথ অবরোধ করে। একটী মনুষ্য হউক আর এক কোটী মনুষ্যই হউক, যিনি কিম্বা যাঁহারা ন্যায়ের অবমাননা করিবেন, ন্যায়ের রাজদণ্ড তাঁহার কি তাঁহাদিগের শিরে অবশ্যই নিপতিত হইবে।

যখন একটী মাত্র মনুষ্যই ন্যায়ের শাসন উল্লঙ্ঘন করে, তখন সেই একটী মনুষ্যের অন্তঃকরণই অনুতাপ-বিষে জর্জ্জরিত হয়, এবং যখন সমুদয় মনুষ্য সমাজ সম্মিলিত ভাবে এবং সম্মিলিত হস্তে ন্যায়ের শাসন উল্লঙ্ঘন করে, তখন সমুদয় মনুষ্য-সমাজের সম্মিলিত হৃদয়ই দুর্ব্বিষহ দুঃখ যাতনা অনুভব করে। দিব্য চক্ষু বিনাও ইহা দৃষ্ট হয় যে, সংসার

---

* শ্রীযুক্ত রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর।

নারীজাতির প্রতি আবহমান কালেই অন্যায় এবং অত্যাচারের একশেষ করিয়াছে। ঈশ্বর নরনারীকে সমান করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন; প্রকৃতি তাহাদিগকে ভিন্নরূপে বিভূষিত করিয়াও সমান ভূষণ প্রদান করিয়াছেন। সংসার তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে অসমান করিয়া রাখিয়াছে। ঈশ্বরের চক্ষে ব্যাস, ক্রয়াসঙ্ক, বেকন, বোনাপার্টি এবং মহম্মদ ও জাহাঙ্গীর প্রভৃতিও যেমন, দুঃখিনী অবলাজাতিও সম্পূর্ণরূপে সেই প্রকার। উভয়ই তাঁহার ক্রোড়ের ধন। সংসারে দেখিতেছি, একজন জ্ঞানাচলের উর্দ্ধতম শিখরে, আর একজন অজ্ঞান-জলধির অধস্তন প্রদেশে; একজন রাজাধিরাজ, আর একজন রাজপথের কাঙ্গালিনী। স্বার্থোন্মাদ নেপোলিয়নের পুরাতন জীর্ণ পাদুকার প্রয়োজন রহিল না, প্রীতিপুঞ্জ জোসেফিন অমনি দীনের দীন হইল। পদচ্যুত ভৃত্যের ন্যায়, রাজমুকুট, রাজবৈভব সমুদয়ই প্রত্যর্পণ করিয়া ভিখারিণীর ন্যায় রাজপথে বহির্গত হইল। ত্রিভুবনে তিষ্ঠিবারও আর স্থান রহিল না। * হেনরীর একটু ভ্রূকুটি হইল। আনোবোলীনের বদনারবিন্দ, ঘাতকের নিষ্ঠুর কুঠারাঘাতে অমনি দেহলতা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ভূতলে পড়িল। † মূর্ত্তিমন্ত পাপ চতুর্থ জর্জ্জ শত শত অবলার মান ধর্ম্মকে চর্ব্বণ করিয়াও ইংলণ্ডের সিংহাসনে সহাস্য বদনে সমাসীন রহিল, প্রজাগণ দ্বিরুক্তিও করিল না। * * * ঈশ্বর পুরুষজাতির উচ্চ নীচ প্রত্যেক ব্যক্তিকেই যেমন স্বকীয় শরীর মনের উপর সম্পূর্ণ স্বামিত্ব প্রদান করিয়াছেন, নারী কুলেরও প্রত্যেককেই, স্বকীয় শরীরের প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, এবং হৃদয় মনের প্রত্যেক ভাববৃত্তির উপর সেই প্রকার পূর্ণ স্বাধিপত্য দিয়াছেন। সংসারে দেখিতেছি, পুরুষজাতি প্রতাপান্বিত প্রভু; নারী চরণের ক্রীত দাসী। পুরুষজাতি স্বেচ্ছাচারী অধিস্বামী; নারী যথেচ্ছ ব্যবহারের ও ভোগের বস্তু। ইচ্ছা হয় ত একটু শিক্ষার আলোক প্রদান করিলাম; ইচ্ছা না হইল অবিদ্যার ঘোর অন্ধকার কূপেই নিমজ্জিত রাখিলাম। প্রবৃত্তি হয় ত কৃপা করিয়া একটুকু স্বাধীনতা 'দান' করিলাম। প্রবৃত্তি না হইল লৌহনিগড়েই বদ্ধ রাখিলাম। আজ অভিলাষ জন্মিল, অশেষ ভূষণে বিভূষিত করিয়া, গন্ধদ্রব্যে প্রমোদিত করিয়া ক্রীড়ার সামগ্রীর ন্যায় মস্তকেই উত্তোলন করিলাম। কল্য বিরক্তি হইল, মার্জ্জার কুক্কুর হইতেও অধম অবস্থায় পরিণত করিয়া পদাঘাতে দূর করিলাম।

এই আসুরিক নিষ্ঠুরতা কি প্রকৃতির প্রেমময় কুসুম-কাননে শোভা পাইতে পারে? এই জগত কি আমাদিগের, না পূর্ণ-ন্যায় পরমেশ্বরের? মনুষ্য কে যে, সে নারীজাতিকে তাহাদিগের স্বত্বাস্পদীভূত স্বাভাবিক অধিকারে বঞ্চনা করে?"

উল্লিখিত উক্তির সহিত এক বাক্যে আমরাও জিজ্ঞাসা করি, এই জগত কি আমাদিগের, না ন্যায়বান্ পরমেশ্বরের? যদি এ জগতের কর্তৃত্ব-ভার মানুষের হস্তেই অর্পিত থাকে তবে নারীজাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমরা বরং সন্দিহান হইতে পারি। কিন্তু আমরা জানি, জগতের ভাগ্য-নিয়ন্তা মানুষ নহে, পরমেশ্বর। এই যে আমাদের জন্মভূমি এখন পরপদানত, জগতের শ্রেষ্ঠতম বীরজাতি আমাদের রাজ্য-নিয়ন্তা, আমাদের শত ক্রন্দনেও তাহারা কর্ণপাত করে না—এ সকল দেখিয়া শুনিয়াও, পরাধীনতার নাগপাশে আবদ্ধ হইয়াও, আমরা কি বিশ্বাস করি না, যে আমাদের জাতীয় জীবনের ভবিষ্যৎ সৌভাগ্য-সমুজ্জ্বল? আমাদের এই আশার মূল কোথায়? ভগবানের মঙ্গল-বিধানে, আর দেশের লোকের কর্ত্তব্য পালনে। সেই প্রকার নারীজাতির বর্ত্তমান যদিও শোচনীয়, ন্যায়বান মঙ্গলময় ভগবান নারীজাতির ভাগ্যে অনন্ত উন্নতি লিখিয়া রাখিয়াছেন। 'নারীগণ চেষ্টা করুন, আত্ম কর্ত্তব্য পালন করুন, তাঁহাদের উন্নতির পথে সকল বাধা কাটিয়া যাইবে, তাঁহাদের সৌভাগ্য দুর্ভাগ্য আর অপরের করতলগত থাকিবে না।' বিধাতার বিধান চিরদিন অপূর্ণ থাকিতে পারে না।

আক্ষেপ।

দিন পরে দিন যায়, রাত্রি পরে রাত,
আপনার মাঝে আমি রয়েছি অজ্ঞাত।
আছে এই ফুল, পাতা, ধরণী, আকাশ,
আছে এই বিশ্বটির অনন্ত প্রকাশ
জাগিয়া শিয়র দেশে; অমর বাতাস
গাহিছে উন্মুক্ত গানে অনন্ত বিকাশ
চির জাগরণটির; বহে' যায় নদী
কল্যাণ-সাধনা খানি নিত্য নিরবধি
নিবেদি ধরার পদে। জাগাইছে ধ্বনি
নিত্য দূর দুরান্তের অন্তরের বাণী।
সবার প্রকাশ মাঝে আমি দিন রাত
আপনার মাঝে শুধু রয়েছি অজ্ঞাত।
ধরণী কহিছে ডাকি সতত নিকটে—

---

* দ্বিতীয় ভাগ চতুর্থ সংখ্যা "ভারত-মহিলায়" জোসেফিনের বিবরণ ও চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে। ভাঃ মঃ সঃ।

† ইংলণ্ডের রাজা অষ্টম হেনরী একে একে ছয়টী বিবাহ করিয়াছিলেন। দুই পত্নীকে পরিত্যাগ করেন, দুই জন তাঁহার আদেশে নিহত হন, একজনের মৃত্যু হয়, একজন তাঁহার মৃত্যুর পরও জীবিত ছিলেন। ভাঃ মঃ সঃ।

"হে অজ্ঞাত, চলে আয় ব্যক্ততার তটে,
সবার প্রকাশ মাঝে মোর চিত্রপটে
তোর অজ্ঞাততা বড় বাজে বক্ষপুটে।"
তবু দিন পরে দিন যায় রাত্রি পরে রাত।
আপনার মাঝে আমি রয়েছি অজ্ঞাত।

লজ্জাবতী বসু

রায় বাহাদুর।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(৫)

নন্দলালের সঙ্গে কমলার বিবাহ—এবং বিবাহের তারিখ পর্য্যন্ত ঠিক্ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু কাঁচা রঙ্গের ছিটের জামা গায় দিলে যেমন নীচের গেঞ্জীর উপরে তাহার একটা ছাপ লাগিয়া যায়, তেম্‌নি নন্দলালের মনে কমলার সমস্ত চেহারার একটা ছাপ পড়িয়া গিয়াছে। নন্দলালের আর কোন কাজ নাই। সে অহর্নিশি কেবল কমলার মূর্ত্তিই ধ্যান করে; এবং কবে প্রজাপতি কমলার সঙ্গে তাহার মিলন ঘটাইয়া দিবেন, তাহারই প্রতীক্ষায় সে দিন গণনা করে।

তাহার পর বিবাহের তারিখ যতই নিকট হইতে লাগিল, ততই সুখের কল্পনায় নন্দলালের মন ভরিয়া উঠিতে লাগিল। অবশেষে নন্দলাল আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিল না। সে ভালবাসাপূর্ণ একখানি লম্বা চিঠি লিখিয়া, গোপনে কমলার কাছে চিঠি পাঠাইয়া দিল। কমলা সেই চিঠির জবাবে লিখিল :—

"আপনি আমাকে এ রকম করিয়া চিঠি লিখেন কেন? ছি! আমার বড় লজ্জা হয়। হরিমতি এই চিঠির কথা শুনিয়া কত ঠাট্টা করিয়া গেল। বিনোদিনী চিঠি খানা চুরি করিয়া কত লোককে দেখাইল। আমার ভারি কান্না পায়। আপনি বার বার চিঠির জবাব দিতে বলিয়াছেন বলিয়া এইটুকু লিখিলাম। আর আমি কিছুই লিখিতে পারিব না।"

'কি বিশ্রী চিঠি! উপরে কোন পাঠ নাই, সম্বোধন নাই। চিঠির নীচে নামটা স্বাক্ষর করা পর্য্যন্ত উচিত বলিয়া মনে করে নাই। তবে কি কমলা আমাকে ভাল বাসে না? তাহার মন কি কঠোর? না না, তাহা হইতেই পারে না। অমন সুন্দর পুষ্পের মধ্যে কি কোমলতা ভিন্ন কঠোরতা থাকা সম্ভব? কমলা তাহার সমবয়স্কা কৌতূহল-পরায়ণা বালিকাদের দৌরাত্ম্যেই এইরূপ শুষ্ক চিঠি লিখিয়াছে। সে নিশ্চয়ই আমাকে ভালবাসে। আমার হৃদয় তাহার জন্য যেরূপ তৃষিত, হয়ত তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়টুকু আমার জন্য তেমনি তৃষিত।'

কমলার চিঠি পাইয়া, নন্দলাল মনে মনে এই রকম কত কি ভাবিতে লাগিল। তাহার পর বিবাহের দিন একেবারে নিকট হইয়া আসিল। কমলার পিতা বিবাহের জন্য সমস্তই দেশী জিনিস কিনিতে লাগিলেন। কিন্তু গোপীনাথ বিলাতি জিনিস কিনিবে বলিয়া, তাহার এক লম্বা ফর্দ্দ তৈরী করিল। সে কথা গ্রামের লোকের কাণে গেল। গ্রামের ছেলেরা বিস্তর অনুনয় বিনয় করিয়া, গোপীনাথকে বিলাতি জিনিস কিনিতে নিষেধ করিল। গোপীনাথ ছেলেদের গালাগালি দিয়া তাড়াইয়া দিল। তখন গ্রামের ভদ্রলোকেরা আসিয়া গোপীনাথকে ধরিলেন। তাঁহারা অত্যন্ত বিনীত ভাবে কহিলেন :—

"আমাদের অনুরোধ আপনাকে রাখিতেই হইবে। আপনি কিছুতেই বিলাতি জিনিস কিনিতে পারিবেন না।"

গোপীনাথ ভদ্রলোকদিগের অনুরোধ অতিশয় গর্ব্বিত ভাবে অগ্রাহ্য করিল। তখন ভদ্রলোকেরা চটিয়া গেলেন। তাঁহারা গোপীনাথকে "ছোট লোক", "ফিরিঙ্গির পোষ্যপুত্র" ইত্যাদি নানা কথা বলিয়া চলিয়া যাইতে লাগিলেন।

গোপীনাথ এই সকল কথার জবাব পুলিসের ভাষায়ই দিবে, ঠিক্ করিয়াছিল। কিন্তু গতিক বড় ভাল নয় দেখিয়া কথাগুলি নিজের মনের মধ্যেই পরিপাক করিতে হইল।

ইহার পর গোপীনাথ গ্রামের লোকদিগকে অপদস্থ করিবার জন্য আর এক ফন্দী বাহির করিল। কুসুমপুরের বাজারের নিধিরাম সাহা একজন 'তেরিয়া' মেজাজের দোকানদার। সে কিছুতেই বিলাতি জিনিসের চালান বন্ধ করিবে না। তাই গ্রামের সমস্ত লোক তাহাকে বর্জ্জন করিয়াছে। এই এক মাস পর্য্যন্ত তাহার দোকানে সিকি পয়সার জিনিষও বিক্রী হয় না। কিন্তু তবু সে কাহারো

কাছে মাথা নত করিবে না—এমনই তার জেদ! গোপীনাথ বক্সী ঠিক করিল, গাঁয়ের লোককে দেখাইয়া দেখাইয়া সে এই দোকান হইতেই বিলাতি জিনিস কিনিবে। তাহা হইলেই গ্রামের লোকেরা খুব অপমানিত হইবে।

(৬)

একদিন বিকাল বেলায় গোপীনাথ টাকাকড়ি এবং চাকর বাকর লইয়া নিধিরামের দোকানে গিয়া হাজির হইল। অল্প সময়ের মধ্যেই গ্রামের শীর্ষস্থানীয় বৃদ্ধ ব্রাহ্মণেরা তাহার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা পৈতা দ্বারা গোপীনাথের হাত জড়াইয়া ধরিলেন এবং কহিলেন ঃ—

"আপনি নিতান্তই যদি বিলাতি জিনিস কেনেন, তাহা হইলে নিকটের বলরামপুরের হাটে গিয়া ক্রয় করুন। এই লক্ষীছাড়া বেটার দোকানে কিছুতেই কিনিবেন না। এ বেটার বড় স্পর্দ্ধা। আমাদের ভারি অপমান করিয়াছে।"

গোপীনাথ এবার মনের ঝুলির ভিতর হইতে পুলিসের বুলি বাহির করিতে লাগিল। তখন ছেলেরা রুখিয়া উঠিল;—তাহারা আজ গোপীনাথের হাড় গুঁড়া না করিয়া বাড়ী ফিরিবে না। বৃদ্ধেরা তাহাদিগকে থামাইয়া বুঝাইতে লাগিলেন ঃ—"আরে এ বেটা কায়েতের ছেলে নয়—মুচি! নইলে কি ব্রাহ্মণের পৈতাকে অগ্রাহ্য করিত?"

ছেলেরা যার যে ঘরে ফিরিয়া গেল। গোপীনাথ বিস্তর বিলাতি দ্রব্য লইয়া নির্ব্বিঘ্নে গৃহে প্রত্যাগমন করিল। কিন্তু গ্রামের লোকেরা কালীকিঙ্কর চৌধুরীকে ধরিয়া পড়িল। তাহারা কহিল ঃ—

"আপনি চৌধুরী বংশের লোক হইয়া কিছুতে এই মুচির ঘরে মেয়ে দিতে পারিবেন না।"

কালীকিঙ্কর চৌধুরীর ত কখন ছোট ঘরে মেয়ে দিতে ইচ্ছাই ছিল না। কিন্তু বিবাহের আয়োজন সব ঠিক। এখন কি আর ফিরানো যায়? ফিরাইলে গোপীনাথ বক্সী কালীকিঙ্করের ভিটায় ঘুঘু চড়াইবে, তবে ত ছাড়িবে।

কালীকিঙ্কর বাবু গ্রাম্য লোকের অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলেন না। তখন গ্রামের লোক দল পাকাইয়া বসিল। কমলার আইবড় ভাতের নিমন্ত্রণের দিন রাশি রাশি খাদ্যসামগ্রী নষ্ট হইল। একটি প্রাণীও তাঁহার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করা আবশ্যক মনে করিলেন না। কালীকিঙ্কর বাবুর বংশের কেহ কখনো এরূপ ভাবে অপমানিত হয় নাই। কাজেই তিনি ক্ষোভে মনস্তাপে আত্মহত্যা করিতে চাহিলেন। বাড়ীর লোকেরা অনেক বুঝাইয়া সে অপকর্ম্ম হইতে তাঁহাকে নিরস্ত করিল।

এ দিকে গোপীনাথের ধোপা নাপিত বন্ধ হইল। গোপীনাথ এই সকল কাজের প্রতিশোধ লইবার জন্য প্রতিজ্ঞা করিল। সে দোকানদার নিধিরাম সাহাকে হাত করিয়া এক মিথ্যা মোকদ্দমা সাজাইল। নিধিরাম জেলার মাজিষ্ট্রেটের কাছে গিয়া নালিশ করিল। গ্রামের যাহারা স্বদেশী আন্দোলনের নেতা এবং স্কুলের ছাত্র তাহাদের অনেককেই এই মোকদ্দমার জালে জড়াইয়া ফেলিল। নিধিরামের নালিসের মর্ম্ম এই যে, একদিন সে বিলাতি কাপড় বিক্রি করিতেছিল, এমন সময় আসামীরা হল্লা করিয়া তাহার দোকানে ঢুকিয়া তাহাকে বিলাতি জিনিস বেচিতে বারণ করিল। সে বারণ অগ্রাহ্য করায়, আসামীরা তাহাকে ধরিয়া মারিয়াছে, এবং অনেক চিনি ও নুন নদীর ভিতর ফেলিয়া দিয়াছে। তা ছাড়া তাহার কয়েক বস্তা বিলাতি কাপড় পুড়াইয়া ফেলিয়াছে।

গোপীনাথ শুধু নিধিরামের দ্বারায় মিথ্যা মোকদ্দমা দায়ের করাইয়াই থামিতে পারিল না। কমিসনার সাহেবের নিকট গ্রাম্য লোকের দৌরাত্ম সম্বন্ধে প্রাইভেট এক চিঠি লিখিল। তখন কি আর রক্ষা আছে? স্বয়ং পুলিস সাহেব মিলিটারী পুলিস লইয়া সদর্পে কুসুমপুর গিয়া উপস্থিত হইলেন। সকল আসামী ধরা পড়িল। আসামীদিগকে সহরে আনিয়া হাজতে রাখা হইল। সহরের উকিলেরা হাকিমের নিকট মাথা খুঁড়িয়াও এই নিরপরাধ ব্যক্তিদিগকে জামিনে খালাস করিতে পারিলেন না।

(৭)

কালীকিঙ্কর চৌধুরী হৃদয়বান্ লোক। তিনি যখন শুনিলেন, গ্রামের কতকগুলি নিরপরাধ লোক গারদ ঘরে পচিতেছে, তখন তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইল। তিনি কন্যার বিবাহে নানা অমঙ্গল আশঙ্কা করিতে লাগিলেন। কিন্তু উপায় কি? গোপীনাথের ভয়ে নিতান্ত অনিচ্ছায়ই কন্যার বিবাহের সমস্ত আয়োজন করিলেন।

নন্দলাল গ্রাম্য বিভ্রাটে পিতার উপর বিরক্ত হইল। কিন্তু আর একদিন পরেই যে কমলার সঙ্গে মিলিত হইবে, সেই সুখের কল্পনায় তাহার বুক কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল।

বিবাহের দিন করুণ সুরে সানাই বাজিতে লাগিল। কিন্তু কে বলিবে সেই সুর কমলার পিতার প্রাণে কেমন বাজিতে লাগিল?

এ দিকে কমলার গায়ে হলুদ দিবার সময় হইল। মেয়েরা কমলার ঘরে গেল। কিন্তু এ কি করুণ দৃশ্য! কমলা যে বিছানায় লুটাইয়া কাঁদিতেছে। চোখের জলে যে বিছানা ভিজিয়া গিয়াছে! মেয়েরা বলিয়া উঠিল:—

"মাগো মা, বাপ মাকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে বলিয়া তোর এত কান্না? ছি! লোকেরা যে ভারি বোকা মেয়ে বলিবে। আয়, তোর গায় এখন হলুদ মাখাইয়া দি।"

কমলা দুই হাতে চৌকি ধরিয়া আরও কাঁদিতে লাগিল। তখন তাহার মা আসিলেন। মা চোখের জল মুছাইয়া কহিলেন:—

"লক্ষ্মী মা, আজ কি কাঁদিতে আছে? এস, আমি তোমাকে নাইবার ঘরে লইয়া যাই।"

কমলার কান্না থামিল না। তখন তাহার পিতা আসিলেন। কে বলিবে কন্যার করুণ মুখ দেখিয়া তাঁহার মনে কোন্ ভাব জাগিয়া উঠিল। তিনি কন্যার দুই গণ্ডে হাত বুলাইয়া নয়নজলে ভাসিতে ভাসিতে কহিলেন:—

"মা, তুই অমন করিয়া কাঁদিস্ কেন, আমায় বল দেখি? তবে কি এ বিয়েতে তোর ইচ্ছা নাই?"

এইবার কমলা দুই হস্তে পিতার গলা জড়াইয়া ধরিল, এবং অনেক কষ্টে কহিল—

"বাবা, এ ঘরে আমার বিয়ে দিও না। তাহা হইলে আমি সুখী হইতে পারিব না।"

পিতা। মা, আগে কেন এ কথা বলিলে না? এখন যে আর সময় নাই।

কমলা পিতার কথায় কোন জবাব দিতে পারিল না। সে পিতার বুকে মুখ লুকাইয়া শুধুই কাঁদিতে লাগিল। কমলার পিতা কহিলেন:—

"এ বিবাহে তুমি কি অমঙ্গল আশঙ্কা করিতেছ?"

কমলা। এখানে বিবাহ হইলে আর আমি বাঁচিব না—

কমলার মুখ হইতে আর কথা বাহির হইল না। সে কাঁদিয়া পিতার বুক ভাসাইয়া দিল। পিতা আর কন্যার মুখের পানে চাহিতে পারিলেন না। তিনি বলিয়া উঠিলেন:—

"ওরে কে আছিস্? দে দে, বাদ্যি বাড়ীর বাজনা বন্ধ করিয়া দে।"

স্ত্রীকে কহিলেন:—"আমার মেয়ের বিবাহ ভাঙ্গিয়া গেল। তুমি যাও, লোকজনদিগকে খাওয়াইয়া বিদায় করিয়া দেও।"

অতঃপর চৌধুরী মহাশয় গোপীনাথ বক্সীর বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে সকল ব্যাপার ভাঙ্গিয়া বলিয়া কহিলেন:—

"আমার কন্যা যখন কিছুতেই এ বিবাহে সম্মত হইতেছে না, তখন আপনার ক্ষতি পূরণের জন্য আমাকে সর্ব্বস্ব হারাইতে হইলেও—এমন কি, জেলে যাইতে হইলেও, আপনার ঘরে, আমার কন্যার বিবাহ দিতে পারিব না।"

বিবাহ আর হইল না। গোপীনাথ সেই দিন দুই প্রতিজ্ঞা করিল। প্রথম প্রতিজ্ঞা এই যে, দুই সপ্তাহের মধ্যেই এই কুসুমপুরের বুকের উপর বসিয়া জাঁকজমক করিয়া পুত্রের বিবাহ দিবে। দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা, গ্রামের সমস্ত লোককে জব্দ করিয়া তবে সে কুসুমপুর ত্যাগ করিবে।

(৮)

একজন সদর-ওয়ালার কন্যার সঙ্গে নন্দলালের বিবাহ ঠিক হইয়াছে। আর সপ্তাহ পরেই তাহার বিবাহ হইবে। কিন্তু নন্দলাল সাহসে বুক বাঁধিয়া বাপের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, এবং কহিল:—

"এ বিবাহে আমার মত নাই।

গোপী। কিন্তু আমার সম্পূর্ণ মত আছে।

নন্দ। আমি অবিবাহিত থাকিব।

গোপী। আমি সাত দিনের মধ্যেই তোমার বিবাহ দিব।

নন্দ। আমার অসম্মতিতে?

গোপী। হাঁ, তাই।

নন্দ। আমি বালক নই, আমার বয়স চব্বিশ বৎসর হইয়াছে।

কামরূপের কামাখ্যা দেবীর মন্দির।

গোপী। আমার বয়স ষাট বৎসরেরও অধিক হইয়াছে, আমি এখন বৃদ্ধ।

নন্দ। বৃদ্ধের মত বিবেচনা করিয়া কথা কহিলেই তাহা মানিতে পারিব। নচেৎ পারিব না।

গোপীনাথের আর সহ্য হইল না। সে পায়ের জুতা খুলিয়া হাতে লইল, এবং "তবে রে বেটা পাজি, তোর যত বড় মুখ তত বড় কথা!" বলিয়াই নন্দলালকে প্রহার করিতে লাগিল। নন্দলাল প্রহার নীরবে সহ্য করিতে লাগিল। কিন্তু নন্দলালের মা আসিয়া চীৎকার করিয়া কহিতে লাগিলেন :—

"ওগো কে কোথায় আছ, শীঘ্র এস; আমার ছেলেকে মারিয়া খুন করিল।"

গৃহিণীর চীৎকারে পাড়ার লোক আসিয়া হাজির হইল। তখন গোপীনাথ প্রহারে ক্ষান্ত হইয়া কহিল :—

"যা, তুই এখনই আমার বাড়ী হইতে বাহির হইয়া যা।"

নন্দলাল কহিল :—"এখনি আমি বাড়ীর বাহির হইতেছি। এ জীবনে আর কখনও এ বাড়ীতে পা বাড়াইব না।"

নন্দলাল সত্য সত্যই বাড়ীর বাহির হইল, এবং যে দিকে পা চলে, সেই দিকেই চলিয়া গেল।

(৯)

এই এক বৎসর হইল নন্দলাল নিরুদ্দেশ; সে বাঁচিয়া আছে কি তাহার মৃত্যু হইয়াছে, সে বিষয়ে কোন খবরই পাওয়া যায় নাই। পুত্রের অভাবে গোপীনাথের প্রকৃতির অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এখন আর মানুষের প্রতি কঠোর ব্যবহার করিতে দেখা যায় না। তা ছাড়া লোকজনের মধ্যেও বড় একটা গতিবিধি নাই। গম্ভীর ভাবে নিজের ঘরের মধ্যে বসিয়া প্রাচীন শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করেন।

একদিন মনোযোগের সহিত রামায়ণের অন্ধমুনির পুত্র-শোকের কাহিনী পাঠ করিতেছিলেন। এমন সময়ে দুখানি চিঠি আসিয়া উপস্থিত হইল। একখানি সহরের কমিসনারের চিঠি। সেখানি খুলিয়া দেখিলেন, গবর্ণমেণ্ট হইতে তিনি 'রায় বাহাদুর' খেতাব পাইয়াছেন। আর একখানি এলাহাবাদের হাঁসপাতালের অধ্যক্ষের চিঠি। সে চিঠিতে নন্দলালের মৃত্যু-সংবাদ। নন্দলাল নানা স্থান ঘুরিয়া পীড়িত হইয়া এলাহাবাদের হাঁসপাতালে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। মৃত্যুর পূর্ব্বে হাঁসপাতালের অধ্যক্ষকে তাহার সংবাদটা পিতার কাছে লিখিতে অনুরোধ করিয়া গিয়াছে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গোপীনাথের জীবনের দুইটি উদ্দেশ্য ছিল। একটী রায় বাহাদুর খেতাব লাভ করা, আর একটী ছেলেকে ডিপুটি করা। গোপীনাথের রায় বাহাদুর উপাধি লাভ হইল, কিন্তু ছেলেকে ডিপুটি করা আর এ জন্মে হইয়া উঠিল না।

শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত।

—*—

কামরূপের কথা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

পরশুরামকুণ্ড হইতে ব্রহ্মকুণ্ড পর্য্যন্ত পথ অতি দুর্গম। ব্রহ্মকুণ্ডে কেহ গিয়াছেন বলিয়া শুনি নাই। পরশুরাম কুণ্ডের নিকট কৌণ্ডিণ্য নামক নগরে আমাদের পৌরাণিক রুক্মিণীর পিতা এবং শ্রীকৃষ্ণের শ্বশুর ভীষ্মক রাজার বাড়ী ছিল বলিয়া কথিত আছে। অদ্যাপি উহার ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। কামরূপ বলিলে এখন একটা জেলা বুঝায়, কিন্তু পূর্ব্বে উহা একটী সমগ্র প্রদেশ বলিয়া গণ্য ছিল। কামরূপের সীমা সম্বন্ধে কালিকা পুরাণে' লিখিত আছে :—

করতোয়ানদীপূর্ব্বং যাবদ্দিকরবাহিনীং
ত্রিংশদ্যোজনবিস্তীর্ণং যোজনৈকশতায়তং।
ত্রিকোণং কৃষ্ণবর্ণঞ্চ প্রভূতালয় পূরিতং
নদীশতদ্বয়াকীর্ণং লিঙ্গ কোটী-সমাবৃতং। *

অর্থাৎ করতোয়া নদী হইতে পূর্ব্বে দিকরবাহিনী পর্য্যন্ত ত্রিশ যোজন বিস্তৃত এবং একশত যোজন দীর্ঘ, ত্রিকোণাকার বহু গৃহ সমাকীর্ণ ও দুইশত নদী ও এক কোটী শিবলিঙ্গ সমাবৃত এই কামরূপ দেশ।—তাহা হইলে দেখা

* "কামাখ্যা-মাহাত্ম্যম্" হইতে সংগৃহীত।

যায়, বর্ত্তমান সদিয়া হইতে রঙ্গপুর জেলা পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগকেই পূর্ব্বে কামরূপ বলা হইত।

"শম্ভোর্নেত্রাগ্নির্নিদগ্ধঃ কামঃ শম্ভোরনুগ্রহাৎ।
তত্র রূপং যতঃ প্রাপ কামরূপং ততোমতম্॥"

মহাদেবের চক্ষু হইতে বহির্গত অগ্নি দ্বারা কামদেব ভস্মীভূত হইলে, মহাদেবের অনুগ্রহে এই দেশে পুনরায় পূর্ব্বরূপ প্রাপ্ত হন বলিয়া এই দেশের নাম 'কামরূপ' হইয়াছে। মহাভারতে যে ভগদত্ত রাজার উল্লেখ আছে, তিনি এই কামরূপেরই রাজা ছিলেন, প্রাক্‌জ্যোতিষপুর (বর্ত্তমান গৌহাটী) তাঁহার রাজধানী ছিল। ব্রহ্মা এই স্থানে বসিয়া পূর্ব্বে নক্ষত্র সৃষ্টি করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম হইয়াছে প্রাক্‌জ্যোতিষপুর।

ব্রহ্মপুত্র এবং কামরূপ সম্বন্ধে এই তো গেল শাস্ত্রীয় কথা। কিন্তু ইংরেজ কি আর সে কথা শোনেন? তাঁহারা সমস্তই ওলট পালট করিয়া ফেলিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, ঐ যে ব্রহ্মপুত্র দেখিতেছ উনিই তিব্বতের 'সানপো।' ব্রহ্মার ছেলে টেলে ওসব কিছু নহে। যখন তিব্বতে ছিলেন, তখন উহার ঐরূপ অনুনাসিক নাম ছিল, ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া 'ব্রহ্মপুত্র' নাম গ্রহণ করিয়াছেন। তার পর আসাম ছাড়াইয়াই আবার নাম বদলাইয়া যমুনা হইয়াছেন, পরে গোয়ালন্দের বাঁকে গঙ্গার সহিত মিশিয়া হইয়াছেন পদ্মা। তার পর বরাবর সাগরে চলিয়া গিয়াছেন।

ব্রহ্মপুত্রের যে অংশ আসাম দেশ দিয়া প্রবাহিত, ইংরেজ আসামের সেই অংশকে "ব্রহ্মপুত্র ভ্যালী" নাম দিয়া একজন কমিশনরের অধীন করিয়াছেন; কামরূপকে তাঁহারা নিতান্তই ছোট করিয়া ফেলিয়াছেন। পূর্ব্বে দরঙ্গ, উত্তরে ভোটান, দক্ষিণে খাসিয়া পাহাড় এবং পশ্চিমে গোয়ালপাড়া এই চতুঃসীমার মধ্যবর্ত্তী স্থানটুকুই 'কামরূপ' নামে অভিহিত হইয়াছে। প্রাক্‌জ্যোতিষপুরের এখন নাম হইয়াছে গৌহাটী।

৬৮০ খৃঃ অব্দে যখন চীনদেশীয় সুবিখ্যাত পরিব্রাজক হিউয়েন্থসাঙ্গ ভারতবর্ষে আগমন করেন তখন তিনি আসামেও আসিয়াছিলেন। তিনি তখন ভাস্করবর্ম্মা নামক একজন ব্রাহ্মণ রাজাকে এদেশে রাজত্ব করিতে দেখিয়াছিলেন। এখন তাঁহার প্রদত্ত বিবরণই আসামের প্রথম প্রামাণিক ঐতিহাসিক বিবরণ বলিয়া গণ্য হয়। ইহার পরে পাল বংশ, সেন বংশ এবং অহম জাতি আসামে রাজত্ব করেন। 'অহম'দিগের নামানুসারেই বর্ত্তমান 'আসাম' নাম হইয়াছে। ১৭৯২ খৃঃ অব্দে ইংরাজ প্রথমে আসামে প্রবেশ করেন; ইহার পরে আসাম-রাজের সহিত ব্রহ্মদেশীয়দের বিবাদের সুযোগে তাঁহারা আসাম অধিকার করিবার সুবিধা পাইলেও অধিকার করেন নাই। ১৮৩৮ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত উপর আসাম ইংরাজদের করদ ও আশ্রিত রাজ্যরূপে পরিগণিত ছিল, কিন্তু উপর-আসামের তদানীন্তন রাজা পুরন্দর সিংহ তাঁহার দেয় বার্ষিক ৫০ সহস্র টাকা কর দিতে অসমর্থ হওয়াতে ১৮৩৮ খ্রীঃ অব্দে ইংরেজ স্বয়ং ইহার শাসনভার গ্রহণ করেন। সুতরাং আসামে ইংরেজ রাজত্ব এক প্রকার সেদিনকার কথা, আবার সেখানে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রবেশ লাভ ততোধিক আধুনিক। এখন মাথায় স্বহস্তনির্ম্মিত চাদর দ্বারা পাগড়ী-বাঁধা, পরিধানে মুগার ধুতি ও উড়ুনি-ভূষিত আসামী ভদ্রলোক বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। ইংরেজী শিক্ষিত যুবকগণ হ্যাটকোট পরিতে ভালবাসেন। এত হ্যাটের প্রচলন বোধ হয় বাঙ্গালা দেশেও নাই। সাধারণে বিলাতী ধুতি চাদর এবং জিনের কোট ব্যবহার করে। বিলাতী সাবান সিগারেট ও বিলাতী জুতা প্রবল বেগে আসামে প্রবেশ করিতেছে। এ দেশে ষ্টীমার আসিবার পূর্ব্বে লোকে লবণের পরিবর্ত্তে কলাগাছ হইতে প্রস্তুত ক্ষার দিয়া লবণের অভাব দূর করিত।

পুরুষের পোষাক দেখিয়া এখন এ দেশের জাতীয় পোষাক নির্ণয় করা কঠিন; এ বিষয়ে আসামীরা বাঙ্গালীদিগকেও অতিক্রম করিয়াছেন। তবে স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে অনেকেই মেখলা (মুগা নির্ম্মিত স্ত্রীলোকের পরিচ্ছদ) ছাড়েন নাই। কিন্তু শিক্ষিতা এবং সহুরে মেয়েরা অনেকেই শাড়ী পরিতেছেন। আমি সময় সময় ইঁহাদের বাড়ী গেলে ইঁহারা মেখলা ছাড়িয়া শাড়ী পরিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন, দেখিয়াছি, আর মনে হইয়াছে, এই নূতন বিড়ম্বনার সৃষ্টি কেন?

আসামের যে এড়ি ও মুগার কাপড় বিদেশে এত আদর লাভ করিয়াছে, দেশে তাহার যথোচিত আদর নাই। আসামে অতি অল্প দিন পূর্ব্বেও চর্ম্মপাদুকার তেমন

প্রচলন ছিল না। এখন উহা একটী অত্যাবশ্যকীয় জিনিষের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। বিশ বৎসর পূর্ব্বে যে সকল জিনিষের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত এ দেশে ছিল না, এখন সেই সকল জিনিষ না হইলেই চলে না। তাই আসামীরা এদেশজাত মূল্যবান পদার্থের পরিবর্ত্তে অসার বিলাস বস্তু ক্রয় করিতে কুণ্ঠা বোধ করিতেছেন না। এই জন্যই কবির সঙ্গে বলিতে ইচ্ছা হয়—যে দেশের লোক চন্দন এবং চূত বৃক্ষ স্বহস্তে ছেদন করিয়া স্যাওড়ার আদর করে; হংস, ময়ূর, কোকিল প্রভৃতি বিনাশ করিয়া বায়সকে যত্নে প্রতিপালন করে; কর্পূরের বদলে কার্পাস গ্রহণ করে, মাতঙ্গের সহিত খরের বিনিময় করে, সে দেশকে নমস্কার।

আসামে স্ত্রী-শিক্ষার অবস্থা সন্তোষজনক না হইলেও আসামী নারীগণ শিল্প-নৈপুণ্যে আমাদের বাঙ্গালী মহিলাদিগের অপেক্ষা উচ্চ আসন পাইবার যোগ্য। ছোট বড়, ধনী নির্ধন সকল ঘরের স্ত্রীলোকেরাই কাপড় বুনিতে পারেন। মূল্যবান এণ্ডি এবং মুগার কাপড় স্ত্রীলোকেরই নির্ম্মিত। পাড়াগাঁয়ের লোকেরা নিজের ব্যবহার্য্য বস্ত্রাদি নিজেরাই প্রস্তুত করিয়া লয়। কিন্তু বিদেশী বস্ত্রের প্রসার যেরূপ প্রবল বেগে বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে কত দিন এই ভাব থাকিবে, বলিতে পারি না। সহরেও প্রায় সকল মহিলারই একখানি তাঁত আছে। আমি তাঁতের কাজ শিখিবার জন্য অনেকবার আসামী পরিবারে প্রবেশ করিয়াছি। পাটশাড়ী (একপ্রকার রেশম নির্ম্মিত শাড়ী) যাহা দেখিয়াছি তাহা বস্তুতঃই প্রশংসনীয়।

বাল্য বিবাহের প্রচলন এদেশে বড় একটা নাই। তবে শৈশবেই কন্যা বাক্‌দত্তা হইয়া থাকে; পরে ১৭।১৮ বৎসর বয়সে বিবাহ হয়। আমার একটী ছাত্রী * উচ্চ প্রাইমারী পরীক্ষায় বৃত্তি পাওয়ার পর বাক্‌দত্তা হইয়াছেন। তাঁহার ভাবী শ্বশুরের অমত বলিয়া বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়াছেন। আমি একবার কতিপয় ছাত্রী সমভিব্যাহারে গ্রামের মধ্যস্থিত একটী মধ্যবিত্ত গৃহস্থের বাড়ী গিয়াছিলাম। গৃহস্বামী এদেশীয় ব্রাহ্মণ। আমাদিগকে অতি যত্নের সহিত তাঁহার বাড়ী দেখাইতে লাগিলেন। বাড়ীখানি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, সম্মুখে একটী ফুলের বাগানে অসংখ্য গোলাপ ফুটিয়া রহিয়াছে। এ অঞ্চলে জাতিভেদ অত্যন্ত বেশী। এমন কি নব-বিবাহিত বধূ যে পর্য্যন্ত গুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ না করে সে পর্য্যন্ত তাহার রান্না কেহ খায় না। বৃদ্ধাদিগেরই এই ভোগ ভুগিতে হয়। গৃহস্বামী বোধ হয় আমাদিগকে খ্রীষ্টান মনে করিয়াছিলেন, সুতরাং গৃহাভ্যন্তরে স্থান দিতে সঙ্কুচিত হইতে লাগিলেন। আমরাও অবস্থা বুঝিয়া বাহিরেই বসিয়াছিলাম।

কামরূপ জেলার তীর্থস্থানগুলির উল্লেখ করিয়াই আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিব। গৌহাটী হইতে নৈঋত কোণে ২ মাইল অন্তর নীলাচলের উপরিস্থিত কামাখ্যা একটী মহাপীঠ ও প্রধান তীর্থস্থান। পুরাণের মতে কামাদি চতুর্বর্গ সাধনের জন্য ভগবতী এই পর্ব্বতে আসিয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম কামাখ্যা হইয়াছে। নানাস্থান হইতে বহুসংখ্যক লোক এই তীর্থ দর্শন করিতে আসিয়া থাকেন। সমতল ভূমি হইতে পাহাড়ের উপর এক মাইল পথ অতিক্রম করিয়া কামাখ্যা দেবীর মন্দিরে যাইতে হয়। পাহাড়ের উপর এই রাস্তা সুপ্রশস্ত প্রস্তর দ্বারা বাঁধান, বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত বলিয়া খ্যাত। দেব-ইঞ্জিনিয়ারের নির্ম্মিত হউক বা না হউক, ইহা যে কোন অদ্ভুতকর্ম্মা ইঞ্জিনিয়ারের কাজ তাহাতে আর সন্দেহ নাই। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথর টানিয়া পাহাড়ের উপর দিয়া রাস্তা করা সহজ ব্যাপার নহে। কামাখ্যাপীঠ ভয়ঙ্কর অন্ধকারময় মন্দিরের নীচে অবস্থিত। দিনের বেলায়ও অমাবস্যার রজনীর মত বোধ হয়। ভিতরে একটা হৈ চৈ ব্যাপার। পুরোহিতের মন্ত্রোচ্চারণ ধ্বনি, যাত্রীদের যাতায়াতের শব্দ, মন্দিরটীকে কোলাহলময় করিয়া রাখিয়াছে। এই কামাখ্যা পাহাড়ের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গে ভুবনেশ্বরীর মন্দির অবস্থিত। সে স্থান হইতে নীচের দিকে চাহিয়া দেখিতে বড়ই সুন্দর।

গৌহাটীর দক্ষিণ দিকস্থিত ব্রহ্মপুত্র নদের মধ্যভাগে উমানন্দ পাহাড় নামক একটি ক্ষুদ্র পর্ব্বতখণ্ডের উপর কামাখ্যার ভৈরব উমানন্দের মন্দির আছে। এই স্থানে শিবের অনুমতি লইয়া পরে কামাখ্যা দর্শন করিতে হয়। চারিদিকে জল, মাঝখানে ক্ষুদ্র শৈলের উপর অবস্থিত.

* মাননীয়া লেখিকা গৌহাটী মধ্যবঙ্গ বালিকাবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষয়িত্রী। ভাঃ মঃ সঃ।

বলিয়া এই মন্দির অতি রমণীয় দেখায়। * শিবরাত্রির দিন এই স্থানে বহু যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে। মহাদেব নিরামিষ খান, তবে এই দিন তাঁহার খাসী খাইতে আপত্তি নাই। তাই উক্ত দিবস বহুসংখ্যক খাসী জীবন্ত অবস্থায় ঘাড় মোচড়াইয়া বিনাশ করা হয়। ইহাই নাকি রীতি। উমানন্দের নিকটে ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণ তীরে "অশ্বক্রান্ত" বা "অশ্বক্রোন্ত" পাহাড়ে জনার্দ্দনের মন্দির আছে। প্রবাদ আছে যে, শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকে হরণ করিয়া লইয়া যাইবার সময় এই স্থানে তাঁহার অশ্ব ক্লান্ত হইয়াছিল। গৌহাটী হইতে ৭মাইল দূরে উত্তর-পশ্চিম কোণে 'বশিষ্ঠাশ্রম' নামক আর একটী রমণীয় স্থান আছে। রামায়ণের বিখ্যাত মুনি বশিষ্ঠ কামাখ্যা দর্শন করিতে আসিয়া এই স্থানে আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন বলিয়া ইহাও একটী তীর্থস্থান হইয়াছে। সুন্দর শৈল-শ্রেণীর মধ্যে প্রস্রবণের নিকট এই আশ্রমটী অতি মনোহর। প্রস্রবণের সুমধুর ধ্বনি প্রাণে এক অভূতপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার করে। নিস্তব্ধতার মধ্যে বন্য বিহঙ্গ কুলের অস্ফুট ধ্বনি স্বভাবতঃই ভগবানের চরণে হৃদয় আকর্ষণ করে। কিন্তু পাণ্ডার উৎপাত এইখানেও আছে। সংসারে আশক্তিশূন্য, যোগিশ্রেষ্ঠ ভগবান বশিষ্ঠের অনুচররূপী পাণ্ডাদের ব্যবহারে দর্শকদিগকে অস্থির হইতে হয়। পয়সা ছাড়া কথা নাই। "এখানে মহর্ষি সন্ধ্যা করিতেন, পয়সা দেও;" "এখানে উহা করিতেন, পয়সা দেও।" এইরূপ ধর্ম্ম এবং অর্থ পরস্পর-বিরোধী এই দুইটী জিনিষের সমাবেশ দর্শকদের নিকট নিতান্ত বিরক্তিকর বোধ হইয়া থাকে।

এতদ্ভিন্ন কামরূপে নবগ্রহ, হয়গ্রীব, পাণ্ডুনাথ প্রভৃতি আরও বহুসংখ্যক তীর্থস্থান আছে। এক কথায় এই জেলা কেবল তীর্থে পরিপূর্ণ বলিলেই হয়। এই সকল তীর্থস্থান এদেশের প্রাচীনতার নিদর্শন, তাহার সন্দেহ নাই।

শ্রীশতদলবাসিনী বিশ্বাস।

গৌহাটী।

---

* লেখিকা মহোদয়া অনুগ্রহ করিয়া কামাখ্যা, উমানন্দ ও বশিষ্ঠাশ্রমের ফটো তুলাইয়া আমাদিগকে পাঠাইয়াছেন। তিনখানি চিত্রই "ভারত-মহিলায়" প্রকাশিত হইবে। ভঃ মঃ সঃ।

অক্ষমের আয়োজন।

জননী, আজিকে মন্দির তলে তোর,
অর্ঘ্যের ভার ধরে না'ক আর
পূজকের নাহি ওর।
দিশি দিশি হ'তে ভিড়িছে তরণী,
শুনিবারে তোর শ্রীমুখের বাণী,
লক্ষ চিত্ত আজিকে মত্ত
নাম-সুধা পিয়ে ভোর।
জননি, এ প্রাতে জনতা-মুখর আঙ্গিনার তলে তোর।

বিজয় শঙ্খ ওই বাজে ঘন ঘন!
কুসুমে কুসুমে ভরি গেছে তনু,
ঝলসিছে আভরণ।
কাঞ্চন শ্রীতে মণি মরকতে
নব প্রভাতের অরুণ ছটাতে,
চরণের তলে থালিতে থালিতে
হের কত আয়োজন,
বিজয় শঙ্খে জয়কার তোর ওই বাজে ঘন ঘন!

উল্লাসে মাগো, ভুলি দৈন্য আপনার।
মৃন্ময় থালে এনেছি সাজায়ে
অতি দীন উপচার!
নিভৃত তোর গৃহ কোণ হ'তে
কোলাহল ভরা নগর পথেতে
দীন মেয়ে তোর এসেছে পূজিতে
মুক্ত করিয়া দ্বার।
জননী, আজিকে দীনতার লাজ বিসরিয়া আপনার।

শ্রীআমোদিনী ঘোষ।

বৈদিক গ্রন্থ ও ধর্ম্ম।

(১)

বেদ হিন্দুর সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মগ্রন্থ। প্রাচীন কালে ভারতের সর্ব্বত্র বেদের যথোচিত আলোচনা হইত। কিন্তু বর্ত্তমান কালে এ দেশে যে ভাবে শিক্ষা-পদ্ধতি পরিচালিত হইতেছে, তাহাতে সুকঠিন বৈদিক সংস্কৃতের অনু-

শীলনাদি করতঃ, স্বাধীন ভাবে প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থগুলির আলোচনা করা অতি অল্প লোকের পক্ষেই সম্ভবপর। পক্ষান্তরে, পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গ অক্লান্ত অধ্যবসায় ও যত্ন সহকারে বৈদিক গ্রন্থসমূহের আলোচনা করিয়া বিভিন্ন বৈদিক গ্রন্থের রচনা-কাল, বৈদিক দেবতাগণের প্রকৃতি ও বৈদিক ঋষিগণের অন্তরে ধর্ম্মভাবের ক্রমবিকাশ প্রভৃতি সকল বিষয়েই একটা সিদ্ধান্ত গঠন করিয়াছেন। সেই সিদ্ধান্ত সঙ্গত হইয়াছে কি না, তাহা বিচার করিয়া দেখিবার জন্য যে অধ্যবসায়, সময় ও পরিশ্রমের প্রয়োজন, আমাদের মধ্যে তাহা এখন অত্যন্ত দুর্লভ হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা আমাদিগকে যাহা বলিয়া দিতেছেন, আমরা তাহাই অকাতরে গ্রহণ করিতেছি।

সকলেই অবগত আছেন যে, ঋক্, সাম, যজুঃ নামে তিনটী বেদ সংহিতা বর্ত্তমান আছে। * প্রত্যেক বেদ-সংহিতাতেই কর্ম্ম, উপাসনা ও জ্ঞান—এই তিনটী কাণ্ড উপদিষ্ট রহিয়াছে। আবার এই তিন বেদ-সংহিতারই ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ - এই তিনটী শাখা বিভাগ আছে। এইগুলি সমুদয় লইয়াই এক এক সংহিতা। কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গের বিভাগ-প্রণালী অন্য প্রকার। তাঁহারা অনুমান করেন এবং তাঁহাদের মতে ইহা এক প্রকার স্থিরীকৃত হইয়া গিয়াছে, যে বৈদিক ঋষিগণ প্রথমেই সর্ব্বব্যাপী, নিত্য, সত্য, ব্রহ্মের একত্ব ধারণা করিতে পারেন নাই। বহুকাল পরে তাঁহাদের চিত্তে ক্রমে এই ব্রহ্মের একত্বের ধারণা ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিয়াছে। বৈদিক ঋষিগণের চিত্তে প্রথমে প্রাকৃতিক কার্য্যগুলির বিস্ময়কর প্রভাব ও শক্তিগুলি "দেবতা" নামে কল্পিত ও স্তুত হইত। অনেক পরে, দেবতার বহুত্বের মধ্যে ব্রহ্মের একত্বের তত্ত্ব ঋষিদিগের চিন্তার বিষয় হইয়াছিল। এই জন্যই এই সকল পণ্ডিতের মতে, বেদের শাখাত্রয়ের মধ্যে উপনিষদংশে ব্রহ্মের একত্ব বিষয়ে বিশেষ ভাবে আলোচিত হইয়াছে বলিয়া উপনিষদই বেদের সর্ব্বশেষ অংশ।

কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের এই বেদ-বিভাগের প্রণালী ও বৈদিক ঋষিগণের হৃদয়ে ঈশ্বর সম্বন্ধীয় ধারণার ক্রমবিকাশ নির্ণয়ের পদ্ধতি আমাদিগের নিকট সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। বৈদিক গ্রন্থ এ দেশে প্রধানতঃ ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়াই পরিগৃহীত হইয়া আসিয়াছে; সুতরাং মনুষ্যের চিত্তের ধর্ম্ম ভাবের বিকাশের শ্রেণী ও তারতম্যের উপরেই বৈদিক গ্রন্থগুলির বিভাগ স্বাভাবিক। স্মরণাতীত পুরাতন কাল হইতে, কর্ম্মকাণ্ড, উপাসনা এবং জ্ঞানকাণ্ড এই তিন ভাগে বৈদিক গ্রন্থ ও ধর্ম্ম বিভক্ত। এ দেশীয় প্রাচীন ভাষ্যকারগণ এই ভাবেই বিভাগ কল্পনা করিয়াছিলেন। ইহাই যে সুসঙ্গত বিভাগ এই প্রবন্ধে আমরা তাহা পরিস্ফুট করিতে চেষ্টা করিব।

অতি প্রাচীনতম বলিয়া কীর্ত্তিত ঋগ্বেদ সংহিতায় অগ্নি প্রভৃতি দেবতার স্তুতিবাচক অসংখ্য সূক্তে এরূপ কথা দেখিতে পাওয়া যায়, যদ্দ্বারা ইহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারা যায়, যে ঋষিদিগের চিত্তে এই তত্ত্ব প্রথমেই পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল যে, দেবতাগুলি—একই পরম-দেবতার ভিন্ন ভিন্ন বিকাশ মাত্র। আবার ইহাও দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে সকল বিশেষ বিশেষণ দ্বারা একটী নির্দ্দিষ্ট দেবতার স্তব করা হইল, অন্য এক দেবতার স্তব করিতে গিয়া সেই বিশেষণগুলিকেই আবার এই শেষোক্ত দেবতার উপরে প্রয়োগ করা হইল। * ইহা দ্বারা ইহা পরিষ্কার প্রতীয়মান হয়, যে দেবতারা কেবল নামত ও কর্ম্মত মাত্র ভিন্ন—উহারা যে প্রকৃত পক্ষে ভিন্ন নহে—এ তত্ত্ব স্তবকারী ঋষিগণের চিত্তে প্রথম হইতেই উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল। একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের ঋষিগণ যে ই ব্রহ্মতত্ত্ব জানিতেন না, এবং তাঁহাদের চিত্তে অনেক পরে ব্রহ্মের একত্ব প্রবুদ্ধ হইয়াছিল,—এ সিদ্ধান্ত স্বীকার করিবার পক্ষে বিশিষ্ট কোন প্রমাণ আমরা প্রাপ্ত হইতেছি না।

মনুষ্য-চিত্তের স্বাভাবিক বিকাশের প্রণালী বরং এই-

* বৈদিক যজ্ঞে প্রধানতঃ ৪ জন ঋত্বিক আবশ্যক। হোতার ব্যবহার্য্য মন্ত্রগুলি 'ঋক্' বা পদ্য মন্ত্র। অধ্বর্য্যুর ব্যবহৃত মন্ত্রগুলি প্রায়ই 'যজুঃ' বা গদ্য মন্ত্র। উদ্গাতার ব্যবহৃত মন্ত্রগুলি 'সাম' এবং সামের মূলীভূত ঋক ও যজুঃ। পদ্য ও গদ্য মিশ্রিত মন্ত্র গানে বাঁধিলেই সাম হয়। অতএব এই তিন প্রকার মন্ত্রাত্মক গ্রন্থই—তিন সংহিতা নামে খ্যাত। এই সকল ঋত্বিকের ব্যবহার্য্য মন্ত্র ছাড়া আর কতকগুলি মন্ত্র আছে (পদ্য, গদ্য ও গানাত্মক); সেইগুলি লইয়া অথর্ব্ব সংহিতা হইয়াছে।

* কেবল ইহাই নহে। দেবতাদের প্রতি স্থানে স্থানে এমন সকল বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে যে, সে সকল বিশেষণ কেবল একমাত্র বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মেই প্রযুক্ত হইতে পারে।

রূপ হওয়াই সুসঙ্গত যে, আর্য্য ঋষিবর্গের মধ্যে কতকগুলি ঋষির চিত্ত—সর্ব্বব্যাপ্ত, নির্গুণ, নিত্য পরব্রহ্মের জ্ঞানের ধারণার অধিকারী ছিল না; কিন্তু সেই সময়েই অন্য এমন অনেক ঋষি তাঁহাদের মধ্যে বর্ত্তমান ছিলেন, যাঁহারা সততই ব্রহ্মজ্ঞানের আলোচনা করিতেন। সর্ব্বদাই, সর্ব্ব-সমাজে, সর্ব্বকালে এইরূপ লোক দেখিতে পাওয়া যায় যে, কতকগুলি ব্যক্তি নিতান্তই সংসার-পরায়ণ ও ইহলোক-সর্ব্বস্ব। এই সকল লোক সংসারের পদার্থ লইয়াই চির-ব্যস্ত এবং সর্ব্বদা ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি-পরায়ণ। এ সকল লোক, সংসার ব্যতীত অন্য কোন উন্নত বস্তু বা লোকের কোন তত্ত্ব রাখে না,—কোন সংবাদ রাখিতে ইচ্ছা করে না। এরূপ লোকের চিত্তে পরলোক ও ঈশ্বর-তত্ত্ব মুদ্রিত করিয়া দিতে হইলে, তাহারা যে সকল পদার্থ দ্বারা চতুর্দ্দিকে সমাবৃত রহিয়াছে সেই সকল পদার্থেরই সাহায্যে এবং তাহাদেরই সুখকর—স্বার্থ-সাধক—প্রণালীর মধ্য দিয়া ক্রমে তাহাদের চিত্তে ব্রহ্ম ও পরলোকের উপদেশ দিতে হয়। নতুবা, এ সকল লোকের সমক্ষে হঠাৎ পরার্থপরতার কথা, আত্মসুখ ত্যাগের কথা ও নির্গুণ, নির্ব্বিকার পরব্রহ্মের কথা উত্থাপন করিলে কোনই ফললাভের সম্ভাবনা নাই। মনুষ্য-চিত্তের এ তথ্য আমরা সর্ব্বদাই প্রত্যক্ষ করিতেছি। এই সকল ইহলোক-সর্ব্বস্ব ব্যক্তির পক্ষে, এই সকল ইন্দ্রিয়-সেবাশীল লোকের উদ্দেশ্যে,—সকাম যাগযজ্ঞাদি কর্ম্মকাণ্ড বেদে উপদিষ্ট আছে। ভিন্ন ভিন্ন দেবতার উদ্দেশ্যে, নিজেরই পরলোকে সুখ হইবে এই প্রকার সকাম স্বর্গাদির কথা তুলিয়া,—এই সকল ব্যক্তিকে ক্রমে সংসারাসক্তি হইতে ঊর্দ্ধে উত্থিত করিয়া, ঈশ্বর-তত্ত্ব প্রদান-মানসে বেদে যজ্ঞাদি কর্ম্মকাণ্ড উপদিষ্ট রহিয়াছে। কিন্তু যাঁহারা তত্ত্ব-দর্শী, বিশুদ্ধ-চিত্ত,—তাঁহাদের জন্য উপনিষদের জ্ঞান-কাণ্ড উপদিষ্ট হইয়াছে।

আমরা উপরে যে তত্ত্বের আভাস দিলাম, ইহাই বেদ-গ্রন্থ বুঝিবার পক্ষে প্রকৃত তত্ত্ব। এই জন্যই আমরা বৈদিক গ্রন্থের সর্ব্বত্র দ্রব্যাত্মক ও ভাবনাত্মক—এই উভয়বিধ যজ্ঞানুষ্ঠানের কথা দেখিতে পাই *। যাঁহাদের চিত্ত কিঞ্চিৎ মার্জ্জিত হইয়া উঠিয়াছে, যাঁহাদিগের ব্রহ্মজিজ্ঞাসা জন্মিয়াছে, তাঁহাদের পক্ষে দ্রব্যাত্মক যজ্ঞের কোন আবশ্যকতা নাই, তাঁহাদের পক্ষে বাহিরে যজ্ঞাদি ক্রিয়া কলাপের পরিত্যাগই বিহিত হইয়াছে। ইঁহারা বাহিরের সকাম কর্ম্ম-কাণ্ড বর্জ্জন করিয়া, ব্রহ্মোদ্দেশে অন্তরে সর্ব্বদা ভাবনাময় যজ্ঞের আচরণ করিবেন। কেবল যে বৈদিক উপনিষদ ও আরণ্যকাদি গ্রন্থেই এইরূপ বিধি প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা নহে। বৈদিক ধর্ম্মসূত্রগুলিতে, এমন কি ভগবদ্গীতাদি গ্রন্থেও এই কথাই পরে পুনরুক্ত হইয়াছে। এই জন্যই আমরা মনুসংহিতায়, ভাবনাত্মক পঞ্চমহাযজ্ঞানুষ্ঠান-কারীর কথা দেখিতে পাই। এবং তথায়, এরূপ অনুষ্ঠান গৃহস্থের পক্ষে বিহিত হইয়াছে। ক্রমে যতই চিত্তে ব্রহ্ম-জ্ঞান পরিস্ফুট হইতে থাকিবে, ততই সাধকের পক্ষে ক্রমে এই ভাবনাময় যজ্ঞেরও প্রয়োজন থাকিবে না। তখন কেবল ব্রহ্মোদ্দেশে, ব্রহ্মপ্রাপ্তি-কামনায় নিয়ত ব্রহ্মের অনু-ধ্যানই কর্ত্তব্য বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে। পরবর্ত্তী মনুসংহিতা, ভগবদ্গীতাদি ধর্ম্মগ্রন্থের এই সকল উপদেশ দ্বারা ইহা সুস্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, অতি প্রাচীনকাল হইতেই প্রাচীন বৈদিক গ্রন্থগুলিতেও সাধকের চিত্তের ধর্ম্ম-বিকাশের তারতম্য-নিবন্ধনই কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড উপদিষ্ট হইয়াছিল। প্রথমে সকল ব্যক্তিই কর্ম্মকাণ্ড লইয়াই আবদ্ধ থাকিতেন এবং বহুকাল পরে ব্রহ্মতত্ত্বের কথা তাঁহাদের চিত্তে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল, এ মীমাংসা সুসঙ্গত নহে। সাধকের চিত্তবিকাশের তারতম্যানুসারেই যে কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের বিভাগ উপদিষ্ট হইয়াছে, এ বিভাগ যে প্রথম হইতেই বর্ত্তমান ছিল, একথা সাধকের পরলোকে গতির যে বিবরণ বৈদিকগ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে তদ্দ্বারাও প্রমাণিত হয়। কিন্তু সে কথা আমরা ইতঃপর আলোচনা করিয়া দেখিব।

তবেই আমরা এই সকল আলোচনা দ্বারা বুঝিতে পারিতেছি, যে কর্ম্মকাণ্ড যে সকলের পক্ষেই এক সময়ে উপদিষ্ট হইয়াছে তাহা নহে; আবার জ্ঞানকাণ্ডও যে এক সময়ে সকলের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহাও নহে। সাংসারিক কার্য্যনিমগ্ন ব্যক্তির চিত্তে ব্রহ্ম ও পরকালের আভাস জন্মাই-বার জন্যই সকাম যজ্ঞবিধির আবশ্যকতা। কিন্তু উন্নতচিত্ত

* মৎপ্রণীত "উপনিষদের উপদেশ" নামক গ্রন্থের অবতরণিকা ও 'সপ্তান্ন-বিদ্যা' দেখুন।

ব্রহ্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তির পক্ষে দ্রব্যাত্মক যজ্ঞের প্রয়োজন নাই; তাঁহারা ভাবনাত্মক যজ্ঞের অধিকারী। ইঁহারা, অন্তরেই সর্ব্বদা যজ্ঞ সম্পাদিত হইতেছে, এইরূপ মনন করিতে থাকিবেন। *

কিন্তু যাঁহারা উত্তম সাধক, তাঁহাদের সম্বন্ধে অধ্যাত্ম-যোগাবলম্বন দ্বারা হৃদয়-গুহায় ব্রহ্মানুচিন্তনের উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে. ইঁহাদের পক্ষে আর পূর্ব্বোক্ত ভাবনাত্মক 'যজ্ঞের'ও আবশ্যকতা নাই।

অতএব সাধকের চিত্তের তারতম্যানুসারে, এইরূপে বৈদিক ধর্ম্ম,—কর্ম্ম, জ্ঞান ও উপাসনা এই ত্রিবিধ মার্গে বিভক্ত হইয়াছে। এই ধর্ম্মের এই ত্রিবিধ মার্গের উপলক্ষেই ভারতের বৈদিক ধর্ম্মগ্রন্থগুলিও প্রত্যেকে এইরূপ তিনভাগে বিভক্ত। এইজন্যই প্রত্যেক সংহিতাতেই এই কর্ম্ম, জ্ঞান ও উপাসনার তত্ত্ব নিবদ্ধ রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। অতঃপর আমরা বৈদিক গ্রন্থগুলির বিবরণ প্রদান করিতে অগ্রসর হইব এবং তদ্দ্বারা আমাদের সিদ্ধান্ত দৃঢ়ীকৃত করিয়া লইব। (ক্রমশঃ)

শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য, বিদ্যারত্ন, এম, এ।

ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ।

—০:০—

এবারে বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত গুণগ্রাহী গুজরাট প্রদেশের সুধাময় সুরাট নগরে মাতৃপূজার মহোৎসব উপস্থিত। যে সুরাট নগরে এক সময়ে মহারাষ্ট্র-কুলতিলক মহাবীর শিবাজির অমিত ভুজবলে সম্রাট-কেশরী আওরঙ্গজেব সসৈন্যে প্রবেশ করিতে সঙ্কুচিত হইয়াছিলেন, যে সুরাটের সমুদ্র বন্দর হইতে একদা বহুমূল্যবান রত্ন, মাণিক্য, কাষ্ঠ ও ভূষণাদি বিবিধ দ্রব্য সুদূর প্যালেষ্টাইনের সুবিখ্যাত সলোমন নরপতির ভুবনবিশ্রুত দেবমন্দির নির্ম্মাণ জন্য প্রেরিত হইয়াছিল, যে সুরাট হইতে এক সময়ে ভারতীয় ইশলামধর্ম্মাবলম্বিগণ পৃথিবীর নানা দেশীয় বণিক-বৃন্দের সহিত মক্কাতীর্থ গমন করিতেন, একদা যে সুপ্রসিদ্ধ সুরাটে সহস্র সহস্র হিন্দু সেনাপতি সমরসজ্জায় ভূষিত হইয়া সোমনাথ-পত্তনের হিন্দুমন্দির রক্ষার্থ আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছিলেন, এবারে সেই সুপবিত্র ও সুবিখ্যাত সুরাট-নগরে ভারতবাসীর পরম প্রিয়, মাতৃভূমির মহাবোধন-যজ্ঞ জাতীয় মহাসমিতির (ন্যাশনাল কংগ্রেসের) অধিবেশন হইতেছে। সুরাটের অধিবাসীবৃন্দ মার্ত্তণ্ড-ময়ূখমালার প্রচণ্ড প্রকোপে অথবা শীতের দুরন্ত হিমানীর অবসাদে কখন ক্লিষ্ট হয়েন না, সুতরাং সেই স্থানে একপ্রকার চিরবসন্ত বিরাজিত বলিলেই হয়। অতি সুখময় সময়ে এবং সুধাময় স্থানে এবারে মাতৃপূজার মহোৎসব উপস্থিত! বর্ত্তমান মহাসমিতিতে যে মহাপুরুষ সম্মানিত সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন, বর্ত্তমান প্রবন্ধে সেই মহানুভবের কথঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিতে আকাঙ্ক্ষা করি।

এই মহাত্মার নাম ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ; ইনি আইনের সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায় বিশেষ যোগ্যতা ও সুখ্যাতিসহ উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন বলিয়া "ডাক্তার অব্ ল" (ডি, এল) উপাধিতে বিভূষিত হইয়াছেন। বৰ্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত তোড়্কোণা নামক গ্রামে কুলীন কায়স্থ-কুলে ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার জন্ম হয়; ইঁহার পিতৃদেব ৺ বাবু জগৎবন্ধু ঘোষ মহাশয় বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের অধীনে ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট পদে নিযুক্ত থাকিয়া পরে পেন্সন গ্রহণ করেন এবং কতিপয় বর্ষ বিশ্রাম-সুখ উপভোগ পূর্ব্বক, স্বর্গধামে প্রয়াণ করেন।*

জগৎবন্ধু বাবুর দুই বিবাহ; রাসবিহারী বাবু প্রথমা সহধর্ম্মিণীর পুত্র। ডাক্তার ঘোষ মহাশয়ও দুইবার পরিণীত হইয়াছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় দুই সহধর্ম্মিণীই নিঃসন্তান অবস্থায় ভবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। ঘোষ মহাশয়ের বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃগণ বিপিনবাবু প্রভৃতি জীবিত আছেন। ভাষা কথায় কহিতে হইলে নিরপেক্ষ ভাবে বলা যায়, যুবাকাল হইতেই ডাক্তার রাসবিহারী একপ্রকার

---

* ব্রাহ্মণ গ্রন্থে ও উপনিষদে এই ভাবে "অগ্নিচয়ন" ও ভাবনাত্মক-যজ্ঞের বহু উপদেশ দৃষ্ট হয়। চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয় যখন শব্দস্পর্শরূপাদি বিষয়ের প্রত্যক্ষানুভূতি লাভ করিয়া থাকে, তখনও যেন বিষয়রূপ ইন্ধন দ্বারা প্রদাপ্ত ইন্দ্রিয়নিচয় নিয়ত আত্মাগ্নিতে হোম-ক্রিয়া সম্পাদন করিতেছে—এই প্রকারের বিধি দৃষ্ট হয়।

* বর্ত্তমান লেখকের সহিত ডাক্তার ঘোষের পিতৃদেবের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরিচয় ছিল

"ব্রহ্মচারী।" তাঁহার সমস্ত জীবন প্রাচীন ঋষির ন্যায় জ্ঞানচর্চ্চা ও গ্রন্থাধ্যয়নে অতিবাহিত হইয়াছে। তিনি বয়সে, জ্ঞানে, বহুদর্শিতায় ও বিবেচনা-শক্তিতে প্রবীণ, কিন্তু উৎসাহ ও কার্য্যকুশলতায় সদাই নবীন। মান্দ্রাজের অনরেবল ভাষ্যম আয়াঙ্গার মহোদয় ব্যতীত সমগ্র ভারতবর্ষে ঘোষ মহাশয়ের সমকক্ষ এমন অসাধারণ আইনাভিজ্ঞ উকিল বোধ হয় অদ্যাপি জন্মগ্রহণ করে নাই। ইনি কলিকাতা হাইকোর্টের লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবহারজীবী এবং বঙ্গদেশ ও বাঙ্গালীজাতির অত্যুৎকৃষ্ট গৌরব ও সৌরভ। অতি শুভক্ষণে এই মহাত্মার জন্ম এবং অতি সুখের কথা যে, এই মহানুভবকে এবারে জাতীয় মহাসমিতির সভাপতি পদে বরণ করা হইয়াছে।

ডাক্তার ঘোষ কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের একজন অতি প্রসিদ্ধ ছাত্র। তাঁহার সময়ে এরূপ প্রতিভাশালী বিদ্যার্থী এদেশে ছিল না। তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষা হইতে এম, এ, বি, এল পরীক্ষা পর্য্যন্ত প্রত্যেক পরীক্ষায়ই প্রথম বিভাগের সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। ১৮৭৯ অব্দে তিনি বি, এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন এবং ১৮৮৪অব্দে ডি, এল পরীক্ষায় কৃতকার্য্যতা লাভ করেন। ১৮৭৬ অব্দে ঠাকুর-আইন পরীক্ষার অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া তিনি আইন বিষয়ে যে সকল বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়া যাইবার পরে সুদূর ইউরোপ দেশপর্য্যন্ত তাঁহার অসাধারণ যোগ্যতার সৌরভ পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। "বন্ধক বিষয়ক আইন" (Law of mortgage) নামক তাঁহার ইংরাজি গ্রন্থ সমগ্র জগতের আইনজ্ঞদিগকে চমৎকৃত করিয়া রাখিয়াছে।

ডাক্তার ঘোষ এদেশের বহুবিধ হিতকর অনুষ্ঠানে মনপ্রাণে সাহায্য করিয়াছেন। অনেক দিবস হইতে তিনি কংগ্রেসের অন্যতম প্রধান সহায়, অনেক দিবস হইতে তিনি শিক্ষাবিভাগের সংস্কারক ও উপদেশক এবং বিগত কতিপয় বর্ষ হইতে তিনি এদেশের কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে বদ্ধপরিকর আছেন। তিনি মুখসর্ব্বস্ব লোক নহেন, প্রকৃত কার্য্যের মানুষ। কলিকাতায় তিনি দেশলাইএর কল স্থাপন, কৃষিসভায় যথেষ্ট অর্থদান, টেক্নিক্যাল (Technical) কলেজে প্রচুর অর্থ সাহায্য এবং অনেক শিল্পীকে অসময়ে সাহায্য করিয়া প্রকৃত মহত্ত্ব ও স্বদেশহিতৈষণা দেখাইয়াছেন। তিনি ইংলণ্ড, সিংহল এবং ভারতবর্ষের বহু স্থানে ভ্রমণ করিয়া নানা বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ পূর্ব্বক বহুপ্রকারে তদ্দ্বারা দেশের ও স্বজাতির হিতসাধন করিয়াছেন ও করিতেছেন। নব নব বিষয়ের শিক্ষা এবং নব নব গ্রন্থের অধ্যয়নেই ইনি অধিকাংশ সময় যাপন করেন, কিন্তু স্বদেশ ও স্বজাতিকে ইনি কখন বিস্মৃত হয়েন না। কলিকাতা হাইকোর্টে ইঁহার ওকালতীতে অসাধারণ প্রতিপত্তি ও প্রচুর আয় আছে; ইঁহার আবাসবাটীও রাজপ্রাসাদ সমতুল্য; কিন্তু বদান্যতা ও দীন জনের উপকারে ইনি সদাই মুক্তহস্ত। কলিকাতার বাঙ্গালীবিদ্বেষী "ইংলিশম্যান"-সম্পাদক সেদিন লিখিয়াছেন :—"Dr. Rash Behari Ghose is an intellectual giant". * যে সম্বাদপত্র বাঙ্গালীর নাম শুনিলে কর্ণে অঙ্গুলি অর্পণ করেন, সেই ইংরাজী পত্রে লিখিত হইয়াছে :— 'Dr. Ghose is a man of sterling merit and superior intellect. He is the best product of English education in this country".—(Englishman) † গবর্ণর জেনেরল বাহাদুরের কৌন্সিলের হোম্-মেম্বর (Home-member) সাহেব সেদিন বড়লাটের সভায় কহিয়াছিলেন :—"There is not a single individual in this whole country who does not bow to the learned Dr. Ghose's superior knowledge of law. His profound knowledge of English language and literature is marvellous. He can find place side by side with the best English scholars." ‡

* অর্থাৎ, ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ একজন অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন পুরুষ।

† অর্থাৎ, ডাক্তার ঘোষ একজন অকৃত্রিম গুণশালী ও অনন্যসাধারণ মানসিক শক্তিবিশিষ্ট মহৎ ব্যক্তি। এদেশে ইংরেজি শিক্ষার তিনি সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফল।

‡ এই সমগ্র দেশে এমন একটী লোক নাই, যাহার মস্তক ডাক্তার ঘোষের অসাধারণ আইনজ্ঞানের নিকট অবনত না হয়। ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যে তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য বস্তুতঃই বিস্ময়োৎপাদক। ইংলণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনীষিগণের সহিত তিনি তুল্যাসন পাইবার অধিকারী।

কামরূপের বশিষ্ঠাশ্রম

মহামান্য ডাক্তার (আচার্য্য) রাসবিহারী গবর্ণমেণ্ট বাহাদুর কর্ত্তৃক সি, আই, ই, উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইনি এক্ষণে বড়লাট বাহাদুরের কৌন্সিলের মহাসম্মানিত ও সুযোগ্য সভ্য (মেম্বর)। বাস্তবিক ভারতমাতার এক মাতৃবৎসল, সুযোগ্য ও সুপ্রসিদ্ধ সুসন্তানকে এবারে মাতৃপূজার মহোৎসবে সভাপতির সম্মানিত সিংহাসনে সমুপবিষ্ট দেখিয়া আমরা আজ পরমানন্দিত।

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

দেবী-সমাগম। *

মেরী ও মার্থা।

(১)

পুণ্যের প্রতিমা তুমি কে? আহা! কি সুন্দর মুখ-চ্ছবি! অর্দ্ধ-নিমীলিত নয়নে বক্ষোপরি হস্ত স্থাপন করিয়া কাহার ধ্যানে মগ্ন রহিয়াছ? কি মহারত্ন লাভ করিবার জন্য পৃথিবীর সকল সাধে জলাঞ্জলি দিয়া যৌবনে যোগিনী সাজিয়াছ? এ সময়ে তোমার এ বেশ কেন? নানা ঐশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ সুখময় পৃথিবীর সুখ ভোগে তোমার স্পৃহা নাই কেন? তুমি এমন রূপবতী, ইচ্ছা করিলে ধনীর গৃহিণী হইয়া পৃথিবীর সুখ সম্পদ সম্মান লাভ করিয়া আনন্দে জীবন কাটাইতে পার। তোমার কি পৃথিবীর সুখ সম্পদে আকাঙ্ক্ষা নাই? কোন্ সুখের আশায় পৃথিবীর সকল সুখ তুচ্ছ জ্ঞান করিলে? দেবি! তুমি বুঝি নিত্য সুখের সন্ধান পাইয়াছ, তাই আর পৃথিবীর অনিত্য সুখে তোমার স্পৃহা নাই? তুমি কি দিব্যধামবাসিনী দেবকন্যা? আহা, কি অপরূপ রূপ তোমার! এমন রূপ তো পৃথিবীতে কাহারও দেখিতে পাই না। নির্ম্মল চন্দ্রের স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ তোমার মুখ হইতে ছড়াইয়া পড়িতেছে! আহা! কি সুন্দর!!

তোমার পার্শ্বে দীপ্যমান পুণ্য-সূর্য্যের ন্যায় শোভা পাইতেছেন ইনি কে? বিলম্বিত কেশ, আঁখি দুটী স্বর্গ পানে, বদনে পুণ্যজ্যোতিঃ, সাক্ষাৎ দেবতা স্বরূপ ইনি কে? আঃ বুঝিয়াছি, ইনি পুণ্যাবতার যীশু, যিনি জগতের পাপ ও দুঃখভার লাঘব করিবার জন্য ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন; আর তুমি ইঁহারই প্রিয় সঙ্গিনী মেরী।

(২)

ঐ যে আর একটী ভক্তিমাখা দেবী দেখিতেছি, ইনি মহাব্যস্তা হইয়া নানাকার্য্য করিতেছেন; ইনিই বা কে? ইনি বুঝি তোমারই প্রিয় ভগিনী মার্থা? ইঁহার এত ব্যস্ততা কেন? বুঝিয়াছি, প্রিয় যীশুর পরিচর্য্যা করিবার জন্যই এত পরিশ্রম করিতেছেন। আহা! খাটিতে খাটিতে সুন্দর মুখখানি রক্তরাগে রঞ্জিত হইয়াছে, দেহখানি অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। মেরি! যীশুর পদপ্রান্তে বসিয়া তুমি কি করিতেছ? তোমার হৃদয়ে বিমল আনন্দ, মুখে স্বর্গের লাবণ্য ফুটিয়া উঠিয়াছে! কে তোমার মুখে এমন দিব্য লাবণ্য ঢালিয়া দিল? দেবনন্দন যীশুর শ্রীমুখ-বিনিঃসৃত তত্ত্বকথা শ্রবণ করিতেছ; কি সুধা পানে বিভোরা হইয়া রহিয়াছ! যীশুর পুণ্যময় প্রাণে প্রাণ মিশাইয়া বুঝি অনন্ত শান্তি-সাগরে ডুবিয়া গেলে? তোমার কি সংসারের কথা একেবারেই মনে নাই? ওদিকে যে তোমার ভগিনী মার্থা পরিশ্রান্তা হইয়া তোমার সহায়তা প্রার্থনা করিতেছেন; তুমি কি শুনিতে পাইতেছ না? কোন্ অতীন্দ্রিয় রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছ? পৃথিবীর ধ্বনি আর শুনিতে পাও না! আহা, মার্থা, তোমার এত কষ্ট হইতেছে, তোমার ভগিনী কেন তোমার দিকে ফিরিয়া তাকাইতেছেন না? মেরি! তোমার ভগিনীর উপর পরিচর্য্যার সম্পূর্ণ ভার রাখিয়া তোমার এরূপ ভাবে বসিয়া থাকা কি উচিত হইতেছে, এতে কি তোমার স্বার্থপরতা ও নির্দ্দয়তা প্রকাশ পাইতেছে না? মার্থা! আমি কি তোমার কার্য্যে একটু সাহায্য করিতে পারি? আমার যে তোমার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে সাহস হইতেছে না; তোমার মত পবিত্রতা, তোমার মত ভক্তি তো আমার নাই! কোন্ সাহসে অগ্রসর হইব বল? যাঁহার পবিত্র স্পর্শে কত পাপী পরিত্রাণ লাভ করিল, কত অন্ধ চক্ষুষ্মান হইল,

---

* মেরী ও মার্থা বাইবেলোক্ত দুইটী ধার্ম্মিকা ভগ্নী। ইঁহারা উভয়েই যীশুর অতি প্রিয় শিষ্যা ছিলেন। মেরী ব্রহ্মজ্ঞান-পরায়ণা ও মার্থা শ্রীপ্রজ্ঞাবিশিষ্টা অর্থাৎ গৃহকর্ম্মাদিতে অধিক নিষ্ঠাবতী ছিলেন। মেরীকেই যীশু শ্রেষ্ঠ মনে করিতেন এবং মানব-সমাজে মেরীর সঙ্গই তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় ছিল। ভাঃ মঃ সঃ।

কত মৃত নবজীবন পাইল, সেই পবিত্র দেবতার সেবা করা কি সামান্য সৌভাগ্য? দেবী মার্থা, তুমি অতি পুণ্যবতী ও সৌভাগ্যশালিনী, তাই পুণ্যময় যীশুর সেবা করিয়া ধন্যা হইতেছ! তোমার জন্মই সফল, তোমার দেহ ধারণই সার্থক! তোমার পবিত্র পদধূলি আজ আমার মাথায় তুলিয়া দাও; আশীর্ব্বাদ কর আমি যেন তোমার মত দেব-সন্তানগণের সেবা করিয়া জীবন সফল করিতে পারি।

পুণ্যাবতার যীশু! মার্থা তোমার মুখ পানে তাকাইয়া কি বলিতেছেন? মেরীকে তাঁহার কার্য্যে সাহায্য করিবার জন্য আদেশ করিতে বলিতেছেন বুঝি? পুণ্যময় যীশু, তুমি কি মেরীকে তাঁহার ভগিনীর সাহায্য করিতে আদেশ করিবে না? মার্থা, শোন! শোন! যীশু তোমাকে বলিতেছেন—"তুমি অনেক বিষয়ে চিন্তিতা হইয়াছ, কিন্তু একটী বিষয়ই চিন্তা করা প্রয়োজন, মেরী সেই উত্তম অংশই মনোনীত করিয়াছেন; যাহা তাঁহার নিকট হইতে লওয়া যাইবে না!"

(৩)

আবার একি দৃশ্য দেখিতেছি? মেরি! পাগলিনীর ন্যায় ছুটিয়া আসিতেছ কেন? তোমার হাতে কি? সুগন্ধি তৈল? এ যে বহুমূল্য তৈল, ইহা দিয়া কি করিবে? এ কি করিলে! এতগুলি তৈল যীশুর পদে ঢালিয়া দিলে? মেরি, ঐ শোন জুডাস্ কি বলিতেছেন; "এই আতর তিন শত মুদ্রায় বিক্রয় করিয়া দরিদ্রদিগকে দেওয়া হইল না কেন?" জুডাস্, তোমার প্রাণ কি কঠোর! প্রাণের যীশু যে স্বর্গে যাইতে প্রস্তুত হইতেছেন! তুমি তাঁহার শ্মশান রচনা করিতেছ!! যীশু কি বলিতেছেন শোন:—"মেরী সৎকর্ম্ম করিয়াছে, আমার সমাধি দিনের জন্য সে ইহা রাখিয়াছিল! দরিদ্রেরা তোমাদের নিকট সর্ব্বদাই থাকে, কিন্তু আমি সর্ব্বদা থাকি না।"

(৪)

মেরি! আজ তোমার একি বিচিত্র ভাব দর্শন করিতেছি? যীশুর পদে লুটাইয়া পড়িয়া আপনার সুন্দর কেশরাশি দ্বারা তাঁহার তৈলাভিষিক্ত পদদ্বয় মুছাইয়া দিতেছ। এমন সুন্দর চুল, তাহার এ দুর্দ্দশা কেন? চুলগুলি যে একেবারে ধূলি মাখা হইয়া গেল! দেবি! তুমি কি দিব্য জ্ঞানসম্পন্না মূর্ত্তিমতী ভক্তি? তোমার প্রিয়তম যীশুর জীবনাভিনয় শেষ হইয়া আসিতেছে জানিয়া বুঝি তোমার হৃদয়োদ্যান জাত এই ভক্তি-কুসুম-তৈলে তাঁহার চরণাভিষেক করিলে এবং ভক্তপদধূলি মস্তকে মাখিয়া রাখিলে! এ পবিত্র পদধূলির মাহাত্ম্য তুমিই জান! ভক্ত যে কত আদরের ধন তাহা তোমার মত দেবী ভিন্ন আর কে বুঝিতে পারে? আজ তুমি কি ভাবে বিভোরা হইয়া এ সব করিতেছ? আজ তোমার বিনয়-বিনম্র বদনে কি অপূর্ব্ব ভাবাবেশ পরিলক্ষিত হইতেছে? নয়নে শতধারে অশ্রুধারা ঝরিতেছে, এ কি সাধুভক্তি রূপ পবিত্র গঙ্গাজল? যে পুণ্য-গঙ্গা এত দিন তোমার পবিত্র হৃদয়ে লুক্কায়িত ছিল বুঝি তাহা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে? আর বুঝি হৃদয়ে ধরে না, তাই নানা দিকে নানা ভাবে প্রবাহিত হইতেছে? আহা, মরি? কি সুন্দর রূপই দেখিতেছি? দেবকন্যা ভক্তি জগতকে সাধুভক্তি শিক্ষা দিবার জন্য দেহ ধারণ করিয়া স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হইয়াছেন! দেবি! তোমার একটী পদরেণু আমার পাপ-ভারাক্রান্ত মাথায় দাও। তোমার ভক্তির এক কণা লাভ করিয়া ভক্ত-পদতলে লুটাইয়া ধন্যা হই।

শ্রীপ্রফুল্লকুমারী চৌধুরী।

বনিতা-বিনোদ।

দ্বিতীয় বিনোদ।

ক্রোধ-শান্তি।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

সাধারণ লোককে যদি বলা যায়, যে তোমার উপর যে যত ইচ্ছা অত্যাচার করুক, তুমি তাহার প্রতিশোধ লইও না, তাহা হইলে সে কখনই তাহা শুনিবে না, শুনিতে পারে না। তবে এই মাত্র মনে রাখা উচিত, যে রাগের বশে তৎক্ষণাৎ একটা কাজ না করিয়া একটু ধৈর্য্য ধরিয়া কাজ করিলে আমরা অনেক সময় অনেক কুকার্য্য হইতে রক্ষা পাইতে পারি। রাগের উদয় হইলে যে পাঁচটি প্রশ্নের বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিবার জন্য সকলকে অনুরোধ করিয়াছি, এখন ঐ পাঁচটি প্রশ্ন সম্বন্ধে পৃথক পৃথক আলোচনা করিয়া দেখিব।

প্রশ্ন (১)। যাহার উপর রাগ করিতেছি সেই ব্যক্তি যাহা করিয়াছে তাহা সত্য সত্য ক্রোধের বিষয় কি না।

সচরাচর দুই প্রকারে আমাদের রাগের উদয় হইয়া থাকে; প্রথম,—আমরা যখন শুনি, যে কেহ কোন অনুচিত কার্য্য করিয়াছে,—দ্বিতীয়,—যখন আমরা দেখি, যে কেহ অনুচিত কাজ করিল। প্রথম দৃষ্টান্ত :—মনে করুন রাম আসিয়া আমাকে বলিল, যে শ্যাম আমাকে কদর্য্য গালাগালি দিয়াছে; এখন যদি আমি এই কথা শুনিয়াই রাগে অন্ধ হইয়া শ্যামকে গালি দিতে আরম্ভ করি অথবা তাহাকে মারিতে ছুটিয়া যাই,—অথবা অন্য কোন উপায়ে তাহাকে শাস্তি দিবার জন্য প্রস্তুত হই, তাহা হইলে কখনই ভাল কাজ হইবে না। কারণ (১) ইহা অসম্ভব নহে যে রামের সহিত শ্যামের শত্রুতা আছে, সে আমাকে দিয়া শ্যামকে জব্দ করিবার মতলবে এই মিথ্যা কথা বলিয়াছে; (২) অথবা সে দেখাইতে চায় যে সে আমার বড় হিতৈষী বন্ধু, সেই জন্য এই কথা রচনা করিয়াছে; (৩) কিংবা শ্যাম কি বলিয়াছে, সেই কথা রাম ভাল বুঝিতে না পারিয়া, কি ভুল বুঝিয়া তিলকে তাল করিয়া আমার কাছে লাগাইয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে শ্যাম আমাকে গালি দিয়াছে কি না, এবং গালি দিলে কি কথা বলিয়া গালি দিয়াছে, তাহার অনুসন্ধান করা উচিত। নচেৎ একজন নির্দ্দোষ লোককে সাজা দিতে গিয়া আমি নিজেই এক বড় অপরাধ করিতে পারি। দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত :—মনে করুন, আমি দেখিলাম শ্যাম আমার সম্মুখে আমার পুত্রকে এক চপেটাঘাত করিল। আমি ইহা নিজের চক্ষুতে দেখিলাম, সুতরাং শ্যাম যে অপরাধ করিয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সে কেন মারিল, কি হইয়াছিল, কি শাস্তি দেওয়া উচিত, ইত্যাদি বিষয় না জানিয়া আমি যদি শ্যামকে কোন কঠিন শাস্তি দিই, তাহা হইলে বড়ই অবিচার হইবে।

প্রশ্ন (২)। ঐ কার্য্য সত্য সত্যই অনুচিত কি না।

এখন দেখিতে হইবে, যে কাজটী আমি অনুচিত বলিয়া ভাবিতেছি, উহা সত্য সত্যই অনুচিত কি না। আমি নিজে দেখিলাম বটে শ্যাম আমার পুত্রকে এক চড় মারিল। কিন্তু একটা চড় মারিয়া শ্যাম যে নিশ্চয়ই অন্যায় কাজ করিয়াছে, তাহা প্রথমেই জানা যাইতে পারে না। হইতে পারে, আমার পুত্র কোন অন্যায় কাজ করিয়াছিল, তাহাকে একটু শাসন করার উদ্দেশ্যে, তাহার ভাল করার জন্য, শ্যাম আমার পুত্রকে একটী চড় মারিয়াছে। এই বিষয়টী আমরা আমাদের পাঠিকা ভগিনীদিগকে ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখিতে অনুরোধ করিতেছি। নিতান্ত কোন আত্মীয় ব্যক্তি কোন বালককে সামান্য একটু শাসন করিলে অথবা সামান্য একটী চড় মারিলে বুদ্ধিমতী ও বিদ্যাবতী রমণীও রাগে অধীর হইয়া উঠেন। মাতৃস্নেহ তাঁহাদিগের বিচার-শক্তিকে অন্ধ করিয়া দেয়। তাঁহাদের বুঝা উচিত যে ভাসুর, দেবর, অথবা শ্বশুর বিশেষ কোন কারণ না থাকিলে, শত্রুতা করিয়া তাঁহাদের গোপালের গায়ে হাত দেন নাই। অনুসন্ধান করিলে প্রায়ই দেখা যাইবে, যে গোপাল কোন মন্দ কাজ করিয়াছিল এবং তাহার জন্যই জ্যেঠামহাশয় তাহার কাণটী মলিয়া দিয়াছেন। অতএব যদি বিনা অনুসন্ধানে, বিনা বিচারে আমি শ্যামের উপর প্রতিশোধ লই, তাহা হইলে লোকে আমাকে নিশ্চয়ই মহা রাগী ও অবিবেচক বলিবে।

প্রশ্ন (৩)। যদি ঐ কাজ অনুচিত হয়, তাহা হইলে ক্ষমা করিতে পারি, এতটুকু মহত্ত্ব আমার আছে কি না।

ভাল, ধরিয়া লউন, যে শ্যাম বিনা অপরাধে আমার শিশুপুত্রের গালে একটা চড় মারিয়াছে। শ্যামের এই কাজ যে অনুচিত ইহা ত ধরা কথা। এক্ষণে আমাকে বিবেচনা করিতে হইবে যে আমার কি এতটুকুও দয়া, উদারতা বা মহত্ত্ব নাই, যাহাতে শ্যামের এই অপরাধ আমি ক্ষমা করিতে পারি? একটা চড় মারায় কি হইয়াছে? তাহাতে ত আমার পুত্রের প্রাণ বাহির হইয়া যায় নাই! আমি নিজেই ঐ বালককে কতবার চড় মারিয়াছি। শ্যাম একটা চড় মারিয়া কি এত বড় অপরাধ করিয়াছে? এই সব কথা বিচার করিয়া যদি আমি শ্যামকে একবারে ক্ষমা করিতে পারি, তাহা হইলে আমার সেই কাজ খুব ভাল হইবে এবং শ্যামও খুব লজ্জা পাইবে। আচ্ছা, যদিই আমি অত বিচার করিতে না পারি, বা শ্যামকে একেবারে ক্ষমা করিতে না পারি, তাহা হইলে কি করিব?

আমি ত আর ভীষ্ম পিতামহ, যীশুখ্রীষ্ট বা সক্রেটিশ নহি যে আমার রাগ মোটেই হইবে না—অথবা শত্রুকেও ভালবাসিতে পারিব! আসল কথা এই যে যদি আমি প্রথম ও দ্বিতীয় প্রশ্নের বিচার করিতে শিখি, তাহা হইলে, বড় বড় অপরাধ না হইলেও, ছোট ছোট অপরাধ যে ক্ষমা করিতে পারিব, তাহাতে সন্দেহ নাই।

প্রশ্ন (৪)। যদি ক্ষমা না করিতে পারি, কিরূপ ভাবে প্রতিশোধ লওয়া উচিত? তাহাকে অশ্লীল ভাষায় গালি দিব?—তাহা হইলে, লোকে আমাকে কি বলিবে? যে আমার ঐ অশ্লীল গালি শুনিবে, সেই ত আমাকে অসভ্য ও ছোট লোক বলিবে! ভদ্রলোকে কি নিজের মুখ খারাপ করিয়া গালি দেয়? তবে কি আমি শ্যামকে মারিতে দৌড়িব? তাহা হইলে ফল এই হইবে, যে আমাতে ও শ্যামেতে কিলা-কিলী ঘুসাঘুসী হইবে, আর লোকে —বিশেষতঃ শত্রুরা হাসিবে। আবার যদি শ্যামের গায়ে আমার অপেক্ষা অধিক বল থাকে, তাহা হইলে কি ফল হইবে, তাহা বুঝিতেই পারিতেছি! পরন্তু যদি আমিই বেশী বলবান হই, তাহা হইলে হয়ত, শ্যামের দফা রফা হইবে! যেদিক দিয়াই দেখা যাউক না কেন এরূপ মারামারি করা কদাপি উচিত নহে। তবে কি আমার চাকর অথবা দরোয়ান পাঠাইয়া শ্যামের উপর লাঠি চালাইব? চাকর অথবা দরোয়ানের হাতে মার খাইয়া শ্যাম বড়ই অপমান বোধ করিবে এবং তাহার যদি চাকর কি দরোয়ান থাকে, আমার উপরে সেও ঠিক ঐরূপ ব্যবস্থা করিবে। যদিই তাহার চাকর দরোয়ান না থাকে, তাহা হইলে টাকাটা শিকিটা খরচ করিয়া একটা গুণ্ডা বা বদমায়েস দিয়াও ত আমার লাঞ্ছনা করিবে। এখন দেখুন যদি প্রত্যেক লোক আমার মত সামান্য সামান্য কারণে নিজ নিজ ইচ্ছানুযায়ী প্রতিশোধ লইতে যায়, তাহা হইলে দেশে কি ভয়ানক হাহাকারই না পড়িয়া যাইবে। প্রথম হইতেই ভাল করিয়া বিচার বিবেচনা করিয়া প্রতিশোধ লওয়া উচিত। শ্যামের পিতা বা কোন আত্মীয় মুরুব্বি অথবা প্রতিবেশীদিগকে বলিয়া উঁহাকে তিরস্কার বা ধিক্কার দেওয়া অথবা অন্য কোন প্রকার দণ্ড দেওয়া উচিত। ফলতঃ রাগের বশে হঠাৎ প্রতিশোধ না লইয়া ভালরূপ বিচার বিবেচনা করিয়া প্রতিশোধ লইবার ব্যবস্থা করিলে আর কোন গোলোযোগ হয় না।

প্রশ্ন (৫)। শেষ প্রশ্ন এই যে, অপরাধীকে কিরূপ ও কি পরিমাণ দণ্ড দেওয়া উচিত।

উপরের চারিটী প্রশ্ন বুঝিয়া এবং বিচার করিয়া কার্য্য করিলে আর এই বিষয়ের জন্য ভাবিতে হয় না। শ্যাম আমার পুত্রকে একটী চড় মারিয়াছে বলিয়া তাহার নামে একটা ফৌজদারী মোকদ্দমা বাধাইয়া দেওয়াও সঙ্গত হইবে না। বিবেচনা করিয়া দেখিলেই কিরূপ দণ্ড দেওয়া উচিত তাহা সহজেই বুঝা যাইবে।

এই বিচার বিবেচনা সম্বন্ধে আর দুই এক কথা বলা আবশ্যক। রাগে অন্ধ হইয়া কাজ করিলে যে ঠিক কাজ করিতে পারা যায় না, ও লোক-সমাজে নিন্দিত হইতে হয়, সকলেই ঐরূপ ব্যক্তিকে অবিচারী, ক্রোধান্ধ ও অবোধ বলিয়া থাকে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কেহ কেহ বলিতে পারেন, "সকলেই ত রাগ করে, তবে আমি রাগ করিলেই কি মহাভারত অশুদ্ধ হইল?" এরূপ প্রশ্নের উত্তর নাই। কত লোক কত মন্দ কার্য্য করে, কত লোক চুরি ডাকাতি করে, জাল জুয়াচুরি করে, মিথ্যাকথা বলে, তবে আমিও কেন করিব না? এই প্রশ্ন সুবুদ্ধির প্রশ্ন নহে। ক্রোধান্ধ মনুষ্য পশুবৎ। যিনি ক্রোধান্ধ, তিনি রাজা হউন, পণ্ডিত হউন, যাহাই হউন, তিনি পশু ও অধম। পশু অধম কেন? তাহার বিচার ও বিবেচনা-শক্তি হীন বলিয়া। মানুষ পরম দয়ালু ভগবানের কৃপায় বুদ্ধি বিবেচনা পাইয়াও যদি রাগের বশে তাহা ভুলিয়া গিয়া অন্যায় ব্যবহার করে, তাহা হইলে সে পশু অপেক্ষা হীন নহে ত কি?

ক্রোধের সময় লোকের জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেক, বিচারশক্তি দয়া, মমতা,—যাহা কিছু মনুষ্যত্ব—সমস্ত নষ্ট হইয়া যায়।

কবিবর কাশীরাম দাস অতি সরল ভাষায় ক্রোধের সমুদয় দোষ অতি নিপুণতার সহিত নিম্নলিখিত কয়েক পংক্তিতে বর্ণনা করিয়াছেন :—

"ক্রোধ সম পাপ দেখি নাহিক সংসারে।
প্রত্যক্ষ করহ ক্রোধ যত পাপ ধরে॥

গুরু লঘু জ্ঞান নাহি থাকে ক্রোধকালে।
অকথ্য কথন দেবি ক্রোধ হৈলে বলে॥
আছুক অন্যের কার্য্য আত্মা হয় বৈরী।
বিষ খায় ডুবি মরে অস্ত্রে আত্মা মারি॥
ক্রোধে পাপ, ক্রোধে তাপ ক্রোধে কুলক্ষয়।
ক্রোধে সর্ব্বনাশ হয় ক্রোধে অপচয়॥" (ক্রমশঃ)

শ্রীসত্যবন্ধু দাস।

স্বপ্ন-সঞ্চরণ।

(১)

তখন দানাপুরে থাকিতাম।

দোল-পূর্ণিমার রাত্রে এক সুবৃহৎ উদ্যান-বাটিকায় একাকী কার্য্য করিতে হইয়াছিল। বাড়ীটী পুরাতন। কোন জমিদারবংশ এক সময়ে সেই বাড়াতে বাস করিতেন। কালক্রমে উহা জরাজীর্ণ হইয়াছিল এবং উহার শীর্ণ দীর্ণ দেহ সংস্কারে বহু অর্থব্যয়ের প্রয়োজন দেখিয়া জমিদারগণ নূতন বাস-ভবন নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। পরিত্যক্ত বাড়ীতে জমিদারী কাছারি হইত।

যে রাত্রির কথা বলিতেছি সেদিন কাছারি বন্ধ ছিল। বেহারে "হোলি" মহোৎসব। সেদিন চাকরবাকর সকলেই নৃত্যগীত ও মদিরায় উন্মত্ত। সুতরাং আমি স্বেচ্ছায় তাহাদিগকে সেদিনকার মত অব্যাহতি দিয়াছিলাম।

এক বাঙ্গালী-বাড়ীতে আমার নিমন্ত্রণ ছিল। দশটার পর সেখান হইতে ফিরিলাম; পূর্ণিমার চাঁদ রূপার থালার মত আকাশে শোভা পাইতেছিল। তাহার স্নিগ্ধ করজাল ও বসন্তের সুমিষ্ট বায়ুহিল্লোল যেন স্বপ্নাবেশ রচনা করিতেছিল। নিকটে ও দূরে গাছ পালাগুলি যেন চিত্রার্পিত তরুলতার মত দেখাইতেছিল, আর তাহাদের উষ্ণ নিশ্বাসে একটা সজীবতার ভাব অনুভব করিতেছিলাম।

কাছারি বাড়ীর সুবৃহৎ উদ্যানে প্রবেশ করিলাম। অন্যান্য দিন সন্ধ্যায় যে উদ্যান-পথ কোলাহলে ও তাম্রকূটধূমে পূর্ণ থাকে আজ সে পথ একেবারে নির্জ্জন। কোথাও একটি বড় গোলাপ হাসির হাট খুলিয়া বসিয়াছে, —কোথাও বা আর দুটী ফুল পাতার আড়ালে আধ লুক্কায়িত থাকিয়া সলাজ-মধুর হাসিতে চারিদিক আলো করিয়া রাখিয়াছে।

কি জানি উদ্যান-পথে প্রবেশ করিয়াই সেদিন কেমন একটা ধাঁধা লাগিয়া গিয়াছিল। সে কি বসন্ত প্রকৃতির নগ্ন শোভা দেখিয়া? তা'ত নয়। সে কি কোলাহলপ্রিয় মানবের বিজনতার আস্বাদনজনিত অতৃপ্তি? বোধ হয় তা'ও নয়। সে কোন্ ভাব এ কথার উত্তর সূক্ষ্মদর্শী মনোবিজ্ঞানবিৎ ব্যতীত আর কেহ দিতে পারিবে না।

অন্ধকারে আপনার শয়ন-প্রকোষ্ঠের দ্বারে উপস্থিত হইলাম। দ্বার খুলিতেই শূন্যগৃহে যেন কাহারও পদ-সঞ্চারের শব্দ শুনিতে পাইলাম। যেন কাহার উত্তপ্ত নিশ্বাস চারিদিক হইতে আমাকে বেষ্টন করিয়া আমার নিশ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ করিয়া দিবার উপক্রম করিল। আমি ঊর্দ্ধশ্বাসে বাহিরে চন্দ্রালোকে আসিয়া দাঁড়াইলাম। তার পর উদ্যানস্থিত বেঞ্চে আসিয়া শয়ন করিলাম।

গৃহে অন্ধকার—বাহিরে আলোক, গৃহে রুদ্ধ বায়ুর উত্তপ্ত নিশ্বাস—বাহিরে সুমন্দ বসন্ত-বায়ুর আনন্দ উচ্ছ্বাস। স্বপ্নময়ী নিদ্রা কখন আসিয়া আমাকে অধিকার করিয়াছিল তাহা আমি জানিতেও পারি নাই।

(২)

বড় আরামে ঘুমাইতেছিলাম। স্বপ্নেরও বিরাম ছিল না। কত ফুলের দৃশ্য, কত নদীর দৃশ্য, কত বর্ণগন্ধময় সৌন্দর্য্যের ছবি নিদ্রাকে যেন অবিচ্ছিন্ন স্বপ্নরাজ্যে পরিণত করিতেছিল। একবার স্বপ্ন দেখিলাম, এক নীল হ্রদের মধ্যে নৌ-চালনা করিতেছি। সেই নীল হ্রদের উপরে দিগন্ত-প্রসারিত অসংখ্য নক্ষত্রখচিত নীল আকাশ। হ্রদে বিবিধ বর্ণের জলজ পুষ্প ফুটিয়া রহিয়াছে। কোনটা নীল কোনটা লাল, কোনটা বা শুভ্র বর্ণের। হ্রদের তীরে শষ্পদলের শ্যামল শয্যা। সেই শষ্পদল হইতে এক অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত হইতেছে। আমি যেন একটী মৃণালদণ্ড লইয়া নৌবাহন করিতেছিলাম, হঠাৎ সেই মৃণালদণ্ড ভাঙ্গিয়া গেল। আমার নিদ্রাও সেই সঙ্গে ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল! চাহিয়া দেখিলাম, বাস্তবিকই দিগন্ত-প্রসারিত নীল আকাশে অসংখ্য নক্ষত্ররাজির নীরব সভা, আর তারি মাঝখানে অস্পষ্ট ছায়ালোক। নিম্নে চাহিয়া দেখিলাম,

শম্পদল আছে কিন্তু তাহার অদ্ভুত জ্যোতি নাই, আর সে হ্রদের চিহ্নও নাই। আমি যে বেঞ্চে শুইয়াছিলাম সেই বেঞ্চের উপরেই শয়ান আছি। শুধু একটী দীর্ঘ ছায়া আসিয়া বেঞ্চের উপর পড়িয়াছিল। নিদ্রালস দেহ হঠাৎ হেলাইয়া ভাল করিয়া ছায়ার দিকে চাহিলাম। তার পর ছায়ার বিপরীত দিকে চাহিয়া যাহা দেখিলাম তাহাতে চৈতন্য লোপ পাইবার উপক্রম হইল। নিমেষের মধ্যে উঠিয়া দাঁড়াইলাম। সেই নির্জ্জন উদ্যানের মধ্যে আমার শিয়রের কাছে এক ইংরাজ-মূর্ত্তি! তাহার শিথিল নৈশ পরিচ্ছদ—তাহার সেই নিদ্রিত নয়ন যুগলের কালিমা রেখা, তাহার সেই পাণ্ডুবর্ণ মুখমণ্ডলের বিকৃত ভাব আমার সর্ব্বশরীর কণ্টকিত করিয়া তুলিল। একটা প্রশ্ন করিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু বোধ হয় বাক্‌শক্তি রহিত হইয়া গিয়াছিল। কণ্ঠ হইতে শব্দ উচ্চারিত হইল না। তার পর মনে হইল পদতল হইতে পৃথিবী ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। দৃষ্টির প্রসার ব্যাপিয়া শুধু নীল—অনন্ত নীল—আকাশ, তার পর মহাশূন্য ছুটিয়া আসিয়া আমাকে একেবারে গ্রাস করিয়া ফেলিল!

(৩)

ঘটনাটা কাহারও কাছে বলি নাই। আর আমি নিজেই উহার একটা কূল কিনারা করিয়া উঠিতে পারি নাই। সে দিন চৈতন্য লাভ করিয়া এ বিষয়ে কত চিন্তা করিয়াছিলাম, কিন্তু সব যেন ছায়াময়—ঘটনাটা ঠিক যেন স্মরণ হয় না—স্মৃতির উপর কে যেন কুহেলি-জড়িত একটা আবরণ রাখিয়া গেছে।

কিন্তু একদিন এ মহারহস্যের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল। বার্ণেট্ নামক জনৈক উচ্চপদস্থ রেলওয়ে কর্ম্মচারী সাহেবের স্বপ্ন-সঞ্চরণের ব্যাধি ছিল। * উক্ত ঘটনার কিছুদিন পরে তিনি নিদ্রিতাবস্থায় দানাপুরের ইংরাজদিগের সমাধিক্ষেত্রে নিশাযোগে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। সমাধিক্ষেত্রের দ্বাররক্ষক নিশাচর বার্ণেটকে দেখিয়া ভয়ে পলায়ন করে এবং নিকটবর্ত্তী এক সাহেবের বাংলায় গিয়া তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ করে। উক্ত সাহেব তৎক্ষণাৎ পিস্তল লইয়া দ্বাররক্ষকের অনুসরণ করিলেন এবং অল্প সময়ের মধ্যেই পলায়নপর বার্ণেটকে ধরিয়া ফেলিলেন। বার্ণেটের নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি নিজের ভীষণ ব্যাধির প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইয়া লজ্জায় ও ক্ষোভে ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িলেন।

পরদিন প্রভাতে যখন চারিদিকে এই সংবাদ রাষ্ট্র হইল তখন আমি বুঝিলাম, আমার এত দিনের সঞ্চিত একটা সন্দেহের মীমাংসা হইয়াছে। শুধু চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করিবার নিমিত্ত বার্ণেটকে দেখিতে গিয়াছিলাম। দেখিলাম সেই মুখ, সেই অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, সেই নিদ্রাবিহীন নয়নদ্বয়ের নিম্নে ঈষৎ কালিমারেখা, সেই শান্তিহীন মানুষের রুক্ষ, ভীষণ মূর্ত্তি!

বার্ণেট ছুটি লইয়া ইংলণ্ডে চলিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার স্বপ্ন-সঞ্চরণের ব্যাধি দূর হইয়াছিল কি না তাহার আর কোনো সংবাদ পাই নাই।

শ্রীইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভুপালের বেগমের শিক্ষানুরাগ।

মধ্য ভারতের অন্তর্গত ভুপাল একটী বিখ্যাত দেশীয় করদ মুসলমান রাজ্য। অন্যান্য করদ রাজ্যের ন্যায় এই রাজ্যেরও সাধারণ আইন কানুন রাজ্যাধিপতি বা রাজ্ঞী স্বয়ং তাঁহার অমাত্যগণের সাহায্যে প্রস্তুত করেন। ইংরেজরাজের পক্ষ হইতে এক জন রেসিডেণ্ট রাজ্যে বাস করেন।

গত চারি পুরুষ যাবৎ এখানে স্ত্রীলোকের রাজত্ব চলিতেছে। সর্ব্ব প্রথমে কুদসিয়া বেগম সিংহাসনে আরোহণ করেন। রাজ্য-শাসন কার্য্যে ইনি বিশেষ দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার সহৃদয়তা, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও ন্যায়পরতার জন্য ভুপালবাসী আজিও শতমুখে তাঁহার প্রশংসা করিয়া থাকে।

ইনি যে সময়ে রাজ্যশাসন করিতেন তখন দেশে

---

* প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় Somnambulism শব্দের পরিবর্ত্তে স্বপ্ন-সঞ্চরণ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। ল্যাটিন Somnus শব্দের অর্থ নিদ্রা। সুতরাং অনুবাদ করিতে গেলে নিদ্রাসঞ্চরণ শব্দ ব্যবহার করিতে হয়। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের "স্বপ্ন-সঞ্চরণ" শব্দের মধ্যে একটু বিশেষত্ব আছে। ঐ বিশেষত্বটুকু মনোবিজ্ঞানের হিসাবে আপত্তিজনক নহে, বরং শ্রুতিসুখকর এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তার পরিচায়ক। লেখক।

পাশ্চাত্য রীতি নীতি বিস্তৃতি লাভ করে নাই; কিন্তু আপনার স্বাধীন প্রকৃতি বলে সে সময়েও তিনি মুসলমান সমাজের অবশ্যপ্রতিপাল্য অবরোধ-প্রথা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া চলিতেন। তিনি ইউরোপীয় মহিলাগণের ন্যায় যথা তথা স্বাধীন ভাবে বিচরণ করিতেন এবং প্রকাশ্য ভাবে রাজদরবারে উপবেশন করিতেন।

কুদসিয়া বেগমের মৃত্যুর পর তাঁহার কন্যা সেকেন্দর বেগম সিংহাসনের অধিকারিণী হন। ইনিও মাতার ন্যায় স্বাধীন-প্রকৃতি মহিলা ছিলেন, অবরোধ-প্রথা রক্ষা করিতেন না এবং প্রকাশ্য ভাবে দরবার করিতেন। এই মনস্বিনী মহিলার রাজ্য কালে সর্ব্ব বিষয়ে ভূপাল রাজ্যের উন্নতি হইয়াছিল। সিপাহী-বিদ্রোহের সময় তিনি ইংরেজ গবর্ণমেণ্টকে বিশেষ সাহায্য করায় বিদ্রোহ শান্তির পর বন্ধুতার পুরস্কার স্বরূপ গবর্ণমেণ্ট তাহাকে একটী জনপদ পুরস্কার দিয়াছিলেন। সেকেন্দর বেগমের মৃত্যুর পর শাজাহান বেগম ভূপালের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনিও তাঁহার মাতা এবং মাতামহীর ন্যায় অবরোধ-প্রথা অমান্য করিয়া চলিতেন। দয়াশীলতার জন্য ইনি ভূপাল-রাজ্যে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। শুধু ভূপালে কেন, ইঁহার ন্যায় দয়াশীলা নারী সর্ব্বত্রই দুর্লভ। ইঁহার শাসন সময়ে দানকার্য্য সুনিয়মে সম্পন্ন হইবার জন্য একটী স্বতন্ত্র বিভাগ স্থাপিত হইয়াছিল। এই বিভাগ হইতে মাসিক কুড়ি হাজারের অধিক অর্থ ব্যয়িত হইত। অনাথ ও নিঃস্ব লোকেরা এই অর্থে প্রতিপালিত হইত। একটী অনাথাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাতে বহু সংখ্যক অনাথ বালক রাজব্যয়ে প্রতিপালিত হইত এবং শিক্ষা লাভ করিত। উপযুক্ত শিক্ষালাভের পর ইহাদিগকে নানা রাজকার্য্যে নিযুক্ত করা হইত।

ইঁহার মৃত্যুর পর ইঁহার কন্যা সুলতান জাহান বেগম সিংহাসনারোহণ করিয়াছেন। ইনি অবরোধ রক্ষা করিয়া থাকেন, কিন্তু ইঁহার হৃদয়ও প্রজাগণের উন্নতির জন্য ব্যাকুল।

বেগম সাহেবা স্বয়ং শিক্ষিতা রমণী। স্বরাজ্যের উন্নতি সাধনে তিনি কিরূপ যত্নবতী, প্রজার কল্যাণের জন্য তিনি কত চিন্তা করেন, সম্প্রতি ভূপালের "আলেকজাণ্ডার নোবল" স্কুলের পুরস্কার বিতরণ উপলক্ষে তিনি যে বক্তৃতা করেন তাহা পাঠ করিলে তাহার আভাস পাওয়া যায়। আমরা তাঁহার বক্তৃতার মর্ম্মানুবাদ নিম্নে প্রদান করিলাম। রাজ্যের প্রধান প্রধান দেশীয় ও ইংরেজ কর্ম্মচারী সভায় উপস্থিত ছিলেন। সুদীর্ঘ অবগুণ্ঠনে আবৃত হইয়া বেগম স্বয়ং পুরস্কার বিতরণ করিয়াছিলেন।

"আমারই ন্যায় একজন স্ত্রীলোক—আমার মাতামহী নবাব সেকেন্দর বেগম—ভূপালে শিক্ষাবিস্তারে সর্ব্ব প্রথমে প্রয়াসী হইয়াছিলেন—এই কথা স্মরণ করিতেও আমি আজ গৌরব অনুভব করিতেছি। এ রাজ্যের প্রথম বিদ্যালয়ের নাম "সুলেমানিয়া।" আমার ভগ্নীর নামানুসারে এই বিদ্যালয়ের নামকরণ হয়। এই বিদ্যালয়ে মাতৃভাষা ও কোন কোন প্রাচীন ভাষা শিক্ষা দেওয়া হইত। আমার মাতামহীর মৃত্যুর পর আমার মাতা স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে বিশেষ মনোযোগিনী হন এবং তাঁহার পিতার নামানুসারে "জেহাঙ্গিরিয়া" নামক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন। এই বিদ্যালয়ে প্রথমে কেবল ধর্ম্মশিক্ষাই প্রদত্ত হইত, আমি ইহাতে ইংরেজী শিক্ষাও প্রবর্ত্তিত করিয়াছি। এখন এই বিদ্যালয় এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত এণ্ট্রেন্স স্কুলে পরিণত হইয়াছে। আমার শাসনকালে অন্যান্য স্কুলের ন্যায় এই বিদ্যালয়টীরও অনেক সংস্কার সাধিত হইয়াছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এবং আশা এই যে, ভূপালবাসীগণ তাহাদের সন্তানগণকে উচ্চ শিক্ষা প্রদানে আরও মনোযোগী হইবেন এবং শীঘ্রই এই বিদ্যালয়ের আরো উন্নতি হইবে।

আমার স্নেহময়ী জননী শিক্ষাবিস্তারের দ্বারা এই রাজ্যের প্রজামণ্ডলীর উন্নতির জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। যে সকল জায়গীরদার ও আমীর ওমরাহ সন্তানগণের শিক্ষাবিষয়ে ঔদাসীন্য দেখাইতেন তিনি তাহাদের আয়ের কিয়দংশ কাটিয়া লইতেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, প্রজাবর্গের সহানুভূতির অভাবে তাঁহাকে এই সাধু চেষ্টা পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু আমার ধারণা এই যে, আমার প্রজাবর্গের কল্যাণ সম্পূর্ণরূপে শিক্ষার উপর নির্ভর করিতেছে; সুতরাং আমি কিছুতেই এই চেষ্টায় শৈথিল্য প্রদর্শন করিব না। অশিক্ষিত লোক তাহার

সাংসারিক কার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদন করিতে পারে না, ধর্ম্মতত্ত্বও ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না, এজন্য আমাদের পয়গম্বর বলিয়া গিয়াছেন, 'প্রত্যেক মোসলেম নরনারীর জ্ঞানোপার্জ্জন অবশ্যকর্ত্তব্য।'

ভারতবর্ষ এখনও অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন, সেই কারণে এ দেশের লোক সন্তানগণের শিক্ষার প্রতি তত মনোযোগী নহে। অনাবশ্যকীয় কারণে যে অর্থ ব্যয়িত হয় শিক্ষার জন্য তাহা ব্যয় করিলে কত মঙ্গল হইত। অশিক্ষিতা জননীগণের অযথা আব্দারেও বহু সন্তান নষ্ট হইয়া যাইতেছে। তবে সুখের বিষয় এই যে, অনেক বুদ্ধিমান লোক সুসভ্য ইংরেজ রাজ্যে বাস করিয়া শিক্ষাবিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হইয়াছেন। অশিক্ষিতা জননীদের দ্বারা আমার প্রজাবর্গের মধ্যে শিক্ষা যাহাতে কোনরূপ বাধাপ্রাপ্ত না হয় আমি সে বিষয়েও যত্নবতী হইব। শুভাকাঙ্ক্ষিনী মাতার ন্যায় আমি প্রজাবর্গের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার করিব, কিন্তু যদি প্রজাগণ কোনরূপে আমার এই শুভকার্য্যে বাধা জন্মায় তবে মাতারই ন্যায় প্রকৃত শুভাকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে ধারণ করিয়া আমি কঠোর উপায় অবলম্বনে তাহাদিগের কল্যাণ সাধন করিব।

শিক্ষাবিস্তারে প্রজাদিগের সকল আপত্তি দূর করিবার জন্য আমি বিনা ব্যয়ে শিক্ষাদান প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়াছি। আমার কনিষ্ঠ পুত্রকে অন্যান্য রাজকুমারদিগের সহিত অধ্যয়ন করিবার জন্য আজমীর বা ইন্দোরের রাজকুমার-কলেজে পাঠাইতে পারিতাম, কিন্তু আমার জায়গীরদারগণের পুত্রদিগকে উৎসাহিত করিবার জন্য আমি তাহাকে এখানেই রাখিয়াছি। দুঃখের বিষয়, ইহাতেও আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতেছে না। আমি আরো কিছুদিন দেখিব, যদি প্রজাগণের সুমতি না হয় তবে আমাকেও শিক্ষাবিস্তারের জন্য জাপান-সম্রাটের পন্থানুসরণ করিতে হইবে। আমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট শিক্ষা বিস্তারের জন্য কত অর্থ ব্যয় করিতেছেন কিন্তু দুঃখের বিষয় মুসলমানগণ শিক্ষা বিষয়ে নিতান্ত উদাসীন। আমি শুনিয়াছি, মহীশূর, বরদা, গোয়ালিয়র প্রভৃতি দেশীয় রাজ্যে প্রজাগণ শিক্ষা বিষয়ে বিশেষ অগ্রসর হইতেছে, কিন্তু কি দুঃখের বিষয়, যে আমার প্রজাগণ এবিষয়ে নিতান্ত উদাসীন।

শিক্ষা বলিতে আমি মুখস্থ বিদ্যার কথা বলিতেছি না। মুখস্থ বিদ্যার দ্বারা মানুষ পুস্তকবাহী পশুতে পরিণত হয়। প্রকৃত শিক্ষা মানুষের মনকে আলোকে পূর্ণ করে, আত্মতত্ত্ব ও ঈশ্বরতত্ত্ব শিক্ষা দেয়, মহাপুরুষগণের উপদেশ হৃদয়ে ধারণা করিতে সমর্থ করে, মানুষের প্রকৃত জ্ঞানচক্ষু খুলিয়া দেয়। যদিও এই বিদ্যালয়ের এই প্রথম বৎসর, তথাপি এই বৎসরেই যে বিদ্যালয় এতদূর উন্নতি করিতে পারিয়াছে ইহা নিতান্ত সুখের বিষয়। পরীক্ষার পূর্ব্বে আমার পুত্রকে আমি কঠোর শ্রম করিতে দেখিয়াছি। আমি ঈশ্বরের নিকট তাঁহার সাহায্যের জন্য প্রার্থনা করিয়াছি; আর প্রার্থনা করিয়াছি, যে আমার পুত্রের শিক্ষার জন্য আমি যেমন ব্যাকুল, রাজ্যের অন্যান্য পিতামাতাও তাঁহাদের সন্তানদের শিক্ষার জন্য তেমনি ব্যাকুল হউন।

সম্মানের সহিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াতে আমার পুত্রকে উৎসাহ দিবার জন্য বিদ্যালয়-লব্ধ পুরস্কার ব্যতীত আমি আমার স্বহস্তাঙ্কিত একখানি চিত্র ও অন্যান্য পুরস্কার প্রদান করিতেছি।"
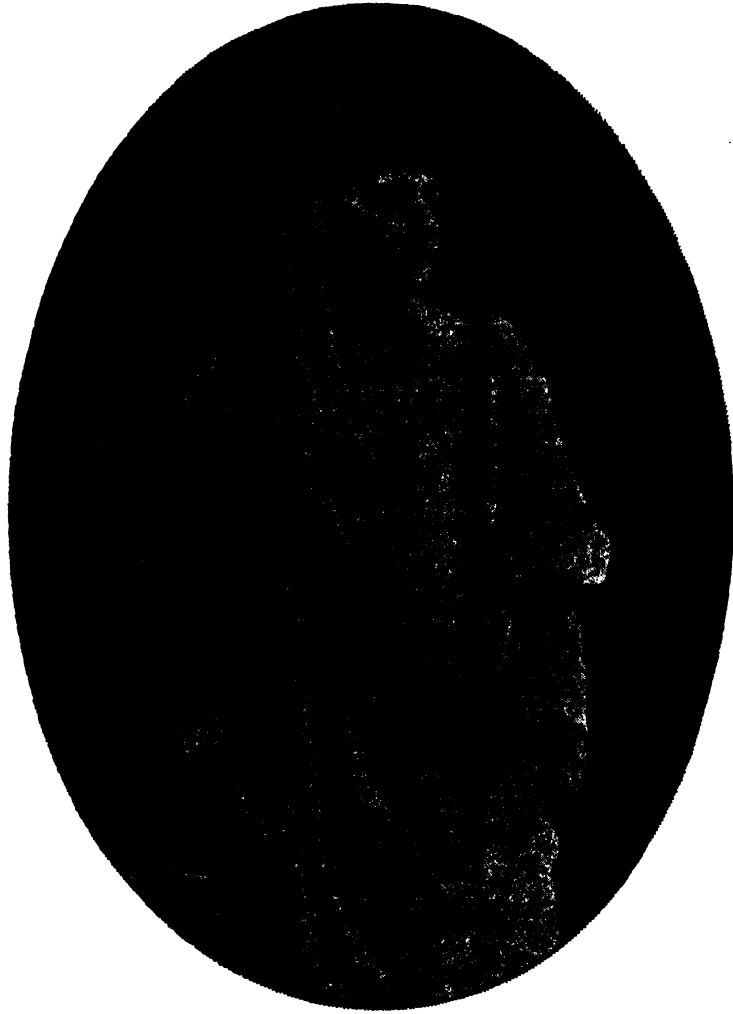
কলিকাতা, ২৫ নং রায়বাগান ষ্ট্রীট, ভারতমিহির যন্ত্রে সান্যাল এণ্ড কোম্পানী দ্বারা মুদ্রিত।

শ্রীমতী জাহাদীর।

ভারত-মহিলা

> The woman's cause is man's ; they rise or sink
> Together, dwarfed or God-like, bond or free ;
> If she be small, slight-natured, miserable.
> How shall men grow ?
>
> *Tennyson.*

৩য় ভাগ । | মাঘ, ১৩১৪ । | ১০ম সংখ্যা ।

প্রাচ্য-নারীর পূর্ব্বাবস্থা ।

আমরা ইতিপূর্ব্বে প্রবন্ধান্তরে বলিয়াছি, যে বেদ-উপনিষদের যুগে ভারত-নারী যে উন্নত অবস্থা লাভ করিয়াছিলেন, ইতিপূর্ব্বে আর কোন দেশের নারীগণ বোধ হয় তদপেক্ষা উন্নততর অবস্থা লাভ করেন নাই। ভারত-নারীর বর্ত্তমান অবস্থার সহিত সেকালের নারী-দিগের অবস্থার কি গুরুতর পার্থক্যই ঘটিয়াছে! শুধু ভারতে নয়, প্রাচীন কালে সভ্য প্রাচ্য দেশ মাত্রেই নারীজাতির অবস্থা অনেক উন্নত ছিল। তৎপর সমাজ যতই পুরাতন হইতে লাগিল, সমাজের মধ্যে কৃত্রিমতা, বিলাসিতা যতই বাড়িতে লাগিল, পুরুষজাতি ততই স্বার্থপরতার অধীন হইয়া শারীরিক বলে অবলা নারীদিগকে তাঁহাদের ঈশ্বরদত্ত অধিকারে বঞ্চিত করিয়া আপনাদের সুখ সাধনের যন্ত্ররূপে পরিণত করিতে আরম্ভ করিল। নারীজাতি বর্ত্তমান সময়ে প্রাচ্যদেশ সমূহে যেরূপ দুর্দ্দশা-নিমগ্ন তাহাতে অতীত কালে তাহাদের অবস্থা যে বিশেষ উন্নত ছিল একথা বিশ্বাস করিতে সহজে প্রবৃত্তি হয় না। কিন্তু ইতিহাস প্রাচ্য বিভাগে সেকালে নারীর উন্নত অবস্থার জীবন্ত সাক্ষী হইয়া রহিয়াছে।

প্রাচ্য বিভাগে ভারত, চীন, মিশর প্রভৃতিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন সভ্য-দেশ। এই সকল দেশে প্রাচীন কালে নারীজাতির অবস্থা উন্নত ছিল। ভারত-নারী পুরাকালে কি সমুন্নত অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, "ভারত-মহিলায়" একাধিকবার তাহা আলোচিত হইয়াছে। হিন্দুজাতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মগ্রন্থ বেদ রচনায় বিশ্ববারা প্রভৃতি মনস্বিনী নারীগণ অধিকারিণী ছিলেন, তাঁহাদের রচিত পবিত্র সূক্ত বেদগ্রন্থকে সমুজ্জ্বল করিয়া এখনও প্রাচীন ভারতে নারীশক্তির প্রভাবের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে, এবং চিরকালই করিবে। উপনিষদের যুগে গার্গী, মৈত্রেয়ী প্রভৃতি মুমুক্ষু নারীগণের ব্রহ্মজিজ্ঞাসা জগতের ইতিহাসে অতুলনীয়। সুপ্রসিদ্ধ মহারাষ্ট্রীয় পণ্ডিত ডাক্তার ভাণ্ডারকর বলেন, ঋগ্বেদীয় ব্রাহ্মণগণকে দৈনিক ব্রহ্ম-যজ্ঞের অনুষ্ঠান কালে এখনও বাচক্নবী গার্গী, সুলভা মৈত্রেয়ী এবং বাদবা প্রতিথেয়ী, এই তিনটী মহিলার নামোচ্চারণ করিতে হয়। কলিকাতা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত জজ ব্যবস্থাচার্য্য শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছেন, মিতাক্ষরা নামক সুপ্রসিদ্ধ হিন্দু আইন-গ্রন্থ—যাহা এখনও হিন্দু সমাজের এক সুবৃহৎ অংশের উত্তরাধিকার নির্দ্ধারণ করিতেছে—তাহা জনৈক রমণী-প্রণীত। দুর্দ্দশামগ্ন, ভ্রান্ত ভারত-সন্তান

এখন নারীকে যতই হীনাবস্থাপন্ন করিয়া রাখুক বা রাখিতে অভিলাষ করুক না কেন, এই সকল নারী-গৌরবের কাহিনী তাহাদের জাতীয় ইতিহাসকে চির দিনই গৌরবময় করিয়া রাখিবে এবং নারীজাতির প্রতি তাহাদের কর্ত্তব্য স্মরণ করাইয়া দিবে।

ভারতের ন্যায় মিশর দেশও এখন পরপদানত। বিদেশীয়ের শাক্ত শাসনে মিশর এখন জর্জ্জরিত। মিশর দেশেও নারীজাতি এখন নিতান্তই হীনাবস্থাপন্ন, কিন্তু জগতের অতীত ইতিহাসে মিশরের স্থান অতি উচ্চে। অনেকে মনে করেন, মিশরের সভ্যতা ভারতের সভ্যতা অপেক্ষাও পুরাতন। প্রাচীনকালে এই মিশর দেশে নারীজাতি অতি উন্নত অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশে নানা সময়ে অনেক শক্তিশালিনী নারী রাজদণ্ড পরিচালন করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু মিশরই তাহার প্রথম দৃষ্টান্ত জগতকে প্রদর্শন করিয়াছে। মিশরের হাত্‌শেপ্‌সুট নাম্নী মহারাণীই জগতের ইতিহাসে প্রথম রাজ্ঞী। তিনি রণক্ষেত্রে সৈন্য পরিচালনা করেন নাই সত্য, কিন্তু তাঁহার শাসন সময়ে তিনি স্বরাজ্যের প্রচুর উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। শুধু শাসন-ক্ষমতার নহে, নারীর গভীর জ্ঞানস্পৃহা ও জ্ঞানালোচনার দৃষ্টান্তও প্রাচীন মিশরে দুর্লভ নহে। অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তীকালে, খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর শেষ ভাগে হাইপেসিয়া নাম্নী জনৈক মহিলা মিশরের আলেকজেন্দ্রিয়া নগরে যে অপূর্ব্ব মানসিক প্রতিভা প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাহাতে তৎকালের সভ্য জগত একান্ত বিস্মিত হইয়াছিল। তিনি তৎকাল-প্রচলিত কঠিন কঠিন শাস্ত্রে এবং প্লেটো ও য়্যারিষ্টটলের নিগূঢ় দর্শন শাস্ত্রে এত দূর গভীর পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন এবং এই সকল বিষয়ে সুমধুর নারীকণ্ঠে এমন চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা করিতে পারিতেন, যে লোকে তাঁহাকে মূর্ত্তিমতী বীণাপাণির ন্যায় শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিত। নানা দেশ হইতে প্রবীণ পণ্ডিতগণ এবং জ্ঞানান্বেষী বিদ্যার্থী-বর্গ সমাগত হইয়া তাঁহার ভবনকে সত্য সত্যই সরস্বতীর সাধন-মন্দিরে পরিণত করিয়াছিল। রাজপুরুষগণ রাজ্য সংক্রান্ত নানা বিষয়ে তাঁহার সহিত মন্ত্রণা করিবার জন্য তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইতেন। দেড় সহস্র বৎসর পূর্ব্বেও মিশর-নারীর পক্ষে ইহা সম্ভব ছিল, কিন্তু এখন মিশরের নারীজাতির অবস্থা প্রায় ভারত-নারীরই অবস্থার ন্যায়।

প্রাচীন কালে চীনদেশে নারীজাতির অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহার বিশেষ বিবরণ আমরা এখনও সংগ্রহ করিতে পারি নাই। বর্ত্তমান অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়, এই পর্য্যন্তই অবগত আছি। কিন্তু চীনের শিষ্যস্থানীয় জাপানের বিষয় যাহা জ্ঞাত হওয়া যায়, তাহাতে মনে হয় না, যে প্রাচীনকালে চীন-রমণী জ্ঞান বুদ্ধিতে হীন ছিলেন, অথবা সমাজে কম শ্রদ্ধা লাভ করিতেন। ইতিপূর্ব্বে "ভারত-মহিলায়" চীনের বর্ত্তমান বৃদ্ধা সম্রাজ্ঞীর বিষয় যাহা আলোচিত হইয়াছে তাহাতে চীন-মহিলার তীক্ষ্ণ মানসিক শক্তির বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। মৃতপ্রায় চীন দেশে নারীজাতির দুরবস্থার সময়েই যখন এক জন নারী এইরূপ অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় দিতে সমর্থ হইয়াছেন, তখন অবরোধ-বিহীন চীন দেশে, প্রাচীন সুপুষ্ট সতেজ সভ্যতার সময়ে নারীগণ যে স্বাভাবিক উন্নত অবস্থাতেই অবস্থিত ছিলেন এরূপ অনুমান করা অযৌক্তিক বোধ হয় না। ব্যারণ সুয়েম্যাৎসু নামক জাপানের সুবিখ্যাত রাজনীতিবিদ্ পণ্ডিত লিখিয়াছেন,—ইউরোপীয়গণ বলিয়া থাকেন, প্রাচীন জাপানে নারীগণ গৃহপালিত জীবজন্তুর ন্যায় ব্যবহৃত হইত, কিন্তু এ কথা প্রকৃত নহে। প্রাচীন জাপানে কয়েক-জন মহিলা রাজ্য-শাসনে বিশেষ দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। সেকালে জাপানের ক্ষাত্রধর্ম্মা সামুরাইগণের সহিত তাঁহাদের স্ত্রী ও কন্যাগণ অপূর্ব্ব বীরত্ব সহকারে রণক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেন। প্রাচীন জাপানে অসংখ্য মহিলা-কবি, মহিলা-ঔপন্যাসিক ও মহিলা-শিল্পী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। চীন-সাম্রাজ্যের বিশাল জ্ঞান-সম্পদ জাপানী মহিলাগণই প্রথমে আয়ত্ত করেন। "জেঞ্জী মনোগাতারী" ও "মাকুরা জোসী" প্রভৃতি সর্ব্বোৎকৃষ্ট জাপানী উপন্যাস মহিলাগণেরই মস্তিষ্ক-প্রসূত। তকুগোয়া বংশের রাজত্ব কালে "চ কোরান," "হারা সাইহিন" প্রভৃতি অনেক সুপণ্ডিতা জাপানী মহিলা চৈনিক সাহিত্য ও দর্শনে প্রগাঢ়

অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। "চিস্" ও "বতোনী" নাম্নী সুপ্রসিদ্ধ জাপানী মহিলা-কবিগণও এই সময়েই তাঁহাদের বিখ্যাত কাব্য-গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এই সকল বৃত্তান্ত পাঠ করিলে মনে হয়, ইউরোপীয় লেখকগণের বাক্যের প্রতিধ্বনি করিয়া বাঙ্গালী কবি জাপানকে "অসভ্য" বলিলেও জাপান বহুকাল যাবৎ সভ্য-পদবীতে উন্নীত হইয়াছিল এবং চীন দেশের অতি প্রাচীন সভ্যতার সাহায্যে আপনাদের দেশকে জ্ঞান-সম্পদে ভূষিত করিয়াছিল। স্বদেশের সেই আভ্যন্তরীণ উন্নতি সাধনে সেকালের জাপান-রমণীর এই প্রভাব ও সাহায্য বর্ত্তমান জাপান-জাতির পক্ষে অল্প গৌরবের বিষয় নহে।

মুসলমান জাতির অধিকৃত দেশ সমূহে নারীজাতির অবস্থা বর্ত্তমান সময়ে সর্ব্বত্রই নিতান্ত শোচনীয়। ইহার একটী বিশেষ কারণ রহিয়াছে। আরব দেশ মুসলমান ধর্ম্মের জন্মস্থান। মহাপুরুষ মহম্মদের জন্মের পূর্ব্বে দুর্দ্দান্ত আরববগণ নারীদিগের প্রতি পশুবৎ আচরণ করিত। মহম্মদের স্বর্গীয় ধর্ম্মের প্রভাবে নারীগণের অবস্থা বহু পরিমাণে উন্নত হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু নারীগণকে হীন চক্ষে দৃষ্টিপাত করা আরব-জাতির বহুকাল-পোষিত অস্থি-মজ্জাগত ভাব। স্বয়ং মহাপুরুষ মহম্মদ পর্য্যন্ত, নারীজাতির মহত্ত্ব বুঝিতে পারিয়াও ৮।৯টী স্ত্রীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। সে সময়ে অসহায় আরব-নারীর অবস্থা যেরূপ বিপদসঙ্কুল ছিল তাহাতে এই অসাহায়া নারী কয়টীকে পত্নীত্বে বরণ করিয়া তিনি তাঁহাদিগকে অনেক পাশব অত্যাচারের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাতে মুসলমান সম্প্রদায়ে সাধারণতঃ দাম্পত্য-সম্বন্ধের আদর্শ অত্যন্ত হীন হইয়া পড়িয়াছে; নরনারীর সমতা অস্বীকৃত হইয়াছে। বোধ হয় এই জন্যই মোস্‌লেম জগতের বহুস্থলে নারীগণ পুরুষের অত্যন্ত সমাদর লাভ করিলেও সমাজে নারীগণ তাঁহাদের প্রাপ্য পবিত্র উন্নত পদ লাভ করিতে পারেন নাই। কিছুদিন পূর্ব্বে একজন ইউরোপীয় ভ্রমণকারীর ভ্রমণ বৃত্তান্তে পাঠ করিয়াছিলাম, মুসলমান-মহিলাদিগকে কঠোর অবরোধে আবদ্ধ করিয়া রাখিবার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে জনৈক শিক্ষিত মুসলমান তাঁহাকে উত্তর করিয়াছিলেন, "স্বর্ণ রৌপ্য, মণি-মাণিক্য কেহ কি বাহিরে ফেলিয়া রাখে? সিন্দুকেই সযত্নে রক্ষা করে। আমাদের নারীদিগকেও আমরা অত্যন্ত মূল্যবান মনে করি, এজন্য তাঁহাদিগকে অন্তঃপুরে রাখিয়া থাকি।" বস্তুতঃ মুসলমান-জগতে নারীজাতির অবস্থা যেন অনেকটা অবশ্য-প্রয়োজনীয় ধনরত্নাদিরই ন্যায়। নারীজাতির সেখানে আদর আছে, কিন্তু তাহা তেমন উচ্চ শ্রেণীর নহে। নিদ্রিত মুসলমান সমাজে বর্ত্তমান সময়ে জাতীয় জীবন পুনরুজ্জীবিত করিবার জন্য চেষ্টা দেখা যাইতেছে; সঙ্গে সঙ্গে নারীজাতিকে সম্যক্ প্রকারে তুলিয়া না ধরিলে এই চেষ্টা পরিণামে সুফল প্রসব করিবে বলিয়া কিছুতেই আশা করা যায় না। কিন্তু এস্থলে ইহা স্বীকার না করিলে অন্যায় হইবে, যে মুসলমান-সভ্যতা যখন উন্নতির চরম সীমায় উপস্থিত হইয়াছিল, সেই সময়ে সেই সবল ও সুপুষ্ট সভ্যতা এবং স্বাধীনতা দ্বারা প্রণোদিত হইয়া মুসলমানগণ তাঁহাদের নারীগণকে যে উচ্চ অধিকার ও সম্মান দিয়াছিলেন তাহা জগতের যে কোন জাতির নারীগণের পক্ষেই গৌরবের বিষয়।

সম্রাট আলতমাসের পুত্র রোকন-উদ্দীন রাজ্য-শাসনে অযোগ্য প্রমাণিত হইলে অমাত্যগণ আলতমাসের কন্যা রজিয়া বেগমকে দিল্লীর সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। রজিয়া সিংহাসনারোহণ করিয়া শাসন-ক্ষমতার যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি রাজোচিত সকল গুণেই ভূষিতা ছিলেন। তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষিত হইলে তিনি তাহা দমনার্থ সসৈন্যে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ভারতের রাজনীতি-ক্ষেত্রে নুরজাহান, জাহানারা, জেব-উন্নীসা প্রভৃতি তীক্ষবুদ্ধিশালিনী সম্রাট-মহিষী ও সম্রাট-কন্যাগণ অবরোধে আবদ্ধ থাকিয়াও রাজনৈতিক কূটচক্রে অল্প পারদর্শিতা প্রদর্শন করেন নাই।

কিন্তু মুসলমান জাতিসমূহের মধ্যে উত্তর আফ্রিকার মুরজাতির নারীগণই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সম্মান ও স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিলেন। মুরীয় সভ্যতার গৌরবের

দিগে—যখন তাঁহারা স্পেন পর্য্যন্ত জয় করিয়াছিলেন—মুর-মহিলাগণ অবগুণ্ঠন ধারণ করিতেন না, এবং অন্তঃপুরে আবদ্ধ থাকিতেন না; পুরুষগণের ন্যায় সর্ব্বত্র স্বাধীন ভাবে বিচরণ করিতেন। অনেক সম্রাট-মহিষী সম্রাটের সঙ্গে প্রকাশ্যে রাজসভায় রাজসিংহাসনে উপবেশন করিতেন; দেশের মুদ্রায় সম্রাটের মস্তকাকৃতির সঙ্গে সঙ্গে মহিষীর মস্তকাকৃতিও মুদ্রিত হইত। জ্ঞানে ধর্ম্মেও মুর-মহিলাগণ অত্যন্ত শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছিলেন। প্রকাশ্য ভাবে তাঁহারা পুরুষগণের সহিত মানসিক শক্তির প্রতিযোগিতা-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইতেন এবং অনেক সময় প্রতিদ্বন্দিতায় তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া জয়মাল্য লাভ করিতেন। তাঁহারা শিল্পকবিতাদি সুকুমার বিদ্যার অনুশীলন করিতেন এবং মৌলিক তত্ত্বানুসন্ধানেও তাঁহারা বিশেষ দক্ষতা প্রদর্শন করিতেন। ইতিহাসে মুর-মহিলাগণের এই সকল বিবরণ পাঠ করিলে প্রাচীন ভারতের আর্য্যরমণীর অবস্থা অপেক্ষা তাঁহাদের অবস্থা কোন ক্রমেই হীন ছিল বলিয়া মনে হয় না; বরং উত্তরাধিকার প্রভৃতি কোন কোন বিষয়ে তাঁহাদিগের অবস্থা শ্রেষ্ঠতর ছিল বলিয়াই বোধ হয়।

অতএব দেখা যাইতেছে, প্রাচীন কালে এসিয়া ও আফ্রিকার প্রধান প্রধান সকল সভ্য দেশেই নারীজাতির অবস্থা উন্নত ছিল এবং অন্যান্য বিষয়েও এই সকল দেশের অবস্থা সে সময়ে সমুন্নত ছিল। এই সমুদয় প্রাচীন সভ্য দেশের মধ্যে একমাত্র জাপান ব্যতীত আর সকলগুলিই এখন দুর্দশা-নিমগ্ন। বর্ত্তমান সময়ে এই সকল দেশে নারীজাতির অবস্থা দেশগুলির সাধারণ অবস্থারই অনুযায়ী। জাপান এখন শক্তি ও গৌরবের উন্নত শিখরে আরূঢ়, সেদেশের নারীগণও দ্রুতবেগে উন্নতি সোপানে আরোহণ করিতেছেন। মুমূর্ষু চীন নিদ্রাভঙ্গ করিয়া জাগিয়া উঠিতেছে, চীনের নারীগণও আত্মাবস্থার উন্নতি সাধনে যত্নশীল হইয়াছেন। মুসলমান রাজ্যগুলির মধ্যে একটু আভ্যন্তরীণ সজীবতার লক্ষণ দেখা যাইতেছে, আশা করা যায়, জগতের বর্ত্তমান সভ্যতার আলোকে মুসলমান সম্প্রদায়ও নারীদিগকে সমুন্নত করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিবেন। ভারতবর্ষের অবস্থা আমরা প্রত্যক্ষই করিতেছি। আমাদের মধ্যে নবজীবনের আভাস দেখা যাইতেছে, কিন্তু দীর্ঘকাল পরপদানত থাকিয়া আমাদের জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ড যেন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, উঠিতে চাহিলেও সহজে উঠিতে পারিতেছি না। দেশাচার, কুসংস্কার এবং পরাধীনতা-জনিত সংকীর্ণতা ও দূরদৃষ্টির অভাব আমাদিগকে অভিভূত করিয়া রাখিতে চাহিতেছে। কিন্তু একথা ধ্রুব সত্য, যে যদি ভারত সত্য সত্যই জাগ্রত হয়—আমরা জানি জাগরণ অবশ্যম্ভাবী—তবে ভারত-নারীকে বর্ত্তমান অবস্থায় রাখিয়া দেশ কিছুতেই উঠিতে পারিবে না। ভারতের নারীজাতির অতীত ইতিহাস—প্রাচ্য-ভূমির এবং সমগ্র জগতের নারীজাতির ইতিহাস—উচ্চ ও দৃঢ় কণ্ঠে আমাদিগকে এই শিক্ষা দিতেছে। ঈশ্বর করুন, প্রত্যেক ভারত-সন্তান অচিরে এই সত্য হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হউন।

প্রেম-আবাহন।

হে পথিক! খোল খোল দ্বার
আজি তব মন্দির-ভবনে,
আসিতেছে নবীন অতিথি,
বরি' তারে লহ সযতনে।
বহুদিন বহু পথ ঘুরি
খুঁজেছিলে যার দরশন,
দেখ চেয়ে তোমারি দুয়ারে
সেই তব কামনার ধন।
আজি তব মন্দির-তোরণ
সাজাওগো পত্র-পুষ্প হারে।
বহুদিন পরে দেখা আজি
জ্বাল দীপ কনক-আধারে।
অতিথিরে কি দিয়ে বরিবে?
হে পথিক! কি আছে তোমার?
প্রেম! সে যে চির তাপসিনী
নাহি চায় কিছুই ধরার।
দাও তারে, হৃদয়-কাননে
ফুটেছে যে পুষ্প শতদল।

শুভ্র যাহা দেবতা-পরশে—
স্বর্গ সম পূত, নিরমল!
লহ তারে, দেবীর মতন
আসিছে সে তোমার ভবনে,
লয়ে বিশ্বজননী-আশীষ—
নত মুখে কম্পিত চরণে!

শ্রীমতী———দেবী।

প্রায়শ্চিত্ত।

(১)

হুগলিতে এক বৃহৎ প্রাসাদ-তুল্য ভবনে একদা সন্ধ্যার সময় বহুসংখ্যক প্রদীপের আলো জ্বলিতেছে। প্রতি কক্ষ দীপালোকে উজ্জ্বল হইয়াছে, দূর হইতে দেখিলে মনে হয়, গৃহে কোনও আনন্দোৎসব হইতেছে, কিন্তু কাছে আসিলে দেখিবে, সমস্ত নিস্তব্ধ। সেই আলোকে যেন গৃহের নীরবতা আরও ভীষণ মনে হইতেছে। গৃহের সম্মুখে বারান্দা, সেখানে দু তিন জন প্রবীণ দাস নীরবে দাঁড়াইয়া আছে, যেন কোন বিষয়ের প্রতীক্ষা করিতেছে। বারান্দার পার্শ্বে উপরে উঠিবার সিঁড়ি, একজন দাসী ধীরে ধীরে উপর হইতে নামিয়া আসিয়া নীচের কক্ষে প্রবেশ করিল। দাসীর ম্লান মুখ চক্ষের জলে ভাসিয়া যাইতেছে।

উপরের একটি কক্ষে দুই জন বিচক্ষণ ডাক্তার বসিয়া আছেন। তাঁহাদের মুখ গম্ভীর, সম্মুখে ঘড়ি ধরিয়া আছেন। পার্শ্বের কক্ষে শয্যার উপরে একটি রমণী শয্যাগত, তাঁহার সঙ্কটাপন্ন পীড়া। বাঁচিবার কোন আশা নাই; দেহ শীতল হইয়া পড়িতেছে, শোণিত-প্রবাহ যেন থামিয়া আসিতেছে। সেই শয্যাতলে মুখ লুকাইয়া গৃহস্বামী সুবোধচন্দ্র আকুল ভাবে রোদন করিতেছেন। তাঁহার বড় আদরের প্রিয়তমা স্ত্রী সহসা তাঁহাকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছেন। এই দুই বৎসর হইল জগদীশ্বর তাঁহাদিগকে স্বামী-স্ত্রী করিয়াছেন, পবিত্র প্রণয়-বন্ধনে বাঁধিয়াছেন। গত কল্য একটি নব কুমার জন্মিয়া তাঁহাদের গৃহ আনন্দোৎসবে পূর্ণ করিয়াছে। আজ সহসা তাঁহার প্রাণাধিকা পত্নী ইহলোক ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছেন; এ দুঃখ, এ শোক দুঃসহ। যাহাকে সহিতে হইয়াছে সে-ই বুঝিবে।

সহসা সেই শয্যা হইতে ক্ষীণকণ্ঠে রমণী ডাকিলেন:—"কোথায় তুমি, কোথায়?"

অশ্রুরাশি মুছিয়া সুবোধচন্দ্র ব্যাকুল কণ্ঠে বলিলেন:—"সুধা, কি বলিতেছ?"

সুধার চক্ষের দৃষ্টি কমিয়া আসিয়াছে, তিনি বলিলেন:—"কোথায় তুমি, এস কাছে এস—"

সুবোধচন্দ্র দুই হাতে স্ত্রীকে বেষ্টন করিলেন, সুধা থামিয়া থামিয়া বলিল, "আমি চলিলাম, আমার ছেলেটি রহিল, দেখিও; যাহাতে উহার কষ্ট না হয় তাহা করিও; বিমাতার——"

সুবোধচন্দ্র সে কথায় বাধা দিয়া বলিলেন, "আমি শপথ করিয়া বলিতেছি সুধা, আমি আর বিবাহ করিব না। তোমায় ছাড়া আমি আর কাহাকেও ভালবাসিতে পারিব না।"

সুধা স্বামীর কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া বলিলেন:—"ছি ছি, শপথ করিও না, তুমি তা রাখিতে পারিবে না। যে মৃত তাহার নিকট সত্যে বদ্ধ হওয়া বড় কঠিন, প্রায় কেহ তাহা রক্ষা করিতে পারে না, তাহা থাকে না। তুমি বিবাহ করিও, কিন্তু রূপ দেখিয়া ভুলিও না। যে আমার বাছাকে ভালবাসিতে পারিবে, যত্ন করিতে পারিবে, এমন দেখিয়া বিবাহ করিও। স্বার্থে অন্ধ হইয়া করিও না।" সুবোধচন্দ্রের চক্ষে অশ্রুর ধারা প্রবাহিত হইল, কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল, আবার চক্ষের জল মুছিয়া অতি কষ্টে বলিলেন:—"ও কথা বলিও না সুধা, তুমি আমার মণি, তুমি আমার একমাত্র রত্ন, তোমা হইতে বঞ্চিত হইলে আমার জীবনে কোনও আবশ্যক নাই, আমি বাঁচিতে চাহি না।"

সুধা অতিশয় দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছিলেন; স্বামীর হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন, "একবার আমার ছেলেটিকে লইয়া এসো, একবার দেখি।"

সুবোধচন্দ্র উঠিয়া পার্শ্বের শয্যাস্থিত নিদ্রিত সন্তানকে অতিশয় যত্নের সহিত তুলিয়া আনিয়া সুধার সম্মুখে

ধরিলেন। সুধা পুত্রের মস্তকে হস্ত রাখিয়া বলিলেন, "পৃথিবীতে তোমার মত আমার কেহ প্রিয় নাই, তুমি আমার প্রাণাধিক প্রিয়তম, আমার এই প্রিয় সন্তানটিকে তোমায় দিলাম. তুমি রক্ষা করিও। মৃত্যু আসিয়া অকালে উহাকে মাতৃহীন করিল, আমার সকল সুখ সাধ ফুরাইয়া গেল। তুমি পিতা মাতা দুই হইলে। আমার সন্তানটির নাম "অমরকুমার" রাখিও। আমার আশীর্ব্বাদ ইহার চারিদিক ঘিরিয়া থাক্।"

সুধার শ্বাস- খুব জোরে বহিতে লাগিল, কথা কহিবার শক্তি হ্রাস হইয়া গেল। সুবোধচন্দ্র পুত্রটিকে শয্যায় শোওয়াইয়া ছুটিয়া ডাক্তারকে ডাকিতে গেলেন। ডাক্তার আসিয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলেন, হঠাৎ আর একবার সুধার কথা ফুটিল, "চলিলাম,—বিদায় দাও, মনে রেখো, আমি তোমারি"—আর কথা ফুটিল না, প্রাণহীন শূন্য কায়া শয্যায় পড়িয়া রহিল। সুবোধচন্দ্র মূর্চ্ছিত হইয়া শয্যাতলে পড়িয়া গেলেন।

(২)

সুধা আর জগতে নাই; সুবোধচন্দ্র কোন মতে এ কথা বিশ্বাস করিতে পারেন না। এ যেন স্বপ্নের মত হইয়া গেল, সেই সুধা ক'দিন আগে কত আদরের সহিত কত কথা কহিয়াছে. তার স্মৃতি চারিদিকে ছড়াইয়া আছে, আজ সেই সুধা নাই! সুবোচন্দ্র কি প্রকারে এ কথা ভাবিবেন! সেই তাঁহাদের প্রিয় শয়ন-কক্ষে সুধার শত স্মৃতি ছড়ান রহিয়াছে। সেই আলনায় তাহার কাপড়গুলি রহিয়াছে। সেই দর্পণের কাছে তাহার চুল বাঁধার ফিতা, চিরুণী, কাঁটা, রূপার সিন্দুর-কৌটা, পাউডারের কৌটা, পমেটমের শিশি এসেন্সের শিশিগুলি সজ্জিত রহিয়াছে। যেন তিনি নিজ হস্তে গুছাইয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার সেই কত আদরের আলমারি কাঁচের পুঁতুলে সজ্জিত হইয়া রহিয়াছে। আর ঐ শিশুটি মাতৃহীন, সর্ব্বদাই কাঁদিয়া উঠিতেছে, তাহাতে যেন সুবোধচন্দ্রের হৃদয়ে দারুণ অগ্নি-শিখা জ্বলিয়া উঠিতেছে। কোন মতে যেন অশান্ত হৃদয় শান্ত হইতে চায় না। কিন্তু সময় কাহারও জন্য বসিয়া থাকে না, এক দিন দুই দিন করিয়া সপ্তাহ গত হইল, সপ্তাহ হইতে পক্ষ গত, পক্ষ হইতে মাস গত হইয়া গেল। মাস গত হইলে সুবোধচন্দ্র সন্তান সমভিব্যাহারে দেশান্তরে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য গমন করিলেন ও ছয় মাস পরে দেশে পুনরায় ফিরিয়া আসিলেন। তখন আর হৃদয় সে প্রকার উদাস নাই। এই প্রকারে বৎসর গত হইল। বর্ষার পর হেমন্ত, হেমন্তের পর শীত, তাহার পর বসন্ত আসিল। আবার ধরণী সজীব হইয়া উঠিল। সুবোধচন্দ্রেরও শোকাবেগ ঘুচিয়া আসিল। সেই সময় তাঁহার আত্মীয় স্বজন বন্ধু-বান্ধব সকলে তাঁহাকে পুনরায় বিবাহ করিবার জন্য অনেক অনুরোধ করিয়া ধরিল। তাঁহার এক পিসি মা তাঁহার এক নিকট-আত্মীয়ের একটি বয়স্কা কন্যার সহিত বিবাহ দিবার জন্য একান্ত জিদ করিয়া ধরিলেন। মেয়েটি দেখিতে সুন্দরী, দরিদ্র-কন্যা। তাহার মুখ দেখিয়া সুবোধচন্দ্রের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইল। সুধার বিয়োগের বৎসরান্তে তিনি পুনরায় শুভ দিনে শুভক্ষণে প্রমদার পাণিগ্রহণ করিলেন।

প্রমদার বয়স সপ্তদশ বর্ষ, বিবাহ এত দিন শুধু দরিদ্রতার জন্য হয় নাই। তদ্ভিন্ন সে আশৈশব পিতৃহীন, বিবাহের পরই সে স্বামীর গৃহে ঘর করিতে আসিল।

সুবোধচন্দ্র বিবাহের পূর্ব্বেই সুধার নিত্য ব্যবহারের সকল দ্রব্য একটি আলমারীতে উঠাইয়া রাখিয়া দিলেন। নব বধূ আসিয়া সুধার শয়ন-কক্ষেই আপনার আধিপত্য লাভ করিল। অমরকুমার অন্য কক্ষে তাহার দাসীর নিকট থাকিত। সুবোধচন্দ্র প্রথম দিনই অমরকে প্রমদার ক্রোড়ে দিয়া বলিলেন, "প্রমদা, এই মাতৃহীন শিশুর তুমিই জননী হইলে, ইহাকে তোমার নিজের বলিয়াই জানিও, আজ হইতে ইহার ভার তুমি পাইলে।"

প্রমদা স্বামীর গৃহে আসিয়া সুধার সমস্ত দ্রব্য সামগ্রীর যত্ন দেখিয়া মনে মনে বড়ই ব্যথিত হইয়া ভাবিল, "যার অন্যের জন্য এত প্রাণ কাঁদে, সে আবার বিয়ে করে কেন?" তাহার শয়ন-কক্ষে অন্যের স্মৃতি তাহার যেন সহ্য হইতেছিল না।

সুবোধচন্দ্র সর্ব্বদাই প্রমদার মন যোগাইতে ব্যস্ত, সুধার স্মৃতি তাঁহার নিকট প্রিয় হইলেও স্মৃতি যাহা তাহা

স্মৃতিতেই আছে, স্বার্থের জন্য তাঁহাকে ব্যস্ত হইতে হইল। এক দিন প্রমদা মুক্ত বাতায়নের নিকট দাঁড়াইয়া আছে, এমন সময় সুবোধচন্দ্র আসিয়া পড়িলেন। সুবোধচন্দ্রের পদশব্দে চমকিত হইয়া প্রমদা ফিরিল, সুবোধ দেখিলেন প্রমদার চক্ষে জল, তিনি কাতর হইয়া তাহাকে বাহু-বেষ্টনে বন্দী করিয়া বলিলেন, "প্রমদা, কি হয়েছে?" প্রমদার অভিমানাশ্রু দুই কপোলে গড়াইয়া পড়িল, সে কিছুই বলিল না। তখন প্রমদাকে শত বার আদর করিয়া মুগ্ধ সুবোধচন্দ্র বলিলেন, "বল প্রমদা, বল, আমায় বলিতে হইবে। তোমার কষ্ট আমার নিকট গোপন করিবে?"

প্রমদা কাতর কণ্ঠে বলিল, "তুমি আমায় ভালবাস না, তবে কেন আমায় বিয়ে করিলে?"

সুবোধচন্দ্র বিস্মিত ভাবে বলিলেন, "তোমায় ভালবাসি না কি প্রমদা! তোমার মত আর কাহাকেও কখনো ভাল বাসি নাই, বাসিব না"—সহসা সেই দেয়ালে একটি টিক্‌টিকির শব্দে হইল, সুবোধচন্দ্রের হৃদয় কেমন কম্পিত হইয়া উঠিল; অমনি সেই আর একজনের মুখ মনে পড়িয়া গেল। অমনি ভাবে সেই এক বৎসর পূর্ব্বে তাহাকেও এই কথা বলিয়াছিলেন, তাহা মনে পড়িল। সুবোধচন্দ্র ভাল করিয়া আর কথা বলিতে পারিলেন না; প্রমদার হৃদয়ের অভিমান-বহ্নি নির্ব্বাপিত হইল না।

(৩)

প্রমদার বিবাহের এক বৎসর গত হইবার পর তাহার একটি সুকুমার শিশু-সন্তান জন্মিয়া গৃহের আনন্দোৎসব বর্দ্ধিত করিল। প্রমদার মাতা আসিয়া প্রমদার সেবা যত্ন করিলেন। প্রমদার স্বাস্থ্য ভাল ছিল, দেখিতে দেখিতে সুস্থ হইয়া উঠিল। সুবোধচন্দ্রের আর আনন্দের সীমা নাই। শিশু যখন দুই মাসের হইল, সেই সময় বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে সুবোধচন্দ্র কয়েক দিনের জন্য কলিকাতায় গমন করিলেন।

যে দিন তাঁহার ফিরিয়া আসিবার কথা, সেই দিন অতি প্রত্যুষ হইতে অমর দাসীকে বলিতেছিল, "ঝি মা, ঝি মা, আজ বাবা আছবে, আমায় আঙ্গা কাপল পলিয়ে দে, আমি বাগানে যাব, দেখব ঝি মা!" দাসী তাহাকে সন্তান স্নেহে প্রতিপালন করিতেছিল, তাই অমর সময়ে সময়ে আদর করিয়া তাহাকে 'ঝি মা' বলিয়া ডাকিত। দাসী তাহাকে যথাসাধ্য পরিষ্কার করিয়া তাহার লাল মকমলের সুট পরাইয়া যখন সিঁড়ি দিয়া নামিতেছিল, তখন প্রমদা তাহাকে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বিধু, কোথায় যাইতেছিস?"

দাসী কুণ্ঠিত হইয়া বলিল, "আজ বাবু আসবেন, তাই খোকাবাবু বাগানে গিয়ে গাড়ী আসবে দেখবে বলেছে।"

প্রমদা বিরক্ত হইয়া বলিল, "কেন, বাগানে না গেলে কি দেখা যায় না? যা উপরে যা"—

অমরকুমার কাঁদিয়া উঠিল, বলিল, "না না মা, আমি যাব, আমাল বাবা বলেছে আমি যাব।" আবার প্রমদা বলিল, "যা খুসী করগে।"

বিধু ধীরে ধীরে অমরকে লইয়া নামিয়া গেল। প্রমদা তাড়াতাড়ি আপনার দাসী মালতীকে ডাকিয়া বলিল, "খোকাকে ভাল কাপড় পরিয়ে বাগানে নিয়ে যা, বাবু আজ আসবেন, অমর গেছে।" মালতী বিধুকে আদপে দেখিতে পারিত না। তাহার সহিত ঝগড়া করিতে পারিলে সে আর কিছু চায় না। সে তাড়াতাড়ি নিদ্রিত খোকাকে উঠাইয়া, বস্ত্রাদিতে সজ্জিত করিয়া লইয়া চলিল। অসময়ে নিদ্রা ভঙ্গ হওয়ায় খোকা উচ্চস্বরে কাঁদিতে লাগিল, মালতী তাহাকে অনেক উপায়ে চুপ করাইতে চেষ্টা করিল, মুখে চুস্‌নি দিল, কিন্তু কিছুতেই না পারিয়া সেই অবস্থায় লইয়া চলিল। মালতী গিয়াই বিধুর সহিত কলহ করিবার সূচনা করিল দেখিয়া বিধু বিনা বাক্যব্যয়ে অমরকে লইয়া ফটকের কাছে গেল। এমন সময় গাড়ীর শব্দ হইল, গাড়ী ফটকে প্রবেশ করিল। সুবোধচন্দ্র অমরকে দেখিয়া গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িলেন ও তাহাকে কোলে লইয়া সহস্র চুম্বন করিয়া তাহার হাতে কোটের পকেট হইতে বাহির করিয়া একটা লাল বল দিলেন। প্রমদা বাতায়ন হইতে সব দেখিতেছে, আর ঈর্ষানলে তাহার হৃদয় দগ্ধ হইতেছে। তাহার সন্তান কেহই নয়, শুধু অমরই সর্ব্বস্ব। মালতী সেই ঘুমন্ত শিশুকে লইয়া অগ্রসর হইয়া যাওয়ায় সুবোধচন্দ্র তাহার মুখে যাই চুম্বন দিতে

গেলেন অমনি সে আবার ক্রন্দন করিয়া উঠিল। সুবোধচন্দ্র তাহাকে ছাড়িয়া, অমরকে ক্রোড়ে লইয়া পত্নীর নিকটে চলিলেন। প্রমদা তখন ক্রোধে ও অভিমানে আত্মহারা। সুবোধচন্দ্র গৃহে প্রবেশ করিয়া অমরকে নামাইয়া বলিলেন, "প্রমদা, কেমন আছ? দেখ তোমার জন্য কি এনেছি।" এই বলিয়া পকেট হইতে একটি সুন্দর সোনার চেন বাহির করিয়া ধরিলেন। প্রমদা উত্তেজিত হইয়া বলিল, "আমি ও সব চাহি না।" অমরকুমার ধীরে ধীরে পিতার নিকট গিয়া সেই চেনে হাত দিয়া বলিল, "বাবা এটা নেব।"

প্রমদা তাহার হস্ত হইতে সেই চেন সজোরে কাড়িয়া লইয়া তাহার কপোলে এক ভীষণ চপেটাঘাত করিয়া বলিল, "যা হতভাগা ছেলে, আমার সম্মুখ হইতে দূর হইয়া যা, সবই তোর তা' কি আর আমি জানি না!" অজ্ঞান বালক সেই প্রহারে কাতর হইয়া কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল, "বাবা, বাবা।" সুবোধচন্দ্র পত্নীর ব্যবহারে, বজ্রাহত হইয়াছিলেন। পুত্রের ক্রন্দনে চমক ভাঙ্গিল তাহাকে বক্ষে তুলিয়া লইয়া, কক্ষের বাহিরে গিয়া বিধুকে ডাকিয়া দিলেন। সুবোধচন্দ্র নীরবে গৃহে আসিয়া একটি আসনে বসিয়া পড়িলেন। দুই হস্ত দিয়া মুখ ঢাকিয়া রহিলেন, তাঁহার ভুল ভাঙ্গিয়া গেল। সেই সুধার মৃত্যুশয্যা, সুধার মুখ মনে পড়িল। সে তাঁহাকে বিবাহ করিতে অনুরোধ করিয়াছিল, কিন্তু সুন্দর মুখ দেখিয়া ভুলিতে মানা করিয়াছিল, তিনি তাহা করেন নাই। তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইয়াছে।

প্রমদার ক্রোধ শান্ত হইলে সে আপনার অন্যায় বুঝিয়া স্বামীর নিকট মার্জ্জনা চাহিল। সুবোধচন্দ্র বেশী কিছু বলিলেন না, শুধু বলিলেন, "অমর ও অমূল্য দুই আমার সমান, তুমি কেন এমন বুঝিলে জানি না।"

প্রমদা অমরের নিকট গিয়া তাহাকে আদর করিয়া ভুলাইয়া আসিল। সে শিশু, তাহার কাহারও প্রতি রাগ দ্বেষ নাই। আঘাত লাগিলে কাঁদে মাত্র, আবার আদরে হাসিয়া উঠিল। (ক্রমশঃ)

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

বৈদিক ধর্ম্ম ও গ্রন্থ।

(২)

আমরা পূর্ব্ব সংখ্যায় সাধারণ ভাবে প্রমাণিত করিতে চেষ্টা করিয়াছি যে, বৈদিক গ্রন্থগুলি ধর্ম্মমতের উপরেই প্রতিষ্ঠিত এবং ভারতের ধর্ম্মমত অতি প্রাচীনকাল হইতেই কর্ম্মকাণ্ড, উপাসনাকাণ্ড এবং জ্ঞানকাণ্ড—এই তিন ভাগে বিভক্ত। আমরা বর্ত্তমান সংখ্যায় এই সিদ্ধান্তটীর সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া দেখিব।

ঋগ্বেদে দেবতাদিগের সম্বন্ধে যে সকল বিশেষণ ব্যবহৃত হইয়াছে সেই বিশেষণগুলির মধ্যে কতকগুলি বিশেষণ এমন ভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে যে, তদ্দ্বারা দেবতা-বর্গকে কতকটা মনুষ্যোচিত গুণগ্রামবিশিষ্ট বলিয়া প্রতীত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপে আমরা ইন্দ্রাদি দেবতার রথ, অশ্ব, সারথি, ভূষণ, কেশ, শ্মশ্রু, পুত্র, দারা প্রভৃতি পদার্থের উল্লেখ করিতে পারি। এমন কি, মনুষ্যজাতির ন্যায়, অনেক স্থলে দেবতাদিগকে, ক্রোধ হিংসা ঈর্ষাদি-পরায়ণ বলিয়াও বর্ণিত দেখিতে পাই। আমাদের বিশ্বাস এই যে, বেদের এই অংশগুলি নিকৃষ্ট সাধকের পক্ষে। যাহারা নিতান্ত সংসারপরায়ণ, ইহলোকের সুখ সমৃদ্ধি ব্যতীত, যাহারা পরলোকের কোন সংবাদ রাখে না, সেই সকল ব্যক্তির চিত্তে, ধীরে ধীরে পরলোকাদির কথা মুদ্রিত করিবার জন্য মনুষ্যের সহিত তুল্যগুণাদি দ্বারা দেবতার বর্ণনা করা হইয়াছে। এই সকল লোকের সম্মুখে একেবারেই হঠাৎ এমন একটা উপাস্য আদর্শ যদি উপস্থিত করা যায় যে, যে আদর্শ মনুষ্য-রাজ্যের অতীত গুণাবলি বিশিষ্ট এবং যে আদর্শে নির্গুণ নিষ্ক্রিয়াদি গুণ আছে,—তাহা হইলে ঐ সকল নিকৃষ্ট সাধকের চিত্ত সে আদর্শকে আদৌ বুঝিতে পারিবে না। এই জন্যই জননীর ন্যায় হিতকারিণী শ্রুতি মনুষ্য-রাজ্যোচিত গুণাবলি দ্বারা দেবতার স্তুতি নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। আবার আমরা ঐ সকল দেবতার উপরে অন্য কতকগুলি ভিন্ন প্রকারের বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে দেখিতে পাই। সাধকের চিত্ত যখন অপেক্ষাকৃত উন্নত হইয়া, দেবতাদিগের স্বতন্ত্রতার পরিবর্ত্তে, একত্বের দিকে ধাবিত

কামরূপের উমানন্দ।

হইয়াছে,—এই শ্রেণীর বিশেষণগুলি সেইরূপ সাধকের পক্ষেই উপদিষ্ট। ইন্দ্র-দেবতাও যেমন জগৎপতি, জগদাধার, জগৎপালক, জগতের নেতা, অগ্ন্যাদি দেবতারাও তদ্রূপ বিশেষণ-বিশিষ্ট বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এই সকল দেবতার একত্ব ধীরে ধীরে প্রস্ফুটিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সকল দেবতার একত্ব বুঝিতে পারিলেই, উহারা যে একই মূলকারণ হইতে অভিব্যক্ত হইয়াছে—অথবা দেবতারা যে একই মূলকারণের বিশেষ বিশেষ বিকাশমাত্র,—এই গভীর তত্ত্বের দিকে সাধকের চিত্ত আপনিই ধাবিত হইয়া পড়ে। অগ্নি দেবতার বর্ণনায় নিরুক্তকার মহামতি যাস্ক সুস্পষ্টভাবেই বলিয়া দিয়াছেন যে, 'একই অগ্নি তিনরূপে অবস্থিত আছেন। পৃথিবীতে অগ্নিরূপে, অন্তরীক্ষে বায়ুরূপে, একই দেবতা অবস্থিত।' আবার এরূপ কথাও আমরা দেখি যে, 'এই অগ্নিই উষা, এবং বিষ্ণুর ত্রিপাদ অর্থ এই যে, এক বিষ্ণুই—অগ্নি সূর্য্য ও বায়ুর আকারে তিন স্থান ব্যাপিয়া অবস্থিত আছেন।' আবার এই অগ্নিকে "বিশ্বরূপ" বলিয়াও কথিত হইয়াছে। আবার, এই অগ্নি সম্বন্ধে এরূপ কথাও উক্ত হইয়াছে যে,—"জনয়ন্ মিত্রং", "নক্ষত্রং সূর্য্যং রোহয়ো দিবি,"—এই অগ্নিই মিত্রকে প্রাদুর্ভূত করিয়া দিয়াছেন, ইনিই সূর্য্য ও নক্ষত্রকে আকাশে রোপণ করিয়া দিয়াছেন। ইন্দ্রের বর্ণনায় আমরা দেখিতে পাই, ঋষি বলিতেছেন—"যো বিশ্বস্য জগতঃ প্রাণতঃ পতিঃ," "সূর্য্যং জনয়ন্ দ্যাং উষাসং,"—জগতের এবং প্রাণীবর্গের এই ইন্দ্রই অধিপতি ; এই ইন্দ্রই সূর্য্য ও আকাশের উৎপাদনকর্ত্তা। প্রিয় পাঠক ও পাঠিকা-গণ, আপনারা বিবেচনা করিয়া দেখুন, এ সকল বিশেষণ দ্বারা কি ব্রহ্মই লক্ষিত হইতেছেন না? সাধকের চিত্তে যাহাতে এই দেবতাগণের স্বতন্ত্রতার বোধ তিরো-হিত হয় এবং তৎপরিবর্ত্তে এই দেবতাবর্গ সেই এক মূলকারণেরই বিভিন্ন বিকাশ বলিয়া প্রতীত হয়,—এ সকল বিশেষণের ইহাই একমাত্র তাৎপর্য্য।

আমরা উপরে দুই শ্রেণীর সাধকের কথা বলিলাম, এবং দুই শ্রেণীর সম্বন্ধে দেবতাবর্গেরও বিশেষণের ভিন্নতার কথা বলিয়া আসিলাম। এখন আমরা আর একটী বিষয়ের কথা বলিব। যখন সাধকের চিত্ত এইরূপ প্রণালীতে ব্রহ্মের দিকে আকৃষ্ট হইল এবং ব্রহ্মের একত্বের ধারণা করিবার যোগ্য হইয়া উঠিল, তখন সেরূপ উন্নত সাধকের পক্ষে দেবতার উপাসনার কোন আবশ্যকতা রহিল না। এরূপ সাধকের পক্ষে ব্রহ্মই উপাস্য হইয়া উঠিলেন। কর্ম্মকাণ্ড হইতে তাঁহার জ্ঞানকাণ্ডে আরোহণ ঘটিল। ইঁহাদের জন্যই, ঋগ্বেদে 'হিরণ্যগর্ভ', 'পুরুষ সূক্ত,' 'ব্রহ্মণস্পতি,' 'স্কম্ভ' প্রভৃতি সূক্ত উপদিষ্ট হইয়াছে। এই সকল সূক্তে, প্রকৃতির অতীত অথচ প্রকৃতিতে অনুপ্রবিষ্ট, নিত্য-সত্য ব্রহ্মের বর্ণনা নিবদ্ধ রহিয়াছে। এই সকল সূক্তে ইন্দ্র, বায়ু প্রভৃতি দেবতাবর্গ যে সেই একমাত্র পরম-দেবতারই বিকাশ এবং তাঁহা হইতে পৃথক ভাবে—স্বতন্ত্ররূপে—যে কোন দেবতারই অস্তিত্ব নাই, এ কথাও সুস্পষ্টরূপে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

অতএব আমরা দেখিতেছি যে, সাধকের চিত্তের বিকাশের তারতম্য অনুসারে ঋগ্বেদে ভিন্ন ভিন্ন প্রণালী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এবং প্রণালীর ভিন্নতা বশতঃই দেবতা-বর্গেরও বিশেষণের ভিন্নতা কীর্ত্তিত হইয়াছে। নতুবা, ঋগ্বে-দের ঋষিবর্গ যে ব্রহ্মধারণার যোগ্য ছিলেন না, এবং তাঁহারা যে প্রথমে কেবল প্রাকৃতিক ক্রিয়াগুলিকেই দেবতা বোধে উপাসনা করিতেন ও অনেক পরে উপনিষদাদি গ্রন্থের সময়ে, তাঁহাদের চিত্ত ব্রহ্মধারণার যোগ্য হইয়াছিল,—এ কথা অমরা স্বীকার করিতে পারি না।

যদি তাহাই হয় তবে আমরা ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক প্রভৃতি প্রাচীন উপনিষদ-গ্রন্থের এক অংশে, দ্রব্যাত্মক "যজ্ঞের" কথা নিবদ্ধ দেখিতাম না। উপনিষদে কেবলই ব্রহ্মের কথা নিবদ্ধ দেখিতাম। কিন্তু পাঠক-পাঠিকা অবগত আছেন যে, প্রাচীন উপনিষদগুলিরও অনেক অংশ যজ্ঞের কথায় পরিপূর্ণ। সুতরাং এই মীমাংসাই প্রকৃত মীমাংসা যে, বেদই বল, আর উপ-নিষদই বল, সর্ব্বত্রই কর্ম্ম, জ্ঞান ও উপাসনা, এই তিনটী কাণ্ড বা অংশ আছে। এবং এই তিনটী অংশে সাধকের জ্ঞানের বিকাশের তারতম্য বশতঃই উপদিষ্ট হইয়াছে। প্রাচীন ভাষ্যকারগণের সিদ্ধান্তও এইরূপ। ভাষ্যকার

শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যও তাঁহার ভাষ্যে নানা স্থানে এইরূপ সিদ্ধান্তই করিয়াছেন। হিন্দুজাতি এরূপ বিশ্বাস পোষণ করেন না যে, উপনিষদে যে সকল তত্ত্ব আছে, সে সকল তত্ত্ব ঋগ্বেদে উপদিষ্ট তত্ত্বের বিরোধী। সুতরাং উপনিষদাদি গ্রন্থে ভাষ্যকারগণ যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, সে সকল সিদ্ধান্ত নিশ্চয়ই বৈদিক সিদ্ধান্তমূলক।

আমরা এ স্থলে শঙ্করাচার্য্যের সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করিব। ঐতরেয় আরণ্যক নামে একখানি অতি প্রাচীন গ্রন্থ আছে। তাহার ভাষ্য করিতে গিয়া শঙ্করাচার্য্য সাধকের এবং সাধনার ফলের চারি প্রকার শ্রেণীবিভাগ করিয়া দিয়াছেন। পাঠিকাবর্গের বুঝিতে কি জানি কষ্ট হয়, এই জন্য আমরা এ স্থলে মূল না দিয়া কেবল মাত্র ভাষ্যের অনুবাদ নিবদ্ধ করিয়া দিতেছি :—

(১) যে সকল মনুষ্য স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বশে চালিত, তাহারা রাগ-দ্বেষ দ্বারা প্রেরিত হইয়াই, নিজের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিকর কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। ইহারা কদাচিৎ শুভকার্য্যের অনুষ্ঠান করে। ইহাদের কর্ম্মমাত্রই প্রায়ই পরপীড়াদি দ্বারা, আত্মসুখার্থ অনুষ্ঠিত হয়। সুতরাং ইহারা একেবারেই সংসার-পরায়ণ এবং অধর্ম্মাচারী। (২) ইহাদের অপেক্ষা উন্নতচিত্ত কতকগুলি ব্যক্তি ইহলোকে পুত্রবিত্তাদিলাভাশায় বা পরলোকে সুখাদিপ্রাপ্তির প্রত্যাশায়, যাগযজ্ঞাদি কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় এবং দেবতাদিগের স্বতন্ত্র অস্তিত্বে ও ফলদাতৃত্বে বিশ্বাস করে। ইহাদিগকে "কেবল-কর্ম্মী" বলা যায়। (৩) ইহাদের অপেক্ষাও উন্নততর ব্যক্তি আছেন ; ইঁহারা "কর্ম্মের সঙ্গে জ্ঞানের সমন্বয়" করিয়া লন। দেবতাবর্গকে ইঁহারা ব্রহ্মেরই বিকাশ বলিয়া মনে করেন। সাধনার পরিপক্কতা অনুসারে, ইঁহাদের নিকটে, ক্রমে দেবতাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব তিরোহিত হইয়া যায়। ইঁহারা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। (ক) কেহ কেহ দ্রব্যাত্মক যজ্ঞের আচরণের সময়ে, যজ্ঞের উপকরণ, অগ্নি, মন্ত্র প্রভৃতির স্বতন্ত্রতা বোধ করেন না। সকলই ব্রহ্মের শক্তির বিকাশ—এইভাবে যজ্ঞ আচরণ করেন। (খ) অপর কেহ কেহ, বাহিরে যজ্ঞের আচরণ করেন না। অন্তরে "ভাবনাময়" যজ্ঞে প্রবৃত্ত হন। (৪) এইরূপে যখন সাধকের চিত্ত, ব্রহ্ম-ধারণার যোগ্য হইয়া উঠে, তখন সাধক আর কোন প্রকার যজ্ঞেরই আচরণ করেন না ; সর্ব্বত্র ব্রহ্মচিন্তা করেন, ক্রমে তাঁহার অদ্বৈত-বোধ প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই সাধনার ফল যেরূপ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, তদ্দ্বারাও আমাদের মীমাংসার যাথার্থ্য অনুভূত হইবে। কিন্তু সে কথা প্রস্তাবান্তরে বলিব। (ক্রমশঃ)

শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য, বিদ্যারত্ন, এম, এ।

প্রকৃতি।

কে তুমি কুসুম-বনে ত্রিদিব-বালিকা,
ভরিয়া কনক-সাজি সুগন্ধি কুসুমরাজি
তুলিয়া আপন মনে গাঁথিছ মালিকা ?
ঢল ঢল রূপরাশি, অধরে কি সুধা-হাসি,
পৃষ্ঠে দোলে মুক্ত বেণী, গাহ কুহুস্বরে।
ফুল দল লুটে পায়, ফুল-রেণু মাখা গায়,
এসেছ নন্দন ছাড়ি' বুঝি স্বপ্ন ঘোরে।

একি রূপ হেরি আজি, ষোড়শী ললনা।
আঁখি ঝলসিয়া যায়, যেন অগ্নি শিখা প্রায়
দহিছ বিশ্বের হিয়া, চঞ্চল-নয়না।
পিপাসার শুষ্ক প্রায় শুষ্ক জগতের গায়,
ঊর্দ্ধ মুখে আছে সবে চাহি সুধাধার।
আপনাতে মগ্ন তুমি, জলিতেছে বিশ্ব ভূমি
কোথা স্নিগ্ধ ভালবাসা হৃদয়ে তোমার !

আজ কেন হেরি তব সজল নয়ন।
কেন গো ব্যাকুল হিয়া, একাকিনী দাঁড়াইয়া,
আলু থালু কেশরাশি, মলিন বসন।
মুখখানি ভাবনায় কেন গো বিষণ্ণ হায়,
ঝরিছে নয়ন-বারি তিতি বক্ষহার।
কার লাগি বল আজ এ হেন বিরহ সাজ,
বেদনা বাজিছে এত হৃদয়-মাঝার।

দুখান্তে সুখের নিশি এসেছে আবার।
শুভ্রবাসে ঢাকি কায় নন্দনের রাণী প্রায়
কণ্ঠে পরিয়াছ শুভ্র শেফালিকা হার।
আনন্দে হৃদয় দোলে, আবেশে পড়িছ ঢলে,
বদনে ফুটেছে হাসি চাঁদের কিরণ।
সরসে ফুটেছে আজি কুমুদ কহ্লার-রাজি
চকোর চকোরী গাহে মাতায়ে গগন।

মরি মরি একি রূপ জননীর মত।
সোণার বরণ গায়, ধন ধান্যে ভরা কায়,
ছাতিছে সন্তানগণ হর্ষে শত শত ;

কিবা ধনী কিবা দুখী কি কাঙ্গাল কিবা দুখী
তব গৃহ হতে সবে নিয়ে যায় লুটে।
গাহে সবে জয়গান আজি হরষিত প্রাণ,
আনন্দে নয়নে তব অশ্রু-বিন্দু ফুটে।

শুভ্র-কেশা অতি বৃদ্ধা হইয়াছ তুমি।
জ্যোতিহীন আঁখি দুটি দেহ যেন পড়ে লুটি',
সাঙ্গ জীবনের খেলা, তবু বিশ্ব ভূমি।
মরণ কুয়াসা হেন, ঘিরিয়া আসিছে যেন,
তুমি দাঁড়াইয়া আছ নিশ্চল নীরব।
নাহি নিজ কোন আশা বদনে নাহিক ভাষা,
বিশ্বের কল্যাণে শুধু পূর্ণ প্রাণ তব।*

শ্রীপ্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

দুই রমেশ।

(প্রথম প্রস্তাব।)

বঙ্গের অদৃষ্ট আকাশে দুইটি মনোহর নক্ষত্র অতীব উজ্জ্বল প্রভায় উদিত হইয়াছিল। দুইটির একই নাম, একই জাতি। উভয়ে একই বিভাগে ও একই উদ্দেশ্যে সুপরিচিত। একের নাম রমেশচন্দ্র মিত্র, অপরের নাম রমেশচন্দ্র দত্ত; দুই জনেই বিচার বিভাগে, সাহিত্য ক্ষেত্রে, রাজনৈতিক চর্চ্চায়, নির্ম্মল চরিত্রে দেশ-হিতৈষিতায় এবং পরোপকার-ধর্ম্মে সমগ্র বঙ্গদেশের ও বাঙ্গালীজাতির গৌরব এবং অলঙ্কার। ইঁহাদের মধ্যে একটি নক্ষত্র (সার রমেশচন্দ্র মিত্র) মানবের চর্ম্ম-চক্ষুর অতীতাবস্থায় অদৃশ্য হইয়া গিয়াছেন; দ্বিতীয়টি (রমেশচন্দ্র দত্ত) এখনও উজ্জ্বল প্রভায় বঙ্গের সৌভাগ্যাকাশে আমাদের দৃষ্টিপথের অন্তর্ভূক্ত আছেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে এই দুই জন মহানুভবের সুবিমল জীবন-চরিত্র বর্ণনা করিতে আকাঙ্ক্ষা করিয়াছি। প্রথমে সার রমেশচন্দ্র মিত্র মহোদয় সম্বন্ধে আলোচনা করিব। দুঃখের বিষয় এই যে, এই দুই মহাত্মার জীবনের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ও অপূর্ব্ব মহত্ব অনেকে এখনও সম্পূর্ণরূপে অনুভব বা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয়েন নাই; যাঁহারা রমেশচন্দ্র মিত্র ও রমেশচন্দ্র দত্তকে বুঝিয়াছেন, তাঁহারা ইঁহাদিগকে মহানুভব বলিয়া স্বীকার করিলেও ইহা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিতে বাধ্য যে, এই মহাত্মাদ্বয়ের জীবন সম্পূর্ণরূপে দোষ বা ভ্রমবিমুক্ত নহে। এ দেশের অতি উচ্চ শ্রেণীর বিদ্বান, সদাচারী, সাত্ত্বিক-প্রকৃতিক, তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি সম্পন্ন, দেশোপকারী মহানুভব পুরুষগণও কেমনে বহুকালের কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া সময়ে সময়ে ভ্রমাত্মক পথে ভ্রান্তের ন্যায় পরিব্রজন করেন—বাঙ্গালা দেশের বড় বড় লোকেরাও কেমনে সময়ে সময়ে কঠিনকে কোমল এবং কোমলকে কঠিন বলিয়া অজ্ঞান চক্ষে দর্শন করেন অথবা মায়াপ্রপঞ্চের দাসত্ব স্বীকার করিয়া অজ্ঞজনের ন্যায় স্বকীয় চিরাগত কুসংস্কারের অনুসরণ করেন—এই দুই রমেশের জীবন তাহার সুন্দর দৃষ্টান্ত। কিন্তু এ স্থলে ইহাও নিরপেক্ষ ভাবে কহিয়া রাখা আবশ্যক, যে ইঁহারা কখন দুষ্ট স্বার্থপর নিম্নশ্রেণীর লোকের ন্যায় বিবেক বা হিতাহিত জ্ঞানকে বলি দেন নাই; ইঁহাদের জীবনের দোষ বা ভ্রম সম্পূর্ণ সরল বিশ্বাস কর্ত্তৃক প্রণোদিত; এই দোষ বা ভ্রম কেবল কুসংস্কারের প্রভাবের ফল ভিন্ন আর কিছুই নহে। ভ্রম ও দোষ নিচয় যথাস্থানে বিবৃত হইবে।

বাঙ্গালা ১২৪৬ সনের ফাল্গুণ মাসের শেষ দিবসে রমেশচন্দ্র মিত্র জন্মগ্রহণ করেন। আদি নিবাস চব্বিশ পরগণা জেলান্তর্গত বিষ্ণুপুর গ্রাম। পিতা রামচন্দ্র মিত্র জমিদার বলিয়া খ্যাত ছিলেন, কিন্তু জমিদারের সম্মানাপেক্ষা অন্য এক বিষয়ে তিনি অধিকতর সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রামচন্দ্র বাবু সেকালের সদর দেওয়ানী আদালতের সেরেস্তাদার পদে নিযুক্ত হইয়া এতাদৃশ যোগ্যতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন যে, কিছু কালের জন্য উক্ত আদালতের তিনি ডেপুটি রেজিষ্ট্রারের উচ্চপদে বরিত হইয়াছিলেন। পারস্য ভাষায় তাঁহার অসাধারণ অধিকার ছিল; তিনি ইংরাজি ভাষাও যথারীতি শিক্ষা করিতে ঔদাস্য প্রকাশ করেন নাই। প্রধান বিচার-পতি সার রবার্ট বার্লোর অভিপ্রায়ানুসারে রামচন্দ্র বাবু

* এই কবিতাটিতে কর্তৃকে ভারতের মাতৃ মূর্ত্তির বর্ণনা করা হইয়াছে। ভাঃ মঃ সঃ।

ইংরাজি Civil Guide নামক আইনপুস্তক উর্দ্দু ভাষায় অনুবাদ করিয়া যথেষ্ট প্রশংসা ও পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বালক রমেশের ছয় বৎসর বয়ক্রম কালে রামচন্দ্র বাবু পরলোক গমন করেন। রমেশচন্দ্রের পিতামহ রামধন মিত্র মহাশয় বাঁকুড়া জেলায় মুন্সেফ ছিলেন; রামধন মিত্রের পিতামহ কালীপ্রসাদ মিত্র নদীয়া জেলার কালেক্টরী কাছারীতে উচ্চপদে নিযুক্ত থাকিয়া যশোপার্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। কালীপ্রসাদ মিত্র মহাশয় "মুন্সী কালীপ্রসাদ" নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। রমেশচন্দ্র মিত্রের জননীর নাম কমলমণি, ইনি ঐ গ্রামের ঘোষ বংশের কন্যা। নানা সৎগুণে এই কায়স্থকুলোদ্ভবা রমণী ভূষিতা ছিলেন। তিনি ধার্ম্মিকা, দাত্রী, বিদ্যোৎসাহিনী, স্বধর্ম্মানুষ্ঠানরতা ও প্রিয়ভাষিণী বলিয়া বিখ্যাতা। রামচন্দ্র বাবুর ছয় পুত্র ও চারি কন্যা জন্মিয়াছিল, তন্মধ্যে সার রমেশচন্দ্র মিত্রই সুপ্রসিদ্ধ। কেশব বাবু নামে এক পুত্র সংগীত বিদ্যায় সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়। শৈশবাবস্থায় গ্রাম্য পাঠশালায় লেখা পড়া করিয়া কিছু দিন খ্রীষ্টান মিশনারীদিগের স্কুলে রমেশচন্দ্র বাঙ্গালা ও ইংরাজী শিক্ষা করিয়াছিলেন। পিতৃদেব জীবিতাবস্থায় কলিকাতার সন্নিকটে ভবানীপুরে বাটী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; রমেশচন্দ্র তাঁহার জন্মস্থান হইতে ভবানীপুরে আনীত হইলেন। বিধবা মাতা তাঁহার সর্ব্ব কনিষ্ঠ পুত্র রমেশকে কলিকাতার কলুটোলা স্কুলে ছাত্ররূপে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন; তখনকার ঐ স্কুল এক্ষণে হেয়ার স্কুল নামে পরিচিত। মাতা কমলমণি তাঁহার স্বামীর সম্পত্তির তত্ত্বাবধান ও পুত্রগণের লেখা পড়ার বন্দোবস্ত করিতে যেরূপ যোগ্যতা দেখাইয়া গিয়াছেন, কোন অশিক্ষিতা বাঙ্গালী-কন্যা সহসা সেরূপ দেখাইতে পারেন কি না সন্দেহ। তিনি নিজে লেখা পড়া জানিতেন না, এই জন্য এখনকার নিয়মানুসারে, "অশিক্ষিতা" বলিয়া গণনীয়া হইলেও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, প্রতিভা, দক্ষতা, স্মরণশক্তি, সাত্বিকাচার, শাস্ত্র জ্ঞান, ঈশ্বর-ভক্তি প্রভৃতিতে কমলমণি অসাধারণ হিন্দুরমণী বলিয়া পরিগণিতা হইবার যোগ্য পাত্রী। কনিষ্ঠ পুত্র রমেশচন্দ্র বিধবা কমলমণির চক্ষুর পুত্তলি স্বরূপ ছিলেন, বাল্যাবস্থা হইতে রমেশচন্দ্র তাঁহার দ্বারা প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। প্রায় প্রতি ঘণ্টায় তাঁহার মাতা তাঁহার স্বাস্থ্য ও স্বভাব সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতেন। সার রমেশচন্দ্রের অসাধারণ উন্নতির মূল তাঁহার অসাধারণ জননী, ইহা তিনি নিজে অনেকবার স্বমুখে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। বিষ্ণুপুর গ্রামে সাধ্বী কমলমণির বহু সৎকীর্ত্তি অদ্যাপি বর্ত্তমান থাকিয়া তাঁহার মহত্ব ও অমরত্ব ঘোষণা করিয়া দিতেছে। তিনি কেবল আত্মীয় কুটুম্ব, বন্ধু, পরিচিত ব্যক্তি ও পল্লীবাসীদিগের উপকার অথবা অতিথি সেবা, ব্রাহ্মণ, সজ্জন প্রভৃতির জন্য অর্থ দান, দরিদ্রাদির প্রতিপালন কিম্বা স্বধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন না, পরন্তু সাধারণ হিতকর কার্য্যেও বিশেষ মনোযোগিনী ছিলেন। কাদিহাটি গ্রাম হইতে ভাঙ্গড় গ্রাম পর্য্যন্ত অষ্ট ক্রোশ-ব্যাপী প্রশস্ত প্রকাশ্য বর্ত্মটি সাধ্বী কমলমণির যত্নে ও অর্থব্যয়ে প্রস্তুত হইয়াছে। বিষ্ণুপুর হইতে কাদিহাটি পর্য্যন্ত অন্য একটি পথও কমলমণির পরোপকার প্রবৃত্তির যথেষ্ট পরিচায়ক।

অতি প্রত্যুষে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিবার অভ্যাস রমেশচন্দ্র মিত্রের বাল্যকাল হইতেই শিক্ষা হইয়াছিল। ভোরের বেলায় বিছানা হইতে উঠিয়া ভৃত্য সঙ্গে অথবা পাড়ার বালকদিগের সঙ্গে কিংবা একাকী পদব্রজে অনেক দূর পর্য্যন্ত বালক রমেশ ভ্রমণ করিয়া আসিতেন। শুনা যায় এই অভ্যাস তাঁহার জীবনের বহুবর্ষকাল পর্য্যন্ত ব্যাপী ছিল। ইহাতে তাঁহার দেহ এবং মন উভয়ই সুস্থ থাকিত। রমেশচন্দ্র বাল্যকাল হইতেই বাহিরের নির্ম্মল বায়ু ও আলোকে অবস্থান করিতে শিখিয়াছিলেন। ঘরের ভিতর চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে, বাল্যকালে কেহ তাঁহাকে দেখে নাই। বৃষ্টি, অতিশয় হিম, ঝটিকা প্রভৃতি না হইলে তিনি কুঠার ভিতর থাকিতেন না। বালক রমেশ তাঁহার পুস্তকাদি পাঠের জন্য অপরাপর পরিশ্রমী বালকের ন্যায় দিবা-রাত্রি এই অভ্যাস করিতেন না। শুনা যায়, বাল্যকালে তিনি পুস্তক পাঠের জন্য অল্প সময় ব্যয় করিতেন, কিন্তু ঐ অল্প সময় মধ্যে একাগ্র চিত্তে

যাহা পড়িতেন তাহা সমস্ত জীবনেও ভুলেন নাই। যোগীজনের ন্যায় নীরবে ও নির্জ্জনে বসিয়া অল্প সময় মধ্যে যাহা পড়িতেন তাহা অন্য এক জন বুদ্ধিমান বালক চতুর্গুণ সময়েও শেষ করিতে পারিত না। রমেশের পাঠের সময় তাঁহার মন এমন সন্নিবিষ্ট হইত যে, সম্মুখ বা অতি নিকটে কেহ ভয়ানক গোলমাল করিলেও অথবা কেহ বাদ্যযন্ত্র বাজাইতে থাকিলেও তাঁহার ধ্যানভঙ্গ হইত না। পাঠে অত্যন্ত অনুরাগী হইয়া ষোড়শ বৎসর বয়সে রমেশ বাবু জুনিয়ার স্কলারশিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন। অষ্টাদশবর্ষ বয়ক্রমে প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে সিনিয়র স্কলার্শিপ পরীক্ষায় প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া পঞ্চবিংশ মুদ্রা মাসিক বৃত্তিলাভ করেন। বিংশ বৎসর বয়ক্রমে উক্ত কলেজ হইতে বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তৎপর বর্ষে বি, এল, পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হয়েন। রমেশচন্দ্র কহিতেন, "যদি আমি বি, এল, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারি তাহা হইলে একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকীল হইবার আমার ভরসা আছে। কোথা হইতে আমার মনোমধ্যে এই ভরসা জন্মিয়াছে, তাহা আমি জানি না; কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, আমি একজন ভাল উকীল হইতে পারিব।" রমেশচন্দ্রের এই ধারণা সুফলদায়িনী হইয়াছিল; পরিণামে তিনি কেবল হাইকোর্টের সুদক্ষ উকীল ও জজ বলিয়া প্রসিদ্ধ হয়েন নাই; পরন্ত চিফ্ জষ্টিশ অর্থাৎ সর্ব্বপ্রধান বিচারপতির কার্য্যও করিয়া গিয়াছেন। বি, এল, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া রমেশ বাবু অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন বটে কিন্তু সেই আহ্লাদ অতীব নিরানন্দে পরিণত হইল। আইন-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার অল্প দিবস পরেই তাঁহার পূজনীয়া জননী দেবীর মৃত্যু হইল। জননীর পরলোক গমনে তিনি হৃদয়ে অত্যন্ত ব্যথা প্রাপ্ত হয়েন। যাহা হউক, ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ একুশ বৎসর বয়সে রমেশ বাবু কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতী করিতে আরম্ভ করেন এবং প্রায় চতুর্দ্দশ বর্ষকাল ওকালতী করিয়া প্রভূত প্রশংসা, প্রচুর অর্থ, অতুল যোগ্যতা ও দক্ষতা অর্জ্জনপূর্ব্বক সমস্ত উকীলের অগ্রগণ্য হইয়া উঠিয়াছিলেন। ওকালতী করিবার সময় হাইকোর্টের জজেরা তাঁহার তীক্ষ্ণবুদ্ধি, বিবেক, প্রতিভা, যোগ্যতা ও সাধুকতা দর্শন করিয়া বিমোহিত হইতেন। সমুদয় জজ তাঁহাকে অত্যন্ত পণ্ডিত ও যোগ্য পুরুষ বলিয়া প্রশংসা করিতেন, কিন্তু বিচারপতি লুইস্ জ্যাকসন্ সাহেব রমেশ বাবুকে দেখিতে পারিতেন না। রমেশচন্দ্র ঐ হিংস্রক সাহেবের চক্ষুর শূল-স্বরূপ ছিলেন। ইহার কারণ এই যে, তদানীন্তন হাইকোর্টের জজদিগের এবং হাইকোর্ট সম্পর্কীয় জনগণের মনোমধ্যে এই একটি ধারণা বদ্ধমূল ছিল যে, বিচারপতি লুইস্ জ্যাক্‌সনের তুল্য মহাপণ্ডিত ও আইনাভিজ্ঞ লোক ভারতবর্ষে আর নাই। রমেশচন্দ্র পদে পদে জজ জ্যাক্‌সনের ভুল ধরিয়া দিতেন এবং তাঁহার যুক্তি সমূহকে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া দিতেন। হিংসায়, বিদ্বেষ ও অপমানে জ্যাকসন্ সাহেবের গাত্র-দাহ ও মনোবেদনা উপস্থিত হইত। কালা-চামড়ার বাঙ্গালী "নেটিব" উকীল সাদা-চাম্‌ড়ার জজ সাহেবের উপর টেক্কা দিবে, ইহা কি ইংরাজের প্রাণে সহ্য হয়? যাহা হউক, পরিণামে জ্যাকসন্ সাহেবও স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন যে, উকীল রমেশের ন্যায় সুপণ্ডিত পুরুষের প্রতিদ্বন্দ্বিতা তাঁহার পক্ষে অবশ্য মহা গৌরবের কারণ। উকীল রমেশ বাবু যেমন বিদ্বান, তেমনি চরিত্রবান, এবং তেমনি সাহসী, স্পষ্টবাদী অথচ বিনয়ী ও প্রিয়ভাষী ছিলেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

বনিতা-বিনোদ।

দ্বিতীয় বিনোদ।

ক্রোধ-শান্তি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

রাগ হইলে হঠাৎ কোন কাজ না করিয়া সকল বিষয় বিচার বিবেচনা করিয়া কাজ করা যে অতিশয় ন্যায়সঙ্গত সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহই নাই। এস্থলে আপত্তি হইতে পারে, "বা! একজন আসিয়া আমার মুখে ঘা করিয়া এক ঘুষী মারিল আর আমি গম্ভীর ভাবে

বসিয়া বিচার ও বিবেচনা করিতে লাগিলাম, এদিকে অপরাধী ব্যক্তি ততক্ষণ কোথায় চলিয়া গেল, যে আমি আর তাহার কোন ঠিকানা পাইলাম না। সকলে আর এত সুবুদ্ধি নহে যে আমি বিচার বিবেচনা করিয়া কিরূপ দণ্ড বিধানের ব্যবস্থা করি, আগ্রহের সহিত সেই দণ্ড গ্রহণ করিবার ও আমার-বিচার বুদ্ধির প্রশংসা করিবার জন্ত স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিবে!', এই আপত্তি প্রথম শুনিতে বেশ যুক্তিসিদ্ধ বোধ হয় বটে, কিন্তু তলাইয়া বুঝিলে ইহা কুতর্ক বই আর কিছু বলা যায় না। আপনি বুকে হাত দিয়া বলুন দেখি, কে কবে বিনাদোষে আপনার মুখে ঐরূপ মুষ্ট্যাঘাত করিয়াছে? বোধ হয় কখনই না। আরও আপনি ভাবিয়া দেখুন দেখি, আপনি রাগ করিয়া কতবার পুত্র বা ভৃত্যাদির প্রতি কঠোর ব্যবহার করিয়া পরে অনুতপ্ত হইয়াছেন? অবশ্যই অনেকবার ঐরূপ হইয়াছে। এই জন্ত বলিতেছিলাম, যে উল্লিখিত আপত্তি কুতর্ক মাত্র। বিনা অপরাধে কেহই আপনাকে ঘুসী মারিবে না। আর যদিই বা কখনও ঐরূপ ঘটে, তাহা হইলেও আপনার ধীরভাবে বিচার-বিবেচনা করিয়া কাজ করা উচিত। যদিই বিচার করিতে গিয়া আততায়ী ব্যক্তি পলাইয়া যায়, তাহাতেও কোন ক্ষতি নাই। বরঞ্চ লাভ এই যে আপনার মনের উত্তেজিতাবস্থায় হঠাৎ তাহার প্রতিশোধ—হয়ত তুলনায় অতিশয় গুরু—না লইয়া পরে স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিয়া তাহার দোষানুরূপ শাস্তি দিতে পারিবেন। আপনার শত্রু আপনাকে একটী ঘুসি মারিয়া একেবারে দেশত্যাগ করিয়া পলাইবে, এমন ভয় আছে কি?

প্রসিদ্ধ গ্রীক্ দার্শনিক পণ্ডিত অরস্তুর মত এই যে, যুদ্ধক্ষেত্রে অথবা ভয়ানক হিংস্র জন্তুর আক্রমণ সময়ে ক্রোধের আবশ্যক হয়, অতএব ক্রোধকে সমূলে নাশ করা উচিত নহে, কেবলমাত্র উহাকে বুদ্ধিবৃত্তির অধীন রাখা প্রয়োজন। আমাদের মতও ইহা নহে যে ক্রোধকে একেবারে ধ্বংস করিতে হইবে। ভগবানের প্রদত্ত কোন বৃত্তিকেই একেবারে বিনষ্ট করিবার অধিকার কাহারও নাই এবং তাহা করা উচিতও নহে। ক্রোধ যাহাতে বুদ্ধিবৃত্তিকে পরাস্ত করিয়া আমাদের জ্ঞান-নেত্র অন্ধ করিয়া না দেয়, তাহার জন্তই সাবধান হওয়া আবশ্যক।

পণ্ডিতবর সেনেকা এবং আরও অনেক গ্রীক দার্শনিক পণ্ডিত অরস্তুর উপর্য্যুক্ত মত অতিশয় অসার বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। আমরাও দেখিতে পাইতেছি যে ঐ মত ঠিক নহে। ক্রোধের ফল যখন বুদ্ধিভ্রংশ, তখন যুদ্ধক্ষেত্রে—যে সময়ে বুদ্ধিবৃত্তির সুপরিচালনা নিতান্তই আবশ্যক—ক্রোধের উদয় নিতান্ত অপকারী, তাহাতে আর সন্দেহ কি? ইতিহাস পুনঃ পুনঃ সাক্ষ্য দিতেছে যে প্রকৃত বীর ব্যক্তিরা যুদ্ধক্ষেত্রে কদাপি ক্রোধের বশীভূত হন না। সাধারণতঃ যে পক্ষ দুর্ব্বল ও লঘুচিত্ত, সেই পক্ষেই ক্রোধ আবির্ভূত হইয়া বিনাশের পথ পরিষ্কার করিয়া দেয়। বিগত রুষ-জাপান মহাসমরের প্রথম হইতেই রুষপক্ষ হইতে নানাবিধ তর্জ্জন গর্জ্জন ও বড় বড় অহঙ্কারপূর্ণ কথা শুনা গিয়াছিল। যুদ্ধের সময় রুষ-সেনাপতিগণ খোলাখুলি জাপানীদিগকে "বানর" প্রভৃতি সম্বোধনে আপ্যায়িত করিতে ত্রুটি করেন নাই। পক্ষান্তরে জাপানীদিগের পক্ষ হইতে এরূপ কথা কেহই শুনেন নাই। যদি বীরবর এড্‌মিরাল টোগো ও মার্শেল ওয়ামা ক্রোধের বশীভূত হইয়া কাজ করিতেন তাহা হইলে জাপানের কি সর্ব্বনাশই না হইত। জেনেরেল নোগী উক্ত কাল-সময়ে দুই উপযুক্ত প্রিয়তম পুত্র হারাইয়াও ক্রোধের অধীন হইয়া বিচারশক্তি হারান নাই। তিনি বিচার ও বিবেচনা শক্তির সম্যক প্রয়োগ করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া জগতে অজেয় ও দুর্দ্ধর্ষ বলিয়া বিখ্যাত রুষ-বাহিনী ফেরুপালের মত পর্য্যুদস্ত হইয়া গেল ও পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুদৃঢ় বলিয়া কথিত পোর্ট-আর্থার দুর্গ বৎসরেক কালের মধ্যে জাপানের করতলগত হইল। জাপান যে আজ জগতের মধ্যে একটী প্রথম শ্রেণীর শক্তি বলিয়া সর্ব্বত্র সম্মানিত হইতেছেন, তাহা এই রুষজাপান যুদ্ধে জাপানী বীরগণের দূরদর্শিতা, বুদ্ধি ও বিবেচনার ফল মাত্র। ধৈর্য্যই যে বীর্য্যের প্রধান আশ্রয় তাহা কাহারও অস্বীকার করিবার ক্ষমতা নাই।

হিংস্র জন্তুর আক্রমণ কালেও যে ক্রোধের কোন উপযোগিতা নাই, তাহা বুঝাইয়া বলা নিষ্প্রয়োজন। যখন বাঘের মুখে পড়িয়াছি, তখন রাগিয়া কি হইবে, বা দুটা কটুকথা বলিয়া গালাগালি দিয়া কি হইবে? বাঘ ত আমার নিরীহ প্রজা কেনারাম দাস নহে যে আমার রাগ দেখিয়া ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে পলাইবে! সে সময়ে, স্থির বুদ্ধি, অটুট সাহস, ও অবিচলিত প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের আবশ্যক। হিংস্র জন্তু সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, দস্যু তস্করাদির আক্রমণ সম্বন্ধেও ঐ সকল কথা ঠিক খাটে। এই সকল ক্ষেত্রে ক্রোধের পরিবর্ত্তে ধৈর্য্য এবং বিচার-বুদ্ধিই আমাদের প্রকৃত আশ্রয়।

ক্রোধান্ধ হইয়া অনেকে এমন অজ্ঞান হইয়া যায়, যে পিতার উপর ক্রোধ করিয়া পুত্রের, পুত্রের উপর ক্রোধ করিয়া পিতার, প্রভুর উপর ক্রোধ করিয়া ভৃত্যের প্রতি অত্যাচার করতঃ প্রতিশোধ-পিপাসা শান্ত করে। এরূপ ঘৃণিত ব্যবহারের উদাহরণ বিরল নহে।

আমরা দেখিয়াছি, শিক্ষিত বলিয়া অভিমানী ব্যক্তিরাও অতি সামান্ত কারণে স্ত্রী পুত্র বা ভৃত্যাদির প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া কঠোর ব্যবহার করেন। ইহা একদিকে যেমন অন্যায়, অপরদিকে তেমনি কাপুরুষতার পরাকাষ্ঠা। যাহারা আমার একেবারে অধীন, তাহাদের প্রতি অত্যাচার করা যে কতদূর নির্লজ্জতার বিষয় তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। পুত্রকে বিনা দোষে অথবা তুচ্ছ দোষে তাড়না করিতে করিতে সেও উত্তর দিতে আরম্ভ করে। যখন দেখে, বিনা দোষে প্রহার লাভ অবশ্যম্ভাবী, তখন সে পলাইয়া আত্মরক্ষা করে এবং শেষে যখন নিজের বল একটু বুঝিতে পারে, তখন পিতার সহিত "হাতাহাতি" করিতেও পশ্চাৎপদ হয় না। যেখানে পুত্র পিতার সহিত ঐরূপ কুব্যবহার করে, অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে শতকরা ৯৯ স্থলে পিতার অবিবেচনার দোষেই এই ফল হইয়াছে। এই বিংশ শতাব্দীতেও ভদ্রলোক বলিয়া পরিচিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে অতি তুচ্ছ দোষে বা বিনা দোষে পত্নীকে তাড়না করিয়া মনুষ্য নাম কলঙ্কিত করিতেছেন এরূপ লোকের সংখ্যাও নিতান্ত কম নহে। পুত্র হউক, ভৃত্য হউক বা অপর কেহ হউক, ক্রোধের সময় কাহাকেও শাসন বা তাড়না করা কদাপি উচিত নহে। ক্রোধের সময় নিজের মনোবৃত্তি যখন নিজের আয়ত্বাধীন থাকে না, তখন সে সময়ে শাসন বা তাড়না করিতে গিয়া হিতে বিপরীত হয় মাত্র। ক্রোধের সময় শাসন করিতে গিয়া পিতা পুত্রকে অতি অনুচিত অশ্লীল কুবাক্য বলিয়াছেন এবং তাড়না করিতে গিয়া পুত্র অথবা ভ্রাতার হাত পা ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন এমন দৃষ্টান্ত বিরল নহে। যুবক স্বামী অথবা বৃদ্ধা খাশুড়ী ক্রোধান্ধ হইয়া বালিকা পত্নী বা বধূর কুসুম-কোমল কলেবরে উত্তপ্ত লৌহখণ্ড দিয়া অমানুষিক অত্যাচার করিয়াছেন, এমন ঘটনা এখনও সংবাদ-পত্রাদিতে দেখিতে পাওয়া যায়।

একবার এইরূপ কঠোর ব্যবহারের একটী করুণ দৃশ্য অনুবাদকের চক্ষে পড়িয়াছিল। অতি সংক্ষেপে সেই গল্পটী বলিতেছি। এক সমৃদ্ধ গৃহস্থের বাটীতে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল। খাশুড়ী ঠাকুরাণীর বয়স ৫০ বৎসরের ন্যূন নহে, বালিকা বধূর বয়স চতুর্দ্দশের অধিক নহে। বালিকা সবেমাত্র শ্বশুর বাটীতে আসিয়াছে, পূর্ব্বে মায়ের আদরের মেয়ে ছিল, সুতরাং রান্নাবান্না জানিত না। খাশুড়ী ঠাকুরাণী "দাসী" পাইয়া ছাড়িবেন কেন? বধূকে ভাত রাঁধিতে দিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া হরিনামের মালা জপ করিতেছিলেন। বালিকা বধূ ভাত রাঁধিয়া ভাতের ফেন গড়াইতে পারে নাই। সে গিয়া খাশুড়ী ঠাকুরাণীকে ডাকিল। বধূর এই প্রকার অসভ্য আহ্বানে খাশুড়ীর "নামে" বাধা পড়িল, তিনি ভয়ানক রাগিয়া গেলেন ও বৌকে তাহার পিতা ভ্রাতা প্রভৃতির মস্তক ভক্ষণের সুমধুর ব্যবস্থা দিতে লাগিলেন। বৌএর আবার অপরাধ হইল; সে মৃদুস্বরে বলিল, "মা, তোমারও ত ভাই আছে, বাপ ভাইএর মাথা খাইতে বল কেমন করিয়া?" আর যায় কোথায়? খাশুড়ী ঠাকুরাণী তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া গিয়া বধূমাতার হাতখানি ধরিয়া রান্না ঘরে টানিয়া লইয়া গেলেন এবং—পাঠিকারা বিশ্বাস করিবেন কি?—বৌএর সেই সুন্দর মুখখানি সেই টগবগ করা ফুটন্ত ভাতের ডেকচীতে ডুবাইয়া ধরিতে গেলেন। ডুবাইতে পারিলেন না, বৌ প্রাণপণে মুখ

সরাইয়া লইল। কিন্তু হায়! ফুটন্ত ভাতের ফেন ছিট্‌কাইয়া ও "ভাপ" লাগিয়া সমগ্র মুখখানি পুড়িয়া গেল। তিন চারি দিন পরে আমাকে বাধ্য হইয়া—কারণ আমি সরকারী কর্ম্মচারী—সেই হতভাগিনীকে দেখিতে যাইতে হইয়াছিল। সে দৃশ্য দেখিয়া আমার সর্ব্বাঙ্গ যুগপৎ কাঁপিয়া উঠিল, সমস্ত অঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। সে দৃশ্য আর জীবনে ভুলিবার সম্ভাবনা নাই। অনিন্দ্যসুন্দরী অর্দ্ধোস্ফুটিত শতদলবৎ সেই বালিকার মুখ কি বিকট ভাব ধারণ করিয়াছিল! চোখ দুইটী কেবল নষ্ট হয় নাই, আর সমস্ত মুখশ্রী জন্মের মত নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। বালিকা এত অত্যাচার সহ্য করিয়াছিল কিন্তু তাহার হৃদয় ক্ষমার পীযুষে পূর্ণ ছিল। আমি বার বার কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে দৃঢ়ভাবে বলিল, "না আমার উপর খাশুড়ী বা অন্য কেহ কোন অত্যাচার করেন নাই, আমি ফেন গড়াইতে গিয়াছিলাম, হঠাৎ আমার মাথা ঘুরিয়া গেল, আমি ডেক্‌চীর উপর পড়িয়া গেলাম, তাহাতেই এইরূপ হইয়াছে।" বালিকা অতি কষ্টে বাঁচিল। খাশুড়ীঠাকুরাণী বালিকার ক্ষমার ফলে রাজদণ্ডে অব্যাহতি পাইলেন।

আর একটী লোমহর্ষণ ক্রোধের অত্যাচার আমার দৃষ্টি পথে পতিত হয়। সসত্ত্বা যুবতী স্ত্রীর সহিত যুবক স্বামীর কি তুচ্ছ কারণে সামান্য কলহ হয়। যুবতী অভিমান করিয়া পর দিন রান্না করে নাই। স্বামী কৃষক—বেলা দুই প্রহরের সময় মাঠ হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখে, তখনও ভাত হয় নাই। স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল, "আমি পারিব না।" অমনি ক্রোধান্ধ স্বামী নিজের হস্তস্থিত দা দিয়া সেই অভিমানিনী সসত্ত্বা যুবতী স্ত্রীর শিরশ্ছেদন করিল। হতভাগ্য অবিলম্বে আত্মকৃত অপরাধের মাত্রা বুঝিতে পারিল। কিন্তু তখন আর কি ফল? সে উন্মত্তপ্রায় হইয়া আত্মহত্যার উদ্দেশ্যে নিকটস্থ কূপে ঝাঁপ দিল, কিন্তু মৃত্যু হইল না। অবশেষে বিচারে অভাগা প্রাণ ভিক্ষা পাইয়া দীর্ঘ কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল। সে জীবনের শেষ পর্য্যন্ত অবিবেচনা ও ক্রোধের বিষময় ফল ভোগ করিবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

এইরূপ দৃষ্টান্ত অনেকগুলি আমার জীবনে দেখিয়াছি, সুতরাং এইরূপ ঘটনা যে অহরহ ঘটিতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। ক্রোধ এমন ভয়ানক শত্রু যে তাহার অধীন হইলে লোকে অতি নিকট প্রিয়তম ব্যক্তিকে নিদারুণ যাতনা দিতে অথবা বধ করিতে কুণ্ঠিত হয় না। পুত্র, ভৃত্য অথবা যে কেহ কোন অপরাধ করিলে ক্রোধের সময় কোনরূপ তাড়না বা শাসন না করিয়া চুপ করিয়া থাকা উচিত। শেষে রাগ পড়িয়া গেলে ধীরভাবে তাহাদের কৃত দোষের বিষয় অনুসন্ধান করিয়া যথোপযুক্ত তাড়না বা শাস্তি প্রদান করা উচিত। যাঁহারা তাহা না পারেন তাঁহারা পুত্রাদির শাসন করিবার অনুপযুক্ত, সন্দেহ নাই।

পুত্র অপেক্ষা ভৃত্যের সম্বন্ধে আরো সাবধান হওয়া উচিত। রাগের সময় ভৃত্যকে তাড়না বা প্রহার করা দূরে থাকুক রূঢ় কথা বলিয়া শাসন করাও উচিত নহে। গ্রীস দেশীয় সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত সক্রেটীস্ একবার এক ক্রীত দাসের উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। সক্রেটিস্ দাসকে প্রহার করা দূরে থাকুক একটা রূঢ় কথা পর্য্যন্ত বলিলেন না। কেবল এইমাত্র বলিয়াই ক্ষান্ত হইলেন, "দেখ, যদি তোমার উপর আমার রাগ না হইত তাহা হইলে আজ তোমাকে প্রহার করিতাম।" অন্য লোক হইলে প্রহার করিত এবং শেষে বলিত, "কি করিব, রাগ হইল, সামলাইতে পারিলাম না, কাজেই প্রহার করিলাম।" মহানুভব ব্যক্তির মহত্ত্ব এইখানে।

এখন প্রশ্ন করা যাইতে পারে, ক্রোধ কেমন করিয়া সংযত করা যায়? মানুষ ত আর ক্রোধকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনে না, ক্রোধ আপনিই যে আসিয়া হৃদয়ের সমস্ত অংশটা অধিকার করিয়া বসে! উহাকে তাড়াইয়া দিবার উপায় কি? সেই উপায় বলিতে না পারিলে বিচার বিবেচনা করিবার কথা বলা বৃথা। আমরা এখন এই উপায় সম্বন্ধে আলোচনা করিব। (ক্রমশঃ)

শ্রীসত্যচন্দ্র দাস।

অনুবাদক।

রাজনৈতিক কথা।

সুরাটে কংগ্রেসের অধিবেশন উপলক্ষে একদল শিক্ষিত ভারতবাসী এবার যে প্রকার ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাতে দেশের প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষী মাত্রেই অন্তরে নিদারুণ ব্যথা অনুভব করিয়াছেন। দেশে নরম বা ধীরপন্থী moderate) ও গরম বা চরমপন্থী (extremist) এই দল-পার্থক্যের সৃষ্টি দেখিয়া প্রথমে ভীত হইলেও আমরা মনে করিয়াছিলাম ইহাতে দেশের কল্যাণই হইবে। কারণ, আমরা আত্মশক্তির উপর নির্ভর না করিয়া, স্বাবলম্বন শক্তিকে বহু পরিমাণে বিসর্জ্জন দিয়া, কেবলই রাজকৃপার ভিখারী হইয়া পড়িয়াছিলাম। কথায় কথায় রাজদ্বারে কান্নাকাটি করিতে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ শুভক্ষণে আত্মশক্তির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যাঁহারা এই আত্মশক্তির সাহায্য গ্রহণে আমাদিগকে প্রথমে উদ্বুদ্ধ করেন, তাঁহারাই এখন চরমপন্থী নামে অভিহিত হইতেছেন। দেশের লোক আত্মশক্তির উপর নির্ভর করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল, শুভ মুহূর্ত্তে দেশের কতিপয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি উচ্চ কণ্ঠে এই মন্ত্র ঘোষণা করিলেন, দেশের লোক মস্তক পাতিয়া তাহা গ্রহণ করিল। যাঁহারা বহুকাল হইতে রাজকৃপা-ভিক্ষাই আমাদের মুক্তির প্রধান উপায় বলিয়া মনে করিতেছিলেন তাঁহারাও স্বাবলম্বনের মূল্য ও প্রয়োজনীয়তা সহজেই অনুভব করিলেন। চরমপন্থী ও ধীরপন্থী এই দুই মতের সংমিশ্রণে দেশের পরম উপকার হইবার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছিল, কিন্তু এই আত্মকলহদুষ্ট অধঃপতিত দেশে দশজনে মিলিয়া কাজ করিতে গেলেই কলহ উপস্থিত হয়। কারণ মনুষ্যত্বের হিসাবে আমরা নিতান্ত দীন। প্রকৃত মানুষ হইতে হইলে চরিত্রে যে সকল সদ্‌গুণ থাকা প্রয়োজন আমাদের তাহা নাই। আমরা দেশের স্বার্থের সঙ্গে নিজের স্বার্থকে জড়িত করি; দেশের কাজ করিয়া নিজের যশ মান বৃদ্ধি করিতে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়ি, তাই দেবতা আমাদিগের প্রতি রুষ্ট হন। স্বার্থবুদ্ধি-কলুষিত পূজা-দেবতা গ্রহণ করেন না। এইবার কংগ্রেসের কার্য্য এই জন্যই পণ্ড হইল। পাঠকপাঠিকাগণ সংবাদ-পত্রে মহাসমিতি ভঙ্গের শোচনীয় বিবরণ বিস্তৃতরূপে পাঠ করিয়া থাকিবেন, আমরা এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ করিব না। দেশের বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থা ও আমাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে জনৈক সুপ্রসিদ্ধ, প্রবীণ, চিন্তাশীল, ধার্ম্মিক স্বদেশ-সেবকের উক্তি আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

"কংগ্রেসের অধিবেশন বন্ধ হওয়ায় চারিদিকে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। যে মহাসমিতিতে সমগ্র ভারতের লোক জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সমবেত হইয়া আজ দ্বাবিংশতি বর্ষকাল রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে যোগদান করিতেন, সমগ্র ভারতের গৌরবের বস্তু সেই জাতীয় মহাসমিতি ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় দেশের আপামর সাধারণ সকলেই বিচলিত হইয়া উঠিয়াছেন। ভারতের সর্ব্বত্র তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। আমরা চিরদিনই বলিয়া আসিতেছি যে, আত্মকলহেই ভারতের সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে; এই বিদ্বেষ-বুদ্ধিকে বিষের ন্যায় বর্জ্জন করিতে না পারিলে আর এই অধঃপতিত জাতির কল্যাণ নাই। সমগ্র দেশে রাজশক্তি এবং প্রজাশক্তির মধ্যে বিষম সংঘর্ষ বাধিয়া উঠিয়াছে, বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের শাসন নীতিতে দেশের লোক দিন দিন 'মরিয়া' হইয়া উঠিতেছে এবং ভারতের রাজনৈতিক আকাশ ক্রমে মেঘাচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে।

এ দিকে আবার এংলো ইণ্ডিয়ান সহযোগিগণ প্রতি দিন গবর্ণমেণ্টকে আমাদিগের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া তুলিতেছেন—এমন দুর্দ্দিনে আমরা ভাই ভাই সত্য সত্যই ঠাঁই ঠাঁই হইয়া গেলাম, ইহার অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর নাই। * * * * *

আজ কংগ্রেসের মৃত শরীর ভারতের মহাশ্মশানে পড়িয়া রহিয়াছে এবং অভিশপ্ত ভারতসন্তানদিগকে বলিতেছে যে, আত্মকলহের ইহাই পরিণাম। সুরাটে কংগ্রেস ভাঙ্গিয়া গেল, কোথায় তাহাতে সকলে মর্ম্মাহত হইয়া পুনরায় স্বদেশ সেবার আয়োজনে নিযুক্ত হইবেন, তাহা না হইয়া আবার কলহে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এই উপলক্ষে কতকগুলি সংবাদপত্রে যেরূপ মিথ্যা সংবাদ

প্রচার করা হইতেছে তাহা পাঠ করিলে নীরবে কেবল অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিতে ইচ্ছা হয়। চারিদিকেই গালাগালির ছড়াছড়ি দেখা যাইতেছে; * * * দেশের সর্ব্বত্রই কলহ উপস্থিত হইতেছে। আন্দোলনের উত্তেজনায় আমাদিগের জীবন-মরণের সম্বল স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলন ক্ষীণ হইয়া পড়িতেছে।

অনেকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, সুরাটের কংগ্রেস কে ভাঙ্গিল? কেমন করিয়া ভাঙ্গিল? কে আগে আক্রমণ করিল? ইত্যাদি বহু প্রশ্ন এবং তাহার উত্তরে সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা দশ পূর্ণ করা হইতেছে। কিন্তু আসল গোলযোগ যে অনেক পূর্ব্বেই আরম্ভ হইয়াছে এ কথা কেহই তলাইয়া দেখিতেছেন না। সুরাটের বিপ্লবের কারণ যদি কেহ জানিতে চাহেন তবে তাহার কয়েক মাস পূর্ব্বের ইতিহাস অনুসন্ধান করিতে হইবে। যে দিন দেশের মধ্যে চরমপন্থী এবং ধীরপন্থী নামক দুই দলের উদ্ভব হইল সেই দিন হইতেই গোলমালের সূত্রপাত হইয়াছে। এই কথা শুনিয়াই অনেকে হয়ত বলিয়া উঠিবেন যে দুই দল থাকায় ক্ষতি কি? বিলাতে কত দল আছে, আমেরিকায় কত দল আছে—রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দলাদলি, মতভেদ এবং আদর্শ লইয়া মতান্তর থাকাই বরং জীবনের লক্ষণ এবং তাহার অভাবই জড়তার পরিচয় দেয়। খুব সত্য কথা। কিন্তু আমাদিগের দুর্ভাগ্য এই যে ভারতবর্ষ বিলাত বা আমেরিকার মত নহে। তাহাদিগের পায়ে পরাধীনতার শৃঙ্খল পরান নাই। সহস্র বৎসরের দাসত্বের কালিমায় তাহাদিগের ললাট কলঙ্কিত হইয়া যায় নাই এবং সহস্র সহস্র স্বদেশদ্রোহীর নিঃশ্বাস-বায়ুতে তাহাদিগের দেশ অভিশপ্ত হইয়া ওঠে নাই। সে সকল দেশে প্রজাই দেশের রাজা। সেখানে দুগ্ধপোষ্য শিশু তাহার জননীর ক্রোড়ে দুগ্ধপান করিতে করিতেই শেখে, যে স্বদেশের কল্যাণের নিমিত্ত তাহাদিগের অদেয় কিছুই নাই, জন্মভূমির সেবা করিতে গেলে আগেই স্বার্থ-বুদ্ধির বিনাশ করা চাই। তাই সে সকল দেশে রাজনৈতিক ব্যাপারে মতান্তর হইলেও তাহার শ্রাদ্ধ বড় বেশী দূর গড়ায় না। কিন্তু আমাদিগের এই দুর্ভাগ্য দেশে মতান্তর হইলেই মনান্তর উপস্থিত হয় এবং এই মনান্তর শেষে এমন মর্ম্মান্তিক হইয়া উঠে যে তাহা হইতে নানা অনর্থের সূত্রপাত হয়।

তাই আমরা দলাদলির সূচনা হইতেই দেশের সর্ব্বসাধারণকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিয়া বলিয়াছিলাম, যে একবার যখন আমরা মাতৃমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছি তখন আর ওই দলাদলির সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে ফিরিয়া যাইব না—যে পাপে এই পুণ্য ভূমি পিশাচের লীলাভূমিতে পরিণত হইয়াছে পুনরায় সে পাপের অনুষ্ঠান করিব না। রাখী-বন্ধনের পুণ্যবাসরে মহামিলনের মণ্ডপতলে দণ্ডায়মান হইয়া আমরাই এক দিন প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিয়াছিলাম :—

'ভাই ভাই একঠাঁই, ভেদ নাই ভেদ নাই।'

কিন্তু বৎসর ঘুরিয়া যাইতে না যাইতে কি দেখিলাম? দেখিলাম, তপতি নদীর তীরে সৌরাষ্ট্র নগরীতে জাতীয় মহাসমিতির যে মণ্ডপ নির্ম্মিত হইয়াছে তাহার নিম্নে মাতৃপূজকেরা ভ্রাতৃভাবে মিলিতে পারিতেছেন না—সেখানে বিদ্বেষের আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে। সুরাটে যে শোচনীয় ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে তাহার মূল অনেক দূরে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে—তাহার সহিত কার্য্যকারণ সম্বন্ধ জড়িত হইয়া রহিয়াছে। একদিনে এ ঘটনা অনুষ্ঠিত হয় নাই। এতদিন ধরিয়া যে অগ্নি ধূমায়মান অবস্থায় ছিল সুরাটে তাহাই ইন্ধন সাহায্যে প্রজ্বলিত হইয়া জাতীয় মহাসমিতিকে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিয়াছে!

দেশে দুই দলের সৃষ্টি হইয়া যদি উভয়ে একত্রে বা বিচ্ছিন্ন ভাবে দেশের সেবায় মনোনিবেশ করিতেন তবে তাহাতে ইষ্ট বই অনিষ্ট হইত না। দুই দল কেন, আজ যদি দেশের মধ্যে দুই শত দলের সৃষ্টি হয় এবং সকলেই নীচতা পরিত্যাগ করিয়া কেহ কাহাকেও গালাগালি না দিয়া দেশের কার্য্যে লিপ্ত হইয়া যান এবং এইরূপে কেহ স্বদেশী প্রচারে, কেহ জাতীয় শিক্ষায়, কেহ সমাজ সংস্কারে, কেহ শিল্পবাণিজ্যে, কেহ স্ত্রীশিক্ষায় এবং কেহ বা ব্যায়ামাদি লইয়া স্বদেশের মঙ্গল-কার্য্যে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া যান তবে বলিব, যে এইবার আমার দুঃখিনী জননীর কাল-নিশার অবসান হইয়াছে! কাজ লইয়া

যদি দেশে দলের সৃষ্টি হইত তবে আর দুঃখ কি ছিল—ভারতবর্ষ ত তাহা হইলে মুক্তি-পথের যাত্রী হইয়া দাঁড়াইত। কিন্তু আমাদিগের এই হতভাগ্য দেশে দল হইল কাজ করিবার জন্য নহে, কার্য্যে বাধা জন্মাইবার জন্য। তুমিও যাহা চাও আমিও তাহাই চাই—তোমারও যাহা উপায় আমারও তাহাই উপায়, কিন্তু হইলে কি হয়, আমরা একত্র হইয়া থাকিতে পারিলাম কই? কাজ করিবার জন্য দেশে দল হইল না, কিন্তু মত এবং আদর্শ জাহির করিবার জন্য এদেশে ঘরে ঘরে দলের সৃষ্টি হইয়া গেল। আজ যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন যে কে এই শুভদিনে জাতীয় জাগরণের পুণ্য প্রভাতে দেশের মধ্যে এমন দারুণ হলাহল উদ্গীরণ করিল, তবে মুক্তকণ্ঠে বলিব যে, যে ঐ 'নরম' ও 'গরম' নামে দুই দলের সৃষ্টি করিয়াছে সে-ই আমাদিগের এই সর্ব্বনাশের সূত্রপাত করিয়া দিয়াছে। আজ সকলে হায় হায় করিয়া বলিতেছে যে সুরাটেই আমরা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলাম; কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি, আমরা কি তাহার বহুপূর্ব্বেই বিচ্ছিন্ন হইয়া যাই নাই? যে দিন হইতে দেশে চরমপন্থীদিগের এই ধারণা হইল যে তাঁহারা এক নূতন দল গঠন করিবেন, তাঁহারাই মুক্তির সুসমাচার পাইয়াছেন, দেশের অপর সেবকগণ কোনও কার্য্যের নহেন, তাঁহাদিগকে নেতৃপদ হইতে অবসর গ্রহণ করাইতে হইবে, সেই দিন হইতেই গোলযোগের সূত্রপাত আরম্ভ হইল। দেশের লোক বুঝিয়াই হউক আর না বুঝিয়াই হউক তাঁহাদিগের কথায় সায় দিতে পারিল না। সেই দিন হইতে আজ প্রায় দুই বৎসর কাল পর্য্যন্ত চরমপন্থীগণ সংবাদপত্রে এবং এবং সভা সমিতিতে অজস্র অমূলক সংবাদ প্রচার করিয়া নেতৃবৃন্দকে অপদস্থ করিবার জন্য বিধিমতে চেষ্টা করিতেছেন এবং এই কার্য্যে একেবারেই যে নিষ্ফল হইয়াছেন এমন কথা বলিতে পারি না। * * * ইহাও কি বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় যে আজীবন ধরিয়া যে সকল লোক দেশের সেবা করিয়া আসিলেন আজ জীবনের সন্ধ্যাকালে তাঁহারাই কি তাঁহাদের জন্মভূমির বক্ষে ছুরিকাঘাত করিয়া চলিয়া যাইবেন? দেশের জন্য তিল তিল করিয়া যাঁহারা আত্মদান করিয়া আসিয়াছেন আজ জন্মভূমির বক্ষে চিহ্ন রাখিয়া যাইবার কালে তাঁহারাই কি দেশদ্রোহিতার পরিচয় দিবেন? তাঁহারা বলেন, এতদিন ধরিয়া দেশের সেবা করিলাম—কত দুর্দ্দিনের মধ্যে কত ঝড় ঝঞ্ঝাবাত মাথায় করিয়া জননীর সেবায় কাটাইয়া দিলাম, তাহাতেও যদি দেশের লোক আমাদিগের পরিচয় না পাইয়া থাকেন তবে আর সহস্র মিথ্যার প্রতিবাদ করিয়া বুঝাইতে চাহি না যে আমরা দেশদ্রোহী নহি; দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে, আমরা আমাদিগের কর্ত্তব্য করিয়া যাই, ফলাফল চিন্তা করি নাই, এখনও করিব না। একপক্ষ এতদিন ধরিয়া ধীরভাবে এই সকল মিথ্যা সংবাদকে উপেক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন, এবং অন্যপক্ষ অসীম অধ্যবসায় সহকারে সর্ব্ব সাধারণের নিকট তাঁহাদিগকে অপদস্থ করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। এই সকল আন্দোলনে এতদিন যে কোনও ফল হয় নাই তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু তথাপি দেশের অধিকাংশ লোক পুরাতন নেতাদিগের নেতৃত্ব অস্বীকার করেন নাই। মিঃ তিলক এক স্থানে স্পষ্টই বলিয়াছেন:—"We are hopelessly in the minority." 'সংখ্যায় আমরা এত কম যে আমরা যে কিছু করিতে পারিব এমন আশা নাই।' এই সংখ্যার অল্পতা বশতঃ পাছে তাঁহারা সর্ব্বত্র পরাস্ত হন এই আশঙ্কায়, আমরা আজ কয়েক মাস হইতে দেখিতেছি যে, প্রত্যেক বড় বড় সভায় কলহকারীরা উপস্থিত হইয়া বিদ্রূপ, গালাগালি এবং নানারূপ গোলমাল দ্বারা সভার কার্য্যের ব্যাঘাত উৎপাদন করিতেছে এবং কোথাও বা সভা লণ্ডভণ্ড করিয়া দিতেছে। নাগপুরে ইঁহারা এতদূর বাড়াবাড়ি করিয়া তুলিয়াছিলেন যে, অবশেষে সেখানে কংগ্রেসের অধিবেশন হওয়া একরূপ অসম্ভব বলিয়া বিবেচিত হইল এবং কংগ্রেসকে সুরাটে স্থানান্তরিত করিতে হইল। সেখাও তাঁহাদেরই চেষ্টায় কংগ্রেস পণ্ড হইয়া গেল। কিন্তু এজন্য তাঁহারা একদিনও অনুতপ্ত হন নাই; সমুদয় ভারতবর্ষের লোক যে ঘটনাতে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে, এই সকল চরমপন্থী তাহাতে নিতান্ত উল্লাসিত হইয়া উঠিয়াছেন।" (ক্রমশঃ)

শ্রীমতী জাহাঙ্গীর।

সুরাটে জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশন পণ্ড হইয়া গেলেও সমাজসংস্কার-সমিতি, টেম্পারেন্স কনফারেন্স প্রভৃতি অন্যান্য সভাসমিতির অধিবেশন নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। শ্রীমতী লেডী জাহাঙ্গীর "ভারত-মহিলা পরিষদের" অধিবেশনে সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভারত-মহিলার অধিকাংশ পাঠিকার নিকট ইনি সম্পূর্ণ অপরিচিতা। এ জন্য আমরা তাঁহার কিঞ্চিৎ পরিচয় নিম্নে প্রদান করিতেছি।

বর্ত্তমান সময়ে সমাজ-সংস্কার, সভ্যতা, বাণিজ্য-বুদ্ধি ও ধন-সম্পদে পার্শী-সম্প্রদায় ভারতবর্ষে সর্ব্বাগ্রগণ্য। সমগ্র ভারতের পরম বরেণ্য শ্রীযুক্ত দাদাভাই নৌরোজী এই পার্শী-কুলোদ্ভব। শ্রীযুক্ত ফেরোজসা মেটা ও ওয়াচা প্রভৃতি সুবিখ্যাত দেশ-নায়কগণ এই পার্শী-সম্প্রদায়ভুক্ত। স্ত্রীশিক্ষা এবং নারীজাতির উন্নতি বিষয়েও পার্শীগণ ভারতের অন্যান্য জাতি ও সম্প্রদায় অপেক্ষা বহু অগ্রবর্ত্তী। জাহাঙ্গীর-পরিবার এই পার্শী-সম্প্রদায়ের মধ্যে একটী শ্রেষ্ঠ পরিবার। এই পরিবারের বর্ত্তমান প্রধান পুরুষের নাম শ্রীযুক্ত সার জাহাঙ্গীর কাওয়াসজি জাহাঙ্গীর, কে, টি। শ্রীমতী জাহাঙ্গীর এই সার কাওয়াসজি জাহাঙ্গীর মহোদয়ের সুশিক্ষিতা পত্নী।

জাহাঙ্গীর-পরিবারের যে ব্যক্তি পার্শীগণের মাতৃভূমি নাওসেরী হইতে প্রথম ভারতবর্ষে আগমন করেন তাঁহার নাম হিরজি জাহাঙ্গীর। হিরজি জাহাঙ্গীরের বাণিজ্য-বুদ্ধি অসাধারণ ছিল। যে সকল সাহসী ব্যক্তি চীন ও ভারতবর্ষের মধ্যে প্রথম বাণিজ্য-সম্বন্ধ স্থাপন করেন হিরজি জাহাঙ্গীর তাঁহাদের অন্যতম। চীন দেশ হইতে প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিয়া তিনি ভারতে প্রত্যাগমন করেন এবং ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ব্যাঙ্কার অর্থাৎ টাকা সরবাহকারের কার্য্য গ্রহণ করেন। সে সময়ে রেল ছিল না, টেলিগ্রাফ ছিল না, গরুর গাড়ীতে টাকা চালান দিতে হইত। হিরজি আপনার বিষয়বুদ্ধি বলে এমন ক্ষিপ্রকারিতার সহিত টাকা সংগ্রহ করিয়া দিতেন যে কোম্পানির কর্ত্তৃপক্ষীয় লোকেরা এ জন্য তাঁহাকে রেডি-মনি (Ready Money) "নগদ-টাকা" এই উপনাম দিয়াছিলেন। এখন পর্য্যন্ত জাহাঙ্গীর-পরিবার "রেডি-মনি" পরিবার নামে পরিচিত হইয়া থাকেন।

এই জাহাঙ্গীর-পরিবারের কাওয়াসজী জাহাঙ্গীর একজন সুবিখ্যাত দাতা ছিলেন। বোম্বাইয়ের চক্ষু-চিকিৎসালয়, অতিথি-নিবাস (Strangers' Home), সুবিখ্যাত এলফিনষ্টোন কলেজ-গৃহ, বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট-গৃহ; পুণার সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ-গৃহ; সুরাটের সিভিল হাঁসপাতাল এবং সিন্ধু হায়দ্রাবাদের বাতুলাশ্রম; লণ্ডনের রিজেন্ট পার্কের ফোয়ারা প্রভৃতি বহু ব্যয়সাধ্য পুর্ত্তকার্য্য ইঁহার রাজোচিত দানে নির্ম্মিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সার জাহাঙ্গীর মহোদয় ইঁহারই দত্তক পুত্র। সার জাহাঙ্গীর দাতা, অসাধারণ বিষয়বুদ্ধি-সম্পন্ন ও সুশিক্ষিত পুরুষ। ইনি সস্ত্রীক কয়েক বার ইংলণ্ড ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন। ইংলণ্ডের স্বনামধন্য রাজমন্ত্রী স্বর্গীয় গ্লাডষ্টোন মহোদয় জীবনের শেষ ভাগে প্রায় কাহারও নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতেন না, কিন্তু সার জাহাঙ্গীর ও লেডী জাহাঙ্গীরের অমায়িকতা ও সদ্গুণে মুগ্ধ হইয়া সপত্নীক গ্লাডষ্টোন তাঁহাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

সার জাহাঙ্গীর বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো (সভ্য), বোম্বাই সহরের জষ্টিস্ অব দি পিস্, মিল-ওনারদিগের (কলওয়ালাদিগের) সভার সভ্য এবং কাওয়াসজি বালিকা-বিদ্যালয়ের সভাপতি।

লেডি জাহাঙ্গীর উপযুক্ত স্বামীর উপযুক্ত সহধর্ম্মিণী। বোম্বাই-সমাজে তিনি একজন নেত্রীস্থানীয়া মহিলা। সকল প্রকার লোকহিতকর কার্য্যে তিনি সর্ব্বদাই অগ্রণী এবং পার্শী সম্প্রদায়ের মধ্যে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে তিনি বিশেষ যত্নবতী।

বোম্বাইয়ের এই নেত্রীস্থানীয়া মহিলার নেতৃত্বাধীনে এ বৎসর সুরাটে "ভারত-মহিলা পরিষদের" কার্য্য সুচারুরূপেই সম্পন্ন হইয়াছে।

শিল্প-কর্ম্ম নিরতা—কাবুলী-মহিলা।

সূচি-শিল্প।

সূচি-শিল্প নারীজাতির অত্যন্ত প্রিয় জিনিষ। ইংরেজীতে একটা কথা আছে,—It is the girl's disgust, the woman's consolation অর্থাৎ "ইহা বালিকাদিগের বিরক্তি এবং বয়স্কাদিগের সান্ত্বনাস্বরূপ।" শেলাই শিক্ষার প্রথম অবস্থায় ইহা বালিকাদিগের নিকট নিতান্ত বিরক্তি-উৎপাদক হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু অভ্যস্ত হইয়া গেলে ইহা বাস্তবিকই পরম প্রীতিপ্রদ কার্য্যে পরিণত হয়।

বিষয়টী অতি বিস্তৃত। এক প্রবন্ধে এ বিষয়ে যথোচিত আলোচনা সম্ভবপর নহে। এই প্রবন্ধে সংক্ষেপে সূচি-শিল্পের সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

সোজা শেলাই পৃথিবীতে যে কতকাল হইতে প্রচলিত হইয়াছে তাহা কেহই নিশ্চিত রূপে বলিতে পারে না। অতি প্রাচীন গ্রন্থাদিতে আমরা দেখিতে পাই, যে প্রাচীনতম কালেও পুরুষ এবং নারী উভয়েই সীবনকার্য্যে বেশ দক্ষতা লাভ করিয়াছিল। মিশর দেশীয় লোকেরা এ বিষয়ে অতি প্রাচীন কালেই বিশেষ পারদর্শিতা দেখাইয়াছিল।

বোধ হয়, মানব জাতির আদিম অবস্থায় গাত্রাবরণের জন্য খণ্ড খণ্ড চর্ম্মকে একত্র জুড়িবার চেষ্টা হইতে শেলাই কার্য্যের প্রথম উৎপত্তি। শীতপ্রধান দেশেই শেলাই শীঘ্র শীঘ্র উন্নতি লাভ করিয়াছিল। কারণ, দারুণ শীতের প্রকোপ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য মানুষ শীতপ্রধান দেশে এক খানা চর্ম্মের পরিবর্ত্তে শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অংশের জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র চর্ম্ম ব্যবহার করিত এবং সেই গুলিকে স্থায়ীভাবে একত্রিত রাখিবার জন্য চেষ্টা করিত। চর্ম্মের ধারে কোনরূপে তীক্ষ্ণ পদার্থ দ্বারা ছিদ্র করিয়া সেই ছিদ্রগুলিতে সূক্ষ্ম দড়ি প্রবেশ করাইয়া প্রথম প্রথম শেলাই কার্য্য সম্পাদিত হইত। কখন কখন এই দড়িগুলি রঞ্জিত করিয়া শেলাই করা হইত এবং আদিম অবস্থায় ঐরূপ রঞ্জিত দড়ির শেলাই অত্যন্ত সমাদর লাভ করিত। ক্রমে ক্রমে মানব জাতির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শেলাইও উন্নতি লাভ করিয়াছে।

সোজা শেলাইএর উপকরণ যৎসামান্য; অতি দরিদ্রের পক্ষেও তাহা আয়ত্বাধীন। কাপড় ছাড়া একটী সূচ, এক খানা কাঁচি, একটু সূতা হইলেই সোজা শেলাইএর যাবতীয় উপকরণ সংগৃহীত হইল।

সূচ অতি প্রাচীন কাল হইতেই ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। প্রথমতঃ মাছের কাঁটা, হাড়, কাষ্ঠ এবং হাতীর দাঁত হইতে সূচ নির্ম্মিত হইত। এই সকল প্রাথমিক সূচে কোন ছিদ্র থাকিত না; এই সকল ছিদ্রবিহীন তীক্ষ্ণ পদার্থের দ্বারা দড়ি বা সূতা কোন প্রকারে ঠেলিয়া চর্ম্মে প্রবেশ করানই সূচের কার্য্য ছিল। অস্থিনির্ম্মিত সূচ এখনও কোন কোন অসভ্য জাতির মধ্যে প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রোঞ্জধাতু আবিষ্কৃত হইবার পর সভ্যদেশ সমূহে ধাতুনির্ম্মিত সূচের প্রচলন হইয়াছে। খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে সর্ব্ব প্রথম লৌহনির্ম্মিত সূচ ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হয়। জার্ম্মেণীর অন্তর্গত নুরেম্বর্গ সহরে প্রথম লৌহ-সূচি প্রস্তুত হইয়াছিল। বর্ত্তমান্ সময়ে ইংলণ্ডের অন্তর্গত রেডিচ সহরে সর্ব্বোৎকৃষ্ট সূচ প্রস্তুত হইয়া থাকে। এক সময়ে এই সকল সূচ ধনীগৃহের লোভনীয় বস্তু ছিল, এখন অতি দরিদ্র ব্যক্তিও পয়সায় ৪।৫ টা করিয়া এই সূক্ষ্ম ও উৎকৃষ্ট সূচ কিনিতে পারে, এবং শিশুরাও তাহা ব্যবহার করিতে পারে।

মানুষের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে হস্তই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কার্য্যক্ষম। সূচিকর্ম্ম অভ্যাসের দ্বারা হস্ত যে স্থিরতা, নিপুণতা এবং শক্তি লাভ করে সহজেই তাহা কার্য্যান্তরে নিয়োগ করা যাইতে পারে। সূচিকর্ম্ম দ্বারা চক্ষুরও বিশেষ চালনা হয়; শুদ্ধভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিতে, বিভিন্ন আকৃতির পরস্পর তুলনা করিতে, সঠিক ভাবে সূচি চালনা করিতে, ভাঁজ করিয়া কাপড় কাটিতে এবং সুরুচিসঙ্গত রূপে শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত করিতে চক্ষুর শক্তি যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়, বুদ্ধিশক্তির পরিচালনা হয়, সুতরাং সূচিকর্ম্ম দ্বারা মানসিক শক্তি বিকাশেরও বিশেষ সাহায্য হয়।

স্থচি-শিল্প বিশেষ ভাবে গৃহকর্ম্মেরই অঙ্গ। বিবেচনা পূর্ব্বক শিক্ষা দিলে ইহাতে মিতব্যয়িতার ভাব, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, শৃঙ্খলা ও পরিশ্রম-শক্তি এবং সুরুচিপ্রিয়তা বর্দ্ধিত হয়।

স্থচি-শিল্প এমন ভাবে শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে, যাহাতে বালিকাগণের পর্য্যবেক্ষণ ও সৌন্দর্য্য-বোধ শক্তি বিকাশ লাভ করে এবং যাহাতে তাহারা বুঝিতে পারে, যে ভিতর ও বাহিরে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে পরীক্ষা দ্বারা যাহা উৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হয় শুধু তাহাই প্রশংসা লাভের যোগ্য। এই প্রকারে স্থচিশিল্প শিক্ষার ভিতর দিয়া শিক্ষয়িত্রী বালিকাদিগের অন্তরে সুচারুরূপে কাজ করিবার যে শক্তি বিকশিত করেন, ভবিষ্যৎ জীবনে তাহার অন্যান্য কার্য্যেও তাহা প্রয়োগ করিতে অভ্যস্ত হয়।

দুঃখের বিষয় এদেশে বিদ্যালয়াদিতে সাধারণতঃ যে শেলাই শিক্ষা দেওয়া হয় তাহাতে এ সকল বিষয়ে কোন দৃষ্টিই দেওয়া হয় না। কাপড় কাটিবার সময় তাহাদিগকে কোন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণানুযায়ী কাটিতে শিক্ষা দেওয়া হয় না, সুতরাং বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিবার পর একটী পোষাক প্রস্তুত করিতে হইলে তাহাদিগকে গলদঘর্ম্ম হইতে হয়।

প্রথমে মোটামুটী একরূপ শিক্ষা দিয়া শেষে শৃঙ্খলা পূর্ব্বক শিক্ষা দেওয়া হইবে, এই প্রণালী নিতান্ত ভ্রমপূর্ণ। প্রথম হইতেই বালিকাদিগকে শিল্পের প্রত্যেক অংশ বিশুদ্ধ প্রণালীতে শেলাই করিতে শিক্ষা দিতে হইবে। অনেকগুলি মেয়েকে একত্র শিক্ষা দিতে হইলে এক একটী বালিকার প্রতি স্বতন্ত্র ভাবে মনোযোগ দেওয়া শিক্ষয়িত্রীর পক্ষে সম্ভব হয় না। এক জনের প্রতি অধিক মনোযোগ দিলে শ্রেণীর অন্যান্য বালিকাদিগের ক্ষতি হয়। এই জন্য যে প্রণালীতে ড্রইং ও হস্তলিপি-লেখন শিক্ষা দেওয়া হয়, শেলাইও ঠিক সেই প্রণালীতে শিক্ষা দিতে হইবে। অর্থাৎ বোর্ডে (ব্ল্যাক বোর্ড) খড়ি দিয়া আঁকিয়া সকলকে এক সঙ্গে শিক্ষা দিতে হইবে। প্রতি দিন শেলাই-শ্রেণীতে অন্ততঃ এক ঘণ্টার কম সময় শেলাই শিক্ষা দেওয়া উচিত নয়। এই এক ঘণ্টার ১৫ মিনিট সময় বালিকাদিগকে কাজ বণ্টন করিয়া দেওয়া ও বুঝাইয়া দেওয়া এবং সূচে সূতা পরান ইত্যাদিতে ব্যয় হইতে পারে। অবশিষ্ট তিন কোয়ার্টার শেলাই করিতে পারা যায়। শেলাইএর সময় বালিকারা যাহাতে প্রথম হইতেই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে কাজ করিতে শিক্ষা করে সে বিষয়ে শিক্ষয়িত্রী বিশেষ মনোযোগী হইবেন। সোজা শেলাই সম্বন্ধে মোটামুটী এই কয়টী কথা বলিয়া সূচিশিল্পের অন্যান্য বিভাগ সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে।

উল ও সেম্পলের কাজ (Sampler work) এবং বুনন।

উলের কাজ ও সেম্পলের কাজ যদিও প্রকৃত পক্ষে একই শ্রেণীর কাজ তথাপি পূর্ব্বে এই দুইটিকে সূচি-শিল্পের দুইটী সম্পূর্ণ পৃথক শাখা বলিয়া গণ্য করা হইত। ডবল সূতাযুক্ত অথবা যোড়া কেনবিসের (canvas উপর অপেক্ষাকৃত মোটা উল সূতা (বার্লিন উল) দ্বারা উলের কাজ হইত, এবং এক সূতা বিশিষ্ট অথবা সূক্ষ্ম কেনবিসের উপর পাকানো সূতা অথবা রূপার তার দিয়া সেম্পলের কাজ হইত।

পূর্ব্বে সেম্পলের কাজের খুব আদর ছিল। যত রকম শেলাই এই কাজে হইতে পারে পূর্ব্বে এক একটী সেম্পলে তাহাই অতি দক্ষতার সহিত দেখান হইত। কিন্তু আজ কাল সস্তা প্যাটার্ণ-পুস্তকের জ্বালায় সেম্পলের কাজের আদর কমিয়া গিয়াছে। এখনকার সেম্পলের কাজ শুধু কতকগুলি উলের কাজের প্যাটার্ণ। তার রং বিশ্রী, কাজ তদধিক জঘন্য।

যে সকল স্থান বা পদার্থের স্মৃতি স্থায়ীভাবে রক্ষা করা প্রয়োজন বোধ হইত, সেই সকলের আদর্শ প্রস্তুত করাই উলের কাজের প্রথম উদ্দেশ্য ছিল। তৎপর গৃহের সাজ-সরঞ্জামের স্থায়ী ও সুন্দর আবরণ প্রস্তুতের জন্য উলের কাজের বিশেষ আদর হইয়াছিল। এমন এক সময় ছিল যখন সম্ভ্রান্ত মহিলাগণ গৃহের সমস্ত সাজ-সরঞ্জামের আবরণ ও পর্দা নিজ হস্তে প্রস্তুত করা নিতান্ত গৌরবের বিষয় মনে করিতেন।

বুনন সূচিকর্ম্ম ও লেসের (lace) কাজ অপেক্ষা

অনেক আধুনিক। পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে ইংলণ্ডের ইতিহাসে বুননের কোন উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু এখন প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক সুগৃহিণীর পক্ষে বুননে পারদর্শিতা অবশ্য-লভনীয় বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। বাস্তবিকই ইহা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় শিল্প। মানবদেহের পক্ষে আবশ্যকীয় এমন কোন পোষাক পরিচ্ছদ নাই যাহা বুনন দ্বারা প্রস্তুত করা যাইতে পারে না।

ক্রোসে শেলাই বুননেরই এক জাতীয়। কেবল প্রভেদ এই যে, বুননে ঘরগুলি এক বা ততোধিক কাঠিতে সাজান থাকে, অপর একটী কাঠি দ্বারা তাহা হইতে নূতন ঘর বুনিয়া পূর্ব্বকার ঘরগুলি ফেলিয়া দিতে হয়। ক্রোসে শেলাইয়ে ঘর তৈয়ারি থাকে না, একটী মাত্র কাঠি দ্বারাই একটী একটী করিয়া ঘর তুলিয়া তাহা বুনিয়া ফেলিয়া দিতে হয়।

সোজা শেলাই শিক্ষা দেওয়া সম্বন্ধে পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে, বুনন ও ক্রোসে শেলাই সম্বন্ধেও সেই সকল কথাই প্রয়োজ্য। বুনন ও ক্রোসে এক সঙ্গেই শিক্ষা দেওয়া উচিত।

এম্ব্রয়ডারি।

সূচের দ্বারা উল, রেশম অথবা কোন প্রকার বস্ত্রের উপর ফুল, ফল অথবা জীব জন্তুর আকৃতি ইত্যাদি প্রস্তুত করার ইংরাজি নাম এম্ব্রয়ডারি। ইহা অতি প্রাচীন শিল্প। চিত্রবিদ্যা প্রচলিত হইবার পূর্ব্বাবধি এম্ব্রয়ডারি প্রচলিত হইয়াছে। কোন দৃশ্য বা আকৃতি স্থায়ী ভাবে রক্ষা করিতে হইলে তাহা কেনবিসের উপরে সূচী-সাহায্যে গড়িয়া লোতাই প্রাথমিক রীতি ছিল; চিত্রিত করিবার প্রথা তাহার পরে প্রচলিত হইয়াছে। অতি প্রাচীন কাল হইতে রাজরাণীগণ পর্য্যন্ত ধর্ম্মযাজকের পোষাক এবং ধর্ম্মমন্দিরস্থ বেদীর আবরণ ও অন্যান্য বস্ত্রাদিতে ফুল তোলা ও নানা প্রকার আকৃতি প্রস্তুত করা পুণ্যকর্ম্ম মনে করিতেন। বীরগণের বীরত্ব-কাহিনী তাঁহারা এই প্রকারে এম্ব্রয়-ডারির সাহায্যে অঙ্কিত করিতেন। প্রাচীন মিশর দেশের অধিবাসীগণ অতি প্রাচীনতম কাল হইতে এই শিল্পে বিশেষ দক্ষতা লাভ করিয়াছিল। প্রায় প্রত্যেক জিনিষ তাঁহারা এম্ব্রয়ডারির সাহায্যে সুশোভিত করিত।

পুরাতন বাইবেলে লিখিত আছে যে, যে সকল বজরা দেশান্তরে প্রেরিত হইত তাহাদের পাল নানারূপ এম্ব্রয়ডারি কারুকার্য্যে শোভিত থাকিত। বীরবর সিসেরার বিজয় উপলক্ষে আনন্দোৎসবের সময় তিনি যে শিরস্ত্রাণ পরিধান করিয়াছিলেন তাহার উভয় দিকে একই প্রকার এম্ব্রয়ডারি-চিত্র অঙ্কিত ছিল বলিয়া লিখিত আছে। এই প্রকার কঠিন এম্ব্রয়ডারি কার্য্যে অত্যন্ত দক্ষতা, বুদ্ধিকৌশল ও ধৈর্য্যের প্রয়োজন, তাহা সকলেই জানেন। প্রাচীন কালে কেবল পূর্ব্বদেশের (এশিয়া ও আফ্রিকা) লোকেরাই এইরূপ কঠিন এম্ব্রয়ডারি কার্য্য করিতে পারিত।

সুপ্রসিদ্ধ বাবিলন নগরের নারীগণের বিচিত্র এম্ব্রয়ডারি কার্য্যের জন্য প্রাচীন কালে ঐ নগর বিখ্যাত ছিল। ভারতবর্ষের কিংখাপ ও অন্যান্য এম্ব্রয়ডারি কার্য্য অতি প্রাচীন কাল হইতেই সর্ব্বত্র সুখ্যাতি লাভ করিয়া আসিতেছে।

প্রাচীন কালে কোন কোন স্থানে পুণ্য লাভের উদ্দেশ্যে, কোথাও বা সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা-প্রণোদিত হইয়া লোকে এম্ব্রয়ডারি কাজ করিত। "অশেষ দোষের আকর আলস্য" হইতে রক্ষা করিবার জন্য এক দল নারীকে এম্ব্রয়ডারি কাজ দেওয়া হইয়াছিল, একখানি প্রাচীন গ্রন্থে এরূপ বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়।

বর্ত্তমান সময়ে সকল দেশেই স্বর্ণ রৌপ্য হইতে আরম্ভ করিয়া সজারু কাঁটার পর্য্যন্ত এম্ব্রয়ডারি কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমান সময়ে সভ্য জগতে চীন ও জাপান এম্ব্রয়ডারিতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে। কল্পনার মৌলিকতা, বর্ণের বিন্যাস এবং সূচি-কার্য্যের নৈপুণ্যে এই দুই দেশের এম্ব্রয়ডারি অতুলনীয়।

এম্ব্রয়ডারি কার্য্য সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। (১) মূল্যবান ধাতু-তন্তু ও রঞ্জিত সূত্রাদির এম্ব্রয়ডারি। (২) চিকন অর্থাৎ সাদা এম্ব্রয়ডারি। ফ্রান্স, সুইজার্লণ্ড, আয়র্লণ্ড প্রভৃতি দেশ এই শেষোক্ত শ্রেণীর

কার্য্যের জন্য বিখ্যাত। ভারতবর্ষে চিকনের কাজ যাহা হয় তাহা নিতান্ত নিকৃষ্ট। সম্প্রতি মান্দ্রাজে এই কার্য্যের উন্নতির চেষ্টা হইতেছে।

এম্ব্রয়ডারি কার্য্যে মনের একাগ্রতা, কোমলতা ও সুরুচিপ্রিয়তা এবং সৌন্দর্য্যানুরাগ বর্দ্ধিত হয়। কিন্তু কতকগুলি জঘন্য প্যাটার্ণ অনুকরণ করিলে এবং স্বাভাবিক বর্ণের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া শুধু কতকগুলি জমকাল রং ব্যবহার করিলে এই সকল উপকার লাভের কোন সম্ভাবনা নাই। এদেশের বালিকা ও মহিলাগণের এম্ব্রয়ডারি কার্য্যে বিশেষ অনুরাগ দেখা যায়। উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রী দ্বারা এই বিষয় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিলে বিশেষ উপকারের সম্ভাবনা।

লেস্।

লেস্ তিন প্রকারে প্রস্তুত হয়। (১) সূচের সাহায্যে, (২) ববিন অথবা আলপিনের সাহায্যে, (৩) যন্ত্র সাহায্যে। এই শিল্পটী এতই সুন্দর যে প্রাচীন কালে ইহা স্বর্গ হইতে আনীত বলিয়া লোকে বিশ্বাস করিত। কথিত আছে, অত্যন্ত দরিদ্রতার জন্য একটী তরুণীর বিবাহ হইতেছিল না। সেই তরুণী ক্রমাগত দেবতার নিকট প্রার্থনা করিতে করিতে এক দেবী প্রসন্ন হইয়া তাহাকে লেস্ প্রস্তুতের যাবতীয় উপকরণ দিয়া যান এবং নিজে সযত্নে তাহাকে লেস্ প্রস্তুত করিতে শিক্ষা দেন। এই লেস্ বিক্রয়লব্ধ অর্থ দ্বারা সেই তরুণী শীঘ্রই ধনশালিনী হইয়া উঠে এবং অপরকেও লেস্ প্রস্তুত করিতে শিক্ষা দেয়। সে যাহা হউক, লেস্ প্রস্তুত যে প্রথমে কাহা দ্বারা আবিষ্কৃত হইয়াছিল তাহার কোন ঐতিহাসিক বিবরণ পাওয়া যায় না। ইটালীতেই বোধ হয় সর্ব্ব প্রথম লেস প্রস্তুত ও ব্যবহৃত হইয়াছিল। পর্ত্তুগীজগণ যখন ভারতের পশ্চিম উপকূলে আগমন করে তখন এদেশবাসীকে তাহারা এই শিল্প শিক্ষা দিয়াছিল এখনও ঐ অঞ্চলে কুইলন ও তাহার চতুপার্শ্বে লেস্ প্রস্তুত হইয়া থাকে। কিন্তু এই সকল লেস উৎকৃষ্ট নহে। ৬০।৬৫ বৎসর পূর্ব্বে ইহা একবার লুপ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছিল। মিসেস মল্ট নাম্নী জনৈক মহিলা মাল্টা হইতে লেস প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষা করিয়া ত্রিবাঙ্কুরে ইহার প্রচলন করেন। ভারতবর্ষের নানা স্থানে মিসেস মল্টের কন্যাগণের বিবাহ হয় এবং তাহাদের দ্বারা নানা স্থানে লেসের কার্য্য বিস্তৃত হয়। কিন্তু ত্রিবাঙ্কুর ব্যতীত আর কোথাও এই শিল্পের তেমন উন্নতি হয় নাই। ভারতবর্ষে খৃষ্টান মিশনারীগণ আপন সম্প্রদায়ভুক্ত বালিকাদিগকে নূতন নূতন শিল্প শিক্ষা দিবার জন্য যত্নশীল হওয়াতে এখন এদেশে ১০।১২টী লেস্-প্রস্তুত শিক্ষা দিবার স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

প্রাচীন কাল হইতে লেস্ নানা রকমে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। ইউরোপে মৃত ব্যক্তির আবরণ প্রস্তুত কার্য্যে ইহা পূর্ব্বে অত্যন্ত অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হইত। ডেন্মার্ক দেশে সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্ লেস্ এই উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হইত।

রাজা মহারাজা এবং তাঁহাদের মহিষীগণের ও ধর্ম্মযাজকগণের পোষাক, পাখা, ছাতা এবং মহিলাগণের সর্ব্ব প্রকার পরিচ্ছদে এখন লেস্ ব্যবহৃত হয়। পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই এখন লেস্ প্রস্তুত হয়।

ইংলণ্ডের ১৮৫১ খৃষ্টাব্দের বিখ্যাত শিল্পপ্রদর্শনীতে ব্রুসেলের লেস্ প্রথম, মেকলিনের লেস্ দ্বিতীয়, ভ্যালেন্সিনের লেস্ তৃতীয়, হিলের লেস্ চতুর্থ এবং ফ্রান্সের আলেঙ্কন সহরের সুবিখ্যাত লেস্ পঞ্চম স্থান অধিকার করিয়াছিল।

ভারতবর্ষে এখন সহজ রকমের লেস্ যথেষ্ট প্রস্তুত হইয়া থাকে। ভারত-মহিলাগণের পক্ষে ববিন-লেস্ প্রস্তুত খুব উপযোগী। প্রস্তুত-প্রণালী অত্যন্ত সহজ, গৃহ পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরেও যাইতে হয় না। ৭।৮ বৎসরের বালিকারাও ইহা প্রস্তুত করিতে পারে।

লেস্ প্রস্তুত কার্য্যে পরিচ্ছন্নতা বিশেষ প্রয়োজনীয়। এই কার্য্য আরম্ভ করিলে বাধ্য হইয়াই ক্রমে পরিচ্ছন্নতা অভ্যস্ত হয়।

সকল শ্রেণীর সূচি-শিল্পই আমাদের মানসিক উন্নতি বিষয়ে সাহায্য করিয়া থাকে। সুতরাং সূচি-শিল্প যেমন আর্থিক সাহায্য করে তেমনি আমাদের চরিত্র গঠনেও বিশেষ সাহায্য করিয়া থাকে।*

* মান্দ্রাজের শিল্প বিষয়ক প্রদর্শনীতে কুমারী হেণ্ডার্সনের প্রদত্ত বক্তৃতার মর্ম্মানুবাদ। ভাঃ মঃ সঃ।

২১১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্ম মিশন প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত দ্বারা মুদ্রিত।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী।

ভারত-মহিলা

The woman's cause is man's ; they rise or sink
Together, dwarfed or God-like, bond or free ;
If she be small, slight-natured, miserable,
How shall men grow ?

Tennyson.

৩য় ভাগ । | ফাল্গুন, ১৩১৪ । | ১১শ সংখ্যা ।

সাহিত্যে মৌলিকতা ।

সকলের আগে একটা নূতন বস্তু দেখার গৌরবকে সাধারণতঃ মৌলিকতা বলে। "অমুক রাজা আজ নগরে বাহির হইয়াছিলেন এবং আমিই সর্ব্বপ্রথমে তাঁহাকে দেখিয়াছি"—বালক কিংবা সাধারণ লোকের মধ্যে ইহা একটী বিশেষ গৌরবের কথা; ইহা এক শ্রেণীর মৌলিকতা। এক জন লোক পর্ব্বতের গুহা খনন করিতে করিতে খনির গর্ভে নিহিত এক প্রকার মলিন মৃত্তিকামিশ্রিত ধাতু প্রাপ্ত হইলেন এবং তাহা পরিষ্কার করিলে পীতোজ্জ্বল ভাস্বর সুবর্ণ-কণায় পরিণত হইল; ইহা দ্বিতীয় শ্রেণীর মৌলিকতা। এক জন স্পেন দেশীয় নাবিক আটলাণ্টিক মহাসাগরে জাহাজ ভাসাইয়া দিয়া একটী অজ্ঞাতপূর্ব্ব মহাদেশ আবিষ্কার করিয়া বসিলেন; ইহা তৃতীয় শ্রেণীর মৌলিকতা। আর এক জন লোক খনি খুঁড়িতে খুঁড়িতে হঠাৎ এরূপ একটী বৃহৎ দীপ্তিমান পদার্থ প্রাপ্ত হইলেন যাহা রাজাধিরাজের কনক-মুকুটের শোভা বৃদ্ধির জন্য প্রেরিত হইল; তাহার নাম হইল কোহিনুর; ইহা চতুর্থ শ্রেণীর মৌলিকতা।

রাজা যদি মাথায় মুকুট পরিয়া গজবাজিসৈন্য লইয়া রাস্তায় বাহির হন, তবে তাঁহাকে চেনায় কোন গৌরব নাই। যে চক্ষু মেলিয়া তাঁহার দিকে তাকাইবে সেই তাঁহাকে রাজা বলিয়া চিনিতে পারিবে। কিন্তু তিনি যদি রাজপরিচ্ছদ খুলিয়া সাধারণ বেশে একাকী বাহির হন, তবে তাঁহাকে চিনিতে পারা একটা গৌরবের বিষয়, সন্দেহ নাই। শিক্ষিত সমাজে যাঁহারা এইরূপে সাহিত্য-জগতের সম্রাটদিগকে জন সাধারণের মধ্য হইতে চিনিয়া বাহির করিয়া লোকসমক্ষে প্রচার করেন তাঁহাদিগকে সমালোচক (critic) বলে; তাঁহারা প্রথম শ্রেণীর মৌলিকতাসম্পন্ন।

সমালোচকের আবিষ্ক্রিয়া বহুল পরিমাণে নিজের শিক্ষা সাধনার উপর নির্ভর করে। তবে এ কথাও ঠিক, যে শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই সমালোচক হইতে পারেন না। বস্তুর দোষ গুণ বিচারের একটী স্বাভাবিক শক্তি থাকে, তাহা সুশিক্ষা দ্বারা বিকশিত হয়। শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেরই সেই শক্তি আছে একথা বলা যায় না। তবুও সমালোচকের মৌলিকতা অনেক পরিমাণে তাঁহার নিজের চেষ্টা ও উদ্যমের উপর নির্ভর করে। উহা পুরুষতন্ত্র ব্যাপার।

দ্বিতীয় শ্রেণীর মৌলিকতা অর্থাৎ ভূতত্ত্ববিদের পর্ব্বত-গহ্বর হইতে স্বর্ণের আবিষ্কার, ইহাও অনেকটা পুরুষতন্ত্র ব্যাপার সন্দেহ নাই। ইহাই বৈজ্ঞানিকের গবেষণা—

original research. বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত তাঁহার বিজ্ঞানাগারে জড়পদার্থ নিচয় ও যন্ত্রতন্ত্র লইয়া দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা করিতেছেন; হয়ত এক দিন তাঁহার সৌভাগ্যক্রমে তিনি অনেকগুলি পদার্থ পরীক্ষা করিতে করিতে তাহাদের মধ্যে আর একটী নূতন পদার্থ দেখিতে পাইলেন। অনেকগুলি যন্ত্রের নির্ম্মাণ-কৌশল পরীক্ষা করিতে করিতে আর একটী নূতন যন্ত্র আবিষ্কার করিলেন। তাঁহার এই আবিষ্কার অনেক পরিমাণে তাঁহার অবিচলিত অভিনিবেশ ও অক্লান্ত অধ্যবসায়ের ফল। ইহাও পুরুষতন্ত্র ব্যাপার।

কলম্বসও নিজের দুর্দ্দমনীয় উৎসাহ বশে মহাসাগরে জাহাজ ভাসাইয়াছিলেন। কিন্তু সেই জাহাজ কোথায় গিয়া ঠেকিবে একথা তিনি এক বারও কল্পনা করিতে পারেন নাই। পরে সেই জাহাজ ভাসিতে ভাসিতে যখন একটী অদৃষ্টপূর্ব্ব মহাদেশে আসিয়া লাগিল তখন তিনি যেন একটী স্বপ্নরাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার এই আবিক্রিয়াকে সম্পূর্ণ পুরুষতন্ত্র বলা যাইতে পারে না, ইহা কতক তাঁহার নিজের উদ্যমপ্রসূত, কতক দৈবাধীন।

কিন্তু যাঁহার হাতে কোহিনুর ধরা পড়িল, তাঁহার আবিষ্কার প্রায় সম্পূর্ণ দৈবাধীন। ইহাতে তাঁহার নিজের উদ্যম অতি অল্পই। জ্ঞানবিজ্ঞানের রাজ্যে এই শ্রেণীর আবিষ্কারকের নাম দ্রষ্টা, ঋষি, কবি—Seer, Prophet, Poet. বাল্মিকী, কালিদাস—হোমর, সেক্ষপীয়ার—নিউটন, ফ্যারাডে এই শ্রেণীর আবিষ্কারক। ইঁহাদের আবিষ্কৃত রত্নরাজিই জগতের জ্ঞান-ভাণ্ডার বৃদ্ধি করে। সেই সকল রত্নরাজি লইয়া সমালোচকগণ ও বৈজ্ঞানিকগণ সাধারণের ব্যবহারোপযোগী অলঙ্কারাদি নির্ম্মাণ করেন।

দ্রষ্টার আবিষ্কার দৈবাধীন বলিলাম কেন? ইহাতে কি তাঁহার কিছুমাত্র নিজের কর্ত্তৃত্ব নাই? কিছু কর্ত্তৃত্ব অবশ্যই আছে। তাঁহাকেও সময়োপযোগী শিক্ষা দ্বারা ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া রাখিতে হয়। যেরূপ শস্য ফলিবে সেইরূপ ক্ষেত্র চাই। সেক্ষপীয়ারের ক্ষেত্রেই সেক্ষপীয়ার জন্মিয়াছিলেন, নিউটনের ক্ষেত্রে সেক্ষপীয়ার কিম্বা সেক্ষপীয়ারের ক্ষেত্রে নিউটন জন্মিতে পারিতেন না। দ্রষ্টার নিজ সংস্কারানুরূপ শিক্ষা দ্বারা হৃদয়াকাশ অরুণায়িত হইলে তবে তাহাতে জ্ঞান-সূর্য্যের উদয় হয়। দ্রষ্টাকেও শাস্ত্রানুশীলন রূপ ঘট স্থাপন করিয়া বাগ্‌দেবীর ধ্যানমগ্ন হইয়া বসিয়া থাকিতে হয়, পরে যদি কখনও দেবতার কৃপা হয় তবে তিনি তাঁহার চিত্তে উদ্ভাসিত হইতে পারেন। শিক্ষা ও শাস্ত্রানুশীলনের দ্বারা তাঁহার মনের কেন্দ্র (focus) ঠিক হয়, কিন্তু সেই কেন্দ্রে (focusএ) নূতন আলোকের আবির্ভাব হইবে কি না তাহা সেই আলোকদাতার ইচ্ছাধীন।

কবিবর শেলি বলিয়াছেন, আমাদের মধুর গাথা ঐগুলি, যাহাতে গভীরতম বিষাদ-কাহিনী সূচিত হয়। সেইরূপ বলা যাইতে পারে, আমাদের মৌলিক তত্ত্ব ঐগুলি যাহাতে মানুষের নিজের কর্ত্তৃত্ব অত্যন্ত কম। যে ভাবগুলি অনেক ভাবনা চিন্তার পর বাহির হয় সে গুলিতে প্রায়ই মৌলিকতা থাকে না। কিন্তু যে সব ভাবের বিষয় একটুও চিন্তা করা হয় নাই, যে গুলি হঠাৎ বিজলি-চমকের মত চিত্তে প্রস্ফুরিত হয়, যে গুলি মনের কোন অজানা কোণ হইতে ক্রমাগত বাহির হইতে থাকে, আর ফুরায় না,—ঠিক বন্যার জলের মত সমস্ত চিত্তবৃত্তি ভাসাইয়া লইয়া বাহির হয়—সেই সব ভাব যথার্থ মৌলিক ভাব (Original ideas). তাই মৌলিক ভাবের একটী লক্ষণ তাহার স্বাভাবিক দ্রুত প্রবাহ। উহা প্রতি পদে আসে না, আসিয়া ভয়ে ভয়ে পিছনে ফিরিয়া দেখে না, কে কি মনে করিতেছে। অফুরন্ত গিরি-প্রস্রবণের ন্যায় তাহা অবিরত ধারায় ধাবিত হয়।

ভাবগ্রস্ত দ্রষ্টা ঠিক ভূতগ্রস্ত রোগীর ন্যায়। অথবা মৃগের নাভিতে কস্তুরি জন্মিলে মৃগ যেমন ছট্‌ফট্ করিয়া বেড়ায়, কি জন্য বেড়ায় সে তাহা জানে না; ভাবুকও সেইরূপ ভাবের মত্ততায় বিহ্বল হইয়া ছুটিয়া বেড়ান। যতক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি তাঁহার ভিতরের ভাবকে বাহিরে প্রকাশ করিতে না পারেন, ততক্ষণ তিনি সুস্থ হইতে

পারেন না। আবার যখন তিনি তাহা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন, তখন তিনি কি লিখিতেছেন, কেন লিখিতেছেন, তাহা জানেন না। কে এক জন ভিতর হইতে তাঁহার হাত ধরিয়া লেখাইতেছে, তাই তিনি লিখিতেছেন। সব টুকু লেখা শেষ হইলে তবে তিনি তাঁহার ভাবার্থ বুঝিতে পারেন! এইরূপ ভাবগ্রস্ত হইয়া আমাদের বর্ত্তমান সময়ের একজন দ্রষ্টা ৺রামকৃষ্ণ পরমহংস বলিতেন, "আমি যন্ত্র তিনি যন্ত্রী, আমি ঘর তিনি ঘরণী।" দ্রষ্টা যে ভিতরকার যন্ত্রীর যন্ত্র বিশেষ, দ্রষ্টার মৌলিকতা যে তাঁহার স্বোপার্জ্জিত জ্ঞানের উপর নির্ভর করে না, এই ক অক্ষর-বিবর্জ্জিত মহাপুরুষই তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

সাহিত্যের মৌলিকতা এইরূপ ভাবগ্রস্ত রোগীর প্রলাপ। আবার বিজ্ঞানের মূলতত্ত্বাবিষ্কারও কোন যন্ত্রীর যন্ত্র-ক্রীড়া বিশেষ। মানুষ ত হাজার হাজার বৎসর আগুন দিয়া জল গরম করিয়া আসিতেছে, কিন্তু সেই উত্তপ্ত জল হইতে যে বাষ্প উঠে, সেই বাষ্পের শক্তিতে রেলগাড়ী চলিতে পারে, এই তত্ত্বের আবিষ্কার কি মানুষের ইচ্ছায় হইয়াছিল? গাছের ডাল হইতে ফল বৃন্তচ্যুত হইয়া আকাশে উড়িয়া বেড়ায় না, তাহা মাটিতেই পড়ে, এ কথা আগে কে না জানিত এবং এখনও কোন্ শিশু তাহা দেখে না? কিন্তু এই সূত্র ধরিয়া জগতের মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আবিষ্কার নিউটনের আগে কেহ করিতে পারে নাই কেন? তাহার কারণ, এই তত্ত্ব ধরিবার জন্য আর কাহারও মনের focus (কেন্দ্র) ঠিক হয় নাই। যেই নিউটনের মনের কেন্দ্র সেই সর্ব্বজ্ঞানভাণ্ডার আলোক-কেন্দ্রের সহিত যুক্ত হইল, অমনি তাঁহার মনের মধ্যে এই তত্ত্ব উদ্ভাসিত হইল। এইরূপে বিশ্বের কেন্দ্রস্বরূপ একমাত্র যন্ত্রীর দ্বারা পরিচালিত হইয়া সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে এক একটি নব নব ভাব, নব নব তত্ত্ব দ্রষ্টৃগণ জগতে প্রচার করিতেছেন। সেই পুরাণ পুরুষই একমাত্র আদি কবি, আদি শিল্পী, বিশ্বকর্ম্মা। তাঁহার নিকট ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান একমাত্র বর্ত্তমান। তাঁহার ক্রীড়ার যন্ত্রও সর্ব্বকালে বিদ্যমান। সুতরাং নূতন ভাব, নূতন তত্ত্ব আবিষ্কারের যুগ চলিয়া গিয়াছে, আর আসিবে না, এ কথা সাহস করিয়া বলা যাইতে পারে না।

কিন্তু বাস্তবিকই কোন কোন ব্যক্তি এরূপ বলিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে সাহিত্যে মৌলিকতার যুগ চলিয়া গিয়াছে, বর্ত্তমান সময়ে সাহিত্যে মৌলিকতার অর্থ পূর্ব্বসঞ্চিত ভাবরাশি লইয়া নাড়াচাড়া করা। এখনকার দিনে নাকি যিনি যত বড় পণ্ডিত (scholar), তিনিই তত অধিক মৌলিক তত্ত্ব উদ্ভাবনে অধিকারী! মৌলিকতাকে যদি শুদ্ধ পাণ্ডিত্যের বাট্‌কারায় ওজন করিতে হয় তবে আমার মতে মৌলিকতার অবমাননা করা হয়। আজকালকার দিনে কোন দেশেই পণ্ডিতের অভাব নাই, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কয় জন মৌলিকতা-সম্পন্ন?

আর একজন বলেন, মৌলিক ভাব বা মৌলিক তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে হইলে পূর্ব্বসঞ্চিত জ্ঞান-বিজ্ঞানরাশি সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করা আবশ্যক। যিনি মূল তত্ত্ব আবিষ্কারের প্রয়াসী, তাঁহাকে নাকি জগতে সঞ্চিত সাহিত্য বিজ্ঞানের স্তূপে আরোহণ করিয়া তদুপরি তাঁহার নূতন ইট বসাইতে হইবে। আমি বলি, এ কাজ সেই ইষ্টক-নির্ম্মাতার নহে, এ কাজ সৌধ-শিল্পীর। জ্ঞান বিজ্ঞান রাজ্যে যিনি নূতন ইট প্রস্তুত করেন তিনি ইট প্রস্তুত করিয়াই খালাস। সে ইট নূতন কি পুরাতন ইহা বিচারের অবকাশ তাঁহার নাই। তিনি শুক্তির ন্যায় মুক্তা প্রসব করিয়া যাইবেন—সে মুক্তা আসল কি নকল সাহিত্যের বাজারে তাহার মূল্য কত ইহা সমালোচকগণ বিচার করিবেন।

আর, কোন এক জনকে মৌলিক লেখক বলিয়া পরিচিত হইতে হইলে তাঁহাকে যদি পৃথিবীর যেখানে যিনি যাহা লিখিয়াছেন তাহা সমস্ত আয়ত্ত করিয়া কলম ধরিতে হয়, তবে কাহারও ভাগ্যে এই যশঃ ঘটিবে কি না সন্দেহ। জগতের জ্ঞান-ভাণ্ডার অনন্ত, মানুষের আয়ু সামান্য। জগতে আর কেহ কখনও যাহা ভাবে নাই, আমি তাহা ভাবিয়াছি—জগতে আর কেহ কখনও যাহা লেখে নাই আমি তাহা লিখিয়াছি, এইরূপ গর্ব্ব মৌলিকতার অর্থ নহে। সেক্ষপীয়ারের হ্যামলেটের

ন্যায় সংস্কৃত সাহিত্যে যদি একটি নাটকীয় চরিত্র বিদ্যমান থাকিত, তবে হ্যামলেট্‌কে কি মৌলিক চরিত্র বলিতাম না? আমাদের বঙ্কিমচন্দ্র যদি প্রকৃতই তাঁহার আয়েষা-চরিত্র আইভ্যান্‌হো উপন্যাস পাঠ করিবার পূর্ব্বে কল্পনা করিয়া থাকেন, তবে আয়েষাকে কি মৌলিক চরিত্র বলিব না? মৌলিক ভাব দেশ-কাল দ্বারা সীমাবদ্ধ নহে। তাহা একই প্রণালীতে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন কবি-হৃদয়ে প্রস্ফুরিত হইয়া থাকে।

পূর্ব্বতন সাহিত্যানুশীলন মৌলিক ভাব বিকাশের জন্য একান্ত আবশ্যক না হইলেও অনেক সময়ে তাহার সহায়তা করে। সেই সহায়তা লাভের জন্য সাহিত্যানুশীলন আবশ্যক। স্বয়ং সেক্ষপীয়ারও গ্রীক এবং রোমান ইতিহাসাদি প্রাচীন সাহিত্য হইতে তাঁহার নাটকের উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এই জন্য সেক্ষপীয়ারের মৌলিকতার উপর কেহ দোষারোপ করিবে ভয়ে ইমারসন্‌ তাঁহাকে সমর্থন করিয়া কত কথা লিখিয়াছেন। কিন্তু আমার মতে তাঁহার এ কারণে এত বাক্য ব্যয় করিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। আমাদের দেশের কালিদাস, ভবভূতি প্রমুখ কবিগণ রামায়ণ ও মহাভারতের অনন্ত ভাণ্ডার হইতে তাঁহাদের কাব্যের উপাদান সংগ্রহ করিতে কিছুমাত্র লজ্জা বোধ করেন নাই। কিন্তু কালিদাসের শকুন্তলা মহাভারতের শকুন্তলার সহিত তুলনায় একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র চরিত্র-চিত্র। এই সকল মহাকবি স্বীয় প্রতিভার উজ্জ্বল আলোক-পাতে পুরাতনকে সম্পূর্ণ নবীন জীবন দান করিতে সমর্থ। তখন সেই পুরাতন চিত্রকে আর পুরাতন বলিয়া চেনা যায় না। এখানেই কবির মৌলিকতার বিকাশ। অতএব সেই পুরাতনের অবলম্বনে এই নূতন সৃষ্টিও মৌলিকতা।

এইরূপে পুরাতনের অনুকরণে নূতন সৃষ্টিও আর এক শ্রেণীর মৌলিকতা। একটি চিত্র দেখিয়া সেইরূপ আর একটি নির্ম্মাণ করাতে যে মানসিক উৎকর্ষের আবশ্যক, তাহাও সাহিত্য-জগতে দুর্লভ। এরূপ সৃষ্টি-সামর্থ্য দ্বারা প্রমাণিত হয়, যে শেষের কবি ও পূর্ব্বতন কবি প্রায় সমান শক্তিবিশিষ্ট। প্রথম কবির চিত্তে সেই চিত্রটি দৈবানুগ্রহে স্ফুরিত হইয়াছিল, শেষোক্ত কবি তাহা নিজের সাধন বলে সৃষ্টি করিয়াছেন। একটা ভাব কেবল স্ফুরিত হইলেই হইল না, তাহাকে রক্ত মাংসের শরীর দিয়া জীবন্ত করিয়া গঠন করাতেই বেশী কৃতিত্ব। এই হিসাবে, অনুকরণশীল কবিকে সাধারণতঃ যতটা নিন্দার পাত্র মনে করা যায়, বাস্তবিক তিনি ততটা নিন্দার পাত্র নহেন।

আমাদের বঙ্গসাহিত্যে এই শ্রেণীর মৌলিকতা কিছু বেশী হইতেছে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহাতে নিরাশ হইবার কোন কারণ নাই। এক একটী প্রকৃত দ্রষ্টা বা কবি বৎসর বৎসর জন্মগ্রহণ করেন না, কোন যুগে এক আধটি আবির্ভূত হইয়া থাকেন। তাঁহাদের একটী অন্তর্হিত হইলে আর একটীর আবির্ভাব পর্য্যন্ত আসর কি একেবারেই খালি থাকিবে? তাই স্বভাবের নিয়মে তাঁহাদের একটীর তিরোধানের পর তাঁহার মন্ত্রে দীক্ষিত, তাঁহার প্রভাবে সঞ্জীবিত অনেক গুলি শিষ্য প্রশিষ্যের আবির্ভাব হইয়া থাকে। তাঁহারাই অন্য মহাপুরুষের আবির্ভাব কাল পর্য্যন্ত সাহিত্যের দীপ-শিখা প্রজ্জ্বলিত রাখেন। তাঁহারা পূর্ব্বলব্ধ জ্ঞানবিজ্ঞানের রত্নরাজি দ্বারা নূতন নূতন অলঙ্কার প্রস্তুত করিতে থাকেন। এইরূপ মহাপুরুষের সমাধিলব্ধ মৌলিক ভাব সকল বিবিধ বেশে, বিবিধ আকারে জনসমাজে প্রবাহিত হইয়া সাধারণের মানসিক উৎকর্ষ ও সাংসারিক সুখ সুবিধার বৃদ্ধি করিয়া থাকে। এইরূপে এক একটী দ্রষ্টার আবির্ভাবের পর জনসমাজ ক্রমশঃ ঊর্দ্ধদিকে এক একটী স্তরে উত্থিত হইয়া পরিশেষে পূর্ণতা লাভ করে। ইহাই সাহিত্য-সৃষ্টির চিরন্তন নিয়ম।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ।

প্রায়শ্চিত্ত।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

৪

আজ অমরের জন্মদিন। অমরের জন্মদিনে গৃহে বিশেষ রূপে আনন্দোৎসব হয়। অমর এখন চার বৎসরের, অমূল্যকুমার দুই বৎসরের। অমরের জন্মদিনে যাহা হয় অমূল্যকুমারের জন্মদিনে তাহা হয় না, এ দুঃখ প্রমদার অন্তঃস্তলে বিঁধিয়া আছে। সুবোধচন্দ্র প্রমদাকে বলিয়াছেন, বাটী ঘর বিষয় সবই অমরের মাতামহের, অমর সেই সকলের উত্তরাধিকারী, সুবোধচন্দ্রের যাহা সামান্য বিষয় আছে তাহা দুই পুত্র সমান ভাগে পাইবে। অমরের এত আছে তবু সেই সামান্য বিষয়ে ভাগ, একি কম কথা! প্রমদা এখন আর সর্ব্বদা সংযত হইয়া কথা কহে না, যখন তখন সুবোধচন্দ্রকে নানা কথা শুনাইয়া দেয় এবং পরের দাসী করিবার জন্য বিবাহের কি প্রয়োজন ছিল, তাহাও জিজ্ঞাসা করে। সুবোধচন্দ্রের জীবন ভারবহ হইয়াছে, তবু তিনি নীরবে সকলি সহিতেছেন। আর অমরের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া, অমূল্যের শিক্ষার কি হইবে ভাবিয়া অন্তর আকুল হইয়া উঠিতেছে।

অমরকুমারের জন্মদিনে দাস দাসী সকলে নূতন বস্ত্র পরিধান করিয়াছে। পাড়া-প্রতিবাসীরা নিমন্ত্রিত হইয়াছে। সুবোধচন্দ্র সেই দিন কাঙালী-ভোজন করাইতেছেন। অমরকুমার নূতন বস্ত্রে সজ্জিত হইয়া আপনার কক্ষের বাহিরে আসিল, পিতা তাহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া নীরবে আশীর্ব্বাদ করিলেন। সে পিতাকে বলিল, "বাবা, ভাইয়ের কাছে চল।"

সুবোধচন্দ্র অমরের হাত ধরিয়া অমূল্যকুমারের নিকট লইয়া চলিলেন। অমূল্য সেদিন মায়ের নিকট বন্দী। মা সেদিন তাহাকে আর বাহির হইতে দিবেন না। পিতার কণ্ঠস্বরে সে ছুটিয়া বাহিরে আসিল, সঙ্গে সঙ্গে প্রমদাও আসিল। সপত্নী-পুত্রের সাজসজ্জা ও তাহাকে পিতার আদর-গৌরবে ভূষিত দেখিয়া প্রমদার অন্তরের জ্বালা বাড়িল বই কমিল না। অমূল্য আসিবা মাত্র অমর তাহার হাতে একটি বাঁশী দিয়া বলিল, "ভাই, নাও।"

সে অমূল্যকে ভাই বলিয়া ডাকিত। অমূল্য বাঁশী লইয়া অমরের কণ্ঠস্থিত সুবর্ণ-হারের প্রতি দৃষ্টি করিয়া বলিল, "এটা নেব।" সেই হার ছড়াটি সুধার। এই জন্মদিনে বাহির করিয়া সুবোধচন্দ্র তাহা অমরের গলায় পরাইয়া দিয়াছেন, কারণ হারে একটি লকেটে সুধার ছবি আছে। অমূল্য হার ধরিয়া টানায় অমরও লকেটটা সজোরে ধরিয়া বলিল:—"আমার ছবি, মার ছবি, আমি দেবো না।" সুবোধচন্দ্র অমূল্যকে অনেক ভুলাইলেন, সে কিছুতেই ভুলে না। শুধু "হার নেব, হার নেব," বলিয়া কাঁদিতে লাগিল। প্রমদা পুত্রকে আসিয়া প্রহার করিয়া বলিল:—"এই হার নাও, কার গর্ভে জন্মেছ জান না? তোমার ও সব সাধ কেন?"

অমূল্য ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল, প্রমদা তাহাকে ধরিয়া লইয়া চলিয়া গেল।

সুবোধচন্দ্র পত্নীর ব্যবহারে মর্ম্মাহত হইয়া পুত্রকে লইয়া কাঙালী-ভোজন দেখিতে গেলেন।

৫

পর দিন প্রভাতে সুবোধচন্দ্রের নিকট হইতে প্রমদা নিম্নলিখিত পত্রখানি পাইল।

"প্রমদা, আমি বড় আশায় নিরাশ হইয়াছি। আমার জীবনে আর সুখ নাই, গৃহে আর শান্তি নাই। আমার শান্তি-স্বরূপিনী স্ত্রীর বিয়োগের পর বড় সাধে তোমায় বিবাহ করিয়া আনিয়াছিলাম, ভাবিয়াছিলাম, তোমার ভালবাসায় আমার ক্ষত হৃদয় জুড়াইবে, কিন্তু তাহা আমার দুরাশায় পরিণত হইয়াছে। মাতৃহীন শিশু বালককে তোমার কোলে দিয়াছিলাম, ভাবিয়াছিলাম, তুমি তাহার জননীর তুল্য তাহাকে ভালবাসিবে। জগদীশ্বর তোমার কোলে অমূল্যকে দিয়া তোমায়ও জননী নামে ভূষিতা করিয়াছেন, তবু তোমার এই ক্ষুদ্র মাতৃহীন শিশুর প্রতি এত বিরাগ কেন, তাহা বুঝিবার ক্ষমতা আমার মত লোকের নাই। যাহা হউক, যখন আমার সহিত বিবাহ হওয়ায় তুমি সুখী হও নাই, হইবার

আশাও নাই, তখন আমি চলিলাম, অমরকে লইয়াই চলিলাম। কোথায় যাইব, কি করিব কিছুই জানি না। যদি আমার প্রতি তোমার মত পরিবর্ত্তন হয়, যদি স্বামী বলিয়া শ্রদ্ধা হয়, আসিতে বলিলে আসিব, নতুবা এই জন্মের মত বিদায়।

হতভাগ্য সুবোধচন্দ্র।

পুনঃ। আমায় পত্র দিতে হইলে সরকারের নিকটে পাঠাইয়া দিলেই আমি পত্র পাইব।"

প্রমদা সে পত্র পাইয়া আরও ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। সে ইচ্ছা করিলে একটু অনুনয় বিনয়ে স্বামীর মন রাখিতে পারিত কিন্তু তাহা তাহার কর্ত্তব্যের মধ্যে মনে হইল না। চলিয়া যাইতেছেন—আবার সঙ্গে অমরকে লইয়া! যান, সে তাহার দুর্ভাগ্য লইয়াই থাকিবে।

সুবোধচন্দ্র অমরকে লইয়া সমুদ্রতীরে পুরীতে বেড়াইতে গেলেন। সমুদ্র তটে একটি ক্ষুদ্র গৃহ ভাড়া লইয়াছিলেন। শিশু অমর সারা দিনমান সমুদ্রতটে বালুর উপর খেলাইয়া বেড়াইত, ঝিনুক শামুক কুড়াইত, বিস্মিত ভাবে সমুদ্রের বিশাল তরঙ্গের প্রতি চাহিয়া থাকিত, আনন্দে ছুটাছুটি করিত, পিতাকে শত সহস্র প্রশ্ন করিত ও শিশু ভাইটির কথা প্রায়ই জিজ্ঞাসা করিত। একা একা তাহার যেন আর ভাল লাগিত না। সুবোধচন্দ্র একাকী গৃহের বারান্দায় বসিয়া সেই নীলোর্ম্মিময় অসীম অনন্ত সমুদ্রের প্রতি চাহিয়া থাকিতেন, তাঁহার হৃদয়ে যেন কি এক শূন্য ভাব ভাসিয়া বেড়াইত। সেই সমুদ্রের অনন্ত কল্লোলে হৃদয়ে যেন কি এক বিষাদ গান বাজিয়া উঠিত। তাঁহার জীবন যেন বিরস, যেন উদাস, যেন শূন্যময় বোধ হইত।

আর প্রমদা একাকিনী সেই প্রাসাদতুল্য বৃহৎ ভবনে শিশু পুত্রটিকে লইয়া বাস করিত। দু চার দিন কোন অভাব ছিল না, কিন্তু যত দিন যাইতে লাগিল ততই হৃদয় যেন শূন্য হইয়া আসিতে লাগিল। সেই বিশাল ভবনে একাকিনী আর যেন ভাল লাগিত না। অমূল্য যখন তখন ছুটিয়া আসে, আর বলে, "মা, বাবা কই, দাদা কই?" সে যখন তখন প্রতি শূন্য ঘরে যায়, আর তাহার দাদার জন্য কাঁদে। এই রূপে কিয়দ্দিন পরে তাহার শরীর অসুস্থ হইয়া পড়িল, ক্ষুধা কমিয়া গেল, প্রত্যহ সামান্য জ্বর হইতে লাগিল, ক্রমে সে দাদার জন্য আরও কাতর হইতে লাগিল। প্রমদার তখন যেন জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইল; কেন সে স্বামীর সহিত ভাল ব্যবহার করে নাই, কেন সে অমরকে স্নেহচক্ষে দেখে নাই, কেবল সেই কথা ভাবিতে লাগিল। সুবোধচন্দ্র দুই মাস চলিয়া গিয়াছেন, ইহার মধ্যেই প্রমদার হৃদয়ে গভীর অনুতাপ উপস্থিত হইয়াছে। অমূল্য দিন দিন অসুস্থ হইয়া পড়িতেছে, আর পিতা ও ভ্রাতার জন্য কাতরোক্তি করিতেছে। কাহার জন্য প্রমদার জীবন? স্বামী জীবনের সুখে নিরাশ হইয়া চলিয়া গিয়াছেন। শিশুপুত্র শুকাইয়া যাইতেছে, প্রমদার জীবনে আর কি সাধ?

এমন সময় সংবাদ আসিল, পুরীতে সুবোধচন্দ্রের কঠিন পীড়া হইয়াছিল, এখন একটু ভাল আছেন। সে সংবাদে প্রমদার আর কোনও বাধা বা দ্বিধা রহিল না। সে অমূল্যকে লইয়া দাসী ও সরকার সমভি-ব্যাহারে পুরীর জন্য যাত্রা করিল।

পুরীতে একদিন প্রভাত কালে সূর্য্যোদয়ের পর সুবোধচন্দ্র বারান্দায় তাঁহার নির্দ্দিষ্ট আরাম-চেয়ারে শয়ন করিয়া আছেন। রৌদ্ররাশি কেমন সেই বালুকার উপর রত্নের মত জ্বলিতেছে, নীলোর্ম্মি বক্ষে কেমন রত্ন-কণার মত ঝলসিতেছে, অন্যমনে তাহাই দেখিতেছেন। তাঁহার পীড়ার পর মুখ বড়ই শুষ্ক দেখাইতেছে, চক্ষের কোণে কালিমা পড়িয়াছে। অমর অদূরে খেলা করিতেছে। এমন সময় একখানি গাড়ী আসিয়া তাঁহাদের গৃহের সম্মুখে দাঁড়াইল, অমর বিস্মিত ভাবে গৃহের সম্মুখে ছুটিয়া গেল। সুবোধ-চন্দ্রও চমকিত হইয়া চাহিয়া দেখিলেন, যে অমর অমূল্যকুমারকে লইয়া ছুটিয়া আসিতেছে, পশ্চাতে অবগুণ্ঠনবতী প্রমদা আসিতেছে। সুবোধচন্দ্রের যেন নিজের চক্ষুর প্রতি অবিশ্বাস জন্মিল। এমন সময় অমর ছুটিয়া আসিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, "বাবা, ভাই এসেছে, ভাইকে দেখ।"

অমূল্য ছুটিয়া পিতৃক্রোড়ে আশ্রয় লইল। অশ্রুপূর্ণ নয়নে সুবোধচন্দ্র তাহাকে বক্ষে ধরিয়া চুম্বন করিলেন। সেই দৃশ্যে প্রমদার চক্ষের ধারা আর বাধা মানিল না, সে অভাগিনী, তাই এত দিন বুঝে নাই। সুবোধচন্দ্র প্রমদার সহিত কক্ষের ভিতর গমন করিলেন ও তাহার পর প্রমদাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রমদা, ভাল আছ?"

প্রমদা সকল অভিমান ভুলিয়া স্বামীর পায়ের ধূলি লইতে গিয়া পদতলে লুটাইয়া বলিল, "আমায় ক্ষমা কর, আমার পাপের যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে। আমি তোমার চরণসেবার যোগ্য নই।" সুবোধচন্দ্র সাদরে প্রমদাকে তুলিয়া বলিলেন, "প্রমদা, আমার ক্ষমা করিবার কিছু নাই, তুমি দয়া ক'রে অভাগাকে ভালবাসিলে কৃতার্থ হইব।" এমন সময় অমর ও অমূল্য ছুটিয়া সেই গৃহে আসিল। অমর দুই হাতে অনেক ঝিনুক ধরিয়া আনিয়াছে, আসিয়া প্রমদাকে বলিল, "মা, এই নাও, আমি তোমার জন্য রোজ তুলে রাখি, ভাইয়ের জন্য রাখি।"

প্রমদা স্নেহের সহিত অমরকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া সুবোধচন্দ্রকে বলিল, "আজ এই পুণ্যধামে শপথ করিয়া বলিলাম, অমরকে আমার নিজের সন্তানের তুল্য দেখিব, আমায় বিশ্বাস করিবে কি?" অমর দুই হাতে মায়ের গলা জড়াইয়া বলিল, "মা, তুমি এতদিন কোথায় ছিলে, কেন এসো নাই, আমরা একলা ছিলাম"—অমরকে সস্নেহে চুম্বন করিয়া প্রমদা নামাইয়া দিল, দুই ভাই খেলিতে চলিয়া গেল।

সুবোধচন্দ্রের নিরাশা-ব্যথিত হৃদয় শান্ত হইল। প্রমদার প্রায়শ্চিত্তে তাহাদের সংসার, সোনার সংসার হইল।

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

বৈদিক ধর্ম্ম ও গ্রন্থ।

(৩)

আমরা এই প্রবন্ধের গত দুই সংখ্যায় ঋগ্বেদের দেবতাদিগের যে আলোচনা করিয়াছি, তাহা দ্বারা বোধ করি ইহা পরিস্ফুট হইয়াছে যে, মনুষ্যের চিত্ত-বিকাশের পার্থক্য অনুসারে বৈদিক ধর্ম্ম-গ্রন্থগুলিতে সাধনার ব্যবস্থা আছে; সাধনার দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই, দেবতাদিগের উপাসনা হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে সেই বিশ্বাতীত অথচ বিশ্বে অনুপ্রবিষ্ট পরম দেবতা পর-ব্রহ্মের উপাসনা ও ভাবনাদি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আমরা আরো দেখিয়াছি যে, ঋগ্বেদের সময়ে যে কতকগুলি ঋষির চিত্তে একেবারেই ব্রহ্মতত্ত্ব ফুটিয়া উঠে নাই, এই সিদ্ধান্ত নিতান্তই যুক্তিবিরুদ্ধ। সর্ব্বকালে, সর্ব্বসমাজে এইরূপ লোকই দেখিতে পাওয়া যায় যে, সকলের চিত্তের বিকাশ সমান নহে এবং সকলের চিত্তে উপাস্য বস্তুর স্ফূর্ত্তিও সমান হয় না। মানব-চিত্তের এই বিকাশের তারতম্য লক্ষ্য করিয়াই বৈদিক গ্রন্থ মাত্রেই, কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড ও উপাসনাকাণ্ড নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

এ সম্বন্ধে আমরা দেবতাদিগের 'বিশেষণ' গুলির শ্রেণী বিভাগ করিয়া দেখিয়াছি এবং প্রাচীন ভাষ্যকারের সিদ্ধান্তেরও উল্লেখ করিয়াছি। এই সংখ্যায় আমরা আর একটী কথার উল্লেখ করিব।

শ্রুতিতে জীবের পরলোকে গতির বিষয়ও বর্ণিত হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্য যেমন সাধনার প্রণালীর চারি প্রকার শ্রেণী বিভাগ করিয়াছেন, তদ্রূপ সাধনের ফলেরও চারি প্রকার শ্রেণী বিভাগ দৃষ্ট হয়। ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক প্রভৃতি সুপ্রাচীন উপনিষদ্‌গুলিতে জীবের পরলোক-গতির বিস্তারিত বিবরণ আছে। সেই বিবরণ হইতেও আমাদের প্রদর্শিত চিত্ত-বিকাশের তারতম্য-ভেদে সাধনার ভেদ,—এই কথাই সুদৃঢ় হইয়া উঠে।

(১) যে সকল মনুষ্য স্বাভাবিক প্রবৃত্তির প্রেরণায় পরিচালিত হইয়া কার্য্য করে, তাহারা প্রায়ই পর-পীড়াকর কার্য্যাদিরই অনুষ্ঠান করে এবং কিসে নিজের ইন্দ্রিয় তৃপ্তি ঘটিবে, কিসের দ্বারা কেবল আপনার সুখ

সম্পাদিত হইবে, ইহারা তাহারই অনুসন্ধানে দিবারাত্র রত। মৃত্যুর পর, এই সকল ব্যক্তির স্থাবর-জন্ম লাভ হয় বলিয়া শ্রুতিতে উল্লেখ আছে। (২) আর যাহারা বাপীকূপাদির খননাদি দ্বারা পরোপকারার্থও কিছু কিছু শুভ-কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, এবং যাহাদের চিত্তে কখন কখন পরলোকের কথাও জাগিতে থাকে, তাহারা আত্মসুখার্থ দেবতারাধনায় রত হয়, এই সকল সমধিক সামর্থ্যশালী দেবতাবর্গ স্বর্গে সুখ দিতে পারিবেন, এই উদ্দেশ্যে ইহারা যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করে। এই দুই প্রকারের লোকই "পিতৃ-যান" মার্গ অবলম্বন করিয়া স্বর্গলোকে প্রবিষ্ট হয়। কিন্তু শ্রুতিতে এ কথাও দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে শুভকর্ম্মের অনুষ্ঠানের ফলে ইহাদের এই স্বর্গলোক-প্রাপ্তি ঘটিল, সেই ফলের ক্ষয় হইয়া গেলে ইহারা পুনরায় স্বর্গভ্রষ্ট হয়। স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে ফিরিয়া আসিয়া জন্মজরামৃত্যু ক্লেশ ভুগিতে থাকে।

(৩) কিন্তু যাঁহারা "কর্ম্ম ও জ্ঞানের সমুচ্চয়" করিয়াছেন,—অর্থাৎ যাঁহারা দেবতাদিগের স্বতন্ত্রতা বোধ না করিয়া, ব্রহ্মসত্তাতেই দেবতাদের সত্তা, এই প্রকার বোধ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁহাদের "দেবযান-মার্গ" * দ্বারা উন্নততর স্বর্গে গতি হয়। ইঁহাদিগকে আর মর্ত্ত্যলোকে ফিরিয়া আসিতে হয় না। সেই সকল লোকে থাকিয়াই ক্রমশঃ ইঁহাদের জ্ঞানের পরিপকতা লাভ হইতে থাকে। আবার যে সকল মনুষ্যের চিত্ত এতদূর মার্জ্জিত যে, তাঁহারা সর্ব্ব পদার্থে কেবল ব্রহ্মদর্শনই করিয়া থাকেন; কোন পদার্থকেই 'স্বতন্ত্র' বলিয়া বোধ করেন না; ব্রহ্ম-সত্তাতেই সকল পদার্থের সত্তা,—সর্ব্বদা এইরূপ ধারণা করেন,—এ প্রকারের সাধকেরাও "দেবযান" পথ অবলম্বন করিয়া, আরো উন্নততর স্বর্গে প্রবিষ্ট হইয়া, ব্রহ্মেরই মহিমা ও ঐশ্বর্য্য সন্দর্শন করিতে করিতে, সর্ব্বাপেক্ষা উর্দ্ধতম "ব্রহ্মলোকে" প্রবিষ্ট হন। ক্রমে অদ্বৈত-বোধের পরিপকতা জন্মিলে, সেই লোকেই তাঁহারা মুক্তিলাভ করেন। ইঁহাদিগকেও আর মর্ত্ত্যলোকে ফিরিয়া আসিতে হয় না। (৪) আর যাঁহাদের চিত্তের এ প্রকার বিকাশ হইয়াছে যে, তাঁহারা সর্ব্বত্র অভিমানশূন্য হইয়া ঈশ্বরার্থ ক্রিয়া করেন এবং ব্রহ্মসত্তা হইতে স্বতন্ত্র-ভাবে কোন পদার্থের সত্তা অনুভব করেন না, এরূপ পরিপক্ক জ্ঞানীদিগের মৃত্যুর পর লোকবিশেষে গতি হয় না। ইহলোকেই জীবিত কালে বা মৃত্যুর পর তাঁহারা মুক্তি-লাভ করেন।

শ্রুতির সর্ব্বত্র আমরা জীবের এই চারি প্রকারের পরলোক-গতির বিবরণ দেখিতে পাই। পরলোকগমনের এই শ্রেণী-বিভাগ হইতেও আমরা উপাসনা ও সাধকের চিত্তের বিকাশেরও তারতম্য বুঝিতে পারি। সুতরাং, পরলোকে গতির এই বিবরণ দ্বারাও আমাদের কথার যাথার্থ্য অনুভূত হইবে বলিয়া আমরা আশা করি।

সাধকের চিত্ত যেরূপে যাঁহার বিকশিত হইয়াছে তিনি ঋগ্বেদের দেবতাগণকে সেইরূপেই গ্রহণ করিবেন। যাঁহারা উপাস্য-বস্তুকে মনুষ্যোচিত গুণগ্রামে বিভূষিত না করিলে ধারণা করিতে পারেন না, তাঁহাদের জন্য—ইন্দ্রাদি দেবতার সুরম্য হর্ম্ম্য, বিবিধ বসন ভূষণ, দারা-পুত্র, অনুগ্রহ নিগ্রহ-সামর্থ্য, বৃত্রাদির সহিত যুদ্ধে জয় লাভ—প্রভৃতি নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। আর যাঁহাদের চিত্তে একত্বের তত্ত্ব পরিস্ফুট হইতে আরম্ভ করিয়াছে; যাঁহারা সকল দেবতার মধ্যে এক পরম-দেবতার শক্তি ও ঐশ্বর্য্য দেখিতে অভ্যস্ত হইয়াছেন;—ঋগ্বেদে তাদৃশ সাধকের পক্ষে সুন্দর ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে। তাঁহারা দেখিতে পাইবেন যে, একই পরমাশক্তি বিবিধ দেবতায় বিবিধ শক্তিরূপে বিকাশ পাইতেছে। সকল দেবতার একত্বসূচক বিশেষণগুলি এইরূপ সাধকের জন্য। আর যাঁহাদের অন্তঃকরণে, এক ব্রহ্ম-বস্তুই পরিস্ফুট,—কোন দেবতারই যাঁহারা স্বতন্ত্রতা বুঝিতে অক্ষম—ঋগ্বেদে তাঁহাদেরও উপাস্য-পদার্থ নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছেন। শ্রীমৎ দয়ানন্দ স্বামী এইরূপ সাধক ছিলেন। তাই তিনি অগ্নিশব্দ দ্বারাও ব্রহ্মকে বুঝিতেন, আবার ইন্দ্র সূর্য্যাদি শব্দ দ্বারাও কেবল ব্রহ্মকে বুঝিয়াছিলেন। ইহাও নূতন আবিষ্কার নহে। যাস্ক-প্রণীত নিরুক্তাদি গ্রন্থে এ ভাবেও

* 'পিতৃযান' ও 'দেবযান' পথের বিবরণ, মৎপ্রণীত "উপনিষদের উপদেশ" গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে।

দেওয়ান রামকমল সেন।

প্যারিমোহন সেন।　　　　সারদাসুন্দরী সেন।

কেশবচন্দ্র সেন,　নবীনচন্দ্র সেন,　কৃষ্ণবিহারী সেন।

দেবতাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। দেব-বাচক যাবতীয় শব্দ দ্বারা কেবল ব্রহ্মই লক্ষিত হইয়াছেন। শ্রীমৎ দয়ানন্দ এই প্রকারে ঋগ্বেদের ভাষ্য লিখিয়াছিলেন। তাঁহার ভাষ্য, প্রকৃত অদ্বৈত জ্ঞানীর বা পরিপক্কজ্ঞানী পুরুষদিগের ব্রহ্মতত্ত্ব বোধে বিশেষ সাহায্য করিতেছে। কিন্তু, এ সকল তত্ত্ব সকলে তলাইয়া দেখেন না। এই জন্যই ভারতে মহাত্মা দয়ানন্দকে সকলে চিনিতে পারিল না। এক সম্প্রদায়ের লোক তাঁহার উপরে বড়ই নারাজ এবং তাঁহাকে "দেবদ্বেষী, অহিন্দু ও নাস্তিক" বলিয়াও নির্দ্দেশ করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই !!

অতএব আমরা দেখিতেছি যে,ঋগ্বেদের ঋষিগণ যে কেহই ব্রহ্মধারণার যোগ্য ছিলেন না এবং তাঁহাদের হৃদয়ে যে প্রথমে কেবল জড়ীয় প্রাকৃতিক ক্রিয়াগুলিই দেবতা-বোধে অনুভূত হইয়া স্তুত হইয়াছিল এবং ইহার বহুকাল পরে যে ঋষিরা ব্রহ্মবস্তুর অনুসন্ধান পাইয়াছিলেন এবং তাঁহার একত্বের তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম হইয়াছিল,— এই সকল পাশ্চাত্য সিদ্ধান্ত গুলিকে বিনা-বাধায় গ্রহণ করা যাইতে পারে না। অন্ততঃ এ দেশের শাস্ত্রগ্রন্থ সমূহেও প্রাচীন ভাষ্যকারাদির সিদ্ধান্ত হইতে, আমরা পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের আবিষ্কৃত কথার বরং বিপরীত সিদ্ধান্তই প্রাপ্ত হইতেছি। প্রিয় পাঠক ও মাননীয়া পাঠিকা! আমরা এই তিন সংখ্যায় অতি সংক্ষেপে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, ইহাই সমীচীন সিদ্ধান্ত কি না, তাহা ভাবিয়া দেখিলে আমরা বিশেষ উপকৃত হইব। এইরূপ. এ দেশের বৈদিক গ্রন্থগুলি সম্বন্ধে যে কত অদ্ভুত তত্ত্ব এ দেশে প্রচারিত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই! (ক্রমশঃ)

শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য, বিদ্যারত্ন, এম্, এ।

কাব্যে লোক-শিক্ষা।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের কবিতা।

(৮)

অদ্য আমরা পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের রচিত কাব্যগ্রন্থ সম্বন্ধে আলোচনা করিব। শাস্ত্রী মহাশয় এ পর্য্যন্ত নির্ব্বাসিতের বিলাপ, পুষ্পমালা, পুষ্পাঞ্জলী, হিমাদ্রি-কুসুম ও ছায়াময়ী-পরিণয় শীর্ষক পাঁচখানি কাব্য রচনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে শেষোক্ত তিনখানি কাব্য পাঠক-সমাজে আশানুরূপ প্রচারিত হয় নাই। অনেকে হয় ত এই তিনখানি গ্রন্থের কোন খবরই রাখেন না। আজ কাল যে গ্রন্থের যত জাঁকাল বিজ্ঞাপন বাহির হয়, সেই গ্রন্থেরই তত বেশি কাট্‌তি হয়। সাহিত্য-বাজারে এই বিজ্ঞাপনের জোরে অনেক রাবিশও মিঠায়ের দামে বিকাইয়া যায়; এবং পাঠকদিগকে কেবল মাত্র অর্থের অপব্যয়ের ভয়ে উহা গলাধঃকরণ করিতে হয়। বোধ হয় এই বিজ্ঞাপন ও চেষ্টার অভাবেই উক্ত গ্রন্থগুলি লোকের চক্ষে পড়ে নাই।

কিন্তু নির্ব্বাসিতের বিলাপ ও পুষ্পমালা পাঠক সমাজে আদৃত হইয়াছিল। শুধু আদৃত হইয়াছিল বলিলে বোধ হয় যথেষ্ট বলা হয় না। পুষ্পমালার "শচীমাতা বলে নিমাই, নিমাই, প্রতিধ্বনি বলে নাই নাই," "চরিত্রের শোভা চাই দেখিবারে, ভারত সন্তান তবে বলি তারে," "চাই না সভ্যতা চাষা হ'য়ে থাকি, দেও ধর্ম্মধন প্রাণে পূরে রাখি," "সুখের শয্যাতে মোহ-নিদ্রাগত, কে চায় কে চায় থাকিতে নিয়ত," এবং অন্যান্য কবিতার অনেক উৎকৃষ্ট শ্লোক পল্লীগ্রামের তরুণী ও তরুণ বয়স্ক যুবকদিগের মুখে মুখেও শুনা যাইত। উক্ত কাব্য দুখানি বিদ্যালয়ের ছাত্র ও ছাত্রীদিগকেও পড়ানো হইত। প্রাচীন লোকেরাও এই দুই গ্রন্থের সমাদর করিতেন। তদ্ভিন্ন শাস্ত্রী মহাশয়ের

"কর্ত্তব্য বুঝিব যাহা, নির্ভয়ে করিব তাহা
যায় যাক থাকে থাক ধন প্রাণ মান,
সত্যকে ধরিয়া র'ব পর্ব্বত সমান।"

ইত্যাদি শ্লোকপূর্ণ সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত কয়েকটি

কবিতাও লোকের মুখে মুখে শুনা যাইত। কিন্তু বর্ত্তমান সময় রবীন্দ্রনাথের কাব্যসমূহ বাঙ্গলা সাহিত্যে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে। এখন মাইকেল মধুসূদন দত্ত, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের কবিতারই আশানুরূপ সমাদর দেখা যায় না, শাস্ত্রী মহাশয়ের কবিতার আর যথেষ্ট সমাদরের আশা করি কিরূপে?

তথাপি চিন্তা করিয়া দেখিলে এখনও এক বিষয়ে শাস্ত্রী মহাশয়ের কবিতার বিশেষত্ব আছে। বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের শত সহস্র কবিতা সঙ্গীত-নিপুণা সুর-বালার গীতধ্বনির ন্যায় অপূর্ব্ব শব্দলালিত্যে ও ভাবের মাদকতায় পাঠকদিগের অন্তরে পুলক এবং মোহের সঞ্চার করে; এবং এই হিসাবে শাস্ত্রী মহাশয়ের কাব্য যে আধুনিক কবিতার তুলনায় কলাকৌশল ও বৈচিত্র্য-বিহীন,—তাহাও স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু তবু শাস্ত্রী মহাশয়ের কাব্যে যাহা আছে, তাহা আর কোথাও নাই। এমন জীবন্ত আধ্যাত্মিক ভাবপূর্ণ কবিতা বাঙ্গলা সাহিত্যে আর কোথায় আছে? আমরা পাঠকদিগকে দ্বিধাশূন্য অন্তরে বলিতে পারি, তাঁহারা যদি এক জন ধার্ম্মিক, চরিত্রবান ও তেজস্বী পুরুষের মহৎ হৃদয়ের খাঁটি ও তাজা ভাব দেখিতে চাহেন, তাঁহারা যদি এক জন ইন্দ্রিয়জয়ী ত্যাগী পুরুষের বিশ্বাসের বল ও সাধনার শক্তি দেখিতে চাহেন, তাহা হইলে শাস্ত্রী মহাশয়ের কাব্যগুলি পাঠ করুন।

শাস্ত্রীমহাশয়ের কাব্যগুলির উপর তাঁহার মহৎ জীবনের ছায়া পড়িয়াই যেন মূল্যবান হইয়া উঠিয়াছে। এই জন্যই আগ্রহের সহিত তাঁহার কাব্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি।

শাস্ত্রী মহাশয়ের গ্রন্থের বিরুদ্ধে আমাদের প্রধান অভিযোগ এই যে, তিনি তাঁহার কাব্যের সকল স্থানের ভাষার প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ দেন নাই। তাঁহার ছন্দের নূতনত্ব আছে, আবেগ আছে, তেজ আছে; তাঁহার ভাষাও অনেক স্থানে শ্রুতিমধুর; কিন্তু আবার অনেক স্থানের ভাষা দেখিয়া মনে হয়, তিনি তাঁহার বর্ণিত বিষয়ের মহা ভাবের মধ্যে এমনই তন্ময় হইয়া যান, যেন কাব্য রচনার কথা আর মনেই থাকে না; তাই পদ্যের মধ্যে অত্যন্ত গদ্য ভাষাই আসিয়া পড়ে। এজন্য এক একটি স্থানের রচনা অত্যন্ত নীরস বলিয়া মনে হয়।

শাস্ত্রী মহাশয়ের নির্ব্বাসিতের বিলাপ গ্রন্থখানি এই সুদূর মফঃস্বলে সংগ্রহ করিতে পারিলাম না। এজন্য সর্ব্বাগ্রে পুষ্পমালা সম্বন্ধেই আলোচনা করিব। পুষ্পমালার প্রথম কবিতাটিই একটি আধ্যাত্মিক কবিতা। কবি গভীর নিশীথ কালে অধ্যাত্ম চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া ধর্ম্মের যে গূঢ়ভাব উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহাই এই কবিতাটির মধ্যে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। আমরা উহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছিঃ—

"কি ঘোর গভীর নিশি! আঁধার সাগরে
মগ্ন ধরা; * *
* * *
অগাধ জলধিতলে, শৈবাল কুহরে
কীটাণু নিবসে যথা; আমি সেইরূপ
আঁধার সাগরগর্ভে, আপন কুটীরে
ডুবে আছি; পরিজন সকলে নিদ্রিত!
কি ঘোর নিস্তব্ধ দিক! নিশার আকাশে,
অদৃশ্য প্রহরী কেহ যেন ঘোর রবে
ফুকারিছে—সাঁ সাঁ করে; বিশ্ব চমকিত!
কে আমি!—পড়িয়ে এই জলধির তলে
সভয়ে জিজ্ঞাসা করি কে আমি রজনী!
ভূতধাত্রি! গিরি, নদী, গ্রাম জনপদ,
তরুলতা জীবজন্তু কোটি কোটি লয়ে
ফিরিতেছ, আগে শুনি কে তুমি ধরণি?
এ বিশ্বে ত রেণু তুমি!—তবে আমি কোথা!
কল্পনে! ভারতি! স্মৃতি! মোর প্রিয়ধন
তোমরা কি? করি আমি কার অহঙ্কার?
আমি কই! এই বিশ্বে যাই যে মিলায়ে!
বিশ্বদেব! তুমি তবে কিরূপ অদ্ভুত!
কি জানি! কীটাণু হয়ে রেণুকণামাঝে
পড়ে আছি, আমি দেব কি আর বর্ণিব
তব কথা! কোটি বিশ্ব, কোটি চন্দ্র তারা,
কোটি পৃথ্বী, কোটি জীব স্তব্ধ যার ভয়ে,
সেই তুমি! * *

* * *

এই যে আঁধার, ইহা তব স্নেহ-ছায়া
ঢেকেছে আমারে, যথা মাতা বিহগিনী
আপন শাবকে ঢাকে; ঢেকেছে আমারে
প্রাণবাসে; তবে আমি লুকাই জননি!
লুকাই তোমার ক্রোড়ে;"

ঈশ্বরানুভূতির এইরূপ উচ্চ ভাবের অকৃত্রিম কবিতা বাঙ্গালা সাহিত্যে ত বড় বেশি দেখিতে পাই না। ধর্ম্মরসজ্ঞ কবির চমৎকার বর্ণনার গুণে বক্তব্য বিষয়টি জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে।

ইহার পরেই "উৎসর্গ" শীর্ষক একটি অপূর্ব্ব কবিতা। এই কবিতাটি সম্বন্ধে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ১২৮৭ সালের বঙ্গদর্শনের "বাঙ্গালা সাহিত্য" শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, "যে কবিতায় তিনি (শিবনাথ শাস্ত্রী) স্বদেশের জন্য আত্মজীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, তাহার ন্যায় উচ্চতর ভাবপূর্ণ কবিতা আর দেখি নাই।"

এইরূপ উচ্চ ভাবের কবিতা হয় ত আরও থাকিতে পারে। কিন্তু শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার কবিতার সঙ্গে জীবনকে এক করিয়াছেন। তিনি ত কল্পনায় শুধু স্বপ্ন রচনা করেন নাই। যেমন স্বার্থত্যাগ করিয়া স্বদেশের সেবায় আত্মজীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, তেমনি "উৎসর্গ" শীর্ষক কবিতা রচনা করিয়াছেন। আমরা এই কবিতার মধ্যে ত শুধুই ভাষা, ছন্দ ও ভাব দেখিতে পাই না। অরণ্যের বৃক্ষান্তরাল হইতে যেমন সূর্য্যের এক একটি রশ্মিরেখা প্রকাশ হইয়া পড়ে; তেমনি ইহার ভাষা ও ছন্দের অন্তরাল হইতে একটি উন্নত হৃদয়ের এক একটি অংশ প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে। সেই জন্যই এই কবিতাটি বাঙ্গালা সাহিত্যের এক অমূল্য সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছে। ইহার এক একটি কথা স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখিবার যোগ্য। আমরা নিম্নে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি :—

"শুধু চক্ষু জলে কি হবে ভাসিলে,
তাতে কি রজনী হবে অবসান?
সুদৃঢ় সংকল্পে আজি প্রতিজন
করুক উৎসর্গ নিজের জীবন,
দেখি দেখি তায় যায় কি না যায়
এ ঘোর দুর্দ্দশা রজনী সমান।"
"হবে না কথাতে কেবল লেখাতে
করিতে হইবে কঠোর সাধনা।
চরিত্রের শোভা চাই দেখিবারে,
ভারত সন্তান তবে বলি তারে,
* * * *
ইন্দ্রিয়ের দাস যেবা বারমাস
দেশের উদ্ধার তার কর্ম্ম নয়।"

কবির এই শেষোক্ত সারবান কথাগুলি বিশেষভাবে চিন্তা করিবার যোগ্য। বাস্তবিক যার চরিত্র উন্নত নয়, সে কিরূপে ভারত-সন্তান বলিয়া গর্ব্ব করিবে? আর যে সর্ব্বদা ইন্দ্রিয়ের দাস, তাহার দ্বারাই বা কিরূপে দেশের দুর্গতি দূর হইবে? ভারতবর্ষের যদি কোন গৌরব করিবার সামগ্রী থাকে ত সে ধর্ম্মসম্পদ। এই ধর্ম্মসম্পদেই ভারতভূমি শক্তিশালিনী হইয়াছিল। এখন যাহারা ধর্ম্মকে অগ্রাহ্য করিয়া, চরিত্র হইতে স্খলিত হইয়া দেশের দুর্গতি দূর করিতে চাহেন, পুণ্যময়ী ভারতমাতা কি তাঁহাদের কার্য্যের প্রতি প্রসন্ন দৃষ্টিপাত করিতে পারেন? যাঁহারা উন্নত চরিত্র এবং গভীর আধ্যাত্মিক ভাবের দ্বারা ভারতের ধর্ম্মসম্পদকে রক্ষা করিয়া, দেশের কার্য্য করিতে পারিবেন; তাঁহাদের দ্বারাই জন্মভূমির মুখোজ্জ্বল হইবে।

এই সুদীর্ঘ কবিতার উপসংহার-কালে কবি বলিতেছেন;—

"আমি বড় দুঃখী তাতে দুঃখ নাই
পরে সুখী করে সুখী হতে চাই;
নিজে ত কাঁদিব কিন্তু মুছাইব
অপরের আঁখ এই ভিক্ষা চাই।
সত্য—ধন মান চাহে না এ প্রাণ
যদি কাজে আসি তবে বেঁচে যাই।
বহু কষ্টে পূর্ণ আমার অন্তর
এই আশীর্ব্বাদ করহে ঈশ্বর
খাটিতে বাঁচিব খাটিয়া মরিব
এই বড় আশা, পূর্ণ কর তাই।"

কথাগুলি ব্যক্তিগত হইলেও ইহা না বলিয়া পারিতেছি না যে, কবির এই প্রার্থনা পূর্ণ হইয়াছে। তিনি বিগত ত্রিশ বৎসর অবিশ্রান্ত দেশের জন্য খাটিয়া খাটিয়া দেহের শক্তি ক্ষয় করিয়াছেন এবং শরীরের স্বাস্থ্য হারাইয়াছেন। আমরা যথার্থই যদি দেশের উন্নতি চাই, তাহা হইলে সকলেই যেন সরল প্রাণে ঈশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা করি যে,—

"সত্য—ধন মান চাহে না এ প্রাণ

* * * *

খাটিতে বাঁচিব খাটিয়া মরিব।"

অতঃপর পুষ্পমালার "বহুদূর নয়" শীর্ষক আর একটি জাতীয় ভাবোদ্দীপক কবিতার উল্লেখ করিব। আমাদের বিবেচনায় এ কবিতাটি হেমচন্দ্রের জাতীয় ভাবোদ্দীপক কবিতার পার্শ্বেই স্থান পাইবার যোগ্য। স্বদেশের সেবায় উৎসর্গীকৃত-প্রাণ কবি গভীর নিশীথে জাগ্রত হইয়া ভারতের দুর্গতির কথা ভাবিতে ভাবিতে অধীর হইয়া পড়িয়াছেন; এবং তাঁহার হৃদয়োদ্বেলিত ভাবরাশি এই কবিতাটির মধ্যে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। কবি বলিতেছেন :—

"ঘুমাইতে চাই কেহ কাণে বলে
ঘুমায়ে কি আছে সন্তান সকলে!
তাই ত আমার ঘুম দূরে গেল,
তাই ত আমার প্রাণ উথলিল,
একাকী জাগিয়া রয়েছি বসিয়া
অন্য সব ভাই কেন ঘুমাইল?
কেন না সকলে সে রব শুনিল?

* * * *

অভদ্র কি ভদ্র লোক শত শত
অনাহারে শীর্ণ দেখি অবিরত;
না যেতে যৌবন তাদের নয়নে
বিষাদ নিরাশা দেখি এক সনে,
দারিদ্র্য যাঁতায় প্রাণ পিষে যায়
চূর্ণ আশা যত কঠোর ঘর্ষণে
সে মুখ ভাবিলে ঘুমাই কেমনে?

* * * *

বুঝিয়াছি বেশ দিতে হবে প্রাণ,
তবে যে জাগিবে ভারত-সন্তান;
আর জন কত ধরি এই ব্রত
খাটিয়া জীবন করি অবসান
তবে যদি জাগে ভারত-সন্তান।"

আজ স্বদেশী আন্দোলনে কবিগণ যে কথা বলিতেছেন, ভবিষ্যদ্দর্শী কবি বহু পূর্ব্বেই সেই সকল কথা বলিয়া রাখিয়াছেন। কবির স্বদেশের প্রতি কি প্রবল অনুরাগ! তিনি প্রাণের আবেগে প্রত্যেক কবিতায়ই বলিতেছেন, জননী জন্মভূমির জন্য খাটিয়াই এ জীবনলীলা সাঙ্গ করিব। এই সকল কথা কবি শুধু সাময়িক ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া বলেন নাই। তাঁহার যে কথা সেই কাজ! অদ্যাপি তিনি রুগ্ন শয্যায় শায়িত থাকিয়াও দেশের জন্য ভাবিতেছেন। কে বলিবে এই সকল ত্যাগী পুরুষের আত্মবিসর্জ্জনের সুকৃতির ফলেই আজ ভারত-সন্তানগণ জাগিয়া উঠিয়াছে কি না!

অতঃপর আমরা "হিমাদ্রিকুসুম" গ্রন্থের আলোচনা করিব। ইহার "দীক্ষা" শীর্ষক আখ্যান কাব্যখানির মধ্যে ধর্ম্মের গূঢ় রহস্য বর্ণিত হইয়াছে। একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, সাধকের জীবনের চারিটি অবস্থা আছে। প্রথমাবস্থায় বৈরাগ্য, দ্বিতীয় অবস্থায় সাধন, তৃতীয় অবস্থায় ভক্তিলাভ, চতুর্থ অবস্থায় মানব-প্রীতিতে সেই ভক্তির পূর্ণতা। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনী আলোচনা করিলে তন্মধ্যে এই লক্ষণগুলি দৃষ্টিগোচর হয়। প্রথমতঃ তাঁহার পিতামহীর মৃত্যুতে শ্মশান ঘাটে বৈরাগ্যের উদয় হইল। সেই বৈরাগ্যের প্রভাবেই তিনি সাংসারিক সুখে বীতস্পৃহ হইলেন। তৎপরে অন্যান্য গোলযোগে সংসারের প্রতি বিরক্ত হইয়া হিমালয়ে গমন করিলেন। সেখানে দুই বৎসর কঠোর সাধনের দ্বারা ব্রহ্মদর্শন করিলেন এবং তাঁহার অন্তরে ভক্তি স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইল। পরিশেষে তাঁহার অন্তরের প্রীতি সংসারে ধাবিত হইল। তিনি ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ লাভ করিয়া সংসারে আগমন করিলেন। তৎপরে লোকহিত সাধনে তাঁহার প্রীতি সম্পূর্ণতা লাভ করিল এবং তাঁহার হৃদয় বিশ্বমানবের মধ্যে সম্প্রসারিত হইয়া বিশ্বনাথের সঙ্গেও মহাযোগে যুক্ত হইল,

কবি মহর্ষির জীবনের এই সকল সত্যের ছায়া অবলম্বন করিয়া হিমাদ্রিকুসুমের "দীক্ষা" শীর্ষক আখ্যান কাব্যটি রচনা করিয়াছেন। কাব্যের নায়ক নরেন্দ্র—

"ছিল বঙ্গে এক ধনীর সন্তান
* * * *
সুপ্রশস্ত চিত্ত, অতি সদাশয়
পর দুঃখে দুঃখী কোমল হৃদয়
* * * *
সদালাপে মতি জ্ঞানলাভে রুচি।"

কিন্তু মানুষের দুর্ব্যবহারে তাঁহার সংসারে বৈরাগ্য উপস্থিত হইল। তিনি লোকালয় ত্যাগ করিলেন; এবং একটি নির্জ্জন গিরিশৃঙ্গে উপনীত হইয়া বাস করিতে লাগিলেন। গিরিশৃঙ্গের তরুলতার হরিৎ কান্তি, প্রস্ফুটিত পুষ্পনিচয়ের অনুপম শোভা, জলপ্রপাতের বিচিত্র দৃশ্য এবং সূর্য্যালোক-রঞ্জিত তুষারমালার অভিনব সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে তাঁহার চিত্ত সৌন্দর্য্যময়ের অনির্ব্বচনীয় ভাবের মধ্যে নিমগ্ন হইতে লাগিল। তিনি ধ্যানস্থ হইয়া ঈশ্বরের মহা সত্ত্বার মধ্যে তন্ময় হইয়া যাইতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহার অন্তরে ব্রহ্মস্ফূর্ত্তি হইল; তিনি ঈশ্বর দর্শন করিলেন, ঈশ্বরের ভক্ত হইলেন। তখন তাঁহার হৃদয়ের প্রীতি উৎসের জলধারার ন্যায় কেবল ঈশ্বরের অভিমুখে উৎক্ষিপ্ত হইয়াই ক্ষান্ত রহিল না; উহা নিম্নগামিনী নদীর জলস্রোতের ন্যায় নরনারীর অন্তরের মধ্যদিয়া প্রবাহিত হইতে চাহিল। নরেন্দ্র আবার পরিত্যক্ত লোকালয়ে আগমন করিয়া বিশ্বকার্য্যে আত্মসমর্পণ করিলেন। ইহাতেই তাঁহার হৃদয় সম্প্রসারিত, প্রেম চরিতার্থ এবং জন্ম সার্থক হইল।

এই ত গেল আখ্যায়িকার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম কিন্তু কবি আপনার আশ্চর্য্য আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার প্রভাবে ইহার এক একটি উচ্চ ভাব কাব্যের মধ্যে কিরূপভাবে পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছেন, তাহাই দেখাইব। মানুষের বীরত্ব, মহত্ব এবং প্রেমের অভিনয় সর্ব্বদাই আমাদের চোখের সম্মুখে অভিনয় হইতেছে; তাহার বর্ণনা করাও তত কঠিন কার্য্য নহে। কিন্তু ঈশ্বর দর্শন প্রভৃতি ইন্দ্রিয়াতীত বিষয়ের বর্ণনা করা বড় কঠিন। অথচ ব্রহ্মবিৎ কবি নরেন্দ্রের ঈশ্বর দর্শনের ভাবটি কিরূপ সুন্দর ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, দেখুন :—

"কাল সূত্র ধরি
সৃষ্টির প্রারম্ভে গেনু; যবে তারাদল
নাহি ছিল,—মহাকাশ যবে পূর্ণ করি
অগ্নিময় বাষ্প রাশি খেলিত কেবল!
ভাবিলাম সে কি শক্তি, লক্ষ যুগ ধরি
ফুটায়ে তুলিল যাহা বিচিত্র কৌশল?
দেশ কালে সেই শক্তি দেখিনু ব্যাপিয়া
জড়ের বিচিত্র শোভা তুলিছে গড়িয়া।"

"জড় চেতনের পারে, ডুবিতে ডুবিতে
কি যেন ঠেকিল প্রাণে! ডুবুরি যেমন,
অগাধ সলিল ভেদি নামিতে নামিতে
পায় ভূমি; আমি তথা হইয়া মগন,
দেখিনু অতল-তলে যেন আচম্বিতে
সত্য তিনি। সেই শক্তি কূটস্থ চেতন,
এ বিশ্ব যাহারি লীলা, অদ্ভুত প্রকাশ
নিমেষে ভগিনি, তাঁর দেখিনু আভাস।"

"যতই ডুবিল মন এ তত্ত্ব-সাগরে,
ভুলিলাম দেশ কাল; যেন প্রাণাকাশে
মিশাইল প্রাণ মোর! বাহিরে অন্তরে
সেই সত্তা বিরাজিত, উজ্জ্বল বিশ্বাসে
ধরিনু সে সত্তা বোন! তনু থর থরে
কেঁপে গেল; মন প্রাণ পূরিল উল্লাসে;
উথলিল সান্দ্রানন্দ হৃদয় গভীরে,
ডুবিল পরাণ সেই পুণ্য-শান্ত-নীরে।"

"দেখিনু যে মহাশক্তি জগত মাঝারে
ভাঙ্গিছে গড়িছে সদা; নিজে এক হয়ে
বিবিধ শক্তির খেলা বিবিধ প্রকারে
দেখাইছে: যুগে যুগে অদ্ভুত উপায়ে
শৃঙ্খলা সৌন্দর্য্য পুণ্য বিতরে সংসারে।"

ইহা কল্পনার হেঁয়ালী নয়। ইহার প্রত্যেকটি কথা ভাবিবার বুঝিবার এবং সাধন করিবার যোগ্য।

বর্ত্তমান সময়ের ধর্ম্মবিজ্ঞানের ও ধর্ম্মসাধনের অনেক তত্ত্ব এই কবিতাগুলির মধ্যে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

"দীক্ষা" শীর্ষক আখ্যান কাব্য হইতে আমাদের আরও উদ্ধৃত করিতে ইচ্ছা হইতেছে। কিন্তু প্রবন্ধের কলেবর ক্রমশই বৃদ্ধি হইতেছে; পাছে বা পাঠকদিগের ধৈর্য্যচ্যুতি হয়, সেই ভয়ে সে সংকল্প ত্যাগ করিলাম।

সর্ব্বশেষে সহৃদয় কবি রমণীদিগকে যে কি পবিত্র ভাবে দেখেন, আমরা তাহাই দেখাইব। অনেক বাঙ্গালী লেখক নাটকে প্রহসনে ও উপন্যাসে নারীর চরিত্র কলঙ্ককালিমায় লিপ্ত করিয়াছেন। আবার অনেক উচ্চশ্রেণীর লেখক নারীচরিত্রকে অতি উন্নতভাবে অঙ্কিত করিয়া সাহিত্যের গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছেন। কিন্তু শাস্ত্রী মহাশয় কোন্ রঙে নারীর ছবি আঁকিয়াছেন, তাহা একবার দেখুন:—

"ইন্দ্রিয়-বিকার-রোগ জন্মেছে যাহার,
তার যদি মহৌষধ কেহ মোরে চায়,
আমি বলি—খুঁজে লও নারী এ প্রকার
পার্থিব পাপের কালি স্পর্শেনি যাহায়,
লাবণ্যে কলঙ্ক-রেখা হয়নি সঞ্চার,
নারী যদি পাও হেন, গিয়ে তার পায়
আপনারে ফেলে রাখ,—সাধুতা-বাতাসে
ইন্দ্রিয়-বিকার-রোগ পলাবে তরাসে।"

শাস্ত্রী মহাশয় যথার্থই নারীদিগকে এইরূপ দেবী বলিয়া মনে করেন; সেজন্য নারীজাতির শিক্ষা ও স্বাধীনতার সপক্ষে এরূপ জলদগম্ভীর স্বরে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহার প্রতিধ্বনিতে সমগ্র ভারত প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। এই হিমাদ্রিকুসুমের মধ্যেই তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া লিখিতেছেন:—

বহুস্থান ঘুরে
ভারত নারীর বোন, যে দশা দেখে'ছি,
প্রাণেতে বেজেছে শেল, শোকের অক্ষরে
সে কথা হৃদয়পটে লিখিয়া রেখেছি।"

এখন আমরা ছায়াময়ী-পরিণয় সম্বন্ধে কিছু বলিয়াই এই রচনাটি সমাপ্ত করিব। ছায়াময়ী-পরিণয় একখানি রূপক কাব্য। এক একটি জীবনের যখন শুভমুহূর্ত্ত উপস্থিত হয়, তখন বিশ্বের স্বামী তাঁহার স্বরূপমাধুর্য্যে চিত্তকে আকৃষ্ট করেন; মানুষ তখন ঈশ্বরপ্রেমে আকুল হইয়া ভোগৈশ্বর্য্য তুচ্ছ করে; আত্মীয় স্বজনের মায়া-মমতা ভুলিয়া যায়; এবং বর্ষাকালের নির্ঝরের ন্যায় অনন্ত প্রেমসিন্ধুর উদ্দেশে ঘরের বাহির হয়। অবশেষে যখন প্রেমসিন্ধুর সঙ্গে তাহার মিলন হয়, তখনই সে আপনার দুর্ল্লভ মনুষ্যজন্মকে ধন্য মনে করে। ছায়াময়ী-পরিণয় গ্রন্থে ঈশ্বর-প্রেমের এই গূঢ় রহস্যই বর্ণনা করা হইয়াছে। ছায়াময়ী ঈশ্বর প্রেমে উন্মাদিনী হইয়াই গৃহের বাহির হইয়াছিলেন এবং ঈশ্বরের সঙ্গে প্রেমযোগে যুক্ত হইয়া নারীজন্ম ধন্য মনে করিয়াছিলেন।

শুনিয়াছি, স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয় এই গ্রন্থখানি বড়ই ভাল বাসিতেন। এ গ্রন্থের চিত্তাকর্ষক গল্পটি যে প্রত্যেক ধর্ম্মরসজ্ঞ ব্যক্তিরই মনোরঞ্জন করিতে পারিবে, তাহাতে সংশয় নাই। কিন্তু ইহার অধিকাংশ স্থানের ছন্দ পাঠকেরা পছন্দ করিবেন কি না সন্দেহ। পুস্তকের বিষয়টি ত বালকদিগের উপযোগী নহে; সুতরাং ছন্দটা অন্য রকম হইলেই বোধ হয় ভাল হইত। তা ছাড়া এরূপ ছন্দরচনায় কবি দীনবন্ধু মিত্র ও হেমচন্দ্র এবং রাজকৃষ্ণ রায় যেরূপ ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন, শাস্ত্রী মহাশয় যে সেরূপ ক্ষমতার পরিচয় দিতে পারেন নাই, তাহাও আমাকে স্বীকার করিতে হইবে। পড়িতে পড়িতে এক এক জায়গায় খট্ করিয়া বাঁধিয়া যায়। তবে এই গ্রন্থের মধ্যে অন্য প্রকার ছন্দে যে সকল অংশ রচিত হইয়াছে, তাহা অতি উত্তম। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা ছায়াময়ী-পরিণয়ের চমৎকার বন্দনাটি হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়াই এই রচনা সমাপ্ত করিব:—

"জয় হে সুন্দর মহিমা-সাগর
আজি কৃপা কি দেখি অপার!
জয় জয় করুণা-আধার।
বিষয় বন্ধনে সুখের শয়নে
ছিল শুয়ে যে জন ধরায়
জাগাইলে কিরূপে তাহায়!
ধন মান যৌবন নানা প্রলোভন

পথে ছিল অচল সমান
তবু তাতে বাঁধিল না প্রাণ,

* * * *

দেহ মন ঢালিয়ে প্রেমে বিকাইয়ে
আজি সে যে নিজে করে দান;
সঁপিতেছি দেখ মন প্রাণ!

* * * *

আজি যেন তটিনী সাগর-গামিনী
প্রেমে প্রেমে সুমধুর লয়;
দুটি তনু আজ এক হয়।
জয় হে সুন্দর মহিমা-সাগর
কি দেখালে আজি পরিণয়!
জয় জয় জয় প্রেমময়।"

শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত।

বনিতা-বিনোদ।

দ্বিতীয় বিনোদ।

ক্রোধ-শান্তি।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(১ আমাদের ক্রোধ হয় কেন? ক্রোধ-উৎপত্তির হেতু কি? এই হেতুর বিষয় বিবেচনা করিতে গেলে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ মদ ও মাৎসর্য্য এই ছয় রিপুর কথা একসঙ্গে আমাদিগের মনে হয়। ইহারা পরস্পর অতি ঘনিষ্ট আত্মীয়তা সূত্রে আবদ্ধ। অহঙ্কার এই সমস্ত দারুণ রিপুদিগের জনক। অহঙ্কার জিনিসটা কি? "আমি" এবং "আমার" এই জ্ঞানের নাম অহঙ্কার। কথাটা একটু শক্ত হইল। শক্ত হইবারই কথা। শাস্ত্রে বলে এই অহঙ্কার হইতেই এই বিশাল সৃষ্টি জন্মগ্রহণ করিয়াছে। অহঙ্কারের নাশ হইলেই আমাদের মুক্তি হয়। সুতরাং এই অহঙ্কারের প্রকৃত জ্ঞান লাভ করা সহজ হইতে পারে না। "রামের" পুত্র বি, এ, পাশ করিয়াছে, "আমার" পুত্র ফেল হইয়াছে। "রাম" "আমার" গাছের পাকা আমগুলি আমার বিনা আদেশ, অর্থাৎ জোর করিয়া, পাড়িয়া লইল। রাম আসিয়া বিনা দোষে "আমার" পুত্রকে প্রহার করিল। রামের ব্যবসায়ে দশহাজার টাকা লাভ হইয়াছে, আমার ভরা নৌকা ডুবিয়া গিয়াছে। এই সকল কারণে "রামের" উপর "আমার" ঈর্ষা বা ক্রোধ জন্মে। কেন? যেহেতু রাম আর আমি পৃথক। "আমার" পুত্র, "আমার" গাছের ফল, "আমার" ক্ষতি, ইত্যাদি এই যে "আমার" জ্ঞান,—ইহার মূলেই ঈর্ষা ও ক্রোধের বীজ রহিয়াছে। বিবেচনা করিয়া দেখিলে "আমার" কি আছে? যখন আমি পৃথিবীতে অসিয়াছিলাম, "আমার" কি কি সঙ্গে আনিয়াছিলাম, অথবা যখন আমাকে এই সংসার ছাড়িয়া পরলোকে যাইতে হইবে, তখনই বা "আমার" কি কি বস্তু সঙ্গে যাইবে? "আমার" "আমার" বলিতে যাহা বুঝি,—শত সহস্র চেষ্টায়ও তাহার মধ্যে একটা প্রিয় পদার্থ সঙ্গে লইয়া যাইতে পারিব না। "আমি" ও "আমার" এই যে জ্ঞান, ইহা মিথ্যা। অথচ এই মিথ্যা জ্ঞানে বাঁধা পড়িয়াই ত আমরা যত অনর্থ করিতেছি। অপরের যে জিনিসটা আছে, "আমার" নাই,—আমার তাহা পাইবার ইচ্ছা হইল। এই ইচ্ছার নাম "কাম"। যদি সেই বাঞ্ছিত পদার্থটী না পাই, তাহা হইলে আমার "ক্রোধ" জন্মে;—যদি পাই, তবে সেই প্রাপ্ত বস্তুর জন্য "মদ" ও "মোহ" এবং তদ্রূপ আরও অন্যান্য বস্তুর প্রাপ্তির জন্য "লোভ" জন্মে। "কামের" অপ্রাপ্তি জন্য "মাৎসর্য্য" বা হিংসারও উদ্ভব হয়। "ক্রোধ" হইতেও "মোহ" উৎপন্ন হয়। সুতরাং সকল বিপদের মূলে এই "আমার"। "আমার" ও "পরের" এই ভেদজ্ঞান মন হইতে মুছিয়া ফেলিতে পারিলে আর কোন রিপুই আমাদের হৃদয়ে আধিপত্য করিতে পারিবে না। কিন্তু এই "আমার" ও "পরের" জ্ঞান,—অর্থাৎ আত্মপর ভেদজ্ঞান—দূর হওয়া সহজ নহে। "সব বোন সব ভাই ভেদ নাই; ভেদ নাই" মুখে বলা যত সহজ, পালন করা দূরে থাকুক, ঠিক অনুভবে আনাও তত সহজ নহে। যেদিন আমরা এই আত্মপর ভেদজ্ঞান ভুলিয়া প্রকৃত সাম্য শিখিব, অকপট চিত্তে সকলকে আপনার বলিয়া ভাবিতে পারিব, সেই দিনই আমরা প্রকৃত স্বাধীন

হইব। রিপুর অধীনতাই অধীনতা। রিপুর অধীনতা হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিলে আমরা চরিতার্থ হইব।

দর্শন শাস্ত্রে এই অহঙ্কার নাশের অনেক উপায় উপদিষ্ট আছে। সে সকল বিবেচনার স্থল এ নহে। আমরা এ প্রবন্ধে পণ্ডিতদিগের কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিতে বসি নাই, আমাদিগের মত সামান্য লোকদিগের জন্যই ইহা লিখিত হইতেছে অতএব সাধারণ ভাবেই এই সকল কথার মীমাংসা করিতে হইবে। অহঙ্কার নামক প্রবল শত্রুর হাত হইতে রক্ষা পাইতে হইলে সর্ব্বাগ্রে "আমি বড়," "আমি পণ্ডিত" "আমি ধনী" প্রভৃতি আমাদিগের "বড়ত্বের" ভাব মন হইতে তাড়াইতে হইবে। জগতে আমা অপেক্ষা কত লক্ষ লক্ষ গুণে বড় ধনী, মানী, পণ্ডিত রহিয়াছেন, তাঁহাদের তুলনায় আমি তুচ্ছ তৃণবৎ—"তৃণ হইতেও সুনীচ" এইরূপ ভাবনা মনে করিতে হইবে। তোষামোদকারীকে ত্রিসীমানায় ঘেসিতে দেওয়া হইবে না। তোষামোদ-কারীর কথা শুনিলে আমার চিত্ত দুর্ব্বল হইবে, আমার দম্ভ বাড়িয়া উঠিবে এবং আমি হঠকারী হইয়া উঠিব। তোষামোদ আদৌ না শুনিলে ক্রমশঃ আমার মন কেবল আমার গুণের দিকে দেখিতে দেখিতে গর্ব্বিত হইয়া উঠিবে না, তখন আমার অগণ্য ত্রুটির প্রতি লক্ষ্য পড়িবে। আমার মিত্রগণ যদি আমার দোষ বা ত্রুটি দেখাইয়া দেন, তাহা হইলে আমি ক্রোধে অধীর না হইয়া কৃতজ্ঞ হইব,—সেই সকল দোষ বা ত্রুটি পরিহার করিবার চেষ্টা করিব। যদি দাস দাসী বিছানায় চাদর বিছাইতে একটু "কোঁচ" রাখিয়া দেয়, তাহা হইলে আমার কোমল কলেবরে বিঁধিবার ভয়ে অধীর হইব না; ভাবিব, 'আজ হয়ত আমা অপেক্ষা কতশত গুণে কোমলকায় "সুখী" ব্যক্তির অদৃষ্টে চাদরই জুটিতেছে না, কোঁচ ত দূরের কথা। জুতা নাই বলিয়া যদি আমি দুঃখে আকুল হই, তাহা হইলে যাহার জুতা দূরে থাকুক পা দুখানি পর্য্যন্ত নাই, সে কি করিবে?' আপনার গুণের সহিত আপনার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদিগের গুণের তুলনা করিলে একদিকে যেমন অহঙ্কার কম হইয়া যায় নিজের অপেক্ষা দুঃখী ব্যক্তিদিগের অভাবের সহিত নিজের অভাবের তুলনায় তদ্রূপ অভাব জনিত কষ্ট কমিয়া যায়। পরের গুণ এবং নিজের ত্রুটি দেখিবার অভ্যাস করিতে করিতে মন ক্রমশঃ দৃঢ় হইয়া যায় ও অহঙ্কার অভিমান কম হইয়া পড়ে। মন দৃঢ় ও সবল হইলে তুচ্ছ বিষয়ের জন্য আর ক্ষোভ উপস্থিত হয় না।

(২) ক্রোধকে অঙ্কুরেই দমন করা উচিত। সর্ব্বদা সতর্ক থাকিলে এই অভ্যাস হয়। ক্রোধ বাড়িয়া উঠিলে সেই আমার প্রভু হইয়া উঠিবে, তখন তাহাকে কে দমন করিবে? ক্ষুদ্র অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাড়িয়া উঠিলে তাহাকে নিভান দুঃসাধ্য হয়, তাহা সকলেই জানেন।

(৩) অপরের ক্রোধের সময় তাহার ভাব ভঙ্গী, আচার ব্যবহার, কথা বার্ত্তা লক্ষ্য করিলে অনেক উপকার হয়। "এ ব্যাক্তি যেমন ক্রুদ্ধ হইয়া কদাচার করিতেছে, আমার ক্রোধ হইলেও ত আমি এইরূপ করিব" এই চিন্তা করিলে বেশ শিক্ষা হয়। "এ যেমন চোখ লাল করিয়া দাঁতে দাঁত ঘসিতেছে, অশ্লীল ভাষায় গালাগালি দিতেছে, কাঁপিতেছে, আমি ক্রোধান্ধ হইলে ত আমিও এইরূপ করিব," ইহা বার বার আলোচনা করা উচিত।

(৪) শীতল জলে মুখ হাত পা ধুইলে উত্তপ্ত রক্ত শীতল হইয়া পড়ে এবং ক্রোধ অনেক শান্ত হইয়া যায়। সাবধান ব্যক্তি ক্রোধ শান্তির নিমিত্ত এই উপায় অবলম্বন করিতেও উপেক্ষা করেন না।

(৫) রাগে থর থর কাঁপিতেছে, মুখ চোখ লাল হইয়াছে,—ক্রোধান্ধ ব্যক্তি যদি নিজে এই ভয়ঙ্করমূর্ত্তি দর্পণে প্রত্যক্ষ করে, তাহা হইলে ক্রোধের পরিবর্ত্তে লজ্জা আসিয়া উপস্থিত হয়। এ উপায় অতি সহজ ও কার্য্যকর।

(৬) একটু বিলম্ব ক্রোধের মহৌষধ। মনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করুন, যে যত কেন অনর্থ হউক না, ক্রোধের সময় তাহার প্রতিবিধান করিবেন না। ক্রোধ পড়িয়া যাউক, তাহার পর যাহা উচিত বোধ হয় করিবেন। ক্রোধের সময় উত্তেজিত-চিত্তে প্রতিকার করিতে গিয়া

বুদ্ধদেব।

। ও যোগ্যতার

নতী করিতেছিলেন

জগতে যে কত অনিষ্ট হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। এই বিলম্ব ক্রোধের মহৌষধ—তাহা সকলেরই স্মরণ রাখা উচিত।

(৭) নিন্দুকের সঙ্গ বিষবৎ পরিত্যাগ। তোষামোদকারী অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর জন্তু যদি কেহ থাকে, সে নিন্দুক। নিন্দুক আসিয়া আপনাকে বলিল, "রাম অমুক স্থানে বহু ভদ্রলোকের সমক্ষে আপনাকে নিতান্ত দুষ্টপ্রকৃতির লোক ও লোভী বলিয়াছে।" আপনি ইহার কি উত্তর দিবেন? আপনি যদি বলেন, "রাম আমাকে দুষ্ট ও লোভী বলিয়াছে? সে ত কোন অন্যায় কথা বলে নাই। সে আমাকে ঠিকই চিনিয়াছে।" হতভাগ্যের ঠিক "জোঁকের মুখে নুন" দেওয়া হইবে। যদি সে অতি-বেহায়া না হয়, চুপ করিয়া চলিয়া যাইবে।

(৮) পশুর ব্যবহারে,—অর্থাৎ দুরন্ত ষাঁড় শৃঙ্গাঘাত করিলে, অথবা ক্ষিপ্ত শৃগাল কুক্কুরে দংশন করিলে,—পশুর উপর রাগ করা বৃথা। নির্ব্বোধ লোক পশুর সমান। নির্ব্বোধ না হইলে কেহ পরের অপমানাদি করে না। বৈদ্য যেমন আপনার চিকিৎসাধীন রোগিগণের প্রলাপ বাক্যাদিতে ক্রুদ্ধ না হইয়া তাহাদিগের প্রতি কৃপা করেন, বুদ্ধিমান লোকেরও সেইরূপ নির্ব্বোধদিগের প্রতি কৃপা করা উচিত, ক্রুদ্ধ হওয়া কর্ত্তব্য নহে।

(৯) অপরাধী ব্যক্তির সম্বন্ধে ভাল করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিলে অনেক সময় দেখা যাইবে যে ক্রোধ করা আদৌ উচিত নহে। উন্মত্ত, বালক, এবং পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজন প্রভৃতির উপর রাগ করা কখনও সঙ্গত নহে। আর যদি অপরাধী ব্যক্তি কাহারও আদেশে কাজ করিয়া থাকে, তাহা হইলেও তাহার উপর রাগ করা বৃথা। ফলতঃ যিনি ক্রোধকে জয় করিবার দৃঢ়সংকল্প করিয়া তদুপযোগী উপায় অবলম্বন করেন, সংযম অভ্যাস করিতে শিক্ষা করেন, তিনিই ক্রোধকে জয় করিতে পারেন। অভ্যাস ও সাধনা দ্বারা সকলই সম্ভব।

ভগবানের উপর পূর্ণ বিশ্বাস রাখিয়া, নিজের অহঙ্কার অভিমান খর্ব্ব করিতে, প্রতিনিয়ত নিজের ত্রুটি এবং অপরের গুণানুসন্ধান করিতে অভ্যাস করিলে চরিত্রের উন্নতি হয় ও হৃদয়ে শক্তি জন্মে। বুদ্ধিমান সারথি যেমন দৃঢ় রশ্মি দ্বারা বেগবান অশ্বসমূহকে সংযত করিয়া রাখে, মানুষও তেমনি ধৈর্য্য ও মানসিক শক্তির বলে [illegible] রিপুগণকে জয় করিতে পারে। যত্ন, উদ্যম, অধ্যবসায় এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞা সহকারে সাধনা করিলে সকল অসম্ভবই অতি সহজ-সম্ভব হইয়া পড়ে। সংসারে মানুষের অসাধ্য কিছুই নাই।

দ্বিতীয় বিনোদ সমাপ্ত।

শ্রীসত্যশরণ দাস।
অনুবাদক।

আগ্রার তাজ ও রূপসী বিধবা।

চৌধারে বিটপীরাজি সুন্দর শোভিত;
মধ্যে তার বহি যায় কৃষ্ণা প্রবাহিণী,
শ্রেষ্ঠ কারুকার্য্য তুই, মানব রচিত,
রে তাজ! হেরিয়া তোরে তৃপ্ত এ পরাণী
হ'ল আজি; কিন্তু আমি না করি স্বীকার,
তুমি গো উপমাহীন ভুবন-মাঝারে;
আমি জানি হেন বস্তু আছে এ সংসারে,
যাহার সৌন্দর্য্যে হারে সৌন্দর্য্য তোমার।
সুন্দরী সে ওহে তাজ যমুনা তোমারে
ঘিরি আছে, কেশের কালিন্দী তারে
আছে আহা আবেষ্টিয়া, তোমারি সমান;
বুকেতে বেঁধেছে ধনি মর্ম্মর পাষাণ;
শব-দেহ ধর তুমি হে তাজ বিষাদী!
আমার বিধবা সখী জীয়ন্তে সমাধি!

শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী সিংহ।

দুই রমেশ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

বাবু রমেশচন্দ্র মিত্র যখন প্রভূত যশ ও যোগ্যতার সহিত কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতী করিতেছিলেন

সেই সময়ে বাবু দ্বারিকানাথ মিত্র হাইকোর্টের সম্মানিত বিচারপতি পদে অভিষিক্ত ছিলেন। দ্বারিকানাথ হুগলী কলেজের এক জন দিকদিগন্তবিশ্রুত ছাত্র; এমন অসাধারণ প্রতিভাশালী যুবা ভারতবর্ষে অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। অষ্টাদশবর্ষ বয়ক্রমকাল ইনি যেরূপ ভাবে ইংরাজি লিখিতে পারিতেন এবং যেরূপ ভাবে দর্শন, ন্যায়, তর্ক শাস্ত্র, বিজ্ঞান প্রভৃতি কঠিন তত্ত্ববিদ্যা সমূহের জটিল ও কুটিল সমস্যা সমূহ সহজে মীমাংসা করিয়া দিতে পারিতেন, বড় বড় ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ তাহা দর্শন করিয়া বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া যাইতেন। সাহিত্যে তাঁহার অসাধারণ অধিকার ছিল, ইংরাজ পণ্ডিতেরা ইঁহাকে Son of the East বলিয়া সম্বোধন করিতেন। Webster's Dictionary খানা এই অসাধারণ প্রতিভাশালী যুবা কণ্ঠস্থ রাখিয়াছিলেন। সাহেবেরা বলিত, "দ্বারিকানাথ মিত্র নিকটে থাকিলে, অভিধান দেখিবার প্রয়োজন হয় না।" বাগ্মিতা, আইনাভিজ্ঞতা, তর্কশক্তি প্রভৃতিতেও দ্বারিকানাথ সে সময়ে অদ্বিতীয় ছিলেন। সার রমেশচন্দ্র দ্বারিকানাথের গুণরাশিতে বিমুগ্ধ হইয়া প্রায় দিবা রাত্রি তাঁহার সঙ্গে থাকিতেন; দ্বারিকানাথের সংসর্গও রমেশচন্দ্র মিত্রের উন্নতির অন্য কারণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। এই সময়ে রামগোপাল মিত্র নামে আর এক জন অসাধারণ পুরুষ ভবানীপুরে বাস করিতেন। সার রমেশ, বিচারপতি দ্বারিকানাথ এবং রামগোপাল মিত্র এই তিন জনে পরস্পর অভেদ মিত্র ছিলেন এবং একই সময়ে এই তিন অসাধাণ পুরুষ ভবানীপুরকে আলোকিত করিয়া বাস করিয়াছিলেন। রামগোপাল নয়টা ভাষায় অদ্বিতীয় পণ্ডিত বলিয়া বিখ্যাত। তিনি কখন গবর্ণমেণ্টের বা কোন রাজা বা নবাবের অধীনে চাকুরী স্বীকার করেন নাই, কখন কোন বাণিজ্য বা ব্যবসা বৃত্তি অবলম্বন করেন নাই, তাঁহার সমস্ত জীবন ঋষির ন্যায় বিদ্যাচর্চ্চায় অতিবাহিত হইয়াছিল। সেকালের ইউরোপ, আমেরিকা ও ভারতবর্ষের বড় বড় সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রে তিনি অত্যুৎকৃষ্ট প্রবন্ধ সমূহ লিখিতেন অথচ কখন নিজের নাম ব্যবহার করিতেন না। কৃত্রিম নাম ব্যবহার করিয়া লেখকের পরিচয় দিতেন। তাঁহার ভূসম্পত্তির যথাকথঞ্চিৎ আয়ে তিনি সন্তুষ্ট থাকিয়া দিনপাত করিতেন। এই মহাত্মাকে অতি অল্প লোকেই জানিত ও চিনিত, তিনি মানব সংসারে সুপরিচিত না হইয়া ভগবৎরাজ্যে সুপরিচিত হইতে ভালবাসিতেন। সার রমেশচন্দ্র এই ধার্ম্মিক ও সুবিদ্বান মহাত্মার সহিত অকপট সখ্যভাবে আবদ্ধ ছিলেন। ইঁহার পবিত্র সংসর্গ রমেশচন্দ্রের জীবনের উন্নতির অন্যবিধ কারণ।

খৃষ্টীয় ১৮৭৪ অব্দে দ্বারিকানাথ মিত্র ভবলীলা সম্বরণ করিলে পর রমেশচন্দ্র মিত্র চৌত্রিশবর্ষ বয়ক্রমকালে কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি পদে অভিষিক্ত হয়েন। এরূপ অসাধারণ সামর্থ্যশালী পুরুষ স্বল্প দিবস মধ্যেই যে গবর্ণমেণ্ট ও সাধারণের অনুরাগ ভাজন হইয়া উঠিবেন তাহা সকলেই আশা করিয়াছিল। এই আশা নিস্ফল হয় নাই। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে প্রধান বিচারপতি (চিফ্ জষ্টিশ্) কিয়দ্দিবসের জন্য অবকাশ গ্রহণ করায় ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট বাহাদুর রমেশচন্দ্র মিত্রকে ঐ পদে প্রতিনিধিত্ব করিবার আদেশ দেন। তখন মহাত্মা লর্ড রিপন ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারেল ছিলেন। যাহাতে কৃষ্ণকায় বাঙ্গালী ভারত রাজধানীস্থিত হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি না হয় তজ্জন্য সাহেবেরা কটিবদ্ধ হইয়া রমেশচন্দ্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল; মহাত্মা রিপনকে পর্য্যন্ত তাহারা বিভীষিকা প্রদর্শন করিতে লাগিল; সমগ্র বঙ্গদেশের সাহেব মহল রমেশ-ভীতি (Romeso phobia) নামে উৎকট রোগের আবির্ভাব হইয়াছে বলিয়া সে কালের হিন্দুপেট্রিয়ট নামক সুপ্রসিদ্ধ সমাচার পত্রে ভারতবিখ্যাত কৃষ্ণদাস পাল মহাশয় অতি সুন্দর রহস্যপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়া ইংরাজদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিতে লাগিলেন। গবর্ণর জেনেরল লর্ড রিপন সাহেবদিগের কথা তুচ্ছ করিয়া রমেশচন্দ্রকে চিফ্‌জষ্টিশ পদে নিয়োজিত করিলেন। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে পুনরায় ঐ সর্ব্বোচ্চ বিচারপতির পদ কিছু দিবসের জন্য শূন্য হইলে, লর্ড রিপন বাহাদুর রমেশচন্দ্রকে পুনর্ব্বার ঐ পদের প্রতিনিধিত্ব করিতে দিয়াছিলেন। ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট বলিয়াছিলেন, "গত বারে রমেশচন্দ্র মিত্র যেরূপ যোগ্যতা দেখা-

ইয়াছেন, তাঁহাতে রমেশচন্দ্র ভিন্ন আর কাহাকেও এবারে ঐ পদের প্রতিনিধি নিযুক্ত করিলে রমেশচন্দ্রের প্রতি ঘোরতর অন্যায় আচরণ করা হইবে।" ১৮৯০ অব্দে রমেশ বাবুকে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট হাইকোর্টের স্থায়ী রূপে চিফ্‌জষ্টিশ নিযুক্ত কবিবার প্রস্তাব করেন কিন্তু এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইবার অল্পদিন পূর্ব্বে স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায় রমেশচন্দ্র মিত্র সরকারী কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়েন। পঞ্চাশবর্ষ বয়ক্রম-কালে তিনি পেন্সন গ্রহণ করেন। তিনি চিরাবসর গ্রহণ করিলে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট প্রকাশ্য ভাবে তাঁহার চরিত্রবল, যোগ্যতা, পাণ্ডিত্য বিচারশক্তি, অসাধারণ প্রতিভা প্রভৃতির যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছিলেন।

রমেশ বাবু যখন হাইকোর্টের বিচারপতি তখন ভারতবিখ্যাত শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে "হাইকোর্ট অমান্য" করার অপরাধ বিষয়ে এক গুরুতর মোকদ্দমা উপস্থিত হয়। ঐ মোকদ্দমায় সমস্ত ভারতবর্ষ আন্দোলিত হইয়া উঠিয়াছিল। সেকালের পাঠক পাঠিকার বোধ হয় তাহা এখনও স্মরণ আছে। বিচারপতি নরিশ সাহেব এই মোকদ্দমার বিচার করিবার পূর্ব্বে প্রধান বিচারপতি সার রিচার্ড গার্থ সাহেব এবিষয়ে রমেশ বাবুর অভিমত জিজ্ঞাসা করেন। বলা বাহুল্য, ইংরাজ বিচারপতিদিগের মতের বিরুদ্ধে রমেশ বাবু ঘোরতর প্রতিবাদ করেন। অবশেষে সুরেন্দ্রনাথের দণ্ড হয়। কিন্তু রমেশচন্দ্রের উদার মত, ন্যায়ানুরাগ ও স্বাধীনচিত্ততার জন্য সমস্ত দেশ তাঁহার অশেষ প্রশংসা করিয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে পাটনার কমিশনার টেলর সাহেব, জজ দ্বারিকানাথ মিত্রের মানহানি করায় দণ্ডিত হইয়াছিলেন; রমেশচন্দ্র সেই বিচারে দ্বারিকানাথের পক্ষাবলম্বন করিয়া সত্যের ও স্বাধীনতার মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পশ্চাৎপদ হয়েন নাই। বিচারপতি রমেশচন্দ্রের সম্মুখে গিবন্ নামে নামে এক দুর্বৃত্ত ইংরাজ "জাল" (Forgery) করিয়া বহুলোককে সর্ব্বস্বান্ত করায়, অপরাধী রূপে বিচারার্থ আনীত হয়। গিবনকে পরিত্রাণ করিবার নিমিত্ত তৎকালের সমুদয় ইংরাজি সংবাদপত্র-সম্পাদক, নীলকর, চা-কর, বণিক এবং অপরাপর ইংরাজ যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। দেশে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল। অনেকে সার রমেশচন্দ্রকে ভয় দেখাইয়া ন্যায়-পথ ভ্রষ্ট করিবার জন্যও আন্দোলন করিতে বিমুখ হইল না, কিন্তু রমেশ বাবু কাহারও দিকে দৃক্‌পাৎ না করিয়া, সাহেবদের অন্যায় আন্দোলন ও যুক্তিকে তুচ্ছ করিয়া, অপরাধী দুর্বৃত্ত গিবনকে কঠোর শাস্তি দান করিলেন। ইহাতে অনেক সম্মানিত ও উচ্চপদস্থ ইউরোপীয় পুরুষের সহিত রমেশচন্দ্রের শত্রুতা হইয়াছিল। রমেশ বাবু তাহাতে দুঃখিত হয়েন নাই। তিনি কহিয়াছিলেন,"যাহারা সত্য, ধর্ম্ম, ন্যায় ও নিরপেক্ষতার বিরোধী, তাহাদের সহিত সংযোগ অপেক্ষা বিয়োগই বাঞ্ছনীয়।" শত্রুরা রমেশচন্দ্রের সাহস, স্বাধীনতা ও সত্যপরায়ণতা দেখিয়া লজ্জায় নীরব হইয়া গেল। (ক্রমশঃ)

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

সেবাস্বেচ্ছকগণের সম্বর্দ্ধনা।

এবার অর্দ্ধোদয় যোগ উপলক্ষে কলিকাতায় লক্ষ লক্ষ নরনারীর সমাগম হইয়াছিল। ইহাদের অধিকাংশই অশিক্ষিত স্ত্রীলোক। দুশ্চরিত্র বদমায়েসগণ এইরূপ লোক-সমাগমে কত লোকের সর্ব্বনাশ করে, পুলিস কত অত্যাচার করে, তাহার ইয়ত্তা নাই। এ বৎসর এই সকল যাত্রীদিগের গঙ্গাস্নানে সাহায্য ও অন্যান্য বিষয় সুবিধা করিয়া দিবার জন্য এক জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক দল গঠিত হইয়াছিল। বঙ্গদেশের শিক্ষিত যুবকগণ অনিদ্রা, অনাহার সহ্য করিয়া ভৃত্যের ন্যায় যাত্রীদিগের সেবা করিয়াছেন, তাঁহাদের স্নানের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন, রোগে শুশ্রূষা করিয়াছেন, মৃতদেহ দাহ করিয়াছেন। কয়েক সহস্র যুবক এই পবিত্র নরসেবা ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্ট পর্য্যন্ত ইঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিয়াছেন। দেশের লোক ইঁহাদিগকে ধন্য ধন্য করিতেছে। কিন্তু অসহায়া নারীদিগের সেবা করিয়া ইঁহারা বিশেষভাবে বঙ্গনারীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। স্বেচ্ছাসেবকগণের প্রতি এই কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য শ্রীমতী বিমলা দাস, শ্রীমতী নির্ম্মলাবালা সরকার, শ্রীমতী

সুবালা আচার্য্য ও শ্রীমতী লীলাবতী মিত্র মহাশয়াদিগের যত্নে ও উদ্যোগে বিগত ২৩এ মাঘ বৃহস্পতিবার অপরাহ্নে মেরীকার্পেন্টার হলে এক মহতী সভার অধিবেশন হয়। মিঃ কে, জি, গুপ্তের পত্নী শ্রীমতী প্রসন্নতারা গুপ্ত সভানেত্রী পদে বৃতা হইয়াছিলেন। শ্রীমতী মনোরমা মজুমদার, শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী, শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা সরকার, শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী দাস, শ্রীমতী লীলাবতী মিত্র বক্তৃতা করিয়াছিলেন। শ্রীমতী লাবণ্য-প্রভা সরকার নিম্নলিখিত রূপ আশীর্ব্বাদ করেন।

আশীর্ব্বাদ।

বিগত অর্দ্ধোদয় স্নান উপলক্ষে যে সকল স্বেচ্ছাসেবক স্নানার্থিনী মহিলাগণের সর্ব্ববিধ সুবিধাবিধান করিতে সকল শ্রম সানন্দে স্বীয় স্বীয় মস্তকে ধারণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সেই আত্মবিস্মৃত সেবার জন্য সমগ্র বঙ্গনারীর আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও সাদর অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতে আমরা এখানে সমবেত হইয়াছি। সেবকদলের এই পরিশ্রম অপরিমেয়; তাঁহারা যদি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই গুরু শ্রমভার বহন করিতে অগ্রসর না হইতেন, তবে বঙ্গের কত গৃহে আজ হাহাকার উঠিত ও কত প্রাণ আজ অব্যক্ত গভীর বেদনার পীড়নে ধুলিবিলুণ্ঠিত হইত তাহা আমরা সকলেই অবগত আছি। যে গৃহ ও যে দেশে নারীর প্রতি সম্ভ্রমশীল এইরূপ যুবকদলের অভ্যুদয় হয়, সে গৃহ ও সে দেশ বিধাতার কৃপা ও মহত্ত্ব লাভ করিয়া ধন্য হইয়া থাকে। বিধাতার শুভ বরে সেই সুদিন বঙ্গদেশে আবির্ভূত হইতেছে দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইতেছি। বঙ্গজননীর সুসন্তানগণ, বিধাতার করুণা সকল সঙ্কটে আপনাদের রক্ষা-কবচ হউক, আপনাদের ভগিনী ও মাতৃস্থানীয়াদের ইহাই আন্তরিক আশীর্ব্বাদ।

শ্রীমতী লীলাবতী মিত্র নিম্নলিখিতরূপে সকলকে আশীর্ব্বাদ করেন।

জন্মভূমির ভবিষ্যৎ আশা-সন্তানবৃন্দ!

তোমরা গত অর্দ্ধোদয় যোগ উপলক্ষে যেরূপ অক্লান্ত পরিশ্রম সহকারে তিন লক্ষ নরনারীর সেবা করিয়াছ, তজ্জন্য আমরা হৃদয়ের আনন্দ তোমাদের না জানাইয়া থাকিতে পারিতেছি না। আমরা এখানে সম্মিলিত হইয়া স্বদেশের প্রতি তোমাদের নবীন উৎসাহকে ধন্যবাদ দিতেছি। অনেকে বলিতেছেন যে ভারতে সুপ্রভাত আসিয়াছে। বিধাতার আশীর্ব্বাদে তোমরাই সেই সুপ্রভাত আনিয়াছ।

তাই বৎসগণ! তোমাদের উপর অন্যায়ের দণ্ড বিশেষ ভাবে পতিত হইতেছে। তোমরা জান না, তোমরা যখন স্বদেশের জন্য, বিধাতার কার্য্যের জন্য দণ্ডিত হও, আমাদের প্রাণে কত ব্যথা লাগে। আমরা প্রত্যেক মাতা ও ভগিনী তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করি। ঠিক আমাদের নিজ সন্তানের ন্যায় তোমাদের কোন কষ্টের কথা শুনিলে আমাদেরও কষ্ট হয়, তোমাদের সুকার্য্যে আমাদেরও আনন্দ হয়।

তোমরা নারীর সম্ভ্রম কেমন করিয়া রক্ষা করিতে হয়, তাহার সুন্দর দৃষ্টান্ত এবার দেখাইয়াছ। কত লোক মাতা, ভগিনী হারাইয়া এই বিদেশে চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিতেছিল, তোমরাই তাহাদের অন্বেষণ করিয়া আনিয়া দিয়াছ; কত নিরাশ্রয় স্ত্রীলোকের সম্মান তোমরাই প্রকৃত মাতা ভগিনীর সম্মানের ন্যায় রক্ষা করিয়াছ। কতরূপ সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত লোকের সেবা করিয়া বিধাতা-প্রেরিত আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছ। এবার এই যোগ উপলক্ষে তিন লক্ষ লোকের সুবন্দোবস্ত, বিশেষ স্ত্রীলোকের সম্ভ্রম রক্ষা করিয়া তোমরা সমস্ত রমণী জাতির কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছ।

এত দিন লোকে ভাবিত, আমাদের গৃহের শৃঙ্খলা, সম্ভ্রম বিদেশীরা রক্ষা করিবে। তোমাদের মাতা ভগিনী হারাইবে, অপমানিত হইবে, আর বিদেশীরা তাহা খোঁজ করিয়া আনিয়া দিবে। এই সহরে কত অর্দ্ধোদয় যোগ এবং কতরূপ জনতা গিয়াছে। শত শত নরনারীর কতরূপে সর্ব্বনাশ অতীত কালে হইয়া গিয়াছে। তাহা-দের খোঁজ খবর কে লইত? গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থায় যাহা হইবার তাহাই হইত। কিন্তু এ কথা কি ঠিক নয়, নিজের গৃহের সুব্যবস্থা নিজে না লইলে অপরের বন্দো-বস্তে শৃঙ্খলা হয় না। তোমরা এবার নিজের গৃহের সন্ধান

পাইয়াছ, জন্মভূমিকে চিনিয়াছ, সমস্ত নরনারীকে তোমাদের মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী জ্ঞান করিয়াছ। তবে দেশের উন্নতির আশা সুদূর নয়। তাই আমরা প্রত্যেক নারী তোমাদের ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। সন্তানগণ! স্বদেশের কল্যাণের জন্য তোমরা যে সব সৎকার্য্য করিতেছ, তাহা বিধাতার অখণ্ড নিয়মে কালের পটে মুদ্রিত হইতেছে। জন্মভূমির জন্য, মায়ের মুখ উজ্জ্বল করিবার জন্য তোমরা যে প্রত্যেকে ভাইয়ের ন্যায় পাশাপাশি একযোগে কাজ করিতেছ, ইহা কি বৃথা যাইবে? বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের পরিবর্ত্তে ভারতে শুভযোগের উদয় হইয়াছে। এ সময়ে প্রত্যেকে প্রত্যেককে চিনিয়া লও; নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইতে শিক্ষা কর। দেখ, যেন পথভ্রান্ত হইয়া লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইয়া পড়িও না, জ্ঞানচক্ষে দেখ, ইহা ভারতের পক্ষে অতি শুভযোগ। এ যোগের সময় দেখ যেন কেহ কাহাকেও হারাইও না। তাহা হইলে আমরা আর কোন কালে একত্র হইয়া একযোগে স্বদেশের কার্য্য করিয়া গম্য পথে উপনীত হইতে পারিব না। শেষে কি আমরা আপনার দেশে আপন-জন হারাইয়া মায়ের নিকটে ম্লানমুখে ফিরিব? না! না! হে নবযুগের নবীন যাত্রিগণ! তোমরাই যে জাতীয় জীবনে সুপ্রভাত আনিয়াছ, তোমরা যে নূতন পথের সন্ধানে জাতীয় তরণী খুলিয়া দিয়াছ, আমরা আশার চক্ষে তাহাকে মহা সম্ভ্রমের সহিত অভিবাদন করিতেছি। কি সুন্দর সুবর্ণ যুগে তোমরা জন্মগ্রহণ করিয়াছ! সমস্ত জগৎ-সম্ভ্রমের সহিত তোমাদের দিকে চাহিয়া আছে। নব শতাব্দীর জাতীয় জীবনের উষাকালের নবীন সন্ন্যাসিগণ! তোমরা সেই সিদ্ধিদাতা বিধাতার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া জ্ঞানে, ধর্ম্মে, কর্ম্মে, শৌর্য্যে, এক হইয়া জগতকে চমকিত কর, ভগবানের নিকট এই প্রার্থনা করি। ঈশ্বরের শুভ আশীর্ব্বাদ তোমাদের উপর বর্ষিত হউক।

দেবী সারদাসুন্দরী।

বিগত ২৮শে অগ্রহায়ণ ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম নেতা স্বর্গীয় ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের পুণ্যবতী জননী সারদাসুন্দরী সেন ৮৮ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। আচার্য্য কেশবচন্দ্র বর্ত্তমান সভ্য জগতের এক জন প্রধান পুরুষ ছিলেন। যে মনস্বিনী পুণ্যবতী নারী তাঁহাকে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন এবং মৃত্যু পর্য্যন্ত তাঁহার পার্শে থাকিয়া সুকোমল মাতৃস্নেহে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাঁহার বিচিত্র জীবনকাহিনী মহিলাগণের পক্ষে বিশেষ শিক্ষাপ্রদ।

১৮১৯ খৃষ্টাব্দে ত্রিবেণীতে মাতুলালয়ে সারদাসুন্দরীর জন্ম হয়। তাঁহার পিতা গরিফা নিবাসী গৌরহরি দাস এক জন ভক্ত শাক্ত ছিলেন। এই পরিবারের রক্ত মাংসে প্রবল ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষা মিশ্রিত ছিল বলিয়া বোধ হয়। সারদাসুন্দরীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রবল ধর্ম্মোত্তেজনার অধীন হইয়া অল্প বয়সেই সন্ন্যাস-ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া গৃহত্যাগ করেন। সারদাসুন্দরীও শৈশব হইতেই ধর্ম্মনিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছিলেন। নয় বৎসর বয়সে সুবিখ্যাত দেওয়ান রামকমল সেনের পুত্র প্যারীমোহন সেনের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। বিবাহের পর দুই বৎসর পরে হিন্দুমতে তাঁহার ধর্ম্মদীক্ষা হয়, এবং তিনি নিয়মিত পূজা অর্চ্চনাদি শিক্ষা করেন। বিবাহের পূর্ব্বেই তাঁহার ধর্ম্মশীলা জননীর আদেশে তিনি ব্রত উপবাসাদি করিতেন। এই রূপে শৈশবে যে পবিত্র ধর্ম্মনিষ্ঠা তাঁহার অন্তরে জাগ্রত হইয়াছিল তাহাই অবশেষে পরিণতি লাভ করিয়া কেশবচন্দ্র রূপ মহাফল প্রসব করিয়াছিল। সংসারে বিনা কারণে কোন কার্য্যের উৎপত্তি হয় না, সুমাতা ব্যতীত সুপুত্রের কখনও জন্ম হয় না।

দেওয়ান রামকমল সেন উচ্চ বেতনভোগী অতি সম্মানিত রাজকর্ম্মচারী ছিলেন। তিনি পরম ভক্ত বৈষ্ণব ছিলেন। তাঁহার গৃহে পূজার্চ্চনা, কথকতা, কীর্ত্তনাদি অনুষ্ঠান নিয়মমত রূপে সম্পাদিত হইত। শ্বশুর বালিকা পুত্রবধূকে অতি স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। কিন্তু সারদাসুন্দরী সে সময়ে শাশুড়ীর শুভদৃষ্টি লাভ করিতে সমর্থ হন নাই। শাশুড়ীর তিরস্কার ভয়ে তাঁহাকে সর্ব্বদাই সন্ত্রস্ত থাকিতে হইত। প্যারীমোহন সেন টাঁকশালায় উচ্চ বেতনে কর্ম্ম করিতেন। সুতরাং শাশুড়ীর বিরাগ ব্যতীত সারদাসুন্দরীর পতি-গৃহে

আর কোন দুঃখ ছিল না। কিন্তু বিধাতা তাঁহাকে সুখে আসক্ত হইবার সুযোগ কোন দিনই দেন নাই। শৈশবে ভ্রাতার সন্ন্যাসের স্মৃতি, পতিগৃহে শাশুড়ীর বিরাগ এ সকলই তাঁহাকে সংসার সুখে অতৃপ্তি শিক্ষা দিয়াছিল। ২৫ বৎসর বয়সে তিনি বিধবা হন। তাঁহার গর্ভে তিন পুত্র ও চারি কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহার মৃত্যুকালে তাঁহারা কেহই জীবিত ছিলেন না। অনেক পৌত্র পৌত্রী, দৌহিত্র দৌহিত্রী ও জামাতার মৃত্যুশোকও ইঁহাকে সহিতে হইয়াছিল। কিন্তু সকল শোকের মধ্য দিয়া তিনি ক্রমশঃ ভগবানের দিকেই আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহার শোকাহত হৃদয় একমাত্র ভগবানের দিকেই চাহিয়া শান্তি লাভ করিত। কেশবচন্দ্র তাঁহাকে জননীরূপে লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। এমন জননীর গর্ভে স্থান পাইয়াছিলেন বলিয়াই তিনি কেশবচন্দ্র হইতে পারিয়াছিলেন; আর সারদাসুন্দরীও কেশবচন্দ্রকে পুত্ররূপে পাইয়া ধন্য হইয়া গিয়াছেন। কেশবচন্দ্র ধর্ম্মপথে তাঁহাকে যেরূপ সাহায্য করিয়াছেন জগতে অল্প জননীই পুত্রের নিকট এরূপ সাহায্য লাভ করিয়া থাকেন।

প্রচলিত ধর্ম্মবিশ্বাসে কেশবচন্দ্রের যখন অবিশ্বাস জন্মিল, স্বীয় বিশ্বাসানুযায়ী তিনি যখন জাতিভেদ ও পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিলেন, আপনার আত্মীয় স্বজনও তখন কেশবচন্দ্রকে পরিত্যাগ করিলেন। সুকোমল মাতৃস্নেহ রক্ষাকবচের ন্যায় তখন স্বভাবতঃই কেশবচন্দ্রকে আবেষ্টন করিয়া রহিল। কিন্তু স্বাভাবিক সন্তান-স্নেহের উপরে পুত্রের ঈশ্বরভক্তি ও ধর্ম্মনিষ্ঠা দেখিয়া তাঁহার ধর্ম্মপ্রবণ হৃদয় কেশবচন্দ্রের নিকট অবনত হইল। তিনি কুলপাবন পুত্রকে দেবতা জ্ঞানে ভক্তি করিতে লাগিলেন। কেশবচন্দ্র ব্রাহ্ম ছিলেন, কেশব-জননী চিরকালই হিন্দু ছিলেন, মৃত্যু পর্য্যন্ত নিষ্ঠাবতী হিন্দু বিধবার ন্যায়ই জীবনের সকল অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মের উচ্চ তত্ত্বগুলি তিনি হৃদয়ে ধারণ করিতে পারিতেন এবং বলিতেন, 'দৃশ্যমান দেবদেবীর পূজা করিতে বসিলেও আমি তদতীত প্রাণরূপী পরমাত্মারই অর্চ্চনা করি।' অনেকেই অল্পদিন পূর্ব্বেও কেশবচন্দ্রের উপাসনা-গৃহ কমল কুটীরে তাঁহার সরল ব্যাকুল প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছেন: কেশবচন্দ্র তাঁহাকে যে প্রার্থনাশীলতা শিক্ষা দিয়া গিয়াছিলেন এই প্রার্থনা-পরায়ণতাই শেষ জীবনে তাঁহার এক মাত্র সান্ত্বনার উপায় হইয়াছিল। তিনি বলিয়া গিয়াছেন কেশবচন্দ্রের মৃত্যুর পর এক দিন আকুল হৃদয়ে ক্রন্দন করিতে করিতে তিনি ভগবানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেন তুমি আমাকে আমার প্রিয় সন্তানে বঞ্চিত করিলে?' ভিতর হইতে উত্তর হইল, "তুমি আমাকে চাও, না সংসারের জিনিষ চাও?" কেশব-জননী উত্তর করিলেন, "না প্রভু, সংসার চাই না, তোমাকে চাই।" পুনরায় উত্তর হইল, "তবে সংসারের সকলই হারাইতে প্রস্তুত হও।" অল্পদিন পরেই তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র নবীনচন্দ্র এবং কিছুকাল পরে কনিষ্ঠ কৃষ্ণবিহারীর মৃত্যু হইল। একে একে কন্যাগণও সকলে চলিয়া গেলেন। তিনি শোকে আত্মহারা হইয়া আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু শীঘ্রই আত্মসম্বরণ করিয়া বলিলেন, "কেশব যদি আমাকে প্রার্থনা করিতে শিক্ষা না দিত, তবে শোকতাপে কোন্ দিন মৃত্যুমুখে পতিত হইতাম।

কেশব-জননী বাস্তবিকই একজন আদর্শ নারী ছিলেন। কেশবচন্দ্র যখন আপন বিশ্বাসের অধীন হইয়া হিন্দুসমাজ পরিত্যাগ করেন তখন তাঁহার জননীর সহানুভূতি তাঁহার অন্তরে যথেষ্ট বল প্রদান করিয়াছিল। মতপার্থক্য বশতঃ কেশবচন্দ্র যখন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে বিযুক্ত হইয়া পড়েন তখনও তিনি জননীর প্রবল সহানুভূতি লাভ করিয়াছিলেন। ন্যায়ের পথ বিপদ সঙ্কুল হইলেও তাহাতে অগ্রসর হইতে সন্তানকে উৎসাহ দিতে হইবে, কেশব-জননী বঙ্গ-জননীগণকে এই আর এক মহাশিক্ষা দিয়া গিয়াছেন।

রাজনৈতিক কথা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

"আজ জাতীয় মহা সমিতির সমাধি-স্তূপের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া নিজের মনকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, সত্যই কি আমাদের একত্র থাকিবার আর উপায় ছিল না? সত্যই কি আমাদের মধ্যে এত সরিৎসাগর ব্যবধান, যে আমরা আর কিছুতেই মিলিয়া মিশিয়া কার্য্য করিতে পারিতাম না? প্রাণের অন্তস্তল হইতে এই সরল উত্তর আসিতেছে, কই কিছুই ত তফাৎ পাই না? চরমপন্থীরা যে পথের যাত্রী ধীরপন্থীরাও সেইখানেই যাইতেছেন। জাতীয় শিক্ষা, বয়কট, স্বদেশী এবং স্বরাজ তোমারও যেমন প্রিয় তাঁহাদিগেরও তেমনি প্রিয়। এক এক করিয়া আলোচনা করিয়া দেখাইতেছি। প্রথমেই জাতীয় শিক্ষা সম্বন্ধে দেখ, ডাক্তার ঘোষই এই শিক্ষা-পরিষদের সভাপতি এবং শ্রীযুক্ত এ, চৌধুরী তাহার সম্পাদক। কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্যদিগের মধ্যে আরও বহু ধীরপন্থী নেতাদিগের নাম দেখিতে পাইলাম। জাতীয় শিক্ষা লইয়া দেশব্যাপী যে তুমুল আন্দোলন উত্থিত হইয়াছিল এবং যাহার ফলে বাংলা দেশের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম রংপুরে জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাই, যে তাহার মূলেও ধীরপন্থীদিগের সেবাপরায়ণ হস্ত বিদ্যমান। তবেই দেখা যাইতেছে যে জাতীয় শিক্ষা লইয়া মতভেদ নাই। তাহার কল্যাণকল্পে তুমিও যেমন খাটিয়াছ এবং খাটিতেছ ধীরপন্থী স্বদেশী ভাইরাও ত তেমনি খাটিয়াছে এবং খাটিতেছে বলিয়া দাবী করিতে পারে। তবে তোমাতে তাহাতে মর্ম্মান্তিক প্রভেদ কোথায়? তার পর বয়কটের সম্বন্ধে আলোচনা করিলে দেখিতে পাই, যে বাংলা দেশে সুরেন্দ্র বাবু প্রমুখ ধীরপন্থী নেতৃগণই সর্ব্বপ্রথম বয়কট ঘোষণা করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদেরই প্রযত্নে ১৯০৫ সালের ৭ই আগষ্ট তারিখে টাউনহলের সভায় সমগ্র বাংলাদেশ কর্ত্তৃক বয়কটের প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতি ক্রমে রাজনৈতিক অস্ত্ররূপে পরিগৃহীত হয়। সুতরাং বয়কট সম্বন্ধেও ত কোনও গোলমাল দেখিতে পাইলাম না—সেখানেও চরমপন্থীদিগের সহিত ধীরপন্থীদিগের কোনও মতভেদ নাই। তা'র পর স্বদেশী। গত তিন বৎসর ধরিয়া সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আমরা যেরূপ দেখিয়াছি তাহাতে মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি, যে এই কয় বৎসর সুরেন্দ্র বাবু যুবকের উৎসাহ এবং তেজ লইয়া শরীরের রক্ত জল করিয়া দেশের জন্য খাটিয়াছেন। বাংলা দেশের সর্ব্বত্র যাহাতে প্রচারকেরা যাইয়া স্বদেশী প্রচার করিতে পারেন—দূর পল্লীপ্রান্তে যাহাতে স্বদেশীর জয়গান উচ্চারিত হয় তাহার জন্য এই কয় বৎসর ধরিয়া তাঁহাকে দিবা রাত্রি পরিশ্রম করিতে দেখিয়াছি—যেখানেই তাঁহাকে প্রচারের জন্য আহ্বান করা হইয়াছে সেইখানেই শরীরের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া এই বৃদ্ধ বয়সে যৌবনের স্ফূর্ত্তি ও উদ্যম লইয়া তিনি চলিয়া গিয়াছেন। গত তিন বৎসর স্বদেশী প্রচারের ইতিহাস যাঁহারা জানেন তাঁহারা অবগত আছেন, যে ধীরপন্থীগণ বাংলাদেশের সর্ব্বত্র যাহাতে স্বদেশী প্রচার হয়, তাহার জন্য শরীর, অর্থ এবং শক্তি কিছুরই প্রতি মায়া করেন নাই। এই ডাক্তার ঘোষই একা ৪০ হাজার টাকা দিয়া একটি দিয়াশলাইয়ের কারখানা খুলিতেছেন; বেঙ্গলকেমিকেল এবং ফার্ম্মাসিউটিকাল ওয়াকসেও একা ডাক্তার ঘোষ ৪০ হাজার টাকা দিয়াছেন; এইরূপ কত লোকের নাম করিব? যে যেমন পারিতেছে, সে সেই ভাবেই দেশের সেবা করিতেছে; এইরূপে সকলেই নিজের নিজের শক্তি এবং সামর্থ্য অনুযায়ী দেশের কল্যাণ কল্পে খাটিতেছেন। তবে কেন অকারণ সকলকে গালাগালি দিয়া দেশের মধ্যে কলহের বীজ বপন করিতেছ?

স্বরাজ সম্বন্ধেও কংগ্রেসে বাঙ্গালার ধীরপন্থীদিগের সহিত চরমপন্থীদিগের কোনও মতভেদ ছিল না। স্বরাজ সম্বন্ধে উভয় পক্ষই এই স্থির করিয়াছিলেন, যে গত কলিকাতা কংগ্রেসে স্বরাজের যেরূপ ব্যাখ্যা এবং মন্তব্য লিপিবদ্ধ হইয়াছে এবারকার কংগ্রেসেও সেইরূপ মন্তব্য লিপিবদ্ধ হইবে। এখন দেখা যাউক, কংগ্রেসের বাহিরে এই বিষয় লইয়া উভয় দলের মধ্যে কোনও পার্থক্য আছে কি না। এইবার দেখিতে পাইতেছি যে

একপক্ষ বলিতেছেন ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন তাঁহাদিগের আদর্শ এবং অন্য পক্ষ বলিতেছেন স্বাধীন এবং মুক্ত স্বায়ত্ত শাসনই তাঁহাদিগের আদর্শ। কিন্তু ইহা আদর্শ লইয়াই মতভেদ; কার্য্যপ্রণালী লইয়া কোনও মতভেদ নাই। উভয় পক্ষেরই আদর্শ প্রাপ্তির উপায় স্বদেশী, বয়কট, জাতীয় শিক্ষা, সালিশী সভা ইত্যাদি। গবর্ণমেণ্ট ঔপনিবেশিক স্বরাজ বা স্বাধীন স্বরাজ এতদুভয়ের কিছুই আমাদিগকে সহজে দিতেছেন না, সুতরাং পূর্ব্বাহ্নেই একটা মত লইয়া আমরা মারামারি করিতে বসিয়াছি কেন তাহা আমাদিগের বুদ্ধিতে আসে না।

বহুবার বলিয়াছি এবং এখনও বলিতেছি, জাতীয় জাগরণ এবং জাতীয় উত্থান শুধু আদর্শ লইয়া মারামারি কাটাকাটি করিলে হইবে না। তুমি আমি আদর্শ লইয়া মারামারি করিতেছি, আর ওদিকে যে তোমার আমার উভয়ের শত্রু সে মুখ টিপিয়া হাসিতেছে এবং সুবিধা পাইলে এই বিদ্বেষের আগুণে ইন্ধন প্রয়োগ করিতেও কুণ্ঠিত হইতেছে না। তিল তিল করিয়া স্বার্থত্যাগ না করিয়া কবে কোথায় মহাজাতির গঠন হইয়াছে? বিন্দু বিন্দু রক্ত দান না করিয়া কবে কোন্ জাতি জগতের সম্মুখে সগর্ব্বে মস্তকোত্তলন করিয়া দাঁড়াইয়াছে? ৭ সহস্র বৎসরের দাসত্বের টীকা ললাটে পরিয়া আজও যে কেন আমাদের চৈতন্য হইতেছে না তাহা বুঝিতে পারি না। ভারতবর্ষের আকাশ জুড়িয়া কালোমেঘ ভ্রূকুটী করিতেছে, সম্মুখে অনন্ত সিন্ধু উত্তাল তরঙ্গ তুলিয়া বিভীষিকা দেখাইতেছে—আর আমরা এক স্বদেশী নৌকায় সেই অনন্তসাগরে ভাসিয়া চলিয়াছি। সম্মুখে কত ঝড় ঝঞ্ঝাবাত, কত দুর্য্যোগ পড়িয়া রহিয়াছে; এই সকল বাধা অতিক্রম করিয়া ওই যে দূরে—অতি দূরে কুহেলিকাচ্ছন্ন অজ্ঞাত প্রদেশ দেখা যাইতেছে ওইখানেই তোমার স্বরাজের বিজয়-নিশান প্রোথিত রহিয়াছে; কিন্তু এখনই তাহার কি? এখন ত সবে অকূলে ভাসিয়াছ, ভীম গর্জ্জনে সিন্ধু তোমাকে গ্রাস করিতে আসিতেছে—এখন ঋষিদিগের মহাবাক্য স্মরণ করিয়া তোমরা সকলে এক সঙ্গে মিলিত হও, এক সঙ্গে কথা বল, একসঙ্গে সকলের মন সকলে জান।

সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সংবো মনাংসি জানতাং।
দেবাভাগং যথাপূর্ব্বে সংজানানা উপাসতে।
সমানীব আকুতিঃ সমানা হৃদয়ানিবঃ
সমানমস্তু বো মনঃ যথা বঃ সুসহাসতি ॥

আকাশে ঝড় উঠিবে তাহার লক্ষণ দেখা যাইতেছে—আজ আর আত্মকলহে প্রবৃত্ত হইয়া অকূলে নৌকাডুবি করিও না। এখন ত সবে "যাত্রা সুরু" হইয়াছে—এই সাগর যদি পার হইতে পার তবে ত স্বরাজ-তীর্থের সন্ধান পাইবে; আগে তবে কূলের কাছে পৌঁছাও, তখন আদর্শ লইয়া যুদ্ধ করিও এবং তখন না হয় ভোট লইও কে ওই ঔপনিবেশিক স্বরাজে নৌকা ভিড়াইতে চায় আর কেই বা ওই স্বাধীন স্বরাজের ঘাটে লাগাইতে চায়। আজ সাহস করিয়া বলিতেছি, আগে সেই পর্য্যন্তই যাও, তখন দেখিবে ত্রিশকোটি নরনারী এক মতাবলম্বী হইয়া একই ঘাটে নৌকা লাগাইতে বলিতেছে। সেটা ঔপনিবেশিক ঘাট কি স্বাধীন ঘাট সে কথাটা লইয়া এখন আর মারামারি করিও না।"

পাবনা প্রাদেশিক সমিতি।

কবিবর রবীন্দ্রনাথের নেতৃত্বাধীনে এবার নির্ব্বিবাদে প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশনে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। গত কংগ্রেসের কাণ্ড স্মরণ করিয়া প্রাদেশিক সমিতির সম্বন্ধে সকলেরই মনে বিশেষ উৎকণ্ঠা ছিল। কিন্তু ভগবানের কৃপায় সকল ভয়, সকল উৎকণ্ঠা দূর হইয়াছে। বঙ্গের চরমপন্থী ও ধীরপন্থীগণ এবার যে সুবিবেচনার পরিচয় দিয়াছেন, ভগবান করুন সমগ্র ভারতে তাহা অনুসৃত হউক। প্রাদেশিক সমিতির এই সফলতার জন্য রবীন্দ্রনাথ প্রধান ভাবে সমগ্র দেশবাসীর ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন। চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারিয়াছেন, দেশে যে নবশক্তি জন্ম গ্রহণ করিয়াছে তাহাকে সুপথে পরিচালনা করাই এখন আমাদের প্রধান কার্য্য। অন্তরে শক্তির অনুভূতি আমাদিগকে পীড়ন করিতেছে অথচ কি উপায়ে যে সেই শক্তি সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়ে দেশ সেবায় ব্যয়িত হইবে তাহা বুঝিতে না পারাতে শক্তির অপব্যয় হইতেছে, অমঙ্গলও উৎপন্ন হইতেছে। কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁহার দার্শনিক চিন্তা কবিত্বের আচ্ছাদনে অতি সুললিত ভাষায় দেশবাসীর সম্মুখে উপস্থিত করিয়া দেশের লোককে প্রকৃত কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে আহ্বান করিয়াছেন। তাঁহার আহ্বান দৈববাণীর ন্যায় ভারতবাসীর কর্ণে প্রবেশ করুক। সভাস্থলে প্রায় পাঁচ শত মহিলা উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতায় নারীজাতির সম্বন্ধে কোন কথা—নারীজাতির প্রতি কোন বার্ত্তা—নাই কেন?

২১১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্ম মিশন প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত দ্বারা মুদ্রিত।

মন্দির-পথ-বর্ত্তিনী

(মহারাষ্ট্র ভাস্কর ম্হাত্রে নির্ম্মিত মূর্ত্তির প্রতিলিপি)

The woman's cause is man's ; they rise or sink
Together, dwarfed or God-like, bond or free ;
If she be small, slight-natured, miserable,
How shall men grow ?

Tennyson.

৩য় ভাগ। } চৈত্র, ১৩১৪। { ১২শ সংখ্যা।

রমণী-প্রতিভা।

"প্রথমতঃ বুদ্ধির বিষয়, স্ত্রীলোকের বুদ্ধির পরীক্ষা কোন্‌কালে লইয়াছেন, যে অনায়াসেই তাহাদিগকে অল্পবুদ্ধি কহেন? কারণ বিদ্যাশিক্ষা এবং জ্ঞানশিক্ষা দিলে পরে ব্যক্তি যদি অনুভব ও গ্রহণ করিতে না পারে, তখন তাহাকে অল্পবুদ্ধি কহা সম্ভব হয়; আপনারা বিদ্যা শিক্ষা জ্ঞানোপদেশ স্ত্রীলোককে প্রায় দেন নাই, তবে তাহারা বুদ্ধিহীন হয় ইহা কিরূপে নিশ্চয় করেন? বরঞ্চ লীলাবতী, ভানুমতী, কর্ণাট রাজার পত্নী, কালিদাসের পত্নী প্রভৃতি যাহাকে যাহাকে বিদ্যাভ্যাস করাইয়াছিলেন, তাহারা সর্ব্বশাস্ত্রের পারগ রূপে বিখ্যাত আছে, বিশেষতঃ বৃহদারণ্যক উপনিষদে ব্যক্তই প্রমাণ আছে, যে অত্যন্ত দুরূহ ব্রহ্মজ্ঞান তাহা যাজ্ঞবল্ক্য আপন স্ত্রী মৈত্রেয়ীকে উপদেশ করিয়াছেন, মৈত্রেয়ীও তাহার গ্রহণ পূর্ব্বক কৃতার্থ হয়েন।"

সহমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সংবাদ।

(ইংরেজী ১৮১৯ সন)

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় যে সময়ে নারীজাতির বুদ্ধি সম্বন্ধে এই প্রকার সম্ভ্রমপূর্ণ মত ব্যক্ত করেন, তখন সুসভ্য ও সমুন্নত পাশ্চাত্য জাতি সমূহের মধ্যেও অতি অল্প লোকেই রমণী-প্রতিভায় সম্যক্‌ আস্থাবান ছিলেন। মনস্বিনী জর্জ্জ ইলিয়ট, কবি শ্রীমতী ব্রাউনিং, বিদুষী শ্রীমতী ফসেট, বৈজ্ঞানিক শ্রীমতী কুরি তখনও ভবিষ্যৎ গর্ভে নিহিত। স্ত্রীজাতির ন্যায্য-অধিকার লাভের পক্ষপাতী, বিজ্ঞ দার্শনিক ও ক্ষমতাশালী লেখক জন্‌ ষ্টুয়ার্ট মিল তখনও বালক; স্বাধীনচিত্ত ও সাম্যবাদী হার্ব্বার্ট স্পেন্সার তখনও জন্মগ্রহণ করেন নাই; বাগ্দেবীর বরপুত্র রাজকবি টেনিসনের "রাজকুমারী" (The Princess) নামক মিশ্রকাব্য নারীগণের গৌরব, মহত্ব ও অধিকারের প্রশ্ন উপস্থিত করিয়া তখনও জনসাধারণের চিত্তকে আলোড়িত করে নাই। রাজা রামমোহনের স্বর্গারোহণের পরে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে নারীসমাজে যে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে, মনে হয়, দিব্যদৃষ্টিতে তাহার পূর্ব্বাভাস দেখিতে পাইয়াই যেন তিনি এইরূপ লিখিয়াছিলেন। রাজার ঋষিত্ব বা অলৌকিক প্রতিভার ইহা অন্যতম প্রমাণ।

রামমোহন কতিপয় বিদুষী ভারতীয় নারীর উল্লেখ করিয়াছেন। ইতিহাস অধ্যয়ন করিলে বিভিন্ন দেশে অনেক মনস্বিনী রমণীর পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। খৃষ্টের জন্মের কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে গ্রীস দেশে স্যাফো (Sapho) নাম্নী এক কবি বর্ত্তমান ছিলেন, তাঁহার

লিখিত কবিতাগুলির অধিকাংশই বিলুপ্ত হইয়াছে, যাহা আছে, তাহা হইতেই জানা যায়, তিনি অসাধারণ কবিত্বশক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। খৃষ্ট-পূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীতে এথেন্স নগরীতে এস্পেসিয়া (Aspasia) নাম্নী এক রমণী আপনার সৌন্দর্য্য, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, বিদ্যাবত্তা ও বাক্‌পটুতা দ্বারা এমন খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন, যে তিনি অনন্যসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন, অদ্বিতীয় রাজনীতিজ্ঞ এথেন্সের গৌরবরবি পেরিক্লিসের (Periklesএর) বান্ধবী (hetaera) রূপে গৃহীত হইয়াছিলেন। আরব ও পারস্যেও অনেক মহিলা কাব্যে আপন আপন নাম চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন। ইচ্ছা করিলে অপরাপর দেশ হইতেও এইরূপ দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করা যাইতে পারে।

কিন্তু এযাবৎ কোনও রমণী কাব্যে ও সাহিত্যে পুরুষের সমকক্ষতা লাভ করিয়াছেন, এমত বলা কঠিন। পূর্ব্ব বা পশ্চিম দেশের ইতিহাসে বাল্মীকি, হোমর বা ড্যান্টের ন্যায় মহাকাব্য-রচয়িত্রী কোনও নারীর নাম প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কালিদাস বা শেক্ষপীরের সমকক্ষ নাট্যকার স্ত্রীজাতির মধ্যে কবে জন্মগ্রহণ করিবে, কে বলিতে পারে? সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান ও ইতিহাসে পুরুষের প্রাধান্য এ পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

তবে আর রমণীদিগকে অল্পবুদ্ধি কহিতে দোষ কি? পুরুষদিগের অপেক্ষা তাঁহাদিগের মানসিক শক্তি যে হীন, ইহা তো নিজ মুখেই স্বীকার করা হইল।

এ কথার উত্তর এই—একটি প্রধান ও নিত্যপ্রয়োজনীয় বিষয়ে রমণীগণ আপনাদিগের সমকক্ষতা প্রমাণিত করিয়াছেন—তাহা রাজনীতি।

প্রাগৈতিহাসিক যুগে, অনেক দেশেই অলৌকিক শক্তিসম্পন্না, মহীয়সী নারীর উল্লেখ দৃষ্ট হয়। অনেকেই এরূপ নারীর অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হইবেন। সুতরাং ইতিহাসে যাঁহাদিগের অবিনশ্বর কীর্ত্তিকাহিনী স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে, কেবল এইরূপ কয়েক জনের নামোল্লেখ করা যাইতেছে।

খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে জিনবিয়া (Zenobia) নাম্নী এক তেজস্বিনী রমণী এসিয়ার পশ্চিমখণ্ডে প্যাল্‌মিরা (Palmyra) রাজ্যের অধিশ্বরী ছিলেন। তিনি স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য দীর্ঘ কাল দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ রোমক সম্রাটের সহিত সংগ্রাম করিয়াছিলেন। পরিণামে পরাজিত হইয়া রাজ্য ও স্বাধীনতা হারাইলেও তাঁহার অসাধারণ শৌর্য্য ও স্বদেশপ্রীতির কাহিনী ইতিহাস কখনও বিস্মৃত হইতে পারিবে না। গিবনের "রোমক-সাম্রাজ্যের অবনতি ও অধঃপতন" (The Decline and Fall of the Roman Empire) নামক গ্রন্থে এই মনস্বিনী নারীর কীর্ত্তিগাথা সুললিত ভাষায় বিবৃত হইয়াছে।

ইংলণ্ডের রাণী এলিজাবেথের নাম শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই অবগত আছেন। তাঁহারই রাজত্বকালে ইংলণ্ড হীনাবস্থা হইতে উত্থিত হইয়া দুর্জ্জয় সমৃদ্ধিসম্পন্ন, শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত হয়। কেহ কেহ বলিতে পারেন, এই খ্যাতি তাঁহার মন্ত্রিগণের প্রাপ্য—ইহাতে রাণীর কিছুই কৃতিত্ব নাই। লর্ড বার্লে প্রভৃতির ন্যায় উপযুক্ত মন্ত্রী না পাইলে এলিজাবেথের রাজত্ব এমন গৌরবমণ্ডিত হইত না, এ কথা সত্য। কিন্তু উপযুক্ত মন্ত্রী নির্ব্বাচন করাও তো প্রকৃত প্রতিভার পরিচায়ক! হাজার শক্তিমান্ হইলেও রাজা কখনও একাকী রাজ্যশাসন করিতে পারেন না, তাঁহাকে মন্ত্রীদিগের উপর নির্ভর করিতেই হইবে। এলিজাবেথ লোকচরিত্র অবগত ছিলেন, সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধির সাহায্যে উপযুক্ত ভৃত্য নির্ব্বাচন করিতে জানিতেন, এবং যে বিশ্বাসের উপযুক্ত, তাহাকে পূর্ণ বিশ্বাস দ্বারা সমাদৃত করিতেন, তাই তাঁহার রাজত্বকাল ইংলণ্ডের ইতিহাসে সুবর্ণ-যুগ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে। বস্তুতঃ লোক-চরিত্রজ্ঞানে তাঁহাকে বর্ত্তমান কালের সর্ব্বপ্রধান মনস্বী নেপোলিয়নের সমকক্ষ বলিলেও কিছু মাত্র অত্যুক্তি হয় না।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে রুসিয়ার সম্রাজ্ঞী ক্যাথেরাইন (Catharine the Great) রাজনীতিক্ষেত্রে রমণী-প্রতিভার অন্যতম দৃষ্টান্ত। ইনি চরিত্রাংশে প্রশংসনীয় ছিলেন না। কিন্তু কূটরাজনীতিতে ইঁহাকে পরাভব করিতে পারে, ইয়ুরোপে সে সময়ে এমন কোনও পুরুষ বিদ্যমান ছিল না। ইঁহার রাজত্বকালে রুসিয়ার অনেক রূপ উন্নতি সাধিত হয়, এবং ইনিই প্রসিয়ার ও অষ্ট্রীয়ার

সহিত মিলিত হইয়া বিস্তীর্ণ পোলণ্ড দেশের অস্তিত্ব বিলোপ করেন।

ভারতবর্ষে স্বলতানা রেজিয়া ও চাঁদবিবির নাম করিলেই যথেষ্ট। আর প্রাতঃস্মরণীয়া অহল্যাবাইয়ের নাম না শুনিয়াছেন, এমন শিক্ষিত লোক, বোধ হয়, কেহই নাই।

তবেই দেখা যাইতেছে, রমণীগণ মানসিক শক্তিতে সকল ক্ষেত্রেই পুরুষদিগের অপেক্ষা হীন, এমন সিদ্ধান্ত সমীচীন নহে। কিন্তু তথাপি স্বীকার করিতে হইতেছে, যে এ পর্য্যন্ত কোনও রমণী মানবের চিন্তারাজ্যে কিংবা শিল্পকলায় নূতন যুগ প্রবর্ত্তন করিতে সমর্থ হয়েন নাই।* ইহাতে মনে হইতে পারে, উদ্ভাবনী শক্তি বা মৌলিকতাতে নারিজাতি পুরুষগণের অনেক পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছেন। জন ষ্টুয়ার্ট মিল তাঁহার "নারীজাতির পরাধীনতা" (Subjection of Women) নামক গ্রন্থে এ সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছেন, আমরা নিম্নে তাহার সারাংশ সঙ্কলন করিয়া দিতেছি।

১। সভ্যতার প্রভাতকাল হইতে আরম্ভ করিয়া এ পর্য্যন্ত জ্ঞানচর্চ্চা পুরুষগণের করায়ত্ত রহিয়াছে, রমণীগণ জ্ঞানান্বেষণে মনোনিবেশ করিবার স্বযোগ ও অধিকার লাভ করিতে পারেন নাই। নূতন ভাব ও চিন্তা যাহা আবিষ্কৃত হইবার, এত দিনে হইয়া গিয়াছে। অন্ততঃ এক্ষণে যথার্থ মৌলিকতা (originality) প্রদর্শন করা কাহারও পক্ষে সহজসাধ্য নহে। অতীত কালের বা পূর্ব্ববর্ত্তিগণের জ্ঞানের সহিত সম্যক্ পরিচিত না হইলে কোন পুরুষও এখন মৌলিকতা দ্বারা খ্যাতিলাভ করিতে পারেন না। স্বতরাং পুরুষগণ যে শিক্ষা লাভ করিয়া মৌলিকতা দেখাইতে সমর্থ হইতেছেন, নারীজাতি যখন তত্তুল্য শিক্ষা প্রাপ্ত হইবেন, তখন বিচার করিবার সময় হইবে, তাঁহাদিগের উদ্ভাবনী শক্তি আছে কি না।*

২। নূতন, মৌলিক তত্ত্ব কি কখনও নারীদিগের মনে উপস্থিত হয় না? যথেষ্ট হয়। কিন্তু উহার উপযুক্ত সমাদর করিতে পারেন, এমন স্বামী বা ভ্রাতা বিরল, স্বতরাং উহা জনসমাজে প্রচারিত হয় না। প্রচারিত হইলেও সে জন্য স্বামী বা ভ্রাতাই প্রতিপত্তি লাভ করেন, যে রমণী তত্ত্বটী আবিষ্কার করিলেন, তাঁহার নামমাত্রও উল্লিখিত হয় না।

৩। নারীগণ মৌলিক সাহিত্য রচনা করিতে পারেন নাই কেন? ইহার কারণ এই যে, তাঁহারা সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই মানবের সাহিত্য এত দূর উন্নতি লাভ করিয়াছে, যে তাঁহাদিগের পক্ষে অনুকরণ যেমন সহজ, মৌলিক উদ্ভাবন তেমনি কঠিন। †

৪। কেহ কেহ বলিতে পারেন, সৌন্দর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি নারী যে কলাবিদ্যাতেও এযাবৎ নূতন কিছু করিতে পারেন নাই, ইহার কারণ উদ্ভাবনী শক্তির অভাব। এই সিদ্ধান্ত একান্ত অসঙ্গত। রীতিমত শিক্ষাপ্রাপ্ত না হইলে কলাবিদ্যায় কেহই উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে না। শিক্ষিত পুরুষ-শিল্পীর নিকট শিক্ষা-বঞ্চিত স্বেচ্ছা-শিল্পী রমণী যে পদে পদে পরাজিত হইবেন, তাহাতে আর বিস্মিত হইবার কি আছে? ‡

মিলের যে সকল উক্তি উদ্ধৃত হইল তাহা হইতে বুঝা যাইতেছে, নারীজাতি, উপযুক্ত স্বযোগ ও শিক্ষা পাইলে, শিল্প, বিজ্ঞান, সাহিত্য, সকল ক্ষেত্রেই পুরুষদিগের সমকক্ষতা লাভ করিতে পারেন। কিন্তু তাই বলিয়া আমরা

* They have not yet produced any of those great and luminous new ideas which form an era in thought, nor those fundamentally new conceptions in art which open a vista of possible effects not before thought of, and found a new School. Mill's Subjection of Women Chap. III.

* When women have had the preparation which all men now require to be eminently original, it will be time enough to be judging by experience of their capacity for originality. Chap. III.

† They have not created one, because they found a highly advanced literature already in the field.
Chap III.

‡ This shortcoming, however, needs no other explanation than the familiar fact more universally true in the fine arts than in anything else; the vast superiority of professional persons over amateurs.
Chap. III.

এমত মনে করি না, যে তাঁহাদিগের মানসিক প্রকৃতি ও শক্তি ঠিক পুরুষদিগেরই অনুরূপ। বিশেষ বিশেষ প্রতিভাশালী রমণীর কথা স্বতন্ত্র; সাধারণ পুরুষ ও নারীর পার্থক্য সম্বন্ধে অমর কবি টেনিসনের উক্তিই যথার্থ বলিয়া বোধ হয়:—

Woman is not undevelopt man,
But diverse. *

শ্রীরজনীকান্ত গুহ।

মীরাবাই।

চারি শত বৎসর পূর্ব্বে ভক্তকবি মীরাবাইয়ের ভগবদ্ভক্তি-স্রোতে রাজপুতনা ও গুজরাষ্ট্র প্রদেশ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল। শুধু রাজপুতনা ও গুজরাষ্ট্র কেন, ভারতের প্রায় সর্ব্বাঞ্চলে তাঁহার সেই ভক্তিপ্রবাহ শতধা হইয়া প্রবাহিত হইয়াছিল।

মীরাবাই ভারতের ম্যাডাম্ গেঁয়ো। দুই জনেরই জীবনে সর্ব্বপ্রকারে সাদৃশ্য দেখা যায়। দুই জনেই উচ্চ কুলোদ্ভবা, পরমা সুন্দরী, কবি ও সুগায়িকা ছিলেন। দুই জনেরই কবিতা উজ্জ্বল ধর্ম্মপ্রাণতা ও উচ্ছ্বসিত ভক্তি দ্বারা অনুপ্রাণিত। তাঁহাদের সুমিষ্ট ভগবদ্ভক্তি ভারত ও ইউরোপের সহস্র সহস্র নরনারীর প্রাণে ভগবদ্ভক্তির সুধাস্বাদন দিয়াছিল।

১৫০০ খ্রীষ্টাব্দে যোধপুরের রাজা জয়মলের গৃহে মীরাবাই জন্মগ্রহণ করেন। শৈশব হইতেই মীরার প্রাণে সুখৈশ্বর্য্য-বিমুখতা দেখা গিয়াছিল; যোধপুর-রাণী মীরার জননী কন্যাকে সর্ব্বপ্রকার সুখৈশ্বর্য্যে প্রতিপালিত করাই জীবনের পরম সুখ বলিয়া জানিতেন। এবং মাতা অপেক্ষাও—কুড়ি লক্ষ প্রজার অধিপতি রাজা জয়মল অধিক ভোগ-বিলাসপ্রিয় ছিলেন। কিন্তু মীরা শৈশবাবস্থাতেই নিজের ইচ্ছানুযায়ী কার্য্যে দৃঢ়তা দেখাইতেন। সেই কোমল শৈশবে মীরার প্রাণে ধর্ম্মাঙ্কুর নিহিত হইয়াছিল। প্রতিদিন খেলিবার অন্যান্য সামগ্রীর মধ্যে শিশু মীরা তাহার কৃষ্ণ-মূর্ত্তিটীকে আনিয়া উপস্থিত করিত। সে তাহাকে লইয়া খেলা করিত; তাহার কাছে আধ আধ সুমিষ্ট স্বরে গান গাহিত এবং তাহার সহিত নানারূপ কথা বলিয়া তাহার প্রতি আপনার প্রাণের ভালবাসা জানাইত।

এই ভাবে মীরার বাল্যজীবন কাটিল। মীরা চৌদ্দ বৎসরে, মেওয়ারের ভাবী রাজা, উদয়পুরের রাজকুমার কুম্ভ সিংহের সহিত পরিণীত হইলেন। স্বামী-গৃহে যাইবার সময়ে মীরার জননী মীরাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি কি সামগ্রী তোমার সঙ্গে লইয়া যাইতে ইচ্ছা কর?" মীরা উত্তর করিলেন, "আমি কিছুই চাই না, শুধু শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তিটীকে আমার সঙ্গে দেও।" মীরার শ্বশুরালয়ের সকলে শিব উপাসক ছিলেন। শ্বশুরালয়ের সকলে মীরাকে শিবের পূজা করিতে বলিলেন। কিন্তু তিনি অসম্মতি প্রকাশ করিয়া বলিলেন—"আমি শ্রীকৃষ্ণের উপাসক, শ্রীকৃষ্ণ আমার স্বামী ও দেবতা।"

বাল্যকালেই মীরার কবিত্ব শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। রাজকুমার কুম্ভ সিংহেরও কবিতা লিখিবার শক্তি ছিল। বিবাহের পর তাঁহারা দুই জনে অধিকাংশ সময়ই কবিতা পাঠ ও রচনায় যাপন করিতেন। কুম্ভ সিংহ সাংসারিক বিষয়ে কবিতা লিখিতেন, কিন্তু মীরার কবিতা স্বর্গীয় ভাবের আভাস প্রদান করিত।

ক্রমে ক্রমে মীরার ধর্ম্মপ্রাণতা সংসারের সমুদয় ক্ষুদ্র বন্ধন ও বাসনা হইতে বিমুক্ত হইতে লাগিল। মীরা বেশভূষা ও বৈষয়িক কার্য্যে উদাসীন হইতে লাগিলেন। তিনি প্রতিদিন কৃষ্ণের নামে নূতন নূতন সংগীত রচনা করিয়া তাঁহার চরণে ভক্তি-অর্ঘ্য দিয়া কৃতার্থ হইতে লাগিলেন। সারাদিন ও রাত্রিতে কখনও সঙ্গীদের লইয়া, কখনও একাকী—আপনার রচিত গান গাহিয়া বিভোর হইয়া যাইতেন। ঐশ্বর্য্য-সুখ-নিমগ্ন রাজ-পরিবারস্থ লোকের নিকট এ ভগবদ্ভক্তি সুখকর হইবে কিরূপে? মীরার সমুদয় আচরণ তাঁহাদের নিকট বিষবৎ বোধ হইতে লাগিল। কিন্তু যাহার প্রাণ সেই স্বর্গীয় ভক্তিতে পূর্ণ, যে সেই জীবন্ত ভগবানে জীবিত, সে সংসারের ভয় করিবে কেন?

---

* নারী অসম্পূর্ণ পুরুষ নহেন, তিনি পুরুষ হইতে বিভিন্নপ্রকৃতি।

অল্পদিন পরে মীরাকে রাজপ্রাসাদ হইতে লইয়া অন্য স্থানে রাখা হইল। মীরা তাহাতে বিচলিত হইলেন না। তিনি তথায় একটী উপাসনা-মন্দির স্থাপন করিয়া নূতন নূতন ভজন ও সঙ্গীত রচনা করিয়া প্রতিদিন তাঁহার প্রাণেশ্বরের চরণে অঞ্জলি প্রদান করিতে লাগিলেন। যেরূপ মধুপাত্রের অন্বেষণ পাইলেই কোথা হইতে শত শত মক্ষিকা আসিয়া তথায় মত্ত হয় সেইরূপ মীরার অন্তর্নিহিত সেই অমৃত ভাণ্ডের আস্বাদন পাইয়া, চারিদিক হইতে শত সহস্র ঈশ্বরপ্রেমিক, সাধু, সজ্জন আসিয়া মীরার ক্ষুদ্র মন্দিরে উপস্থিত হইতে লাগিলেন। যখন ঘটনা এইরূপ হইয়া দাঁড়াইল, তখন মীরা রাজপরিবারে দুর্ণাম আনিতেছেন এই বিবেচনায় রাজ-পরিবারস্থ সকলে মীরার উপর অধিকতর কুপিত হইলেন। তদনন্তর কুম্ভ সিংহ মীরাকে দেখিবার উদ্দেশ্যে মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। তিনি দেখিলেন, বহু ভক্ত পরিবেষ্টিত মীরা মন্দিরে নৃত্যগীত করিতেছেন। কুম্ভ সিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কাহার জন্য এত নৃত্যগীত করিতেছ?" মীরা উত্তর করিলেন,—"আমার প্রাণেশ্বর ভিন্ন আর কাহার জন্য?" কথিত আছে, কুম্ভ সিংহ ঈর্ষান্বিত হইয়া মীরার হত্যা মানসে তাঁহার উপর তরবারি উত্তোলন করিলেন; কিন্তু তৎক্ষণাৎ চক্ষুর সম্মুখে চারি জন মীরা দেখিতে পাইলেন, কাহার উপর তরবারি নিক্ষেপ করিবেন তাহা বুঝিতে না পারিয়া সে কার্য্যে ক্ষান্ত হইলেন। কথিত আছে—একবার হরিচরণামৃত বলিয়া মীরাকে বিষ পান করিতে দেওয়া হইয়াছিল। মীরা একটী ভজন গাহিয়া তাহা পান করেন। কিন্তু সে বিষের কোনও কার্য্যই মীরার দেহে প্রকাশ পায় নাই। আর একটী প্রবাদ আছে, যে একটী বাক্সে কতকগুলি সর্প বন্ধ করিয়া ইহাতে শালগ্রাম আছে বলিয়া, মীরার নিকট পাঠান হয়; মীরা বাক্সটী খুলিয়া একটী শালগ্রাম ভিন্ন আর আর কিছুই পান নাই। এই সকল প্রবাদের মূলে সত্য অসত্য যাহাই থাকুক না কেন—ইহা দ্বারা দেখান হইয়াছে, সত্যই মহাশক্তি, পুণ্য অদম্য অস্ত্র এবং পরাজয় পাপ-ইচ্ছার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম।

এই সকল ঘটনার পর রাজপরিবারস্থ সকলে মীরার প্রাত্যহিক পূজা বন্দনায় বাধা দিতে লাগিলেন এবং মীরাকে দেশত্যাগ করিতে আদেশ দিলেন। তখন মীরা বৃন্দাবনে তীর্থযাত্রা করিলেন।

সুগন্ধগর্ভা বাসোরা গোলাপ যখন ফুটে তখন তাহার সুবাস কি আর সেই ক্ষুদ্র বনভূমিতে আবদ্ধ থাকে? ঈশ্বরপ্রেমে উদ্বুদ্ধা মীরার সঙ্গীতরাশিও লোককণ্ঠ পরম্পরায় দেশ বিদেশে স্বর্গীয় সুবাস ও ভগবৎ প্রেম-সুধা বিস্তার করিতে লাগিল। এমন কি, বাদসাহ আকবরও মীরাকে দেখিতে ইচ্ছুক হইলেন। কিন্তু বাদসাহ মীরার দর্শন লাভ সম্বন্ধে সন্দিহান হইলেন। অল্পকাল পূর্ব্বে রাজপুতানারই রাণী পদ্মিনী ধন, জন, জীবন সর্ব্বস্ব চিতায় আহুতি দিয়াছিলেন তথাপি মুসলমান রাজার সম্মুখে উপস্থিত হন নাই। এই ভাবিয়া বাদসাহ আকবর ও মিঞা তানসান ছদ্মবেশে মীরা-বাইয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। মীরাবাইয়ের সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া আকবর বিশেষ উপকৃত হইয়াছিলেন। এমন কি, কেহ কেহ বলেন, মীরার সহিত সাক্ষাতের পর হইতেই আকবরের ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, এবং তিনি উদার ধর্ম্মমতের পক্ষপাতী হন।

এ দিকে রাণা কুম্ভ সিংহ দূর দূরান্তর হইতে চিতোরের দ্বারে দ্বারে মীরার সঙ্গীত গীত ও যশোকাহিনী প্রচারিত হইতে দেখিয়া অবাক্ হইলেন। মীরার রচিত সেই ভক্তি-গাথা, আবালবৃদ্ধ নর নারীর কণ্ঠে কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হইতে দেখিয়া, কুম্ভ সিংহ বলিলেন—"হায়! আমি লোকের নিন্দাবাদকে ভয় করিয়া, তাহাদের পরিতুষ্টির জন্য সব করিলাম, অথচ তাহারাই মীরার নামে ভক্তিভাবে মস্তক অবনত করিতেছে; তাহারাই মীরার অনুগামী হইতেছে, মীরা রাজ-পরিবারে দুর্ণাম কখনই আনয়ন করে নাই বরং সংসারের শ্রেষ্ঠতম সম্মান দ্বারা মীরা এই রাজবংশকে সম্মানিত ও গৌরবান্বিত করিয়াছে। শুনা যায়, ইহার পর রাণা ছদ্ম-বেশে পদব্রজে মীরার সাক্ষাৎ উদ্দেশ্যে বৃন্দাবনে গমন করেন এবং তথায় অনুতপ্ত হইয়া মীরার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

মীরার মৃত্যুকাল নিশ্চিতরূপে নির্দ্ধারিত হয় নাই। মীরার মৃত্যুর পর মীরার অনুচর ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে নূতন জীবন সঞ্চারিত হয় এবং আজ পর্য্যন্তও মীরার সঙ্গীতরাশি শত সহস্র হৃদয়ে ঈশ্বর-ভক্তির সঞ্চার করিতেছে। মীরার সঙ্গীত ও কবিতা সমূহ প্রকৃত কবিত্ব, উৎকৃষ্ট ভাষা ও সুললিত ছন্দে রচিত। মীরা শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তির পূজা করিতে গিয়া, প্রাণময় জীবন্ত ঈশ্বর লাভ করিয়াছিলেন। তিনি ভগবানকে সখা, স্বামী ও সহচররূপে নিজ প্রাণে ও বিশ্ব চরাচরে দেখিয়াছিলেন। জিজ্ঞাসা করিলে তিনি সর্ব্বদা বলিতেন,—"তোমরা ভগবানকে আত্মার চক্ষু দিয়া দেখ, অন্তরই তাঁহার অনুভূতির স্থান। তুমি যে ভাবে ঈশ্বরকে চাহিবে সেই ভাবেই পাইবে; ঈশ্বর তোমার সমুদয় ইচ্ছা জানেন। তিনি তোমাকে ভালবাসেন এবং তিনি তোমার ভালবাসা চাহেন। তাঁহাকে ভালবাসিয়া মানুষ সংসারের অতীত সুখ উপলব্ধি করে।" মীরা ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল নির্ব্বিশেষে ধর্ম্মোপদেশ দিতেন। মীরা পরিষ্কার রূপে বলিয়া গিয়াছেন—নিরামিষ আহার, শারীরিক কষ্ট অথবা সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেই ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না—কেবলমাত্র ভগবৎপ্রেম দ্বারা ভগবানকে লাভ করা যায়।

শ্রীকুমুদিনী দেবী। (বম্বে)

জননী-স্নেহ।

জননী তাঁহার সন্তানকে ভালবাসেন এবং আজীবন তাহাদের মঙ্গল কামনা করেন, ইহা সনাতন সত্য কথা। কোন জননীকেই সন্তানকে ভালবাসিতে শিখাইতে হয় না, সন্তানও জন্মাবধি সহজ জ্ঞানে জননীকে ভালবাসে। পিতা মাতার সহিত সন্তানের যে চিরন্তন সম্বন্ধ তাহার স্রষ্টা মানুষ নহে, স্বয়ং বিধাতা। সন্তানধনে ধনী হইলে কোন্ জননী আপনাকে সার্থকজন্মা মনে না করেন? ভারতবর্ষে সন্তানবতী জননী সৌভাগ্য ও কল্যাণের প্রতিমূর্ত্তিরূপে পূজিতা হ'ন।

সন্তানকে সৌভাগ্য ও সম্পদের আধার মনে করা স্বাভাবিক, কিন্তু সেই সৌভাগ্যের সহিত যে কি গভীর দায়িত্বভার জড়িত রহিয়াছে, তাহার বিষয় কয়জন জননী চিন্তা করেন? সাধারণতঃ, পুরুষ অপেক্ষা নারীগণ আধ্যাত্মিক সম্পদে হীন বলিয়া পরিগণিতা, কিন্তু বিশ্বপিতা, যিনি তাঁহার প্রসন্ন দক্ষিণ হস্তে উভয়কেই সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি যদি পুরুষ অপেক্ষা নারীকে হীন করিতেন, তাহা হইলে নারীকে সাধনশ্রেষ্ঠ জননী-পদ কখনও দান করিতেন না। যখন স্বর্গ-দূতের মত একটি শুভ্র কোমল শিশু-পুষ্প আসিয়া প্রথমে জননীর ক্রোড়কে শোভিত করে, তখন তাহার সেই অসহায়, নির্দ্দোষ মুখের দিকে চাহিয়া, স্নেহ-বিগলিতা জননীর কি মনে হয় না, বিধাতার এই অনির্ব্বচনীয় আশীর্ব্বাদ লাভ করিবার মত উপযুক্ততা তাঁহার কোথায়? জননীগণ যদি মনে করিতেন, যে সন্তানরূপে এক একটি স্বর্গবাসী আত্মা তাঁহাদের কাছে স্নেহ প্রেমে পুষ্ট হইতে আসিয়াছে, তাঁহাদের নিকট হইতে শুধু শরীর নয় কিন্তু জীবন লাভ করিতে আসিয়াছে,—যাহার বলের পরীক্ষা ভবিষ্যতে তাহার জীবনব্যাপী সংগ্রামের ভিতর দিতে হইবে; যদি মনে করিতেন, যে তিনি ভাল এবং মন্দ আদর্শের যে সকল বীজ তাঁহার সন্তানের চরিত্রের ভিতর রোপন করিবেন, তাহা ভবিষ্যতে শাখা ও প্রশাখায় পরিণত হইয়া তাহার জীবনে সুখ দুঃখের কারণ হইবে, তবে জননী হওয়া যে কত দায়িত্বপূর্ণ তাহা ধারণা করিতে পারিতেন। যেমন পিতামাতার শরীরস্থিত ব্যাধি সন্তানের শরীরে সংক্রামিত হয়, তেমনি, তাহাদের স্বভাবের দোষ এবং দুর্ব্বলতা অজ্ঞাতসারে সন্তানের স্বভাবে প্রতিফলিত হয়। বিশেষতঃ, মানুষের স্বভাবের মধ্যে এমন একটি ভাব আছে, যাহার দ্বারা সে সদ্গুণ অপেক্ষা দোষকেই অধিক অনুকরণ করে। অনেকস্থলে দেখা যায়, ধার্ম্মিক পিতার সদ্গুণাবলী অপেক্ষা দুর্ব্বলপ্রকৃতি মাতার চরিত্র সন্তানে অধিক প্রকাশ পাইয়াছে।

যদিও জননীর ভালবাসার ভিতরে স্বার্থপরতা নাই, সন্তানের মঙ্গলপ্রার্থিনী হইয়া তিনি নিজের আরাম ও সাচ্ছন্দ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক আজীবন তাহাদের সেবা করেন,

কিন্তু তাঁহাদের এই মঙ্গলকামনা সাধারণতঃ সাংসারিক তুচ্ছ অনিত্য সুখের উপরে প্রতিষ্ঠিত। প্রায় অধিকাংশ জননীই এই কামনা করেন, যে তাহাদের সন্তানগণ সচ্ছল অনায়াসলভ্য জীবিকা লাভ করুক, সাংসারিক অমঙ্গল যেন তাহাদের না ঘটে। কিন্তু কয়জন জননী দৃঢ় চিত্তে এই কথা বলিতে পারেন, যেন তাহারা হৃদয়ের শক্তিতে ধর্ম্মেতেই, শ্রেষ্ঠ হয়, সে জন্য যদি তাহাদের শত সহস্র সাংসারিক দুঃখ সহ্য করিতে হয় তাহাতেও আমার দুঃখ নাই!

সন্তান সচ্চরিত্র হয় ইহাই বা কোন্ জননীর কামনা নয়? কিন্তু শুধু কামনা করিয়া ফল কি? সন্তানের সচ্চরিত্র লাভ তাঁহাদেরই উপর নির্ভর করিতেছে, এই কঠিন সত্যটি জননীগণকে মস্তকে তুলিয়া লইতে হইবে। নিঃশ্বাস প্রশ্বাস যেমন স্বাভাবিক, অনিবার্য্য এবং অবিরাম, সেইরূপ সন্তানকে সচ্চরিত্র করিবার কামনা স্বাভাবিক এবং জীবনব্যাপী হওয়া চাই। যেদিন একটি অসহায় অক্ষম মানব-শিশু এই অজ্ঞাত অপরিচিত জগতে জননীর স্নেহের উপরে একান্ত বিশ্বাসে আত্ম সমর্পণ করে সেই দিন হইতে জননী যেমন তাহার সুখ সাচ্ছন্দ্য এবং আরামের জন্য আপনাকে সম্পূর্ণ ভাবে উৎসর্গ করেন, তাহার শরীরকে পরিপুষ্ট করিবার ভার যেমন তাঁহার উপর মনে করেন, তেমনি তাহার মনকে, আত্মাকে, বিকশিত করিয়া তুলিবার ভারও তাঁহার উপর, তাহা যেন ভুলিয়া না যান। পশু এবং ইতর প্রাণীদিগের ভিতর দেখা যায়, যে তাহাদের শাবকগণ যত দিন অক্ষম থাকে, তাঁহারা কত অসীম যত্নে ও আগ্রহে তাহাদিগকে পালন করে—কিন্তু যখনই তাহারা সবল ও সক্ষম হইয়া উঠে, তাহাদের জন্মদাতাগণ আর তাহাদের বিষয় ভাবে না, এমন কি ভবিষ্যতে তাহারা আপন আপন শাবকগণকে চিনিতেও পারে না। পশুপক্ষীদিগকে আত্মার ভাবনা ভাবিতে হয় না, শরীর টুকু পালন করাই শুধু তাহাদের কর্ত্তব্য। কিন্তু বিধাতা মানুষকে মন বলিয়া, মনুষ্যত্ব বলিয়া যে বিশেষ সম্পত্তি দান করিয়াছেন, তাহার বিষয় যদি মানুষ না ভাবে তবে পশুদিগের সহিত যে পার্থক্য তাহা লোপ পাইবে।

সন্তানকে সচ্চরিত্র করিবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায় কি? জননীর নিজের চরিত্রকে ভাল করা। তাঁহার ভাব রুচি এবং কার্য্যকে নিঃস্বার্থ এবং নির্ম্মল করিতে হইবে। পুর্ব্বেই বলিয়াছি, সন্তানকে সচ্চরিত্র করিবার কামনা জননীর মনে নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের ন্যায় অবিরাম এবং অনিবার্য্য হওয়া চাই। আজীবন শাসন করিলে, শিক্ষা দিলে কোন ফল হয় না, যদি অনুরূপ আদর্শ শিক্ষার্থীর সম্মুখে ধরিতে না পারা যায়। কিরূপ অজ্ঞাতসারে জননীর দুর্ব্বলতা সন্তানদিগের ভিতর সঞ্চারিত হয় তাহার দুই একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। এক শ্রেণীর জননীগণ সন্তানের কোন প্রকার দোষ এবং দুর্ব্বলতা দেখিলে তৎক্ষণাৎ অত্যন্ত দৃঢ় হস্তে শাসন করিয়া থাকেন। তিনি তাঁহার পুত্রকে বলিলেন, এই কাজটি কর, কিন্তু বালক তাহার খেলা ছাড়িয়া জননীর কথা শুনিতে রাজি হইল না। ইহাতে জননী পুত্রের এই অবাধ্যতার জন্য সক্রোধে শাসন করিতে অগ্রসর হইলেন, কিন্তু সে সময় তাঁহার মনে পড়িল না, যে কিছুক্ষণ পুর্ব্বে তিনি যখন নিজের একটি কাজে ব্যস্ত ছিলেন, বালক তাঁহাকে কিছু করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিল, তখন তিনি তাহাকে বিনা দ্বিধায় বলিয়াছিলেন, আমি এখন পারিব না। যে অবাধ্যতার জন্য তিনি পুত্রকে এমন কঠিন শাসন করিলেন, সেই অবাধ্যতা সে কাহার নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছে? এইরূপে তাঁহারা নিজেদের দোষ ও দুর্ব্বলতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অন্ধ হইয়া, সন্তানের চরিত্র সংশোধন করিতে যান, এবং অনেক ভাবিয়াও বুঝিতে পারেন না, তাঁহাদের সন্তানগণ দিন দিন কেন এরূপ অবাধ্য, ক্রোধপরায়ণ এবং কর্ত্তব্যবিমুখ হইয়া পড়িতেছে।

আর এক শ্রেণীর জননী আছেন, তাঁহারা সন্তান-গণের দোষ দেখিয়াও দেখেন না। তিনি স্পষ্ট জানিতে পারিলেন, তাঁহার বালক একটি মিথ্যা কিম্বা মন্দ কথা বলিল, তবু তিনি তাহাকে সংশোধন করা প্রয়োজন মনে করিলেন না। লোকে যদি শুনিতে পায়, যে তাঁহার সন্তানগণ মিথ্যাবাদী, সে যে বড়ই লজ্জার কারণ হইবে! অতএব এসকল বিষয় বেশী গোলোযোগ না করাই

সুবিধা। এইরূপ করিয়া যে তিনি শুধু সন্তানকে কুশিক্ষায় প্রশ্রয় দিলেন, তাহা নহে, কিন্তু কপটতার আশ্রয় গ্রহণ করিতে শিখাইলেন। সময় বিশেষে নিজের ভিতরকার ভাব ঢাকিয়া অন্যভাব দেখাইতে হইবে, তাহা সে বেশ বুঝিয়া লইল।

এই দুই শ্রেণীর জননীদিগের মধ্যে শেষোক্ত প্রকারের জননীগণ সন্তানের চরিত্রের অধিক ক্ষতি করেন, কারণ অন্ধতা হইতে কপটতা আরও হেয়।

আমরা মনে করি, শিশুকে অতি সহজে ফাঁকি দেওয়া যায়। কিন্তু আমাদের এ ধারণা অত্যন্ত ভ্রমাত্মক। আমাদের ইচ্ছা যাহাই হউক না, কিন্তু আমাদের সেই ইচ্ছার অন্তরালে যে স্বভাব আমরা রাখিয়াছি, শিশু তাহা দেখিতে পায়। মুখ দেখিয়া স্বভাব চিনিতে শিশুর মত কেহ নাই। আবার যাহা দেখে তাহা আয়ত্ব করিতেও শিশুর মত সুদক্ষ কেহ নাই। শিশুর হৃদয় যেন একটি দর্পণ সদৃশ, যেরূপ ছবি তাহার কাছে লইয়া যাও সেইরূপ প্রতিবিম্বই তাহার ভিতরে পড়িবে, সেই জন্যই শিশুর কাছে খাঁটি না হইলে চলে না। জননীর স্বভাবের ভিতরে শিশু যদি কোন প্রকার উত্তেজনা অথবা দুর্ব্বলতা দেখিতে পায়, তবে সন্তানের কাছে তিনি পরাজিত হইলেন। যে শিশু জননীকে সহজে ত্যক্ত অথবা উত্তেজিত করিতে পারে সে জানে, জননীর দৃঢ়তা কত অল্প। শিশু হইলেও মন শৈশব হইতে দৃঢ়তার বশীভূত হয়। জননী যেন শিশু-গ্রহের সূর্য্যস্বরূপ হইবেন, যেখান হইতে সেই ক্ষুদ্র, অক্ষম, চঞ্চল জীবন-বিন্দুটি সর্ব্বদা নবীন আলোক, শান্তি এবং বল লাভ করিয়া অনন্তের পথে অগ্রসর হইবে।

ত্যাগ এবং আত্মবিসর্জ্জন সকল প্রকার প্রেমকে সার্থক করে। সন্তানের প্রতি জননীর যে স্নেহ তাহার ভিতরে সেই আত্মবিসর্জ্জন না থাকিলে তাহা অমর হয় না। রামায়ণে কৌশল্যার পুত্রস্নেহে আমরা সেই কামনাহীন নিঃস্বার্থপরতা দেখিতে পাই। রামচন্দ্রকে বনবাসে বিদায় দিবার সময় তিনি দৃঢ় অথচ শান্ত স্বরে বলিতেছেন :—

ন শক্যতে বারয়িতুং গচ্ছেদানীং রঘূত্তম
শীঘ্রঞ্চ বিনিবর্ত্তস্ব বর্ত্তস্ব চ সতাং ক্রমে
যং পালয়সি ধর্ম্মং ত্বং প্রীত্যা চ নিয়মেন চ
স বৈ রাঘব শার্দ্দূল ধর্ম্মস্ত্বামভিরক্ষতু।

"বৎস, তোমাকে আমি কিছুতেই নিবারণ করিয়া রাখিতে পারিলাম না, এক্ষণে তুমি প্রস্থান কর। কিন্তু শীঘ্র আসিও এবং সৎপথে প্রতিষ্ঠিত থাকিও। তুমি প্রীতির সহিত, নিয়মের সহিত যে ধর্ম্মপালনে প্রবৃত্ত হইয়াছ, সেই ধর্ম্মই তোমাকে রক্ষা করুন।" বিনা দোষে দণ্ডিত পুত্রের সুদুঃসহ দুঃখভার, ধর্ম্মের জন্য, সত্যের জন্য এমন করিয়া কয়জন জননী মাথায় তুলিয়া লইতে পারেন? কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "গান্ধারীর আবেদন" যিনি পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা জানেন, জননীর প্রেম কি স্বর্গীয় আকার ধারণ করিতে পারে। মহাভারত হইতে গান্ধারীর চরিত্রকে তিনি শ্রেষ্ঠ করিয়াছেন, এবং গান্ধারীর জননীস্নেহ সমস্ত স্বার্থের মলিনতা পরিহার করিয়া এক অপূর্ব্ব গৌরব ও মহিমার আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। যখন পুত্র দুর্য্যোধন অধর্ম্মের আশ্রয় লইয়া সর্ব্বস্বান্ত পঞ্চপাণ্ডবকে বনে পাঠাইতে উদ্যত হইলেন, তখন মর্ম্মাহতা, পুত্রগর্ব্বচ্যুতা গান্ধারী স্বামী ধৃতরাষ্ট্রের কাছে আসিয়া নিবেদন করিলেন, পুত্র ত্যাগ করিতে হইবে। ধৃতরাষ্ট্র মহিষীর এই দারুণ প্রস্তাব শুনিয়া ভীত হইলেন, কিন্তু জননী অবিকম্পিত স্বরে বলিলেন:—

মাতা আমি নহি? গর্ভভার জর্জ্জরিতা
জাগ্রত হৃৎপিণ্ডতলে বহি নাই তারে?
স্নেহবিগলিত চিত্ত শুভ্র দুগ্ধধারে
উচ্ছ্বসিয়া উঠে নাই দুই স্তন বাহি
তার সেই অকলঙ্ক শিশুমুখ চাহি?
শাখা বন্ধে ফল যথা, সেই মত করি
বহুবর্ষ ছিল না সে আমারে আঁকড়ি,
দুই ক্ষুদ্র বাহুবৃন্ত দিয়ে, লয়ে টানি
মোর হাসি হতে হাসি, বাণী হতে বাণী,
প্রাণ হতে প্রাণ?—তবু কহি মহারাজ,
সেই পুত্র দুর্য্যোধনে ত্যাগ কর আজ!

বনগমন কালে মলিনবসন পঞ্চভ্রাতা যখন জননী গান্ধারীর নিকট বিদায় আশীর্ব্বাদ লইতে আসিলেন, তখন

নিরভিমানা, জননী সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন :—

মোর পুত্র করিয়াছে যত অপরাধ
খণ্ডন করুক সব মোর আশীর্ব্বাদ
পুত্রাধিক পুত্রগণ! অন্যায় পীড়ন
গভীর কল্যাণ-সিন্ধু করুক মন্থন!

আহত-হৃদয়া জননীর এই আশীর্ব্বাদ-বাণীর মহত্ব এবং করুণা কাহার হৃদয়কে না গৌরবের অশ্রুজলে অভিসিক্ত করে! সে কালে, জননীদিগের ভিতরে এইরূপ ধর্ম্মনিষ্ঠা ছিল বলিয়াই রামের মত, যুধিষ্ঠিরের মত পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আজ আমাদের জননীগণ সে ধর্ম্মনিষ্ঠা, সে তেজ হারাইয়াছেন, তাই আমাদের সন্তানগণও এমন মলিন সংসারাসক্তির ভিতরে, এমন মানসিক দৈন্য ও লজ্জার ভিতরে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হইয়া আছেন। তাঁহারা যদি তাঁহাদের সন্তানদিগকে হাত ধরিয়া উঠাইয়া তাঁহাদের জীবনকে মনুষ্যত্বের উপরে, ধর্ম্মের উপরে প্রতিষ্ঠিত না করেন তবে কিরূপে তাহাদের উদ্ধার হইবে?

জননীগণ! সেই ধর্ম্ম ও তেজ, সেই নিঃস্বার্থ মাতৃ-হৃদয় লাভ করিবার জন্য আবার সাধন করিতে হইবে। যিনি এই স্নেহকে সকল দুঃখ, সকল ক্ষতি সহ্য করিতে শিখাইয়াছেন, সেই বিশ্বজননীই আবার আমাদের হৃদয়কে সকল প্রকার দুর্ব্বলতা ও স্বার্থের মলিনতা হইতে উদ্ধার করিয়া অসীম গৌরব ও মঙ্গলে সার্থক করিবেন।

শ্রীসুশীলা সেন।

ঊষা-বন্দনা।

(ঋগ্বেদ অবলম্বনে।)

ভারতের পুণ্যাকাশে, স্বরগের দীপ্তি ভাসে.
এস ঊষা, আদিত্য-জননী!
তোমার অর্চ্চনা তরে, রহিয়াছে অর্ঘ্য ভরে,
সুপ্তোত্থিতা নবীনা ধরণী! ১।

অয়ি ঊষা স্বর্গ-সুতে! প্রীতি-ফুল্ল জ্যোতিঃ সাথে
হও হেথা আজিকে প্রকাশ;
দিনে দিনে আমা সবে, প্রদানি সৌভাগ্য ভবে,
অন্ধকার করগো বিনাশ। ২।

অয়ি পূত-শুভ্র-ভূষা! সুচির তরুণী ঊষা!
অয়ি সর্ব্ব ধনের ঈশ্বরি!
মৃতবৎ প্রাণীগণে, কৃপা-বিন্দু বিতরণে,
এস, নব সংজ্ঞা দান করি। ৩।

দূর-দিগন্তের পটে, কি আনন্দ-বার্ত্তা-রটে,
অয়ি ঊষা, অয়ি স্বর্ণ-লতা!
প্রথম তরঙ্গ তার, আজি প্রাণে সবাকার,
পূর্ণ কর, আশীর্ব্বাণী যথা। ৪।

বর্ষার প্রবাহ সম, রশ্মি-ধারা নিরুপম,
পরিব্যাপ্ত করিছে সংসার;
তা'রি সনে হে সুভগে! দাও সবে অনুরাগে,
শৌর্য্য-বীর্য্য হৃদয়ে অপার। ৫।

সু-কণ্ঠ বিহঙ্গদলে, স্তুতি করে কুতূহলে,
মৃদু মন্দ বহে স্নিগ্ধ বায়;
প্রফুল্ল প্রসূন হাসে, মধুপ গুঞ্জরি আসে,
কর হর্ষ শাশ্বত ধরায়। ৬।

কল্যাণী গৃহিণী যথা, হয়ে অগ্রে জাগরিতা,
পরিজনে দেন জাগাইয়া;
তেমতি গো ঊষা সতি! দাও আজ দ্রুতগতি
জড়-সুপ্তি সবার নাশিয়া। ৭।

অয়ি শত্রু-বিতারিণি! নব-শক্তি-বিধায়িনি!
জীব-আয়ু-বিনাশিনী অয়ি!
কত দীর্ঘ কাল হতে, আস নিত্য বিশ্ব-পথে,
কত কাল গেছে আরো রহি'! ৮।

মোর পূর্ব্ব-পিতৃগণ, করেছেন নিরীক্ষণ,
তব দীপ্ত আলোকের ধারা;
হেরিতেছি আমি আজ, আসিছে অবনী মাঝ,
ভবিষ্যতে নিরখিবে যারা। ৯।

বিপর্য্যয় ত্রিভুবন, তুমি সত্য সনাতন,
অয়ি উষা, অয়ি দিব্যাঙ্গনা !
যুক্ত-করে উর্দ্ধ মুখে, ভক্তি-উচ্ছ্বসিত বুকে,
করি আমি তোমারি বন্দনা। ১০।

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

দুই রমেশ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

মহানুভব লর্ড রিপনের শাসনকালে ভারতে এক তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়। উচ্চবংশসম্ভূত, সুশিক্ষিত, উচ্চপদস্থ, ধর্ম্মপরায়ণ ও সুযোগ্য ভারতবাসী মাজিষ্ট্রেট কলেক্টরের পদ প্রাপ্ত হইয়াও ইংরাজ অপরাধীর বিচার করিতে আইন মতে অনধিকারী ছিলেন বলিয়া তখন বিচারকার্য্যে অত্যন্ত ক্ষতি ও অসুবিধা হইত। এই অন্তরায় অন্তর্হিত করিবার জন্য লর্ড রিপন মহোদয় এক আইন বিধিবদ্ধ করিয়া দেশীয় বিচারকদিগকে ঐ অধিকার প্রদান করিবার প্রস্তাব করেন। বড় লাটের সভার সভ্য ইলবার্ট সাহেব মহোদয় এই কার্য্যে লর্ড রিপনের বিশেষ সহায় স্বরূপ হইয়া ঐ আইন প্রস্তুত করেন, এই কারণে ইহা "ইলবার্ট বিল" নামে খ্যাত হয়। এই আইনের বিরুদ্ধে সমুদয় ভারতবাসী ইংরাজ ও ইউরোপীয় নরনারী তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করেন। ইংরাজ ভলণ্টিয়ার দল এতদুর পর্য্যন্ত কহিয়াছিল, "এই আইন পাশ হইলে আমরা ইংরাজ রাজ্য রক্ষার জন্য আর অস্ত্র স্পর্শ করিব না।" দেশের সমুদয় সাহেব বলিয়া উঠিল, "কালা নেটীব আমাদের নরনারীর বিচার করিবে, ইহা আমাদের প্রাণ থাকিতে সহ হইবে না।" সকল শ্রেণীর ইংরাজ একেবারে ক্ষেপিয়া উঠিল; বড়লাট সাহেবকে পর্য্যন্ত ভয় দেখাইতে লাগিল। মহাত্মা লর্ড রিপন মহা বিপদে পতিত হইলেন। সমস্ত ইংরাজ ক্ষেপিয়া উঠিলে দেশ রক্ষা হওয়া ভার, অথচ দেশীয় লোকদিগকেও অসম্মানিত করা যায় না; এদিকে গবর্ণমেণ্টেরও জিদ্ বজায় রাখা চাই। এই সকল কথা ভাবিয়া "এখন কি করা কর্ত্তব্য" এই পরামর্শ গ্রহণ জন্য লর্ড রিপন মহোদয় বিচারপতি রমেশচন্দ্রকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। রমেশ বাবুর পরামর্শ মতে ঐ আইন ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নূতন আকার ধারণ করিল। দুই দিকের জিদ্ বজায় রহিল। এই নূতন আইনে আমরা বিশেষ কিছু পাই নাই বটে, কিন্তু যাহা কিছু পাইয়াছি তাহাই সেকালে আমাদের পক্ষে অনেক ছিল। রমেশচন্দ্র মিত্রের বুদ্ধি, যোগ্যতা, প্রতিভা, বহুদর্শন ও আইনাভিজ্ঞতা কত উচ্চ অঙ্গের ছিল, ইলবার্ট বিলের আন্দোলন কালে তাঁহার সুপরামর্শ তাহার অত্যুৎকৃষ্ট প্রমাণ। সাহেবেরা কালা নেটিবকে কত ঘৃণা করে এবং এদেশে তাহাদের কিরূপ অসাধারণ প্রভুত্ব, এই আন্দোলন তাহারও জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

এদেশে একবার "জুরি প্রথা" উঠাইয়া দিবার প্রস্তাব হয়। জুরীরা জজের সহিত বসিয়া বিচার করেন, গবর্ণমেণ্টের ইহা ইচ্ছা ছিল না। বলা বাহুল্য রমেশচন্দ্রের চেষ্টায় এই অমূল্য অধিকার হইতে আমরা বঞ্চিত হই নাই। সুপ্রসিদ্ধ বৃটীশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন নাম্নী জমিদার-সভার তিনি কিছুকাল সহকারী সভাপতি ছিলেন। সম্পত্তি-রক্ষণী সভা" (Property Protection Association) তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত। সুরেন্দ্র বাবুর "ভারত সভার"ও তিনি একজন গণনীয় ও আনুষ্ঠানিক সভ্য ছিলেন। কন্‌গ্রেসের তিনি চিরবন্ধু; একবার তিনি অভ্যর্থনা কমিটীর (Reception Committee) চেয়ারম্যান হইয়াছিলেন। জমিদারী পঞ্চায়ৎ সভার রমেশ বাবু একজন নেতা ছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভবলীলা সম্বরণের পরে তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ কলেজ-কমিটির তিনি সভাপতি পদে বৃত হইয়াছিলেন। সিটিকলেজ, বধির ও মূক বিদ্যালয়, ভবানীপুরের সাউথ সুবর্বাণ স্কুল, হিন্দুবালিকা বিদ্যালয়, "ভগবৎ চতুষ্পাঠী" প্রভৃতির সহিত রমেশ বাবুর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। ভবানীপুরের হিন্দুবালিকা বিদ্যালয় তাঁহারই যত্ন, উৎসাহ ও অর্থব্যয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। "সাহায্য সমিতি"র তিনিই প্রাণদাতা। এই সমিতি হইতে অন্ধ, খঞ্জ, দরিদ্র, অনাথা প্রভৃতিকে সাহায্য দান করা হইত। সুরাপান নিবারিণী সভার তিনি সর্ব্ব প্রথম সভাপতি নিযুক্ত হয়েন। পিতৃভূমি বিষ্ণুপুর গ্রামে উচ্চশ্রেণীর ইংরাজি বিদ্যালয় ও

বালিকাস্কুল রমেশচন্দ্রেরই দ্বারায় প্রতিষ্ঠিত। ঐ গ্রামের চিকিৎসালয়ও মিত্র মহাশয়ের অমর কীর্ত্তি। ঐ দুইটি স্কুল ও একটি চিকিৎসালয়ের জন্য তিনি বার্ষিক ৬০ হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তি দান করিয়া গিয়াছেন। তিনি গোপনে গোপনে মাসিক তিন শত টাকার অধিক দান করিতেন। মহাকবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুরবস্থার সময়ে রমেশ বাবু তাঁহাকে প্রতি মাসে অর্থ সাহায্য করিয়া উপকৃত করিতেন। স্ত্রী-শিক্ষায় তাঁহার অকৃত্রিম অনুরাগ ছিল। কাশীর হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠাতাদিগের মধ্যে তিনি একজন প্রধান।

রমেশচন্দ্র মিত্র হিন্দু মতাবলম্বী ছিলেন, কিন্তু তাঁহাতে গোঁড়ামী বা কুসংস্কার অথবা ভণ্ডামী ছিল না। তাঁহার জামাতা ও এক পুত্র ইংলণ্ডে গিয়া ব্যারিষ্টার হইয়া আসিয়াছেন। রমেশ বাবু সম্পূর্ণরূপে হিন্দু হইয়াও হিন্দু বিবাহ সংস্কার কার্য্যে বিশেষ যত্ন করিয়া গিয়াছেন। কায়স্থ সম্প্রদায়ের বিবাহ ব্যয় সংস্কার জন্য আন্দোলন করিয়া গিয়াছেন এবং সমুদ্র যাত্রা ও বিলাত গমনের পক্ষে অনেককে সাহায্য করিয়াছেন। তিনি স্বদেশ-প্রেমিক, স্বজাতিবৎসল এবং আত্মীয়গণের অকৃত্রিম উপকারী ছিলেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণীও স্বামীর ন্যায় নানাগুণে ভূষিতা ছিলেন। ইনি পঞ্চপুত্র ও এক কন্যার জননী। রমেশ বাবুর এক পুত্র কিছুকাল কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর কালেক্টার ছিলেন; এক্ষণে অ্যাটনি অ্যাট্ লএর কার্য্য করিতেছেন। ধার্ম্মিক রমেশচন্দ্র বঙ্গসাহিত্যেও বিশেষ অধিকার রাখিতেন, সাহিত্য-পরিষদের তিনি নেতা ও সভ্য ছিলেন। সংস্কৃত শাস্ত্র ও সাহিত্যে তিনি এমন পারদর্শিতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন যে, কাশীধামেও তিনি দিগ্‌গজ পণ্ডিত বলিয়া প্রসিদ্ধ হয়েন। জীবনের শেষাংশ বারাণসী ধামে যাপন করিবার তাঁহার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু ৬০ বৎসর বয়ক্রমকালে তিনি ভবলীলা সম্বরণ করেন সুতরাং কাশীনগরীতে নির্ম্মিত নব অট্টালিকায় তিনি অধিক দিন বাস করিতে পারেন নাই। মৃত্যুর অনেক পূর্ব্বে তিনি "সার" ও কে, সি, আই, উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। তাঁহার মৃত্যুতে মহারাণী ভিক্টোরিয়া হইতে আরম্ভ করিয়া সামান্য প্রজা পর্য্যন্ত সকলেই একবাক্যে দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

আমি এ পর্য্যন্ত যাহা কিছু লিখিয়া আসিয়াছি, তাহা সার রমেশচন্দ্র মিত্রের গুণগরিমায় পরিপূর্ণ, কিন্তু উপসংহার কালে আমি তাঁহার জীবনের একটু বিস্ময়কর দুর্ব্বলতার কথা উল্লেখ করিতে বাধ্য হইতেছি। ইহা গোপনে রাখিলে রমেশচন্দ্রের জীবন-চরিত্র অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়, এই ভয়ে ইহার উল্লেখ করিতে হইতেছে। কথাটা এই—হরিমতি নামে এক বালিকার ৯ বৎসরে বিবাহ হয় এবং দশম বৎসর বয়ক্রম কালে হরিমতি শ্বশুরালয়ে আনীতা হয়। হরিমতির যুবক স্বামী নিশাকালে দাম্পত্য শয্যায় দশমবর্ষীয়া স্ত্রীর প্রতি যে অবৈধ অত্যাচার করিয়াছিল তাহাতে হরিমতির মৃত্যু হয়। এই কথা সম্বাদপত্রে ঘোরতররূপে আলোচিত হইবার কালে গবর্ণমেণ্ট বাহাদুর ইহা পাঠ করেন এবং যাহাতে এবম্বিধ অত্যাচার পুনরায় সংঘটিত হইতে না পারে তজ্জন্য এক আইনের প্রস্তাব করেন। বড় লাট সাহেবের কৌন্সীলের সভ্য সার আন্‌ড্রু স্কোবল সাহেবের উপর এই আইনের ভার সমর্পিত হয়। সার রমেশচন্দ্র প্রথম হইতেই এই আইনের ঘোরতর বিদ্বেষী ছিলেন। এই আইন সম্মতি আইন বা Consent Act নামে পরিচিত। এই আইনের বিধিলঙ্ঘন করিলে যাবজ্জীবনের জন্য দ্বীপান্তরিত অথবা কারাগার দণ্ডের বিধান হয়। এই আইনের মর্ম্ম প্রকটিত হইলে আমি সেকালের এক কাগজে তখন লিখিয়াছিলাম, "চতুর্দ্দশ বৎসর ঠিক সময় নয়; নারীর সম্মতি দানের বয়ক্রম অন্ততঃ সপ্তদশ বৎসর হওয়া আবশ্যক।" সার রমেশচন্দ্র হিন্দু ছিলেন, আমিও হিন্দু; কিন্তু রমেশচন্দ্রের সহিত আমি এবিষয়ে কোন ক্রমে একমত হইতে পারি নাই। তিনি প্রথম হইতে আইনের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া আইন রহিত করিবার চেষ্টা করেন এবং তজ্জন্য ঘোরতর অবৈধ আন্দোলনে যোগ দেন। এই সময়ে রমেশ বাবু বড়লাট সাহেবের কৌন্সীলের মেম্বর ছিলেন। যে দিন লাটসভায় এই আইনের তর্ক উঠে সেই দিন রমেশ বাবু এমন বিরুদ্ধ, বিষাদিত ও ক্রুদ্ধ হয়েন যে,

ইচ্ছাপূর্ব্বক লাটসভায় অনুপস্থিত হয়েন। বড়লাট সাহেব অর্দ্ধ ঘণ্টাকালের জন্য দরবার বন্ধ রাখিয়া রমেশ বাবুকে ডাকিবার জন্য অশ্বারোহী পাঠাইয়া দেন। রমেশ বাবু পত্র দ্বারা জানাইয়াছিলেন, "আমার শরীরের অবস্থা ভাল নয়. আমি সভায় উপস্থিত হইতে পারিব না।" আইন যে লাটসভায় পাশ হইয়া যাইবে ইহা তিনি নিশ্চয় জানিতেন।

রমেশ বাবুর আপত্তির একটি মাত্র কারণ এই ছিল যে, তিনি বলিতেন, "গবর্ণমেণ্ট আমাদের সকল অধিকারই করতলগত করিয়াছেন, যদি ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধেও অবাধে হস্তক্ষেপ করিতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে দুরবস্থার আর বাকি রহিল কি?" দুরবস্থার বাকি থাকিবে না সত্য, কিন্তু গঙ্গায় পুত্র-কন্যা নিক্ষেপ, অহিফেণ খাওয়াইয়া মাড়োয়ার দেশে শিশুকালে কন্যা বধ প্রভৃতি সর্ব্বনাশকর কুপ্রথা গবর্ণমেণ্টই ত নিবারণ করিয়াছিলেন। পথের ডাকাইতি দমন, রাত্রিকালের দস্যুতা দমন, গুরুগ্যাই নামক সেকালের সেই অতীব অশ্লীল নারকীয় ব্যাপার এবং ধর্ম্মের নামে চড়ক ও "গাজনের" সময় পৃষ্ঠ, পদ ও হস্তকে তপ্ত লৌহশলাকা দ্বারা বিদ্ধ করিয়া চড়কগাছে শরীরকে ঝোলাইবার নিষ্ঠুর প্রথা গুলিকে গবর্ণমেণ্টই ত বন্ধ করিয়াছেন। আরও অসংখ্য প্রকারের বিষয় আছে, বাহুল্য ভয়ে তাহার উল্লেখ করিব না। যাহা অন্যায়, যাহা পাপ, বিধিসঙ্গত উপায়ে তাহা দমন সম্ভবপর হইলে কোন যুক্তিতেই তাহা স্থগিত রাখা উচিত নহে। সুতরাং রমেশ বাবুর এই যুক্তি ও এই আশঙ্কা নিতান্ত ভ্রমাত্মিকা ও কুসংস্কারাচ্ছন্না। যাহা হউক, আশ্চর্য্যের বিষয় এই, দশমবর্ষীয়া সরলা ও নিরাশ্রয়া বালিকাদের প্রতি আসুরিক অত্যাচারের জন্য রমেশ বাবুর চক্ষু হইতে এক বিন্দু জল বাহির হইল না, অথচ ৬০ বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধের স্ত্রী বর্ত্তমান থাকিতে সে "আবার দশ বার বিবাহ করিলে পাতকী হয় না," রমেশচন্দ্রের এই কথা অত্যন্ত দুঃখোৎপাদিকা। যাহা হউক, যদি আমরা এই আইনের কথা ভুলিয়া যাই, তাহা হইলে সার রমেশচন্দ্র মিত্রকে আমরা এক অসাধারণ মহাপুরুষ বলিয়া পূজা করিতে পারি।

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

কল্যাণী।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

"হাঁ পিসি মা, ডাক্তার কি ব'লে গেলেন পিসিমা, তোমার অসুখ সারবে ত?"

'হাঁ মা, ডাক্তার বল্‌লেন, কোন বিশেষ অসুখ হয় নাই, সারাদিন বসে বসে শেলাই করা শরীরে সহ্য হচ্ছে না, তাই শরীটা খারাপ হয়ে পড়ছে।"

"তবে পিসিমা, এখন থেকে আমি শেলাইয়ে বেশী সময় দিব, তোমাকে আর এত শেলাই করতে দিব না।"

কল্যাণী ও তাঁহার পিসিমার মধ্যে এই কথোপকথন হইতেছিল। ইঁহাদের সহিত আমাদের প্রথম পরিচয়ের পর তিন বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। এই তিন বৎসরে সুশীলা দেবীর চেহারার পরিবর্ত্তন অল্পই হইয়াছে। তবে তিনি এখন একটু মোটাসোটা হইয়াছেন, বদনে কেমন একটী প্রসন্ন মাতৃভাব যেন ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু কল্যাণীর যে মলিন, বিমর্ষ, খিটখিটে চেহারা দেখিয়াছিলাম এখন তাহার কিছুই নাই। কল্যাণী এখন হৃষ্টপুষ্ট, প্রসন্নবদনা, হাস্যমুখী তরুণী। তাঁহার সযত্নবর্দ্ধিত কেশরাশি এখন বেণীবদ্ধ, তাঁহার পবিত্র, নির্ম্মল মুখচ্ছবি এখন নয়ন তৃপ্তিকর ও তীক্ষ্ণবুদ্ধির পরিচায়ক। কল্যাণী তাঁহার পিসিমাকে এখন সমগ্র হৃদয়ের সহিত গভীর ভাবে ভালবাসেন। সুশীলা দেবীও তাঁহাকে সন্তান-নির্ব্বিশেষে ভালবাসেন। কল্যাণীর কথার উত্তরে তিনি বলিলেন :—

"আমি ক'দিন যাবৎ আর একটা কথা ভাব্‌ছি মা! তোমার সঙ্গে সেই পরামর্শটা করা দরকার। আমার হাতে হাজার দুই টাকা আছে জান মা! আমার মা লক্ষ্মীর বিয়ের সময় —"

স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র মিত্র।

"ও পিসিমা,—"

"আমার কথাটা শোন আগে। যদি তুমি সাহস কর তবে এই টাকা দিয়া আমরা একটা নূতন কাজে হাত দি। আমি কয় দিন যাবৎ গালার চাষের বিষয় পড়ছি। তোমার পিসে মহাশয়ের এবিষয়ে খুব উৎসাহ ছিল। কিন্তু গালার চাষে অসংখ্য কীটের প্রাণ নাশ হয় শুনিয়া আমি তাঁহাকে বাধা দিয়াছিলাম। নূতন পুস্তক পড়িয়া দেখিতেছি এখন নাকি লাক্ষা কীটের প্রাণবিনাশ না করিয়াও গালার চাষ চলে। ব্যবসায়টা খুব লাভের, আর তত হাঙ্গামা নাই। তা' হলে কিন্তু আমাদিগকে সহর ছাড়িয়া মফঃস্বলে কোন পল্লীগ্রামে থাকিতে হইবে। আমার এখন যা, কিছু মা তোমারই জন্য। ভেবে দেখ, এতে তোমার মন প্রস্তুত হয় কি না?"

কল্যাণী। সে ত বেশ কথা পিসিমা! আমার নিকট এ ত বেশ ভালই বোধ হয়। আমিও তোমার ঐ বই খানা একটু একটু দেখিয়াছি। এই ব্যবসায়ে নাকি অনেক লাভ হয়। সহর ছেড়ে পাড়াগাঁয়ে যেতে কেমন কেমন বোধ হয় বটে, সেখানে কে আমাদের খবর নেবে, লোকজন কেমন কি জানি? কিন্তু পিসিমা, তুমি যখন কথাটা মনে স্থান দিয়েছ, সকল দিকই চিন্তা করিয়াছ; তোমার ইচ্ছা হইলে আমার অনিচ্ছা হইবে কেন?

সুশীলা দেবী। এই প্রস্তাবে তোমার মত আছে শুনিয়া সুখী হইলাম। আমার ইচ্ছা, ধারাপুরে জ্ঞানবাবুকে এবিষয়ে চিঠি লিখি। তিনি জমি বাড়ী সকল বন্দোবস্ত করিলে তার পর যাওয়া যাইবে। জ্ঞানবাবু অতি সহৃদয় লোক। তোমার পিসে মহাশয় ও তিনি প্রায় এক সময়ে খ্রীষ্টান হন, উভয়ের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব ছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর জ্ঞানবাবু সর্ব্বদাই আমার খোঁজ খবর লইয়া থাকেন। ধারাপুরে জ্ঞানবাবুর বেশ প্রতিপত্তি আছে। তিনিও নাকি গালার চাষ করেন।

কিছু দিন মধ্যে জ্ঞানবাবু তাঁহার স্বগ্রামের নিকটে লাক্ষাচাষের উপযোগী পলাশ বনের জমি স্থির করিয়া সুশীলা দেবীকে পত্র লিখিলেন। তিনিও অবিলম্বে সহরের বাস উঠাইয়া আপনার সামান্য যাহা কিছু ছিল সকল লইয়া কল্যাণীকে সহ ধারাপুরে উপস্থিত হইলেন।

ধারাপুর বালেশ্বর জেলার অন্তর্গত একটি গণ্ডগ্রাম। খৃষ্টান জ্ঞানবাবু এই গ্রামের একজন সম্ভ্রান্ত অধিবাসী। ইংরেজী শিক্ষা লাভ করিয়া তিনি প্রথম যৌবনেই খ্রীষ্ট-ধর্ম্মের প্রতি আশক্ত হন। কিন্তু সাধারণ খৃষ্টানগণ যেমন সাহেবী চাল চলন অনুকরণ করিয়া থাকে তিনি তাহা করেন নাই। তিনি খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন বটে কিন্তু জাতীয় ভাব সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করিতেন। নিজে সুশিক্ষিত এবং অবস্থাপন্ন হইয়াও স্বীয় বাসভূমি পল্লীগ্রাম ত্যাগ করিয়া সহরে আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই। পত্নী জীবিত ছিলেন না; পুত্র কন্যাগণকে বাসগ্রামে যথাসম্ভব শিক্ষা দিয়া পরে তাহাদিগকে কলিকাতায় রাখিয়া শিক্ষার বন্দোবস্ত করিতেন। জ্যেষ্ঠপুত্র জিতেন্দ্র এণ্ট্রেন্স পাশ করিয়া বাড়ীতেই আছেন। পিতার গালার চাষের তত্ত্বাবধান করেন। পড়াশোনায় তেমন প্রখর বুদ্ধির পরিচয় দিতে পারেন নাই বলিয়া জ্ঞানবাবু তাহাকে আর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িতে দেন নাই। বাড়ীতেই এখন তাঁহার নিয়মিত পড়াশোনার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন। নিজেই তাঁহার অধ্যয়নের সাহায্য করেন। তাঁহার বয়স এখন ২০।২১ বৎসর।

সুশীলা দেবী তাঁহার লাক্ষার চাষে জ্ঞানবাবু ও জিতেন্দ্রের নিকট যথেষ্ট সাহায্য পাইতে লাগিলেন। বস্তুতঃ জ্ঞানবাবুর ভরসায়ই তিনি ধারাপুরে আসিয়াছিলেন, জ্ঞানবাবু সাধ্যানুসারে বন্ধুপত্নীর সাহায্য করিতে লাগিলেন। নিজের গ্রামের মধ্যেই সুশীলা দেবীর জন্য একটী বাড়ী স্থির করিলেন। তাঁহাদের জন্য একজন ভৃত্য রাখিয়া দিলেন। তা ছাড়া লাক্ষা জমির জন্য আরো কয়েকজন চাকর রাখা হইল। জ্ঞানবাবু ও জিতেন্দ্র সর্ব্বদা তাঁহাদের বাড়ীতে আসিতেন, কল্যাণী এবং সুশীলা দেবীও জ্ঞানবাবুর বাড়ীতে প্রায়ই যাইতেন। ক্রমে ধারাপুরের অন্যান্য প্রতিবেশীদিগের সঙ্গেও তাঁহাদের পরিচয় হইল। তাঁহারা খৃষ্টান হইলেও হিন্দু প্রতিবেশী-

গণ তাঁহাদিগকে ঘৃণা করিত না, কারণ জ্ঞানবাবুর চরিত্র সে অঞ্চলে "খৃষ্টান" নামকে সাধারণের শ্রদ্ধাভাজন করিয়া তুলিয়াছিল। পল্লীগ্রামে সাধারণতঃ ভদ্রঘরের বয়স্কা বিধবা ও কুমারীগণের মধ্যে সহরের ন্যায় অবরোধ প্রথা বিদ্যমান নাই। সুশীলাদেবী ও কল্যাণী পদব্রজেই গ্রামের গৃহস্থদের বাড়ী যাইয়া স্ত্রীলোকদিগের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করিতেন। আশে পাশে ২।১টী বাড়ীর অল্পবয়স্কা স্ত্রীলোকগণ কল্যাণীর নিকট একটু একটু লেখাপড়াও শিখিতে আরম্ভ করিল। মোটের উপর ধারাপুরে সুশীলা-দেবী ও কল্যাণী মনের সুখেই কাল কাটাইতে লাগিলেন। এক বৎসর অতীত হইল, এই বৎসরে গালার চাষেও তাঁহাদের বিলক্ষণ লাভ দাঁড়াইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সুশীলাদেবীর লাক্ষার চাষে সফলতা লাভের একটা প্রধান কারণ জিতেনের নিঃস্বার্থ পরিশ্রম। এ দেশের শ্রমীজীবিগণ সাধারণতঃ পরিশ্রমী হইলেও তাহাদের কর্ত্তব্যজ্ঞান তেমন প্রবল নহে, সুবিধা পাইলেই তাহারা মনিবকে ঠকাইতে চেষ্টা করে। কিন্তু সর্ব্বদা পিতার কার্য্যে মজুর খাটাইয়া ও লাক্ষার চাষ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া জিতেন এবিষয়ে বিশেষ দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন। অসহায়া বিধবা—পিতার বন্ধুপত্নী যাহাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হন সুশীল, পরোপকার-পরায়ণ জিতেন সর্ব্বদাই সেই চেষ্টা করিতেন। সুতরাং সুশীলা দেবীর লাক্ষার চাষ জ্ঞান-বাবুর লাক্ষাক্ষেত্রের ন্যায়ই সমান যত্ন লাভ করিত। কিন্তু শুধু পরোপকার বৃত্তি, শুধু সহানুভূতিই কি জিতেনের এই যত্নের কারণ ছিল? তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। অন্য কারণ না থাকিলেও হয়ত জিতেন সুশীলা দেবীর জন্য এই যত্ন ও শ্রম করিতে কাতর হইতেন না। কিন্তু এখানে জিতেনের আর একটী প্রবল আকর্ষণের সৃষ্টি হইয়াছিল। প্রথমতঃ কল্যাণীর সঙ্গে পরিচিত হইয়া এবং ক্রমে প্রতিবেশীদিগের মুখে কল্যাণীর প্রশংসা শুনিয়া জিতেন ক্রমে ক্রমে তাঁহার প্রতি আসক্ত হইয়া পড়িতেছিলেন। মানব-চরিত্রের একটা বিশেষত্ব এই—যাহার প্রীতি লাভ করিবার জন্য মনে আগ্রহ হয়, যাহার প্রতি মন আকৃষ্ট হয় তাহাকে সুখী করিতে, তাহার তৃপ্তি উৎপাদন করিতে, ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল উপায়ে তাহার প্রতি জ্ঞাত ও অজ্ঞাত সারে আপনার শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে, প্রাণ ব্যাকুল হয়। জিতেনও ক্রমে সুশীলা দেবীকে উপলক্ষ্য করিয়া কল্যাণীর প্রীতি উৎপাদনের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সকল প্রকারে তিনি তাঁহাদের লাক্ষার চাষের উন্নতি সাধনে যত্নবান হইলেন।

লাক্ষার চাষের প্রধান শত্রু চোর। লাক্ষা যখন প্রায় পরিপক্ক হইয়া আসে সেই সময় পার্শ্ববর্ত্তী চোরেরা সকল হিংস্র জন্তুর ভয় পরিত্যাগ করিয়া গভীর অন্ধকার নিশীথে ঘন জঙ্গলে প্রবেশ করিয়া পলাশ বৃক্ষের ডাল ভাঙ্গিয়া তৎসংলগ্ন লাক্ষা চুরী করে। অতি সতর্ক পাহারা ব্যতীত এই চুরি নিবারণ করা সুকঠিন। জ্ঞান বাবুর ক্ষেত্র হইতে কতবার বহু মূল্যের লাক্ষা এই প্রকারে চুরী গিয়াছে। কিন্তু এখন শুধু ভৃত্যদিগের পাহারার উপর নির্ভর না করিয়া জিতেন্দ্র গভীর রাত্রিতে প্রায়ই জঙ্গলে প্রবেশ করিয়া দেখেন, ভৃত্যগণ কিরূপ পাহারা দিতেছে। এক রাত্রিতে সেই অঞ্চলের সর্ব্বপ্রধান চোর করিম খাঁকে তিনি লাক্ষা চুরি করিবার সময় ধরিয়া ফেলিলেন। বিচারে তাহার তিন মাসের জেল হইল। লাক্ষাক্ষেত্রও কিছু দিনের জন্য নিরাপদ হইল। কিন্তু জিতেন্দ্র বেশ বুঝিলেন, করিম খাঁ খালাস হইয়া আসিলে তাঁহাকে দ্বিগুণ সতর্ক হইতে হইবে। সুশীলাদেবী ও কল্যাণী তাঁহাকে বার বার অনুরোধ করিতে লাগিলেন, আর কখনও যেন তিনি এরূপে গভীর রাত্রে জঙ্গলে প্রবেশ না করেন। করিম খাঁর ন্যায় দুর্বৃত্ত সে অঞ্চলে আর ছিল না, সকলেই তাহার নামে ভয় পাইত। মুক্তি লাভের পর সুবিধা পাইলেই জিতেন্দ্রের উপর সে প্রতিশোধ লইবে, এই বলিয়া তাঁহারা জিতেন্দ্রকে বার বার সাবধান করিতে লাগিলেন।

কিন্তু করিম খাঁর মুক্তিলাভের পরও জিতেন পূর্ব্বের ন্যায় গভীর রাত্রে জঙ্গলে প্রবেশ করিতে ক্ষান্ত হইলেন না। তিনি সুশীলা দেবীর অনুনয়ের উত্তরে বলিলেন:— করিম যদি বুঝিতে পারে, যে আমি ভয় পাইয়াছি, তাহা

হইলে তাহার চুরি আরও বাড়িবে।" জিতেন চলিয়া গেলে কল্যাণী সুশীলাদেবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন :—"পিসি মা, স্ত্রীপুত্রকে অন্ন বস্ত্র দিতে না পারিয়া যাহারা চুরি করে ঈশ্বর কি তাহাদিগকে ক্ষমা করেন না? আর উপায় না পাইয়াই ত তাঁহারা এরূপ করে!"

সুশীলা। না মা, কোন অবস্থাতেই চুরির মার্জ্জনা নাই। অপরকে তাহার ন্যায্য ধনে বঞ্চিত করিবার অধিকার কাহারও নাই। অলস, কর্ত্তব্যজ্ঞানহীন লোকেরাই চুরী করে।"

কল্যাণী। পিসি মা, আমার বাবার কথা একবার ভাব। কি দুঃখে তাঁর দিন কাটে। করিমেরও অবস্থা হয়ত তেমনই। সে ছোটলোক, পাপ-পুণ্যের বিচার অতটা করিতে পারে না, তাই চুরি করে।

সুশীলা। মা, তুমি নিশ্চয় জানিও, মানুষ যখন এতটা দরিদ্র হয় তাহার মূলে কোথাও না কোথাও পাপ আছে। তোমার বাবার এই অবস্থার কারণ কি, আমরা সকলেই ত তাহা জানি।

কল্যাণী। কিন্তু যাহারা মন্দ, তাহাদের দোষে যাহারা ভাল তাহাদিগকেও কেন কষ্ট পাইতে হয়, বুঝি না।

সুশীলা। ভগবানের ব্যবস্থা সকল সময় আমরা পরিষ্কার বুঝিতে পারি না। কিন্তু তোমার বাবার দুরবস্থার কারণ বুঝিয়া উঠা কিছু কঠিন নয়। পুরুষ মানুষ যখন বিবাহ করে তখন তাহার ভাবা উচিত যে, সে তাহার সন্তানদিগের জননী মনোনয়ন করিতেছে, শুধু সুন্দর মুখ খুঁজিলেই চলে না। আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, তোমার মা উপযুক্ত মেয়ে হইলে সুধীন্দ্রের সংসার সোনার সংসার হইত।

কল্যাণী। পিসি মা, কয় দিন যাবৎ একটা চিন্তা মনে জাগিতেছে। আমি এখানে তোমার কাছে কত সুখে, কত যত্নে রহিয়াছি, আর বাবা আমার কি কষ্টেই না দিন কাটাইতেছেন! হয়তঃ আমি কাছে থাকিলে তাঁহার কষ্টের একটু লাঘব হইত, সংসারে একটু শৃঙ্খলা, শান্তি বিরাজ করিত।

কল্যাণীর কথায় নিতান্ত চমকিত হইয়া সুশীলাদেবী বলিলেন, "তুমি বল কি মা! সেখানে থাকিলে তুমিও ঠিক তাহাদেরই মত এক জন হইতে!"

কল্যাণী। হাঁ পিসি মা তুমি না থাকিলে আমি তাই হইতাম, তাহাতে সন্দেহ নাই।

সুশীলা। তবে তোমার কর্ত্তব্য ত অতি পরিষ্কার, সরল। আমার কাছে থাকাই তোমার কর্ত্তব্য। তা ছাড়া তোমার বাবার সঙ্গে এইরূপ স্থির করিয়াই ত আমি তোমাকে এখানে আনিয়াছি!

কল্যাণী। কয়েক দিন যাবৎ এই চিন্তাতে মনটা বড়ই আন্দোলিত হইতেছিল। তোমার কথায় সহজে বিষয়টা মীমাংসা হইয়া গেল।

এই মীমাংসায় উপনীত হইয়া কল্যাণীর মন যেন শান্তি লাভ করিল। জিতেন্দ্রের সঙ্গে কল্যাণীর ঘনিষ্ঠতা এখন যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। জিতেন্দ্র দেশের অবস্থা ও নানা লোকহিতকর বিষয়ে এখন কল্যাণীর সহিত আলোচনা করেন। ভাল ভাল পুস্তক ও পত্রিকা তাঁহাকে পড়িতে দেন এবং সেই সকল পঠিত বিষয়ে কথাবার্ত্তা কহেন। কয়েক দিন কল্যাণীর পিতামাতার প্রতি কর্ত্তব্য সম্বন্ধেও জিতেনের সঙ্গে তাঁহার আলাপ হইয়াছে, এবং জিতেনের কথায় কল্যাণীর মন আন্দোলিত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু কল্যাণী জিতেনের নিকট তাঁহাদের পরিবারের সকল কথা খুলিয়া বলেন নাই কারণ সুশীলাদেবী কল্যাণীর মনে এ কথা বদ্ধমূল করিয়া দিয়াছিলেন, যে তাঁহাদের ঘরের কথা, তাঁহার মার কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করা কর্ত্তব্য নহে, তাহাতে আত্মসম্মান বিনষ্ট হইবে। কল্যাণী পিসিমার এই শিক্ষা সযত্নে পালন করিতেন।

সুশীলাদেবী সহৃদয়া প্রেমপ্রবণ মহিলা হইলেও একটী বিষয়ে তাঁহার মন বড় কঠোর ছিল। সততা ও সম্ভ্রমশীলতার তাঁহার একটা আদর্শ ছিল; যাহারা এই আদর্শের নিম্নে পড়িত তিনি তাহাদিগের প্রতি কিছুমাত্র সহানুভূতি প্রকাশ করিতে পারিতেন না। ন্যায়ের কঠোর তুলাদণ্ডে তিনি তাহাদের বিচার করিতেন।

কল্যাণী সে রাত্রে শান্ত চিত্তে নিদ্রা গেলেন। সুশীলাদেবীর সঙ্গে কথোপকথনে তাঁহার মনের একটা

মেঘ যেন কাটিয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান সুখের অবস্থার সহিত তাঁহার কর্ত্তব্যের কোন বিরোধ নাই, এই ধারণাতে আবার তাঁহার মন প্রফুল্ল হইয়া উঠিল।

পর দিন প্রত্যুষে উঠিয়া কল্যাণী জিতেন্দ্রের সহিত সাক্ষাতের আশায় বাহিরের ঘরে গেলেন। সপ্তাহে তিন দিন করিয়া সুশীলাদেবীর প্রাতঃকালীন উপাসনায় জিতেন্দ্র উপস্থিত থাকিতেন, আজ তা'র এক দিন। কিন্তু জিতেন্দ্রকে দেখিতে পাইলেন না। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া তাঁহারা দৈনিক উপাসনা শেষ করিলেন। তাঁহারা মনে করিলেন, বিশেষ কোন কার্য্যে জিতেন আজ উপস্থিত হইতে পারেন নাই, অপরাহ্নে অবশ্যই আসিয়া সাক্ষাৎ করিবেন। কিন্তু বেলা প্রায় দশটার সময় জ্ঞান বাবু ত্রস্ত ভাবে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "জিতেন কি এখানে আসিয়াছে ?"

সুশীলাদেবী উত্তর করিলেন, "কই, না। আজ সকালের উপাসনায় জিতেনের উপস্থিত থাকিবার কথা ছিল, সে আসে নাই। সে কি বাড়ী নাই ? সে তবে কোথায় গেল ?"

জ্ঞান বাবু। তাই ত! শুনিলাম রাত্রে সে পলাশ বনে গিয়াছিল। সকালে তাহাকে বাড়ীতে না দেখিয়া ভাবিলাম, আমি ঘুম হইতে উঠিবার পূর্ব্বেই বুঝি সে আপনাদের বাড়ী আসিয়াছে। এখানেও ত দেখি আসে নাই। এ যে বড় ভাবনার কথা! তবে কি পলাশ বনে তাহার কোন বিপদ ঘটিল!

জ্ঞান বাবু, সুশীলাদেবী, কল্যাণী, ভৃত্যগণ সকলে মিলিয়া তখন ব্যতিব্যস্ত হইয়া পলাশ বনে ছুটিলেন। সে প্রকাণ্ড বন, ভিতরে পরিষ্কার হইলেও সর্ব্বত্র সূর্য্যালোক ভালরূপে প্রবেশ করিতে পারে না। সকলে বনে প্রবেশ করিয়া চারি দিকে খুঁজিতে লাগিলেন। এক এক জন এক এক দিগে ছুটিলেন। প্রায় বনের সীমান্তে একটা খালের ধারে যাইয়া হঠাৎ কল্যাণী চীৎকার করিয়া উঠিলেন। একটা প্রকাণ্ড পলাশ বৃক্ষের নিম্নে জিতেনের দেহ শায়িত, দেখিলে মৃত বলিয়াই মনে হয়। নিকটে রক্তের দাগ। হায়! দুরন্ত করিম খাঁ জিতেনকে খুন করিয়াছে! দ্রুত পদে কল্যাণী নিকটস্থ খাল হইতে আঁচল ভিজাইয়া জল আনিয়া তাঁহার মুখে চোখে দিলেন এবং মুখের রক্ত মুছিতে লাগিলেন। দেখিলেন, তাহার বাম বাহু এক খানা রুমাল দিয়া বাঁধা, রক্তে রুমাল ভিজিয়া গিয়াছে। কল্যাণীর চীৎকার শুনিয়া ইতিমধ্যে জ্ঞান বাবু প্রভৃতি সকলে সেখানে উপস্থিত হইলেন। দেখা গেল, জিতেনের দেহে তখনও প্রাণ আছে। ডাক্তার আনিবার জন্য লোক দৌড়িল। ডাক্তার আসিয়া চৈতন্য সম্পাদন করিলে মাচায় করিয়া জিতেনকে বাড়ী লইয়া যাওয়া হইল। কল্যাণী বাড়ী ফিরিয়া গেল। সুশীলাদেবী জিতেনকে গৃহে রাখিয়া এবং তাহাকে একটু প্রকৃতিস্থ দেখিয়া বাড়ী ফিরিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সুশীলাদেবী বাড়ী আসিয়া দেখিলেন, কল্যাণী বিছানায় মুখ গুঁজিয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতেছেন। সুশীলা-দেবীকে দেখিয়া কল্যাণী আত্মসংবরণ করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তিনি তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালিনী প্রবীণা মহিলা। তিনি বলিলেন, "মা, তুমি এখন একাকীই থাক। বাবা! যে ভয়ানক কাণ্ড! তুমি ত ছেলে মানুষ, ভয়ে আমাদেরই অন্তরাত্মা শুকাইয়া গিয়াছে। একটু একাকী থাক, মন শান্ত হইবে।" কল্যাণী আজ অজ্ঞাতসারে পিসিমার নিকট জিতেনের প্রতি তাঁহার মনের ভাবের অনেকটা পরিচয় দিয়া ফেলিয়াছেন। কল্যাণী নিজেও জানিতেন না, জিতেনের মঙ্গল অমঙ্গলে তিনি নিজে এতটা জড়িত হইয়া পড়িয়াছেন! আজ কল্যাণী ভাবিতে লাগিলেন, যদি জিতেন না রক্ষা পান তবে তাঁহার জীবনে কি শূন্যতাই আসিবে! জিতেনের অমঙ্গল ভাবিতেও যেন তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিতে লাগিল। সুশীলা দেবী কল্যাণীর চিন্তাস্রোত অনেকটা বুঝিতে পারিলেন এবং তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, "এক মাস দেড় মাসে জিতেন আবার সুস্থ সবল হইয়া উঠিবে। আঘাত তেমন কঠিন নয়।"

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, জিতেনের মা নাই। সুশীলা দেবী প্রত্যহ তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিতেন বটে, কল্যাণীও মাঝে মাঝে তাঁহার সাহায্য করিতেন কিন্তু

ঘরে এক জন শুশ্রূষাকারিণী মাতৃস্থানীয়ার অভাব এ সময় বিশেষ ভাবে অনুভূত হইতে লাগিল। জ্ঞানবাবু জিতেন্দ্রের মামীকে এই উদ্দেশ্যে নিজ বাড়ীতে আনাইলেন। জিতেনের মামীর সঙ্গে তাঁহার পুত্র উপেন্দ্রও কিছু দিনের জন্য আসিলেন। উপেন্দ্র জিতেনেরই সমবয়সী, অনেকবার জিতেনদের বাড়ী আসিয়াছেন, মাঝে মাঝে আসিয়া ১০।১৫ দিন এখানে থাকেন। এট্রান্স পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হইয়া উপেন পড়াশোনা ছাড়িয়া বাড়ীতেই থাকেন, বিশেষ কোন কাজকর্ম্ম করেন না। জিতেনদের বাড়ী আসিলে তিনি অনেক সময়ই সুশীলা দেবী ও কল্যাণীর নিকটে থাকিতেন। কিন্তু কল্যাণী তাঁহার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিতে বড় ভালবাসিতেন না। সর্ব্বদাই তাঁহার সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে চেষ্টা করিতেন।

উপরোক্ত ঘটনার ২।৩ দিন পরে এক দিন উপেন আসিয়া কল্যাণীকে বলিলেন, "গত রাত্রে জিতেনের অবস্থা বড় খারাপ গিয়াছে।"

কল্যাণী ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন, কাল দিনের বেলায় ত একটু ভাল ছিলেন, কোন ভয়ের কারণ হইয়াছে কি?"

"তা আমি ঠিক বলিতে পারি না। ডাক্তার বলিলেন, ভাল হইতে এখনও ঢের সময় লাগিবে। আপনার চেহারা দেখিতেছি বড়ই খারাপ হইয়া পড়িয়াছে।"

উপেনের কথায় কল্যাণীর মুখ লাল হইয়া উঠিল, তিনি আত্মসংবরণ করিয়া বলিলেন, "হাঁ, সে দিনের ঘটনায় বড় ভয় পাইয়াছিলাম, একটু রক্ত দেখিলেই আমার মাথা ঘুরিয়া যায়, এটা আমার একটা বড় দুর্ব্বলতা।"

"তা ছাড়া, আপনাদের দুজনের মধ্যে ঘনিষ্ঠতাও যথেষ্ট। আমি দেখিয়াছি, আপনাকে আর কাহারও সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশিতে দেখিলে জিতেন বিরক্ত হয়।"

কল্যাণী বিরক্তি প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "তিনি পিসিমার কত উপকার করেন, আমরা তাঁহার নিকট কত কৃতজ্ঞ।"

উপেন। "ও! তাত বটেই!"

উপেনের এই কথার ভঙ্গীতে এমনি একটু বিদ্রূপ লুক্কায়িত ছিল, যে কল্যাণী বিরক্ত হইয়া উঠিয়া গেলেন। কিন্তু যখন তাঁহার বিরক্তি চলিয়া গেল তখন তিনি ভাবিলেন, উপেনের সঙ্গে এরূপ ব্যবহার করা অন্যায় হইয়াছে। তাঁহার এই ব্যবহারে উপেনের মনের সন্দেহ আরও দৃঢ় হইবে মাত্র। তিনি সংকল্প করিলেন অতঃপর যখন উপেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে, তিনি খুব ভাল ভাবে কথাবার্ত্তা কহিবেন। আরও মনে হইল, জিতেনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধুতা ব্যতীত আর কি সম্বন্ধ আছে? তিনি নানাপ্রকারে তাঁহাদের সাহায্য করেন বটে, কিন্তু সম্ভবতঃ ঘনিষ্ঠ বন্ধুতা ব্যতীত তাহার আর কোনই কারণ নাই। জিতেনের মত সৎ লোকের ঘনিষ্ঠ বন্ধুতার কথা স্মরণ করিয়াও কল্যাণী যেন মনে গৌরব অনুভব করিতে লাগিলেন। কিন্তু এবিষয় লইয়া কেহ কোনরূপ ঠাট্টা বা বিদ্রূপ করিলে কল্যাণী তাহা সহ্য করিতে প্রস্তুত নহেন।

জিতেন ক্রমেই আরোগ্য লাভ করিতে লাগিলেন। উপেনের সঙ্গে কল্যাণী এখন বেশ ভাল ব্যবহারই করেন। কল্যাণী প্রথমে উপেনের ব্যবহার সম্বন্ধে একটু সন্দেহ পোষণ করিয়াছিলেন, কিন্তু অবশেষে তাঁহার শান্ত ও সহৃদয়তাপূর্ণ ব্যবহারে সে সন্দেহ দূর হইল।

আজ সুশীলা দেবীর বাড়ীতে জিতেনের নিমন্ত্রণ। সাংঘাতিক আঘাতে প্রায় দুই মাস শয্যাগত থাকিবার পর জিতেন আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। সেই আনন্দ জ্ঞাপনের জন্য আজ সুশীলা দেবী জিতেনকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। তাঁহাদের অবস্থায় যতটা কুলায় আহারের উৎকৃষ্ট আয়োজন তাঁহারা করিয়াছেন। কল্যাণীর প্রাণে আজ আর আনন্দ ধরিতেছে না। তিনি বাগানে ফুল তুলিয়া একটী ফুলের তোড়া প্রস্তুত করিতেছেন, আর গুন্ গুন্ করিয়া মনের আনন্দে গান গাহিতেছেন। এমন সময় জিতেন বাগানে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পদশব্দে কল্যাণী চমকিয়া ফিরিয়া চাহিলেন। তাঁহার হাস্যপ্রফুল্ল মুখের অব্যক্ত সাদর অভিনন্দন জিতেনের প্রাণে যেন অমৃত বর্ষণ করিল। রোগশয্যায়, কথাপ্রসঙ্গে উপেনের তাঁহাদিগকে কাজকর্ম্মে যথেষ্ট সাহায্য করিবার কথা জিতেন সুশীলা দেবীর মুখে শুনিয়াছেন।

শুনিয়া মনে মনে বিরক্ত হইয়াছেন। আজ কল্যাণীর এই সরল স্বাভাবিক গভীর প্রীতিপূর্ণ অভিনন্দনে তাঁহার মন যেন অনেকটা পরিষ্কার হইল। তিনি বলিলেন :—

"কত দিন পরে আবার আপনাদের বাড়ী আসিলাম!"

সুশীলা দেবী জিতেনকে দেখিয়া ডাকিয়া বলিলেন, "এস জিতেন, ঘরে এস। তোমার শরীর এখনও দুর্ব্বল, বেশীক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকা ভাল নয়।"

জিতেন ঘরে প্রবেশ করিয়া ভোজনের ব্যবস্থা দেখিয়া আনন্দে বলিয়া উঠিলেন, "ও! এযে মহা ঘটা দেখিতেছি! আয়োজন দেখিয়া যে আমার ক্ষুধা বাড়িয়া গেল।"

সুশীলা দেবী বলিলেন, "এ আর কি আয়োজন! তুমি একটু বস, আমি রান্নাঘর হইতে সবগুলি জিনিষ নিয়া আসি।"

"আমি ততক্ষণ বাগানে একটু বেড়াই"—এই কথা বলিয়া জিতেন আবার কল্যাণী যেখানে ফুল তুলিতেছিলেন সেখানে গেলেন। কল্যাণী ফুলের তোড়া প্রস্তুত করিয়া একটী সুন্দর গোলাপ নিজের খোপায় পরিয়াছেন। আরও কয়েকটী ফুল তুলিতেছেন। জিতেন অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "আমাকে একটী ফুল দিন্ না, আমার বোতামে লাগাব।"

কল্যাণী তাঁহাকে হস্তস্থিত একটী ফুল দিতে গেলেন, কিন্তু জিতেন বলিলেন, "আপনার খোপার ফুলটী বড় সুন্দর, ঐটী আমায় দিন্ না!" ব্রীড়াবনতমুখী কল্যাণী ফুলটী খুলিয়া জিতেনের হাতে দিতে গেলেন। জিতেন বলিলেন, "আপনি কি জানেন না, আমার হাত এখনও কত দুর্ব্বল, আপনি আমার বোতামে ফুলটী পরাইয়া দিন্।" কল্যাণী সলজ্জ মধুর হাসি ও অনুরাগ পূর্ণ দৃষ্টিতে জিতেনের মুখের দিকে চাহিয়া ফুলটী তাঁহার বুকের বোতামে পরাইয়া দিলেন।

এমন সময় ভিতরের আঙ্গিনায় উপেন ডাকিলেন, "পিসিমা ঘরে আছেন?" সুশীলা দেবী উত্তর করিলেন, "হাঁ বাবা, এসো।"

উপেনের স্বর শুনিয়া সেই মুহূর্ত্তে জিতেনের মুখ ম্লান হইয়া গেল। তিনি কল্যাণীকে বলিলেন, "উপেন ত দেখিতেছি আপনাদের বাড়ীতে বেশ পসার করিয়া বসিয়াছে। আচ্ছা, আপনাদের এ কি রকম বিবেচনা, আপনারা ত তাকে জানেন, একে কেন আপনাদের সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠতা করিতে দেন? আপনাদের এ ভারী অন্যায়।"

কল্যাণী। কেন, উপেন বাবু মন্দ লোক কি? এই আপনার অসুখের সময় তিনি আমাদের কত সাহায্য করেছেন! আমার কাপড় কিনিয়া দিতে পিসিমা তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, বোধ হয় টাকা নিতে আসিয়াছেন। আমি তাঁহাকে কাপড়ের পাড়ের কথা বলিয়া আসি, আপনি একটু দাঁড়ান, আমি এখনি আস্‌ছি।

এই বলিয়া কল্যাণী ঘরে প্রবেশ করিলেন। জিতেন তাঁহার কথা ও ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া ধীরে ধীরে গৃহে প্রবেশ করিলেন এবং কল্যাণী উপেনের সঙ্গে বেশ অসঙ্কোচে কথা কহিতে অভ্যস্ত হইয়াছেন দেখিয়া ক্রোধে তাঁহার মুখ আরক্তিম হইয়া উঠিল। সুশীলা দেবী জিতেনের মুখের ভাব লক্ষ্য করিয়া বলিলেন :—

"বাবা জিতেন, এতক্ষণ বাগানে দাঁড়াইয়া থাকা তোমার ভাল হয় নাই, তোমাকে অত্যন্ত ক্লান্ত ও বিষণ্ণ দেখাইতেছে, তুমি বস, একটু বিশ্রাম কর।"

সকলে আহারে বসিলেন। জিতেন নাম মাত্র আহার করিলেন। আহারের পরেই তিনি বাড়ী চলিয়া যাইতে চাহিলেন। সুশীলা দেবী ও কল্যাণী একটু বিশ্রাম করিয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন, কিন্তু জিতেন কিছুতেই অপেক্ষা করিতে সম্মত হইলেন না। সুশীলা দেবী কার্য্যোপলক্ষে গৃহান্তরে গেলে জিতেন কল্যাণীকে বলিলেন, "যার তার সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠ ভাবে মেশা আপনার অন্যায়।" কল্যাণী জিতেনের বৃথা বিরক্তিতে বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, "আমাকে এমন ভাবে কথা বলাটা কি আপনার ভাল? আপনি নিশ্চয় জানেন—" কল্যাণীর কথা সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই উপেন বাজার হইতে কাপড় লইয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। জিতেনকে গমনোদ্যত দেখিয়া

উপেন বলিলেন, "জিতেন, এখন বড় রোদ, এই রোদে তুমি একাকী বাড়ী যেয়ো না, চল এক সঙ্গে দুজনে যাই।" জিতেন উগ্রভাবে বলিয়া উঠিলেম, "না, না, আমি একাই বেশ যাইতে পারিব। তোমার যাইবার প্রয়োজন নাই।" কল্যাণী জিতেনের মুখের দিকে চাহিলেন। জিতেন আপনার ব্যবহারে লজ্জিত হইলেন। কল্যাণী বলিলেন, "না উপেন বাবু, আপনি ওঁর কথা শুনিবেন না, আপনি ওঁকে ঘরে রাখিয়া আসুন।" জিতেন ও উপেন চলিয়া গেলেন। অল্পক্ষণ পরেই ডাক পিয়ন কল্যাণীর নামের একখানা চিঠি দিয়া গেল। তাঁহার পিতার চিঠি। তিনি লিখিয়াছেন, কল্যাণীর মাতা অত্যন্ত পীড়িতা, অবস্থা খুব খারাপ। পড়িয়া গিয়া কল্যাণীর পিতারও পা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এই সময় বিশেষ সাহায্য না পাইলে তাহাদের অবস্থা যে কি হইবে বলা যায় না।

সুশীলা দেবী চিঠি শুনিয়া বলিলেন ;—"বিপদ কখনও একাকী আসে না। আহা ভাই সুধী, লক্ষ্মীছাড়া মেয়েকে বিবাহ করিয়া তোমার এই দশা!"

কল্যাণী বলিলেন, "পিসিমা, আমার এখন কি বাবার কাছে যাওয়া উচিত নয়?"

সুশীলা দেবী চমকিত হইয়া বলিলেন, "তুমি সেখানে যাবে? বল কি মা? এ চিন্তা কেন তোমার মনে আসিল? সুধী ত তোমায় যাইতে লেখে নাই।" সুশীলা দেবীর মুখ বিমর্ষ হইয়া পড়িল। কল্যাণী তাঁহার নিকট হইতে যাইবেন, একথা তিনি ভাবিতেও পারিতে-ছিলেন না। কল্যাণী গেলে সুশীলা দেবীর আর কি থাকে? এই ঘর সংসার—কল্যাণী ছাড়া এ গুলির কি কোন অর্থ থাকে? আর সেই ভয়ানক স্থানে কি করিয়া তিনি কল্যাণীকে যাইতে দিবেন? যদি সুধীন্দ্র বাবুর পরিবারের শুধু দারিদ্র্য দোষই থাকিত, সুশীলা দেবীর বিচারে তাহা হইলেও কল্যাণীর সেখানে যাওয়া অনুচিত। তার উপর সেই পরিবারের লোক গুলির কি অভদ্র প্রকৃতি! স্ত্রীরই কর্ত্তব্য স্বামীর যত্ন ও সেবা করা। সুধীন্দ্রের স্ত্রী যদি মানুষ হইত, তবে অবশ্যই সুধীন্দ্রের যত্নের ক্রটী হইত না। তবে কল্যাণী-যাকে তিনি এত যত্নে মানুষ করিয়াছেন—যাকে না হইলে এখন তাঁহার দিন চলে না—কল্যাণী কেন সেখানে যাইবে? তার পর জিতেন ও কল্যাণীর মধ্যে একটা কিছু মন কষাকষি চলিয়াছে সুশীলা দেবী তাহা বুঝি-য়াছেন। এই সময় যদি কল্যাণী দূরে চলিয়া যায়, তাহার ফল কি ভাল হইবে? সুশীলা দেবী কল্যাণীর মন হইতে তাঁহার পিতৃগৃহে যাইবার চিন্তা দূর করিতে চেষ্টা করিলেন এবং শীঘ্রই সুধীন্দ্র বাবুর সাহায্যার্থ কিছু টাকা পাঠাইয়া দিবেন বলিলেন। কল্যাণী বলিলেন, "পিসিমা, আমি কিছু মীমাংসা করিতে পারিতেছি না। কাল যাহা হয় স্থির করিব। আমি ত একবারে চলিয়া যাইতে চাহিতেছি না। অল্প দিনের জন্য যাব, আবার শীঘ্রই ফিরিয়া আসিব।"

বিরক্ত হইয়া সুশীলা দেবী বলিলেন, "আমি আশা করি ফিরিবার সময় তোমার মাকে সঙ্গে করিয়া আনিবে না! আমি এতদিন যথাসাধ্য যত্নে তোমাকে লালন পালন করিয়াছি কিন্তু এখন তুমি বড় হইয়াছ, নিজের কর্ত্তব্য নিজেই মীমাংসা করিয়া লও।"

কল্যাণী কাঁদিয়া ফেলিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "পিসিমা, তোমায় ছেড়ে—"

সুশীলা দেবী বলিলেন, "আমি জানি মা, তুমি অতি লক্ষ্মী মেয়ে। কিন্তু তোমার সেখানে যাইবার কথা ভাবা আমার পক্ষে অত সহজ নয়।" তিনি আর বেশী কিছু বলিতে পারিলেন না। তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। কল্যাণী তাঁহার গলা জড়াইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহাকে শান্ত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অবশেষে উভয়ে নিজ নিজ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন।

সন্ধ্যার পর কল্যাণী উপাসনা-গৃহে প্রবেশ করিলেন। "আমার এ বিষয়ে কর্ত্তব্য কি?" চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিছু মীমাংসা করিতে না পারিয়া ব্যাকুল হৃদয়ে অনেকক্ষণ প্রার্থনা করিলেন। তাঁহার প্রার্থনা বৃথা হইল না। পিতামাতার নিকট যাইবেন, এই মীমাংসায় উপনীত হইয়া তিনি নিদ্রা গেলেন। কিন্তু ভাল নিদ্রা হইল না।

এখানে কত সুখে আছেন, পিতৃগৃহের কষ্ট কি এখন

শরীরে সহিবে? জিতেনের সঙ্গে তাঁহার জীবন এখন যে ভাবে জড়িত হইয়া পড়িয়াছে, দূরে গেলে কি মনের শান্তি রক্ষা করিতে পারিবেন? আবার উপেনের সঙ্গে ব্যবহার নিয়া জিতেনের মনে কি একটা অযথা বিরক্তি প্রবেশ করিয়াছে—যদিও তাহা স্থায়ী হইবে না কিন্তু কল্যাণীর কর্ত্তব্য জিতেনের এই পীড়িত অবস্থায় মিষ্ট ব্যবহারে তাঁহার মনকে প্রফুল্ল রাখা। কত দিন পরে আজ ভাল করিয়া কথাবার্ত্তা কহিবেন আশা করিয়াছিলেন কিন্তু জিতেনের একগুঁয়েমিতে এই সাক্ষাৎ বরং অপ্রীতিকরই হইয়া পড়িয়াছে। এখন যদি তিনি এখান হইতে চলিয়া যান তবে জিতেনের মানসিক অশান্তি দূর হইবার কোন উপায় থাকিবে না। এইরূপ নানা ভাবনায় সারারাত্রি ভাল নিদ্রা হইল না। প্রাতঃকালে পিসিমাকে আপনার সংকল্প জানাইলেন। সুশীলা দেবী সেদিন আর তত আপত্তি করিলেন না। গত রাত্রে অনেক চিন্তার পরে তিনিও স্থির করিয়াছেন, কল্যাণী যাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলে তিনি বাধা দিবেন না। উপেন কল্যাণীকে পিতৃগৃহে রাখিয়া আসিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

প্রায় এক মাস হইল কল্যাণী পিতৃগৃহে আসিয়াছেন। পিতৃগৃহ তাঁহার পক্ষে এখন কি পরীক্ষার স্থান! সকল প্রকারের অশান্তি যেন এখানে রাজত্ব করিতেছে। মাতার স্বভাবতঃ উগ্রপ্রকৃতি রোগশয্যায় আরও অশান্তিদায়ক হইয়া উঠিয়াছিল। এখন তিনি চিরশান্তি লাভ করিয়াছেন। পিতার পা এখনও ভাল করিয়া সারে নাই। ভাই সুশীল দোকানের টাকাকড়ির হিসাব ভাল করিয়া দেয় না, টাকাকড়ি কি করে সে-ই জানে। এদিকে অর্থাভাবে কল্যাণী চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিতেছেন। সুশীলা দেবী যে কয়টী টাকা সঙ্গে দিয়াছিলেন তাহাও শেষ হইয়া গিয়াছে। ঘরবাড়ী নিতান্ত অপরিষ্কার ছিল, রুগ্ন পিতামাতার সেবা করিয়া যে সামান্য অবসর পাইতেন কল্যাণী খাটিয়া খাটিয়া বাড়ীটাকে তার মধ্যেই এখন মানুষের বাসোপযোগী করিয়া তুলিয়াছেন। ভগ্নী সরলার বয়স এখন ১২।১৩ বৎসর হইয়াছে, কিন্তু সে কল্যাণীর সাহায্য বড় একটা করে না। এই অশান্তির আলয়ে শান্তি স্থাপনের জন্য কল্যাণী প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু তিনি দেখিতে পাইলেন, ক্রমে তাঁহার নিজ প্রকৃতিও খিট্‌খিটে হইয়া পড়িতেছে। এই এক মাসের মধ্যে তিনি পিসিমার একখানা পোষ্টকার্ড মাত্র পাইয়াছেন। তাহাতে বেশী কিছু লেখা নাই। কল্যাণী জিতেনের চিঠি পাইবেন আশা করিয়াছিলেন, কিন্তু একখানা চিঠিও পান নাই। তিনি ভাবিলেন, জিতেন কি তবে তাঁহাকে ভুলিতেছেন? সে কি সম্ভব? নানা অশান্তিতে পরিপূর্ণ কল্যাণীর মন একটু সহানুভূতির জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তিনি পিসিমাকে এক খানা দীর্ঘ চিঠি লিখিলেন।

যে দিন কল্যাণীর পিতা আরোগ্য লাভ করিয়া কার্য্য আরম্ভ করিলেন সেই দিন কল্যাণী সুশীলা দেবীর পত্রোত্তর পাইলেন। জিতেন তাঁহার ভগ্নীকে আনিবার জন্য শীঘ্রই কলিকাতা যাইতেছেন, তাঁহার সঙ্গে তিনি কল্যাণীকে ধারাপুরে যাইতে লিখিয়াছেন। কল্যাণীর মন আনন্দে নাচিয়া উঠিল। পিতৃগৃহে যাহা করিবার ছিল, যে জন্য তিনি আসিয়াছিলেন আপনার সমস্ত হৃদয় ও শক্তি দিয়া তিনি তাহা করিয়াছেন। পিতার যত্ন করিবার জন্য এখন সরলা রহিল। আর পিসিমা তাঁহার জন্য এত করিয়াছেন, তিনি তাঁহাকে যাইতে লিখিয়াছেন, তিনি না থাকিলে সুশীলা দেবীর কত অসুবিধা হয় কল্যাণী তাহা জানেন। কিন্তু তিনি চলিয়া গেলে পিতৃগৃহের অবস্থা শীঘ্রই আবার কিরূপ দাঁড়াইবে কল্যাণীর তাহা বুঝিতে বাকী ছিল না। চিঠি পাইবার দুই দিন পরে অনেক ভাবিয়া কল্যাণী তাঁহার বাবাকে পিসিমার চিঠি শোনাইলেন। এবং ধারাপুরে যাওয়া সম্বন্ধে তাঁহার মত জিজ্ঞাসা করিলেন। সুধীন্দ্র বাবু বলিলেন, "মা, আমাকে জিজ্ঞাসা করা বেশীর ভাগ। তুমি নিজে যাহা ভাল মনে কর তাই কর; তুমি এখন নিজের ভাল মন্দ বেশ বুঝিতে পার।" কল্যাণী চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহার মনে এক প্রবল সংগ্রাম চলিতে লাগিল। পিতাকে সেই অবস্থায় রাখিয়া ধারাপুরে যাইবার পক্ষে যে সকল যুক্তি ছিল, তিনি তাহা বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু বলিতে পারিলেন না।

"নারীজাতি বিষয়ক প্রস্তাব"-রচয়িতা

রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর।

তিনি জানিতেন, পিতাকে ছাড়িয়া যাইবার কথা বলিলে সুধীন্দ্র বাবু তাঁহাকে মনে মনেও কোনরূপে দোষী করিবেন না। কিন্তু পিতার বিষন্ন মুখ দেখিয়া আর কিছু বলিতে তাঁহার সাহস হইতেছিল না। তিনি মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিলেন, পিতার চক্ষে জল। পিতার অশ্রু মুহূর্ত্ত মধ্যে কল্যাণীর কর্ত্তব্যপথ দেখাইয়া দিল। তিনি বলিলেন, "বাবা, আমি এখানে থাকিলেই তুমি সুখী হও, না বাবা?" সুধীন্দ্র বাবু আত্মসংবরণ করিয়া বলিলেন, "সুখী নিশ্চয়ই হই মা, তুমি কাছে থাকিলে এই অশান্তিপূর্ণ গৃহও আমার নিকট আনন্দময় হয়। কিন্তু মা, তোমাকে এই কষ্টের মধ্যে রাখিতে আমার ইচ্ছা হয় না। এখন সরলা বড় হইয়াছে, সে আমার যত্ন করিবে।"

কল্যাণী। না বাবা, সরলার বয়স হইয়াছে বটে, কিন্তু সে এখনও কাজকর্ম্ম কিছু শিখে নাই। সে যতদিন ভাল করিয়া তোমার সেবা করিতে না শিখে তত দিন আমি এখানেই থাকিব।

সুধীন্দ্র। মা, ঈশ্বর তোমায় সুখী করুন। তোমার মত লক্ষ্মী মেয়ে সকলের হয় না।

আনন্দোৎফুল্ল হৃদয়ে সুধীন্দ্র বাবু কাজে চলিয়া গেলেন। বাহিরে কল্যাণীর ডাক পড়িল। তিনি যাইয়া দেখিলেন জিতেন আসিয়াছেন। আনন্দে বিস্ময়ে, এবং সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘকাল জিতেনের বিস্মৃতি ও অকারণ বিরক্তির কথা স্মরণ করিয়া কল্যাণী কিছুক্ষণ নির্ব্বাক্ হইয়া রহিলেন। জিতেন বলিলেন, "আপনি ভাল আছেন? বাবা, কি রকম জায়গা! আপনাদের বাড়ী খুঁজিয়া বাহির করিতে যে কত ভুগিয়াছি!"

কল্যাণীর মুখ লাল হইয়া উঠিল। আপনাদের অবস্থার হীনতাসূচক এই উক্তিতে কল্যাণীর নানা চিন্তায় উৎপীড়িত মন মুহূর্ত্ত মধ্যে কঠিন হইয়া উঠিল, তিনি বলিলেন, "আপনি আমাদের বাড়ী খুঁজিতে এত কষ্ট পাইয়াছেন জানিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম।"

জিতেন বলিলেন, "না না, এই কষ্ট আমি গ্রাহ্য করি নাই। তা ছাড়া এই অঞ্চলেই এমন একজন আছেন যাঁকে দেখিবার জন্য আমি অনেক কষ্ট তুচ্ছ করিতে পারি।" জিতেন মনে করিয়াছিলেন, কল্যাণী বুঝিতে পারিবেন, যে জিতেন তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়াই একথা বলিয়াছেন। কিন্তু কল্যাণী তাঁহার কথা বুঝিতে পারিলেন না, তিনি সংক্ষেপে বলিলেন, "শুনিয়া সুখী হইলাম।"

জিতেন কল্যাণীর এই প্রকার ব্যবহারে একটু বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হইলেন। তথাপি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি আমাকে আপনাদের বাড়ীতে বসিতেও বলিবেন না?"

কল্যাণী। আসুন, ভিতরে আসুন। কিন্তু আমাদের বাড়ীর যে অবস্থা, আপনি এখানে বসিতে বড় একটা ইচ্ছা করিবেন না।

জিতেন। তা'তে আর কি? একদিকে বরং ভালই। আপনি নিশ্চয়ই তা' হ'লে এখান হইতে শীঘ্র শীঘ্র যাইতে ব্যস্ত হইয়াছেন!

কল্যাণী বলিলেন, "না, আমি ব্যস্ত হই নাই। আমার মত এবিষয়ে অন্য রকম।"

কল্যাণী মনে মনে অনুভব করিলেন, তিনি জিতেনের সঙ্গে যে ভাবে কথাবার্ত্তা কহিতেছেন তাহা ঠিক হইতেছে না। একটু কোমল ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পিসিমা, আপনার বাবা এঁরা সকলে ভাল আছেন?"

জিতেন। হাঁ, তাঁরা সকলেই ভাল আছেন। বাবা সেদিন বলিতেছিলেন, আপনি তাঁহাকে এক খানা চিঠিও লেখেন নাই।

কল্যাণী জ্ঞান বাবুর চিঠি পান নাই, সুশীলা দেবীও ভাল করিয়া চিঠি লেখেন না, অথচ কল্যাণী চিঠি লেখেন না বলিয়া তাঁহারা অনুযোগ করেন, ইহাতে কল্যাণীর বিরক্তি বোধ হইল, তিনি বলিলেন, "আমার সময় কোথায়, এখানে কত দিকে মন দিতে হয়।"

"জিতেন বলিলেন, দেখুন, এক মাসে আপনার কি হইয়াছে, আপনার ব্যবহার, কথাবার্ত্তা সকলি যেন কেমন কেমন বোধ হইতেছে!"

কল্যাণী বলিলেন, "শুধু কি আমারই ব্যবহার কেমন কেমন লাগিতেছে?" এই এক মাসের মধ্যে কল্যাণী জিতেনের একখানা চিঠিও পান নাই, সেই কথা স্মরণ

কল্যাণী এই কথা বলিলেন। কিন্তু জিতেন তাহা বুঝিতে পারিলেন না। কারণ, কারবারের অসুখের সময় দিবারাত্রি ব্যস্ত থাকাতে কল্যাণীকে তিনি চিঠি লিখিতে পারিতেছেন না, একথা তাঁহাকে লিখিতে সুশীলা দেবীকে তিনি অনুরোধ করিয়াছিলেন। সুশীলা দেবী কল্যাণীকে সে কথা যে লেখেন নাই জিতেন তাহা জানিতেন না। উপেন নানা প্রকার ইঙ্গিতে এত দিন জিতেনকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, কল্যাণীর সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠতা খুব বাড়িয়াছে। জিতেনের এখন মনে হইল, কল্যাণীর এখন আর তাঁহার প্রতি পূর্ব্বভাব নাই। একটু বিরক্ত হইয়া তিনি বলিলেন, "আপনার নিকট এরূপ ব্যবহার আশা করি নাই।" কল্যাণী বলিলেন, "আমারও ঐ একই কথা।" জিতেন বলিলেন, "আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ আপনার এত অপ্রীতিকর হইবে মনে করি নাই। থাক, আমি এখন যাইতেছি। আপনার পিসিমা আমাকে বলিয়া দিয়াছিলেন, আপনাকে সঙ্গে করিয়া নিয়া যাইতে, কিন্তু আপনার বোধ হয় আমার সঙ্গে যাওয়া অভিপ্রায় নয়।"

কল্যাণীর মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি ভাবিলেন, আজ একি রকম হইতেছে? জিতেন কি কল্যাণীর প্রেমে সন্দেহ করিতেছেন? পরস্পরকে বুঝিতে কি কোন গুরুতর ভুল হইয়াছে? জিতেনকে কেমন ম্লান দেখাইতেছে, কিন্তু গুরুতর কিছু হইয়া থাকিলে জিতেনেরই ত কর্ত্তব্য কল্যাণীকে তাহা খুলিয়া বলা। তিনি বলিলেন, "পিসিমাকে বলিবেন, আমি তাঁহার নিকট যাইবার জন্য অস্থির হইয়াছি, কিন্তু এখনি যাইতে পারিতেছি না, বাবাকে এই অবস্থায় রাখিয়া যাইতে পারি না।"

জিতেন। আমি তবে আসি, নমস্কার।

কল্যাণী। আসুন, নমস্কার। দেখুন, আমার কোন কথায় বিরক্ত হইয়া থাকিলে ক্ষমা করিবেন।

জিতেন চলিয়া যাইতেছেন দেখিয়া কল্যাণী এই এই কথা কয়টী বলিলেন। যদি জিতেন তাঁহার কোন সন্দেহের কথা খুলিয়া বলেন। কিন্তু জিতেন একটু উত্তেজিত ভাবে শুধু বলিলেন, "না না, ক্ষমা করিবার মত কিছু হয় নাই।" অবিলম্বে তিনি চলিয়া গেলেন।

গভীর মানসিক কষ্টে কল্যাণীর দিন কাটিতে লাগিল। ধারাপুরে ছুটিয়া যাইবার জন্য তাঁহার মন অস্থির হইয়া উঠিল। তিনি নিশ্চয় জানিতেন, তিনি ধারাপুরে গেলেই জিতেনের সঙ্গে মনোমালিন্য কাটিয়া যাইবে। কিন্তু কর্ত্তব্যের নিকট আর সকলই তুচ্ছ করিতে তিনি প্রস্তুত হইলেন। প্রস্তুত হইলেন বটে, কিন্তু দারুণ অন্তর্জ্জালায় তিনি পুড়িতে লাগিলেন। প্রাণপণে তিনি আপনার কর্ত্তব্য করিতে লাগিলেন, কিন্তু হায়, সকলই যেন বৃথা হইতে লাগিল। সুধীন্দ্র বাবুর শরীর সারিয়াও সারিল না। সরলা কাজকর্ম্ম শিখিবে কি, দিন দিন যেন আরও অকর্ম্মণ্য হইতে লাগিল। সুশীলের অত্যাচার ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। দুঃখিনী কল্যাণী ভিতরে বাহিরে আর কত সহিবেন? কাহার নিকট আপনার মনোব্যথা, আপনার সংগ্রাম জানাইবেন? এই অসহায় অবস্থায় কল্যাণী একমাত্র ভগবানকেই সহায় ও আশ্রয় বলিয়া আরও বেশী করিয়া ধরিলেন। ক্রমে তিনি বুঝিলেন, কর্ত্তব্যের অনুসরণ করিয়া চলাই তাহার একমাত্র গতি। তাঁহার স্বার্থত্যাগের, পরিশ্রমের কি ফল হইবে, তিনি তাহা ভাবিয়া কি করিবেন? হয়তঃ বহুদিন পরে তাঁহার কার্য্যের ফল ফলিবে। হয়তঃ জীবিত কালের মধ্যে ফলিবে না। কিন্তু ঈশ্বরের নিকট বিশ্বস্ত থাকিয়া কর্ত্তব্য করিয়া যাওয়াই তাঁহার সম্মুখে একমাত্র পথ।

এক দিন শ্রান্ত দেহ মন লইয়া কল্যাণী শেলাই করিতেছেন, তাঁহার আর সেই শ্রী নাই, শরীর শীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু মুখে কেমন একটু শান্তি ও পবিত্রতার আভা প্রকাশ পাইতেছে। অতর্কিত ভাবে সুশীলা দেবী সেখানে প্রবেশ করিলেন। "মা আমার!" বলিয়া কল্যাণীকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন। বহুদিন পরে কল্যাণীর শ্রান্ত মস্তক সুশীলা দেবীর ক্রোড়ে বিশ্রাম লাভ করিল। অশ্রু ও উচ্ছ্বাসে কল্যাণীর হৃদয়ভার আজ লঘু হইল। নিজের এবং কল্যাণীর চোখের জল মুছিয়া সুশীলা দেবী বলিলেন, "চল মা, জিতেন বাহিরে দাঁড়া-

রয়া আছে, তাহাকে নিয়া আসি।” কল্যাণী চমকিত হইয়া বলিলেন, “তিনিও আসিয়াছেন?” জিতেনকে তাঁহারা ভিতরে লইয়া আসিলেন। কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর কল্যাণী বলিলেন, “পিসিমা, মনে করিয়াছিলাম তুমি আমার উপর রাগ করিয়াছ।”

সুশীলা। হাঁ মা, আমি সত্যই তোমার উপর বিরক্ত হইয়াছিলাম, কিন্তু মা, তুমিই জয়ী হইয়াছ। তুমি আপনার কর্ত্তব্যের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া আমাকে আমার কর্ত্তব্য শিখাইয়াছ। কিন্তু মা, আমি আর তোমাকে কাছে রাখিব না। জ্ঞান বাবু ও আমাতে মিলিয়া স্থির করিয়াছি, তোমার বাবা, সুশীল, সরলা সকলে ধারাপুরে যাইবে। আমাদের গালার চাষ এখন সুধীন্দ্র ও সুশীল দেখিবে। সরলা তোমার স্থান অধিকার করিবে। জ্ঞান বাবুর ঘরে আর লক্ষ্মী না হইলে চলিতেছে না, তুমি তাঁহার গৃহের গৃহলক্ষ্মী হইবে।

কল্যাণী জিতেনের দিকে মুখ ফিরাইয়া তখনি লজ্জায় মুখ নত করিলেন। সেই দৃষ্টিতে উভয়ে উভয়ের হৃদয়ের অন্তঃস্থলের গভীর প্রেম দেখিতে পাইলেন। সুধীন্দ্র বাবুরা সহরের বাস ভাঙ্গিয়া ধারাপুরে পল্লীমাতার শান্ত ক্রোড়ে আশ্রয় লইলেন। জিতেন ও কল্যাণীর বিবাহে ধারাপুরের হিন্দুমুসলমান আবালবৃদ্ধবনিতা পরম আনন্দোৎসব সম্ভোগ করিল।

বৈদিক ধর্ম্ম ও গ্রন্থ।

৪

আমরা কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড সম্বন্ধে আমাদের অভিপ্রায় সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিয়াছি এবং ইহা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, হিন্দুশাস্ত্রানুসারে কেবল কর্ম্মকাণ্ডই ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায় হইতে পারে না। কর্ম্মকাণ্ড দ্বারা দেবতার উপাসনা এবং স্বর্গাদি লাভের প্রলোভন দেখাইয়া, সংসার-সর্ব্বস্ব ব্যক্তির চিত্তে ধীরে ধীরে ব্রহ্মাত্মজ্ঞানের স্ফুরণ করিয়া দেওয়াই উহার মৌলিক উদ্দেশ্য। আমরা ইহাও দেখাইয়াছি যে, চিত্তের [illegible] তারতম্যানুসারেই ধর্ম্মমতের বিকাশ হয় এবং [illegible] বিকাশের ক্রমোচ্চভাবের দিকে লক্ষ্য করিয়াই, প্রথমতঃ কর্ম্মকাণ্ড এবং তৎপরে জ্ঞানকাণ্ড উপদিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং বেদ বুঝিতে হইলে, মন্ত্র ব্রাহ্মণ আরণ্যক ও উপনিষদ্ এই গুলিকে একত্র লইয়া বুঝিতে হয়; একাংশ ছাড়িয়া দিয়া, অন্যাংশ গ্রহণ করিলে বৈদিক তত্ত্ব বুঝা হয় না। উপাসনাকাণ্ড অবলম্বন করিয়াও এ কথার দৃঢ়তা সম্পাদন করা যাইতে পারে।

বৈদিকগ্রন্থে উপদিষ্ট উপাসনাপ্রণালী প্রধানতঃ চারি প্রকার, ইহার আভাস পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে। দর্শন-শাস্ত্রেও এই চারিপ্রকার প্রণালীই নির্দ্দেশিত হইয়াছে। (১) দেবতাবর্গকে স্বতন্ত্র পদার্থ জ্ঞান করিয়া এবং তাঁহা-দিগকেই কর্ম্মের ফলদাতা মনে করিয়া যে যজ্ঞাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করা হইয়া থাকে, ইহা নিকৃষ্ট উপাসনা। এই প্রকার যজ্ঞানুষ্ঠানের ফলে, সাধকের পিতৃ-যান পথ অবলম্বন করিয়া, পিতৃলোকে গতি হইয়া থাকে। এই প্রকার সাধকের পুনরাবৃত্তি আছে। এইরূপ উপাসনাই ব্রাহ্মণ-গ্রন্থে প্রধানতঃ কীর্ত্তিত হইয়াছে। (২) দ্বিতীয় প্রকারের উপসনাকে প্রতীকোপাসনা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। প্রাকৃতিক পদার্থগুলি ব্রহ্মশক্তির বিকাশ; সুতরাং প্রাকৃতিক পদার্থে ব্রহ্মদৃষ্টি করা সাধকের কর্ত্তব্য। এ প্রকার উপাসনা প্রথমোক্ত উপাসনা হইতে উৎকৃষ্টতর। এ প্রকার উপাসনায় ব্রহ্মদর্শন আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে উপাস্য পদার্থগুলির প্রাধান্য তিরোহিত হয় না। এ প্রকার উপাসনায়, দেবতা-দিগকে—ব্রহ্মের বিভূতি বা ঐশ্বর্য্যরূপে গ্রহণ করা হইয়া থাকে। বেদান্ত-দর্শনে (৪।৩।১৪), আকাশে ব্রহ্মদৃষ্টি, মনে ব্রহ্মদৃষ্টি, ইন্দ্র, চন্দ্রাদিতে ব্রহ্মদৃষ্টি করিয়া উপাসনা কথিত হইয়াছে। এ প্রকার উপাসনায়, ইন্দ্রাদি দেবতারা এবং প্রাকৃতিক পদার্থগুলি,—এই সকলের ধর্ম্ম ও গুণ ব্রহ্মে আরোপ করিয়া লইয়া সাধক উপাসনা করেন (বেদান্ত দর্শন, ৩।৩।৪)। ইন্দ্রাদি দেবতার বিশেষত্ব-সূচক যে সকল বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে, তদ-বলম্বনে এই প্রতীকোপাসনা সিদ্ধ হইয়া থাকে। ব্রহ্ম

সর্ব্বব্যাপক এবং সর্ব্বস্বরূপ; সুতরাং ইন্দ্রাদির গুণও ব্রহ্মে প্রযুক্ত হইতে পারে। কিন্তু ব্রহ্মের গুণ—কখনই ইন্দ্রাদিতে প্রযুক্ত হইতে পারে না; কেননা, ইন্দ্রাদি দেবতা কেবল বিশেষ অধিকারের স্বামী মাত্র (বেদান্ত দর্শন, ১।১।২৭)। (৩) তৃতীয় প্রকারের উপাসনা অপ্রতীকাবলম্বনে উপাসনা। ইহা মুখ্য ব্রহ্মোপাসনা।০ ইহা দুই প্রকার—(ক) প্রাকৃতিক পদার্থ ও ইন্দ্রচন্দ্রাদি দেবতাবর্গকে ব্রহ্মের বিশেষণরূপে গ্রহণ করিয়া উপাসনা করা যাইতে পারে (বেদান্তদর্শন ৪।১।১৩ বিজ্ঞানভিক্ষু-কৃত ভাষ্য)। ইহাই "তটস্থ" উপাসনা বা "সম্পদুপাসনা" নামে পরিচিত। ইহাতে পদার্থ ও ইন্দ্রাদিদেবতার একেবারেই প্রাধান্য থাকে না; উপাস্য ব্রহ্মেরই একমাত্র প্রাধান্য থাকে। ঋগ্বেদে ইন্দ্রাদি দেবতার সর্ব্বগতত্ব, পাপহারকত্ব প্রভৃতি যে সকল বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা এই অভিপ্রায়েই প্রদত্ত হইয়াছে। ("শাস্ত্র দৃষ্ট্যাতু উপদেশো বামদেববৎ", ১।১।৩০)। শ্রীমদ্দয়ানন্দ এই অংশ লইয়াই বেদের ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। (খ) এই প্রকারে মুখ্যরূপে ব্রহ্মই উপাস্য হইয়া উঠেন। তখন আর কোন প্রাকৃতিক পদার্থ বা দেবতাদির অবলম্বন আবশ্যক করে না। বুদ্ধি বৃত্তির প্রেরক ও অবভাসকরূপে ব্রহ্ম তখন মুখ্যভাবে উপাসনার অবলম্বন হইয়া উঠেন। ধ্যানযোগে তখন একমাত্র ব্রহ্মচিন্তাই সম্পাদিত হইতে থাকে। ক্রমে অদ্বৈতবোধ পরিপক্ক হইয়া সাধক মুক্তি-পথের অধিকারী হইয়া, ভূমানন্দ লাভে পরিতৃপ্ত হইয়া যান।

অতএব, আমরা এখন এই সকল আলোচনা দ্বারা ঋগ্বেদে উল্লিখিত দেবতাবর্গের স্বরূপ এবং উপযোগিতা সম্বন্ধে প্রকৃত অভিপ্রায় কিরূপ, তাহা অনেকটা বুঝিতে পারিলাম। কিন্তু এখনও দেবতাবর্গের সম্বন্ধে সকল দিক্ সম্পূর্ণরূপে দেখা হয় নাই। বেদে দেবতাদিগের সংখ্যা ৩৩টী বা ৩৪টী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। দর্শনশাস্ত্রে ইন্দ্রিয়বর্গকে ব্যষ্টিদেবতা এবং ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু প্রভৃতিকে সমষ্টি দেবতা বলে। বৃহদারণ্যকে এই ব্যষ্টি ও সমষ্টি দেবতার সংখ্যা ৩৩টী বলিয়া নির্দ্দেশিত করা হইয়াছে। ৮ বসু, ১১ রুদ্র, ১২ আদিত্য এবং দ্যৌঃ ও পৃথিবী;—আর কোথাও বা প্রজাপতিকে লইয়া ৩৪টী দেবতা। প্রাকৃতিক দেবতার সংখ্যা এই প্রকারে বৈদিকগ্রন্থে ৩৪টী বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত, আর কতকগুলি স্বভাবতঃই দেবতা আছেন; যেমন ইন্দ্র, বরুণ, যম প্রভৃতি। এতদ্ব্যতীত, আরও এক শ্রেণীর দেবতার উল্লেখ করা হইয়াছে। পূর্ব্বে যাঁহারা মনুষ্য ছিলেন, তাঁহারা উৎকৃষ্ট কর্ম্ম, তপশ্চর্য্যা ও ব্রহ্ম-চর্য্যাদির প্রভাবে দেবতা হইয়া থাকেন। উপনিষদে, এই শেষোক্ত দুই প্রকার দেবতাকে 'আজান দেবতা, এবং 'কর্ম্মদেবতা' এই দুই প্রকার সংজ্ঞা দ্বারা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। বৈদিক টীকাকার সুবিখ্যাত মহীধর একথা আমাদিগকে বলিয়া দিয়াছেন। পৃথিবী, আকাশ ও অন্তরীক্ষ—এই স্থানত্রয়ে যে তিন শ্রেণীর দেবতা—সূর্য্য, বায়ু প্রভৃতি—আছেন বলিয়া ঋগ্বেদে উল্লিখিত হইয়াছেন, তাহা কেবল প্রাকৃতিক দেবতাকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছে। দেবতাদিগের এই যে শ্রেণী বিভাগ করিয়া আমরা দেখাইলাম, এই শ্রেণীবিভাগের কথাটা স্মরণ করিয়া রাখিলে দেবতার সংখ্যা লইয়া আর গোলে পড়িতে হইবে না। এই বিভাগের কথা ভুলিয়া, কেবল ৩৩টী দেবতা লইয়া ব্যস্ত থাকিলে, নানাপ্রকার গোলযোগ হইবারই সম্ভাবনা। Muir প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গ এই শ্রেণী-বিভাগের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়াই, স্থির করিয়াছেন যে ঋগ্বেদে এক এক স্থানে এক এক প্রকার কথা; নানা স্থানে দেবতার নানা সংখ্যা উক্ত হইয়াছে। "ত্রীণি শতা, ত্রি সহস্রানি অগ্নিং ত্রিংশচ্চ দেবাঃ নব চ অসপর্য্যন্" (ঋগ্বেদ, ৩।৯।৯।) আমাদের প্রদর্শিত দেবতাবর্গের শ্রেণী বিভাগের কথা মনে রাখিলে ঋগ্বেদকে আর বিরোধী উক্তিদ্বারা পরিপূর্ণ বলিয়া কদাপি মনে হইবে না।

শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য, বিদ্যারত্ন এম-এ।

২১১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্ম মিশন প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত দ্বারা মুদ্রিত।